আনওয়ারুল মিশকাত শরহে

মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা

২
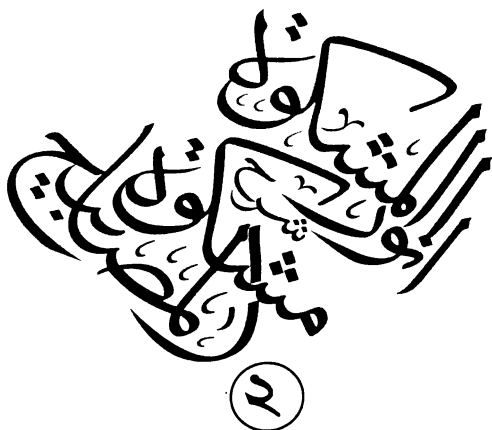
অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন

মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা আব্দুস সালাম

মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

অধ্যায় : নামাজ

ইসলামের মূল রোকন বা স্তম্ভ পাঁচটি। এর মধ্যে ঈমানের পরই সালাতের স্থান। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কোনো ব্যক্তির ঈমান গ্রহণ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যে কাজটি সর্বাগ্রে বর্তায় তা হলো নামাজ। এটা সর্বসম্মতভাবে ফরজ। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে এর ফরযিয়্যাত প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন—

١. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ . (الْبَيِّنَةُ)

অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে সকল দিক হতে নির্লিপ্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে, আর এটাই হলো সঠিক জীবন ব্যবস্থা।-[সূরা বায়্যিনা, আয়াত : ৫]

٢. فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ . (الْحَجُّ)

অর্থাৎ, তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর; যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই হলেন তোমাদের মালিক।-[সূরা হাজ, আয়াত : ৭৮]

٣. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ . (إِبْرَاهِيمُ)

অর্থাৎ, বলুন আমার বান্দাদেরকে, যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি যা তাদেরকে দান করেছি তা হতে ব্যয় করে।-[সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩১]

এমনিভাবে হাদীসে এসেছে যে,

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءُ الزَّكٰوةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ .

٢. حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَادْعُهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الخ . (وغيره)

শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নামাজ ফরজ তা নয়; বরং পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের উম্মতের উপরও নামাজ আবশ্যক ছিল। তবে তাদের জন্য ওয়াক্তের কমবেশির তারতম্য ছিল। যেমন সূরা বাইয়্যেনায় আহলে কিতাব ইহুদি ও নাসারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ الخ .

অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে সকল দিক হতে নির্লিপ্ত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং সালাত কায়েম করবে।

অপর স্থানে হযরত আদম, ইদ্রীস, নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ.) সহ প্রভৃতি নবীগণের উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেন— فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا .

অর্থাৎ অতঃপর তাদের পর স্থলাভিষিক্ত হলো এমন লোকেরা যারা সালাতকে নষ্ট করে দিল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল ফলে তারা অচিরেই ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। [সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৯]

বস্তুত হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী রাসূলের যুগে তাদের উম্মতের উপর সালাত ফরজ ছিল, কোনো নবীর উম্মতই এ থেকে দায়িত্বমুক্ত ছিল না।

সমাজ জীবনে সালাতের প্রভাব : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে তাকে বসবাস করতে হয়। নামাজ মানুষের উপর একটি আবশ্যকীয় দৈনন্দিন পালনীয় একটি ইবাদত হলেও সমাজ জীবনে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী।

১. **অশ্লীলতা ও অন্যায় দূরীকরণ** : নামাজ কায়েমের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন হতে বিবেক বর্জিত কাজ বিদূরীত হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন— إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, অবশ্যই সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

২. **সাম্য** : জামাতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার মাধ্যমেই উঁচু-নিচু, ধনী-নির্ধনের, আশরাফ-আতরাফের দূরত্ব হ্রাস পেয়ে সাম্যগুণের সৃষ্টি হয়।

৩. **ঐক্য** : জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

৪. **দায়িত্ববোধ ও সময়ানুবর্তিতা** : প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে এই গুণের প্রতিফলন ঘটতে পারে।

৫. **সমাজনেতা নির্বাচনের শিক্ষা** : জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে যেভাবে ইমাম নির্বাচন করা হয় তেমনি একইভাবে সমাজ নেতা নির্বাচনেও এটা শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৬. **নেতৃত্বের দায়িত্ববোধ** : ইমাম তাঁর ইমামতের মাধ্যমে নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন।

৭. **শ্রবণ ও আনুগত্য** : ইমামের যথাযথ অনুসরণ ও অনুগমনের মাধ্যমেই মুক্তাদির এ শিক্ষা অর্জিত হয়।

৮. **পারস্পরিক সহযোগিতা** : মসজিদ তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে এ সামাজিক গুণটি সৃষ্টি হয়।

৯. **নিষ্ঠা ও একাগ্রতা** : শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সালাত আদায়ের মন-মানসিকতা থেকেই এই গুণ অর্জন করা যায়।

১০. **আত্মনিয়ন্ত্রণ** : সর্বদা সালাত আদায় এবং সালাতের নিয়ম-পদ্ধতি সঠিকভাবে পালন করার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এ সৎগুণের সৃষ্টি হয়।

১১. **চরিত্র গঠন** : নামাজের মাধ্যমে দৈনিক পাঁচবার তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের স্মরণের ফলে চরিত্রের মন্দ-দিকগুলো দূরীভূত হয়ে যায়।

১২. **নিয়মানুবর্তিতা** : দৈনিক পাঁচবার নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ নিয়ম-শৃঙ্খলা বোধসম্পন্ন হয়ে যায়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমার নামাজ হতে অপর জুমার নামাজ এবং এক রমজানের রোজা হতে অপর রমজানের রোজা কাফ্ফারা হয় সে সব গুনাহের, যা এদের মধ্যবর্তী সময়ে হয়; যখন কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকা হয়।—[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মূল নাম নিয়ে এত অধিক বিতর্ক যে, এরূপ মতানৈক্য আর কারো ব্যাপারে ঘটেনি। সর্বাধিক ১৯/৩৫ পর্যন্ত মতামত পাওয়া যায়। তবে এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো—

❊ ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর নাম ছিল— (ক) আবদুশ শামস, (খ) আব্দু আমর, (গ) আব্দুল লাত, (ঘ) আব্দুল ওজ্জা ইত্যাদি।

❊ ইসলাম পরবর্তী নাম হলো— (ক) আব্দুল্লাহ ইবনে সখর, (খ) আব্দুর রহমান ইবনে সখর, (গ) ওমায়ের ইবনে আমের।

উপনাম : আবূ হুরায়রা। এই উপনামেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেন।

পিতার নাম : সখর।

মাতার নাম : উম্মিয়া বিনতে সাকীহ বা মাইমূনা।

নিসবতী নাম : তাঁকে দাউসী বলা হয়। সম্ভবত তাঁর পূর্ব পুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হয়। তাঁকে আবার আযদীও বলে। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের 'আযদ' গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহ্ম বংশোদ্ভূত।

২. **আবূ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ** : বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) জামার আস্তিনের নিচে একটি বিড়াল ছানা নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। হঠাৎ বিড়াল ছানাটি সকলের সামনে বের হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে রাসূলে কারীম ﷺ রসিকতা করে তাঁকে "يَا اَبَا هُرَيْرَةَ" বা 'হে বিড়াল ছানার পিতা' বলে ডাকেন। তখন থেকেই তিনি এ নামটি নিজের জন্য পছন্দ করে নেন। আর সে থেকেই তিনি আবূ হুরায়রা নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

❊ শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলবী (র.) সংক্ষেপে এভাবে বলেন যে,

إِنَّمَا سُمِّىَ اَبَا هُرَيْرَةَ لِاَنَّهُ كَانَ لَهُ هِرَّةٌ صَغِيْرَةٌ يَحْمِلُهَا مَعَهُ .

৩. **ইসলাম গ্রহণ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত তুফায়েল ইবনে আমের আদ-দাওসীর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হন।

৪. **রাসূলের সাহচর্য** : ইসলাম গ্রহণের পর হতে তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হননি।

❊ আল্লামা ইবনুল আসীর (র.) বলেন— فَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ الرَّسُوْلِ ﷺ

❊ আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (র.) বলেন—

وَاظَبَ عَلَيْهِ رَاغِبًا فِى الْعِلْمِ رَاضِيًا بِشِبْعِ بَطْنِهِ وَكَانَ يَدُوْرُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُ اَحَدٌ مِنْهُمْ بِمُلَازَمَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِذٰلِكَ كَثُرَ حَدِيْثُهُ .

৫. **তাঁর স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে রাসূল ﷺ-এর দোয়া** : তিনি প্রথম অবস্থায় হাদীস শুনে মুখস্থ রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারে হুজুর ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন, اُبْسُطْ رِدَاءَكَ অর্থাৎ 'তোমার চাদর বিছিয়ে ধরো'। তিনি তা করলেন, হুজুর ﷺ তাতে বরকত দান করলেন। সে বরকত লাভ করার পর হতে তিনি আর একটি হাদীসও ভুলেননি।

৬. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা** : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.)-এর মতে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৩২৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। এককভাবে ইমাম বুখারী ৭৯টি আর মুসলিম ৭৩/৯৩ টি হাদীস বর্ণনা করেন।

❊ কারো মতে বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ৮২২টি আর ইমাম বুখারী এককভাবে ৪০৪টি ও মুসলিম ৪১৮টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৭. **তাঁর নিকট হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন** : ইমাম বুখারী ও আইনী বলেন, আট শতেরও বেশি সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

৮. **ইন্তেকাল** : তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ থাকলেও মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মৃত্যু সন ৫৭/৫৮/৫৯ হিজরি। মদীনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯. **তাঁর জানাযার নামাজ** : হযরত ওলীদ ইবনে ওকবা (রা.) তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) তাঁর জানাযায় শরিক হন। তাঁকে মদীনার জান্নাতুল বাকী'তে সমাহিত করা হয়

مَعْنَى الصَّلٰوةِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا সালাতের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

مَعْنَى الصَّلٰوةِ لُغَةً : صَلَاةٌ শব্দটি فِعَالٌ-এর ওযনে বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। স্থান বিশেষে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কবির ভাষায়—

صَلٰوة رَا مَعْنٰى دَرْ لُغَتْ چَارْ * دُعَاء و دَرُوْد و رَحْمَتْ وَاِسْتِغْفَارْ

১. রহমত অর্থে : যখন صَلَاةٌ শব্দটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন কুরআনের বাণী—
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ

২. দোয়া অর্থে : যখন صَلَاةٌ শব্দটি সাধারণ মানুষ থেকে অন্যের দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন কুরআনের বাণী—
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ .

৩. দরূদ অর্থে : যখন صَلَاةٌ শব্দটি উম্মত থেকে রাসূল ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন কুরআনের বাণী—
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

৪. ক্ষমা প্রার্থনা অর্থে : যখন ফেরেশতার দিকে সম্পর্কিত হবে। যেমন আল্লাহর বাণী—
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

বস্তুত صَلٰوةٌ-এর স্থানভেদে অনেকগুলো অর্থ রয়েছে, পবিত্র কুরআনেই এ শব্দটি ১০টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلصَّلٰوةُ : مَعْنَى الصَّلٰوةِ اِصْطِلَاحًا-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমগণ নিম্নোক্ত মতামত পোষণ করেন—

১. ফাতহুল মুলহিম প্রণেতার মতে— هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْاَرْكَانِ الْمَعْهُوْدَةِ وَالْاَفْعَالِ الْمَخْصُوْصَةِ فِيْ اَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট আরকান এবং আফয়াল সম্পন্ন করাকে صَلٰوة বলে।

২. কেউ কেউ বলেন— هِيَ عِبَادَةٌ شَامِلَةٌ عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَالْجُلُوْسِ وَالْقَوْمَةِ অর্থাৎ, শরিয়ত নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কিয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদি যথাযথ পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাকে صَلٰوة বলে।

৩. কারো কারো মতে— هِيَ اَدَاءُ اَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ بِطَرِيْقَةٍ مَخْصُوْصَةٍ
"اَلْمُعْجَمُ الْوَسِيْطِ" গ্রন্থে বলা হয়েছে— هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُوْدَ اَوْقَاتِهَا فِي الشَّرِيْعَةِ

৪. কেউ কেউ বলেন- هِيَ الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةُ الَّتِيْ تُؤَدّٰى بِطَرِيْقٍ مَخْصُوْصٍ فِيْ وَقْتٍ مَخْصُوْصٍ

৫. فِقْهُ السُّنَّةِ কিতাবে বলা হয়েছে—
اَلصَّلَاةُ عِبَادَةٌ تَتَضَمَّنُ اَقْوَالًا وَاَفْعَالًا مَخْصُوْصَةً مُفْتَتَحَةً بِتَكْبِيْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُخْتَتِمَةً بِالتَّسْلِيْمِ .

মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম হচ্ছে- صَلَاةٌ যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর ফরজ করেছেন, যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর, আর শেষে রয়েছে তাসলীম।

اَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ فِيْ اَنَّ الْعِبَادَاتِ مُكَفِّرَاتٌ لِلذُّنُوْبِ

ইবাদত পাপ কাজের কাফ্ফারা হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত : ইবাদত বা নেক কর্ম বান্দার পাপ কর্মের কাফ্ফারা কি না এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা—

১. مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ : মু'তাযিলাদের মতে সৎকর্ম দ্বারা কবীরা গুনাহের ক্ষমা হয় না। কেননা, কবীরার জন্য তওবা শর্ত, তদ্রূপ সগীরা গুনাহের ক্ষমা হওয়ার জন্য কবীরা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকা শর্ত।

তাদের দলিল :

١. قَالَ تَعَالٰى : اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا (اَلنِّسَاءُ : ٣١)

٢. قَالَ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ . (سُوْرَةُ النَّجْمِ : ٣٢)

٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ الْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ .

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ **আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত** : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা মাফ করেন না। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে তওবা ছাড়াই মাফ করতে পারেন, যেহেতু তিনি হলেন— فَعَّالٌ لِمَا يُرِيْدُ আর সগীরা গুনাহের ক্ষমা হওয়ার জন্য কবীরা থেকে বিরত থাকা শর্ত নয়।

তাঁদের দলিল—
١. قَوْلُهُ تَعَالٰى اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ .

২. يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ .... اَلْاٰيَةُ .

৩. خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ، مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ ... كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَلَهُ الخ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِ الْمُخَالِفِيْنَ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পক্ষ হতে মু'তাযিলাদের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে كَبَائِرُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

আর আয়াত ও হাদীসের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন, যেগুলো কবীরা গুনাহের জন্য কার্যকারণ হয়েছিল; যদি বান্দা কবীরা গুনাহ হতে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে যায় এবং ইবাদতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যখন দৈনন্দিনের গুনাহ মোচন করে, তখন এমন আর কোনো পাপ অবশিষ্ট থাকে না, যা জুমা মোচন করবে। এরপর আবার এমন কোনো গুনাহ থাকে না, যা রমজান মোচন করতে পারে। কেননা, সকল গুনাহ মোচনের জন্য তো নামাজই যথেষ্ট। ফলে হাদীসে জুমা এবং রমজানের উল্লেখ অতিরিক্ত নয় কি?

এর জবাবে বলা যায় যে, নামাজ আদায় করতে গিয়ে যদি কোনো রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায় তবে জুমা ঐ ত্রুটিসমূহ মোচন করে থাকে। আর জুমা আদায় করতে গিয়ে যে সব ভুল-ত্রুটি হয়, তার মোচনের জন্য রমজানের রোজা। কাজেই বুঝা গেল যে, হাদীসে জুমা ও রমজানের উল্লেখ অতিরিক্ত নয়।

এ ছাড়া জুমা এবং রমজান উল্লেখ করে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং জুমার নামাজ ও রমজানের রোজার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٥١٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهْرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهٖ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৯. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা আমাকে বল তো যে, যদি তোমাদের কারো দরজার নিকট একটি নহর থাকে আর তাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে কী কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে? তাঁরা [সাহাবীরা] বলল, না তার শরীরের কোনো ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণও এরূপই। এগুলোর বিনিময়ে আল্লাহ তার অপরাধসমূহ মুছে দেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ تَشْبِيْهِ الْغُسْلِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ গোসলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তুলনা করার কারণ : পাঁচবার গোসল করাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ উচিত ছিল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে দৈনিক পাঁচবার গোসলের সাথে তুলনা করা এরূপ ব্যতিক্রম করার কারণ কি?

এর জবাবে বলা যায় যে, এরূপ তাশবীহ হলো– تَشْبِيْهُ الْمَعْقُوْلِ بِالْمَحْسُوْسِ এবং تَشْبِيْه مَقْلُوْب -এর অন্তর্ভুক্ত مُبَالَغَة -এর জন্য এরূপ বলা হয়েছে যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا এখানে اَلْبَيْعُ -কে اَلرِّبٰوا -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে মুবালাগার জন্য। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শ্রোতাদেরকে সতর্ক করা। বস্তুত এখানে اِغْتِسَال হলো مُشَبَّهْ আর صَلَاتْ خَمْسَة হলো مُشَبَّه بِه এবং وَجْه شِبْه হলো تَطْهِيْر তথা পবিত্র করা।

مَا هِيَ فَائِدَةُ الْحَسَنَاتِ لِمَنْ لَا سَيِّئَاتَ لَهُ :

যার গুনাহ নেই তার নেক কাজের উপকার কি হবে? হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সৎকর্ম তথা অজু, নামাজ, জুমা, রমজান ইত্যাদি দ্বারা তার সগীরা গুনাহ ঝরে যায়। আর তার সাথে তওবা থাকলে কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়। যদি তার সগীরা বা কবীরা কোনো গুনাহই না থাকে তবে তার ভালো কর্ম দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং নেকী বেড়ে যায়।

---

٥٢٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَصَابَ مِنْ اِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِيَ هٰذَا؟ قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ اُمَّتِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২০. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুম্বন করেছিল। অতঃপর সে নবী করীম ﷺ-এর নিকট আগমন করে তা তাঁকে জানাল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করলেন যে, اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ, 'দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূরীভূত করে দেয়।' তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আমার জন্য? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমার সকল উম্মতের জন্যই।' অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমার উম্মতের যে কেউই এ আমল করবে। অর্থাৎ, কোনো পাপ কাজ করার পর পুণ্য কাজ করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَانُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি বাজারে খেজুর বিক্রয় করতে গিয়েছিল। যার নাম আবুল ইয়াসার। একদা এক অপরিচিতা মহিলা তার নিকট খেজুর ক্রয় করতে আসল। তখন সে বলল, ঘরের ভিতরে ভালো খেজুর আছে। অতঃপর স্ত্রীলোকটি ভিতরে প্রবেশ করলে খেজুর বিক্রেতা তাকে চুম্বন করে বসল। স্ত্রীলোকটি ছিল অত্যন্ত ধার্মিক। ফলে সে খেজুর বিক্রেতাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, اِتَّقِ اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর'। এ কথা শোনামাত্র লোকটি ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়ল এবং বুঝতে পারল যে, সে অপরাধ করে ফেলেছে। অতএব সে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বিস্তারিত খুলে বলল। রাসূল ﷺ কোনো ফয়সালা না দিয়ে ওহীর অপেক্ষায় থাকলেন। অবশেষে আসরের নামাজের পর উল্লিখিত হাদীসের মধ্যস্থিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِنَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দিনের দুই অংশে এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।' দিনের প্রথমাংশে ফজর নামাজ দ্বিতীয়াংশে জোহর ও আসরের নামাজ এবং রাতের কিছু অংশে অর্থাৎ প্রথমাংশে মাগরিব ও এশার নামাজ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারক এ আয়াতটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

❊ আর কিছু সংখ্যক বলেন, দিনের একাংশে ফজরের নামাজ ও জোহরের নামাজ আর অপরাংশে আসর ও মাগরিবের নামাজ এবং রাতের কিছু অংশে এশার নামাজ। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

نَبْذَةٌ مِنْ حَيَاةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জীবনী :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম– আবূ আব্দুর রহমান আল-হুজালী। দাদার নাম– জাকির ইবনে হাবীব।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে, মহানবী ﷺ দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ইবনে মাসউদ নিজেই বলতেন, আমি ৬ষ্ঠ মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

৩. **মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ :** তিনি রাসূল ﷺ-এর সফরসঙ্গী হতেন। হুযূরের অজুর পানি মিসওয়াক ও জুতা বহন করতেন।

৪. **হিজরত :** ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি মক্কায় প্রকাশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফলে কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখান থেকে পরে মদীনায় হিজরত করেন।

৫. **জিহাদে যোগদান :** তিনি ইসলামের সকল জিহাদে অসীম শৌর্যবীর্য নিয়ে অংশ গ্রহণ করেন। হুনাইনের যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

৬. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন :** ৬৪০ খ্রি: মোতাবেক ২০ হিজরি সনে কূফার কাজি নিযুক্ত হন।

৭. **দৈহিক গঠন :** দৈহিক দিক থেকে তিনি একেবারে হালকা-পাতলা স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তবে তিনি এত লম্বা ছিলেন যে, বসলেও সবার উপর তার মাথা দেখা যেত।

৮. **বর্ণিত হাদীস :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সর্বমোট ৮৪৮ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬৪/৬৮টি ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে আর বুখারী ২১ খানা ও মুসলিম ৩৫ খানা এককভাবে উল্লেখ করেছেন।

৯. **ইন্তেকাল :** তিনি ৩২/৩৩ হিজরিতে ৯/৮-ই রমজান ৬০ বছরের কিছু বেশি বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

১০. **দাফন :** হযরত উসমান (রা.) মতান্তরে যোবায়ের বা আম্মার (রা.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকী'তে উসমান ইবনে মাযউনের কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

---

٥٢١ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ قَالَ وَلَمْ يَسْئَلْهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ اَلصَّلٰوةَ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْ فِىَّ كِتَابَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ ذَنْبَكَ اَوْ حَدَّكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি। অতএব আমার উপর তা প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম ﷺ তাকে সে সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। ইত্যবসরে নামাজের সময় হয়ে গেল। তখন লোকটি নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ল। যখন নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ শেষ করলেন, তখন সে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি শরয়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছি। সুতরাং আমার উপর আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত বিধান প্রয়োগ করুন। জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামাজ পড়নি? সে বলল, হ্যাঁ, পড়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহ বা দণ্ড মাফ করে দিয়েছেন। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْكَبِيْرَةُ لَاتُغْفَرُ اِلَّا بِالتَّوْبَةِ فَكَيْفَ غُفِرَتْ بِالصَّلٰوةِ :

কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না নামাজ দ্বারা তা কিভাবে মাফ হলো? আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, কেবলমাত্র সগীরা গুনাহ পুণ্য কাজের দ্বারা ক্ষমা হয়ে যায়, কিন্তু কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। অথচ উল্লিখিত হাদীসে আগন্তুকের কথানুযায়ী বুঝা যায় যে, সে কবীরা গুনাহ করেছে। এটা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ কিভাবে বললেন যে, তোমার দণ্ড বা গুনাহ নামাজের দ্বারা মাফ হয়ে গেছে। হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নোক্ত জবাব প্রদান করেছেন—

১. আগন্তুক লোকটি মূলত কবীরা গুনাহ করেনি। যদিও সে নিজের ধারণা মতে তার কৃত গুনাহকে কবীরা গুনাহ মনে করেছিল। তার পরবর্তী বাক্য "فَاَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ" দ্বারা বুঝা যায়, তার কৃত অপরাধ শাস্তিযোগ্য কি না? এ বিষয়ে সে নিজেই নিশ্চিত ছিল না।

২. অথবা যদিও আগন্তুক ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করেছে বলে মনে করেছে, কিন্তু রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, সে কবীরা গুনাহ করেনি। এ জন্যই নামাজ দ্বারা তা মাফ হয়ে গেছে।

৩. অথবা আগন্তুক ব্যক্তি حَدٌّ দ্বারা তাযীর বুঝিয়েছেন। আর তা সগীরা গুনাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়।

৪. অথবা আগন্তুক ব্যক্তি কবীরা গুনাহই করেছিল। কিন্তু সে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে রাসূল ﷺ-কে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করেছিল, এতেই তার তওবা হয়ে গেছে।

৫. অথবা কবীরা গুনাহ মাফের ব্যাপারটি শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, অন্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

৬. অথবা সে কবীরা গুনাহই করেছিল, তবে রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ার বরকতে এবং তাঁর সঙ্গ দানের বিশেষত্বের কারণে তার গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ব্যাপারটি একান্তই স্বতন্ত্র। সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য নয়।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ مَعْنٰى "عَلٰى" وَ "فِىْ" :

عَلٰى ও فِىْ-এর অর্থের মধ্যে পার্থক্য : আলোচ্য হাদীসে আগন্তুক ব্যক্তির প্রথম বক্তব্য হলো فَاَقِمْ عَلٰى আর অপর বক্তব্য হলো فَاَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ এ উভয় বাক্যাংশের فِيَّ ও عَلٰى-এর মধ্যকার পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ : عَلٰى দ্বারা সুনির্দিষ্ট কোনো হদ বা শাস্তি বুঝা যায়, আর فِىْ নির্দিষ্ট حَدٌّ বুঝা যায় না; বরং হদ হোক বা অন্য কোনো শাস্তি হোক তাই বুঝা যায়। এর ব্যাখ্যা হলো, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে বুঝেছিল যে নিঃসন্দেহে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়েছে। এ জন্য সে فَاَقِمْهُ (اَلْحَدَّ) عَلَيَّ তথা আমার উপর হদ জারি করুন। এটা বলার পরও যখন দেখল যে, রাসূল ﷺ নীরব রয়েছেন– হদ প্রয়োগ করার কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না, তখন তার সন্দেহ হলো যে, তার কৃত পাপ শাস্তিযোগ্য কি না? এই দ্বিধার কারণে পরবর্তীকালে সে বলেছে যে– فَاَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমার উপর যে শাস্তি রয়েছে তা প্রয়োগ করুন।

اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ-এর জবাব "بَلٰى" দ্বারা দেননি কেন? لِمَ يَجِبْ "بَلٰى" فِىْ جَوَابِ الْاِسْتِفْهَامِ الْاِنْكَارِيِّ : সাধারণত اِسْتِفْهَامِ اِنْكَارِىْ-এর জবাব "بَلٰى" দ্বারা দেওয়া হয় "نعم" দ্বারা নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى কেননা, এখানে যদি نَعَمْ দ্বারা জবাব দেওয়া হতো তা হলে অর্থ হতো "نَعَمْ لَسْتَ رَبَّنَا" অর্থাৎ হাঁ, তুমি আমাদের প্রতিপালক নও। এমনিভাবে এখানেও نَعَمْ বললে অর্থ দাঁড়ায়– نَعَمْ لَيْسَ صَلَّيْتَ مَعَكَ অর্থাৎ, হাঁ, আমি আপনার সাথে নামাজ পড়িনি।

সমাধান : এর সমাধানকল্পে বলা যায় যে, دِرَايَتْ ও رِوَايَتْ-এর মধ্যে গরমিল দেখা দিলে স্বভাবতই رِوَايَتْ-এর অগ্রাধিকার হয় دِرَايَتْ-এর নয়। আর এখানেও رِوَايَتْ-এরই অগ্রাধিকার হবে। আলোচ্য হাদীসে دِرَايَةْ-এর দৃষ্টিতে "بَلٰى" হওয়া যুক্তিযুক্ত হলেও رِوَايَةْ-এর দৃষ্টিতে نَعَمْ হওয়াই হলো অধিক অগ্রগণ্য। তাই এখানে بَلٰى না হয়ে نَعَمْ হয়েছে।

لِمَ لَمْ يَسْئَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَنْبِهِ **নবী করীম ﷺ কেন তাকে তার পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি** : মহানবী ﷺ ওহীর মাধ্যমে লোকটির দোষ ও ক্ষমার কথা পূর্বেই অবহিত হয়েছিলেন। তাই তা আর জানতে চাননি।

অথবা লোকটি তার ওজর নিজেই পেশ করেছিল, যার কারণে রাসূল ﷺ আর কিছু জানতে চাননি।

اَيَّةُ صَلٰوةٍ صَلَّى الرَّجُلُ مَعَ الرَّسُوْلِ ﷺ :

লোকটি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোন নামাজ পড়েছিল : লোকটি রাসূল ﷺ-এর সাথে কোন নামাজ পড়েছিল তা সঠিকভাবে যানা যায়নি। ফলে অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো ওয়াক্তের নামাজ উদ্দেশ্য হতে পারে তবে কিছু সংখ্যকের মতে উক্ত নামাজ ছিল আসরের নামাজ।

مَا اسْمُ الرَّجُلِ **লোকটির নাম কি?** কারো মতে ইবনে মাসউদ ও হযরত আনাসের হাদীসের ঘটনা একই তাই আগত ব্যক্তির নাম হলো আবুল ইয়াসার।

আর কেউ বলেন, উভয়টি পৃথক পৃথক ঘটনা। আর হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসের ব্যক্তির নাম জানা যায়নি। কেননা, এরূপ মন্দ কর্মে জড়িত একজন সাহাবীর নাম উল্লেখ না করাই যুক্তিযুক্ত।

نَبْذًا مِنْ حَيَاةِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ হযরত আনাস ইবনে মালেকের সংক্ষিপ্ত জীবনী :

১. **নাম ও পরিচিতি** : নাম– আনাস; উপনাম– আবূ হামযা, আবূ উমাইয়া, আবূ উমামা এবং আবূ উমায়মা। উপাধি– খাদেমু রাসূলিল্লাহ ﷺ। পিতার নাম– মালেক ইবনে নযর, আর মাতার নাম–উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান।

২. **রাসূলের খেদমতে নীত** : রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করলে হযরত আনাসের মাতা তাঁকে রাসূলের খেদমতে পেশ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। তিনি একটানা দশ বছর যাবৎ রাসূল ﷺ-এর খেদমত করার সুযোগ লাভ করেন।

৩. **যুদ্ধে অংশ গ্রহণ** : বয়সের স্বল্পতার কারণে হযরত আনাস (রা.) বদর ও ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। কেননা, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। পরবর্তীতে খায়বারসহ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৪. **সরকারি দায়িত্ব পালন** : হযরত আবূ বকরের খেলাফতকালে তিনি বাহরাইনের আমেল ও গভর্নর নিযুক্ত হন। হযরত ওমর-এর খিলাফতকালে বসরার মুফতি নিযুক্ত হন। তবে হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর ফিতনার সময় নীরবতা পালন করেন।

৫. **রাসূলের দোয়া** : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক ধন-সম্পদ, দীর্ঘ হায়াত, সন্তানাদি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলেন। আল্লামা আইনীর বর্ণনা মতে হযরত আনাসের মা একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا خُوَيْدِمُكَ اَنَسٌ اُدْعُ اللّٰهَ لَهٗ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِىْ مَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَاَطِلْ عُمْرَهٗ وَاغْفِرْ ذَنْبَهٗ – ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত আনাস (রা.)-কে ১০০/৮০ সন্তান প্রদান করেন। এর মধ্যে ২ জন কন্যা সন্তান।

৬. **হাদীস বর্ণনা** : হযরত আনাস (রা.) সর্বমোট ১২৮৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ১৬৮ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। আর এককভাবে ইমাম বুখারী ৮৩ খানা এবং ইমাম মুসলিম ৯১ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

৭. **ইন্তেকাল ও দাফন** : এই মহামানব ৯০/৯২/৯৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩/১১০/১০৭। বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী হলেন তিনি। প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাঁকে গোসল করান। কাতান ইবনে মুদরাক তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। বসরায় তাঁর বাসভবনের পাশে 'তেফ' অথবা 'কছর' নামক মহল্লায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٥٢٢ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُّهٗ لَزَادَنِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২২. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়? জবাবে তিনি বললেন, ঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোন কাজ? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোন কাজ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। ইবনে মাসঊদ (রা.) বললেন, নবী করীম ﷺ আমাকে এগুলো বললেন, যদি আমি আরো বেশি জিজ্ঞাসা করতাম তবে তিনি আমাকে আরো বেশি বলতেন। —বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ فِىْ تَعْيِيْنِ اَفْضَلِ الْاَعْمَالِ :

উত্তম কাজ নির্ধারণের ব্যাপারে হাদীসসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : 'কোন্ কাজ করা উত্তম?' এরূপ প্রশ্নের জবাবে মহানবী ﷺ বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্মের কথা বলেছেন। যেমন–হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.)-এর হাদীসে বলেছেন যে, যথাসময়ে নামাজ

পড়া, পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবার হযরত আবূ যার (রা.)-এর হাদীসে দেখা যায় যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকে উত্তম কাজ বলেছেন। আবার অন্য হাদীসে বলেছেন যে, অপরকে খাদ্য দান করা ও সালাম করা উত্তম। ফলে হাদীসসমূহের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এ দ্বন্দ্ব সমাধানকল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন।

১. হাদীস সমূহের মধ্যে أَفْضَلُ তথা اِسْمُ تَفْضِيْل -এর সীগাটি তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অর্থাৎ, এর দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, এ আমলটিই সর্বোত্তম। বরং এর দ্বারা শুধুমাত্র আমলটির ফজিলত বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

২. অথবা প্রশ্নকারীর অবস্থানুযায়ী রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়কে উত্তম বলেছেন, অর্থাৎ যার মধ্যে যে আমলের ত্রুটি দেখেছেন তাকে সে আমলের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য রাসূল ﷺ এরূপ বলেছেন।

৩. অথবা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, এক স্থানে একটি জিনিস উত্তম, যেমন নামাজের মধ্যে সময় মতো নামাজ পড়া উত্তম, নম্রতার মধ্যে সালাম দেওয়া উত্তম, সমস্ত আমল হতে ঈমান উত্তম ইত্যাদি।

---

٥٢٣ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, বান্দা ও কুফরির মধ্যে যোগসূত্র হলো নামাজ পরিত্যাগ করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ تَكْفِيْرِ تَارِكِ الصَّلٰوةِ নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগকারীকে কাফির বলা যাবে কি না? এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. হযরত ওমর (রা.)-এর মতে যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন– كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهٗ كُفْرٌ غَيْرُ الصَّلَاةِ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ নামাজ ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরি কাজ বলে মনে করতেন না; শুধুমাত্র নামাজ ত্যাগ করাকেই তারা কুফরি কাজ বলে মনে করতেন।

৩. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, تَرْكُ الصَّلٰوةِ كُفْرٌ নামাজ ত্যাগ করা কুফরি।

৪. ইমাম মালেক, শাফেয়ী (র.) সহ অন্যান্যদের মতে– تَارِكُ الصَّلٰوةِ كَالْمُرْتَدِّ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدِّيْنِ অর্থাৎ, নামাজ ত্যাগকারী ধর্মত্যাগকারীই অনুরূপ, তবে সে দীন হতে বের হয়ে যায় না।

৫. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে– لَا يُقْتَلُ بَلْ يُحْبَسُ حَتّٰى يُصَلِّيَ নামাজ ত্যাগকারীকে হত্যা করা যাবে না, বরং নামাজে অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখতে হবে।

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ -এর ব্যাখ্যা : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কোনো আমল ত্যাগকারী কাফির হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকে ত্যাগ করা বৈধ মনে করে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, নামাজ ত্যাগকারী কাফির। ওলামাগণ তার নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন– (১) যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করাকে বৈধ মনে করে নামাজ পরিত্যাগ করে সে কাফির হয়ে যাবে। (২) অথবা যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করে সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। সুতরাং পরকালের দৃষ্টিতে তাকে কাফির বলা হয়েছে। (৩) অথবা নামাজ ত্যাগকারী কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়। নামাজ হলো ঈমান ও কুফরির মধ্যে প্রাচীর স্বরূপ। (৪) অথবা যে ব্যক্তি নামাজের অপরিহার্যতা অস্বীকার করে তা ত্যাগ করে সে কাফির। (৫) কিংবা যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করল সে কাফিরের ন্যায় কাজ করল। (৬) অথবা কুফরির নিকটবর্তী হয়ে গেল। (৭) অথবা এ সকল হাদীস দ্বারা নামাজ ত্যাগকারীর প্রতি শাস্তির হুকমি প্রদান করাই উদ্দেশ্য।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি** : নাম– জাবের, উপনাম– আবূ আব্দুল্লাহ ও আবূ আব্দুর রহমান, পিতার নাম– আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, মাতার নাম– নাসীবাহ।

২. **জন্ম** : তিনি খাযরাজ গোত্রের সলম শাখায় হিজরতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **ইসলাম গ্রহণ** : হযরত জাবের (রা.) তাঁর ১৮ বছর বয়ঃক্রমকালে তাঁর পিতাসহ দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কারো মতে প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. **জিহাদে অংশগ্রহণ** : তিনি বদর ও ওহুদে বয়সের স্বল্পতার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। এরপর তিনি সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৫. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা** : তিনি সর্বমোট ১৫৪০টি হাদীস বর্ণনা করেন। সম্মিলিতভাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ৬০টি, আর এককভাবে বুখারী ২৬টি এবং মুসলিম ২৬টি হাদীস উল্লেখ করেন।

৬. **ইন্তেকাল** : তিনি ৭৪/৭৭ হিজরিতে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্বাস ইবনে ওসমান (রা.) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। মদীনায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٤ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوٰى مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

৫২৪. **অনুবাদ** : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ তা'আলা ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি সেগুলোর অজু ভালভাবে করে এবং যথাসময়ে পড়ে আর রুকূ' সেজদা পূর্ণভাবে আদায় করে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে এরূপ করে না তার জন্য আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। –[আহমদ, আবূ দাঊদ, মালেক ও নাসায়ী-এর মতোই বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দার উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করবে না তার বিষয়ে আল্লাহর কোনো জিম্মাদারী নেই। আল্লাহ তাকে ক্ষমাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। তবে ইবাদতকারীকে ক্ষমা করা বা ছওয়াব প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়। তিনি ইচ্ছা করলে ইবাদাতকারীকেও শাস্তি প্রদান করতে পারেন, আবার ফাসিককেও ছওয়াব দিতে পারেন। তিনি কোনো কাজ করতে বাধ্য নন। তবে মহা ইনসাফগার হওয়ার কারণে অন্যায়কারীকে শাস্তি এবং ন্যায়কারীকে ছওয়াব দিয়ে থাকেন।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ **রাবী পরিচিতি :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম– উবাদা, উপনাম– আবুল ওয়ালীদ। পিতার নাম– সামিত, মাতার নাম– কুররাতুল আইন বিনতে উবাদা ইবনে নাযলা, মাতামহের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় উবাদা। হিজরতের ৩৮ বছর পূর্বে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন।

২. **বংশধারা :** উবাদা ইবনে সামিত ইবনে কায়িস ইবনে আসরাম ইবনে ফিহ্র ইবনে কায়স ইবনে ছা'লাবা ইবনে গানাম ইবনে সালেম ইবনে আউফ ইবনে আমর ইবনে আউফ ইবনে খাযরাজ।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি আকাবার প্রথম শপথে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী আকাবায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১২জন নকীবের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

৪. **যুদ্ধে অংশ গ্রহণ :** তিনি বদরসহ সকল যুদ্ধে শরিক ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শাসনামলে সিরিয়ার অভিযানসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। সিরিয়ার কাজি ও মুয়াল্লিমের দায়িত্বও পালন করেন। ওমরের যুগে মিশর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ফিলিস্তিনের প্রথম ও প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

৫. **হাদীসশাস্ত্রে অবদান :** রাসূল ﷺ থেকে তিনি সর্বমোট ১৮১ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ৬ খানা আর এককভাবে ইমাম বুখারী ২ খানা এবং মুসলিম ২ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** তিনি ৭২ বছর বয়সে ৩৪ হিজরিতে ফিলিস্তিনের রামাল্লা নামক শহরে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٥٢٥ أَبِىْ أُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكٰوةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا ذَا اَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৫২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা আল- বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা [তোমাদের প্রতি নির্ধারিত] পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর। [তোমাদের জন্য নির্ধারিত] মাসটির রোজা রাখ। তোমাদের সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের কর্মকর্তার [শাসকের] আনুগত্য কর। তা হলে তোমরা তোমাদের প্রভুর [তৈরি] বেহেশতে প্রবেশ করবে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَمْسَكُمْ -শব্দটির মধ্যে নবী করীম ﷺ কেন خَمْس-কে তাদের প্রতি اضافت করেছেন : আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিনিময় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং جَنَّةَ رَبِّكُمْ মধ্যকার বর্ণনায় مَحَلْ -কে ثَوَابْ- -এর মোকাবিলায় দেখানোর জন্য রাসূল ﷺ خَمْس শব্দকে তদ্রূপ صَوْم শব্দকে বান্দার প্রতি اِضَافَتْ করেছেন। যেমনি কুরআনে এসেছে– اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَكُمْ الخ

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, خَمْس শব্দ এবং তার পরবর্তী صَوْم শব্দকে বান্দার প্রতি اِضَافَتْ করার দ্বারা এ কথার অবগতি প্রদান উদ্দেশ্য যে, বিশেষ ধরনের এ সকল আমল এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য, যা দ্বারা এ উম্মতকে অন্যান্য সকল উম্মত হতে বৈশিষ্ট্যবান করা হয়েছে। তা ছাড়া তাদেরকে সম্বোধনের দ্বারা এ সকল আমলের প্রতি আগ্রহী করা ও এ কথার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা যে, তোমাদের এ সকল আমলের বিনিময়ে তোমাদেরকে যা প্রদান করা হবে তা তোমাদের আমল হতে অনেক উত্তম, আর তা হলো জান্নাত।

اَلْمُرَادُ بِذَا اَمْرِكُمْ -এর মর্মার্থ : ذَا اَمْرِكُمْ বলতে এখানে শাসনকর্তা বা উপরস্থ পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরস্থকে মান্য না করলে দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয়। নাগরিক জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা নেমে আসে

اِطَاعَةُ الْاَمِيْرِ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ শাসকের আনুগত্য শর্তহীন নয় : শাসক বা উপরস্থ পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তার আদেশ শুধু ততটুকুই মানতে হবে যতটুকু পর্যন্ত তারা শরিয়ত বিরোধী আদেশ না করেন। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না।

وَعَنْ ٥٢٦ عَمْرِوْ بْنِ شُعَيْبٍ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَكَذَا رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ـ

৫২৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের জন্য আদেশ কর, যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌঁছে। আর যখন তারা দশ বছর বয়সে পৌঁছে তখন [নামাজের জন্য] তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের শোবার স্থান পৃথক করে দাও। -[আবূ দাউদ, শরহে সুন্নাহেও [তার লেখক] এরূপ বর্ণনা করেছেন, আর মাসাবীহ গ্রন্থে, হাদীসটি হযরত সাবুরাহ ইবনে মা'বাদ হতে বর্ণিত আছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ -এর মর্মার্থ : মহানবী ﷺ বলেছেন যে, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হবে তখন তাদেরকে নামাজ পড়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে। শিশুকে প্রথম হতেই নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এবং নামাজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরূপ করতে আদেশ প্রদান করেছেন। যাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে নামাজে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারে এবং নামাজ যাতে কাজা না হয়। এমনিভাবে ১০ বছর বয়স হলে নামাজ না পড়লে প্রহার করতে আদেশ প্রদান করেছেন। কেননা, এর থেকে বেশি বয়স হলে তখন আর অভিভাবকের কথা শুনবে না, এরূপভাবে রোজা রাখার ক্ষেত্রে বালক-বালিকাদের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تَفْرِيْقِ الْمَضَاجِعِ :

বিছানা পৃথক করার ব্যাপারে আলিমগণের মতামত : বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে বালক-বালিকাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দিতে হবে। এটাই এ হাদীসের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। যেন তাদের মাঝে অবাঞ্ছনীয় কোনো ঘটনা সংঘটিত হতে না পারে। কেননা, দশ বছর বয়সে কামস্পৃহা সৃষ্টি হয়ে যায়।

কিছু সংখ্যক বলেন, দু'জন পুরুষ বা দু'জন মহিলা একই বিছানায় শুতে পারে, যদি তাদের সতর ঢাকা থাকে এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার আশঙ্কা না থাকে। তবে অসতর্ক অবস্থায় দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারী একই বিছানায় শোয়া হারাম। এমনকি মা-ছেলেকেও এক বিছানায় থাকতে দেওয়া নিষেধ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে আমাদের ইমামগণ বলেছেন যে, ভাই-বোনদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দেওয়া ওয়াজিব।

اَبِيْهِ ও جَدِّهٖ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত আমর ইবনে শোয়াইবের বংশ পরিচয় হলো- عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ এখানে اَبِيْهِ -এর "ه" সর্বনামটির مَرْجِعْ হচ্ছে- عَمْرو অর্থাৎ আমর তার পিতা শোয়াইব হতে বর্ণনা করেছেন। আর جَدِّهٖ -এর মধ্যকার "ه" সর্বনামটির مَرْجِعْ সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে-

১. এর مَرْجِعْ হলো عَمْرو এ ক্ষেত্রে جَدْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مُحَمَّدْ কেননা, মুহাম্মদ আমরের দাদা। এ অবস্থায় হাদীসটি মুরসাল হবে। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর সাথে মুহাম্মদের সাক্ষাৎ হয়নি।

২. অথবা جَدِّهِ এর "ه" সর্বনামটির مَرْجِعْ হলো- شُعَيْبْ তখন جَدّ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে (رض) عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو কেননা, (رض) عَبْدُ اللّٰه শোয়াইবের দাদা। এমতাবস্থায় হাদীসটি مُنْقَطِعْ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। যেহেতু শোয়াইব তাঁর দাদা আব্দুল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেননি।

وَعَنْ ٥٢٧ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫২৭. অনুবাদ : হযরত বুরইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- আমাদের ও তাদের [মুনাফিকদের] মধ্যে যে ওয়াদা রয়েছে তা হলো নামাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করবে সে [আপাত দৃষ্টিতে] কাফির হয়ে যাবে।-[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلٰوةُ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি হলো নামাজ। যে নামাজ পড়ে না সে মুসলিম রূপে গণ্য নয়, আর যে নামাজ পড়ে সে মুসলমান হিসেবে গণ্য। এ কারণেই মহানবী ﷺ ইসলাম গ্রহণকারী লোকদের নিকট হতে যথা সময়ে নামাজ পড়ার এবং তা ত্যাগ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন। লোকদের সাথে যে চুক্তি হতো, তার ভিত্তি ছিল নামাজ। কেননা, নামাজ পড়াই হলো ঈমানের ও মুসলমান হওয়ার বাস্তব প্রমাণ। এটাই হলো ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ-এর অর্থ : মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ নামাজ পড়ার জন্য অসংখ্যবার তাকিদ দিয়েছেন। ইসলামে অন্যান্য পালনীয় কর্মসমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একে মহানবী ﷺ মু'মিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্যকারী নিদর্শন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। বস্তুত কেউ যদি অহঙ্কারবশত বা অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে নামাজ পরিত্যাগ করে তা হলে তার কাফির হয়ে যাওয়া অবধারিত। এরূপ ব্যক্তি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য কেউ যদি নিছক গাফিলতির কারণে নামাজ না পড়ে, কিন্তু তা ফরজ হিসেবে মেনে নেয় তবে এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে ঈমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ফিকহবিদদের মতে সে কাফির নয়; বরং ফাসিক। তার তওবা করে নামাজ পড়া আবশ্যক। যদি সে তওবা না করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও অন্যান্য ইমামদের মতে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না ; বরং অন্যান্য শাস্তি দেওয়া হবে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারীর পরিচয় :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম বুরায়দা, পিতার নাম- হোসাইব, গোত্র আসলাম ; আসলাম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছেন বিধায় তাকে আসলামী বলা হয়।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** বদর যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩. **জিহাদে যোগদান :** বদর ব্যতীত প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

৪. **ইন্তেকাল :** ইয়াযীদ ইবনে মোয়াবিয়ার শাসনামলে হিজরি ৬২ সনে 'মারব' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। সাহাবী ও তাবেয়ীদের একদল তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫২৮ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ عَالَجْتُ اِمْرَأَةً فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنِّىْ اَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ اَنْ اَمُسَّهَا فَاَنَا هٰذَا فَاقْضِ فِىْ مَا شِئْتَ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللّٰهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا وَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَاَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا فَدَعَاهُ وَتَلَا عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَانَبِيَّ اللّٰهِ هٰذَا لَهٗ خَاصَّةً فَقَالَ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মদীনার অপর প্রান্তে একজন মহিলার সাথে শৃংগার [যৌনকেলী] করেছি এবং আমি তার সাথে সঙ্গম ব্যতীত সবকিছু করেছি। আর এই যে, আমি স্বয়ং উপস্থিত রয়েছি। অতএব আপনি আমার উপর যা ইচ্ছা হুকুম জারি করুন। এমন সময় হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমার অপরাধকে ঢেকে রাখতেন যদি তুমি নিজেকে নিজে ঢেকে রাখতে। রাবী আব্দুল্লাহ বলেন, নবী করীম ﷺ তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। অতঃপর লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং চলে গেল। অতঃপর নবী করীম ﷺ তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডাকালেন এবং এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذَّاكِرِيْنَ অর্থাৎ, দিনের দু' অংশ এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যসমূহ পাপসমূহকে দূর করে দেয়। এটা হলো উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। [সূরা হূদ, আয়াত : ১১৪] এ সময় উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর নবী ! এ বিধান কি তার জন্য সুনির্দিষ্ট? তিনি বললেন, (না;) বরং সমস্ত মানুষের জন্যই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ লোকটির পাপের কথা শ্রবণ করেও তার কোনো জবাব দেননি। কেননা আল্লাহ তা'আলা লোকটির শাস্তির ব্যাপারে কিছু সহজ হুকুম অবতীর্ণ করতে পারেন। আর এ অপেক্ষায়ই রাসূল ﷺ কোনো রায় প্রদান করেননি।

فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ -এর ব্যাখ্যা : রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ব্যতিরেকেই লোকটি মহানবী ﷺ-এর দরবার ত্যাগ করল। এটা তার বেআদবির প্রতি ইঙ্গিত করে না। কেননা, রাসূল ﷺ তার কথার কোনো জবাব দেননি। তাই সে ধারণা করেছিল যে, নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে কোনো আদেশ অবতীর্ণ হবে এবং রাসূল ﷺ পরবর্তীতে তাকে তা অবহিত করবেন। ক্ষমার হুকুম আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর শাস্তির হুকুম আসলে তা সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। কাজেই قَامَ দ্বারা পালিয়ে যাওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কেননা, দোষ স্বীকার করার পর পালিয়ে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : বাক্যে رَجُلٌ দ্বারা হযরত ওমর (রা.) অথবা হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٥٢٩ أَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَاَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَجَعَلَ ذٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ قَالَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلٰوةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَهَافَتُ هٰذَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী করীম ﷺ শীতকালে বের হলেন, তখন গাছের পাতা ঝরছিল। [তখন] তিনি গাছ হতে দু'টি ডাল জোরে ঝাঁকালেন, বর্ণনাকারী বলেন, এতে সে পাতা [আরো বেশি] ঝরতে লাগল। হযরত আবূ যার (রা.) বলেন, তখন রাসূল ﷺ আমাকে ডাকলেন যে, হে আবূ যার ! আমি জবাবে বললাম– হে আল্লাহর রাসূল ! আমি উপস্থিত আছি। রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই মুসলমান বান্দা যখন নামাজ পড়ে, আর এর দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তখন তার [শরীর] থেকে তার পাপসমূহ ঝরে যায়, যেভাবে এই গাছ হতে পাতাসমূহ ঝরছে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : মুসলমান বান্দার নামাজ বা যে কোনো ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হওয়া চাই। ইবাদতে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক। লোক দেখানো বা লোক শুনানো ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এরূপ ইবাদতের ফলে সে আল্লাহর নিকট কিছুই আশা করতে পারে না।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম– জুনুদুব, কারো মতে জানদাব, আবার কারো মতে আল-জেনদাবে যার অর্থ–পাখি; কিছু সংখ্যকের মতে বুরাইদা ইবনে জুনদুব। তবে প্রথম মতটি সর্বাধিক গৃহীত। উপনাম– আবূ যার। এ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। উপাধি শায়খুল ইসলাম, পিতার নাম– জুনাদা। গিফার গোত্রের লোক হিসেবে তাঁকে আল-গিফারী বলা হয়।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি মক্কাতেই রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুনাযির আহসান গিলানী (র.) তাঁকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম বলে উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ্যে শাহাদাতাইন উচ্চারণ করার কারণে তিনি অনেক নির্যাতন ভোগ করেন।

৩. **রাসূলের সাহচর্য :** তিনি সর্বক্ষণ রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত থাকতেন। মদীনায় রাসূল ﷺ তাকে মুনযির ইবনে আমরের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়ে দেন। 'যাতুররিকা' (ذَاتُ الرِّقَاعِ) যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল ﷺ তাকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করে যান।

৪. **ইসলামের খেদমত :** তিনি একজন পণ্ডিত, সাধক, কোমলমতি ও শরীফ লোক ছিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করাকে হারাম মনে করতেন।

৫. **হাদীস শাস্ত্রে অবদান :** তিনি রাসূল ﷺ হতে সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৩১টি বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে, আর বুখারী ২টি ও মুসলিম ১৭টি হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন

৬. **ইন্তেকাল :** তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফত আমলে ৩২ হিজরি ৮ই জিলহজ মদীনা হতে ৪০ মাইল দূরে রাবাযা পল্লীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান।

وَعَنْ ٥٣٠ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৩০. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি দু' রাকাত নামাজ পড়ে, আর তাতে ভুল করে না, [এর দ্বারা] আল্লাহ তা'আলা তার অতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا -এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে لَا يَسْهُوْ শব্দটি لَا يَغْفُلُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অমনোযোগিতার সাথে নামাজ পড়ে না। কেননা, অমনোযোগিতা ভুলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই لَا يَسْهُوْ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত এখানে সবব উল্লেখ করে মুসাব্বাব উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তার নাম যায়েদ, উপনাম আবূ তালহা, আবার কারো মতে, আবূ আব্দুর রহমান বা আবূ যুর'আ। পিতার নাম খালেদ। তার বংশের জনৈক ব্যক্তির নামের দিকে নিসবত করে তাঁকে জুহানীও বলা হয়।

২. **তাঁর বংশ পরিচয় :** তিনি হলেন জুহাইনা ইবনে যায়দ ইবনে লাইছ ইবনে সূউদ ইবনে আসলুম ইবনে আলহাফ ইবনে কুজাআ-এর বংশোদ্ভূত।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** সম্ভবত মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. **ইলমে হাদীসের খেদমত :** তিনি সর্বমোট ৮১ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় গ্রন্থে ছয়খানা হাদীস বর্ণনা করেন।

৫. **ইন্তেকাল :** তিনি ৭৮ হিজরিতে ৮৫ বৎসর বয়সে কূফা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে মদীনা বা মিসরে ইন্তেকাল করেন

وَعَنْ ٥٣١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ ذَكَرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَ بُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهٗ نُوْرًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَاُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫৩১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন নবী করীম ﷺ নামাজের প্রসঙ্গে আলোচনা করে বললেন, যে নামাজের প্রতি যত্নশীল হয় তার জন্য নামাজ কিয়ামতের দিন আলোকবর্তিকা, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে নামাজের প্রতি যত্নশীল হয় না, নামাজ তার জন্য আলোকবর্তিকা, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে না; বরং কিয়ামতের দিন সে কারূন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে উঠবে। –[আহমদ, দারেমী, বায়হাকী–শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا -এর মর্মার্থ : নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকার অর্থ হলো, নামাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে একাগ্রতার সাথে নামাজ পড়া এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ সঠিক সময়েও যথা নিয়মে আদায় করা, কোনো অবস্থাতেই এক ওয়াক্ত নামাজও যেন কাজা না হয়। যে ব্যক্তি এরূপভাবে নামাজের সংরক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন এ নামাজ

তার জন্য নূর হয়ে দেখা দেবে। কিয়ামতের দিন অন্ধকারের মধ্যে সে এই আলো দ্বারা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর হিসাব-নিকাশের সময় এটা তার জন্য অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দণ্ডায়মান হবে। এর ফলেই সে জাহান্নাম হতে মুক্ত হয়ে জান্নাতে যেতে সক্ষম হবে।

وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ الخ -এর মর্মার্থ : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকে না, তার নিকৃষ্ট পরিণতির কথা বুঝাবার জন্য মহানবী ﷺ পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট চারজন ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন। সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এ চার ব্যক্তির সঙ্গী হবে। এ চার ব্যক্তির সাথে হাশরে উঠার কারণ সম্পর্কে ইমাম ইবনুল কাযি্যম বলেছেন– (১) হয় সে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বেশি মাশগুল হওয়ার কারণে নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকবে না তাই সে এর পরিণতিতে কারূনের সাথে থাকবে। (২) অথবা দেশ-শাসনের রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামাজে গাফিলতি করবে ফলে তার পরিণতি ফিরাউনের সাথে হবে। (৩) কিংবা ওজারতী ও সরকারি-বেসরকারি চাকরিজনিত ব্যস্ততার কারণে সে যথাযথভাবে নামাজের প্রতি যত্নশীল থাকবে না; তাই তার পরিণতি হবে হামানের সাথে। (৪) অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে ব্যস্ততার দরুন নামাজে গাফিলতি করলে সে উবাই ইবনে খলফের সাহচর্যে শাস্তিভোগ করবে।

উল্লেখ্য যে, এ সব নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সহচর হওয়ার অর্থ হলো, যদি কোনো মুসলমান পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ বলে বিশ্বাস না করে, তবে তাকে এ সব কুলাঙ্গারদের সাথে চিরকালই জাহান্নামে থাকতে হবে। তবে যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ হিসেবে বিশ্বাস করেও আদায় করতে ত্রুটি করে, তবে সে এদের সাথে জাহান্নামী হবে, আজাবের পরিমাণ সমান হবে না এবং সে তার অপরাধ পরিমাণ আজাব ভোগ করার পর মুক্তি পাবে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ اُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ - কারূন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের পরিচিতি :

কারূন : হযরত মূসা (আ.)-এর যুগের এক খোদাদ্রোহী ধনকুবেরের নাম কারূন। সে ছিল অগাধ সম্পদের মালিক। হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তো ঈমান আনেইনি, উপরন্তু বনী ইসরাঈলীদের প্রতি ছিল চরম অত্যাচারী। আল্লাহর পথে সে এক কপর্দকও ব্যয় করত না। অবশেষে মহান আল্লাহর নির্দেশে তার সমস্ত অর্থ সম্পদসহ ভূমি তাকে গ্রাস করে নেয়।

ফিরাউন : খোদায়ীর দাবিদার মিসরের শাসনকর্তা। তার প্রকৃত নাম ছিল ওলীদ ইবনে মুসআব। সে অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক ছিল। যারা তার বশ্যতা স্বীকার করত না তাদেরকে নির্মম অত্যাচারে নিঃশেষ করে দিত। সে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করে। এমনকি বনী ইসরাঈলীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। অবশেষে সে তার দলবলসহ নীল দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়।

হামান : এ ব্যক্তি ফিরাউনের রাজসভার সদস্য ছিল। সকল কু-কর্মের উপদেষ্টা ছিল সে। প্রধানমন্ত্রী থাকার সুবাধে সে বনী ইসরাঈলীদের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালায়। ফিরাউনের সাথে সেও নীল দরিয়ায় ডুবে মারা যায়।

উবাই ইবনে খালফ : উবাই ইবনে খালফ ছিল জাহিলিয়া যুগের অন্যতম ব্যবসায়ী ধনশালী ব্যক্তি। সে ছিল ইসলামের জঘন্যতম শত্রু। অনেক নওমুসলিমকে সে কষ্ট দিয়েছে। অবশেষে উহুদের যুদ্ধে এই পাপিষ্ঠ নিহত হয়।

وَعَنْ ٥٣٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ (رحـ) قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَايَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهٗ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلٰوةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩২. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ দীনি আমলসমূহের মধ্যে নামাজ ব্যতীত কোনো কর্ম পরিত্যাগ করাকেই কুফরি মনে করতেন না। [তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারী পরিচিতি : তিনি ছিলেন বিখ্যাত তাবেয়ী। নাম– আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক। উপনাম– আবূ আব্দুর রহমান বা আবূ মুহাম্মদ। তিনি হযরত ওমর, ওসমান, আলী, আয়েশা (রা.)-সহ প্রমুখ সাহাবীদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। কাতাদা, আইয়ূব সাখতিয়ানী ও মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১০৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٥٣٣ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ أَوْصَانِى خَلِيْلِى اَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৩৩. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু [অর্থাৎ, রাসূলে কারীম ﷺ] আমাকে উপদেশ প্রদান করেছেন যে, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে বা পুড়িয়ে ফেলে। (২) স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করো না, যে ইচ্ছা করে তা ত্যাগ করে তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা উঠে যায়। (৩) এবং শরাব পান করে না। কেননা তা সমস্ত মন্দ কাজের চাবিকাঠি স্বরূপ। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আর সেগুলো হলো, প্রথমত আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করা, এমনকি এ জন্য যদি নিহত হতে হয় বা ছিন্নভিন্ন হতে হয় কিংবা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে হয় তারপরও শিরকে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বস্তুত কোনো ঈমানদার ব্যক্তি কখনো এরূপ করতে পারে না। ঈমান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হলেও সে আকুণ্ঠ চিত্তে তা দিতে প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু শিরকে লিপ্ত হবে না। দ্বিতীয়ত স্বেচ্ছায় কখনো ফরজ নামাজ পরিত্যাগ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে নামাজ পরিত্যাগ করে সে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হতে বের হয়ে যায়; বরং এরূপ ব্যক্তিকে অন্য হাদীসে কাফিরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তৃতীয়ত মদ পান না করা। কেননা, এটা হলো সকল পাপ কর্মের চাবিকাঠি। যেহেতু মদপানের ফলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তাই সে যে কোনো রকমের পাপ ও মন্দ কর্ম করতে কুণ্ঠিত হয় না।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَةِ وَالْحَدِيْثِ আয়াত ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কাউকে যদি আল্লাহর সাথে শরিক করার জন্য জবরদস্তি করা হয়, এমনকি জীবন-হুমকির সম্মুখীনও হয় তবু শিরক করা যাবে না। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে, إِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ যার দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্তরে ঈমান ঠিক রেখে যবরদস্তির মুখে শিরক করার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

দ্বন্দ্বের সমাধান : উল্লিখিত হাদীস ও আয়াতের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান হলো, আয়াতের হুকুম رُخْصَتْ বা ঐচ্ছিকতার উপর প্রয়োগ হবে, আর হাদীসের হুকুম عَزِيْمَةٌ তথা দৃঢ়তার উপর প্রয়োগ করা হবে।

অথবা হাদীসের বক্তব্য শুধু আবুদ দারদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, আর কুরআনের বক্তব্য সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ-এর মর্মার্থ : নামাজ বর্জনকারীর উপর হতে নিরাপত্তা অপসৃত হওয়ার অর্থ হলো, ইসলাম গ্রহণের পর ব্যক্তি তার জীবন ও সম্পদ সম্পর্কে দীনের দিক হতে নিরাপত্তা লাভ করে থাকে। আর নামাজ যেহেতু ইসলামের প্রধান খুঁটি এবং ঈমানের বহিঃপ্রকাশ সেহেতু যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, তার ও কা ফিরদের মধ্যে ব্যবধান থাকে না। ফলে ইসলাম প্রদত্ত নিরাপত্তা হতে সে বঞ্চিত হয়ে পড়বে। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজকে ঈমান ও কুফরির মধ্যে ব্যবধান রচনাকারী প্রাচীর রূপে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্যই ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ বর্জনকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উদ্ধৃত বাক্যটি একটি সতর্কতামূলক বাক্য। এটা দ্বারা নামাজ বর্জনকারীকে এ শর্তে সতর্ক করা হয়েছে যে, দীনের প্রধান স্তম্ভ নামাজ বর্জনের কারণে সে কুফরির সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়বে। রাসূলের সাথে তার সম্পর্কও এর মাধ্যমে নির্ণিত হবে। নামাজ না পড়ার কারণে তাকে রাসূলের শাফায়াত হতেও বঞ্চিত থাকতে হবে।

حُكْمُ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى الْاِكْرَاهِ জোর-জবরদস্তি অবস্থায়-কুফরি বাক্য উচ্চারণের বিধান : কোনো মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে আন্তরিকতার সাথে কাউকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করা বৈধ নয়। এমনকি শিরক না করার কারণে

যদি তাকে হত্যাও করা হয়। ঈমান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে হলেও তা করবে, কিন্তু ঈমান পরিত্যাগ করবে না। তবে অনুরূপ অবস্থায় পড়ে যদি কেউ কেবলমাত্র মুখে কুফরি বা শিরকি কথা উচ্চারণ করে, কিন্তু অন্তরে দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে মানে, তবে এতে সে কাফির বা মুশরিক হয়ে যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (اَلنَّحْلُ : ١٠٦)

উক্ত আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে, প্রথমত ঈমানের পরে যারা কুফরি গ্রহণ করে এবং তাতেই তাদের অন্তর সন্তুষ্ট থাকে আল্লাহর গজব তাদের উপরই পড়বে এবং তাদের জন্য মহা শাস্তি নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত যাদেরকে কুফরি বা শিরক করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাদের হৃদয়-মন যদি ঈমানে পরিপূর্ণ, নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত থাকে তবে তারা আল্লাহর গজব ও আজাব হতে নিষ্কৃতি পাবে।

فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ -এর মর্মার্থ : যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার, মানুষ হত্যা, চুরি করার অপরাধ ও শাস্তি মদ্য পানের তুলনায় জঘন্য, তবু আলোচ্য হাদীসে মদ্য পানকে সকল মন্দ কর্মের চাবিকাঠি ও উৎস বলার কারণ হলো, মদ্য পান এমন এক স্বভাব, যা ব্যক্তিকে ব্যভিচার, হত্যা, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি সামাজিক ও নৈতিক অপরাধে উদ্বুদ্ধ করে। মদ্যপায়ী মদের নেশায় মত্ত হয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় বা কাউকে হত্যা করে, সে বিবেকের দংশন অনুভব করে না। তার মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান না থাকার কারণে পর সম্পদ আত্মসাৎ ও ধ্বংস করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি লজ্জা-শরম মানববিকতা বলতে তার কাছে কিছুই থাকে না ; বরং তার মধ্যে শুরু হয় চরম পাশবিকতা, কদর্যতা, নিষ্ঠুরতা ও ক্রুর হিংস্রতা। এ সকল কারণেই মহানবী ﷺ মদ্যপানকে সকল মন্দ কর্মের চাবিকাঠি রূপে চিহ্নিত করেছেন।

মদ পান করা সকল মন্দ কর্মের চাবিকাঠি এ কথা আজ পাশ্চাত্যের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একে নানা ব্যাধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। খাদ্য বিজ্ঞান তাকে খাদ্যবস্তু বলে স্বীকার করে না। আর সমাজ বিজ্ঞানও একে অপরাধের উৎস বলেছে। এসব কারণে পাশ্চাত্য জাতিসমূহও একে পরিত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তা পরিহারের আন্দোলনে নেমেছে। বস্তুত বিবেক বর্জিত সকল কর্মের মূল উৎস এই মদের মধ্যেই নিহিত। তাই একে পরিহার করা সকলের উচিত।

بَابُ الْمَوَاقِيْتِ
পরিচ্ছেদ : নামাজের সময়

اَلْمَوَاقِيْتُ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো– اَلْمِيْقَاتُ। শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ [নির্দিষ্ট সময়।] এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনেও দেখা যায়। যেমন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ الخ আল্লাহ তা'আলা নামাজ ফরজ করার সাথে সাথে তা আদায় করার জন্য সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا ۔ (: ١٠٣) এ আয়াতটি দ্বারা যেমনিভাবে নামাজের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় তেমনিভাবে এটাও প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নামাজের জন্য নির্ধারিত সময়ও রয়েছে। আর এ সব নির্ধারিত সময়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ও মহানবী ﷺ-এর হাদীসে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

١. اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۔ (هُوْد : ١١٤)

٢. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۔ (اَلْاِسْرَاءُ : ٧٨)

٣. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَاءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ ۔ (طٰهٰ : ١٣٠)

٤. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۔ (اَلرُّوْمُ : ١٨ ۔ ١٧)

এমনিভাবে রাসূল ﷺ-এর কথা ও কাজের মাধ্যমেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন– ١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ الخ ۔

আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসসমূহে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٣٤ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ الْاَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَمْسِكْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ۔ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ে, আর শেষ হয় যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয় তথা যে পর্যন্ত না আসরের সময় উপস্থিত হয়। আসরের সময় [তার পর হতে শুরু করে] সূর্য হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত থাকে। মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত [সূর্যাস্ত হতে আরম্ভ করে] শফক অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত থাকে। আর ইশার নামাজের ওয়াক্ত [এরপর হতে শুরু করে] মধ্য রাত পর্যন্ত থাকে এবং ফজরের নামাজের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ করে সূর্যোদয় শুরু না হওয়া পর্যন্ত থাকে। যখন সূর্যোদয় শুরু হয় তখন নামাজ হতে বিরত থাক। কেননা, সূর্য উদিত হয় শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اَوْقَاتِ الصَّلٰوَاتِ :

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

وَقْتُ الظُّهْرِ জোহরের নামাজের ওয়াক্ত : জোহরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর হতেই জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ তবে এর শেষ সময় নিয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَالصَّاحِبَيْنِ وَ زُفَرَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, এরপর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়।

তাঁদের দলিল :

১. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) مَرْفُوْعًا وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ مَالَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ـ

২. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اَنَّهٗ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ صَلٰوةَ الظُّهْرِ اِلٰى اَنْ يَّكُوْنَ ظِلُّ اَحَدِكُمْ مِثْلَهٗ ـ

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ (رح) : ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক مِثَالٌ হওয়ার পর চার রাকাত নামাজের সময় হচ্ছে– وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ তাতে জোহর ও আসর উভয়টি পড়া যায়। এরপর জোহরের সময় শেষ হয়ে যায়।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের শেষ সময় থাকে। এটাই ইমাম আবূ হানীফার প্রসিদ্ধ মত। তার দলিল–

১. عَنْ عَلِىِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَادَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ـ (اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

২. عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ اِلٰى ذِى الْحُلَيْفَةِ ـ (مُصَنَّفُ اِبْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ)

৩. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهٗ اَبْرِدْ حَتّٰى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ـ (بُخَارِىْ)

শেষোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একগুণ ছায়ার পরও জোহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ প্রমুখ ইমামগণের দলিলের জবাব নিম্নরূপ–

১. তাদের প্রথম হাদীসের وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهٖ অংশটি اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ-এর উপর عَطْفٌ হয়েছে। তাই এ হাদীসে প্রথম সময়ের কথা বলা হয়েছে।

২. সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় হযরত ওমর (রা.)-এর কথা গ্রহণীয় হতে পারে না।

৩. অথবা বলা যায় যে, اِنَّ الْمِثْلَ الْاَوَّلَ اَفْضَلُ الْوَقْتِ

৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন–

اِنَّ الْمِثْلَ الْاَوَّلَ مَخْصُوْصٌ لِلظُّهْرِ وَالْمِثْلَ الثَّالِثَ مَخْصُوْصٌ لِلْعَصْرِ وَالْمِثْلَ الثَّانِىَ مُشْتَرَكٌ لَهُمَا وَلٰكِنْ لَا يَجُوْزُ جَمْعُهُمَا فِيْهِ ـ

وَقْتُ الْعَصْرِ **আসরের নামাজের ওয়াক্ত :**

আসরের সময় নিয়ে ইমামদের মতভেদের বিবরণ : ইমামদের মতভেদের ভিত্তিতে জোহরের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর আসর নামাজের সময় শুরু হয়। তবে এর শেষে সময়সীমা নিয়ে ফিকহবিদগণের মতভেদ নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

১. ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, মালিক, আহমাদ (র.) তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের অভিমত হলো, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

তাঁদের দলিল—

١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

٢. وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

২. সুফিয়ান ছাওরী, হাসান ইবনে যিয়াদ, আবূ ছওর (র.) প্রমুখের অভিমত হলো, সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

তাঁদের দলিল— ١. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَاٰخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ .

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ . (رَوَاهُمَا الطَّحَاوِىُّ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাদের হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, যে সব হাদীসে আসরের ওয়াক্ত সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে বলা হয়েছে তা দ্বারা আসরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। ওয়াক্তের শেষ সীমা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়।

وَقْتُ الْمَغْرِبِ **মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত :** ইসলামি ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে সূর্যাস্তের পরপরই মাগরিব নামাজের সময় আরম্ভ হয়। তবে তার সর্বশেষ সময় নিয়ে ইমামগণের নিম্নোক্ত মতামত রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মতে মাগরিবের নামাজের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। সূর্যাস্ত হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জন করে আযান একামত সম্পন্ন করে পাঁচ রাকাত নামাজ আদায় করতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। তাদের দলিল– ١. اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِى الْيَوْمَيْنِ فِىْ وَقْتٍ وَاحِدٍ .

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.), আহমদ (র.) প্রমুখের মতে شَفَقْ অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। দলিল–

١. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . (مُسْلِمْ)

٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاٰخِرُهُ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ . (مُسْلِمْ)

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَاِنَّهُ وَقْتٌ اِلٰى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ . (مُسْلِمْ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) প্রমুখ ইমামগণ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামত সংক্রান্ত যে হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেছেন এর জবাব নিম্নরূপ—

১. হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে গেছে।

২. অথবা মাগরিবের নামাজ সব সময় প্রথম ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব এ কথা বুঝানোর জন্য উভয় দিন প্রথম ওয়াক্তে নামাজ পড়িয়েছেন।

৩. অথবা, এর দ্বারা মাকরূহ হতে বেঁচে থাকার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, মাগরিবের নামাজ শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত দেরি করে পড়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ।

৪. অথবা উত্তর এই যে, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা মাগরিবের ওয়াক্তের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা প্রমাণিত হয় সনদের দিক দিয়ে তা বিশুদ্ধতম।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ مَعْنَى الشَّفَقِ **শফকের অর্থ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** شَفَقٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– লালিমা, তবে এর পারিভাষিক অর্থ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন–

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সূর্য ডোবার পর পশ্চিমাকাশে যে লালিমা দৃশ্যমান হয়, তা অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে যে সাদা রেখা প্রকাশিত হয় তাই شَفَقٌ। যেমন– মহানবী ﷺ-এর বাণী– اٰخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ اِذَا اسْوَدَّ الْاُفُقُ

২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদসহ প্রমুখ ইমামের মতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে যে লালিমা দেখা যায় তাকে শফক বলা হয়, তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন যে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلشَّفَقُ اَلْحُمْرَةُ

وَقْتُ الْعِشَاءِ **ইশার নামাজের ওয়াক্ত :** শফক অস্তমিত হওয়ার পর হতেই ইশার নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে ইশার শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ لَا يَفُوْتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ ـ

٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَاٰخِرُهٗ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ـ

مَذْهَبُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَاِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম ইবনুল মোবারক, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক (র.) প্রমুখ ওলামার মতে রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। তাঁদের দলিল হলো–

١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ قَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ـ (مُسْلِمٌ)

مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর মতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। তাঁর দলিল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস–

١. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ـ (اَبُوْ دَاوٗدَ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : যে সব হাদীসে অর্ধরাত্রি বা রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে জমহুরের বক্তব্য হলো এই যে, রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হলো মোস্তাহাব ওয়াক্ত, অর্ধরাত পর্যন্ত জায়েজ ওয়াক্ত, আর তার পর হতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত হলো মাকরূহ ওয়াক্ত।

وَقْتُ الْفَجْرِ : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, সুবহে সাদেক হতে ফজরের নামাজের সময় শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এর সময় বিদ্যমান থাকে। আর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এর সময় শেষ হয়ে যায়। তাঁদের দলিল–

١. اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَ وَقْتُ صَلٰوةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ (اَبُوْ دَاوٗدَ)

٣. قَوْلُهٗ تَعَالٰى " فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ " ـ

فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ-এর **মর্মার্থ :** রাসূল ﷺ-এর বাণী– فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ-এর অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয় শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে সূর্যোদয় হয়। এ কথার ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. শয়তান দু'দলে বিভক্ত। একদল রাতে, আর অপর দল দিনে দায়িত্ব পালন করে, আর সূর্যোদয়ের সময়টা উভয় দলের মিলনকাল। তাই বলা হয়েছে– فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ

২. কেউ কেউ বলেন, মানুষকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে শয়তান এ সময় দু'দল অনুসারী প্রেরণ করে। হাদীসে শিং বলে শয়তানের এ দু'দল অনুসারীকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেন, শিং দ্বারা কাল্পনিক শিং বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জন্তু যেরূপ শিং দ্বারা অপরকে খোঁচা মারে, অভিশপ্ত শয়তানও তদ্রূপ তার শিংরূপী প্রতারণা দ্বারা সত্যের মোকাবেলায় ব্যর্থ চেষ্টা চালায়।

৪. আবার কেউ কেউ বলেন, শয়তান সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় থাকে। উদয়কালে সূর্য পূজারীরা যখন সূর্যের পূজায় লিপ্ত হয়, শয়তান তখন সূর্যের সামনে এসে দাঁড়ায় আর আল্লাহর নামে দেওয়া সেজদা নিজের নামে গ্রহণ করে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ মুহাম্মদ, আবূ আব্দুর রহমান ও আবূ নুসাইর, পিতার নাম আমর ইবনুল আস, মাতার নাম রাইতা বিনতুল মুনাব্বিহ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আস বা পাপী।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা আমর ইবনুল আসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ৫ম অথবা ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার সাথে তাঁর বয়সের ব্যবধান ছিল এক বর্ণনা মতে ১২/ ১৩ বছর আর অপর এক বর্ণনা মতে ২০ বছর। এ প্রসঙ্গে صَاحِبُ الْاِكْمَالِ বলেন–

اَسْلَمَ قَبْلَ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوْهُ اَكْبَرُ مِنْهُ بِثَلَاثِ عَشَرَةَ سَنَةً وَقِيْلَ بِاثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً ـ وَفِى الْاِصَابَةِ : وَجَزَمَ اِبْنُ يُوْنُسَ بِاَنَّ بَيْنَهُمَا عِشْرِيْنَ سَنَةً ـ

৩. **হিজরত :** পিতা-পুত্র উভয়ের মক্কা বিজয়ের পূর্বে মদীনায় হিজরত করেন।

৪. **জিহাদে যোগদান :** রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ যুদ্ধে পিতা আমর ইবনুল আস তাঁর নেতৃত্বের ঝাণ্ডা পুত্র আব্দুল্লাহর হাতে তুলে দেন। আব্দুল্লাহ পিতার চাপে সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুআবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। এ কারণে তিনি আমরণ অনুশোচনায় জর্জরিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'হায়! আমি যদি এই যুদ্ধের দশ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করতাম।'

৫. **তাঁর জ্ঞানগত অবস্থান :** তিনি অসাধারণ জ্ঞান ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি হাফেজে কুরআন ছিলেন। আরবি ও হিব্রু ভাষায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাওরাত ও ইনজীলের উপরও দক্ষতা ছিল। হাদীস লেখার ব্যাপারে রাসূল ﷺ একমাত্র তাকেই অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে صَاحِبُ الْاِكْمَالِ বলেন,

اِسْتَأْذَنَ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ اَنْ يَكْتُبَ حَدِيْثَهُ فَاَذِنَ لَهُ

৬. **হাদীসশাস্ত্রে অবদান :** তিনি সর্বমোট ৭০০ হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ১৭টি মুত্তাফাকুন আলাইহি, ৮টি ইমাম বুখারী আর ২০টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন। তিনি صَادِقَةٌ নামক একটি হাদীসগ্রন্থও লেখেন।

৭. **চরিত্র :** তিনি অত্যন্ত পরহেজগার, আবেদ ছিলেন। ইতিহাসে তিনি প্রার্থনাকারী ও তওবাকারী হিসেবে ভূষিত ছিলেন। অধিক রোজা রাখতেন। রাতের আঁধারে বাতি নিভিয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন, এতে তার দু'চোখের পাতা নষ্ট হয়ে যায়।

ইন্তেকাল : বিশুদ্ধ মতে তিনি ৩৫ হিজরিতে ৭২ বছর বয়সে মিশরের 'ফুসতাত' নগরীতে ইন্তেকাল করেন। মারওয়ান ইবনে হাকাম ও ইবনে যোবায়েরের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধার কারণে তাঁকে গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর নিজ আবাস স্থলেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٥٣٥ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِى الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ

৫৩৫. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, জবাবে তিনি বললেন, তুমি আমাদের সাথে এ দু'দিন নামাজ পড়ো, [প্রথম দিন] যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন বেলালকে আদেশ করলেন, বেলাল আযান দিলেন। অতঃপর তিনি আদেশ করলেন এবং বেলাল জোহরের একামত দিলেন। এরপর তিনি হুকুম করলেন, আর বেলাল আসরের একামত দিলেন, অথচ তখনও সূর্য উঁচুতে অবস্থিত এবং পরিষ্কার সাদা। অতঃপর তিনি হুকুম করলেন, ফলে বেলাল মাগরিবের একামত দিলেন, যখন সূর্য অস্তমিত হলো। তারপর তিনি আদেশ করলেন, বেলাল (রা.) ইশার

الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِىْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُّبْرِدَ بِهَا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلٰوتِكُمْ بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

নামাজের একামত বললেন, যখন শফক অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশেষে নির্দেশ দিলেন হযরত বেলাল ফজরের একামত দিলেন যখন সুবহে সাদেক উদিত হলো। অতঃপর যখন দ্বিতীয় দিন হলো রাসূলে কারীম ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে হুকুম করলেন যে, জোহরকে শীতল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে, তিনি বিলম্ব করলেন এবং শীতল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। আর আসরের নামাজ পড়লেন সূর্য যখন উঁচুতে অবস্থিত তিনি পূর্ব দিনের তুলনায় তাতে বিলম্ব করলেন এবং মাগরিব পড়লেন শফক অদৃশ্য হওয়ার কিছু পূর্বে আর ইশার নামাজ পড়লেন রাত এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। এরপর ফজর পড়লেন এবং তাতে ফর্সা করে পড়লেন, অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, নামাজের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? জবাবে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের নামাজের সময় হলো তোমরা যা [এ দুই দিনে] দেখলে তার মধ্যবর্তী সময়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দুই দিনে দুই সময়ে নামাজ পড়ে নামাজের ওয়াক্তের সূচনা ও শেষ সীমা জানিয়ে দিয়েছেন, তবে উক্ত হাদীসে যে সময় সীমা বর্ণনা করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ সীমা নয়। কেননা, অধিকাংশ ওলামা এ কথার উপর একমত যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের সময় বিদ্যমান থাকে, যেমন নবী করীম (স.) বলেছেন–

(١) مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ.

(٢) مَنْ اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ -

এর অর্থ হলো, যদি কেউ যথা সময়ে আসরের নামাজ পড়তে না পারে তা হলে সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেলেও আসরের নামাজ পড়তে হবে এর ফলে সে ঐ দিনের আসরের নামাজ পড়েছে বলে পরিগণিত হবে।

এমনিভাবে যদি কেউ রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরও ইশার নামাজ আদায় না করে থাকে তা হলে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পড়ার তার সুযোগ রয়েছে। আর তখন পড়লেও তা মাকরূহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– لَا يَفُوْتُ وَقْتُ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ

اَلْاِشْكَالُ সমস্যা : আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত বেলাল (রা.)-কে নবী করীম ﷺ শুধু জোহরের আযান দিতে আদেশ দিয়েছেন, আর অবশিষ্ট চার ওয়াক্তের জন্য একামত বলার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্যই আযান, একামত ও জামাত অপরিহার্য।

دَفْعُ الْاِشْكَالِ সমস্যার সমাধান : উল্লিখিত প্রশ্নের জবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ আযান, একামত ও জামাত সহকারে আদায় করা হয়েছে, কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে শুধু যোহরের আজানের কথা উল্লেখ করেছেন।

اَلْاِشْكَالُ সমস্যা : হাদীসে উল্লিখিত اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রশ্নকারী ছিল একজন, এতদসত্ত্বেও রাসূল ﷺ صَلٰوتَكُمْ -এর মধ্যে বহুবচনের যমীর এবং رَاَيْتُمْ ক্রিয়া পদটি বহুবচন হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করলেন?

دَفْعُ الْاِشْكَالِ সমস্যার সমাধান : যদিও প্রশ্নকারী ছিলেন একজন, কিন্তু রাসূলে কারীম ﷺ كُمْ যমীরটি এবং رَاَيْتُمْ ক্রিয়া পদটি বহুবচন ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, উপরে বর্ণিত নামাজের ওয়াক্তসমূহ প্রশ্নকারী ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র উম্মতে মুহাম্মদী এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৫৩৬ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّنِىْ جِبْرَئِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৩৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বায়তুল্লাহর পাশে হযরত জিবরাঈল (আ.) দু'বার আমার ইমামতি করেছেন। একবার তিনি আমাকে সাথে নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছিল। আর তা ছিল মাধ্যাকাশ থেকে জুতার ফিতার প্রস্থের সমান। আর যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার অনুরূপ হয়েছিল, তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। আর যখন রোজাদার ইফতার করে [অর্থাৎ সূর্যাস্ত হয়] তখন তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। আর যখন শফ্‌ক তথা লালিমা বিদূরিত হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ইশার নামাজ আদায় করেন। যখন রোজাদারের উপর পানাহার হারাম হয়ে যায়, তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর যখন আগামীকাল হলো, তখন তিনি আমাকে সাথে নিয়ে ঠিক সে সময় জোহর নামাজ আদায় করেন, যখন যে কোনো বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে গেল। যখন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ পরিমাণ হলো, তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসর নামাজ পড়লেন। যখন রোজাদার ইফতার করল, তখন তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে ইশার নামাজ পড়লেন। আর উষা উদ্ভাসিত হওয়ার পর তিনি আমাকে নিয়ে ফজর নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! এটা হচ্ছে তোমার পূর্ববর্তী নবীদের নামাজের সময়। এ দু'ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাজের সময়। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ -এর অর্থ : মহানবী ﷺ -এর বাণী– اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ বাক্যে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যথা–

প্রথমত মহানবী ﷺ সৃষ্টির সেরা হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) কিভাবে তাঁর ইমামতি করলেন?

জবাব :

১. أَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ বাক্যের অর্থ হলো হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে ইমাম বানিয়েছে, তিনি ইমামতি করেছেন এটা নয়; অর্থাৎ তিনি মুক্তাদী হয়ে লোকমা দিয়ে নামাজের শিক্ষা দিয়েছেন, আর নামাজের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তো রাসূল ﷺ পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন।

২. অথবা, এর অর্থ হলো হযরত জিব্রাঈল আমার ইমামতি করেছেন, এর দ্বারা তার আংশিক মর্যাদা প্রমাণিত হয়, কিন্তু সামগ্রিক মর্যাদা প্রমাণিত হয় না।

৩. অথবা কমযোগ্য ব্যক্তির পিছনেও অধিকযোগ্য ব্যক্তির একতেদা শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। যেহেতু রাসূল ﷺ ও প্রয়োজনে হযরত আবূ বকর ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর একতেদা করেছেন।

দ্বিতীয়ত : দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, হযরত জিব্রাঈল (আ.) হলেন غَيْرُ مُكَلَّفٌ আর রাসূল ﷺ হলেন مُكَلَّفٌ তাই হযরত জিব্রাঈল (আ.) কিভাবে রাসূলের ইমামিত করেছেন। রাসূল হলেন ফরজ আদায়কারী, আর হযরত জিব্রাঈল হলেন নফল আদায়কারী।

জবাব :

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য غَيْرُ مُكَلَّفٌ হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিব্রাঈল (আ.) ইমামতি করেছেন। এটা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে হয়েছে।

২. অথবা সে নির্ধারিত সময়ের জন্য হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে নামাজের مُكَلَّفٌ বানানো হয়েছে। আর সে মুহূর্তে তাঁর উপরও সালাত ফরজ ছিল।

৩. অথবা বলা যায় হযরত জিব্রাঈল (আ.) مُكَلَّفٌ ছিলেন না বিধায় তাঁর সালাত ছিল নফল। আর সালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার আগে রাসূল ﷺ-এর উপরও সালাত ফরজ ছিল না; বরং নফল ছিল। তাই مُتَنَفِّلٌ -এর নামাজই হয়েছে।

৪. অথবা বলা যেতে পারে যে, أَمَّنِىْ جِبْرَئِيْلُ -এর অর্থ হলো, جَعَلَنِىْ إِمَامًا হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন, অর্থাৎ রাসূল ﷺ ইমাম হয়েছেন আর হযরত জিব্রাঈল (আ.) মুক্তাদি। এতে হাদীসের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

৫. অথবা তখন নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা জায়েজ ছিল। আর এ কারণেই রাসূল ﷺ ফরজ আদায়কারী হওয়া সত্ত্বেও নফল আদায়কারী হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর পিছনে একতেদা করেছেন।

وَاقِعَةُ مَبْدَأِ الصَّلٰوةِ নামাজের সূত্রপাতের ঘটনা : হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর উক্তি هٰذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ 'এটাই পূর্বেকার নবীগণের (নামাজের) সময়' দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্বেকার নবীগণের উপরও নামাজ ফরজ ছিল। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে হযরত আয়েশা (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মর্মার্থ নিম্নরূপ–

১. হযরত আদম (আ.)-এর তওবা ফজরের সময় কবুল হয়েছে। তখন তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়েছেন। ঐ সময় হতেই ফজর নামাজের প্রচলন শুরু হয়।

২. হযরত ইসমাঈল (আ.) কুরবানি হতে দুম্বার বিনিময়ে রক্ষা পেয়েছেন জোহরের সময়, তখন তিনি চার রাকাত নামাজ পড়েছেন। এটাই 'জোহর নামাজ' নামে পরিচিত হয়।

৩. হযরত উযায়ের (আ.) এক বৎসর মৃত অবস্থায় থাকার পর একদিন আসরের সময় পুনর্জীবন লাভ করেন। তখন তিনি চার রাকাত নামাজ পড়েন। এটাই আসরের নামাজ নামে অভিহিত হয়।

৪. হযরত দাউদ (আ.)-এর অপরাধ ক্ষমা হয়েছে মাগরিবের সময়। তখন তিনি চার রাকাতের নিয়ত করে নামাজ আরম্ভ করেন; কিন্তু অধিক পরিমাণে কান্না-কাটি করার ফলে তৃতীয় রাকাতে বসে পড়েন। বাকি এক রাকাত আদায় করা আর সম্ভব হয়নি। সে হতে মাগরিব তিন রাকাত।

৫. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বপ্রথম এশার নামাজ পড়েন। এ হিসেবে প্রত্যেক নামাজের রাকাত ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

هٰذَا دَفْعُ التَّعَارُضِ দ্বন্দ্ব নিরসন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সীমা বর্ণনা করার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ এটা আপনার পূর্বেকার নবীদের (নামাজের) সময়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ফরজ ছিল। অথচ হযরত মু'আয (রা.) বর্ণিত হাদীস–

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِعْتَمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ . (اَبُوْ دَاوُدَ وَ بَيْهَقِىْ)

অনুরূপভাবে উপরোল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং উভয় পক্ষের হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

১. উক্ত দ্বন্দ্ব সমাধানে হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, এখানে وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ বলে ওয়াক্তের সম্পর্ক সমষ্টিগতভাবে নবীদের সাথে করা হয়েছে, পৃথক পৃথকভাবে নয়। আর নামাজ তো সমষ্টিগতভাবেই নবীদের জন্য ছিল, যদিও ইশার নামাজ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নির্দিষ্ট।

২. কাজি বায়যাবী (র.) বলেন, ইশার নামাজ পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ ছিল না, নফল হিসাবে ছিল। সুতরাং নবীগণ নফল হিসেবে এ নামাজ আদায় করতেন। এখন ফরজ হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য নির্দিষ্ট। তাই নফল হিসেবে হলেও পূর্ববর্তী নবীদের উপর এশার নামাজ ধার্য ছিল, তাই পূর্ববর্তী নবীদের দিকে ওয়াক্তের নিসবত করে وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ বলা হয়েছে। মোল্লা আলী কারী (র.) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন– وَالْحَقُّ اَنَّ الْحَقَّ مِنَ الْقَاضِىْ

৩. অথবা এখানে هٰذَا -এর দ্বারা اَوْقَاتُ خَمْسَةٍ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি; বরং এর পূর্বে উল্লিখিত اِسْفَارٌ -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী নবীদেরও নামাজের সময় ছিল।

هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ -এর মর্মার্থ : هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ -এই উভয় ওয়াক্ত দ্বারা হাদীসে উল্লিখিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রথম ও শেষ সীমার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাদীসে উল্লিখিত প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের উভয় সীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগ, মধ্যভাগ বা শেষ ভাগে নামাজ আদায় করা যেতে পারে।

قَدْرُ الشِّرَاكِ এর মর্মার্থ : জুতার ফিতাকে অরবিতে اَلشِّرَاكُ বলা হয়। আর قَدْر -এর অর্থ হলো পরিমাণ। অতএব قَدْرُ الشِّرَاكِ অর্থ– জুতার ফিতার প্রস্থের পরিমাণ। আরবরা ক্ষুদ্র বা সামান্য পরিমাণ বস্তু বুঝাতে জুতার ফিতার সাথে তুলনা করে থাকে। অর্থাৎ সূর্য খুব সামান্য পরিমাণ পশ্চিম দিকে ঢললেই জোহরের নামাজের সময় আরম্ভ হয়।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি** : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম-আবুল আব্বাস, মাতার নাম লুবাবাহ বিনতুল হারেছ। তাঁর উপনাম উম্মুল ফজল। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনার বোন। হযরত ইবনে আব্বাস রাসূল ﷺ-এর চাচাত ভাই ছিলেন।

২. **বংশ পরিক্রমা** : তাঁর বংশ ধারা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ।

৩. **তাঁর জন্ম** : রাসূলে কারীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের ৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দশম বছর তিনি মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন রাসূলে কারীম ﷺ ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স হয়েছিল ১৩ বৎসর। কারও মতে পনেরো, আবার কারো মতে দশ বৎসর। তবে ১৩ বৎসর হওয়াটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

৪. **তাঁর ফজিলত** : উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার উত্তম ব্যক্তি তিনি এবং বিজ্ঞ আলিম। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ফিকহশাস্ত্র, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জ্ঞান দানের জন্য দোয়া করেছেন। তিনি বিজ্ঞ মুফাসসিরে কুরআন ছিলেন। দু'বার হযরত জিবরাঈল আমীনকে দেখেছেন। নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করেন– اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ ! ইবনে আব্বাসকে হিকমত দান করুন।

৫. **ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান** : হযরত ইমাম আহমদ বলেন, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য হতে সর্বমোট ছয়জন ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) একজন। তিনি (১৬৬০) এক হাজার ৬ শত ৬০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে তাঁর বর্ণিত ৯৫ খানা হাদীস এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ১২০ খানা এবং ইমাম মুসলিম ৪৯ খানা স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও অসংখ্য তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬. **তাঁর দৈহিক আকৃতি** : তিনি অত্যন্ত সুন্দর এবং লম্বা ছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর মুখমণ্ডল অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। স্বাস্থ্য মোটা ছিল। তিনি তাঁর দাঁড়িতে মেহেন্দির রং ব্যবহার করতেন।

৭. **ইন্তেকাল** : তিনি জীবনের শেষ দিকে চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ [আটষট্টি] হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর খেলাফতকালে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তাঁর নামাজে জানাযায় ইমামাত করেন। জানাযা শেষে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ তাঁর শানে বলেন, وَاللّٰهِ مَاتَ الْيَوْمَ حِبْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ এবং তথায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫৩৭ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رض) اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اَنَّ جِبْرَئِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اَمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩৭. **অনুবাদ** : প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত। একদিন [তাবেয়ী] হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) আসরের নামাজ কিছু বিলম্বে আদায় করলেন। তখন হযরত উরওয়া (র.) তাঁকে বলেন, জেনে রাখুন, হযরত জিবরাঈল (আ.) একদা অবতরণ করলেন এবং রাসূল ﷺ-কে নিয়ে ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন। তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলছ তা ভালোভাবে জেনে নাও। তখন উরওয়া (র.) বললেন, আমি বাশীর ইবনে আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, একদিন হযরত জিবরাঈল (আ.) অবতরণ করলেন। অতঃপর তিনি আমার ইমামতি করলেন, আমি তাঁর সাথে [জোহর] নামাজ পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [আসর] পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [মাগরিব] পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [ইশা] পড়লাম। অতঃপর তাঁর সাথে [ফজর] নামাজ পড়লাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি স্বীয় অঙ্গুলিতে হিসাব করে দেখান। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উরওয়া (রা.)-কে اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ বলার কারণ :

১. হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) হযরত উরওয়া (র.)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামতির কথা শুনে প্রথমে অভাবিত ও অকল্পনীয় মনে করেছিলেন, আর এ জন্যই তিনি উরওয়াকে লক্ষ্য করে বলেছেন اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ অর্থাৎ, তুমি বুঝে-শুনে বল। মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালিক (র.)-এর একটি হাদীসে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় যে, তাতে রয়েছে– اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهٖ يَا عُرْوَةُ اَوَ اَنَّ جِبْرَائِيْلَ هُوَ الَّذِىْ اَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَقْتَ الصَّلٰوةِ

২. অথবা, উরওয়া (র.) বিনা সনদে রাসূল ﷺ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করার কারণেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) আপত্তি করেছেন এবং সনদসহ হাদীস বর্ণনার প্রতি তাকিদ দিয়েছেন।

৩. অথবা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) তাঁর উক্ত কথার মাধ্যমে সনদবিহীনভাবে হাদীস বর্ণনা না করার জন্য সকলের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যাতে কোনো প্রকার জাল হাদীস রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

سَبَبُ إِمَامَةِ جِبْرَائِيلَ জিবরাঈল (আ.)-এর ইমামতি করার কারণ : রাসূলে কারীম ﷺ أَشْرَفُ الْمَخْلُوْقَاتِ তথা সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) কর্তৃক মহানবী ﷺ-এর ইমামিত করার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে হাদীস বিশারদগণ নিম্নরূপ মতামত পোষণ করেন—

১. أَمَّنِىْ -এর অর্থ হচ্ছে- جَعَلَنِىْ إِمَامًا وَكَانَ جِبْرَئِيْلُ مُقْتَدِيًا অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন, আর তিনি মুক্তাদি হয়েছেন এবং পেছন থেকে আমাকে নামাজের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন, مَفْضُوْل -এর ইমামতি বৈধ, এর بَيَانُ جَوَازٍ -এর জন্য জিবরাঈল (আ.) রাসূলের ইমামতি করেন।

৩. অথবা বলা যায়, প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) ইমামতি করেছেন। সে সময় নামাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) অধিক অবহিত ছিলেন। (فَلَا تَلْزَمُ إِمَامَةَ الْمَفْضُوْلِ عَلَى الْأَفْضَلِ)

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি : নাম ইবনে শিহাব যুহরী [আসল নাম- মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব]। ইমাম যুহরী (র.) ইলমে হাদীসের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস ছিল তাঁর অপূর্ব স্মৃতিশক্তির বাস্তব প্রমাণ।

আমর ইবনে দীনার তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম যুহরী অপেক্ষা হাদীসের অধিক প্রামাণ্য ও অকাট্য দলিলরূপে আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি। আল্লাহ্ তাঁকে অপরিসীম স্মরণশক্তি দান করেছেন।

ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা মতে, তিনি মাত্র আশি রাতে কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের আদেশক্রমে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলের হাদীস সংগ্রহ ও গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন, ইমাম যুহরী না হলে মদীনা হতে হাদীসসমূহ নিঃসন্দেহে বিলীন হয়ে যেতো।

তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, সাহল ইবনে সা'দ, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ, আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ, রবীয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে বিপুল সংখ্যক তাবেয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের মোট সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার দুইশত। হিজরি ১২৪ সনে সিরিয়ার 'সাগ্‌বাদা' নামক গ্রামে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

تَعْرِيْفُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)-এর পরিচিতি :

১. **জন্ম :** হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের ৫০ বৎসর পর ৬১ হিজরি সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আব্দুল আযীয, আর মাতা ছিলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের পৌত্রি।

২. **খিলাফত :** তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে পুনরায় خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ -এর উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ জন্য তাঁর শাসন আমলকে খেলাফতের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ৯৯ হিজরিতে উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর যুগে অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ী জীবিত ছিলেন।

৩. **ইসলামের খেদমত :** অভিজ্ঞদের মতে তিনি প্রথম মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংগ্রহ ও তা কিতাবাকারে বিন্যস্ত করেন। তাঁকে প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি হাদীসশাস্ত্রে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখতেন।

৪. **ইন্তেকাল :** হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) ১০১ হিজরি সালে ৩৯ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইসলামের এই প্রথম মুজাদ্দিদ মাত্র আড়াই বৎসর সংস্কারমূলক কাজ করার সুযোগ পান। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেন।

৫৩৮. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهٖ اَنَّ اَهَمَّ اُمُوْرِكُمْ عِنْدِى الصَّلٰوةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِيْنَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ ثُمَّ كَتَبَ اَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ اَنْ كَانَ الْفَيْئُ ذِرَاعًا اِلٰى اَنْ يَّكُوْنَ ظِلُّ اَحَدِكُمْ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَقَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةً قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ وَالصُّبْحَ وَالنُّجُوْمُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ- رَوَاهُ مَالِكٌ

৫৩৮. **অনুবাদ :** হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [আঞ্চলিক] প্রশাসকদের কাছে লিখেছেন–আমার কাছে নামাজই আপনাদের সমস্ত কার্যের মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি তা সংরক্ষণ করেছে এবং তা যথাযথভাবে রক্ষা করেছে, সে তার দীনকে রক্ষা করেছে। যে ব্যক্তি নামাজকে বিনষ্ট করেছে সে তা ছাড়া অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আরো অনিষ্টকারী। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) লিখেছেন, তোমাদের নিজেদের ছায়া এক হাত হতে তা তোমাদের সমান হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামাজ পড়বে। আর আসর পড়বে যখন সূর্য উচ্চে ও পরিষ্কার-সাদা থাকে এবং যাতে একজন অশ্বারোহী সূর্য অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দু' বা তিন ফরসখ পথ অতিক্রম করতে পারে। আর মাগরিব পড়বে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরক্ষণেই। ইশা আদায় করবে সূর্যের লালিমা দূর হওয়ার সময় হতে রাতের এক- তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এর পূর্বে নিদ্রা যায় তার চক্ষু নিদ্রা না যাক। যে ব্যক্তি এর পূর্বে নিদ্রা যায় তার চক্ষু নিদ্রা না যাক। যে ব্যক্তি এর পূর্বে নিদ্রা যায় তার চক্ষু নিদ্রা না যাক। আর ফজরের নামাজ আদায় করবে যখন নক্ষত্রসমূহ উজ্জ্বল ও ঘন থাকে। [মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَرِيْقَةُ مَعْرِفَةِ فَيْئِ الزَّوَالِ **ফাইয়ে যাওয়াল বা আসলী ছায়া চেনার উপায় :** আসলী ছায়া চেনার উপায় হচ্ছে, কোনো এক স্থানকে সমান করে তার উপর একটি বৃত্ত আঁকতে হবে এবং বৃত্তের কেন্দ্রে একটি কাঠি দণ্ডায়মান করাতে হবে। বৃত্তের কেন্দ্র হতে বৃত্ত-রেখা পর্যন্ত দূরত্বকে ঐ কাঠির মাপে সমান চার ভাগে বিভক্ত করতে হবে। তাতে মোট তিনটি বিন্দু হবে। প্রতিটি বিন্দুকে ব্যাসার্ধ ধরে বৃত্তের মধ্যে আরও তিনটি অস্পষ্ট বৃত্ত আঁকতে হবে। এখন খাড়া করা কাঠিটি মূল বৃত্তের ব্যাসার্ধের চারভাগের একভাগ। অর্থাৎ ভূমির সমান করে ঐ কাঠি দিয়ে বৃত্তরেখার দিকে পরিমাপ করলে চার কাঠি হবে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলতে আরম্ভ করলে কাঠির ছায়াও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এক সময় বৃত্ত-রেখা অতিক্রম করে বের হয়ে যাবে। এটা অতিক্রম করার বিন্দু। দুপুরে কাঠির ছায়া এ রেখার উপরে আসলে যে ছায়াটুকু পাওয়া যাবে তা-ই প্রকৃত ছায়া। এরপর উক্ত ছায়া যখন বৃদ্ধি হয়, তখন তাকে زَوَالٌ বলে এবং তখন হতেই জোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। প্রকৃত ছায়া স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে কোনো কোনো সময় আসলী ছায়া পরিদৃষ্ট হয় না।

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِى النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ :

ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ : ইশার নামাজ পড়ার পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِمْ **হযরত ওমর ইবনুল** খাত্তাব, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.), ইমাম মালিক, আতা, মুজাহিদ, তাউস (র.) প্রমুখের মতে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ

তাঁদের দলিল— (١) عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا (اَىْ اَلْعِشَاءُ)

দ্বিতীয়ত হযরত ওমর (রা.) ইশার পূর্বে শয়নকারীর জন্য বদ দোয়া করেছেন, যেমনি তিনি বলেছেন—

فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهٗ .

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَعَلِيٍّ وَاَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) : ইমাম আবূ হানীফা, আলী এবং আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর মতে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া জায়েজ। তাঁদের প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ—

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِعْتَمَّ بِالْعِشَاءِ حَتّٰى نَادَاهُ عُمَرُ (رضـ) نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ .

এতে দেখা যায় যে ইশার পূর্বে মহিলারা ও বালকেরা ঘুমিয়েছিল। এতে রাসূল ﷺ কোনো রকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَاَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ

এ হাদীস দ্বারাও বুঝা যায় যে, ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়ার কারণে রাসূল ﷺ কোনো রকম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের হাদীসের জবাব : (১) ঐ সব হাদীসে নিদ্রা দ্বারা এরূপ নিদ্রা উদ্দেশ্য, যা এশার নামাজ ছুটে যাওয়ার কারণ হয়। (২) অথবা ঐ নিদ্রা উদ্দেশ্য, যা মোস্তাহাব ওয়াক্তের ফজিলত ছুটে যাওয়ার কারণ হয়। (৩) অথবা এর দ্বারা ঐ নিদ্রা উদ্দেশ্য, যা জামাতে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

এ কারণে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যদি কেউ নিদ্রা যাওয়ার পর পুনরায় জাগ্রত হওয়ার ব্যাপারে আস্থাবান হয় অথবা জাগ্রত করে দেওয়ার মতো অন্য কোনো লোক থাকে তবে ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া মাকরূহ নয়; অন্যথা মাকরূহ।

بَحْثُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ইশার পর কথা বলা প্রসঙ্গে : ইমামগণ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইশার নামাজের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ। কেননা, হাদীসে এসেছে اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا- কথাবার্তা বলা মাকরূহ হওয়ার কারণগুলো হলো—

১. ইশার পরে কথাবার্তা বললে শেষ রাতে গভীর ঘুমে নিমগ্ন হয়ে যায়, ফলে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
২. এটা অনেক সময় ফজর নামাজ কাজা হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
৩. ফজরের জামাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।
৪. ফজর নামাজ উত্তম ওয়াক্তে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।
৫. ঘুম নষ্ট হলে যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগি ও অন্যান্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়। তবে এমন সব কথাবার্তা বলা মাকরূহ নয়, যা দীনের ক্ষেত্রে উপকারী।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ রাবী পরিচিতি :

১. **নাম ও উপনাম :** তাঁর আসল নাম ওমর, উপনাম আবূ হাফস। তাঁর গুণবাচক নাম ফারূক। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব আর মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশেম ইবনে মুগীরা।

২. **বংশধারা :** তাঁর বংশ ধারা হলো, ওমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল ওজ্জা ইবনে রিয়াহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রাযাহ ইবনে আদী। তাঁর ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষের ক্রমধারা রাসূল ﷺ-এর সাথে গিয়ে মিলে যায়। তিনি কুরায়েশ বংশোদ্ভূত।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি নবুয়তের ৬ষ্ঠ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। কারও কারও মতে, তিনি নববী পঞ্চম সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে চল্লিশজন পুরুষ এবং এগারোজন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারও মতে, তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনই পুরুষের সংখ্যা ৪০ [চল্লিশ] পূর্ণ হয়। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং তখন তিনি 'ফারূক' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি আরকাম ইবনে আবুল আরকামের ঘর, যা সাফা পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত তথায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনাও রয়েছে।

৪. **খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ** : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি ১৩ হিজরি ২৩ ই জামাদিউল উখরা মোতাবেক ২৪ শে আগস্ট ৬৩৪ সালে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আল্লাহর দরবারে নিম্নের দোয়া পাঠ করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ غَلِيْظٌ فَلَيِّنِّىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ بَخِيْلٌ فَسَخِّنِىْ

অর্থ–হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী কর। হে আল্লাহ! আমি কঠোর আমাকে কোমল কর। হে আল্লাহ! আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল কর।

২৩ হিজরির ২৩ ই জিলহজ মোতাবেক ৩ রা নভেম্বর ৬৪৪ সালে তাঁর খেলাফত সমাপ্ত হয়। তাঁর খেলাফতের সর্বমোট বয়স হলো ১০ বৎসর ৬ মাস। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তবে তাঁকে সর্বপ্রথম আমীরুল মু'মিনীন বলা হতো। কেননা হযরত আবূ বকর (রা.)-কে খলিফাতুর রাসূল ﷺ বলা হতো।

৫. **রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সাথে সম্পর্ক** : তিনি স্বীয় কন্যা হযরত হাফসা (রা.)-কে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন। আবার নিজে হিজরি ১৭ সালে হযরত আলীর মেয়ে উম্মে কুলসূম বিনতে ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চল্লিশ হাজার দেরহাম মোহরানা দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

৬. **তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা** : তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৯ [পাঁচশত উনচল্লিশ] টি। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম উভয়েই তাঁদের সহীহ কিতাবে ১০টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর বুখারী এককভাবে ৯টি ও মুসলিম এককভাবে ১৫ টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৭. **তাঁর খেলাফতকালে উল্লেখযোগ্য তথ্য** : তাঁর শাসনামলে সর্বাধিক রাজ্য জয় হয়। বিজিত রাজ্যের সংখ্যা হলো ১০৩৬ তিনি সর্বপ্রথম হিজরি সন প্রবর্তন করেন। তারাবীহের নামাজ জামাতে পড়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৮. **শাহাদাত লাভ** : হিজরি ২৩ সালে ২৪ শে জিলহজ বুধবার দিন তিনি মসজিদে নববীতে ইশার নামাজে ইমামত করতে দাঁড়ালে মুগীরা ইবনে শো'বার ক্রীতদাস আবূ লু'লু বিষাক্ত একখানা তরবারি হাতে নিয়ে নামাজের কাতার ফাঁক করে তাঁর নিকট পৌঁছে যায় এবং তাঁর মাথায় ও নাভীতে মারাত্মক আঘাত করে। অবশেষে তিনদিন পর ২৭শে জিলহজ্জ শনিবারে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯. **দাফন ও নামাজে জানাযা** : তাঁর শাহাদাতের পর হযরত সুহাইব (রা.) তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে তাঁকে তাঁর হুজরা এবং হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাম পার্শ্বে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٥٣٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّهْرَ فِى الصَّيْفِ ثَلٰثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৫৩৯. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গ্রীষ্মকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জোহরের নামাজের সময়ের পরিমাণ [তথা ছায়ার পরিমাণ] ছিল তিন হতে পাঁচ কদম পর্যন্ত এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদম পর্যন্ত। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْاَقْدَامِ **একদামের অর্থ** : اَقْدَامٌ শব্দটি قَدَمٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো– পা, এখানে এক কদম বলতে এক হাত দূরত্ব বুঝিয়ে থাকে। পাঁচ ও সাত কদম বলার দ্বারা গ্রীষ্ম ও শীতকালের আসলী ছায়ার ব্যবধান বুঝানো হয়েছে। কেননা, গ্রীষ্মকালের তুলনায় শীতকালে ছায়ার পরিমাণ দীর্ঘ হয়ে থাকে।

بَابُ تَعْجِيْلِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : ওয়াক্তের শুরুতে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়া

আল্লাহ্ তা'আলা নেক কাজসমূহ তরান্বিত করার জন্য আদেশ দিয়ে বলেন,

(١) وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ الخ ـ (٢) فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ الخ ـ (٣) وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ الخ ـ

আর হাদীসে এসেছে যে, عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ الخ

উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজই সকাল সকাল ওয়াক্তের শুরুতে পড়াই উত্তম। ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদসহ প্রমুখ ইমামগণ এ মতই পোষণ করেন।

তবে অপরাপর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাজ উষার আলো স্পষ্ট হওয়ার পর পড়া, গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ বিলম্বে পড়া, শীতকালে শীঘ্রই পড়া এবং আসরের নামাজ প্রত্যেক ঋতুতে কিছুটা গৌণে পড়া এবং ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ ইমামগণ এ মতই পোষণ করেন। তাঁরা জবাবে বলেন, যে সব আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া উত্তম তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ভাগ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٤٠ - عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ اَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهٖ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهٗ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا يُبَالِىْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সায়্যার ইবনে সালামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা [সাহাবী] আবূ বারযা আসলামীর নিকট গমন করলাম, অতঃপর আমার পিতা তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ নামাজ কিভাবে (কখন) পড়তেন? তিনি বললেন, জোহরের নামাজ, যাকে তোমরা প্রথম নামাজ বলো, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলতো তখনই পড়তেন। আর আসরের নামাজ পড়তেন যারপর আমাদের কেউ মদীনার অপর প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত অথচ সূর্য তখনও পরিষ্কার থাকতো, বর্ণনাকারী বলেন, মাগরিব সম্পর্কে কি বলেছেন তা আমি ভুলে গেছি। ইশার নামাজকে দেরি করে পড়তে ভালবাসতেন যাকে তোমরা আতামা বলে থাক। এর পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন। আর তিনি ফজরের নামাজ হতে অবসর হতেন। যখন কোনো লোক তাঁর পাশে বসা সঙ্গীকে চিনতে পারতো এবং তাতে ষাট হতে একশত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছাতেও দ্বিধাবোধ করতেন না এবং এর পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলাকে পছন্দ করতেন না। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ الْاَوْقَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ بِالتَّفْصِيْلِ مَعَ الْاَدِلَّةِ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রমাণসহ বর্ণনা :

اَلْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ জোহর নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : জোহরের নামাজ কখন পড়া মোস্তাহাব এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, ইসহাক, আহমদ, ইবনুল মুবারক সহ অধিকাংশ ইমামের মতে গ্রীষ্মকালে জোহরের নামাজ বিলম্বে আদায় করা উত্তম।

ইমাম নববী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন যে,

اَلصَّحِيْحُ اِسْتِحْبَابُ الْاِبْرَادِ وَبِهٖ قَالَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ وَجُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ لِكَثْرَةِ الْاَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ فِيْهِ

অর্থাৎ, সঠিক কথা হলো জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আদায় করা মোস্তাহাব। অধিকাংশ আলেম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীর বক্তব্য এটাই। কেননা, এ ব্যাপারে বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তবে শীতকালে জোহরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। হানাফীদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .(مُسْلِمٌ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اِنَّ هٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ - (مُسْلِمٌ)

(٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ : اَرَادَ مُؤَذِّنُ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدْ اَبْرِدْ وَانْتَظِرْ اِنْتَظِرْ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ حَتّٰى رَاَيْنَا التُّلُوْلَ . (مُسْلِمٌ)

(٤) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ - (اَلنَّسَائِىُّ وَفِى الْبُخَارِىِّ مَعْنَاهُ)

(٥) عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ .

যৌক্তিক প্রমাণ : দেরি করে নামাজ পড়লে জামাতে জনতার উপস্থিতি সংখ্যা বেশি হয়, যা অতিরিক্ত ছওয়াবের কারণ হয় তদুপরি اِنْتِظَارِ جَمَاعَةٍ বা জামাতের জন্য অপেক্ষমান থাকার কারণে অধিক ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি চারটি শর্ত বিদ্যমান থাকে– (১) গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়া, (২) প্রচণ্ড গরম পড়া, (৩) জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, (৪) দূরবর্তী এলাকা হতে লোকদের উপস্থিত হওয়া। তবে জোহরের নামাজ বিলম্ব করে আদায় করা মোস্তাহাব, নতুবা তাড়াতাড়ি পড়াই উত্তম।

মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। ইমাম আহমাদ হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–

হাদীস ভিত্তিক দলিল–

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ -

(٢) عَنْ عَلِىٍّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَا عَلِىُّ ثَلٰثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ . (تِرْمِذِىٌّ)

(٣) عَنْ اُمِّ فَرْوَةَ (رضـ) قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَلصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا . (تِرْمِذِىٌّ)

আকলী দলিল : প্রচণ্ড গরমের সময় নামাজ পড়লে কষ্ট বেশি হয়। আর বেশি কষ্ট অধিক ছওয়াবের কারণ, যেমন ইরশাদ হয়েছে– اَجْرُكُمْ عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكُمْ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে তাদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ :

ক. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জোহরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম সেগুলো اَبْرِدُوْا হাদীস দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে। কেননা, মুগীরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, اَحَادِيْثُ اِبْرَادٍ অর্থাৎ بِالصَّلٰوةِ

বিলম্ব করে পড়া সংক্রান্ত হাদীসই শেষ পর্যায়ের হাদীস। যেমন তিনি (মুগীরা) বলেছেন– كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ بِالْهَاجِرَةِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ উল্লেখ্য যে, বর্ণটি বিলম্বের সাথে ক্রমবিন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, اِبْرَادْ-এর হাদীস শেষ পর্যায়ের হাদীস। খাল্লাস বর্ণিত হাদীসও এ কথার সমর্থন করে। এতে রয়েছে যে, كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ الْاِبْرَادُ

খ. অথবা ঐ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাড়াতাড়ি পড়া বৈধ। তবে উত্তম হলো দেরি করে পড়া, যা অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

গ. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, ঐ সমস্ত হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত দ্বারা মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম সময় বুঝানো উদ্দেশ্য।

ঘ. তাড়াতাড়ি পড়া সংক্রান্ত হাদীসের বিধান আম, আর বিলম্ব সংক্রান্ত হাদীসের বিধান খাস। দ্বন্দ্বের সময় খাসেরই প্রাধান্য হয়ে থাকে।

আকলী দলিলের উত্তর : কষ্টের আধিক্য ছওয়াবের আধিক্যের কারণ হওয়া সাধারণ বিধান নয়। কেননা, কোনো কোনো সময় কষ্টের স্বল্পতাই অধিক ছওয়াবের কারণ হয়। যেমন– সফর অবস্থায় কসর নামাজ পড়া।

اَلْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ আসরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : আসরের উত্তম ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, ইসহাক, ইবনুল মুবারক (র.) প্রমুখ ওলামার মতে আসরের নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম। তাঁদের মতের স্বপক্ষীয় দলিলগুলো নিম্নরূপ—

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا - (مُسْلِمٌ)

(٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِيْ فَيَاْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اَرْبَعَةُ اَمْيَالٍ اَوْ نَحْوِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٣) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَنْحَرُ الْجَزُوْرَ فَنَقْسِمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ نَطْبَخُ فَنَاْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ . (مُسْلِمٌ)

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আসরের নামাজ সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া উত্তম। তাঁর মতের পক্ষে প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ—

(١) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ - (اَبُوْ دَاوُدَ - اَحْمَدُ)

(٢) عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ وَاَشَدَّ تَاْخِيْرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ . (عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيْ مُصَنَّفِهِ)

(٣) اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً . (اَبُوْ دَاوُدَ)

(٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَلِيٍّ (رضـ) فِي الْمَسْجِدِ الْاَعْظَمِ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْعَصْرِ فَقَالَ عَلِيٌّ (رضـ) اِجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ ذٰلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ (رضـ) هٰذَا الْكَلْبُ يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ فَقَالَ عَلِيٌّ (رضـ) فَصَلّٰى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ رَجَعْنَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ كُنَّا فِيْهِ جُلُوْسًا فَنَزَوْرُ الشَّمْسَ الْمَغِيْبَ . (حَاكِمٌ)

এ ছাড়া اَلْعَصْرُ শব্দের অর্থের মধ্যেও বিলম্ব করার অর্থ পাওয়া যায়, যেমন– আবূ কিলাবা হতে বর্ণিত আছে– اِنَّمَا سُمِّيَتْ لِتُعْصَرَ اَيْ لِتُؤَخَّرَ – কাসায়ী বলেন يُقَالُ جَاءَ فُلَانٌ عَصْرًا اَيْ بَطِيْئًا – কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন– اِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتُعْصَرَ وَتُؤَخَّرَ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ ইমামত্রয়ের উপস্থাপিত দলিলের উত্তর : তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে যে সব হাদীস পেশ করেছেন হানাফীদের পক্ষ হতে এর জবাব নিম্নরূপ—

প্রথম হাদীসের উত্তর : وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا এর উত্তরে ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কক্ষের দেওয়াল নিচে অবস্থিত ছিল. তাই সূর্যরশ্মি সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কক্ষের ভিতরেই থাকতো। সুতরাং এটা দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র নামাজ পড়া প্রমাণিত হয় না, বরং এটা দ্বারা বিলম্ব করে পড়া উত্তম বলে প্রমাণিত হয়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) ইমাম তাহাবী (র.) হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর : (ক) হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে যে, فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ রয়েছে এর ভিত্তি হলো অনুমানের উপর, আর এর উপর নির্ভর করে আসরের নামাজ শীঘ্র শীঘ্র পড়ার হুকুম দেওয়া যায় না। (খ) অথবা যেহেতু গ্রীষ্মকালে সময়ের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশস্ততা থাকে, সুতরাং হাদীসটির বিধান সে সময়ের জন্য নির্দিষ্ট। (গ) অথবা ذِهَابٌ اِلَى الْعَوَالِىْ-এর বিধান ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট, যারা দ্রুতগামী অথবা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুততার সাথে পথ অতিক্রম করে। এর দ্বারা শীঘ্র নামাজ পড়া বুঝা যায় না। (ঘ) অথবা রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ আদায় করে শিক্ষা ও অধিক ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত হতে লোক এসে জামাতে শরিক হতো এবং নামাজের পরে আবার তার নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতো। তাদের কষ্টের দিকে লক্ষ্য করে শীঘ্র শীঘ্র নামাজ পড়া হতো। সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র পড়া ছিল একটি বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত, নতুবা বিলম্ব করে পড়াই উত্তম।

তাহাবী শরীফের بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ -এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ে মসজিদে কুবায় গিয়েও লোকেরা দেখতো যে. সেখানে জামাত হচ্ছে। এটা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন এলাকায় সাহাবীরা আসরের নামাজ বিলম্ব করেই পড়তেন। আর এটাই হলো আসল বিধান। রাসূল ﷺ শুধুমাত্র বিশেষ কারণে কখনো শীঘ্র আদায় করতেন।

তৃতীয় হাদীসের উত্তর : তৃতীয় হাদীসে যে আসরের নামাজের পর উট জবাই করে বণ্টন ও রান্না করত সূর্যাস্তের পূর্বে খাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, এর উত্তরে হানাফীগণ বলেন যে, বিলম্বে আসরের নামাজ আদায় করেও এ কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। পাকা বাবুর্চির জন্য এটা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়। বিশেষ করে তারা গোশত অর্ধসিদ্ধ করে খেতো। ফলে বেশি সময়েরও প্রয়োজন হতো না। অতএব এ হাদীস দ্বারা শীঘ্র নামাজ আদায় করা প্রমাণিত হয় না।

اَلْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِلْمَغْرِبِ মাগরিবের মোস্তাহাব সময় : সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, মাগরিবের নামাজ সব ঋতুতে প্রথম ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব, তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেন—

(١) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ (ع) فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَ اِنَّهُ لَيُبْصِرُ نَبْلَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : لَا يَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ .(اَبُوْ دَاوُدَ)

(٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . (مُسْلِمٌ)

উল্লেখ্য যে, তারকারাজি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে মাগরিবের নামাজ পড়া মাকরূহ। আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন—

لَايَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتّٰى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

اَلْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ ইশার নামাজের মোস্তাহাব সময় : ইশার নামাজ কখন পড়া মোস্তাহাব এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সকল নামাজই তাড়াতাড়ি তথা ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া মোস্তাহাব। সুতরাং ইশার নামাজের হুকুমও তাই। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন,

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِيْرَةِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . (اَىْ فِىْ لَيْلَةٍ ثَالِثَةٍ مِنَ الشَّهْرِ اَبُوْدَاوُدَ)

ইবনুল হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তিন তারিখ রাতে শাফাক অদৃশ্য হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পরই চন্দ্র অস্তমিত হয়, সুতরাং এর দ্বারা ইশার নামাজ তাড়াতাড়ি আদায় করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَاَكْثَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আহমদ (র.) সহ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা মোস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন—

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ النَّبِيَّ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ خَرَجَ لَوْلَا اَنْ يَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِيْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ ـ (مُسْلِمٌ)

(٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

(٣) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَخِّرُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ ـ (مُسْلِمٌ)

(٤) وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ - (قَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

(٥) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُؤَخِّرُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ (مُسْلِمٌ)

(٦) وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تَزَالُ اُمَّتِيْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَاَخَّرُوا الْعِشَاءَ - (كَمَا فِى الْهِدَايَةِ)

আকলী দলিল : নামাজ যদি বিলম্ব করে আদায় করা হয় তা হলে নামাজি ব্যক্তি নফল আদায় করা, জামাতের অপেক্ষায় থাকা এবং জামাতে নামাজিদের উপস্থিতি বেশি হওয়ার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ছওয়াব লাভ করার সুযোগ পাবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ **প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর** : ইমাম শাফেয়ী (র.) নু'মান ইবনে বশীর বর্ণিত যে হাদীস يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, হানাফীদের পক্ষ হতে এর নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করা হয়েছে— (ক) মাসের দ্বিতীয় তারিখের চন্দ্র শাফাক অদৃশ্য হওয়ার নিকটবর্তী সময়েই অস্তমিত হয়, আর তৃতীয় তারিখের চন্দ্র আরো বিলম্বে অস্তমিত হয়। অতএব এ হাদীস দ্বারা বিলম্বে পড়াই প্রমাণিত হয়। (খ) ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসটি فِعْلِيْ [কার্যসূচক] আর হানাফীদের উপস্থাপিত হাদীস قَوْلِيْ (কথাসূচক) ; দ্বন্দ্বের সময় قَوْلِيْ-এর প্রাধান্য হয়ে থাকে। (গ) হাদীসটির বিধান একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত, আম নয়।

اَلْوَقْتُ الْمُسْتَحَبُّ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ **ফজর নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত** : ফজরের নামাজ আলোতে পড়া উত্তম, নাকি অন্ধকারে পড়া উত্তম, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ইসহাকসহ প্রমুখ ইমামের মতে ফজরের নামাজের আরম্ভ ও সমাপ্তি উভয়ই অন্ধকারে হওয়া উত্তম, ইমাম আহমদ হতেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি বলেন যে, মুক্তাদির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেরি করা কিংবা তাড়াতাড়ি করা উত্তম।

তাঁদের মতের দলিলগুলো নিম্নরূপ :

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ - (تِرْمِذِيٌّ)

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلّٰى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَ بِهَا - ثُمَّ كَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى التَّغْلِيْسِ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يُعِدْ اِلٰى اَنْ يُسْفِرَ - (اَبُوْ دَاوٗدَ - اِبْنُ حِبَّانٍ)

(٣) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَاٰخِرُهُ عَفْوُ اللّٰهِ .

(٥) قَوْلُهُ تَعَالٰى وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ (وَالتَّعْجِيْلُ مِنْ بَابِ الْمُسَارَعَةِ) .

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, সুফইয়ান ছাওরী এবং অন্যান্য হানাফীদের মতে ফজরের নামাজ উষার আলো বিকশিত হওয়ার পর পড়া উত্তম। অর্থাৎ আরম্ভ করবে আলোতে এবং শেষও করবে আলোতে, তাঁরা উষার আলোর সীমা নির্ধারণ করেন এভাবে যে, সূর্য উদয়ের এতটা পূর্বে নামাজ আরম্ভ করবে যাতে উভয় রাকাতে ৪০ হতে ১০০ আয়াত করে ধীরস্থির ও বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারা যায়। অতঃপর কোনো কারণে নামাজ নষ্ট হলে অনুরূপভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে যেন আবারো দুই রাকাত নামাজ পড়া যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতেও এরূপ একটি মত পাওয়া যায়। তাঁর অপর বর্ণনায় আছে যে, নামাজ অন্ধকারে আরম্ভ করে ঊষার আলোতে শেষ করা উত্তম।

তাঁদের মতের স্বপক্ষীয় দলিলসমূহ নিম্নরূপ :

(١) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُوْرِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - (أَبُوْ دَاوُدَ - اَلتِّرْمِذِيُّ)

(٢) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ وَفِيْ رِوَايَةٍ بِالْفَجْرِ - (اَلنَّسَائِيُّ - اِبْنُ مَاجَةَ)

(٣) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَسْفِرُوْا بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - (اِبْنُ حِبَّانٍ)

(٤) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِكُمْ - (اِبْنُ حِبَّانٍ)

(٥) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ - (اَلطَّبْرَانِيُّ)

(٦) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ نَوِّرْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ حَتّٰى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْإِسْفَارِ - (اِبْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ - إِسْحَاقُ - أَبُوْدَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ)

(٧) عَنْ أَنَسٍ (رض) يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِيْنَ يَفْسَحُ الْبَصَرُ -

فَسْحُ الْبَصَرِ-এর অর্থ দূর হতে কোনো বস্তু দেখা। এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ঊষার আলো।

(٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلّٰى صَلٰوةَ الصُّبْحِ قَبْلَ وَقْتِهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এখানে ওয়াক্তের পূর্বে ফজরের নামাজ পড়ার অর্থ অন্ধকারে পড়া, সুবহে সাদেকের পূর্বে পড়া নয়। এতে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল ফজরের নামাজ ঊষার আলোতে পড়া, একদিন মাত্র তিনি ব্যতিক্রম করেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে তাদের হাদীস সমূহের জবাব নিম্নরূপ :

প্রথম হাদীসের উত্তর :

১. সম্ভবত সফরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ মাঝে-মধ্যে অন্ধকারে নামাজ পড়তেন।

২ অথবা مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ দ্বারা মসজিদের ভিতরের অন্ধকার বুঝানো হয়েছে, রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য নয়।

৩. অথবা مِنَ الْغَلَسِ বাক্যাংশ রাবী কর্তৃক বর্ধিত। কেননা, কোনো কোনো বর্ণনায় تَعْنِي الْغَلَسَ উল্লিখিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, مِنَ الْغَلَسِ হযরত আয়েশার কথা নয়। হয়তো কোনো বর্ণনাকারী নিজের ধারণানুযায়ী একে হাদীসের সাথে সংযোজন করেছেন।

৪. অথবা ঊষার আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীস قَوْلِيْ এবং অন্ধকারে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসটি فِعْلِيْ। দ্বন্দ্বের সময় قَوْلِيْ হাদীসই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

৫. অথবা অন্ধকারে নামাজ পড়ার বিধান ছিল সে যুগে, যখন মহিলারাও জামাতে হাজির হতো। পরে যখন পর্দার হুকুম নাজিল হয় তখন এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

৬. অথবা রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর ও ওমরের যুগে غَلَسْ (অন্ধকার) إِسْفَارْ (আলো) উভয়ের উপরই আমল ছিল। পরে হযরত ওসমান (রা.)-এর সময় إِسْفَارْ (আলো)-এর উপর আমল নির্দিষ্ট হয়ে যায়। হযরত মুগীস বর্ণিত হাদীস এ কথারই প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন–

صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) هٰذِهِ صَلٰوتُنَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ (رض) فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ ـ

৭. অথবা শীতকালে অন্ধকারে পড়তেন এবং গ্রীষ্মকালে আলোতে পড়তেন। মু'আয বর্ণিত হাদীস এ কথারই প্রমাণ বহন করে।

قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيْقُ النَّاسُ وَ إِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ.

৮. অথবা কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ অন্ধকারে নামাজ পড়েছিলেন, কিন্তু আলোতে নামাজ পড়াই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল।

৯. অথবা অন্ধকারে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য হলো অধিক লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। রাসূল ﷺ-এর যুগে সবলোক অন্ধকারেই উপস্থিত হয়ে যেতো। ফলে আর দেরি করার আবশ্যকতা ছিল না। এ জন্য তিনি অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন।

১০. ইমাম আবূ জাফর তাহাবী (র.) উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন এভাবে যে, আরম্ভ করা হবে অন্ধকারে এবং শেষ করা হবে আলোতে।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর :

১. উক্ত হাদীসটির সনদের মধ্যে উসামা ইবনে যায়েদ নামীয় একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি হাদীস বিশারদদের নিকট সমালোচিত ব্যক্তি। ইমাম নাসাঈ ও দারাকুত্নী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। আবূ হাতেম বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করার যোগ্য না।

২. অথবা হাদীসে উল্লিখিত إِسْفَارْ দ্বারা إِسْفَار شَدِيْد বা অধিক আলো বুঝানো হয়েছে।
অর্থাৎ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ إِلَى الْإِسْفَارِ الشَّدِيْدِ حَتّٰى مَاتَ بَلْ عَادَ إِلَى الْإِسْفَارِ الْمُتَوَسِّطِ
তৃতীয় হাদীসের উত্তর : (ক) জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হদীসটি فِعْلِىْ আর আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসটি قَوْلِىْ - আর দ্বন্দ্বের সময় قَوْلِىْ হাদীসের প্রাধান্য হয়ে থাকে।
(খ) অথবা অন্ধকারে নামাজ আদায় করা একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সংযুক্ত, এ বিধানটি সাধারণ নয়। উপরে উল্লিখিত সবগুলো উত্তরই এ হাদীসের উত্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

চতুর্থ হাদীসের উত্তর :

১. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত বলতে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত বুঝানো হয়েছে।

২. হাদীসে উল্লিখিত عَفْوٌ শব্দের অর্থ– অতিরিক্ত। মহান আল্লাহর বাণী– يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ আয়াতটিতে عَفْوٌ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় হাদীসটির মর্মার্থ হবে, যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করল সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করল। আর যে ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে আদায় করল সে অত্যধিক ছওয়াব লাভ করল।

৩. হাদীসের সনদে অলীদ নামীয় একজন বর্ণনাকারী আছে যিনি সমালোচিত ব্যক্তি। আর সমালোচিত ব্যক্তির হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

আয়াতটির উত্তর : উল্লিখিত আয়াতটিতে مُسَارَعَة তথা ত্বরান্বিত করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোস্তাহাব ওয়াক্তের মধ্যে مُسَارَعَة উদ্দেশ্য। কেননা, দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ফজরের মোস্তাহাব ওয়াক্ত হলো إِسْفَارْ তথা আলোতে পড়া, তাই এখানে مُسَارَعَة দ্বারা مُسَارَعَةٌ فِى الْإِسْفَارِ উদ্দেশ্য।
اَلَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلٰى কালামাটির اَلَّتِىْ - هَا এবং أُوْلٰى পদগুলো স্ত্রীলিঙ্গ। অথচ এ পদগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুংলিঙ্গ তথা اَلْهَجِيْرَ মাওসূফটি, এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, اَلْهَجِيْرَ পদটি اَلْهَاجِرَةُ-এর অর্থে অথবা এর পূর্বে صَلٰوة শব্দ উহ্য রয়েছে, আর এ কারণেই স্ত্রীলিঙ্গ সিফাত উল্লেখ করা হয়েছে। আর সর্বপ্রথম হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূল ﷺ কে জোহরের নামাজের তালিম দিয়েছেন। এ জন্যই জোহরের নামাজকে أُوْلٰى বলা হয়েছে।
اَلْعَتَمَةُ শাফক অদৃশ্য হওয়ার পরবর্তী অন্ধকারকে 'আতামা' বলা হয়। গ্রামীণ সাধারণ লোকেরা اَلْعِشَاءُ-কে اَلْعَتَمَةُ না বললে বুঝত না, তবে ' اَلْعِشَاءُ-কে عَتَمَة বলা মাকরূহ। যেমন– মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلٰى إِسْمِ صَلٰوتِكُمْ إِلَّا أَنَّهَا الْعِشَاءُ কিন্তু অন্য হাদীসে اَلْعِشَاءُ-কে عَتَمَة বলে উল্লেখ করা হয়েছে– বয়ানে জাওয়াযের জন্য। অতএব নাহীটি মূলত تَنْزِيْهِىْ -এর জন্য।

وَعَنْ ٥٤١ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪১. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর [ইবনে হাসান ইবনে আলী] (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [সাহাবী] হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে নবী করীম ﷺ-এর নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজ পড়তেন এবং আসরের নামাজ এমন সময় পড়তেন যে, তখনও সূর্য দীপ্তিমান থাকতো। আর মাগরিব পড়তেন এমন সময় যখন সূর্য অস্ত যেতো। লোক বেশি হলে ইশা সকাল সকাল পড়তেন। আর যখন লোক কম হতো তখন দেরি করতেন এবং ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ -**এর মর্মার্থ :** এ বাক্যটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামাত বড় হওয়ার আশায় নামাজ কিছুটা বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম, বরং মোস্তাহাব। তবে মাগরিবের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। কেননা, মাগরিবের সময় খুবই কম।

وَعَنْ ٥٤٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اِتِّقَاءَ الْحَرِّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ)

৫৪২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম ﷺ-এর পিছনে জোহরের নামাজ পড়তাম তখন গরম হতে বাঁচবার জন্য আমাদের কাপড়ের উপর সেজদা করতাম। –[বুখারী ও মুসলিম, তবে হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلظَّهَائِرُ -**এর উদ্দেশ্য :** اَلظَّهَائِرُ শব্দটি اَلظَّهِيْرَةُ-এর বহুবচন, অর্থ দ্বি-প্রহর। তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জোহরের নামাজ। এখানে শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রতিদিন জোহরের নামাজ এ অবস্থায়ই আদায় করতেন।

حُكْمُ السَّجْدَةِ عَلَى الثَّوْبِ :

কাপড়ের উপর সেজদা করার বিধান : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে পরিধানের বস্ত্রের উপর সিজদা করা মাকরূহ, তবে প্রয়োজনের তাকিদে এরূপ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তিনি দলিল হিসেবে নিম্নলিখিত হাদীস পেশ করেন।

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ .

(٢) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلٰى ثِيَابِنَا اِتِّقَاءَ الْحَرِّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পরিধানের বস্ত্রের উপর সেজদা করা বৈধ নয়, তবে পৃথক কাপড়ের উপর সেজদা করা বৈধ। তিনি উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সম্ভবত সাহাবীগণ এ জন্য পৃথক কাপড় ব্যবহার করতেন।

وَعَنْ ٥٤٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا .

৫৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন [সূর্যের] উত্তাপ বাড়ে, তখন তোমরা নামাজকে শীতল কর। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে 'জোহরকে'। কেননা, গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে। জাহান্নাম প্রভুর নিকট বিনয় স্বরে প্রার্থনা করে বলে, হে আল্লাহ! [উত্তাপের তীব্রতায়] আমার এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন তিনি তাকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দেন, এক নিঃশ্বাস শীতে এবং অপর নিঃশ্বাস গ্রীষ্মে। এতেই তোমরা গ্রীষ্মে তাপের আধিক্য পাও এবং শীতে শীতের আধিক্য পাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তোমরা যে গরমের আধিক্য অনুভব কর, তা জাহান্নামের গরম নিঃশ্বাসের কারণেই এবং তোমরা যে শীতের আধিক্য অনুভব কর, তা তার শীতল নিঃশ্বাসের দরুনই হয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالْإِبْرَادِ فِى الظُّهْرِ জোহরকে শীতল করার তাৎপর্য : إِبْرَادٌ শব্দের শাব্দিক অর্থ– শীতল করা তথা গরম বস্তুকে কিংবা রৌদ্রের তাপকে শীতল করা। আর নবীজীর বাণী– إِبْرَادٌ بِالظُّهْرِ-এর অর্থ হলো, উত্তাপের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পরিবেশ শীতল হলে জোহরের নামাজ আদায় করা। এর উপর ভিত্তি করেই হানাফীগণ বলেন, গ্রীষ্ম ঋতুতে জোহরকে দেরি করে ঠাণ্ডা সময়ে পড়া উত্তম।

শীতলতার সময়সীমা সম্পর্কে হানাফী আলেমগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন—

※ কারো মতে আসলী ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার একগুণ হওয়া পর্যন্ত।

※ আবার কারো মতে বস্তুর দৈর্ঘ্যের চারের এক অংশ পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

※ কিছু সংখ্যক বলেন, তিনের এক অংশ পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত।

※ কেউ কেউ বলেন, অর্ধেকের সমান হওয়া পর্যন্ত।

※ আবার একদল বলেন, ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। তবে একগুণের কথাটাই অধিক বিশুদ্ধ।

এ বিষয়ে শাফেয়ীগণের বক্তব্য : শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে জোহরের নামাজ সকাল সকাল পড়াই উত্তম। তাঁরা إِبْرَادٌ بِالظُّهْرِ-এর অর্থ করেন– صَلُّوْا فِىْ وَقْتِ الْحَرِّ وَأَبْرِدُوا الْحَرَارَةَ بِسَبَبِ أَدَاءِ الصَّلٰوةِ فِى الْحَرَارَةِ অর্থাৎ, তোমরা উত্তাপের সময়ই নামাজ পড় এবং গরমে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে উত্তাপকে শীতল করো।

আহনাফের জবাব : আহনাফের পক্ষ হতে এ ব্যাখ্যার জবাবে বলা হয়, যেহেতু হাদীসে এসেছে– كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ وَإِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ عَجَّلَ এখানে أَبْرَدَ-এর বিপরীত عَجَّلَ (তাড়াতাড়ি) এসেছে, সুতরাং إِبْرَادٌ-এর অর্থ تَاخِيْر বা দেরি করা হবে।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَقَوْلِ اَهْلِ الْهَيْئَةِ **হাদীস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব :** হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, গরম ও ঠাণ্ডা দোজখের তাপ হতে সৃষ্টি। অথচ আধুনিক জ্যোতিবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, তা সূর্যের প্রভাবে হয়ে থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ–

১. উক্ত হাদীসে দোজখের তাপ কথাটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ গরমের উত্তাপ যেন দোজখের আগুন, আর ঠাণ্ডার শীতলতা যেন দোজখের হিমশীতলতা।

২. অথবা হাদীস হলো শ্রুত দলিল। প্রমাণ হিসাবে শ্রুত দলিলই অকাট্য। এর বিপরীত বিজ্ঞান হলো গবেষণা লব্ধ, অথচ গবেষণালব্ধ বিষয়টি একটি ধারণার উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, কোনো অকাট্য প্রমাণ ও ধারণালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে অকাট্য দলিলই প্রাধান্য পায় এবং ধারণালব্ধ জ্ঞান প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সূত্র হিসেবে বিজ্ঞানীদের ধারণালব্ধ জ্ঞান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৩. অথবা একটি কারণ জাহেরী বা প্রকাশ্য, আরেকটি কারণ বাতেনী। গরম ও ঠাণ্ডা সূর্যের তাপের প্রভাবে হওয়া জাহেরী কারণ এবং দোজখের প্রভাবে তাপের আধিক্য হওয়া বাতেনী কারণ। বিজ্ঞানীরা জাহেরী কারণ এবং মহানবী ﷺ বাতেনী কারণ বলেছেন।

৪. অথবা জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গ হতে সূর্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা জাহান্নামের সাদৃশ্য ও সৃষ্টিকর্তার কুদরতের স্বাক্ষর হিসেবে পৃথিবীকে গরম ও ঠাণ্ডা করছে।

৫. অথবা সূর্য জাহান্নাম হতে উষ্ণতা গ্রহণ করে পৃথিবীতে বিতরণ করে থাকে, তাই হুজূর ﷺ হাকীকতের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন শীত ও গরম জাহান্নামের কারণে হয়ে থাকে।

حِكْمَةُ الْمَنْعِ عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ :
গরমের অধিক্যের সময় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :

১. তখন গরমের কারণে নামাজ পড়তে কষ্ট হয় অথচ আল্লাহ বান্দার কষ্ট চান না। মহান আল্লাহর বাণী–
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرة - ١٨٥)

২. অথবা কংকরময় জমিনে নামাজ পড়লে কপালে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় এ হুকুম দেওয়া হয়েছে।

৩. অথবা অধিক গরমের কারণে নামাজে একাগ্রতা আসে না, অথচ নামাজ কবুল হওয়ার জন্য একাগ্রতা শর্ত, যেমনি কুরআনে এসেছে যে, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ,

৪. কিংবা গরমের সময় হলো শাস্তির সময়। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন,
اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ اِسْتِوَاءِ الشَّمْسِ فَاِنَّهَا سَاعَةٌ تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّمُ .

তাই এ শাস্তির সময়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নামাজ হলো অনুগ্রহের কারণ, যা দ্বারা শাস্তি দূর হয়। সুতরাং নামাজ ত্যাগ করার নির্দেশ কিভাবে দেওয়া হলো? আলোচ্য প্রশ্নের জবাব হলো, আবুল ফাতাহ ইয়া'মূরী বলেন, কোনো বিষয়ের কারণ (عِلَّتْ) বা উপলক্ষ্য যদি শরিয়ত প্রবর্তকের পক্ষ হতে বর্ণনা করা হয় তবে এর মর্ম বুঝে আসুক বা না আসুক তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব। যেহেতু শরিয়ত প্রবর্তক নামাজ ত্যাগ করার কারণ উল্লেখ করেছেন 'প্রখর গরম', সুতরাং তা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে।

كَيْفِيَّةُ اِشْتِكَاءِ النَّارِ اِلٰى رَبِّهٖ **জাহান্নামের স্বীয় প্রভুর নিকট অভিযোগ করার ধরন :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا 'জাহান্নাম আপন প্রভুর নিকট অভিযোগ করে'। তবে এ অভিযোগের ধরন কি? সে সম্পর্কে হাদীসবিশারদদের মতবিরোধ হয়েছে।

১. কারো মতে জাহান্নাম সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলবে এবং আল্লাহ তার জবান খুলে দেবেন।

২. কারো মতে জাহান্নামের অবস্থার মাধ্যমে এ অভিযোগ বুঝা যাবে, মুখে বলবে না।

৩. কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের পরিচালকের অভিযোগকে জাহান্নামের অভিযোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. কাজি বায়যাবীর মতে জাহান্নামের তীব্র উত্তেজনাকে রূপকভাবে তার অভিযোগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَرْجِعْ "هَا" যমীরটির এর- زَمْهَرِيْرِهَا আলোচ্য অংশে : এর ব্যাখ্যা -أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرِيْرِهَا হলো نَارٌ তাই বাক্যটির অর্থ হবে তোমরা যে শীতের আধিক্য অনুভব কর তা জাহান্নামের ঠাণ্ডা নিঃশ্বাসের দরুনই হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, نَار -এর মধ্যে কিভাবে ঠাণ্ডা থাকতে পারে? হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নরূপ উত্তর দিয়েছেন।

১. এখানে نَارٌ দ্বারা অগ্নি উদ্দেশ্য নয়, বরং نَارٌ বলতে مَحَلِّ نَارٍ বা অগ্নিস্থল তথা জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে। আর জাহান্নামের মধ্যে উষ্ণস্তর ঠাণ্ডাস্তর উভয়ই থাকতে পারে।

২. অথবা মানুষ যেভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে অনুরূপভাবে জাহান্নামও বৎসরে একবার শ্বাস গ্রহণ ও একবার ত্যাগ করে। যখন উহা শ্বাস গ্রহণ করে তখন তার ভিতরে উষ্ণতা জমা হওয়ার কারণে বহির্গত বাইরের উষ্ণতা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আবার যখন শ্বাস ত্যাগ করে তখন বহির্ভাগ উষ্ণ হয়ে যায়, সুতরাং হাদীসে উল্লিখিত زَمْهَرِيْر نَار [অগ্নির ঠাণ্ডা] দ্বারা শ্বাস গ্রহণকালীন ঠাণ্ডাকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٥٤٤ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِيْ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْنَحْوِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আসরের নামাজ পড়তেন তখন সূর্য ঊর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল থাকতো। অতঃপর কোনো লোক আওয়ালীর [উচ্চ বস্তি এলাকার] দিকে যেতো এবং সেখানে গিয়ে এমন সময় পৌঁছতো যে, সূর্য তখনও ঊর্ধ্বে থাকতো। আওয়ালীর কোনো কোনো এলাকা মদীনা হতে চার মাইল অথবা তার কাছাকাছি দূরে অবস্থিত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَوَالِيْ এর অর্থ : عَوَالِيْ শব্দটি عَالِيَةٌ -এর বহুবচন। عَوَالِيْ বলতে মদীনার পার্শ্ববর্তী ঐ সকল বসতি এলাকাকে বুঝানো হয়, যা উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।

※ কারো মতে মদীনা হতে নয় হাজার হাত দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম।

※ কিছু সংখ্যকের মতে তা মদীনারই একটি পার্শ্ববর্তী গ্রাম, যার কোনো কোনো এলাকা মদীনা হতে চার মাইল বা তার কাছাকাছি দূরে অবস্থিত।

أَمْيَالٌ -এর ব্যাখ্যা : أَمْيَالٌ শব্দটি مِيْلٌ -এর বহুবচন। এর দূরত্বের পরিমাণ প্রায় অর্ধক্রোশ, মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় দুই হাজার গজ পরিমাণ দূরত্বকে اَلْمِيْلُ বলা হয়।

وَعَنْهُ ٥٤٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى إِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৪৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, এ হলো মুনফিকের নামাজ যে, সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে, যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখানে আসে তখন সে উঠে দাঁড়ায় এবং চার ঠোকর মারে এবং তাতে আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ التَّشْبِيْهِ তাশবীহ-এর ব্যাখ্যা : এখানে نَقَرَ أَرْبَعًا দ্বারা অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে চার রাকাত তথা আট সেজদা আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত বাক্যে মুনাফিকদের নামাজ আদায় করাকে পাখির আহার খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আর এর وَجْهُ الشَّبَهِ হলো اَلسُّرْعَةُ فِى الصَّلٰوةِ তথা নামাজে তাড়াহুড়া করা অথবা سُرْعَةُ الْقِرَاءَةِ অর্থাৎ, কেরাতে তাড়াহুড়া করা। মুনাফিকরা তরবারির ভয়ে এবং নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি না করার কারণে এভাবে নামাজ আদায় করে।

لِمَ خُصَّ بِالنَّقْرِ صَلٰوةُ الْعَصْرِ আসরের নামাজকে কেন পাখির ঠোকরের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে? আসরের নামাজ পড়াকে পাখির দানা খাওয়ার সাথে তুলনা করার কারণ হলো এটি صَلٰوةُ الْوُسْطٰى আর এই নামাজ মানুষের দিনের কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে দুর্বল হওয়ার পর আসে। তখন দুর্বলতার কারণে মানুষ তাড়াতাড়ি সেজদা করে, এ জন্য একে পাখির দানা খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ইমাম মুযহির (র.) বলেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ সূর্য লাল হয়ে যাওয়ার পর পড়ে, তখন সে যেন নিজেকে মুনাফিকদের সাথে তুলনা করে। কেননা মুনাফিক নামাজের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করে না; বরং সে নিজেকে শাস্তি হতে রক্ষার জন্য নামাজ পড়ে। আর এরূপ বিলম্ব হওয়ার কারণে তার কোনো ভীতিও নেই। কেননা, সে নামাজ দ্বারা কোনো ফজিলত ও ছওয়াব চায় না। সুতরাং সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পর দায়সারা গোছের মতো করে নামাজ আদায় করে।

وَعَنْ ٥٤٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَّذِىْ يَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যার আসরের নামাজ ছুটে গেল তার যেন সমস্ত পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুট হয়ে গেল।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْمُتَعَدِّدَةِ فِىْ فَوَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ :
আসরের নামাজ ছুটে যাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত : উক্ত হাদীসে আসরের নামাজ ছুটে যাওয়ার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

১. মুহাল্লাব ও তাঁর অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এখানে আসরের নামাজ ছুটে যাওয়ার দ্বারা আসরের জামাত ছুটে যাওয়া উদ্দেশ্য, সূর্যের বর্ণ হলুদ হওয়ায় মাকরূহ সময় উপস্থিত হওয়া অথবা সূর্য অস্তমিত হওয়ার দরুন নামাজ কাজা হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়। তাদের যুক্তি হলো, মাকরূহ সময় উপস্থিত হওয়া এবং কাজা হওয়া অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রেও হতে পারে; সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আসরের নামাজের উল্লেখ অনর্থক।

   এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জামাত ছুটে যাওয়ার ব্যাপারটি তো অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রেও হতে পারে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আসরের নামাজকে উল্লেখ করার কারণ কি? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আসরের জামাতের সময় দিনের ফেরেশতার গমন ও রাতের ফেরেশতার আগমনের সময়। তাই উক্ত হাদীসে আসরের নামাজের বিশেষভাবে তাকিদ এসেছে। এ কারণে ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন হারালে কোনো ব্যক্তি যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আসরের নামাজ ফওতকারীও অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

   এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ফজরের সময় ও ফেরেশতার গমন। আগমন ঘটে, সুতরাং আসরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কি? এর জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে কোনো নামাজকে যে কোনো ফজিলতের সাথে নির্দিষ্ট করতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা অনর্থক। যেমন আল্লাহ বলেন,

   لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

২. **ইমাম নববী**, ইবনে ওহ্হাব ও কাজি ইয়ায বলেন, আসর নামাজ ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো তা মোস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় না করে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আদায় করা, যেমন– ইমাম আওয়াযী হতে বর্ণিত আছে। তিনি উক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা বলেছেন– وَفَوَاتُهَا اَنْ تَدْخُلَ الشَّمْسُ صَفْرَةً

৩. কারো মতে, মূলকথা হলো فوات عصر দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের নামাজ তার নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আদায় করা। হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস এ কথারই সমর্থন করে। তিনি বলেন–

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَىْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ـ (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ)

৪. মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, আসর নামাজ ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে আসরের নামাজ দেরি করে পড়া। হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য হলো– আসরের নামাজের গুরুত্ব বর্ণনা করা এবং তা আদায়ের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা। –[মিরকাত]

وُجُوْهُ تَخْصِيْصِ الْعَصْرِ আসরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ :

১. এ সময়টা হলো ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত থাকার সময়, যা মানুষকে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অমনোযোগী করে তোলে। মহান আল্লাহ্র বাণী— رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

২. আবূ ওমর (রা.) বলেন, কোনো এক ব্যক্তি আসরের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাই আসরকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনু আবদিল বারও এরূপই বলেছেন।

৩. হাদীস শরীফে এ নামাজকে اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى বা উত্তম নামাজ বলা হয়েছে। এ জন্য বিশেষভাবে একে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কুরআন মাজীদে اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى -কে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ـ

৪. অথবা আল্লাহ্ যে নামাজকে যে ফজিলতের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, তা-ই আমাদেরকে মেনে নিতে হবে।

৫. অথবা এ আসরের সময়ই দিনের ফেরেশতার আগমনের সময়, এ জন্য বিশেষভাবে এ নামাজকে উল্লেখ করেছেন।

৬. অথবা এই সময় বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হয় তাই বিশেষভাবে এই নামাজকে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচয় :** নাম-আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ আব্দুর রহমান, পিতার নাম- ওমর ইবনে খাত্তাব, মাতার নাম-যয়নব বিনতে মায্‌উন।

২. **জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ :** এ মহামনীষী নবুয়তের দ্বিতীয় বর্ষে মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং নবুয়তের ৬ষ্ঠ বর্ষেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করেন।

৩. **স্বভাব-চরিত্র :** তিনি বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। ১১ বছর বয়সে স্বীয় পিতার সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহর অনুসরণ, খোদাভীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইবনুল আসীরের ভাষ্যে– كَانَ كَثِيْرَ الْاِتِّبَاعِ لِاٰثَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَنَّهُ يَنْزِلُ مَنَازِلَهُ وَيُصَلِّىْ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ صَلّٰى فِيْهِ

৪. **জিহাদে অংশ গ্রহণ :** বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও ওহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন।

৫. **হাদীস বর্ণনা :** তিনি হাদীস বর্ণনায় সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০। মুত্তাফাকুন আলাইহি ১৭০টি এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ৮১টি ও ইমাম মুসলিম এককভাবে ৩১টি হাদীস বর্ণনা করেন।

৬. **ইন্তেকাল :** হিজরি ৭৩ /৭৪ সালে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্দেশে জনৈক সিপাহী তাঁর পায়ে বর্শা ঢুকালে উক্ত আঘাতে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে হজ থেকে ফেরার পথে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে তিনি মক্কার সন্নিকটে 'কাখ' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে যী-তুওয়া নামক মুহাজিরদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٥٤٧ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৪৭. অনুবাদ : হযরত বুরায়দা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পরিত্যাগ করে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ **কুরআন ও হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব** : পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কুফর, শিরক ও ধর্মত্যাগের ফলে আমল বিনষ্ট হয়। যেমন-

(١) قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ . (اَلْمَائِدَةُ - ٥)

(٢) وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ . (اَلْاَنْعَامُ - ٨٨)

(٤) وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . (اَلْبَقَرَةُ . ٢١٧)

আর হযরত বুরাইদার হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজ ত্যাগ তথা গুনাহের দ্বারা আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, অথচ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ কথার উপর একমত যে, গুনাহের দ্বারা আমল বিনষ্ট হয় না, সুতরাং বুরাইদার হাদীসটি প্রকাশ্যভাবে কুরআন ও ইজমার বিপরীত বলে মনে হয়। হাদীস বিশারদগণ হযরত বুরায়দার হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা নিম্নরূপ-

১. مَنْ تَرَكَ .... الخ -এর মর্মার্থ এই যে, যে ব্যক্তি আসর নামাজের অপরিহার্যতা (فَرْضِيَّةٌ) অস্বীকার করে নামাজ ত্যাগ করে, তার যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, অপরিহার্যতা (فَرْضِيَّةٌ) অস্বীকারকারী কাফির। আর কুফরি আমল বিনষ্ট হওয়ার কারণ।

২. অথবা মর্ম এই যে, নামাজের অপরিহার্যতা স্বীকার করে বটে; কিন্তু নামাজ প্রতিষ্ঠাকারীর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এমন ব্যক্তির আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, ঠাট্টা-বিদ্রূপও এক প্রকার কুফরি।

৩. অথবা মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি অলসতা করে নামাজ ত্যাগ করে তার আমল বিনষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে আমল বিনষ্ট হওয়ার হুমকি কঠোরতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাত্রয় تَرْكُ الصَّلٰوةِ [নামাজ ত্যাগ করা]-এর দৃষ্টিকোণ হতে করা হয়েছে। حَبْطُ عَمَلٍ [আমল বিনষ্ট হওয়া]-এর দৃষ্টিকোণ হতেও হাদীসটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. এটা مَجَازُ التَّشْبِيْهِ [রূপক উপমা]-এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, আসর নামাজ ত্যাগকারী ঐ ব্যক্তির মতো, যার আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২. অথবা বাক্যটির মর্ম হবে যে, তার আমল বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হবে,

لِاَنَّ الْاِصْرَارَ عَلَى الصَّغَائِرِ يُفْضِىْ اِلَى الْكَبَائِرِ وَالْاِصْرَارَ عَلَى الْكَبَائِرِ يُفْضِىْ اِلَى الْكُفْرِ .

৩. অথবা মর্ম এই যে, তার আমলের ছওয়াব বিনষ্ট হবে, মূল আমল বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

৪. অথবা মর্ম এই যে, তার সারা দিনের নেক আমলের ছওয়াব হ্রাস পাবে।

حُكْمُ تَرْكِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ **আসরের নামাজ ত্যাগ করার হুকুম :**

مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْحَنَابِلَةِ : মু'তাযিলা ও কতিপয় হাম্বলী হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে বলেন যে, যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ত্যাগ করে তার বিগত জীবনের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে নামাজ পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। আর কবীরা গুনাহের ফলে সে কাফির হয়ে যায় না। কেননা, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর স্বীকৃতি প্রদান করে, তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন لَا تُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ তথা তাকে কোনো গুনাহের কারণে কাফির বলো না। তাই নামাজ পরিত্যাগের ফলেও কেউ কাফির হবে না এবং তার আমলও বাতিল হবে না।

وَعَنْ ٥٤٨ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৮. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে মাগরিবের নামাজ পড়তাম, তারপর আমাদের মধ্যে কেউ যখন [বাড়ির দিকে] ফিরত তখন সে তার তীরের লক্ষ্য স্থল দেখতে পেতো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ **বর্ণনাকারীর পরিচিতি :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আসলাম উপনাম আবূ রাফে'। তিনি হযরত আব্বাস (রা.)-এর কিবতী গোলাম ছিলেন। আব্বাস (রা.) তাঁকে হুযূর ﷺ-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। হুযূর ﷺ আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনে তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন। তিনি আবূ রাফে' উপনামে সমধিক পরিচিত اَلْاِكْمَالُ প্রণেতা বলেন–

كَانَ قِبْطِيًّا وَكَانَ لِلْعَبَّاسِ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بُشِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْاِسْلَامِ الْعَبَّاسِ اَعْتَقَهُ.

২. **ইসলাম গ্রহণ :** তার নাম রাফে' উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ বা আবু খাদীজ পিতার নাম খাদীজ। বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ : রাফে' ইবনে খাদীজ ইবনে রাফে' ইবনে আদী ইবনে ইয়াযীদ ইবনে জু'শাম ইবনে হরিসা ইবনে হারিস। তিনি একজন আনসারী সাহাবী। তাঁর পূর্বপুরুষ হারিসা বা হারিসের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে আল-হারেসী এবং আওস গোত্রোদ্ভূত হওয়ায় আল-আওসী বলা হয়। তাঁর মাতার নাম হালীমা বিনতে মাসউদ ইবনে সিনান।

জিহাদে যোগদান : তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নিজেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পেশ করেন। কিন্তু তার বয়স কম থাকায় তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে অনুমতি দেন নি। পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি তীরবিদ্ধ হন, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমার এ আহত হওয়ার সাক্ষী হব। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ : তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি উহুদ যুদ্ধে যে তীরবিদ্ধ হন সে আঘাত আবার অনেক দিন পর তাজা হয়ে উঠে, ফলে ৭৩ বা ৭৪ হিজরিতে ৮৬ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তাঁর নামাজে জানাজা পড়ান।

وَعَنْ ٥٤٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৪৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ ইশার নামাজ রক্তিম আভা অদৃশ্য হওয়ার পর হতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইশার নামাজকে আতামা বলা হতো। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ এরূপ বলতে নিষেধ করেন। মুসলিম শরীফে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمْ اِلَّا اَنَّهَا الْعِشَاءُ.

এখানে প্রশ্ন হলো যে, নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রা.) কিভাবে ইশার নামাজের ক্ষেত্রে 'আতামা' শব্দ ব্যবহার করলেন? হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এর সম্ভাব্য দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন– (ক) সম্ভবত এটা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বেকার বর্ণনা। (খ) অথবা নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ তখনও তাঁর নিকট পৌছেনি।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** নাম আয়েশা। উপনাম উম্মে আব্দুল্লাহ্, উপাধি সিদ্দীকা, হুমায়রা, উম্মুল মু'মিনীন, রাসূল ﷺ তাঁকে اَلصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ বলে ডাকতেন। পিতার নাম আবূ বকর, আর মাতার নাম উম্মে রুমান।

২. **তাঁর বংশ তালিকা : আয়েশা বিনতে** আবূ বকর ইবনে আবূ কুহাফা ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ, ইবনে তাইম।

৩. **বিবাহ :** হযরত আয়েশা (রা.)-এর বয়স যখন ৬/৭ বছর তখন আবূ বকর (রা.) তাঁকে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ প্রদান করেন। হিজরতের দ্বিতীয় সনে শাওয়াল মাসে ৯ বছর বয়সের সময় তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর বাসর হয়।

৪. **গুণাবলি :** ইসলামি জ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অদ্বিতীয়া। শরয়ী মাসআলা ও মাসায়েলের ব্যাপারে অন্য সব মহিলার চেয়ে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়া। প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এ মর্মে اَلْاِكْمَالُ গ্রন্থে বলা হয়েছে–

كَانَتْ فَقِيْهَةً عَالِمَةً فَصِيْحَةً فَاضِلَةً كَثِيْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَارِفَةً بِاَيَّامِ الْعَرَبِ وَاَشْعَارِهَا .

রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন– فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ

হযরত উরওয়া (রা.) বলেন, তাঁর মতো অধিক কবিতা মুখস্থকারিণী আমি আরবে আর কাউকে দেখিনি।

※ তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র.) বলেন,

لَوْ جُمِعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ ثُمَّ عِلْمُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَسَعَهُمْ عِلْمًا .

৫. **তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ :** তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০টি। বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে ১৭০টি স্থান লাভ করছে। এ ছাড়া ইমাম বুখারী ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম ৮৫টি হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬. **ইন্তেকাল :** এ মহামানবী ৫৭/৫৮ হিজরিতে ৬৬/৬৭ বছর বয়সে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর খিলাফতকালে ১৭ই রমজান মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর অসিয়ত মুতাবেক তাঁকে রাতে দাফন করা হয়।

وَعَنْـ ٥٥٠ ـهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ [এমন সময়] পড়তেন যে, তখন মহিলারা নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘরে ফিরে যেতো, অথচ অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلِ الْاِسْفَارُ بِالْفَجْرِ اَفْضَلُ اَمِ التَّغْلِيْسُ **ফজরের নামাজ উষার আলো বিকশিত হওয়ার পর পড়া উত্তম, না কি অন্ধকারে পড়া উত্তম?** ফজরের নামাজ অন্ধকারে উত্তম না ফর্সাতে পড়া উত্তম? এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁদের মতামত দলিলসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ফজরের নামাজ উষার আলো বিকশিত হওয়ার পর পড়া উত্তম। দলিল– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ

২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের মতে অন্ধকারে পড়া উত্তম। দলিল–

١- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ ـ

٢-كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ ـ

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে আলোতে শেষ করা উত্তম।

প্রতিপক্ষের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে অপর পক্ষের প্রত্যুত্তরে বলা হয়—

১. উষার আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীস قَوْلِىْ এবং অন্ধকার -এর হাদীস فِعْلِىْ ; সুতরাং এতে قَوْلِىْ হাদীস প্রাধান্য পাবে।

২. অথবা কোনো কোনো সময় তিনি অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন, তবে আলোতে নামাজ পড়াই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। কেননা আলোতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য ছিল অধিক লোকের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. অথবা بَيَان جَوَازْ -এর জন্য সেদিন অন্ধকারে পড়েছেন।

৪. কিংবা উক্ত হাদীসে اَلْغَلَسُ দ্বারা মসজিদের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে।

৫. অথবা সেদিন তিনি সফরে যাবার কারণে অন্ধকারে পড়েছেন।

---

٥٥١ - وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ وَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَ دُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ قَدْرَمَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৫১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কাতাদা হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, এক রাতে নবী করীম ﷺ ও যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) সাহরী খেলেন, যখন তাঁরা সাহরী খাওয়া হতে অবসর হলেন তখন নবী করীম ﷺ নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং নামাজ আদায় করলেন। আমরা হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তাদের সাহরী খাওয়া হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত ও নামাজে দাখিল হওয়ার মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে এ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিল। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, সাহরী সুবহে সাদেকের নিকটবর্তী সময়ে খাওয়া সুন্নত। পরবর্তী কালের আলিমগণ তার পরিমাণ নির্ধারণ এভাবে করেছেন যে, রাতের সাত ভাগের শেষভাগে সাহরী খাওয়া উচিত। হাদীসটি দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ রমজান মাসে ফজরের নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ **বর্ণনাকারী পরিচিতি** :

১. **নাম ও পরিচিতি** : তাঁর নাম কাতাদা, উপনাম আবুল খাত্তাব, নিসবতী নাম আস-সুদুসী, পিতার নাম দিয়ামা ইবনে কাতাদা। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেয়ী ও যুগশ্রেষ্ঠ হাফেজ।

২. **বংশ পরিক্রমা** : কাতাদা ইবনে দিয়ামা ইবনে কাতাদা ইবনে আযীয ইবনে আমর ইবনে রাবীয়া ইবনে আম্‌র ইবনুল হারেছ ইবনে সাদুস ইবনে শাইবান ইবনে যুহল ইবনে সালাবা ইবনে উকাবা ইবনে সা'ব ইবনে বকর ইবনে ওয়ায়েল আস-সুদুসী আল-বসরী।

৩. **যে সকল সাহাবীদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে** : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ছোট তাবেয়ী ছিলেন। এর অর্থ বয়সে ছোট নয়, বরং কম সংখ্যক সাহাবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁরা হলেন হযরত আনাস ইবনে মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে ছারজিস, আবুত তোফায়েল আমের (রা.) প্রমুখ সাহাবী।

প্রসিদ্ধ যে সকল তাবেয়ী হতে তিনি হাদীস শুনেছেন তাঁরা হলেন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, হাসান বসরী, আবূ ওসমান, আন্নাহদী, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আরও অনেক। তাঁর নিকট হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁরা হলেন, সুলাইমান আত্তাইমী, আইয়ূবুস সাখতিয়ানী, আ'মাশ, শো'বা, আওযায়ী আরও অনেকে।

৪. **ঐতিহাসিক মতামত :** ইতিহাসে এ কথা সর্বসম্মত গৃহীত যে, তিনি মাতৃগর্ভ হতে অন্ধ ছিলেন এবং মামসূহুল আইন অর্থাৎ চোখ অফুটন্ত ছিল। সকল মুহাদ্দিস ঐকমত্যে পৌছেছেন যে, তিনি অতি বড় বুজুর্গ, সর্বাধিক মুখস্থকারী, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, অত্যন্ত পরহেজগার ছিলেন।

বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুযনী বলেন, مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَى اَحْفَظِ اَهْلِ زَمَانِهٖ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى قَتَادَةَ وَمَا اَدْرَكْنَا الَّذِىْ هُوَ اَحْفَظُ مِنْهُ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যুগশ্রেষ্ঠ হাফেজ দেখতে চায় সে যেন কাতাদার প্রতি তাকায়। আমরা কাতাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হাফেজ অন্য কাউকে পাইনি।

※ কাতাদা নিজে বলেছেন, مَاسَمِعَتْ اُذُنَاىَ شَيْئًا قَطُّ اِلاَّ وَعَاهُ قَلْبِىْ অর্থাৎ, আমার দুই কর্ণ যা কিছু শ্রবণ করেছে অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে।

৫. **মৃত্যু :** বদরুদ্দিন আইনীর মতে ১১৭ অথবা ১১৮ হিজরিতে এবং মিশকাতের বর্ণনা মতে ১০৭ হিজরিতে ৫৬ অথবা ৫৭ বৎসরে ইহরাম ত্যাগ করেন।

وَعَنْ ٥٥٢ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ يُؤَخِّرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ যার! যখন তোমার উপর এরূপ শাসনকর্তা হবে যারা নামাজের প্রতি অমনোযোগী, অথবা উহার সময় হতে নামাজকে পিছিয়ে দেবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? আমি বললাম, আপনি আমাকে কি আদেশ প্রদান করেন? তিনি বললেন, নামাজ সময় মতো পড়বে। যদি তাদের সাথে তা পাও তবে তা পুনরায় পড়বে, আর উহা তোমার জন্য নফল হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মুসলিম সাম্রাজ্যে নামাজ কায়েম করা এবং ইমামতি করা মুসলমান শাসকদেরই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগ এরূপই ছিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ইমামতের অযোগ্য ব্যক্তিরাই ক্ষমতার মসনদে বসে যায়। ফলে এ মহান কর্তব্য হতে দূরে সরে পড়ে। বর্তমান যুগে তো এটাও কল্পনা করা যায় না।

এটা ছিল নবী করীম ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী যে রাজা-বাদশাহগণ নামাজের প্রতি অমনোযোগী হবে বা নামাজকে মাকরূহ ওয়াক্তে নিয়ে যাবে। এরূপ ঘটনা বনী উমাইয়াদের সময়ে ঘটেছিল। এরূপ অবস্থা ঘটলে মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়ে নেওয়া উত্তম। একাকী হলেও তা করতে হবে। পরে যদি জামাত পাওয়া যায় তা হলে তা পড়ে নিলে নফল হিসেবে গণ্য হবে। এরূপ দু'বার নামাজ পড়া শাফেয়ীদের মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে জায়েজ আর হানাফী মাযহাব মতে শুধুমাত্র জোহর ও ইশার নামাজে জায়েজ আছে। কেননা হানাফীদের মতে আসরের পর নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। আর মাগরিবের নামাজ তিন রাকাত। তিন রাকাত নফলের কোনো প্রমাণ নেই। এমনিভাবে ফজরের পরেও কোনো নফল নামাজ নেই। তবে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে কোনো নামাজকে উল্লেখ না করে সাধারণভাবে বলেছেন। কাজেই জালেম ইমামের সঙ্গে মাগরিব, ফজর ও আসরের নামাজ না পড়ায় যদি বিপর্যয় ও অত্যাচারের ভয় থাকে তাহলে এ সব নামাজেও ইমামের সাথে শরিক হবে। কেননা, এ ধরনের বিপর্যয় এড়ানোর জন্য মাকরূহ কার্যও মুবাহ। তাই ইমামের সাথে যে সব নামাজ পড়া হবে তা নফলে পরিগণিত হবে এবং জামাতের ছওয়াব পাবে।

وَعَنْ ٥٥٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাজের এক রাকাত পেল, সে যেন পুরো ফজরের নামাজের ওয়াক্ত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাজের এক রাকাত পেল, সে যেন পুরো আসরের নামাজ পেল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত নামাজ পেল সে পূর্ণাঙ্গ নামাজ পেল, অবশিষ্ট রাকাতগুলো তার পূর্ণ করতে হবে না। কিন্তু হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রবিদগণের কেউই এ মত পোষণ করেননি। তাঁদের সকলের মতেই অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

١ - إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ - (بُخَارِىٌّ)

তিনি আরো বলেন–

٢. مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى مَا بَقِىَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَلَمْ يَفُتْهُ الْعَصْرُ .

তিনি আরো বলেন– ٣. مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرٰى .

উল্লিখিত হাদীসত্রয় দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের বা সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত নামাজ পেলে তার পরিপূর্ণ নামাজ পাওয়া হবে না, বরং অবশিষ্ট রাকাতগুলো পূর্ণ করতে হবে।

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান : আলোচ্য হাদীস তথা فَقَدْ أَدْرَكَ الخ দ্বারা বুঝা যায় যে, طُلُوْعُ الشَّمْسِ ও غُرُوْبُ الشَّمْسِ -এর পূর্বে ফজর ও আসরের এক রাকাত পেলে পূর্ণ নামাজ হয়ে যাবে, অবশিষ্ট নামাজ পড়তে হবে না, অথচ অপরাপর হাদীসে দেখা যায় যে, (فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ) তার অবশিষ্ট নামাজ পড়তে হবে। এ উভয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নরূপ। কেননা, উভয়ের মধ্যে মূলত কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

১. যে সব হাদীসে مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً বলা হয়েছে, তাতে فَقَدْ أَدْرَكَ -এর مَعْمُوْل উহ্য রয়েছে তথা–

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلٰوةِ أَىْ فِى الْوَقْتِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ أَوْ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضِيْلَةَ الْجَمَاعَةِ .

২. অথবা, وُجُوْب কথাটি উহ্য রয়েছে তথা فَقَدْ أَدْرَكَ وُجُوْبَ الصَّلٰوةِ তাই পরবর্তীতে তাকে পুরো নামাজ পড়তে হবে অথবা সংক্ষিপ্তাকারে তখন পড়ে নেবে।

৩. অথবা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস ও দলিলে উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে 'সে পেল' এর অর্থ এই যে, যার উপর ইতঃপূর্বে নামাজ ফরজ ছিল না, সে নামাজ পেল। যেমন সে অপ্রাপ্তবয়স্ক, কাফির, ঋতুবতী বা নেফাস-গ্রস্ত ছিল, অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে কিংবা সূর্যাস্তের পূর্বে যথাক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করেছে কিংবা পাক-পবিত্র হয়েছে এবং নামাজের ওয়াক্তের এক রাকাত পরিমাণ সময় পেয়েছে। সুতরাং তার উপর ঐ নামাজ ওয়াজিব হবে। যার ফলে তাকে পরবর্তী সময়ে ঐ নামাজ কাজা পড়তে হবে।

৪. অথবা فَقَدْ أَدْرَكَ হাদীসটি মাসবূকের জন্য বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ইমামের সাথে এক রাকাত পেল, সে জামাতের পরিপূর্ণ ছওয়াব পেল। অতঃপর যদি সূর্য অস্ত যায়, তবে আসরের নামাজ আদায় হয়ে গেল। আর যদি সূর্য উদয় হয়, তবে সে জামাতের ছওয়াব পাবে, কিন্তু ফজরের নামাজ দ্বিতীয়বার কাজা পড়তে হবে।

মুসলিম শরীফের হাদীসও এ কথার সমর্থন করে। যেমন – مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلٰوةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ, যে ইমামের সাথে এক রাকাত নামাজ পেল সে জামাতের পূর্ণ ছওয়াব পেল।

৫. অথবা, কখনো وَقْت সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সন্দেহবশত মানুষ নামাজ কাজা করে ফেলে, এ সন্দেহ নিরসনের জন্য রাসূল ﷺ বলেছেন যে, যদি এক রাকাত পরিমাণ সময় পায়, তবে সুন্নত মোস্তাহাব বাদ দিয়ে ফরজ নামাজ পড়ে নিতে হবে।

৬. شَرْحُ الْمَشَارِقِ নামক কিতাবে এসেছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—

فَقَدْ اَدْرَكَ ثَوَابَ كُلِّ الصَّلٰوةِ بِاِعْتِبَارِ نِيَّتِهٖ لَا بِاِعْتِبَارِ عَمَلِهٖ

৭. অথবা এর জবাব হলো যে, এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ فَقَدْ اَدْرَكَ حُكْمَ الصَّلٰوةِ যেমন কোনো ব্যক্তি মানত করল যে, অমুক স্থানে গিয়ে যদি আসরের নামাজ পাই তবে আমার গোলাম আজাদ; যদি সে ব্যক্তি ঐ স্থানে যাওয়ার পর সূর্যাস্তের পূর্বে এতটুকু সময় পায় যাতে এক রাকাত নামাজ পড়তে পারে, তবে সে নামাজ পেয়েছে বলে ধরে নিতে হবে এবং গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ بُطْلَانِ صَلٰوةِ الصُّبْحِ عِنْدَ الطُّلُوْعِ :

সূর্যোদয়কালীন সময়ে ফজরের নামাজ বাতিল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ : সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকাত আদায় করা পর্যন্ত যদি সময় পাওয়া যায় তবে উক্ত নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে না ; বরং ঐ নামাজকে পূর্ণ করতে হবে। এ কথার উপর সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ - (بُخَارِىْ)

২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : اِذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهٗ - (بُخَارِىْ)

তবে ফজরের নামাজ বাতিল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে,

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ وَ اَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদের মতে যদি ফজর নামাজরত অবস্থায় সূর্য উদিত হয়, তবে উক্ত নামাজ বাতিল হবে না ; বরং অবশিষ্ট নামাজ পূর্ণ করবে।

দলিল–

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : مَنْ اَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهٗ - (بُخَارِىْ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তাঁর দলিল–

১. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَاتَحَرَّوْا بِصَلَوَاتِكُمْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا -

এ ছাড়াও আরো বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে সূর্যোদয়ের সময় নামাজ বৈধ নয়। সুতরাং সূর্যোদয় দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

※ এ ছাড়া যুক্তিমূলক দলিল হলো– اِصْفِرَارُ الشَّمْسِ-এর সময় হচ্ছে আসরের وَقْت نَاقِصْ , আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ও আসরের وَقْت نَاقِصْ-এর সময়। সুতরাং আসরের নামাজ وَقْت نَاقِصْ-এর মধ্যে শুরু ও শেষ উভয়টি হয়েছে। কিন্তু ফজরের পুরো সময় হচ্ছে وَقْت كَامِلْ এতে কোনো وَقْت نَاقِصْ নেই তাই طُلُوْع شَمْس-এর সময় ফজরের নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইমামত্রয়ের দলিলসমূহের জবাব নিম্নরূপ—

১. প্রথম হাদীসের জবাব فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ সংক্রান্ত হাদীসের অনেকগুলো জবাব পূর্বে আলোচনায় দেওয়া হয়েছে।

২. অথবা এটাও বলা যায় যে, সূর্যোদয়ের সময় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদীস مُتَوَاتِرْ-এর পর্যায়ে পৌছেছে কিন্তু নামাজ বৈধ সংক্রান্ত হাদীস এ পর্যায়ে পৌছেনি, সুতরাং বৈধতার হুকুম تَوَاتُرْ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কেননা, নিয়ম হলো– اِذَا تَعَارَضَ الْمُبِيْحُ وَالْمُحَرِّمُ تَسَاقَطَ الْمُبِيْحُ وَتَرَجَّحَ الْمُحَرِّمُ

দ্বিতীয় হাদীসের জবাব : شَرْحُ الْمَشَارِقِ -এর গ্রন্থকার বলেন, فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهٗ -এর অর্থ হলো فَلْيَاْتِ بِهَا عَلٰى وَجْهِ التَّمَامِ। তথা নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করবে। অর্থাৎ অন্য সময়ে তা যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে সেভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করবে। এর অর্থ এই নয় যে, সূর্যোদয়ের সময়ই পূর্ণ করবে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ فَسَادِ الصُّبْحِ بِالطُّلُوْعِ وَعَدَمِ فَسَادِ الْعَصْرِ بِالْغُرُوْبِ সূর্যোদয় দ্বারা ফজর বাতিল হওয়া এবং সূর্যাস্ত দ্বারা আসর বাতিল না হওয়ার মধ্যকার পার্থক্য : হানাফী আলেমগণ এ কথার উপর একমত যে, সূর্যোদয়ের দ্বারা আসরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, তবে সূর্যাস্তের দ্বারা আসরের নামাজ বাতিল হবে না। অথচ হাদীস দ্বারা উভয় নামাজ বাতিল হওয়া প্রমাণিত হয় এবং অপরাপর হাদীস দ্বারা বাতিল না হওয়াটাও স্যাব্যস্ত। হানাফীগণ উভয় নামাজের মধ্যে এ পার্থক্য করার কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১. ফজর নামাজের সম্পূর্ণ সময়টাই সুবহে সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ওয়াক্তে কামেল বা সম্পূর্ণ ওয়াক্ত। এর একটি অংশও নাকেস (অপূর্ণ) নয়। সুতরাং মুসল্লি ফজর নামাজের যে কোনো সময়েই নামাজ আরম্ভ করুক না কেন ঐ সময়টিই কামেল ওয়াক্ত। উসূলের একটি স্বত:সিদ্ধ নিয়ম এই যে, اَلْجُزْءُ الْمُقَارِنُ لِلْاَدَاءِ سَبَبٌ لِوُجُوْبِ اَدَاءِ الصَّلٰوةِ এখন যদি কেউ ফজর ওয়াক্তের শেষ অংশে নামাজ আরম্ভ করে তবে সে কামেল ওয়াক্তে আরম্ভ করল, তাকে কামেলভাবেই আদায় করতে হবে। সুতরাং যেমন ওয়াজিব হয়েছিল তেমন আদায় করা হবে। কিন্তু যদি নামাজে থাকা অবস্থায় সূর্য উদয় হয়ে যায়, তখন কামেল ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে নাকেস ওয়াক্তে এসে পড়ে। এ কারণে যেহেতু তার নামাজ কামেলভাবে আদায় হবে না সেহেতু তার নামাজ বাতিল হবে। কারণ সূর্যোদয়ের সময়টি নাকেস ওয়াক্তের অন্তর্গত। যদি সে কামেল ওয়াক্তে আরম্ভ করে নাসেক ওয়াক্তে শেষ করে তবে যেমন ওয়াজিব হয়েছিল তেমন আদায় হবে না। সুতরাং ঐ নামাজ সিদ্ধ হবে না। পক্ষান্তরে আসরের নামাজের ওয়াক্ত দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন– জোহরের পর হতে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত সময় কামেল ওয়াক্ত। আর এরপর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নাকেস (ত্রুটিযুক্ত) ওয়াক্ত। সুতরাং যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরম্ভ করে এবং সূর্যাস্তের সময় শেষ করে তবে ওয়াজিব ও আদা উভয়ই নাকেস হবে। এ জন্য ঐ নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

২. জোহরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর হতে শুরু করে অবশিষ্ট সময় হলো মাকরূহ ওয়াক্ত। বান্দা এ মাকরূহ ওয়াক্তেও নামাজ আদায়ের জন্য আদিষ্ট। সূর্যাস্ত দ্বারা মাকরূহ ওয়াক্তের সমাপ্তি ঘটে এবং মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। যেহেতু সূর্যাস্ত দ্বারা অন্য এক নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়; তাই সূর্যাস্ত আসরের নামাজ বিনষ্টকারী নয়; কিন্তু সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামাজ বাতিল হবে। কেননা, সূর্যোদয় দ্বারা অন্য কোনো নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না।

৩. তৃতীয়ত সূর্য একাংশ উদিত হলেই সূর্যোদয় হয়েছে বলা হয়, কিন্তু সূর্যের একাংশ অস্ত গেলে غروب বলা হয় না। এ কারণেই আমরা বলি যে. সূর্যোদয়ের দ্বারা ফজরের নামাজ বাতিল হয়ে যাবে, আর সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেলে আসর বাতিল হবে না।

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ ضَيْقِ الْوَقْتِ সংকীর্ণ ওয়াক্তে নামাজ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে মতভেদ :

مَذْهَبُ زُفَرَ رح : ইমাম যুফার (র.)-এর মতে যদি ওয়াক্তের শেষ ভাগে কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বা বালিকা প্রাপ্তবয়সে উপনীত হয় অথবা কোনো অপবিত্রা মহিলা পবিত্রতা লাভ করে কিংবা কাফির মুসলমান হয় অতঃপর এতটুকু সময় না পায় যাতে ঐ ওয়াক্তের নামাজ পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে পারে তবে ঐ ওয়াক্তের নামাজ তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, নামাজের সাথে তার ওয়াক্তের সম্পর্ক سَبَبٌ ও ظَرْفٌ উভয় দিক দিয়েই হয়।

مَذْهَبُ اَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : অধিকাংশ ওলামার মতে যদি এক রাকাত আদায় করা পরিমাণ সময় পাওয়া যায় তবু ঐ ওয়াক্তের নামাজ ওয়াজিব হবে। যদি সে সময় আদায় করতে পারে তবে তো ভালই, নতুবা কাজা করতে হবে। তাঁদের দলিল–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইমাম যুফারের মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাঁর মতটি সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসের বিপরীত. আর যুক্তিমূলক কথা শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন কুরআন ও হাদীস হতে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

وَعَنْهُ ٥٥٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلٰوتَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আসরের এক সেজদা [তথা এক রাকাত] পায় সে যেন তার নামাজকে পূর্ণ করে নেয়। এমনিভাবে সূর্য উদয়ের পূর্বে যদি এক সেজদা পায় তবে সে যেন তার নামাজকে পূর্ণ করে নেয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طُلُوْعُ الشَّمْسِ وَغُرُوْبُهَا مُبْطِلُ الصَّلٰوةِ أَمْ لَا : **সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নামাজ বাতিলকারী কি না?** হানাফীদের মতে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সকল নামাজকেই বাতিল করে না। কেননা, সেদিনের ফজরের নামাজ সূর্যোদয়ের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়; কিন্তু সূর্যাস্তের কারণে সেদিনের আসরের নামাজ বাতিল হয় না। এ ছাড়া অন্য সকল নামাজই এ সময়ে নিষিদ্ধ, এমনকি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বি-প্রহরের সময় [আসর ব্যতীত] সকল নামাজ নিষিদ্ধ। উল্লিখিত সময়ে জানাজার নামাজ পড়াও নিষিদ্ধ। কেননা, ফরজে কিফায়ার স্থান ফরজে আইনের নিচে। সুতরাং যেখানে ফরজে আইন নিষিদ্ধ সেখানে ফরজে কিফায়া তো শুদ্ধ হবেই না।

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِيْ أَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الْمَنْهِيَّةِ : **নিষিদ্ধ তিন সময়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** নিষিদ্ধ তিন সময়ে নামাজ প্রসঙ্গে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : শাফেয়ী ইমামগণের মতে নিষিদ্ধ তিন সময়ে সকল নামাজ নিষিদ্ধ, তবে ফরজ নামাজ নিষিদ্ধ নয়। তাঁরা নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসটিকে নফলের উপর প্রয়োগ করেছেন। তাই তাঁদের মতে সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামাজ এবং সূর্যাস্তের সময় আসরের নামাজ উভয়টিই শুদ্ধ হবে। তাঁরা তাঁদের মতের সমর্থনে উল্লিখিত হাদীসটি পেশ করেন।

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : হানাফীদের মতে উল্লিখিত তিন সময়ে ফরজ ও নফল সকল প্রকারের নামাজ নিষিদ্ধ। তাঁদের দলিল হলো—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهَا مَوْتَانَا عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتّٰى تَزُوْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفَ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ -

তবে কিয়াসের ভিত্তিতে সেদিনের আসরের নামাজ সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেলে শুদ্ধ হবে। কেননা, তা নাকেসরূপে ওয়াজিব হয়েছে এবং নাকেসরূপে আদায় হয়েছে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে কোনো নামাজ ফরজ হোক বা নফল, এ তিন সময়ে পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

وَعَنْ ٥٥٥ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যদি কেউ কোনো নামাজ পড়তে ভুলে যায় অথবা তা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তবে তার প্রতিবিধান হলো যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নেবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, এটা ব্যতীত তার কোনো প্রতিকারই নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে সাহাবীগণ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন, নিদ্রিত অবস্থার উপর

কোনো কড়াকড়ি নেই। অপরাধ হবে জাগ্রত অবস্থার উপরই। তখন মহানবী ﷺ এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। –[তিরমিযী ও নাসায়ী]

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে যায় অথবা নামাজের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার কাফ্ফারা এটা হবে যে, যখনই তার স্মরণ হবে অথবা জাগ্রত হবে তখনই সে নামাজ পড়ে নেবে। এতে সে ব্যক্তি অপরাধী হবে না। কেননা, সে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পড়তে দেরি করেনি। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো নামাজ ভুলে যাওয়ার অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় নামাজের সময় চলে যাওয়ার হুকুম কি? সুতরাং আমাদের জীবনেও অপরিহার্য কর্তব্য নামাজের ব্যাপারে এরূপ কোনো অবস্থা আসলে জাগ্রত হলে বা নামাজের কথা স্মরণে আসা মাত্রই আমাদেরকে নামাজ পড়ে নিতে হবে। এতে নামাজের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে এবং এরূপ নামাজ আদায়কারী কোনোরূপ অপরাধী হবে না। কেননা, এতে বান্দার অনিচ্ছাকৃত ভাবে নামাজে দেরি হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কাজা নামাজের বিধান সাব্যস্ত হলো।

وَعَنْ ٥٥٦ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلٰوةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিদ্রায় কোনো ত্রুটি নেই; ত্রুটি হলো জাগরণে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোনো নামাজ ভুলে যায় অথবা তা না পড়ে নিদ্রা যায় যখনই তা স্মরণ হয় পড়ে নেবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর আমার স্মরণে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে ফিকহবিদদের মতামত : নিষিদ্ধ সময়সমূহ তথা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরে নফল নামাজ পড়া নিষিদ্ধ ; এমনিভাবে সে সময়ে কোনো কাজা নামাজ পড়াও জায়েজ নেই। তবে সেদিনের ফজর ও আসরের নামাজ জায়েজ কি না? এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র.)-এর মতে ঐ দিনের ফজরের নামাজ সূর্যোদয়ের সময় এবং আসরের নামাজ সূর্যাস্তের সময় আদায় করা জায়েজ আছে। তাঁরা দলিল হিসেবে فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا হাদীসকে পেশ করেন। কেননা, উক্ত হাদীসে মুতলকভাবে নামাজ পড়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে, উক্ত নিষিদ্ধ তিন ওয়াক্তে সব রকমের নামাজ পড়া নিষিদ্ধ [তবে স্বতন্ত্র একটি কারণে শুধু আসরের নামাজ জায়েজ]। কেননা, নিষিদ্ধ তিনটি সময় এই হাদীস হতে স্বতন্ত্র, তিনটি সময়ে নামাজ পড়ার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞাই তার স্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ। এ ছাড়া হাদীসটি প্রকাশ্য অর্থে যদিও নিঃশর্ত বলে বুঝা যায়, প্রকৃতপক্ষে তা শর্তযুক্ত। আর এখানে শর্তটি উহ্য রয়েছে, আর তা হলো اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْاَوْقَاتِ الْمَكْرُوْهَةِ তা হলে হাদীসের অর্থ হবে, যখন স্মরণ পড়বে তখনই নামাজ পড়বে, তবে শর্ত হলো তা যেন নিষিদ্ধ সময়গুলোতে না হয়। এতদ্ব্যতীত এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যখনই স্মরণ পড়বে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়ে শুধু নামাজ পড়বে; বরং সকলেই বলেন যে, শর্তাবলি সাপেক্ষে যেমন অজু করে, সতর ঢেকে ও অপবিত্রতা হতে মুক্ত হয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে নেবে। ফলে উক্ত হাদীসকে শর্তহীন বলা চলে না। উল্লিখিত শর্তাবলি উহ্য আছে বলে সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের হানাফীদের মতে সূর্যাস্তের সময় সে দিনের আসর নামাজ পড়া জায়েজ হবে। কেননা, আসরের শেষ ওয়াক্ত নাকেস ওয়াক্ত। অতএব যেভাবে নামাজ নাকেস ওয়াক্তে ওয়াজিব হয়েছিল তেমনি আদায় হয়েছে। এ ছাড়া সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি ফরজ ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেছে, মাঝখানে কোনো বৃথা সময় রচনা করেনি। কাজেই সে দিনের আসরের নামাজ পড়া জায়েজ হবে।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ -এর মর্মার্থ : আল্লামা তীবী বলেন, আলোচ্য আয়াতটি কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তবে এখানে এমন একটি অর্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে বর্ণিত হাদীসটির সাথে এর পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হবে নিম্নরূপ—

১. اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ اَىْ وَقْتَ ذِكْرِهَا অর্থাৎ, ل বর্ণটি ওয়াক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, নামাজের স্মরণই আল্লাহর স্মরণকে অপরিহার্য করে তোলে।

২. অথবা এর অর্থ হলো এখানে مُضَافٌ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِ صَلٰوتِىْ

৩. অথবা এখানে صَلٰوة-এর যমীর ব্যবহার না করে اَللّٰهُ-এর যমীর ব্যবহার করে নামাজের সম্মান ও মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلتَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেন, ঘুমে কোনো ত্রুটি নেই, ত্রুটি হলো জাগরণে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিদ্রায় কাতর হয়ে নামাজের সময়ের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সময় থাকতে জাগ্রত হলো না, এতে তার কোনো দোষ বা অপরাধ হবে না। তবে জাগরিত হওয়ার পরও যদি সে তাড়াতাড়ি নামাজ আদায় না করে, বরং অলসতা করে তবে এটাই হবে দোষ বা অপরাধের কারণ। اَلتَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর মূল নাম হলো, আল-হারেছ অথবা নো'মান অথবা আমর, কুনিয়ত বা উপনাম আবূ কাতাদা। পিতার নাম-রিবঈ ইবনে বুলদামা। তিনি উপনামেই মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি হুজুর ﷺ-এর একজন সাহাবী।

২. **নসবনামা বা বংশধারা :** আবূ কাতাদা আল-হারেছ ইবনে রিবঈ ইবনে বুলদামা ইবনে খুনাছ ইবনে সিনান ইবনে উবাইদ ইবনে আদী ইবনে গানাম ইবনে কায়াব ইবনে সিলমা আস-সালামী আল-মাদানী আল-আনাসারী।

৩. **বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ :** তিনি যে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি এ ব্যাপারে সকলে একমত না হলেও অংশ গ্রহণ না করার বর্ণনাই প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। তিনি উহুদ, খন্দক ও তার পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৪. **তাঁর হাদীসের সংখ্যা :** তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭০ খানা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে তাঁর বর্ণিত ১১খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে ২খানা, ইমাম মুসলিম ৮খানা হাদীস স্ব-স্ব সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৫. **এ নামে অন্য সাহাবী :** হারেছ নামে সাহাবায়ে কেরামের অনেককে পাওয়া গেলেও তিনি এ নামে ইলমে হাদীস বর্ণনায় পরিচিত নন; বরং আবূ কাতাদা নামেই পরিচিত। আবূ কাতাদা নামে তিনি ব্যতীত কোনো সাহাবীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

৭. **ইহলোক ত্যাগ :** তিনি ৫৪ হিজরি মতান্তরে হযরত আলীর খেলাফতের যুগে ৭০ বৎসর বয়সে মদীনাতে মতান্তরে কূফা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلٰثٌ لَاتُؤَخِّرْهَا اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًّا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে আলী! তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না। (১) নামাজ– যখন তার সময় আসে। (২) জানাযা– যখন তা উপস্থিত হয়। (৩) স্বামীহীনা রমণীর বিবাহদান, যখন তুমি সমপর্যায়ের বর পাও। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসাংশের অর্থ হলো যখন নামাজের সময় হয়, অর্থাৎ নামাজের সময় হলে ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা ঠিক নয়। এর দ্বারা নিষিদ্ধ সময়সমূহ এর থেকে বের হয়ে যাবে। কেননা, এগুলো নামাজের সময় নয়।

اَلْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ-এর অর্থ : এর অর্থ হলো জানাযা যখন উপস্থিত হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাকরূহ সময়ে জানাযা উপস্থিত হলেও ঐ সময় নামাজে জানাযা পড়া মাকরূহ নয়। তবে মাকরূহ সময়ের পূর্বে উপস্থিত জানাযা মাকরূহ সময়ে পড়লে তা মাকরূহ হবে বলে ফকীহগণ মত ব্যক্ত করেছেন, আর সিজদায়ে তিলাওয়াতও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তবে সুবহে সাদেকের পূর্বে কিংবা পরে এবং আসরের পরে নামাজে জানাযা ও সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ নয়।

اَلْاَيِّمُ-এর অর্থ : اَلْاَيِّمُ শব্দটি اِسْم صِفَتْ বহুবচনে اَيِّمُوْنَ - اَيِّمَاتٌ - اَيَامٰى ও اَيَائِمُ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেছেন, স্বামীহীনা নারীকে أَيِّمٌ বলা হয়। কুমারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

مَعْنَى الْكُفُوْءِ وَبِاَيِّ شَيْءٍ تُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِى النِّكَاحِ কুফূ–এর অর্থ এবং বিবাহে কোন কোন বিষয়ে সমতা বিবেচ্য : اَلْكُفُوْءُ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন– اَكْفَاءٌ শাব্দিক অর্থ– অনুরূপ, সাদৃশ্য, সমকক্ষ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সমতা থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় كُفُو বা সমকক্ষতা বলা হয়।

বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ে সমতা থাকা প্রয়োজন : (১) নসব বা বংশগত ঐতিহ্য। সে হিসেবে একজন কোরেশ অপরজন কোরেশের জন্য كُفُوْء বা সমকক্ষ। আর অনারবগণ যেহেতু বংশগত ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি; বরং বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, সেহেতু প্রত্যেক অনারব মুসলমান পরস্পরের সমকক্ষ। (২) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে একে অন্যের সমকক্ষ হওয়া। সুতরাং ধর্মভীরু ও সীমালঙ্ঘনকারী পরস্পরের সমকক্ষ হবে না। (৩) ইসলাম। যার পিতা ও পিতামহ মুসলমান, সে পুরুষ এমন মহিলার জন্য সমকক্ষ বিবেচিত হবে, যার পূর্বপুরুষ মুসলমান। আর যার শুধুমাত্র পিতা মুসলমান, সে পুরুষ এমন মহিলার সমকক্ষ বিবেচিত হবে না, যার পূর্বপুরুষ মুসলমান। (৪) স্বাধীনতা। সুতরাং ক্রীতদাস, স্বাধীনতার চুক্তি সম্পাদনকারী, মনিবের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পুরুষ পূর্ণ স্বাধীন মহিলার সমকক্ষ হবে না। (৫) সম্পদ অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দানে সক্ষমতা। সুতরাং যে পুরুষ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দানে সক্ষম সে সম্পদশালিনী মহিলার সমকক্ষ হবে। (৬) পেশা। সুতরাং তাঁতি, জেলে, নাপিত ও ঝাড়ুদার অভিজাত পেশা-জীবী ও ব্যবসায়ীর সমকক্ষ হবে না।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি** : তাঁর নাম আলী, কুনিয়াত বা উপনাম আবুল হাসান ও আবূ তুরাব। উপাধি আসাদুল্লাহ্, হায়দার, মুরতাযা। পিতার নাম আবূ তালিব, মাতার নাম ফাতিমা। উভয়ে কুরায়েশ বংশের শাখা হাশেমী বংশোদ্ভূত। সাহাবী ও বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত।

২. **নসবনামা বা বংশধারা** : আলী ইবনে আবী তালেব ইবনে আবদিল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ।

৩. **জন্ম** : তিনি মহানবী ﷺ-এর নবুয়ত লাভ করার দশ বৎসর পূর্বে হাশেমী বংশের আবূ তালিবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।

৪. **ইসলাম গ্রহণ** : একদা হযরত খাদীজা (রা.) হুজুর ﷺ সহ নামাজ আদায় করছেন। ইত্যবসরে হযরত আলী (রা.) তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এভাবে কি করছেন। তখন তাঁর বয়স এগারো বৎসর। এ মুহূর্তে হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, এক আল্লাহর ইবাদত করছি এবং তোমাকেও সে দাওয়াত দিচ্ছি। তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

৫. **হযরত ফাতেমার সাথে বিবাহ** : হিজরি দ্বিতীয় সনে রাসূলে কারীম ﷺ-এর কলিজার টুকরা, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

৬. **রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে সম্পর্ক** : প্রথমত কথা হলো, হযরত আলীর পিতা আবূ তালিব, হুজুর ﷺ-এর আপন চাচা। অতএব তিনি তাঁর চাচাত ভাই। আবার দীনের দিক হতে হুজুর ﷺ তাঁকে ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর চাচা গরিব হওয়ার কারণে তিনি ছোটকাল হতেই তাঁর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। অপর দিকে তাঁর জামাতা। নবী করীম ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেন– اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

৭. **মদীনায় হিজরত** : হুজুর ﷺ আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.)-কে নিজ বিছানায় শায়িত রেখে যান, যাতে তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানত তিনি মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারেন। হিজরতের তিন দিন পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

৮. **বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ** : রাসূল ﷺ-এর যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে তাবূক যুদ্ধ ছাড়া তিনি সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেন। খায়বার অভিযানে তিনিই সুদৃঢ় দুর্গগুলো পদানত করেন।

৯. **রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন** : হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টা ছিলেন. হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত আমলে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শদাতা ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) ইন্তেকাল করার পর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পান এবং প্রায় পাঁচ বৎসর এ দায়িত্ব পালন করেন।

১০. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা** : তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হতে ৫৮৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে আনা হয়েছে ২০ খানা। বুখারী এককভাবে ৯ খানা ও মুসলিম এককভাবে ১৫ খানা হাদীস উল্লেখ করেছেন।

১১. **শাহাদাত বরণ** : ৪০ হিজরির ১৭ই রমজান শনিবার ভোরে তিনি যখন আস্-সালাত বলে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন ইবনে মুলজিম নামক খারেজী আততায়ী শাণিত তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করে এবং এতে তিনি ঐ দিনই শাহাদাত বরণ করেন।

১২. **নামাজে জানাযা** : তাঁর পুত্র হযরত হাসান তাঁর নামাজে জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে কূফা জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। কারো মতে তাঁকে নাজফে আশরাফে দাফন করা হয়।

---

৫৫৮ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৫৮. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নামাজের প্রথম সময় হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, আর শেষ সময় হলো আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা [তথা পাপ হতে কোনো রকম বাঁচা]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ-এর অর্থ : উক্ত হাদীসে প্রথম ওয়াক্ত বলতে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন যে, এর অর্থ হলো, ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার পর শীঘ্রই নামাজ আদায়করণ।

رِضْوَانُ اللّٰهِ-এর মর্মার্থ : رِضْوَانُ اللّٰهِ এর অর্থ হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। ওয়াক্তের প্রথমভাগে নামাজ আদায় করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ। কেননা, প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করার মাধ্যমেই মহান আল্লাহর বাণী– فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَ سَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ الخ প্রভৃতি আয়াতের উপর আমল করা হয়।

وَقْتُ الْاٰخِرِ-এর মর্মার্থ : اَلْوَقْتُ الْاٰخِرُ-এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. এমন সময়, যখন নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে বলে আশংকা হয়।

২. মাকরূহ সময়। যেমন– সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের নামাজ পড়া, অর্ধরাত্রি অতিক্রম করার পর ইশার নামাজ আদায় করা।

আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, ফজরের নামাজকে উষা খুব পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত, আসরের নামাজকে সূর্যের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এবং ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করা উত্তম। কেননা, বিলম্বে আদায় করার মধ্যে দু'টি উপকারিতা রয়েছে—

১. নামাজের অপেক্ষায় থাকার ছওয়াব,

২. জামাতে নামাজির সংখ্যা অধিক হওয়ার ছওয়াব।

عَفْوُ اللّٰهِ-এর অর্থ : عَفْوٌ শব্দটি অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ এখানে اَلْعَفْوُ শব্দের অর্থ– অতিরিক্ত। অর্থাৎ, নিজের ও পরিবারের জন্য যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বস্তু খরচ করা। সুতরাং হাদীসাংশের মর্মার্থ হবে فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ فَضْلُ اللّٰهِ كَثِيْرٌ তবে এখানে عَفْوٌ শব্দটি ক্ষমা অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٥٥٩ أُمِّ فَرْوَةَ (رضـ) قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يُرْوَى الْحَدِيْثُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ ـ

৫৫৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে ফারওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন কাজ অধিক উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, নামাজকে তার প্রথম সময়ে আদায় করা। –[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ] আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর আলওমারী ব্যতীত আর কারও থেকে বর্ণিত নয়। আর হাদীসবিদদের নিকট তিনি শক্তিশালী নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ الْوَقْتِ-এর অর্থ : বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনুল মালেক বলেন– لِاَوَّلِ الْوَقْتِ-এর لَامْ বর্ণটি فِىْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ اَلصَّلٰوةُ فِىْ اَوَّلِ الْوَقْتِ মুহাম্মদ ইবনে আলী আত-তীবী (র.) বলেন, لَامْ বর্ণটি তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে. لَامْ টি وَقْت অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী– قُمْتُ لِحَيَاتِىْ-এর মধ্যে لَامْ টি وَقْت অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এখানে وَقْت-এর উল্লেখ রয়েছে। অনুরূপভাবে قَبْل অর্থেও ব্যবহৃত হয়নি, যেমন আল্লাহর বাণী– فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ-এর মধ্যে لَامْ টি قَبْل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এখানে اَوَّلُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কাজেই এখানে لَامْ টি তাকীদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে, এটাই সঠিক অভিমত।

এখানে প্রথম ওয়াক্ত বলতে মোস্তাহাব ওয়াক্তের প্রথম ওয়াক্ত বুঝানো হয়েছে। এটাই হানাফীদের অভিমত।

وَعَنْ ٥٦٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৬০. সরল অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'বার কোনো নামাজকে তার শেষ সময়ে পড়েননি, এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তুলে নিয়েছেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিশেষ ওজরবশত বা আকস্মিক কোনো ঘটনাবশত কারণ ছাড়া রাসূল ﷺ অভ্যাসগতভাবে কখনও শেষ ওয়াক্তে নামাজ পড়েননি, এখানে হযরত আয়েশা (রা.) নবীম করী ﷺ-এর একবার হযরত জিবরাঈল ﷺ-এর সাথে শেষ সময়ে নামাজ পড়া, আর একবার এক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নামাজ পড়াকে বাদ দিয়ে অপর সময়ের কথা বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত হাদীসত্রয়ে যে প্রথম ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এর অর্থ উত্তম সময় তথা মোস্তাহাব সময়ের প্রথম ওয়াক্ত।

وَعَنْ ٥٦١ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ)

৫৬১. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত সর্বদা কল্যাণে থাকবে অথবা তিনি বলেছেন সর্বদা উত্তম স্বভাবের উপর থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাগরিবের নামাজ তারকা ঘন হয়ে ওঠা পর্যন্ত বিলম্ব না করবে। –[আবূ দাঊদ; কিন্তু দারেমী এ হাদীস আব্বাস হতে বর্ণনা করছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَايَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে فِطْرَة দ্বারা উদ্দেশ্য স্থায়ী উত্তম স্বভাব অথবা ইসলাম বর্ণনাকারীর সন্দেহ ছিল যে, রাসূল ﷺ بِخَيْرٍ বলেছেন, নাকি عَلَى الْفِطْرَةِ বলেছেন, এ কারণে او কথাটি বলেছেন।

اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ-এর অর্থ : বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইবনুল মালেক বাক্যটির অর্থ করেছেন যে, يَظْهَرُ جَمْعُهَا وَيَخْتَلِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ অর্থাৎ, তারকারাজি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়া এবং পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়া, অর্থাৎ তারকারাজি ঘন নিবিড় হয়ে উঠা।

উক্ত হাদীস হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মাগরিবের নামাজ তারকারাজি ঘন নিবিড় হয়ে উঠা পর্যন্ত দেরি করে পড়া অনুচিত। শরহে সুন্নহ গ্রন্থে এসেছে যে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তৎপরবর্তী আলিমগণ মাগরিবের নামাজ শীঘ্রই পড়তেন। তবে কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ মাগরিবের নামাজ বিলম্বে আদায় করেছেন, তা ছিল বৈধতা বর্ণনার জন্য।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম খালেদ, কুনিয়াত আবূ আইয়ূব। পিতার নাম যায়েদ ইবনে কুলাইব। বনি নাজ্জার গোত্রোদ্ভূত। মদিনার অধিবাসী, মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন।

২. **নসবনামা :** আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব ইবনে ছা'লাবা ইবনে আবদে আউফ ইবনে গান্‌ম আল-আনসারী আল-নাজ্জার আল-খাযরাজী।

৩. **আকাবায়ে ছানিয়ায় অংশগ্রহণ :** হযরত আবূ আইয়ূব আল-আনসারী মদিনার মুসলমানদের পক্ষ হতে হিজরতের পূর্বে দ্বিতীয় আকাবাতে হুজুর ﷺ -এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

৪. **বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ :** হযরত আবূ আইয়ূব বদর যুদ্ধসহ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সমূহে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণটি যুদ্ধাহত হওয়া হতেই সৃষ্ট। তিনি সকল যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে [যা তাঁর যুগে হয়েছিল] ছিলেন।

৫. **তাঁর ঘরে হুজুরের পদার্পণ :** মক্কা হতে হুজুর ﷺ যখন মদীনাতে হিজরত করেন তখনই মদীনার লোকেরা তাঁর আগমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি মদীনায় পৌঁছার সাথে সাথে মুলসমান আনসাররা স্ব-স্ব গৃহে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার মত ব্যক্ত করেন। এ সমস্যা দেখা দিলে হুজুর ﷺ সমাধানার্থে বলেন, তাঁর উট যেখানে স্বেচ্ছায় বসবে সেখানেই তিনি অবতরণ করবেন। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর উট হযরত আবূ আইয়ূব আনসারীর বাড়িতে গিয়ে বসে এবং তিনি তাঁর বাড়িতে অবতরণ করেন ও তথায় তিনি একমাস অবস্থান করেন।

৬. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫০ খানা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সমভাবে তাঁর বর্ণিত ৭ খানা হাদীস এবং ইমাম বুখারী এককভাবে তাঁর বর্ণিত একখানা হাদীস উল্লেখ করেছেন।

৭. **ইহলোক ত্যাগ :** হিজরি ৫০ মতান্তরে ৫১ তে তিনি কুস্তুনতুনিয়াতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু গাজী অবস্থাতে হয়েছে। ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার সাথে কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে অসুস্থ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি সকলকে অসিয়ত করে বলেন, "আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন তোমরা আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে। যেই মাত্র তোমরা শত্রু সৈন্যদের সাথে মোকাবিলার জন্য সারিবদ্ধ হবে তখন তোমরা আমাকে তোমাদের পায়ের নিচে দাফন করবে।" এ অসিয়ত মোতাবেক তাকে দাফন করা হয়।

---

٥٦٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৬২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতে আদেশ প্রদান করতাম।–[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَوْلَا كَرَاهَةُ الْمَشَقَّةِ عَلٰى اُمَّتِىْ الخ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসের অর্থ হলো لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ অর্থাৎ, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হওয়া আমার অপছন্দনীয় না হতো, ত তবে আমি ইশার নামাজ বিলম্ব করে পড়ার আদেশ প্রদান করতাম। তথা বিলম্ব করে পড়া ওয়াজিব করে দিতাম।

নবী করীম ﷺ কেন ইশাকে দেরি করা ছেড়ে দিলেন? ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। প্রায় সকলেই সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতেন, ফলে সন্ধ্যার পরপরই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কোনো কোনো বর্ণনায় এটাও পাওয়া যায় যে, তারা মসজিদে বসে ঘুমাতেন। ফলে রাসূল ﷺ তাদের এ কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে কাঙ্ক্ষিত সময় পর্যন্ত ইশার নামাজকে দেরি করা পরিহার করেছেন। বস্তুত ইশার নামাজ দেরি করে পড়া মোস্তাহাব, এ হুকুম এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এরূপ সময়ে পড়া কষ্টকর হওয়া মনে না করলে রাসূল ﷺ তা ওয়াজিব করে দিতেন।

اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ -এর অর্থ : কারো মতে এর সম্পর্ক হলো গ্রীষ্মকালের সাথে। আর اَوْ نِصْفِهٖ -এর সম্পর্ক হলো শীতকালের সাথে। আবার কারো মতে যে কোনো কালই হতে পারে, নির্দিষ্ট কোনো কালের সাথে এ হুকুম খাস নয়। কিছুসংখ্যক বলেন, এখানে বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে সন্দেহ হয়েছিল। তথা বর্ণনাকারীর এ সন্দেহ ছিল যে, রাসূল ﷺ ثُلُثُ اللَّيْلِ বলেছেন, নাকি نِصْفِهٖ বলেছেন, এ কারণেই اَوْ বলেছেন।

وَعَنْ ٥٦٣ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৬৩. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- তোমরা এ নামাজকে [ইশাকে] দেরি করে পড়। কেননা, এ নামাজ দ্বারা তোমাদেরকে সকল [নবীর] উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে কোনো উম্মত এ নামাজ পড়েনি। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ-এর অর্থ : উক্ত হাদীসাংশে اَعْتِمُوْا শব্দটি اَمْر বা নির্দেশসূচক, অর্থ হবে اُدْخُلُوا الْعَتَمَةَ অর্থাৎ, রাতের অন্ধকারে প্রবেশ কর। এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা খলীল (র.) বলেন, شفق অদৃশ্য হওয়ার পরবর্তী সময়কে عَتَمَةَ বলা হয়। হাদীসের অর্থ : صَلُّوْهَا بَعْدَ مَا دَخَلْتُمُ الظُّلْمَةَ وَ تَحَقَّقَ لَكُمْ سُقُوْطُ الشَّفَقِ অর্থাৎ, তোমরা অন্ধকারে প্রবেশ করার পর যখন شَفَقْ পুরোপুরিভাবে অদৃশ্য হবে তখন ইশার নামাজ আদায় কর। এ সময়ের পূর্বে যদি আদায় করা হয় তবে এটা ওয়াক্তের পূর্বেই আদায় করা হবে। এ আলোচনার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় না যে, ইশার নামাজ বিলম্বে আদায় করা উত্তম, বরং এখানে ইশার প্রথম ওয়াক্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

তিনি আরও বলেন, এখানে এটাও হতে পারে যে, اَعْتِمْ শব্দটি عَتَّمَ হতে উদ্ভূত। অর্থ- বিলম্ব করা। যেমন- বলা হয় اَعْتَمَ الرَّجُلُ قِرٰى ضَيْفِهٖ فِى اللَّيْلِ اِذَا اَخَّرَ রাতে বিলম্ব করে অতিথিকে খানা খাওয়ানো। এ অবস্থায় হাদীসের অর্থ হলো তোমরা ইশার নামাজ বিলম্বে আদায় কর। তাই বুঝা যাচ্ছে যে, ইশার নামাজ বিলম্বে আদায় করা উত্তম।

اَلدَّفْعُ وَالتَّعَارُضُ দ্বন্দ্ব ও সমাধান :

দ্বন্দ্ব : মু'আয ইবনে জাবালের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে হাদীসে জিবরাঈলে বর্ণিত هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী নবীদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই ফরজ ছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিম্নরূপ :

সমাধান :

১. ইশার নামাজ পূর্ববর্তী কোনো নবীর উম্মতের উপর ফরজ ছিল না। তবে নবীদের উপর ফরজ ছিল। যেমন- তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূল ﷺ-এর উপর ফরজ ছিল, কিন্তু উম্মতের উপর ফরজ বা ওয়াজিব নয়।

২. অথবা বলা যায় যে, পূর্ববর্তীগণও ইশার নামাজ পড়তেন, তবে আমাদের ন্যায় তারা পড়তেন না, বরং তাদের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন।

৩. অথবা ইশার নামাজ ফরজ হিসাবে শুধু এ উম্মতের জন্যই খাস, পূর্ববর্তীদের জন্য এটা ছিল সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার।

৪. অথবা হাদীসে জিব্রাঈলে هٰذَا দ্বারা ফজরের নামাজকে বিলম্ব করে উজ্জ্বল প্রত্যুষে পড়ার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম কোন নবী কোন নামাজ পড়েছেন : তাহাবী শরীফে আছে যে,

১. হযরত আদম (আ.)-এর তওবা ফজরের সময়ে কবুল হয়েছে, এ জন্য আদম (আ.) ফজরের নামাজ পড়েছিলেন।

২. ইব্রাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি দিয়েছিলেন জোহরের সময়, যখন ইসমাঈলের স্থলে দুম্বা এসেছে তখন ইসমাঈলের বেঁচে যাওয়ার শুকরিয়া আদায় করণার্থে তিনি জোহরের চার রাকাত নামাজ পড়েছেন।

৩. হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আসরের সময় পুনর্জীবিত করা হয়েছে, তখন তিনি আসরের নামাজ পড়েছেন।

৪. দাউদ (আ.)-এর মাগফিরাত মাগরিবের সময়ে হয়েছে, তখন তিনি মাগরিবের তিন রাকাত নামাজ পড়েছেন।

৫. ইশার নামাজ সর্বপ্রথম আমাদের নবীর উপরই ফরজ করা হয়েছে।

---

٥٦٤ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৬৪. **অনুবাদ :** হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই নামাজ তথা ইশার নামাজের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। নবী করীম ﷺ তৃতীয় তারিখের চাঁদ অস্তমিত হলে এটা পড়তেন। -[আবূ দাঊদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنَا اَعْلَمُ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ **-এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসটিতে হযরত নু'মান ইবনে বাশীরের اَنَا اَعْلَمُ দাবিটি কখনো তার অহঙ্কারের পরিচায়ক নয়; বরং এটা تحديث بالنعمة -এর অন্তর্ভুক্ত অথবা এ বাক্যটির দ্বারা হাদীসটির প্রতি শ্রোতাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি হাদীসটি এমন এক সময়ে বর্ণনা করেছেন যখন বিশিষ্ট সাহাবীদের কেউই জীবিত ছিলেন না।

صَلٰوةُ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ **-এর অর্থ :** নবী করীম ﷺ-এর যুগে মাগরিবের নামাজকে প্রথম ইশা, আর ইশার নামাজকে عِشَاء اٰخِرَة বা শেষ ইশা বলা হতো।

لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ**-এর অর্থ :** এখানে "ل" বর্ণটি وَقْت বা সময় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর অর্থ হলো غُرُوْب বা অস্তমিত হওয়া। অতএব سُقُوْطُ الْقَمَرِ দ্বারা চন্দ্র অস্তমিত হওয়া উদ্দেশ্য। আর لِثَالِثَةٍ দ্বারা মাসের তৃতীয় রাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ চান্দ্রমাসের তৃতীয় রাতে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে রাসূল ﷺ ইশার নামাজ পড়তেন।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ **বর্ণনাকারীর পরিচিতি :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম নু'মান, কুনিয়াত বা উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ্, পিতার নাম বাশীর ইবনে সা'দ, মাতার নাম আমরা বিনতে রাওয়াহা। তিনি এবং তাঁর পিতা ও দাদী সাহাবী ছিলেন। তিনি খাযরাজ বংশোদ্ভূত।

২. **জন্মলাভ :** নবী করীম ﷺ মদীনাতে হিজরত করার চৌদ্দ মাস পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পরে সর্বপ্রথম আনসারদের সন্তানের মাঝে তিনি প্রথম। নবী করীম ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স আট বছর সাত মাস। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর এবং তিনি একই সনে অর্থাৎ হিজরি দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। তবে হযরত নু'মান ইবনে বাশীর হযরত ইবনে যুবাইর হতে বয়সে ছয় মাসের বড়।

৩. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সংখ্যা হলো ১১৪ [একশত চৌদ্দ] খানা। তাঁর নিকট হতে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তাঁর ছেলে মুহাম্মদ ও হযরত আমের আশ্'শা'বী উল্লেখযোগ্য।

৪. **শাহাদাত বরণ** : ৬৫ হিজরিতে দামেশক এবং হিমস-এর মধ্যবর্তীস্থানে তাঁকে হত্যা করা হয়। মিশকাতের আসমাউর রিজালে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাহায্যার্থে ডাকা হলো তখন হিমসবাসিরা তাঁকে তলব করে এবং তাঁকে ৬৫ হিজরিতে হত্যা করে।

হযরত আলী ইবনে ওসমান আন্ নাওফালী হযরত আবূ মুছহিবের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) হিমস নগরীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের নির্বাচিত আমেল ছিলেন। যখন হিমসবাসিরা তাঁর উপর চড়াও হলো, তখন তিনি পলায়ন করলেন। তখন খালেদ ইবনে খালী আল-কালায়ী তাঁকে অনুসরণ করে ও পথিমধ্যে হত্যা করে।

হযরত মুফাদ্দাল ইবনে গাস্সান আল-গালাবী বলেন, সালামিয়া নামক স্থানে ৬৬ হিজরিতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

---

٥٦٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ)

৫৬৫. **অনুবাদ** : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা ফর্সা করে ফজরের নামাজ পড়। কেননা, এতে অধিক ছওয়াব রয়েছে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারেমী ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী শরীফে এ অংশটি নেই যে, এতে অত্যধিক ছওয়াব রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, ফজরের নামাজ অন্ধকারে না পড়ে আলোতে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে হযরত মু'আয (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِذَا كَانَ فِى الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَاَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيْقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلَّهُمْ وَاِذَا كَانَ فِى الصَّيْفِ فَاَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَاِنَّ اللَّيْلَ قَصِيْرٌ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَاَمْهِلْهُمْ حَتّٰى يُدْرِكُوْا -

আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ফজরের নামাজ শীত ঋতুতে অন্ধকারে পড়া এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে আলোতে পড়া উত্তম। বস্তুত এ হাদীসটির উপর আমল করলে আলো ও আঁধার সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসেরই একটা সমাধান হয়ে যায়।

ফজর নামাজের মোস্তাহাব ওয়াক্ত : সুবহে সাদেকের পর ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়, এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া উত্তম, না ফর্সাতে পড়া উত্তম, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তাঁদের মতামত দলিলসহ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) মতে ফজরের নামাজ ফর্সাতে পড়া উত্তম। দলিল–

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ -

২. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদের মতে অন্ধকারে পড়া উত্তম। দলিল–

١ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْاٰخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ -

٢ - كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ -

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, অন্ধকারে নামাজ আরম্ভ করে আলোতে শেষ করা উত্তম।

প্রতিপক্ষের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে প্রতিপক্ষের জবাবে বলা হয়–

ক. উষার আলোতে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীস قَوْلِىْ এবং অন্ধকার-এর হাদীস فِعْلِىْ ; সুতরাং এতে قَوْلِىْ হাদীস প্রাধান্য পাবে।

খ. অথবা কোনো কোনো সময় তিনি অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন। তবে আলোতে নামাজ পড়াই তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। কেননা, আলোতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্য ছিল অধিক লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ. হযরত আয়েশা (রা.) مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ বাক্যে অন্ধকার বলতে মসজিদের ভিতরকার অন্ধকার বুঝিয়েছেন, রাতের অন্ধকার নয়।

ঘ. হয়তো বা মহিলাদের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন।

ঙ. আলোতে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে নামাজে বেশি লোকের উপস্থিতি উদ্দেশ্য ছিল। রাসূল ﷺ-এর যুগে লোকেরা ভোরে ভোরে জামাতে হাজির হতেন, তাই অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। এ জন্য তিনি অন্ধকারেই নামাজ পড়তেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম তাহাবী (র.) উভয় মাযহাবের মধ্যে নিম্নরূপে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, নামাজকে অন্ধকারে আরম্ভ করবে এবং পরিষ্কার হলে শেষ করবে, অর্থাৎ কেরাত লম্বা পড়বে। এটা ছাড়াও যদি নামাজিগণ অন্ধকারে একত্রিত হয়ে যায়, তা হলে অন্ধকারে পড়া হানাফীদের মতেও উত্তম। এরূপই হাজীদের জন্য মুযদালিফার নামাজ অন্ধকারে পড়া মোস্তাহাব এবং স্ত্রীলোকদের জন্য সর্বাবস্থায়ই অন্ধকারে নামাজ পড়া মোস্তাহাব। কেননা, অন্ধকারই স্ত্রীলোকদের জন্য উপযুক্ত সময়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٦٦ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُنْحَرُ الْجَزُوْرُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَاْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ مَغِيْبِ الشَّمْسِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৬৬. অনুবাদ : হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে আসরের নামাজ পড়তাম। অতঃপর উট জবাই করা হতো। এরপর উটের গোশ্ত দশ ভাগ করা হতো। তারপর রান্না করা হতো। আর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আমরা রান্না করা গোশত খেতাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা شَرْحُ الْحَدِيْثِ : উক্ত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, আসরের নামাজ কোনো বস্তুর ছায়া এক গুণ হওয়ার পরই পড়া হতো। নতুবা সূর্যাস্তের পূর্বে এতগুলো কাজ করা সম্ভব হতো না। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ এ হাদীসটিকে নিজেদের পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেন। হানাফীদের পক্ষ হতে হাদীসটির ব্যাখ্যা এই দেওয়া হয়েছে যে, গ্রীষ্মের ঋতুতে দিন বেশ বড় হয়ে থাকে, তখন দুই মিছিলের পরেও আসরের নামাজ আদায় করে উল্লিখিত কার্য সমাধা করা সম্ভব। কারণ, এ সমস্ত কাজ অনেকটা দক্ষতার উপর নির্ভরশীল। আর আরবগণ এ ব্যাপারে খুবই দক্ষ ছিল। সুতরাং এর দ্বারা আসরের নামাজ প্রত্যেক বস্তুর দ্বারা এক মিছিল পরিমাণ হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করতে হবে তার দলিল দেওয়া যায় না।

وَعَنْ ٥٦٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِىْ اَشَىْءٌ شَغَلَهُ فِىْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُوْنَ صَلٰوةً مَّا

৫৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক রাতে পরবর্তী ইশার নামাজের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অথবা এরও কিছু পরে তখন তিনি বের হয়ে আসলেন, কোনো কাজ তাঁকে পরিবারে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল নাকি অন্য কোনো কিছু? তা আমরা বলতে পারি না। যখন তিনি বের হয়ে এলেন তখন বললেন, তোমরা এমন একটি নামাজের জন্য অপেক্ষা করছিলে,

يَنْتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا اَنْ يَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

যার প্রতীক্ষা তোমরা ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীরা কখনো করেনি। যদি আমি আমার উম্মতের উপর বোঝা হবে বলে মনে না করতাম তবে আমি তাদেরকে নিয়ে এ নামাজ এ সময়েই পড়তাম। অতঃপর তিনি মুয়াজ্জিনকে আদেশ করলেন, সে নামাজের একামত বলল, আর রাসূল ﷺ নামাজ পড়ালেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَوْلَا اَنْ يَثْقُلَ الخ-এর অর্থ : মহানবী ﷺ বললেন, যদি আমি আমার উম্মতের জন্য বোঝা হবে বলে মনে না করতাম তবে তাদেরকে এই নামাজ তথা ইশার নামাজ আমি এ সময়ই রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি অতিবাহিত হওয়ার পর পড়তাম। রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে অথবা তার উপরে আদায় করা মোস্তাহাব। হানাফীগণ এ অভিমতই পোষণ করেন।

وَعَنْ ٥٦٨ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلٰوتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৬৮. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজ পড়তেন প্রায় তোমাদের নামাজসমূহের মতোই। কিন্তু তিনি আতামা তথা ইশার নামাজকে তোমাদের নামাজের তুলনায় কিছুটা বিলম্ব করে পড়তেন এবং নামাজকে সংক্ষেপ করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلٰوةَ-এর অর্থ : মুক্তাদিদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন, বৃদ্ধ বা কর্মব্যস্ত লোক থাকতে পারে। এ জন্য নবী করীম ﷺ প্রায় নামাজই খুব সংক্ষেপে পড়তেন। যখন সকলকে নিশ্চিত ও নির্বিঘ্ন আছে বলে মনে করতেন এবং সকলের আগ্রহ লক্ষ্য করতেন, তখনই মাত্র নামাজকে কিছু দীর্ঘায়িত করতেন। এ যুগের ইমামগণেরও এর প্রতি আরও অধিক লক্ষ্য করা উচিত, তা না হলে লোক জামাতের প্রতি বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ অন্য হাদীসে বলেছেন যে, وَاِذَا اَمَّ اَحَدُكُمْ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلٰوةَ فَاِنَّ فِيْكُمُ الضَّعِيْفَ وَالْمَرِيْضَ وَذَا الْحَاجَةِ .

اَلْعَتَمَةُ-এর অর্থ : اَلْعَتَمَةُ শব্দের অর্থ রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ। শব্দটির মূল হলো عَتَمٌ - عَتَمٌ শব্দের অর্থ– রাত্রের অন্ধকারে দুধ দোহন করা, দুধ দোহন করতে বিলম্ব করা। আরব বেদুইনরা রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতো এবং সে সময়ই ইশার নামাজ পড়া হতো। আর এ কারণেই তারা ইশার নামাজকে عَتَمَة (আতামা) বলতো। তবে ইশাকে আতামা বলা মাকরূহ। কেননা, মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمْ اِلَّا اَنَّهَا الْعِشَاءُ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশাকে আতামা বলা অপছন্দনীয় কাজ। তবে কোনো কোনো হাদীসে যে, ইশাকে আতামা বলা হয়েছে তা বৈধতা বর্ণনার জন্য।

মহানবী ﷺ-এর পক্ষ হতে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) কেন ইশার নামাজের ক্ষেত্রে اَلْعَتَمَةُ [আতামা] শব্দ ব্যবহার করলেন? এ ব্যাপারে আল্লামা মোল্লা আলী কারী সম্ভাব্য দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন–

(ক) হাদীসটি বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত তাঁর নিকট রাসূল ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা পৌঁছেনি।

(খ) যাদের নিকট তিনি হাদীসটি বর্ণনা করছিলেন তাদের নিকট এ নামটিই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় তিনি এ নামটিই উল্লেখ করেছেন।

٥٦٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْلَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسَقَمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৫৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা [একদা রাতে] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আতামা [ইশার নামাজ] পড়ব বলে মনস্থ করলাম; কিন্তু তিনি প্রায় অর্ধ রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত বের হলেন না। অতঃপর তিনি [বের হয়ে এসে] বললেন, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ আসন গ্রহণ কর। তখন আমরা আমাদের আসন গ্রহণ করলাম। তিনি বললেন, লোকজন নামাজ সম্পন্ন করেছে এবং শয্যা গ্রহণ করেছে। আর তোমরা অবশ্যই নামাজে রত আছ, যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের প্রতীক্ষায় রয়েছ। যদি দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগক্লিষ্টের রোগকাতরতার আশঙ্কা না থাকতো তবে আমি এ নামাজকে রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়তাম। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস ও উপরে বর্ণিত কতিপয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ বিলম্ব করে পড়াই উত্তম; কিন্তু উত্তমতা লাভের আশায় ঘুমিয়ে পড়ার কারণে নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে শীঘ্রই পড়াই উত্তম। আর ইশার নামাজের ওয়াক্ত বলতে অর্ধরাত্রের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বুঝায়, এর পরে ইশা পড়া জায়েজ হলেও মাকরূহ। এটা ছাড়াও দুর্বল ও শ্রম-ক্লান্ত ব্যক্তিদের কষ্টের সম্ভাবনা থাকলেও শীঘ্র শীঘ্র পড়া উত্তম। হাদীসের শেষের দিকে এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, ধৈর্য ও আগ্রহের বিষয় ভালোভাবে জানতেন বলেই মাঝে মাঝে ইশার নামাজকে বিলম্ব করে এবং কোনো কোনো নামাজকে একটু দীর্ঘায়িত করে পড়তেন। আজকাল ইমামদেরকে এ বিষয়ে বেশি সজাগ থাকা উচিত।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তার নাম সা'দ, উপনাম বা কুনিয়াত اَبُوْ سَعِيْد। তিনি আবূ সাঈদ আল-খুদরী উপ-নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর পিতার নাম মালেক ইবনে সিনান। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী।

২. **বংশধারা:** তাঁর বংশধারা হলো, আবূ সাঈদ সা'দ ইবনে মালেক ইবনে সিনান ইবনে ওবাইদ [কারো মতে আবদ] ইবনে ছা'লাবা ইবনে ওবাইদ ইবনুল আবজার। আবজার হলেন খুদরা ইবনে হারেছ ইবনে খাযরাজ আল-আনসারী।

৩. **জিহাদে অংশগ্রহণ :** তিনি উহুদ যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ছোট ছিলেন। তাই তাঁকে এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। তবে এর পরে তিনি রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে সর্বমোট ১২ (বারো) টি গাযওয়াতে অংশগ্রহণ করেন।

৪. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে, তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বমোট ১ হাজার একশত সত্তরখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) একই সনদ-মতনে তাঁর বর্ণিত ৪৬ (ছয়চল্লিশ) খানা হাদীস, আর ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ১৬ খানা এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৫২ খানা হাদীস নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

৫. **তাঁর নিকট হতে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন :** তাঁর নিকট হতে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের অনেকে একটি জামাত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবরাহীম নাখায়ী প্রমুখ।

৬. **তিনি যাঁদের নিকট হতে হাদীস শুনেছেন :** তিনি যদিও সাহাবী তবু রাসূলে কারীম ﷺ -এর সকল হাদীস তো তিনি শুনেননি। তাই তিনি অনেক হাদীস সাহাবায়ে কেরামদের নিকট হতেও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন চার খলিফা, তাঁর পিতা মালেক, তাঁর মায়ের পক্ষের ভাই কাতাদা ইবনে নু'মান প্রমুখ।

তাঁর কতিপয় গুণাবলি : তিনি যেমনিভাবে হাদীস মুখস্থের দিকে ছিলেন অগ্রগামী অন্যদিকে তিনি কুরআনের হাফেজও ছিলেন। অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মাঝে তিনি একজন। তিনি সবার নিকট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যু ও দাফন : তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।

---

٥٧٠. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৭০. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জোহরের নামাজকে তোমাদের তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়তেন। আর তোমরা আসরের নামাজকে তার তুলনায় তাড়াতাড়ি পড়। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ :

বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম হিন্দ, উপনাম উম্মে সালামা। পিতার নাম সুহাইল, কারো মতে, হুযাইফা। উপনাম আবূ উমাইয়্যা। মাতার নাম আতিকা বিনতে আমের।

২. নসবনামা : হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়্যা সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মাখযুম।

৩. **পূর্ববর্তী বিবাহ :** হযরত উম্মে সালামার বিবাহ প্রথমে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবদিল আসাদের সাথে হয়েছিল। তিনি এবং তাঁর স্বামী ইলামের প্রথম দিকেই মুসলমান হন।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তপ্রাপ্তির প্রারম্ভেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. **হাবশায় হিজরত :** ইসলাম গ্রহণের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় কিছুকাল থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, তিনিই হিজরতকারিণী প্রথম মহিলা।

৬. **হুজুর ﷺ-এর সাথে বিবাহ :** হযরত আবূ সালামার ইন্তেকালের পর রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর বিবাহের পয়গাম পাঠান। উম্মে সালামা তিনটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। হুজুর ﷺ সমস্যাগুলোর সমাধানের কথা জানালে তাঁর পুত্র সালামার অলিত্বে রাসূলে পাকের সাথে বিবাহের কাজ সম্পাদিত হয়। হযরত উম্মে সালামার বিবাহের কিছুদিন পূর্বে তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা ইন্তেকাল করায় তিনি তাঁর ঘরে অবস্থান নেন।

৭. **তাঁর সন্তান-সন্ততি :** রাসূলে পাকের ঔরসে তার কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। তবে আবূ সালামার ঔরসে ৬ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা হলেন– ১. সালামা, ২. যয়নব, ৩. ওমর, ৪. দুররাহ, ৫. মুহাম্মদ, ৬. উম্মে কুলছুম।

৮. **তাঁর গুণাবলি :** হযরত উম্মে সালামা দৈহিক সৌন্দর্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মেধা, ফিকহশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য দিক হতে তাঁর স্থান হযরত আয়েশার পরেই ছিল। তাঁর পরামর্শক্রমেই রাসূলে কারীম ﷺ সর্বপ্রথমে হুদায়বিয়াতে হাদী কুরবানি করেন এবং হলক করেন।

৯. **তাঁর ইন্তেকাল :** তাঁর ইন্তেকালের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়। ওয়াকেদীর মতে ৫৯ হিজরিতে, ইবনে হিব্বানের মতে ৬১ হিজরিতে ইবনে হাজারের মতে ৬২ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٥٧١ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৫৭১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন গরমকাল আসত তখন রাসূল ﷺ নামাজ ঠাণ্ডা সময় পড়তেন, আর যখন ঠাণ্ডা পড়ত তখন সকাল সকাল পড়তেন। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ-এর অর্থ : গ্রীষ্ম ঋতুতে রাসূল ﷺ নামাজ ঠাণ্ডা সময় পড়তেন। এখানে নামাজ বলতে জোহরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। জোহরের নামাজ সকাল সকাল পড়া ও দেরিতে পড়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহের মধ্যে বাহ্যত যে দ্বন্দ্ব রয়েছে এ হাদীসটি দ্বারা তার মীমাংসা হয়ে যায়। অর্থাৎ, জোহরের নামাজ গ্রীষ্মকালে দেরিতে পড়া এবং শীতকালে সকাল সকাল পড়া মোস্তাহাব। তবে কোনো কোনো হাদীস দ্বারা যে প্রমাণিত হয়, রাসূল ﷺ প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও জোহরের নামাজ সকাল সকাল পড়েছেন, এ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, উক্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٥٧٢ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৭২. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা আমাকে বললেন, 'আমার পরে তোমাদের উপর এমন শাসনকর্তাও হবে, যাদেরকে নানারূপ ঝামেলা যথাসময়ে নামাজ আদায় করা হতে বিরত রাখবে। এমনকি এর সময়ও চলে যাবে। তখন তোমরা ঠিক সময় নামাজ পড়ে নেবে।' এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাঁদের সাথেও নামাজ পড়ব?' তিনি বললেন, 'হাঁ'। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ-এর অর্থ : এখানে মহানবী ﷺ উম্মতকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন যে, আমার অন্তর্ধানের পর তোমাদের উপর এমন অনেক শাসক হবে, যাদেরকে পার্থিব জগতের নানারূপ ঝামেলা যথাসময়ে নামাজ আদায় করা হতে বিরত রাখবে। এমনকি এর সময় চলে যাবে, অর্থাৎ মোস্তাহাব সময় চলে যাবে এবং মাকরূহ সময় এসে উপস্থিত হবে। যখন তোমরা এমন অবস্থার শিকার হবে তখন একা একা হলেও যথাসময়ে নামাজ আদায় করে নেবে। তবে এ ক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ বিপর্যয়ের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে। রাসূল ﷺ-এর এ সর্তকবাণী শ্রবণে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করলেন যে, আমরা কী পুনরায় তাদের (শাসকদের) সাথে নামাজ পড়ব। রাসূল ﷺ বললেন, হাঁ, তোমরা তাদের সাথে পুনরায় নামাজ পড়বে। কেননা, এতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে প্রথম নামাজ ফরজ এবং পরে জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাজ নফল হিসেবে গণ্য হবে। তবে এ বিধান কেবল জোহ্র ও ইশার নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ অন্য হাদীসে আসর ও ফজরের নামাজের পর নফল পড়তে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। আর তিন রাকাত বিশিষ্ট কোনো নফল নামাজ শরিয়তে বিধিত নয়, তাই মাগরিবের নামাজ পড়ে পুনরায় জামাতে নামাজ পড়া যায় না। যদি শাসক শ্রেণী অত্যাচারী হয় এবং তাদের পক্ষ হতে কোনোরূপ বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকে তবে আসর, ফজর এবং মাগরিবও পুনরায় শাসকদের সাথে জামাতে আদায় করা বৈধ।

وَعَنْ ٥٧٣ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ فَهِىَ لَكُمْ وَهِىَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَاصَلُّوْا الْقِبْلَةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৭৩. অনুবাদ : হযরত কাবীসা ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন– আমার পরে তোমাদের উপরে এমন কিছু শাসক হবে, যারা নামাজকে পিছিয়ে দেবে, তা তোমাদের অনুকূলে হবে এবং তাদের প্রতিকূলে যাবে। সুতরাং তখন তোমরা তাদের পিছনে নামাজ পড়ো যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে [অর্থাৎ ইসলামের উপর থাকে]।–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهِىَ لَكُمْ وَهِىَ عَلَيْهِمْ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেন, এটা তোমাদের অনুকূলে হবে এবং তাদের প্রতিকূলে। অর্থাৎ, শাসকদের কারণে নামাজ বিলম্বে আদায় করতে হলে এটা তোমাদের অনুকূলে হবে। দেরি করার কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কেননা, এটা তোমাদের সামর্থ্যের বহির্ভূত। বিশেষ প্রয়োজনের তাকিদেই তোমরা বিলম্ব করেছ। আর সে প্রয়োজন হলো শাসকদের অনুকরণ। সুতরাং এ ক্ষতি তোমাদের উপর বর্তাবে না; বরং শাসকরাই আল্লাহ্র কাছে দায়ী থাকবে। কেননা, তারা ইচ্ছা করলে বিলম্ব না করে পারত। শুধুমাত্র পার্থিব নানাবিধ ব্যস্ততা তাদেরকে যথাসময়ে নামাজ আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। সুতরাং বিলম্বের কারণে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে তারা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের ওপর বহাল থাকে, তাদের পিছনে নামাজ আদায় করতে থাকো, যদিও নামাজ দেরিতে আদায় করে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বাক্যটির মর্মার্থ হলো, তোমরা যখন প্রথম ওয়াক্তে নামাজ আদায় করবে, অতঃপর পুনরায় শাসকদের সাথে জামাতে আদায় করবে তখন এ নামাজ তোমাদের অনুকূলে হবে। আর শাসকরা যেহেতু ইচ্ছা করে বিলম্ব করেছে তাই এটা তাদের প্রতিকূলে যাবে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

وَعَنْ ٥٧٤ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ اِنَّكَ اِمَامُ عَامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مَاتَرٰى وَيُصَلِّىْ لَنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ فَاِذَا اَحْسَنَ النَّاسُ فَاَحْسِنْ مَعَهُمْ وَاِذَا اَسَاءُوْا فَاجْتَنِبْ اِسَاءَتَهُمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৭৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। হযরত ওসমান (রা.) তখন বিদ্রোহীগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি [রাবী] বললেন, হযরত আপনিই জনসাধারণের ইমাম, কিন্তু আপনার উপর এ বিপদ উপস্থিত যা আপনি দেখছেন। আর বিদ্রোহী নেতা [কিনানা ইবনে বিশ্র] আমাদের নামাজ পড়াচ্ছে, অথচ একে আমরা গুনাহ বলে মনে করি। তখন তিনি বললেন, 'মানুষ যে সমস্ত কার্যাবলি করে, তন্মধ্যে নামাজ হলো সর্বোত্তম কাজ।' সুতরাং মানুষ যখন ভালো কাজ করে তখন তাদের সাথে ভালো কাজ কর। আর যখন মন্দ কাজ করে তখন তাদের মন্দ কাজ হতে দূরে সরে থাক। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে হযরত ওসমান (রা.)-এর উত্তরে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক মুসলমানের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ; যদিও কারো পিছনে উত্তম, আর কারো পিছনে উত্তম নয়। এতে এ কথাও বুঝা গেল যে, ভালো কাজে অন্যের অনুসরণ করা এবং মন্দ কাজে তা হতে দূরে থাকা সকলেরই উচিত।

بَابُ فَضَائِلِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের ফজিলত

فَضَائِلُ শব্দটি فَضِيْلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে– মর্যাদা ও মহত্ত্ব। আলোচ্য অধ্যায়ে নামাজের দ্বারা মানুষ কি কি মর্যাদা লাভ করবে এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ যা কিছু ইরশাদ করেছেন, এখানে তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। নামাজের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও ইরশাদ হয়েছে যে, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٧٥ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلّٰى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৭৫. অনুবাদ : হযরত উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এমন ব্যক্তি কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে নামাজ পড়বে অর্থাৎ, ফজর ও আসরের নামাজ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَجْهُ التَّخْصِيْصِ بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ **ফজর ও আসরের বৈশিষ্ট্য** : ভোর রাত আরামদায়ক ঘুমের সময়। আর আসরের সময় ব্যবসায় লিপ্ত থাকা ও খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনে মত্ত থাকার সময়। এ সমস্ত বাধা ও ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এ দুই নামাজের যত্ন করে তার সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করা যায় যে, সে অবশিষ্ট নামাজগুলো নষ্ট করবে না। আর কুরআনেরও দাবি, নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে। কাজেই এমন ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকবে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

অথবা এ দুই সময়ের নামাজের মর্যাদা অন্যান্য নামাজের তুলনায় অনেক বেশি। কেননা, এ দুই সময়ে রাতের ও দিনের ফেরেশ্তা উম্মতের আমল আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করেন। এ সমস্ত ফেরেশ্তা আকাশে উঠতে যে সমস্ত মানুষকে নামাজে রত অবস্থায় দেখে, আল্লাহ্র দরবারে তাদের নামাজি হওয়ার সাক্ষ্য দান করবেন। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হয়ে তাদেরকে মাফ করে দেবেন।

لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ **-এর ব্যাখ্যা** : ফজরের সময় আরামদায়ক ঘুমের সময়। আর আসরের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকার সময়। ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এ দুই নামাজের যত্ন করে, সে নিশ্চিতভাবেই অবশিষ্ট নামাজ নষ্ট করবে না। আর কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ . 'নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। কাজেই সে কবীরা গুনাহ হতেও বেঁচে থাকবে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে না।

২. অথবা এ দুই সময়ের নামাজকে প্রকাশ করেছে এ দুই নামাজের ফজিলত বর্ণনা করার জন্য। কেননা, এ দুই সময়ে রাতের ও দিনের ফেরেশতা এসে উম্মতের আমল আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে যায়। এ সমস্ত ফেরেশতা আকাশে উঠতে যে সমস্ত মানুষকে নামাজে রত অবস্থায় দেখবে, আল্লাহর দরবারে তাদের নামাজি হওয়ার সাক্ষ্য দান করবে। কাজেই এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হয়ে তাদেরকে মাফ করে দেবেন। যেমন–

হাদীসে এসেছে–

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ .

৩. অথবা এটাও হতে পারে যে, لَنْ يَّلِجَ النَّارَ দ্বারা 'সব সময় দোজখে থাকবে না' বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, যারা এভাবে নামাজের যত্ন করে এবং ঠিক মতো আদায় করে তারা সব সময়ের জন্য জাহান্নামে থাকবে না। কবীরা গুনাহের কারণে জাহান্নামে গেলেও পরে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসটি হতে ফজর ও আসরের নামাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

৪. কারো মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে এ দুই ওয়াক্ত ফরজ ছিল, তাই এই দুই নামাজের গুরুত্ব বেশি হিসেবে تَخْصِيْص করেছেন।

৫. কিছু সংখ্যকের মতে দিনের শুরু হলো রিজিক বণ্টনের সময়, আর দিনের শেষে আমল উত্তোলিত হয়। কাজেই যে ব্যক্তি এ দুই ওয়াক্তের যথাযথ হেফাজত করে তার রিজিক ও আমলের মধ্যে বরকত হয়। এ জন্য রাসূল ﷺ এই দুই ওয়াক্তকে تَخْصِيْص করেছেন।

وَعَنْ ٥٧٦ أَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ের নামাজ পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ফজর ও আসরের নামাজ যথা সময়ে নিয়মিত পড়ে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যদিও সে অন্যান্য ফরজসমূহকে ত্যাগ করে এবং কবীরা গুনাহ করে। অথচ জমহুর আলিমগণ বলেন যে, নামাজ দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। ফরজ ত্যাগ করলে বা কবীরা গুনাহ করলে শাস্তি পেতে হবে, যদিও ফজর ও আসর নামাজ নিয়মিত সম্পন্ন করে।

জমহুর আলেমগণ আলোচ্য হাদীসের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেন–

১. ফজরের সময় আরাম উপভোগ করার মতো সময়, আর আসরের সময় নানাবিধ গৃহকর্ম ও পার্থিব কার্যে ব্যস্ত থাকার সময়। যে ব্যক্তি এই আরাম-আয়েশ ও কর্মব্যস্ততা পরিত্যাগ করে ফজর ও আসর যথাসময়ে সম্পন্ন করে, সে তো স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ফরজসমূহও আদায় করে থাকে, আর এরূপ ব্যক্তি সাধারণত কবীরা গুনাহ হতেও মুক্ত থাকে। অতএব সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. উদ্ধৃত হাদীসে ফজর ও আসরের নামাজের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ দুই নামাজের যারা যথাযথভাবে হেফাজত করে তারা প্রকৃতই জাহান্নামে যাবে না। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দার ভালো ও মন্দ কাজের প্রতিফল দেবেন তবু এ দুই নামাজ নিয়মিত আদায়কারীকে আল্লাহ্ নিজের করুণা ও অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারেন।

৩. অথবা এ দুই সময়ে বান্দার আমল ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকট নিয়ে যায়, তখন তারা বান্দার উপর সাক্ষী স্বরূপ বলে যে, وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ বান্দার জন্য ফেরেশতাদের এরূপ সাক্ষ্য তাদের জান্নাতে প্রবেশের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

اَلْبَرْدَيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি এবং এ নামকরণের কারণ কি? اَلْبَرْدَيْنِ দ্বারা ফজর ও আসরের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। অথবা اَلْبَرْدَيْنِ দ্বারা ফজর ও ইশার নামাজকে বুঝানো হয়েছে। আর اَلْبَرْدَيْنِ শব্দের অর্থ হলো– দুই ঠাণ্ডা, যেহেতু ফজর ও আসরের সময় দু'টি দিবসের দুই প্রান্তে হওয়ায় দিবসের অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ দুই সময় ঠাণ্ডা থাকে। তাই এ দুই সময়ের নামাজকে اَلْبَرْدَيْنِ বলা হয়েছে। আর ফজর ও ইশা অর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে এই দুই নামাজকে اَلْبَرْدَيْنِ বলে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ হলো, এ দুই নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রথম ও শেষ ওয়াক্তের নামাজ।

٥٧٧ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنٰهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কাছে একের পর এক একদল ফেরেশতা রাতে, আর একদল ফেরেশ্তা দিনে আসে এবং উভয় দল ফজরের নামাজে ও আসরের নামাজে মিলিত হয়। অতঃপর যারা তোমাদের মধ্যে ছিল তারা উঠে যায়, তখন তাদের প্রভু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তাদের [আপন বান্দাদের] অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবগত, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?' উত্তরে তারা বলে, আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাজ পড়ছে এবং আমরা যখন তাদের নিকট পৌঁছেছিলাম তখনও তারা নামাজ পড়ছিল।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ-এর মর্মার্থ : পৃথিবীর সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে কেন এরূপ জিজ্ঞাসা করেন? এর জবাবে বলা যায় যে, মানুষ সৃষ্টির সূচনাতে ফেরেশতারা এ বলে আপত্তি উত্থাপন করেছিল যে, তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।' এখন সেই ফেরেশতাদের মুখেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যাচ্ছে যে, তারা নামাজ পড়ছে, এ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ফেরেশতাদের মধ্যে মানুষের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করাই হলো মহান আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য।

يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ-এর অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে একের পর এক একদল ফেরেশতা রাতে এবং একদল ফেরেশতা দিনে আসে।' অর্থাৎ, প্রতিনিয়ত দুই দল ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে। দিনের ফেরেশতা ফজরের পূর্বে আগমন করে এবং আসরের পরে আকাশে চলে যায়। আর রাতের ফেরেশতা আসরের পূর্বে আসে এবং ফজরের পরে আকাশে উঠে যায়। সুতরাং ফজরের ওয়াক্তে এবং আসরের ওয়াক্তে উভয় দল পরস্পর মিলিত হয়। এখানে ফেরেশতা দ্বারা বান্দার আমল সংরক্ষণকারী ফেরেশতা উদ্দেশ্য। তবে কারো কারো মতে, অন্য ফেরেশতাও উদ্দেশ্য হতে পারে।

٥٧٨ - وَعَنْ جُنْدَبِ الْقَسْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَىْءٍ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهٖ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبَّهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ اَلْقُشَيْرِىْ بَدَلَ الْقَسْرِيِّ -

৫৭৮. অনুবাদ : হযরত জুনদুব কাস্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে থাকে। সুতরাং [হে মানুষ!] আল্লাহ যেন নিজ তত্ত্বাবধানের কোনো কিছু সম্পর্কে তোমাদের বিরুদ্ধে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিরুদ্ধে আপন তত্ত্বাবধানের কোনো কিছু সম্পর্কে বাদী হবেন তাকে ধরবেনই। অতঃপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। –[মুসলিম। মাসাবীহ গ্রন্থের কোনো কোনো কপিতে কাসরীর পরিবর্তে কুশাইরী লেখা হয়েছে]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ -এর অর্থ : রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়ে সে আল্লাহ তা'আলার হেফাজতে থাকে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে সে যেন আল্লাহ্‌র দায়িত্বভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্ব ভুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা অভিযোগ উত্থাপন করবেন। আর আল্লাহ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেন তার পরিণাম জাহান্নাম। অতএব কোনো মুসলিম ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। হাদীসটি দ্বারা বিশেষভাবে ফজর নামাজের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

---

৫৭৯. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ জানত নামাজের জন্য ডাকা এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার মধ্যে কি [ছওয়াব] রয়েছে? আর যদি লটারী ছাড়া এটা [ভাগে] না পেত, তবে তারা এর জন্য লটারী দিত। আর যদি জানত নামাজের জন্য সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কি [ছওয়াব] রয়েছে, তবে তারা সে দিকে অন্যের আগে পৌঁছতে চেষ্টা করত। আর যদি জানত যে, ইশা ও ফজরের মধ্যে কি [ফজিলত] রয়েছে, তবে তারা এর জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّفُّ الْاَوَّلُ -এর অর্থ : উক্ত হাদীসে اَلصَّفُّ الْاَوَّلُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ কাতার বা সফ, যার সম্মুখে আর কোনো কাতার নেই। সুতরাং যার কা'বা ঘরের পিছন ভাগে কাতার করে তারাও প্রথম কাতারেরই অন্তর্ভুক্ত।

لَاسْتَهَمُوْا -এর অর্থ : اِسْتِهَام শব্দের অর্থ হলো– লটারীর মাধ্যমে কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি মানুষ জানত নামাজের জন্য ডাকা এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার মধ্যে কি ফজিলত, কি ছওয়াব রয়েছে, আর লটারী ছাড়া তা না পেত, তবে তারা লটারীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত। অর্থাৎ নামাজের জন্য ডাকা এবং প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার জন্য তারা পরস্পর ঝগড়া করত এবং পরিশেষে লটারীর মাধ্যমে মুয়াজ্জিন ও প্রথম সফে পড়ার স্থান নির্ধারণ করত।

উল্লেখ্য যে, এখানে اَلنِّدَاءُ দ্বারা একামতও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى حُضُوْرِ الْاِقَامَةِ وَتَحْرِيْمِ الْاِمَامِ وَالْوُقُوْفِ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ এখানে স্পষ্টভাবে اِقَامَةٌ শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ -এর অর্থ : اَلتَّهْجِيْرُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। এর অর্থ– اَلْمُسَارَعَةُ اِلَى الطَّاعَةِ 'ইবাদতের দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়া'। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথম কাতারে নামাজ পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করার পর এখানে প্রথম ওয়াক্ত পাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে تَهْجِيْر-এর অর্থ হয়, সকাল সকাল নামাজ আদায় করা। অধিকাংশ হাদীসবিশারদদের অভিমত এটাই। কেউ কেউ বলেন, এখানে تَهْجِيْر-এর অর্থ হলো– দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরমের সময় জুমা বা যোহরের নামাজের দিকে গমন করা।

وَعَنْهُ ٥٨٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৫৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- মুনাফিকদের কাছে ফজর ও ইশা অপেক্ষা বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। যদি তারা জানতো এর মধ্যে কী [মাহাত্ম্য] আছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার জন্য আসতো। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَيْسَ صَلٰوةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, মুনাফিকদের কাছে ফজর ও ইশা অপেক্ষা বেশি ভারী কোনো নামাজ নেই। অর্থাৎ, মুনাফিকদের নিকট সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হলো ফজর ও ইশার নামাজ আদায় করা। ফজর ও ইশার নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ফজরের সময় আরামদায়ক ঘুমের সময়, আর ইশার সময় খাওয়া-দাওয়া ও সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রামের সময়। সুতরাং আরামদায়ক ঘুম ও বিশ্রামকে উপেক্ষা করে মসজিদে হাজির হওয়া সহজ কাজ নয়। আর এখানে মুনাফিকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা অলস। তারা রীতিমতো নামাজ পড়তে অভ্যস্ত নয়। যদিও পড়ে এতে উদ্দেশ্য থাকে লোক দেখানো। সুতরাং যাদের অবস্থা এই, তাদের পক্ষে আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে ফজর ও ইশার নামাজে যোগদান করা তো অবশ্যই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

হাদীসটিতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিষ্ঠাবান মু'মিনের কাছে নামাজ কোনো ভারী বস্তু নয়। যেমন মহান আল্লাহর ভাষায়— وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ

وَعَنْ ٥٨١ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৫৮১. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ইশার নামাজ জামাতে পড়েছে, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত নামাজ পড়েছে, আর যে (এর সাথে) ফজরের নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন সম্পূর্ণ রাত নামাজ পড়েছে। -[মুসলিম

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ -এর অর্থ : হাদীসের আলোচ্য অংশ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতে পড়েছে সে যেন রাতের প্রথমার্ধ নামাজ ও আল্লাহর স্মরণে কাটাল, এতে ইশার নামাজ জামাতে পড়ার ফজিলত ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইশার সময় হলো সাধারণত বিশ্রামের সময়, সারাদিন পরিশ্রমের পর মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মানুষ যখন এ বিশ্রামকে হারাম করে ইশার নামাজে উপস্থিত হয় এবং জামাতের অপেক্ষায় থেকে তা জামাতে আদায় করে তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে। আর এ সব কারণেই ইশার জামাতের এরূপ ফজিলত।

فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ -এর অর্থ : সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে পড়ল সে যেন রাতের শেষার্ধ নামাজ ও আল্লাহর স্মরণে কাটাল। এখানে صَلَّى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ ইতঃপূর্বে قَامَ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, صَلٰوةُ اللَّيْلِ [রাতের নামাজ]-কে قِيَامُ اللَّيْلِ নামে অভিহিত করা হয়। আর كُلَّ শব্দ যোগ করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইশার জামাতের তুলনায় ফজরের জামাত উত্তম। কেননা, ফজরের জামাতে শরিক হওয়া খুবই কষ্টকর। কারণ, ফজরের সময় মানুষ ঘুমে নিদ্রাবিভূত থাকে। সুতরাং জামাতে শরিক হওয়ার জন্য এ আরামের ঘুমকে বর্জন করতে হয়, পক্ষান্তরে ইশার নামাজের পূর্বে সাধারণত মানুষ নিদ্রা যায় না, বরং নামাজ আদায় করার পরই নিদ্রামগ্ন হয়।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারীর পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম ওসমান, কুনিয়াত আবূ আবদুল্লাহ্ বা আবূ লায়লা। লকব যুন-নূরাইন ও গনী। তাঁর পিতার নাম আফফান ইবনে আবিল আস; মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয। হুজুর ﷺ-এর জামাতা ও তৃতীয় খলিফা। কুরায়েশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান।

২. **নসবনামা :** ওসমান ইবনে আফফান ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ।

৩. **হুজুর ﷺ-এর সাথে সম্পর্ক :** কয়েকটি দিক হতেই তাঁর সাথে হুজুর ﷺ-এর সম্পর্ক রয়েছে। প্রথমত তাঁর উর্ধ্ব পুরুষ আবদে মানাফের সাথে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বংশ সূত্র মিলে যায়। দ্বিতীয়ত তাঁর নানী বায়যা বিনতে আবদিল মুত্তালিব রাসূল ﷺ-এর ফুফু। তৃতীয়ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর দু' কন্য রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমকে একের পর এক তাঁর নিকট বিবাহ দেন। এ কারণেই তাঁকে যুন-নূরাইন বলা হয়।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ'। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫. **হিজরত :** নবুয়তের পঞ্চম বৎসরে মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে মুসলমানদের যে দলটি হাবশায় হিজরত করে তাঁদের সাথে তিনিও স্ব-পরিবারে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর গুজব শুনলেন যে মক্কার নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন তিনি মক্কায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ্‌র মদিনায় হিজরতের পর তিনি মদিনাতে হিজরত করেন।

৬. **জিহাদে অংশ গ্রহণ :** ইসলামে যতগুলো জিহাদ সংঘটিত হয় তন্মধ্যে বদর এবং বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন না, বাকি সকল জিহাদেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বদরের সময় তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যা অসুস্থ থাকায় হুজুর ﷺ তাঁকে রুগীর সেবার নির্দেশ দেন। আর বাইয়াতে রিদওয়ান তো তাঁর মক্কায় অবরুদ্ধ হওয়ার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল।

৭. **দৈহিক আকৃতি :** তিনি ছিলেন মধ্যম আকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংশহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাঁড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন চুল, কোমর ও বুক প্রশস্ত, কান পর্যন্ত ঝুলানো জুলফি, পায়ের নালা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রংয়ের দাঁড়ি এবং স্বর্ণ খচিত দাঁত।

৮. **খেলাফতের দায়িত্ব পালন :** হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর অসিয়ত মোতাবেক মুসলমানদের পরামর্শক্রমে ২৪ হিজরির ১লা মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বার দিন কম বারো বৎসর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

৯. **তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস :** তিনি রাসূলে পাক ﷺ-এর নিকট হতে সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তন্মধ্য হতে ১১ খানা হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করেন।

১০. **শাহাদাত :** ৩৫ হিজরির ১৮ই যিলহজ শুক্রবার আসর নামাজের পর তাঁর বাসভবনে আল্-আস্ওয়াদুত তুজিবী তাঁকে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে পাঁচটি অভিমত পাওয়া যায়; এগুলো যথাক্রমে ৮০ / ৮২ / ৮৬ / ৮৮ / ৯০।
তাঁকে জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানের হুশশে কাওকাব অংশে মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে দাফন করা হয়।

---

৫৮২ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْمَغْرِبَ قَالَ وَتَقُوْلُ الْاَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ وَقَالَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْعِشَاءَ فَاِنَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ فَاِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْاِبِلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মাগরিবের নামাজের নামকরণে বেদুঈনগণ যেন তোমাদের উপর জয়লাভ করতে না পারে। তিনি [বর্ণনাকারী] বলেন, বেদুঈনগণ একে ইশা বলত। রাসূল ﷺ আরও বলেন, তোমাদের ইশার নামাজের নামকরণেও যেন বেদুঈনগণ তোমাদের উপরে জয়লাভ করতে না পারে। কারণ, আল্লাহর কিতাবেই একে 'ইশা' বলা হয়েছে। আর তা পড়া হয় 'আতামা' অর্থাৎ, উটের দুধ দোহনের সময়। [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْمَغْرِبَ -এর অর্থ : আরবের বেদুঈনরা মাগরিবের নামাজকে ইশা বলত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, মাগরিবের নামাজের নামকরণে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর জয়ী হতে না পারে। অর্থাৎ, বেদুঈনদের মতো তোমরাও মাগরিবের নামাজের স্থলে ইশা শব্দ বেশি ব্যবহার করো না। কেননা, এর ফলে তোমদের নামকরণের উপর ওদের নামকরণ জয়ী হবে। কাজেই তোমরা তাকে মাগরিব-ই বলতে থাকো।

فَاِنَّهَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءَ -এর ব্যাখ্যা : পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা অদৃশ্য হয়ে গাঢ় অন্ধকার হলে তাকে 'আতামা' বলে। বেদুঈনদের চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, এ সময় তারা উটের দুধ দোহন করতো। ইসলামের আগমনের পরে ইশার নামাজ এ সময়ে পড়া হতো বলে ইশার নামজকেও লোকেরা 'আতামার নামাজ' বলতে শুরু করল। রাসূল ﷺ বেদুঈনদের অনুকরণে ইশাকে আতামা বলতে পছন্দ করেননি। তাই তিনি বলিলেন لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلٰوتِكُمُ الْعِشَاءَ অর্থাৎ, তোমাদের ইশার নামাজের নামকরণে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপরে জয়ী হতে না পারে। অর্থাৎ বেদুঈনদের মতো তোমরাও ইশার নামাজকে আতামা বলো না। কেননা, কুরআন মজীদে এ নামাজকে এশা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْاِشْكَالُ وَالْجَوَابُ দ্বন্দ্ব ও সমাধান : আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইশার নামাজকে আতামাহ বলা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে ইশাকে আতামা বলা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। ইমাম নববী (র.) উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে দু'টি মত পেশ করেছেন—

১. আতামা শব্দের ব্যবহারের বৈধতা বর্ণনার জন্য এবং নিষেধাজ্ঞা মাকরূহে তানযীহির জন্য।

২. আতামা দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তাদেরকে, যারা 'ইশা' নামের সাথে পরিচিত নয়। কেননা, আতামা নামটিই আরবদের নিকট বেশি প্রসিদ্ধ ছিল। অথবা এর জবাব হলো যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি নিষেধাজ্ঞা-বাণী উচ্চারিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

وَعَنْ ٥٨٣ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৮৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খন্দক যুদ্ধের দিন বলেছেন, তারা [কুরায়েশরা] আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামাজ তথা আসরের নামাজ হতে বিরত রেখেছিল। আল্লাহ তাদের গৃহ এবং কবরসমূহকে অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করুন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تَعْيِيْنِ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى মধ্যবর্তী নামাজ নির্ণয়ে ওলামাদের মতভেদ : সালাতুল উসতা তথা মধ্যম নামাজ দ্বারা কোন নামাজকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। كَشْفُ الْمُغَطّٰى عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশটি মত উল্লিখিত হয়েছে যা নিম্নরূপ– (১) তাহাজ্জুদ নামাজ, (২) ফজর বা আসরের যে কোনো এক ওয়াক্ত, (৩) পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্য হতে অনির্দিষ্ট কোনো এক ওয়াক্ত, (৪) চাশতের নামাজ, (৫) ঈদুল ফিতরের নামাজ, (৬) ঈদুল আযহার নামাজ, (৭) বিতরের নামাজ, (৮) জামাতের নামাজ, (৯) ভয়কালীন নামাজ, (১০) ফজর ও আসরের উভয় নামাজ, ১১. ফজর ও ইশা উভয় নামাজ, (১২) শুধু ইশার নামাজ, কেননা ইশার নামাজ এমন দুই ওয়াক্ত নামাজ তথা মাগরিব ও ফজর নামাজের মধ্যবর্তী সময় পড়া হয় যে দুই ওয়াক্তে কসর নেই, (১৩) জুমার দিনে জুমার নামাজ উদ্দেশ্য এবং অবশিষ্ট ছয় দিনে যোহরের নামাজ উদ্দেশ্য, (১৪) জুমার নামাজ, কারণ তা ফজর ও আসর নামাজদ্বয়ের মধ্যখানে দিনের মধ্যভাগে পড়া হয়, (১৫) সকল নামাজই উসতা, (১৬) মাগরিবের নামাজ, কারণ এ নামাজে সফরে কোনো কসর নেই। আর এর পূর্বে যোহর ও আসর দুই ওয়াক্ত নীরব নামাজ এবং পরে ইশা ও ফজর দুই ওয়াক্ত স্বরব

নামাজ রয়েছে, (১৭) কারো মতে যোহরের নামাজ। কেননা এটা দিনের মধ্যভাগে পড়া হয়, (১৮) ফজরের নামাজ। কেননা এটা দিনের দুই নামাজ ও রাতের দুই নামাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ মতটি ইমাম শাফেয়ী সহ কতিপয় সাহাবী ও তাবেয়ী সমর্থন করেছেন, (১৯) কিছুসংখ্যক এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, (২০) আসরের নামাজ, কেননা এটা দিনের দুই নামাজ এবং রাতের দুই নামাজের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ মতটি ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আহমদ সহ অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ সমর্থন করেছেন।

সঠিক অভিমত : উল্লিখিত মতামতসমূহের মধ্যে ফজর, যোহর ও আসর নামাজের মধ্য হতে যে কোনো একটিকে صَلٰوةُ الْوُسْطٰى হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়; আর তা প্রমাণ সাপেক্ষে–

১. **ফজরের নামাজ :** এই মতটি ইমাম শাফেয়ী ও কিছু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী-এর অভিমত। তাঁদের দলিল হলো–

١ ـ عَنْ عَلِيٍّ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلَانِ اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الصُّبْحِ ـ (اَلْمُوَطَّأُ)

২. **যৌক্তিক প্রমাণ :** শীতকালে প্রচণ্ড শীতের কারণে এবং গ্রীষ্মকালে অধিক ক্লান্তি ও নিদ্রাজনিত কারণে ফজরের নামাজ পড়া খুব কষ্টকর হয়ে থাকে। অতএব এ নামাজের ফজিলত বেশি হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে অনুমিত হয়।

২. **যোহর নামাজের প্রবক্তাদের দলিল :** যারা বলেন যে, সালাতুল উসতা হলো যোহরের নামাজ। তারা নিম্নোক্ত প্রমাণ পেশ করেন। এটি ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত।

১. **হাদীসের প্রমাণ :** عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا قَالَ اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الظُّهْرِ

২. **যৌক্তিক প্রমাণ :** যোহরের সময় প্রচণ্ড গরম থাকে, এই সময় নামাজ পড়া অধিক কষ্টকর, তাই ঐ নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পৃথকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া যোহর নামাজই দিনের মধ্যভাগে পড়া হয়ে থাকে।

৩. **আসর নামাজের প্রবক্তাদের দলিল :** যারা 'সালাতুল উসতা' আসর নামাজকে বলে থাকেন এটি ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর অভিমত, তাঁদের দলিল–

١ ـ عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ ـ (تِرْمِذِىْ)

٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ نَزَلَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَا هَا مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُسِخَتْ فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَقَالَ رَجُلٌ فَهِىَ اَدْنٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ ـ (مُسْلِمْ)

৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, صَلٰوةُ الْوُسْطٰى হলো আসরের নামাজ।

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-ও আসরের নামাজের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَائِلِ الْمُخَالِفِيْنَ **প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব :** যারা 'উসতা নামাজ' বলতে ফজর ও যোহর নামাজকে মনে করেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে নিম্নলিখিতভাবে তাদের দলিলের জবাব প্রদান করা হয়েছে—

১. ফজর নামাজের দাবিদারদের জবাবে আল্লামা শওকানী (র.) বলেন যে, সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় অনুমান নির্ভর কথাবার্তা কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে আসর নামাজকে উসতা নামাজ বলা হয়েছে। আর শীতের কষ্ট ও গ্রীষ্মকালে ঘুম হতে জাগার কষ্টের কারণে ফজরের নামাজ গুরুত্ব লাভ করেছে এবং 'সালাতুল উসতা' বলে একেই হেফাজত করতে বলা হয়েছে, এটা নিছক কিয়াস মাত্র।

২. ইমাম নববী (র.) শাফেয়ী মতাবলম্বী হয়েও যুক্তির মাধ্যমে বিষয়টিকে যাঁচাই করে আসরের নামাজের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, যেহেতু সহীহ হাদীসে আসর নামাজ বলেই প্রমাণিত হয়, সেহেতু এটাই শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব হওয়া উচিত।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে 'উসতা নামাজ' বলতে ফজরের নামাজ প্রমাণিত হয়। হতে পারে তা অন্য কোনো রাবীর বর্ণনা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি নয়। এটা 'মুদরাজ হাদীস' মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় মুদরাজ ফিল হাদীস দলিল হতে পারে না। এতদ্ব্যতীত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উসতা নামাজ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর হাদীস পরিত্যাজ্য হবে।

খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : হিজরি চতুর্থ [ইমাম বুখারী এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন] মতান্তরে পঞ্চম হিজরি [এটা অধিকাংশের মত] ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে আবূ সুফিয়ান সর্বমোট ১০,০০০ পদাতিক ও ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবগত হয়ে রাসূল ﷺ সাহাবীদের পরামর্শক্রমে শহরের ভিতরে থেকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে শহরের রক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিন হাজার আনসার ও মুহাজির কঠোর পরিশ্রম করে এক সপ্তাহে খনন কার্য সমাপ্ত করেন। মহানবী ﷺ স্বয়ং খনন কার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য হযরত ﷺ ৩০০০ সৈন্য নিয়ে পরিখা–অভ্যন্তরে অবস্থান করতে থাকেন। পরিখা অতিক্রম করে আক্রমণ চালাতে অসমর্থ হয়ে আবূ সুফিয়ানের বাহিনী প্রায় এক মাস পর্যন্ত মদীনা নগরী অবরোধ করে রাখে। অবশেষে মারাত্মক খাদ্যাভাব, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রবল হিমেল হাওয়ায় বাধ্য হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে তারা স্বদেশ যাত্রা করে।

পরিখা খনন করে মদীনা রক্ষা করা হয়েছিল বলে এ যুদ্ধকে পরিখার যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।

বিভিন্ন সৈন্যদল তথা কুরায়েশ, গাতফান, ও ইহুদি সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বলে একে আহযাব [দল বা সম্প্রদায়সমূহ]-এর যুদ্ধও বলা হয়। শত্রুদল দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে রেখেছিল বলে এটা মদীনা অবরোধ নামেও পরিচিত।

খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : খন্দক যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে দু'টি মত পাওয়া যায়। যেমন–

১. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, হিজরি চতুর্থ সনে খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
২. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হিজরি পঞ্চম সনে, ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে।

خَنْدَقٌ নামকরণের কারণ : خَنْدَقٌ শব্দটি আরবি। এর অর্থ– পরিখা। যেহেতু এ যুদ্ধে কুরায়েশ ও ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রতিরোধে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে মদীনার বাইরের স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করা হয়। সেহেতু এ যুদ্ধকে 'খন্দকের যুদ্ধ' নামকরণ করা হয়েছে।

مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا -এর অর্থ : হিজরি ৪র্থ/ ৫ম সনে 'খন্দকের যুদ্ধ' অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমদের তুলনায় কাফিরদের সংখ্যা ছিল অধিক। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শে রাসূল ﷺ এ যুদ্ধে মদীনার অরক্ষিত এলাকায় পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিখা খননের কাজ ও শত্রুদের প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকায় নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত আসরের নামাজ। যেহেতু এ কাযা মুশরিকদের মোকাবিলার কারণেই হয়েছিল, তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করেছিলেন যে, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়িসমূহ এবং কবরসমূহ অগ্নি দ্বারা পূর্ণ করুন।

※ আল্লামা তীবী (র.) বদদোয়া বাক্যটির অর্থ করেছিলেন এই যে, জীবন ও মরণে আল্লাহ তাদের জন্য অগ্নি নির্ধারিত করুন এবং ইহকাল ও পরকালে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করুক।

কেউ কেউ বলেলেন যে, পার্থিব শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঘর-বাড়ি বিরান হয়ে যাওয়া, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়া, ছেলে-সন্তান বন্দী হওয়া। আর পরকালীন শাস্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের কবরসমূহ অগ্নি দ্বারা ভরপুর করা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন– ওসতা বা মধ্যম নামাজ হলো আসরের নামাজ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ-এর অর্থ : 'উসতা নামাজ' দ্বারা যে আসরের নামাজ উদ্দেশ্য তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো আলোচ্য হাদীসটি। একে 'উসতা নামাজ' এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা দিনের দুই নামাজ– ফজর ও যোহ্র এবং রাতের দুই নামাজ– মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে অবস্থিত। যেহেতু এই সময় বাজার জমজমাট হতো, লোকেরা ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত হয়ে যেত, ফলে অনেক সময় নামাজ ছুটে যাওয়ার উপক্রম হতো, এজন্যই এখানে এ নামাজের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতকে সমর্থন করে। যদিও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, 'উসতা নামাজ' হলো ফজর নামাজ, কিন্তু তাঁর বর্ণনাটি মারফূ' নয়; বরং মাওকূফ। আর উপরে উল্লিখিত হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি মারফূ'। সুতরাং মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় মাওকূফ হাদীস দলিল হতে পারে না। অথবা হতে পারে এটা ইবনে আব্বাসের উক্তি নয়, বরং এটা মুদরাজ বা বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে সংযোজিত।

٥٨٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا قَالَ تَشْهَدُهٗ مَلٰئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلٰئِكَةُ النَّهَارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا -এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, এতে রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ হাজির হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا-এর অর্থ : মানুষের আমল তদন্ত করার জন্য দু'দল ফেরেশতা আসেন। একদল রাতের জন্য এবং অপর দল দিনের জন্য। উভয় দল আসরের নাজের সময় এবং ফজরের নামাজের সময় একসাথ হয়। হাদীসে উল্লেখিত আয়াতে উভয় দল ফেরেশতার ফজর নামাজে হাজির হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

قُرْاٰنَ الْفَجْرِ-এর اَلْفَجْرِ দ্বারা ফজরের নামাজ উদ্দেশ্য قُرْاٰن দ্বারা উদ্দেশ্য কেরাত। নামাজকে কেরাত বলার কারণ এই যে, এটা নামাজের একটি রোকন। এমনিভাবে নামাজকে রাকাত এবং সিজদা বলা হয়ে থাকে। আল্লামা তীবী (রা.) বলেন, নামাজকে কুরআন নামে অভিহিত করে নামাজিদেরকে নামাজের কেরাত দীর্ঘ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٨٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ عَائِشَةَ (رض) قَالَا اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الظُّهْرِ - رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقًا

৫৮৬. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত ও হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, উসতা নামাজ যোহরের নামাজ। –মালেক যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী উভয় হতে সনদবিহীন অবস্থায় বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটি مَوْقُوْف আর ইমাম তিরমিযী তো একে সনদবিহীন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর পূর্বোল্লিখিত صَلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الْعَصْرِ হাদীসটি مَرْفُوْع আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, مَرْفُوْع-এর মোকাবিলায় مَوْقُوْف বা সনদবিহীন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى দ্বারা আসরের নামাজ উদ্দেশ্য হওয়াই বিশুদ্ধ অভিমত।

تَعْلِيْق-এর পরিচিতি : হাদীসের সনদের মধ্য হতে বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়ার বিভিন্ন অবস্থার মধ্য হতে তা'লীক একটি অবস্থা। যদি সনদের প্রথম দিক দিয়ে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, অথবা পুরা সনদই বিলুপ্ত করা হয় তবে তাকে তা'লীক বলা হয়। যেমন– قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَذَا - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رض كَذَا

٥٨٧ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّىْ صَلٰوةً اَشَدَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلٰوتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلٰوتَيْنِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ)

৫৮৭. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের নামাজ খুব সকাল সকাল পড়তেন। তিনি এমন কোনো নামাজ পড়তেন না, যা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীদের পক্ষে এটা অপেক্ষা অধিক কষ্টকর ছিল। তখন এই আয়াত নাজিল হয়– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى অর্থাৎ নামাজ সমূহের যত্ন করো, বিশেষভাবে উসতা নামাজের'। তিনি [যায়েদ] বলেন, এর পূর্বেও দু'টি নামাজ রয়েছে এবং পরেও দু'টি নামাজ রয়েছে। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি যে, صَلٰوةُ الْوُسْطٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আসরের নামাজ। যার পূর্বে রয়েছে দুই নামাজ তথা জোহর ও ফজর। আর এর পরেও রয়েছে দুই নামাজ তথা মাগরিব ও এশা

وَعَنْ ٥٨٨ مَالِكٍ (رضـ) بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُوْلَانِ الصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى صَلٰوةُ الصُّبْحِ ـ (رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّأِ وَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعْلِيْقًا)

৫৮৮. অনুবাদ : ইমাম মালেকের নিকট [বিশ্বস্ত সূত্রে] পৌঁছেছে যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন, 'উসতা নামাজ ফজরের নামাজ।' হাদীসটি ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর হতে সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসটি হযরত আলী (রা.)-এর স্ববিরোধী হাদীস। কেননা, তাঁর থেকে বর্ণিত ৫৮৩ নং হাদীসে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে যে, ওসতা নামাজ হলো আসরের নামাজ। সুতরাং এখানে ফজর বলাটা সম্ভবত রাসূল ﷺ হতে অবগত হওয়ার পূর্বেকার কথা, তাই এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَعَنْ ٥٨٩ سَلْمَانَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ غَدَا اِلٰى صَلٰوةِ الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْاِيْمَانِ وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫৮৯. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাজের দিকে গেল, সে ঈমানের পাতাকা বহন করল। আর যে ভোরে [নামাজ না পড়ে] বাজারের দিকে গেল, সে ইবলিসের ঝাণ্ডা বহন করে নিল। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসটিতে হেযবুল্লাহ [আল্লাহর দল] ও হেযবুশ্ শয়তান [শয়তানের দল]-এর উপমা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রত্যুষে ফজরের নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করে সে যেন ঈমানের পতাকা উড্ডীন করল, ইসলামের প্রতীক প্রকাশ করল এবং বিরুদ্ধবাদীদের কার্যাবলিকে পর্যুদস্ত করে দিল। এ ব্যক্তিই হেযবুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি ভোরে নামাজ না পড়ে বাজারে গেল সে হেযবুশ্ শয়তানের অন্তর্ভুক্ত। সে শয়তানের পতাকা উত্তোলন করল এবং স্বীয় দীনকে পর্যুদস্ত করল।

মহানবী ﷺ-এর বাণী غَدَا শব্দটি এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, সকাল বেলা বাজারে গিয়ে আড্ডা দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে নামাজ ইত্যাদি আদায় করার পর যদি কেউ হালাল রিজিক অন্বেষণে বের হয় তা হলে দোষের কিছু নেই।

بَابُ الْاَذَانِ
পরিচ্ছেদ : আযান

اَلْاَذَانُ-এর পরিচিতি : اَلْاَذَانُ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْاِعْلَامُ তথা জানিয়ে দেওয়া, সংবাদ প্রদান করা, শুনিয়ে দেওয়া বা অবহিত করা। পবিত্র কুরআনেই এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন– وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ الخ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অবহিত করা। সূরা اَلْاَعْرَافُ-এ রয়েছে যে, فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ তথা মুয়াজ্জিন আযান দিয়েছে।

এর পারিভাষিক পরিচয় হলো : اَلْاَذَانُ هُوَ الْاِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ অর্থাৎ নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নামাজের ওয়াক্ত জানিয়ে দেওয়াকে اَذَانٌ বলা হয়। বস্তুত আযানের বাক্যসমূহের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ যথা– তাওহীদ-রিসালাত এবং ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের ঘোষণা বিদ্যমান রয়েছে।

আযানের উৎপত্তি : ইসলামের প্রাথমিক যুগে পবিত্র মক্কা নগরীতে আযান ব্যতীতই নামাজ পড়া হতো। হুজুর ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর যখন সেখানে মসজিদ নির্মিত হলো তখন তিনি মুসল্লিদেরকে নামাজে একত্রিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সাহাবীদের কাছে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। কেউ কেউ আগুন প্রজ্বলিত করার পরামর্শ দিলেন। আবার কেউ শিঙ্গা বাজানোর কথা বললেন। কিন্তু একটিও গ্রহণযোগ্য হলো না। কোনো সিদ্ধান্ত ব্যতীতই পরামর্শ সভা মুলতবি হয়ে গেল। সাহাবীগণ বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করতে করতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব বাড়ি-ঘরে চলে গেলেন। ঐ রাতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ সপ্নে দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি শিঙ্গা নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শিঙ্গাটি বিক্রি করতে বললে ঐ ব্যক্তি কেনার কারণ জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, আমি শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাজে ডাকব। ঐ ব্যক্তি বলল, তা হতে উত্তম একটি জিনিসের সংবাদ আপনাকে আমি দেব কি? এ বলে তিনি আযানের বাক্যগুলো তাঁকে শিখিয়ে দিলেন। প্রত্যুষে তিনি রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে স্বপ্নের ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার স্বপ্ন সত্য। তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। আজ থেকে বেলাল আযান দেবে। এভাবে সর্বপ্রথম আযানের প্রচলন হলো।

জামাতে নামাজের জন্য আযান দেওয়া সুন্নত, মতান্তরে ওয়াজিব। তবে সুন্নত বা ওয়াজিব যাই হোক না কেন, এটা ইসলামের শেয়ার বা প্রতীক। রাসূল ﷺ যদি কারও বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন, তাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনলে অভিযান বন্ধ করে দিতেন এবং বলতেন, তারা মুসলিম।

আলোচ্য অধ্যায়ে আযানের বিধি-বিধান ও এটা প্রবর্তনের ঘটনাসহ এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٩٠. عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَذَكَرْتُهُ لِاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلَّا الْاِقَامَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ আগুন ও শিঙ্গার উল্লেখ করলেন। একে কেউ কেউ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রথা বললেন। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হলো আযান জোড়া জোড়া এবং ইকামত বেজোড় করে দিতে। বর্ণনাকারী ইসমাঈল বলেন, আমি আমার [ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারী] আইয়ূবকে জিজ্ঞাসা করলাম। [একামত বেজোড় দেওয়া সম্পর্কে] তিনি বললেন, قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ 'কাদ-কামাতিস্ সালাত' অর্থাৎ, একে জোড় বলতে হবে বাকি সবটা বেজোড়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قِصَّةُ مَشْرُوْعِيَّةِ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ **আযান ও একামত প্রচলনের ঘটনা :** শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন মদীনায় মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাধা করলেন, তখন তিনি প্রত্যেক মুসল্লিকে নামাজের জন্য সমবেত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত ধ্বনি স্থির করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। এ জন্য নবীজী সাহাবায়ে কেরামের একটি পরামর্শ সভা ডাকলেন। অধিবেশনে চারটি প্রস্তাব আসল। যথা– ১. ঝাণ্ডা উড়ানো, ২. আগুন প্রজ্বলন, ৩. শিঙ্গা বাজানো, ৪. ঢোল বাজানো। এগুলোর একটিও গৃহীত হয়নি। কেননা, ঝাণ্ডা উড়ালে সকল মানুষ তা দেখতে পাবে না। দ্বিতীয়ত আগুন প্রজ্বলন অগ্নি উপাসকদের কাজ। তৃতীয়ত শিঙ্গা বাজানো খ্রিস্টানদের কাজ এবং চতুর্থত ঢোল বাজানো ইহুদিদের কাজ।

পরামর্শ সভা সেদিন মুলতবি ঘোষণা করা হলো। এ রাতেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি শিঙ্গা নিয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, শিঙ্গাটি আমার নিকট বিক্রি কর। এর মাধ্যমে আমি মানুষদেরকে নামাজের জন্য ডাকব। লোকটি বলল, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দেব কি? এ কথা বলে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে আযানের কালেমাগুলো শিক্ষা দিলেন। রাত পোহালে তিনি ঘটনাটি মহানবী ﷺ-এর নিকট বললেন। এ ঘটনা শুনে রাসূল ﷺ বললেন– اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ অর্থাৎ নিশ্চিত রূপে এটা সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালকে এটা শিখিয়ে দাও। এরপর বেলালকে কালেমাগুলো শিখিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর হযরত বেলাল (রা.) আযান দিলে হযরত ওমর (রা.) দৌড়ে এসে বললেন– يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَأَى

এভাবেই ইসলামে আযানের প্রবর্তন হয়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীদের মধ্যে চৌদ্দজনই ঐ রাতে আযানের বাক্যগুলো স্বপ্নে জেনেছিলেন। এর পরে হযরত বেলাল (রা.) নিয়মিত আযান দিতে লাগলেন এবং এর সাহায্যে নামাজের জন্য আহবান জানাতেন। পরে একদিন হযরত বেলাল (রা.) ফজরের আযান দিতে আসলেন তখন তাঁকে বলা হলো যে, রাসূল ﷺ নিদ্রিত রয়েছেন। হযরত বেলাল (রা.) উচ্চ কণ্ঠস্বরে বললেন 'আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাওম'– 'ঘুম হতে নামাজ উত্তম'। সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব বলেছেন, পরে ফজরের নামাজের আযানে এই বাক্যটি শামিল করে দেওয়া হয়।

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো সাহাবী আযান ও একামতের বাক্যসমূহ স্বপ্নযোগে জানতে পেরেছিলেন এবং মহানবী ﷺ সেগুলো চালু করে দেন। অন্য কথায়, আযান হলো সাহাবীদের স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়– ওহিযোগে প্রাপ্ত নয়, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং মূল ব্যাপার হলো, আযান ও তার বাক্যসমূহ মহানবী ﷺ আল্লাহর নিকট হতে ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। তবে স্বপ্নযোগে আযান প্রাপ্তি সংক্রান্ত হাদীসমূহ সামনে রেখে এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, ওহি অনুযায়ী আযানের বর্তমান বাস্তব প্রচলন চালু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে একসঙ্গে বহু সংখ্যক সাহাবী স্বপ্নযোগে আযানের বাক্যসমূহের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। আল্লাহর ওহি ও সাহাবীদের স্বপ্ন একই সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিংবা আল্লাহর পক্ষ হতে আসা প্রথম এবং স্বপ্নে জানা পরে। কিংবা এটাও হতে পারে যে, আল্লাহই কোনো কোনো সাহাবীকে এ আযান স্বপ্নযোগে জানিয়ে দিয়েছেন এবং রাসূল ﷺ-কেও তা মঞ্জুর করা ও তদনুযায়ী আযান দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

مَعْنَى الْاَذَانِ لُغَةً وَ شَرْعًا **আযানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :**

اَلْاَذَانُ **-এর আভিধানিক অর্থ :** অভিধানবেত্তাদের মতে اَلْاَذَانُ শব্দটি اِسْمُ مَصْدَرٍ যা নিম্নরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়—

১. اِعْلَانٌ [ঘোষণা করা।] যেমন পবিত্র কুরআনের বাণী– وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ

২. اَلْاِعْلَامُ [জানিয়ে দেওয়া।]

৩. اَلنِّدَاءُ [আহবান।]

৪. اَلنِّدَاءُ لِلصَّلٰوةِ [নামাজের জন্য আহবান।]

৫. اَلصَّوْتُ الرَّفِيْعُ لِيَدْعُوَ النَّاسَ اِلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ, মানুষদেরকে জামাতের প্রতি আহবান করার জন্য উচ্চ আওয়াজ।

مَعْنَى الْاَذَانِ اِصْطِلَاحًا :

اَلْاَذَانُ **-এর আভিধানিক অর্থ :** নিম্নে اَلْاَذَانُ -এর কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপিত হলো–

১. هُوَ الْاِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ অর্থাৎ, কিছু নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়া।

২. هُوَ الْاِعْلَامُ بِدُخُوْلِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ بِاَلْفَاظٍ مَشْرُوْعَةٍ অর্থাৎ, অনুমোদিত কিছু শব্দাবলির মাধ্যমে সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়া।

৩. اَلْاَذَانُ هُوَ اِعْلَانٌ مَخْصُوْصٌ بِاَلْفَاظٍ مَخْصُوْصَةٍ فِىْ اَوْقَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ

৪. اَلاَذَانُ هُوَ النِّدَاءُ لِلصَّلٰوةِ فِىْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ

৫. اَلْاَذَانُ هُوَ الصَّلٰوةُ الرَّفِيْعُ لِلْمُؤَذِّنِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ

সার কথা– কতিপয় নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নামাজের ওয়াক্ত জানিয়ে দেওয়াকে আযান বলে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اَلْفَاظِ الْاَذَانِ আযানের বাক্যসংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আযানের বাক্য কয়টি হবে? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. **مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ** : ইমাম মালিকের মতে আযানের বাক্য ১৭টি। তাঁর নিকট প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ দু'বার ও تَرْجِيْعُ الشَّهَادَتَيْنِ রয়েছে। তাঁর দলিল–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً

২. **مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ (رحـ)** : ইমাম শাফেঈ ও আহমদের নিকট আযানের বাক্য ১৯টি। তাঁর মতে প্রথমে تَكْبِيْر চার বার হবে এবং شَهَادَتَيْنِ -কে تَرْجِيْع করতে হবে। তাদের দলিল–

১ـ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ الرَّسُوْلَ ﷺ اَمَرَ بِلَالاً اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ ـ

২ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلَّا اَنَّهُ تَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ ـ

৩. **مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ (رحـ)** : আহনাফের মতে আযানের বাক্য ১৫টি। তাঁদের মতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ -কে ৪ চার বলতে হবে, তবে شَهَادَتَيْنِ -কে تَرْجِيْع করতে হবে না। আহনাফের দলিল–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) اَنَّهُ رَاٰى فِى الْمَنَامِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ فَذَكَرَ الْاَذَانَ بِلَا تَرْجِيْعٍ ـ

নিম্নে ছকের মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হলো—

আযান

বাক্যাবলি	ইমাম আবূ হানীফার মতে	ইমাম মালেকের মতে	ইমাম শাফেয়ীর মতে
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার	২ বার	৪ বার
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার	৪ বার	৪ বার
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার	৪ বার	৪ বার
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	২ বার	২ বার	২ বার
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	২ বার	২ বার
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	২ বার	২ বার	২ বার
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	১ বার	১ বার	১ বার
মোট	১৫ বার	১৭ বার	১৯ বার

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ كَلِمَةِ الْاِقَامَةِ একামতের বাক্যাবলি সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে একামতের বাক্যসংখ্যা মোট ১১ টি। প্রত্যেক কালিমাকে একবার, আর اَللّٰهُ اَكْبَرُ ও قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার করে বলতে হবে। তাঁদের দলিল–

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلَالاً اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلَّا اَنَّكَ تَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ ـ

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ (رحـ) : ইমাম মালিকের মতে ১০টি। তাঁর মতে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ একবার বলতে হবে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে একামতের শব্দ সংখ্যা ১৭টি। তাঁর মতে আযান ও একামতের শব্দসংখ্যা সমান তবে একামতের মধ্যে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ দু'বার বলতে হবে। তাঁর দলিল–

عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضـ) قَالَ عَلَّمَنِى النَّبِىُّ ﷺ الْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ـ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانَ رَجُلًا يُؤَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى مَثْنٰى ـ

নিম্নে তা ছকাকারে পেশ করা হলো–

ইকামত

বাক্যাবলি	ইমাম আবূ হানীফার মতে	ইমাম মালেকের মতে	ইমাম শাফেয়ীর মতে
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৪ বার	২ বার	২ বার
اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	২ বার	১ বার	১ বার
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	২ বার	১ বার	১ বার
حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	২ বার	১ বার	১ বার
حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ	২ বার	১ বার	১ বার
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ	২ বার	১ বার	২ বার
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	২ বার	২ বার	২ বার
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	১ বার	১ বার	১ বার
মোট	১৭ বার	১০ বার	১১ বার

হানাফীদের আরো দলিল :

১. হযরত আবূ মাহযূরা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উনিশ বাক্যে আযান এবং সতেরো বাক্যে একামত শিখিয়েছেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস– তিনি বলেন, আকাশ হতে যে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তাতে একামতের বাক্য সতেরটি স্পষ্টভাবে ছিল।

৩. আসওয়াদ ইবনে যায়েদ (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত বেলাল (রা.) আযান ও একামতের বাক্যগুলোকে দু' দু' বার করে বলতেন।

৪. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন যে, হযরত বেলাল (রা.) ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত একামতের বাক্যগুলো দু'বার করে বলতেন, এ বিষয়ে হাদীসগুলো মুতাওয়াতির বর্ণিত হয়ে এসেছে।

৫. হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী (র.) বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত একামতের বাক্য আযানের বাক্যের মতোই ছিল। বনী উমাইয়াগণ একামতের বাক্য একবার করে প্রচলন করেন।

৬. ইবনে জাওযী (র.) বলেন, আযানের বাক্য দু' দু' বার করে ছিল। একামতও তদ্রূপই ছিল; কিন্তু বনী উমাইয়াগণ ক্ষমতা গ্রহণ করে একামতের বাক্য একবার করে বলার প্রচলন করেন।

হানাফীদের পক্ষ হতে উত্তর :

১. হানাফী মতানুসারী শায়খ নুরুদ্দীন তরাবলুসী বলেন, একামতকে একবার বলা জায়েজের জন্য। এতে মনে হয়, হানাফী মতে একামতের বাক্য একবার বলাও জায়েজ। তবে দু'বার করে বলাই উত্তম।

২. একবার বলা এবং দু'বার বলা শ্বাস ও স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে, বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। অর্থাৎ আযানের বাক্যগুলোকে দু' শ্বাসে এবং একামতের বাক্যগুলো এক নিঃশ্বাসে বলবে। তা হলে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বাক্য দ্বারা বুঝা যাবে যে, কেবলমাত্র 'কাদ কামাতিস সালাত' কে দুইশ্বাসে বলতে হবে। প্রকৃতপক্ষে তেমন বলা হয় না। এর জবাব এই যে, لا শব্দ ব্যবহার করে এর বাহ্যিক অর্থ হতে অতিক্রম বুঝানো হয়নি; বরং ভাবার্থের ব্যতিক্রম বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পিছনের সব বাক্যেই আযান ও একামত সমান, কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু দু'টি বাক্যে। একামতে 'কাদ কামাতিস সালাত' দু'বার বেশি রয়েছে, যা আযানে নেই।

---

৫৯১ وَعَنْ أَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رض) قَالَ أَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِه فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ মাহযূরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দেন এবং বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' অতঃপর তুমি আবার বল, 'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাহ; আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ; হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ; আল্লাহু আকবার, আলাহু আকবার; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে পর পর সাতটি বাক্য রয়েছে। প্রথমে তাক্‌বীর ৪ বার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্য প্রথমে ২+ ২ বার, পরে ২+২ বার [মোট ৪×২ = ৮ বার] ৪র্থ বাক্য ২ বার, ৫ম বাক্য ২ বার, ৬ষ্ঠ বাক্য ২ বার এবং ৭ম বাক্য ১ বার। সর্বমোট ১৯ [উনিশবার]। ২য় ও ৩য় বাক্যকে অর্থাৎ শাহাদাতের বাক্য দু'টিকে প্রথমে দু'বার [আস্তে] বলার পর পুনরায় দু'বার [উচ্চৈঃস্বরে] বলাকে হাদীসের পরিভাষায় تَرْجِيْع তারজী' বলে। ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মতে এভাবে তারজী' পদ্ধতিতে আযান দেওয়া সুন্নত। আমাদের হানাফীদের মতে এটা সুন্নত নয়।

تَرْجِيْع-এর পরিচিতি : تَرْجِيْع শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো- اَلتَّكْرَارُ অর্থাৎ, পুনরায় বলা। আর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো, আযানের মধ্যে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ প্রথমে দু'বার নিম্নস্বরে এবং পরে দু'বার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে تَرْجِيْع বলা হয়।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ حُكْمِ التَّرْجِيْعِ তারজী'র বিধান নিয়ে ইমামদের মতভেদ : اَلتَّرْجِيْعُ-এর বিধান নিয়ে ফিকহবিদদের মতামত নিম্নে উপস্থাপিত হলো-

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ : ইমাম মালিক (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে تَرْجِيْع সুন্নত। তাদের মতের অনুকূলে প্রমাণ হলো-

١ ـ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ ـ

٢. عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَحْمَدَ : ইমাম আহমদের মতে তারজী' করা না করা উভয়ই জায়েজ।

যুক্তি : যেহেতু তারজী' করা না করা উভয় পক্ষেই দলিল-প্রমাণ রয়েছে সুতরাং অনির্দিষ্টভাবে যে কোনো একটি পন্থা অনুসরণ করলেই হবে।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের মতে আযানে تَرْجِيْع মাকরূহ। তিনি প্রমাণ হিসেবে নিম্নরূপ দলিল পেশ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর হাদীস, যে হাদীসের উক্তিতে আযানের সূত্রপাত হয়েছে তাতে আকাশ হতে অবতীর্ণ ফেরেশতা স্বপ্ন যোগে যে আযানের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তাতে তারজী' ছিল না; বরং আযান ও একামতের বাক্যগুলো দু' দু'বার করে বলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

পবিত্র মদীনায় নবী করীম ﷺ-এর দু'জন মুয়াজ্জিন ছিলেন। হযরত বেলাল ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাকতূম (রা.)। তাঁদের কারো আযানে তারজী' ছিল না। যদি তারজী' সুন্নত হতো, তবে হুজুর ﷺ তাদেরকে তারজী' করতে বলতেন। এতে অনেকে বলেন, হযরত আবূ মাহযূরা (রা.)-এর হাদীস মনসূখ হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ওটা মনসূখ হয়নি। তাঁর হাদীসে যে তারজী'র কথা আছে, ওটা সম্পর্কে হানাফী আলিমদের অভিমত এই যে, তারজী' শরিয়তের বিধান কায়েম হওয়ার জন্য ছিল না। বরং সেটা ছিল তালীমের জন্য।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব হলো–

প্রথম হাদীসের উত্তর : প্রথমোক্ত হাদীসে যে বাক্য রয়েছে তার কয়েকটি জবাব হতে পারে। যথা–

ক. রাসূল ﷺ-এর ইচ্ছা ছিল যে, আবূ মাহযূরা আযানের বাক্যগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলুক; কিন্তু সে সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলেছিল, তাই রাসূল ﷺ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ কথা দ্বারা সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয়কে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করতে বলেছিলেন। এটা দ্বারা তারজী' প্রমাণিত হয় না।

খ. হেদায়া গ্রন্থকার হাদীসটির জবাব এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী ﷺ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয়কে পুনঃউচ্চৈঃস্বরে উল্লেখ করতে বলেছিলেন, আর আবূ মাহযূরা একে আযানের অংশ মনে করেছিলেন।

গ. আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেছেন, যেহেতু শিক্ষাদানকালে আবূ মাহযূরা মুসলমান ছিল না; তাই রাসূল ﷺ তার হৃদয়ে সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয়কে সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনঃউচ্চারণ করতে বলেছেন।

ঘ. আবূ মাহযূরা মক্কাভূমির এমন একটি স্থানে আযান দিতেন যেখানে রাসূল ﷺ উপস্থিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে হযরত বেলাল (রা.) রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেই আযান দিতেন, অথচ তাঁর আযানে তারজী' ছিল না। সুতরাং তারজী' না থাকার বর্ণনাই অগ্রাধিকার পাবে।

ঙ. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেছেন যে, আবূ মাহযূরা বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনায় তারজী'র উল্লেখ নেই, সুতরাং না থাকার বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে।

দ্বিতীয় হাদীসের উত্তর :

(ক) যদিও এ একটি বর্ণনা দ্বারা আযানে তারজী' প্রমাণিত হয়, কিন্তু যেহেতু যে ফেরেশতা ও যে সাহাবীর মাধ্যমে আযানের সূচনা হয়েছিল তাতে তারজী'র উল্লেখ নেই। সুতরাং তারজী' না থাকার বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে।

(খ) তারজী' হলো সকল মুয়াজ্জিনের আমলের বিপরীত। সুতরাং তারজী'র উপর আমল করা যাবে না।

(গ) প্রথমোক্ত হাদীসের যে কয়টি জবাব দেওয়া হয়েছে সব কয়টি উত্তরই এ হাদীসের উত্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তৃতীয় হাদীসের উত্তর : শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মাহযূরাকে সাক্ষ্য-বাক্যদ্বয় পুনঃউচ্চারণ করতে বলেছিলেন। আবূ মাহযূরা একে আযানের অংশ মনে করেছিলেন। আর এ কারণেই তিনি বর্ণনা করেছেন যে, আযানের বাক্য ১৯টি।

আযানে চার তাকবীর বলা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ: ইমাম মালেক ও তাঁর অনুসারীদের মতে আযানের শুরুতে যে 'আল্লাহু আকবার' রয়েছে তা দু'বার বলবে, চার বার নয়। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেন : وَرَدَ فِىْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى مَثْنٰى (طَحَاوِىْ) অর্থাৎ, আবূ মাহযূরা (রা.) আযান ও একামতের প্রত্যেকটি বাক্য দু' দু' বার বলতেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অন্যান্য বাক্যের ন্যায় শুরুতে যে اَللّٰهُ اَكْبَرُ রয়েছে তাও দু' বারই বলতেন। এ দলিলের মাধ্যমে ইমাম মালেক (র.) বলেন যে, আযানের বাক্যসমূহ ১৭টি।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে আযানের প্রথম দিকে তাকবীর চার বার বলতে হবে। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন– ١ . عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رض) قَالَ اَلْقٰى عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ التَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهٖ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ . (مُسْلِمٌ)

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রাব্বিহী (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহু আকবার চার বার বলতে হবে। কেননা, তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে আযানের যে বাক্যগুলো প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাতে আল্লাহ আকবার চার বারই উল্লেখ রয়েছে।

৩. আল্লাহু আকবার চারবার বলাই মক্কাবাসীদের আমল। হজের মৌসুমে এর উপর মুসলিমদের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। তদুপরী আল্লাহু আকবার চার বার বলার মধ্যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব চতুর্দিকে বিস্তৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম মালেকের উপস্থাপিত হাদীসের উত্তর :

১. ইমাম মালেকের উপস্থাপিত يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى الخ হাদীসটি অস্পষ্ট, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) উপস্থাপিত হাদীসটি ব্যাপক ও বিস্তারিত। সুতরাং يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى হাদীসটি ব্যাখ্যার যোগ্য।

২. যে সমস্ত হাদীসে আল্লাহু আকবার চারবার বলার কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর বর্ণনাকারী তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভরযোগ্য। সুতরাং তাঁদের বর্ণনাই প্রাধান্য পাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٩٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৫৯২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর যুগে আযানের প্রচলন ছিল দু' দু'বার করে আর একামত এক একবার করে। কিন্তু قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত। [যেহেতু এটা দু'বার বলা হতো]–[আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْاِقَامَةِ একামতের সংজ্ঞা :

مَعْنَى الْاِقَامَةِ لُغَةً একামতের আভিধানিক অর্থ : "اِقَامَةٌ" শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার, মূলবর্ণ হচ্ছে– قَوْم, এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– প্রতিষ্ঠা করা। যেমন– কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে–اَقِيْمُوا الدِّيْنَ।

مَعْنَى الْاِقَامَةِ اِصْطِلَاحًا বা اِقَامَةٌ–এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় একামাত বলা হয়– هُوَ الْاِعْلَامُ عَنْ جَمَاعَةِ الصَّلَاةِ بِعِبَارَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ অর্থাৎ, নির্ধারিত কতগুলো বাক্য দ্বারা মানুষকে নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِيْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবূ আবদুর রহমান, পিতার নাম ওমর ইবনে খাত্তাব, মাতার নাম যয়নব বিনতে মায্‌উন।

২. **নসবনামা :** আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নুফাইল ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে রিয়াহ ইব্‌নে কুরত ইবনে রাজাহ ইবনে আদী ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই। তাঁর নবম পুরুষ রাসূল ﷺ-এর বংশের সাথে মিলে যায়। তিনি কুরায়েশ বংশোদ্ভূত।

৩. **জন্ম :** নবুয়তের দ্বিতীয় বছর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

৪. **ইসলাম গ্রহণ :** নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর পিতা হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে তাঁকেও মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়।

৫. **হিজরত :** ১১ বছর বয়সে পিতার সাথে নবুয়তের ১৩তম বছর মদীনায় হিজরত করেন।

৬. **জিহাদে অংশগ্রহণ :** বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রথমবারের মতো খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। বিদায় হজে রাসূল ﷺ-এর সাথী ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রেরিত বিভিন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

৭. **স্বভাব চরিত্র :** তিনি বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। রাসূল প্রেম, সুন্নাহর অনুসরণ, জিহাদ, খোদাভীতি, ইবাদতে মনোযোগী, বদান্যতা, আত্মত্যাগ, বিনয়, অল্পে তুষ্টি, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইবনুল আসীরের ভাষ্য থেকে আমরা তাঁর গুণাবলি জানতে পারি। তিনি বলেন–

كَانَ كَثِيْرُ الْاِتِّبَاعِ لِاٰثَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَنَّهُ يَنْزِلُ مَنَازِلَهُ وَيُصَلِّىْ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ صَلّٰى فِيْهِ .(اُسْدُ الْغَابَةِ ج/٣ صف ٢٢٧)

হযরত মাইমূন ইবনে মেহরান বলেন, "مَا رَاَيْتُ اَوْرَعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ" 'আমি ইবনে ওমরের চেয়ে ধর্মভীরু কাউকে দেখিনি।'

৮. **বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। ইলমে ফিক্‌হে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৩০টি। ১৭০টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন। ৮১টি বুখারী ও ৩১টি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।

৯. **ইন্তেকাল :** আব্দুল মালিকের শাসনামলে হজ থেকে ফেরার পথে হাজ্জাজের পরামর্শে তার জনৈক সিপাহী ইবনে ওমরের পায়ে বর্শা ঢুকিয়ে দিলে উক্ত আঘাতে রক্তক্ষরণ জনিত কারণে হিজরি ৭৩/৭৪ সালে ৮৩/৮৪ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।

১০. **নামাজে জানাযা ও দাফন :** হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাঁর জানাযার ইমামত করেন। ইবনে ওমরের অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে 'হিল্লে' দাফন করতে চাইলে হাজ্জাজ বাধা দেয়। অবশেষে তাঁকে যীতোয়া মতান্তরে মোহাস্‌সাবে দাফন করা হয়। কেউ কেউ তাঁকে 'কাখ' নামক স্থানে দাফন করার কথা বলেন।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ اِيْتَارِ الْاِقَامَةِ একামত বেজোড় দেওয়া সম্পর্কে মতভেদ : একামতের বাক্যগুলো জোড় বা বেজোড় হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। নিম্নে প্রামাণ সহকারে বর্ণনা করা হলো–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, যুহরী এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে একামতের বাক্যগুলো বেজোড়। অর্থাৎ, প্রথম ও শেষের তাকবীর দু' দু'বার বলবে এবং অবশিষ্ট বাক্যগুলো একবার করে বলবে। তাঁরা নিজের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন ঃ

١ ـ عَنْ اَنَسٍ ...... اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُوْتِرَ الْاِقَامَةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً اِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ـ

সম্ভবত এটা ছিল হযরত বেলাল (রা.)-এর একামত।

৩. ইমাম আবূ দাঊদ ও তিরমিযী ইব্‌রাহীম ইবনে সায়াদের সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে রয়েছে اَلْاَذَانُ مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আযম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছওরী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং কূফাবাসীদের মতে আযানের ন্যায় একামতের বাক্যও দু' দু'বার বলবে। তবে প্রারম্ভিক তাকবীর চার বার বলবে। তাঁরা নিজের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন ঃ

١ ـ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلاً قَامَ فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى ـ (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ)

٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّهٗ رَاَى الْاَذَانَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةَ مَثْنٰى مَثْنٰى ـ (بَيْهَقِىُّ)

٣ ـ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُثَنِّىْ الْاَذَانَ وَيُثَنِّىْ الْاِقَامَةَ حَتّٰى مَاتَ ـ

٤ ـ عَنْ عَلِىٍّ (رض) اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ الْاَذَانُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةَ مَثْنٰى مَثْنٰى ـ (بَيْهَقِىْ)

٥ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّهٗ كَانَ يُثَنِّى اْلاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ ـ (طَحَاوِىْ)

٦ ـ مِنْ طَرِيْقِ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّهٗ كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى ـ

٧ ـ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ـ (تِرْمِذِىْ ، نَسَائِىْ)

٨ ـ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى مَثْنٰى ـ (طَحَاوِىْ)

প্রথম পক্ষের উপস্থাপিত দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী প্রমুখগণ যে সমস্ত হাদীস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, হানাফীদের পক্ষ হতে এর নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম দলিলের উত্তর : তাঁদের উপস্থাপিত প্রথম হাদীসটিতে রয়েছে যে, বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আযান জোড় জোড় এবং একামত বেজোড় করে দিতে। হতে পারে যে, এ নির্দেশটি ছিল সাময়িক সময়ের জন্য, স্থায়ীভাবে ছিল না।

২. অথবা জবাব এই যে, একবার বলা এবং দু'বার বলা শ্বাস ও স্বরের পরিপ্রেক্ষিতে, বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। অর্থাৎ আযানের বাক্য দু'টি দুই শ্বাসে বলতে এবং একামতের বাক্য দু'টি এক শ্বাসে।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : তাঁদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় দলিলের দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত বেলাল (রা.) একামত বেজোড় করে দিতেন। এর উত্তর এই যে, হযরত বেলাল (রা.) হয়ত কখনও جَوَازْ -এর বর্ণনার জন্য অথবা تَعْلِيْم -এর জন্য একবার করে ইকামত দিয়ে ছিলেন। অন্যথা তিনি যে সার্বক্ষণিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে একামত জোড় জোড় করে দিতেন। তা সবিস্তারে বর্ণিত একাধিক রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হযরত বেলালের সার্বক্ষণিক আমলই দলিল হিসেবে প্রাধান্য পাবে।

ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেছেন, যেহেতু হযরত বেলাল (রা.) মহানবী ﷺ ও আবূ বকর (রা.)-এর সম্মুখে আযান ও একামতের বাক্যগুলো জোড় জোড় করে বলতেন, সুতরাং যে সমস্ত হাদীস দ্বারা একামতের বাক্যগুলো বেজোড় প্রমাণিত হয় তা এর পূর্বের।

তৃতীয় দলিলের উত্তর : তৃতীয় হাদীসে যে اَلْاِقَامَةُ مَرَّةً বলা হয়েছে তার উত্তর হলো–

১. সম্ভবত বৈধতা বর্ণনার জন্য কোনো কোনো সময় مَرَّةً مَرَّةً [একবার একবার] বলা হয়েছে।

২. সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো কোনো সময় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে একবার বলাই যথেষ্ট মনে করা হতো।

وَعَنْ ٥٩٣ أَبِىْ مَحْذُوْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মাহযূরা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন উনিশ বাক্যে এবং একামত [শিক্ষা দিয়েছেন] সতেরো বাক্যে। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আযানের মধ্যে তারজী' সুন্নত নয়। এটাই ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব। সুতরাং তাঁর মতে আযানের বাক্য সংখ্যা ১৫টি। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক বলেন, তারজী' সুন্নত। কাজেই তাঁদের মতে আযানের বাক্য সংখ্যা ১৯টি। আবূ মাহযূরার এ হাদীসই তাঁদের দলিল। আর একামতের শব্দসংখ্যা ১৭ টি। এটাই ইমাম সাহেবের অভিমত, অর্থাৎ তিনি বলেন, আযানের ১৫ বাক্যের সাথে 'কাদ্কামাতিস্ সালাহ' বাক্যটি দু'বার সংযুক্ত করলেই একামতের বাক্য সংখ্যা ১৭ই হয়ে যাবে। তবে আবূ মাহযূরার হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, এ অধ্যায়ের শুরুতেই তা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٥٩٤ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَاِنْ كَانَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মাহযূরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম বলে দিন। আবূ মাহ্যূরা বলেন, অতঃপর হুজুর ﷺ তার মাথার সম্মুখের ভাগের উপর হাত মুছলেন এবং বললেন, বলো, 'আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।' এতে তুমি স্বরকে খুব উচ্চ ও বুলন্দ করবে। অতঃপর বলবে, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।' এতে তুমি তোমার স্বরকে নিচু করবে। এরপর তুমি তোমার স্বরকে উচ্চ করে বলবে, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা 'আলাস সালাহ্, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ। হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ।' যদি ফজরের নামাজ হয়, তখন বলবে, 'আস্ সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস্ সালাতু খাইরুম মিনান নাউম।' আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَانُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** একবার নবী করীম ﷺ হুনাইন থেকে ফেরার পথে কোনো এক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। আযানের বাক্যগুলো শুনে নিকটবর্তী বালক-বালিকাগণ শিশুসুলভ উল্লাসে ও খেলার ছলে বাক্যগুলো পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। নবী করীম ﷺ বালক-বালিকাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে উচ্চ ও মধুর কণ্ঠস্বর কার আছে? সকলেই আবূ মাহযূরাকে দেখালেন, তখন আবূ মাহযূরা ইসলাম গ্রহণ করেননি। রাসূল ﷺ আবূ মাহযূরাকে বললেন, যে কথাগুলো তোমরা বলছিলে, সেগুলো আমাকে একটু বলে শুনাও। আবূ মাহযূরা ঐ কথাগুলো পুনরায় বলতে লাগলেন। যখন দুই শাহাদাত আবৃত্তি করছিলেন তখন আস্তে আস্তে বলছিলেন। কারণ, এ তাওহীদের বাণী তাদের ধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত ছিল। এ জন্যই আস্তে আস্তে বলেছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'এগুলো আবারও জোরে জোরে বলো।' সুতরাং তিনি পুনরায় ঐ বাক্যগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন। এ ঘটনায় বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আযানে কোনো তারজী' ছিল না। আবূ মাহযূরা আস্তে বলাতে দ্বিতীয়বার জোরে বলার জন্য রাসূল ﷺ তাঁকে আদেশ করেছিলেন। কিন্তু আবূ মাহযূরা বুঝে নিয়েছিলেন তারজী' আযানের অন্তর্গত। এ জন্য তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আযানে তারজী' করতেন। অথবা তারজী' করাকে শরিয়তের মূল বিধান মনে করে করতেন না, বরং বরকতের জন্য করতেন। কথিত আছে যে, তাঁর মাথার সম্মুখভাগে যে চুলে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র হাতের পরশ লেগেছিল, রাসূল ﷺ-এর হাতের বরকতের জন্য মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনও ঐ চুল কাটেননি। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, আযানের ব্যাপারে আবূ মাহযূরার ঘটনা স্বতন্ত্র। কাজেই তা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

---

٥٩٥ - وَعَنْ بِلَالٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُثَوِّبَنَّ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ اِلَّا فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ الرَّاوِيْ لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ)

৫৯৫. অনুবাদ : হযরত বেলাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, ফজরের নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজেই 'তাছবীব' করবে না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজা] ইমাম তিরমিযী বলেন, বর্ণনাকারী আবূ ইসরাঈল মুহাদ্দিসদের নিকট তেমন শক্তিশালী রাবী নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى التَّثْوِيْبِ **তাসবীবের অর্থ :** تَثْوِيْبٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيْلٌ-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ اَلْاِعْلَامُ بَعْدَ الْاِعْلَامِ বা اَلْاِعْلَانُ بَعْدَ الْاِعْلَانِ সংবাদের পর পুনঃসংবাদ দেওয়া, প্রচারের পর পুনঃপ্রচার করা।

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিও দু'টি ক্ষেত্রে তাছবীব শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে—

১. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা। এটা তাসবীব ফজরের নামাজের সাথে নির্দিষ্ট। উপরোল্লিখিত হাদীসের তাসবীব দ্বারা এই তাসবীব-ই উদ্দেশ্য। এটা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ।

২. আযান ও একামতের মাঝখানে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ কিংবা اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ অথবা اَلصَّلَاةُ . اَلصَّلَاةُ বা অনুরূপ কোনো শব্দ দ্বারা নামাজিদের ডাকা। এ প্রকার তাসবীবের শরয়ী বিধান সম্পর্কে ফিকহবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِي التَّثْوِيْبِ **তাসবীব সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত :** পূর্ববর্তী আলিমগণ ফজর ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তে তাসবীব বলা মাকরূহ বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম নববী (র.) বলেন, এটাই অধিকাংশের মত। তাঁরা নিজেদের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন—

١ - رُوِىَ اَنَّ عَلِيًّا رَاٰى مُؤَذِّنًا يُثَوِّبُ فِى الْعِشَاءِ . فَقَالَ اَخْرِجُوْا هٰذَا الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْمَسْجِدِ .

٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ (رض) فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ قَالَ قَالَ اَخْرِجْ بِنَا فَاِنَّ هٰذِهٖ بِدْعَةٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

তবে পরবর্তী আলিমগণ একে প্রত্যেক নামাজের জন্য মোস্তাহাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একামতের কিছু পূর্বে নামাজের কথা স্মরণ করে দেওয়াকে উত্তম মনে করতেন। আল্লামা শামী (র.) লিখেছেন যে, কাজি, মুফতি বা অনুরূপ যারা দীনি কাজের সাথে জড়িত তাদের ব্যাপারে তাসবীব বলার অনুমতি রয়েছে। তা ছাড়া বর্তমানে দীনি কাজে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট শিথিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাদেরকে নামাজের প্রতি সতর্ক করার জন্য তাসবীব বলা যেতে পারে।

পরবর্তীদের পক্ষ হতে পূর্ববর্তীদের দলিলের উত্তর : পূর্ববর্তী আলিমগণ ফজর ব্যতীত অন্যান্য নামাজে তাসবীব বলা মাকরূহ হওয়ার পক্ষে যে দু'টি হাদীস উপস্থাপন করেছেন, পরবর্তী আলিমগণ এর নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেছেন–

১. ফজরের নামাজে তাসবীব বৈধ হওয়ার কারণ এই যে, এ সময়টা হলো ঘুমের সময়। এ সময় মানুষ অচেতন অবস্থায় ঘুমে নিমজ্জিত থাকে। বর্তমান যুগে এ অচেতনতা ফজরের সময় ছাড়া অন্যান্য নামাজের সময়ও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একই কারণের ভিত্তিতে বৈধতার বিধান সমভাবে প্রত্যেক নামাজের জন্য হওয়া উচিত।

২. যে সমস্ত হাদীসে তাসবীবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তা সে যুগের সাথে নির্দিষ্ট, যখন মানুষের মধ্যে সচেতনতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে যেহেতু মানুষের মধ্যে দীনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতনতা দেখা যায় না; সুতরাং পূর্বের অবস্থার হুকুম এবং বর্তমান অবস্থার হুকুম এক হতে পারে না।

৩. হযরত বেলাল (রা.) থেকে বর্ণিত لَا تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَيْءٍ الخ হাদীসটির উত্তর এই যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী আবূ ইসরাঈল হাদীসবিদদের নিকট শক্তিশালী ও নির্ভরশীল ব্যক্তি নন।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম বেলাল, উপনাম আবূ আবদিল্লাহ। লকব ছিল মুয়ায্যিনু রাসূলিল্লাহ। পিতার নাম রাবাহ, মাতার নাম হামামাহ। হাবশী বংশোদ্ভূত ক্রীতদাস। মক্কাতেই বসবাস ছিল। তাঁর মনিব ছিল উমাইয়্যা ইবনে খলফ।

২. **জন্ম গ্রহণ :** নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত লাভের প্রায় সতেরো বৎসর পূর্বে রাবাহ্‌র ঔরসে, হামামাহ্‌র উদরে মক্কা নগরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাবশী বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে অত্যন্ত কালো রংয়ের ছিলেন।

৩। **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত আবূ বকর (রা.)-এর হাতে ইসলামের প্রথম যুগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অল্প কিছু লোক সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার পর যে সাতজন ব্যক্তি প্রকাশ্যে দীন গ্রহণের ঘোষণা দিয়াছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

৪. **দাসত্ব জীবন ও অসহনীয় অত্যাচার সহ্য :** তাঁর মনিব ছিল উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ। সে ছিল প্রতিমা পূজক। সে যখন জানল যে, তার দাস বেলাল মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্ম গ্রহণ করেছে, তখন সে তাঁর প্রতি অসহনীয় অত্যাচার শুরু করে। তাঁকে তপ্ত বালির ওপর উপুড় করে শোয়ায়ে পিঠের উপর পাথরের চাপা দিয়ে রাখতো। তাঁর গলায় রশি লাগিয়ে শিশুদের মক্কার অলিতে- গলিতে টানতে নির্দেশ দিতো। এত অত্যাচার সহ্য করেও তিনি দীনের উপর অবিচল থাকেন এবং আহাদ আহাদ উচ্চারণ করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে صَاحِبُ الْكَشَّافِ বলেন, وَكَانَ مِمَّنْ عَذَّبَهٗ اَهْلُ مَكَّةَ عَلَى الْاِسْلَامِ

৫. **দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ :** প্রতিদিনের ন্যায় সে দিনও হযরত বেলালের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলছিল। ঘটনাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা.) সে পথ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি এ জাতীয় অত্যাচার দেখে অত্যন্ত ব্যাথানুভব করেন এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে অজস্র অর্থ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন। অবশেষে তিনি তাঁকে আজাদ করে অবর্ণনীয় শাস্তি হতে মুক্তি দেন এবং অবাধে দীন পালনের সুযোগ করে দেন।

৬. **মদীনায় হিজরত :** মক্কার কুরায়েশ কাফিরদের অত্যাচারে তিনিও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি সেখানে হযরত সা'দ ইবনে খুজাইমার অতিথি হন। রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর সাথে হযরত আবূ রুওয়াইহা ইবনে আবদির রহমান খাসয়ামীর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন।

৭. **রাসূল ﷺ-এর মুয়ায্‌যিন নিযুক্তি :** নামাজের সূচনার পর পরই নামাজের জন্য আহ্বান করার উদ্দেশ্যে আযানের পদ্ধতি চালু হয়। হযরত বেলাল (রা.) পৃথিবীর সর্বপ্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হন। তাঁর হৃদয়গ্রাহী আযান শুনে কেউই ঘরে বসে থাকতে পারতো না। মসজিদে লোকজনের ভিড় জমে উঠলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরজায় গিয়ে (حَيَّ عَلَى

(الصَّلٰوةُ) বললে রাসূলে কারীম ﷺ জামাতে হাজির হতেন । হযরত বেলালের অনুপস্থিতির দিন হযরত আবূ মাহযূরা অথবা আমর ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) এ দায়িত্বের আঞ্জাম দিতেন।

৮. **বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ :** ইসলাম গ্রহণের পর হতে গুরুত্বপূর্ণ সকল যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে বদরের যুদ্ধে তিনি ইসলামের বড় শত্রু এবং তাঁর প্রতি অমানবিক অত্যাচারী উমাইয়া ইবনে খালফকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন।
মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাথে ছিলেন এবং তিনি মক্কার অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পান। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তিনি মক্কার কা'বা শরীফের উপর দাঁড়িয়ে আযান দেন।

৯. **সিরিয়া গমন ও তথায় স্থায়ী বসবাস :** হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে তিনি আমীরুল মু'মিনীন হতে অনুমতি নিয়ে সিরিয়া গমন করেন। সিরিয়ার সবুজ ও শষ্য-শ্যামল ভূমি তাঁর নিকট অত্যন্ত পছন্দ হয়। তিনি খলীফাতুল মুসলিমীন হতে অনুমতি নিয়ে তাঁর ইসলামি ভাইসহ খাওলান নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

১০. **মৃত্যু ও দাফন :** তিনি ২০ হিজরি সনে ৬০ অথবা ৬৩ বৎসর বয়সে দামেস্ক নগরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দামেস্কের বাবুস সগীরের নিকটে দাফন করা হয়। আবার কারো মতে তাঁকে বাবুল আরবাঈন-এ দাফন করা হয় এবং তিনি জালব নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।
এ মর্মে صَاحِبُ الْاِكْمَالِ বলেন, وَمَاتَ بِدِمَشْقَ سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَ دُفِنَ بِبَابِ الصَّغِيْرِ وَ قِيْلَ مَاتَ بِحَلَبَ وَ دُفِنَ بِبَابِ الْاَرْبَعِيْنَ

وَعَنْ ٥٩٦ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهٖ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهٖ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَ هُوَ اِسْنَادٌ مَجْهُوْلٌ)

৫৯৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বললেন, যখন আযান দেবে, ধীরে ধীরে দীর্ঘস্বরে দেবে এবং যখনই একামত বলবে, তাড়াতাড়ি নিম্নস্বরে বলবে এবং তোমার আযান ও একামতের মধ্যে এ পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখবে, যাতে ভোজনরত ব্যক্তি ভোজন হতে, পানরত ব্যক্তি পান করা হতে এবং পায়খানা-প্রস্রাবে রত ব্যক্তি তার কার্য হতে অবসর গ্রহণ করে নেয় এবং তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে না, যতক্ষণ না আমাকে [মসজিদে] দেখো। -[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি আব্দুল মুনইম ব্যতীত অপর কোনো সূত্র হতে আমরা জানি না এবং এ হাদীসের সনদটি মাজহুল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى التَّرَسُّلِ وَالْحَدَرِ তারাসসুল ও হদর-এর অর্থ : اَلتَّرَسُّلُ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ- ধীরস্থিরভাবে কোনো কাজ করা। আযানের মধ্যে তারাসসুল করার অর্থ হলো আযানের বাক্যগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করা।
اَلْحَدر শব্দটি বাবে نَصَرَ ও ضَرَبَ -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক অর্থ- তাড়াতাড়ি করা। একামতে হদর করার অর্থ হলো একামতের বাক্যগুলো না থেমে একত্রে উচ্চারণ করা। আযানের মধ্যে তারাসসুল ও একামতের মধ্যে হদর সুন্নত।

وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ -এর অর্থ : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নামাজ হলো আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করার অন্যতম মাধ্যম। তাই যাবতীয় বিষয় ও প্রয়োজনীয় কাজ সেরে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ানো একান্ত আবশ্যক। ফলে অতিমাত্রায় ক্ষুধা-পিপাসা সামনে রেখে অথবা পানাহারে লিপ্ত অবস্থায় তা ত্যাগ করে নামাজে শরিক হলে নামাজ বা নামাজের কার্য আদায়ে একাগ্রতা থাকবে না। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি, তিনি বলেছেন- 'আমি নামাজকে খাদ্যে পরিণত করার চাইতে খাদ্যকে নামাজে পরিণত করাটা অধিক উত্তম মনে করি।'

এমনিভাবে পেশাব-পায়খানার হাজত থাকা অবস্থায় নামাজির মানসিকতা স্থির থাকতে পারে না ; বরং অতি প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তা ত্যাগ না করে নামাজ পড়া মাকরূহ।

মোটকথা, মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক নামাজের পূর্বে এ পরিমাণ সময় হাতে রেখে আযান দিতে হবে, যাতে যার কোনো প্রয়োজন রয়েছে, সে যেন তার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন সেরে নামাজে শরিক হতে পারে।

وَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ -এর অর্থ : মহানবী ﷺ-এর আলোচ্য বাক্যটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. মহানবী ﷺ হলেন ইমাম। সুতরাং ইমাম মসজিদে আসার পূর্বে অনর্থক মুসল্লিদের দাঁড়িয়ে থাকা কষ্ট বৈ কিছু নয়, তাই ইমামের আগমন অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে নিষেধ করেছেন।
২. কেউ কেউ বলছেন, মহানবী ﷺ নিজের হুজ্‌রা হতে তখনই বের হয়ে মসজিদে আসতেন যখন মুয়াজ্জিন একামত বলা আরম্ভ করতেন এবং যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলতেন তখন তিনি মেহ্‌রাবে প্রবেশ করতেন। তাই আমাদের ইমামগণ বলেন– حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সাথে সাথে সমস্ত মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যাবে এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলার সাথে সাথে নামাজ শুরু করে দেবে।
৩. আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, একামত বলা শেষ হলেই হুজুর ﷺ হুজ্‌রা হতে বের হতেন এবং তখনই লোকদেরকে নামাজের জন্য দাঁড়াতে আদেশ করতেন, এর পূর্বে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।
৪. আবার কেউ কেউ বলেছেন, لَا تَقُوْمُوْا দ্বারা মুয়াজ্জিনদেরকে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ মহানবী ﷺ তাদেরকে বলেছেন, আমি হুজরা হতে বের হয়ে আসার পূর্বে একামত বলার জন্য তোমরা দাঁড়াবে না। শায়খুল আদব (র.) বলেছেন, এ শেষের অর্থটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

নামাজের জন্য দাঁড়ার সময় সম্পর্কে ইমামদের মতামত :

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَغَيْرِهٖ : ইমাম মালেক ও অধিকাংশ আলিমের মতে নামাজের জন্য দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোনো সময়-সীমা নির্ধারিত নেই। একামত শুরু করার পূর্বে বা পরে অথবা حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার সময় কিংবা একামত শেষ হওয়ার পর যে কোনো সময় দাঁড়াতে পারবে। এ ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ী ও তার অনুসারীগণ এবং ইমাম আবূ ইউসুফের মতে একামত বলা শেষ হওয়ার পর নামাজের জন্য দাঁড়ানো মোস্তাহাব। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ একবার বলবে তখন সব নামাজি দাঁড়িয়ে যাবে এবং যখন দ্বিতীয় বার قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে তখন নামাজ আরম্ভ করবে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ : ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলবে তখন সব নামাজি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং মুয়াজ্জিন যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলবে তখন ইমাম তাকবীর বলে নামাজ আরম্ভ করবে।

'মারাকিল ফালাহ' গ্রন্থে এসেছে যে, একামত শেষ করার পর নামাজ আরম্ভ করতে কোনো ক্ষতি নেই। তবে সঠিক কথা হলো মুয়াজ্জিন যখন একামত শুরু করবে, সমস্ত নামাজি তখন দাঁড়িয়ে যাবে। এটাই মোস্তাহাব। কেননা, ইবনু শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন– اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا سَاعَةَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ يَقُوْمُوْنَ اِلَى الصَّلٰوةِ

ইমাম যুহরী এখানে সাহাবীদের আমল বর্ণনা করেছেন যে, মুয়াজ্জিন যখন একামত শুরু করতেন তখন সাহাবীগণ নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। আর সাহাবীদের কার্য অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। মহানবী ﷺ-এর উক্তি– عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

নামাজের ইমাম যদি মসজিদে উপস্থিত না থাকে, তবে অধিকাংশ আলিমের মতে ইমামকে না দেখা পর্যন্ত মুক্তাদিরা দাঁড়াবে না।

একটি দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : মহানবী ﷺ-এর আলোচ্য উক্তি لَا تَقُوْمُ حَتّٰى تَرَوْنِىْ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর হুজরা থেকে বের হওয়ার পূর্বেই একামত দেওয়া হতো, নতুবা নিষেধাজ্ঞার কি অর্থ হতে পারে? পক্ষান্তরে হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীস (اِنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُقِيْمُ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ . (مُسْلِمٌ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ হুজরা থেকে বের হওয়ার পরই হযরত বেলাল (রা.) একামত দিতেন। সুতরাং বাহ্যত উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

উপরোক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে, হযরত বেলাল (রা.) মহা নবী ﷺ -এর বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন। যখনই তাঁকে দেখতেন একামত আরম্ভ করে দিতেন। অথচ অন্য লোকেরা তখনও পর্যন্ত মহানবী ﷺ-কে দেখতো না। পরে যখন তারাও দেখতো তখন তারাও দাঁড়িয়ে যেতো। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

قَالَ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ -এর মর্মার্থ : ইমাম তিরমিযী বলেন, আব্দুল মুনইম ব্যতীত অপর কোনো সূত্র হতে হাদীসটি আমাদের জানা নেই।

ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, উপরোক্ত হাদীসটির ভিত্তি হলো আব্দুল মুনইম। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনাকারী এটা বর্ণনা করেননি। তবে ইমাম তিরমিযী নিজ ধারণার ভিত্তিতে এ উক্তি করেছেন। নতুবা হাকেম ও ইবনু আদী প্রমুখ এ হাদীসটিকে অন্য বর্ণনাকারীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এমনকি হাদীসের অন্যান্য কিতাবে অন্য সাহাবীর সূত্রে এ বিষয়বস্তুর উপর হাদীস বর্ণিত আছে। যদিও এ পর্যায়ের সকল হাদীস সনদের ভিত্তিতে দুর্বল, কিন্তু দু'টি কারণে একে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত উম্মতের সমষ্টিগতভাবে হাদীসটির উপর আমল করা।

---

৫৯৭ وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ (رض) قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُذِّنَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৯৭. অনুবাদ : হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফজরের নামাজের আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং আমি আযান দিলাম, অতঃপর বেলাল একামত বলতে চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সুদায়ী আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেবে সে একামতও বলবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বেলাল (রা.) একামত দিতে চাওয়ার কারণ কি? হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন। হয়তো বা তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কোথাও দূরে গিয়েছিলেন এদিকে ফজরের আযানের সময় হয়ে গেল। লেকেরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল; কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। অবশেষে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে সুদায়ী আযান দিলেন। ইতোমধ্যে হযরত বেলাল এসে উপস্থিত হলেন এবং নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন হিসেবে তিনি একামত দিতে চাইলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যে আযান দেবে সে একামত বলবে। বস্তুত হযরত বেলাল (রা.) রাসূল ﷺ-এর নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন হিসাবে একামত দিতে চেয়েছিলেন।

মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলা সম্পর্কে ইমামদের মতামত :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের মতে মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলা মাকরূহ। মুয়াজ্জিন এতে সন্তুষ্ট হোক বা না হোক উভয় ক্ষেত্রের হুকুম একই।

তাঁরা মহানবী ﷺ-এর উক্তি– مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ -কে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।

আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলার বৈধতা সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই, মতভেদ হলো উত্তমতার ব্যাপারে।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ : ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক প্রমুখের মতে মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্যের একামত বলা কোনো প্রকার মাকরূহ ছাড়াই বৈধ।

তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস উপস্থাপন করেন—

١ . اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ لَقِّنْهَا بِلَالًا فَاَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ فَاَقَامَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

٢ . وَ رُوِيَ اَنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَبِلَالٌ يُقِيْمُ وَ رُبَّمَا اَذَّنَ بِلَالٌ وَاَقَامَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

بَدَائِعُ الصَّنَائِعُ নামক গ্রন্থে এসেছে যে, অন্যের একামত বলা সম্পর্কে হানাফীদের বক্তব্য এই যে, যদি মুয়াজ্জিন অপছন্দ মনে করে তবে অন্যের একামত দেওয়া মাকরূহ। কেননা, একামত দেওয়া মুয়াজ্জিনেরই অধিকার। যেমন যিয়াদ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে। আর যদি মুয়াজ্জিন খারাপ মনে না করে তবে মাকরূহ হবে না।

যিয়াদ ইবনে হারেছের সুদায়ী (রা.) সম্পর্কে তাঁরা বলেন, যিয়াদ ইবনে আল-হারেস তখন নব মুসলিম ছিলেন, এ কারণে অন্যের একামত বলাকে হয়তো বা তিনি অপছন্দ মনে করবেন, তাই রাসূল ﷺ বেলাল (রা.)-কে একামত বলতে নিষেধ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫৯৮ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ لِلصَّلٰوةِ وَلَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا اَحَدٌ فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَ لَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানগণ যখন মদীনায় আসেন, তখন তারা অনুমান করে নামাজের জন্য একটা সময় স্থির করে নিতেন এবং ঐ সময় সকলে সমবেত হতেন। নামাজের জন্য কেউ ডাকতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। কেউ কেউ বললেন, খ্রিস্টানদের মতো একটা ঘণ্টি বাজানো হোক। আর কেউ কেউ বললেন, ইহুদিদের মতো একটা শিঙ্গা বাজানো হোক। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা কী কোনো লোককে পাঠাতে পারো না, যে ব্যক্তি মানুষকে নামাজের দিকে ডেকে আনবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বেলাল ! উঠ এবং মানুষকে নামাজের জন্য ডাক। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইহুদি নাসারাগণ নিজ নিজ সংকেত অনুযায়ী মানুষদেরকে ইবাদতের জন্য ডাকতো, তাই হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবে হযরত বেলাল (রা.) কর্তৃক اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ 'নামাজ প্রস্তুত! নামাজ প্রস্তুত!!' বলে লোকদেরকে নামাজের জন্য ডাকা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং তাদের ঘর-বাড়ি এবং মহল্লা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে মুসলিমগণ একটি বৈঠকে সমবেত হলেন। এবারও কোনো প্রকার ফয়সালা ছাড়াই বৈঠকের কার্য সমাপ্ত হলো। পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদি রাব্বিহীসহ কয়েকজন সাহাবী স্বপ্নযোগে আযানের বাক্যগুলো প্রাপ্ত হলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ ওহি বা ইজতেহাদের মাধ্যমে আযান প্রথা প্রচলন করলেন।

৫৯৯ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ (رض) قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِيْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ قُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِلٰى

৫৯৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [নামাজের জন্য] ঘণ্টি বানানোর আদেশ করলেন, যাতে নামাজের জন্য লোকদেরকে সমবেত করতে তা বাজানো হয়। তখন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে আমার নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি গমন করছিল, তার হাতে একটি ঘণ্টি ছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এ ঘণ্টিটি বিক্রয় করবে কি? সে বলল, তুমি এটা দ্বারা কী করবে? আমি বললাম, এটা দ্বারা আমরা নামাজের জন্য আহবান করব। সে বলল, এর চেয়ে উত্তম পন্থা আমি কী তোমাকে বলে দেব না? আমি বললাম, হাঁ, অবশ্যই বলুন। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, তখন সে 'আল্লাহু আক্‌বার' হতে আরম্ভ করে

اٰخِرِهٖ وَكَذَا الْاِقَامَةُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ قَالَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرِ الْاِقَامَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ لٰكِنَّهٗ لَمْ يُصَرِّحْ قِصَّةَ النَّاقُوْسِ)

আযানের শেষ বাক্য পর্যন্ত শব্দগুলো বলল। এরূপে একামতের শব্দগুলোও বলল। অতঃপর যখন আমি ভোরে উঠলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যা স্বপ্নে দেখলাম তা বললাম; তখন তিনি বলে উঠলেন– ইন্‌শাআল্লাহ এটা সত্য স্বপ্ন! উঠো! বেলালের সঙ্গে যাও এবং যা যা তুমি দেখেছ তা বেলালকে বলে দাও। সে শব্দ দ্বারা বেলাল যেন আযান দেয়। কেননা, সে তোমার চেয়ে অধিক উচ্চ-স্বরধারী। সে বলল, অতঃপর আমি বেলালের সাথে গেলাম এবং তাঁকে তা বলে দিতে লাগলাম, আর তিনি তা দ্বারা আযান দিতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) নিজের ঘরে থেকেই তা শুনতে পেলেন এবং ত্বরিত বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম করে বলছি, যা তাকে [আব্দুল্লাহ্‌কে] দেখানো হয়েছে, আমিও সেরূপ স্বপ্নে দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। –[আবূ দাঊদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্]

কিন্তু ইবনে মাজাহ্ একামতের কথা উল্লেখ করেননি। আর ইমাম তিরমিযীও এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন এটা সহীহ্ ও বিশুদ্ধ হাদীস বটে। তবে তিনি 'ঘন্টির' কথা উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ -এর অর্থ : যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘন্টি বানানোর নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ اَرَادَ اَنْ يَّاْمُرَ – ঘন্টি বানিয়ে তার দ্বারা লোকদেরকে নামাজের জন্য সমবেত করার আদেশ দানের ইচ্ছা করলেন, ঠিক সে রাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহীসহ আরো কয়েকজন সাহাবী স্বপ্নযোগে আযানের বাক্যগুলো প্রাপ্ত হলেন। উল্লেখ্য যে, ১১ জন মতান্তরে ১৪ জন সাহাবী একইরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নের কথা শুনে রাসূল ﷺ ওহি বা নিজ ইজতেহাদ দ্বারা স্বপ্নে প্রাপ্ত বাক্যগুলোকে আযান হিসেবে সাব্যস্ত করলেন।

দ্বন্দ্ব ও সমাধান : 'নিশ্চয়ই এটা সত্য স্বপ্ন' এখানে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নকে কিভাবে নির্দ্বিধায় সত্য স্বপ্ন বলে ঘোষণা দিলেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সাহাবী। নবীর স্বপ্ন অবশ্য ওহির সমতুল্য; কিন্তু একজন সাধারণ সাহাবীর স্বপ্নকে কিভাবে সত্য বলে ঘোষণা করে শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? উক্ত প্রশ্নের জবাব কয়েকটি হতে পারে–

১. সম্ভবত মহানবী ﷺ নিজের খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও দূরদর্শিতা তথা ইজতেহাদ অথবা সরাসরি ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এটা সত্য স্বপ্ন।
২. আবার কেউ কেউ বলেছেন, মি'রাজের রাতে তিনি ফেরেশ্‌তাদের আযানের শব্দগুলো শুনেছিলেন, এতদিন তা তাঁর স্মরণ পড়েনি, পরে আব্দুল্লাহ্‌র মুখে শব্দগুলো শুনার সাথে সাথেই তা তাঁর স্মরণে পড়েছে। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলে ফেলেছেন, এটা সত্য স্বপ্ন। সুতরাং এটা একজন সাহাবীর স্বপ্ন হিসেবের শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

৩. আবার কেউ কেউ বলেছেন, আযানের শব্দগুলোর মধ্যে তার অন্তর্নিহিত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্মিলিত যে নূর বা জ্যোতি বিদ্যমান রয়েছে, তা শুনামাত্রই হুজুর ﷺ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা اضغاث احلام বা শয়তান প্রদত্ত স্বপ্ন নয়; বরং এটা মহান প্রভু রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে আমাদের জন্য একটি কল্যাণ ও রহমত, যা তিনি আমাদের সমস্যা নিরসনের জন্য দান করেছেন।

فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ -এর অর্থ : আযানের বাক্যসমূহ হযরত বেলাল (রা.)-কে শিখাতে ও তাঁকে আযান দিতে বলার কারণ স্বরূপ মহানবী ﷺ বলেছেন, তাঁর কণ্ঠস্বর অন্যদের তুলনায় উঁচু। এ থেকে বুঝা গেল যে, উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তিরই আযান দেওয়া উচিত, যেন বহু দূরের লোকেরাও আযান শুনতে পায়।

---

৬০০ - وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৬০০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাজের জন্য বের হলাম। তখন তিনি যে ব্যক্তির কাছে দিয়েই যেতেন তাকে নামাজের জন্য ডাকতেন, অথবা নিজের পা দ্বারা তাকে নাড়া দিতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ কিভাবে পা দিয়ে নাড়া দিলেন? মহানবী ﷺ ফজরের নামাজের জন্য বের হয়ে পথে যাকেই পেয়েছেন তাকে নামাজের জন্য ডেকেছেন, আর যাকে অচেতন পেয়েছেন তাকে পা দিয়ে নাড়া দিয়েছেন। হুজুরের পা দিয়ে নাড়া দেওয়া ব্যহ্যত তাঁর শানের খেলাফ মনে হয়? এর জবাবে বলা যায় যে, হুজুর ﷺ নামাজের জন্য প্রস্তুতির গুরুত্বের তাকিদে এরূপ করেছেন। অথবা হুজুর ﷺ যাদেরকে পা দিয়ে নাড়া দিয়েছেন তারা রাসূলের পায়ের নাড়া খাওয়াকে নিজের জন্য ভাগ্যের ব্যাপার মনে করতেন, তাই এরূপ করা রাসূলের শানের খেলাফ নয়।

বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম নুফাই। আবার কারো মতে তাঁর নাম মাসরূহ। তাঁর কুনিয়াত বা উপনাম আবূ বাকরাহ। তাঁর পিতার নাম হারেছ ইবনে কালাদা। আবার কারো মতে তাঁর পিতার নাম মাসরূহ যিনি হারেছের আজাদ করা গোলাম। তাঁর মাতার নাম সুমায়্যা। তিনি একজন সাহাবী।

২. **বংশ ধারা :** তাঁর বংশধারা হলো নুফাই ইবনে হারেছ ইবনে কালাদা ইবনে আমর ইবনে ইলাজ ইবনে আবী সালমা। তিনি আব্দুল ওজ্জা ইবনে গিয়ারা ইবনে আউফ ইবনে কাসী।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি তায়েফের দিন তায়েফের সুরক্ষিত দুর্গ হতে চরকির সাহায্যে নেমে রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। চরকিকে আরবিতে বাকরা বলা হয়। এ কারণে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর কুনিয়াত রাখলেন আবূ বাকরা। ইত্যবসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে হুজুর ﷺ তাঁকে আজাদ বা মুক্ত করে দিলেন।

৪. **তাঁর ফজিলত :** তিনি সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের মাঝে অত্যন্ত নেককার ও পরহেজগার ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা ইবাদতের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকতেন।

৫. **ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান :** ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান যথেষ্ট রয়েছে। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বমোট ১৩২ [একশত বত্রিশ] খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে সম্মিলিতভাবে আট খানা এবং এককভাবে বুখারীতে পাঁচ খানা ও মুসলিমে তিন খানা হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

তাঁর থেকে তাঁর ছেলে, হাসান বসরী এবং আহনাফ ইবনে কায়েছ সহ আরও অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬. **ইন্তেকাল ও দাফন :** তিনি তায়েফ হতে আসার পর বসরা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতঃপর বসরা নগরীতে ৪৯ হিজরিতে আবার কোনো বর্ণনা মতে ৫১ বা ৫২ হি. সালে ইহলোক ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁকে বসরাতেই সমাহিত করা হয়।

৭. **সন্তানাদি :** মৃত্যুকালে তিনি ৮ জন পুত্র সন্তান রেখে যান। তারা হলেন আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, আব্দুল আযীয, মুসলিম, রায়াদ, ইয়াযীদ এবং ওকবা।

وَعَنْ ٦٠١ مَالِكٍ (رضـ) بَلَغَهُ اَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ يُؤَذِّنُهُ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فَقَالَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يَجْعَلَهَا فِىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ ـ (رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّاءِ)

৬০১. **অনুবাদ :** ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ হাদীস পৌছেছে যে, জনৈক মুয়াজ্জিন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসল তাঁকে ফজরের নামাজের জন্য ডাকতে এবং তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেল; [এটা দেখে] সে বলল, اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ 'ঘুম হতে নামাজ উত্তম' তখন হযরত ওমর তাকে এটা ফজরের আহবানের সাথেই যুক্ত করতে বললেন। –[মুয়াত্তা মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يَجْعَلَهَا فِىْ نِدَاءِ الصُّبْحِ-এর মর্মার্থ : হযরত ওমর (রা.) মুয়াজ্জিনকে "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" বাক্যটিকে ফজরের নামাজের আযানের সাথে সংযোগ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বাক্যটি হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশেই ফজরের আযানে সংযোজিত হয়েছে; কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; বরং মহানবী ﷺ-এর যুগ হতেই এটা বলার রীতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসাংশটির মর্মার্থ এই যে, কারো ঘরে এসে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বাক্যটি ব্যবহার করা ওমর (রা.) পছন্দ করতেন না। বাক্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্র হলো ফজরের আযান। তাই বাক্যটিকে যথাস্থানে প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন। –[মিরকাত]

وَعَنْ ٦٠٢ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ قَالَ اِنَّهٗ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ ـ (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ)

৬০২. **অনুবাদ :** [তাবে তাবেয়ী] হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে আম্মার ইবনে সা'দ– রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন (রা.)–হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁর বাপের মাধ্যমে তাঁর দাদা সা'দ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত বেলালকে হুকুম দিলেন, [আযান দেওয়ার সময়] তার দুই আঙ্গুল তার দুই কানের মধ্যে স্থাপন করতে। তিনি বলেন, এটা তোমার স্বরকে উচ্চ করবে। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِسَعْدٍ সা'দ দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে সা'দ বলতে আল-কারাজ উদ্দেশ্য। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় 'কোবা' মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন এবং তাঁর (রাসূলের) ইন্তেকালের পর মসজিদে নববীতে হযরত বেলাল (রা.)-এর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁর প্রপৌত্র আব্দুর রহমান তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يَجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ-এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলালকে নির্দেশ দিলেন, যেন আযান দেওয়ার সময় তাঁর দুই আঙ্গুল তাঁর কানে স্থাপন করে। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন– اِنَّهٗ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ এটা স্বরকে উচ্চ করবে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, সম্ভবত এর তাৎপর্য এই যে, যখন মুয়াজ্জিনের উভয় কানের ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়া হবে তখন সে উচ্চ আওয়াজ ছাড়া নিজ স্বাভাবিক আওয়াজ শুনতে পায় না। ফলে সে তার আওয়াজকে অধিক উচ্চ করে দূরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছাতে চেষ্টা করবে। কেউ কেউ বলেন, কানে আঙ্গুল দেওয়ার ফলে বধির ব্যক্তি বুঝতে পারে যে এখন আযান হচ্ছে। সুতরাং আযানের সময় কানে আঙ্গুল দেওয়াই নামাজের জন্য আহবানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ কার্যকর ব্যবস্থা।

بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

পরিচ্ছেদ : আযানের মাহাত্ম্য ও মুয়াজ্জিনের উত্তর দান

আযানের মাহাত্ম্য : আযান দ্বারা মানুষদেরকে নামাজ তথা কল্যাণের দিকে আহবান করা হয়। এ কাজ অত্যন্ত মঙ্গলজনক কাজ। পবিত্র কুরআন মাজীদে কল্যাণের দিকে আহবানকারীর প্রশংসায় বলা হয়েছে যে, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ তার চেয়ে উত্তম কে আছে, যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করে। এ আয়াতটি আল্লাহর পথে আহবানকারীর প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আযান দেওয়াও মূলত আল্লাহর দিকে আহবান করা।

আযানের ফজিলত ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম ﷺ বলেন, "اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন হবেন। তথা কিয়ামতের দিন তারা অন্যদের তুলনায় অধিক ছওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হবেন।

আযানের জবাব দেওয়া : আযানের জবাব দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। আযানের জবাব পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে প্রদান করলে সে বেহেশত প্রবেশ করবে বলে নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন।

আযানের জবাব দু'ভাবে হয়—

১. قَوْلِىْ : আযানের বাক্য শ্রবণের পর ঐ বাক্যগুলো শ্রোতা আস্তে আস্তে বলবে। অবশ্য حَيَّ عَلَى দ্বয়ের জবাব لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলতে হবে, আর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ-এর জবাবে صَدَقْتَ وَ بَرَرْتَ বলতে হবে অজুবিহীন, জুনূবী, ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী নারী মুখে মুখে জবাব দিতে পারবে। কিন্তু কেউ যদি মল-মূত্র ত্যাগে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত থাকে তবে সে অবস্থায় জবাব দেওয়া নিষিদ্ধ।

২. فِعْلِىْ :এটা হলো আযান শুনার সাথে সাথে নামাজের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে মসজিদের দিকে গমন করা। আলোচ্য অধ্যায়ে আযানের মাহাত্ম্য ও আযানের উত্তর দান সংক্রান্ত হাদীসগুলো স্থান পেয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٠٣ عَنْ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০৩. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় অন্যান্য মানুষের তুলনায় দীর্ঘ হবে। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا **-এর ব্যাখ্যা :** দুনিয়াতে যারা একমাত্র আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার লক্ষ্যে আযান দেয় তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন যে, 'কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ দীর্ঘ ঘাড়সম্পন্ন হবেন।' এ দীর্ঘ ঘাড়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ—

১. ইবনুল আরাবী বলেছেন- اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا অর্থ اَكْثَرُ النَّاسِ اَعْمَالًا অর্থাৎ, আমলের দিক দিয়ে তারা অধিক আমলকারী প্রমাণিত হবে।

২. কেউ বলেছেন, এর অর্থ কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন নবীগণ প্রথমে বেহেশতে প্রবেশ করবে, অতঃপর প্রবেশ করবে বায়তুল্লাহ শরীফের মুয়াজ্জিনগণ, অতঃপর বাইতুল মাকদিসের মুয়াজ্জিনগণ, অতঃপর আমার মসজিদের মুয়াজ্জিনগণ। পরে দুনিয়ার অন্যান্য মুয়াজ্জিনগণ প্রবেশ করবে।

৩. অথবা এর অর্থ এই যে, মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন সকলের সরদার ও নেতা হবে। আরবের লোকেরা সাধারণত সরদার বা নেতাকে طَوِيْلُ الْعُنُقِ বা 'লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট' বলতো।

৪. অথবা অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন তারা লজ্জিত হবে না, লজ্জিত ব্যক্তি মাথা তুলে তাকায় না।

৫. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ اَكْثَرُهُمْ دَرَجَةً তারা সকলের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হবে।

৬. কারো মতে তাদের অনুসারীর সংখ্যা হবে অন্যান্য সকলের তুলনায় অনেক বেশি। এ কথার বাস্তব ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে, দুনিয়ায় যেহেতু লাখ লাখ মুসলমান মুয়াজ্জিনের আযান শুনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাতে হাজির হয়, তাই কিয়ামতের দিনও লাখ লাখ লোক তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে।

৭. নযর ইবনে শুমায়েল বলেন, এর অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ ঘামের সাগরে হাবুডুবু খাবে তখন মুয়াজ্জিনগণের ঘাড় ঘামমুক্ত থাকবে। তারা এ বিপদ থেকে রেহাই পাবেন।

৮. اَعْنَاقٌ শব্দটি عُنُقٌ -এর বহুবচন। এর একটি অর্থ জামাত বা দল। আরবের লোকেরা বলে جَاءَ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ তথা جَاءَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ তখন হাদীসের মর্মার্থ হবে, কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণের দল ভারী হবে।

৯. কেউ বলেছেন, এর অর্থ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَكْثَرُ النَّاسِ ثَوَابًا অর্থাৎ মুয়াজ্জিনগণ সকলের তুলনায় অধিক ছওয়াব লাভে ধন্য হবে।

১০. কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ اَكْثَرُهُمْ رَجَاءً অর্থাৎ তারা সকলের তুলনায় অধিক আশাবাদী হবে। কারণ যখন কোনো মানুষ কোনো কিছু পাবার আশা পোষণ করে, তখন সে দিকে সে ঘাড় উঁচু করে তাকায়। কিয়ামতের দিন যখন অন্যান্য লোক ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে তখন মুয়াজ্জিনগণ বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার জন্য অপেক্ষমান থাকবেন।

১১. কারো মতে এর অর্থ এই যে, তারা আন্তরিক প্রশান্তি ও মর্যাদা প্রকাশের ভিত্তিতে উন্নত মস্তকে সুদৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকবেন। লজ্জিত ও অপমানিত ব্যক্তির ন্যায় মস্তক অবনত করে দাঁড়াবেন না।

১২. কাজী ইয়ায প্রমুখ মনীষী বলেছেন, اَعْنَاقٌ শব্দটির হামযাটি যের বিশিষ্ট; এমতাবস্থায় এর অর্থ اَسْرَعَا اِلَى الْجَنَّةِ তথা বেহেশতের দিকে দ্রুত গমন। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনগণ বেহেশতের দিকে দ্রুত গমন করবেন।

১৩. আবূ দাউদের পুত্র বলেছেন, আমি আমার পিতা আবূ দাউদের নিকট শুনেছি, বাক্যটির অর্থ–

اِنَّ النَّاسَ يَعْطِشُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِذَا عَطِشَ الْاِنْسَانُ اِنْطَوَتْ عُنُقُهُ وَالْمُؤَذِّنُوْنَ لَا يَعْطِشُوْنَ فَاَعْنَاقُهُمْ قَائِمَةٌ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়বে। আর মানুষ যখন পিপাসা-কাতর হয় তখন তার ঘাড় ভাঁজ ও খাটো হয়ে যায়। কিন্তু মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন পিপাসা-কাতর হবে না, তাই তাদের ঘাড় ঊর্ধ্বে উন্নত ও দীর্ঘ থাকবে। বস্তুত উক্ত হাদীস দ্বারা মুয়াজ্জিনগণের উচ্চ মর্যাদার কথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

وَعَنْ ٦٠٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬০৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন– যখন নামাজের আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পশ্চাৎবায়ু ত্যাগ করতে করতে পিছন দিকে পালাতে থাকে, যাতে সে আযানের ধ্বনি শুনতে না পায়। অতঃপর আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। আবার যখন একামত বলা হয় তখন সে পিছনে ফিরে পালাতে থাকে, একামত শেষ হলে আবার ফিরে আসে এবং মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঢেলে দেয়। আর সে বলে, এ বিষয় স্মরণ কর, ঐ বিষয় স্মরণ কর, যা এতক্ষণ তার স্মরণে ছিল না। মানুষ শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে, সে বলতে পারে না কত রাকাত নামাজ পড়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَهٗ ضُرَاطٌ **-এর মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান পশ্চাৎবায়ু ত্যাগ করতে করতে পিছনে পালাতে থাকে। মিরকাত ও আশি'আতুল লুম্'আত গ্রন্থে এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—

১. হাদীসবিশারদদের কেউ কেউ বলেন, এটা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; কারণ শয়তান দেহ বিশিষ্ট প্রাণী, সে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। তাই গাধা যেমনি দৌড়ালে পশ্চাৎবায়ু বের হয় শয়তানেরও তেমনি হয়ে থাকে।

২. কেউ কেউ বলেন, এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে আযান ধ্বনি শ্রবণে শয়তারে অমনোযোগী হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৩. কারও মতে, এটা শয়তানের প্রতি বিদ্রূপ বুঝানো হয়েছে। যেমন– বলা হয়ে থাকে, ضَرَطَ بِهٖ অর্থাৎ اِسْتَهْزَءَ [সে বিদ্রূপ করল]।

قَوْلُهٗ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লামা রাযী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো শয়তান মানুষের উন্নতি ও সাফল্যের বিরোধী। মানুষ যখন একাগ্রতা ও ঐকান্তিকতার সাথে নামাজ পড়ার ইচ্ছা করে, তখন শয়তান মানুষকে এই সাফল্য হতে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে মানুষের মনে নানা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে শুরু করে। এমনকি মানুষ শেষ পর্যন্ত বলতে পারে না যে, সে কত রাকাত নামাজ পড়ল। আলোচ্য উক্তির ব্যাখ্যা এটাই।

শয়তান আযান হতে পলায়ন করার এবং নামাজ ও যিকর হতে পলায়ন না করার কারণ : হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আলোচ্য বিষয়ে আলিমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে—

১. কেউ কেউ বলেন, হাদীস আছে (لَا يَسْمَعُ صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ আর শয়তান এ সাক্ষ্য দেওয়া হতে বাঁচার জন্য আযানের আওয়াজ শ্রবণ মাত্র পলায়ন করে। আর এ সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপার অন্যান্য আমল তথা নামাজ ও জিকরে নেই। তাই অন্যান্য আমল হতে পালায়ন করার প্রয়োজন নেই।

২. ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, আযানের মধ্যে এক বিশেষ প্রভাব রয়েছে, যা শয়তানের জন্য বিরক্তির কারণ হয়। কেননা, আযানে রিয়া ও গাফলত ইত্যাদি নেই। আর নামাজ ও অন্যান্য আমল এর বিপরীত।

৩. কারো মতে আযান সর্বোত্তম আমল নামাজের প্রতি আহ্বান। আর আযান এমন কতিপয় শব্দে দেওয়া হয় যাতে কমবেশির অবকাশ নেই। তাই এতে শয়তানের শয়তানী প্রকাশের সুযোগ থাকে না। নামাজ এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতে অনেক লোকেরই কম ও বেশি হওয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।

৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, আযানের মধ্যে যেহেতু اَعْظَمُ الْاَرْكَانِ وَاُمُّ الْقُرُبَاتِ -এর উপর উদ্বুদ্ধ করে আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্বের অধীনে اِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللّٰهِ -এর বাস্তবায়ন পূর্বক সাফল্যকে প্রসার করা হয়, তাই শয়তান এতে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক রাগান্বিত হয়। كَمَا فِىْ قَوْلِهٖ (ع) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ এ জন্য শয়তান আযান হতে পলায়ন করে।

---

٦٠٥ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَسْمَعُ مَدٰى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ وَلَا شَىْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে কোনো মানুষ, জিন বা অন্য কোনো কিছু মুয়াজ্জিনের স্বরের শেষ রেশটুকুও শুনবে সে-ই কিয়ামতের দিনে তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয় এবং এতে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মহানত্ব ও এককত্ব এবং তাঁর রাসূলের রিসালাত এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের ঘোষণা দেওয়া হয় তখন জিন, মানুষ ও বস্তু যারা তা শুনতে পায় কিয়ামতের দিন তারা সকলেই সে মুয়াজ্জিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। ফলে এ সাক্ষ্য ঐ সমস্ত লোকের বিপক্ষে যাবে যারা কার্যত উক্ত আযানের জবাব দেয়নি। অর্থাৎ নামাজ আদায় করেনি।

وَعَنْ ٦٠٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهٗ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِىْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَ اَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– তোমরা যখন মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণ করবে, তখন সে যা বলে তোমরাও অনুরূপ তাই বলবে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অসিলা প্রার্থনা করো। কেননা, তা বেহেশতের এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ আসন যা বান্দাগণের মাঝে একজন মাত্র প্রিয় বান্দা ব্যতীত আর কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। আর আমি সে বান্দা হওয়ার আশা রাখি। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলা কামনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ কার্যকর হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ আযানের জবাব দেওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

১. مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মোস্তাহাব। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمِعَ مُؤَذِّنًا فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَمَّا تَشَهَّدَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ مِنَ النَّارِ .

২. مَذْهَبُ بَعْضِ الْاَحْنَافِ وَغَيْرِهِمْ : কোনো কোনো হানাফী ইমাম ও اَهْلُ الظَّوَاهِرِ-এর মতে শ্রোতাদের উপর আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া ওয়াজিব।

١ . عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

٢ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الخ . (مسلم)

প্রতিপক্ষের প্রমাণের উত্তরে বলা হয়–

১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসে উল্লেখ নেই যে, لَمْ يَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ অর্থাৎ, মুয়াজ্জিন যা বলেছেন অনুরূপ তিনি বলেননি।

২. অথবা এটা আযানের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দানের পূর্বের ঘটনা।

৩. অথবা যুদ্ধাভিযান পরিচালনার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তি হতে যে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ধ্বনি শুনেছিলেন তা আযানের ধ্বনি ছিল না।

উল্লেখ্য যে, আযানের জবাব দেওয়া হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারী সকলের মতে ওয়াজিব নয়; বরং কতিপয়ের মতে ওয়াজিব। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) এ কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী বলেন, আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মোস্তাহাব এবং কার্যত জবাব দেওয়া ওয়াজিব। এটাই হানাফীদের গ্রহণযোগ্য অভিমত।

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِيْ جَوَابِ الْحَيْعَلَتَيْنِ **হাইয়াআলাতাইনের জবাবের ব্যাপারে ইমামদের অভিমত :**

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَأَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী, ইবরাহীম নাখায়ী, আহলে যাহের, ইমাম মালেক ও আহমদের এক বর্ণনা মতে আযানের জবাবদাতা হুবহু আযানের শব্দগুলোই বলবে। তাঁদের দলিল হলো—

١ - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ . (بُخَارِيْ)

٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ . (مُسْلِمْ)

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَ أَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালেক প্রমুখের মতে শ্রোতা আযানের উত্তরে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ব্যতীত অন্যান্য বক্যের ক্ষেত্রে মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলবে। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর উত্তরে বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন যে,

١ - عَنْ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .... ثُمَّ قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ . (مُسْلِمْ)

٢ - وَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ يَقُوْلُ .

৩. মুয়াজ্জিন যেহেতু صَلٰوةِ (নামাজ) ও فَلَاحْ (কল্যাণ)-এর দিকে আহবান করে, সুতরাং শ্রোতা যদি তার উত্তরে অনুরূপ বাক্য বলে তবে এটা বিদ্রূপের শামিল হবে। কাজেই হুবহু অনুরূপ বাক্য না বলে শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলা উচিত।

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের উপস্থাপিত উভয় হাদীসে যে قُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ রয়েছে এর উত্তরে (১) আল্লামা শামী (র.) বলেন, যদিও ব্যাপারটি এখানে অস্পষ্ট, কিন্তু মুসলিম শরীফের এক হাদীসে উহার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর উত্তরে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলবে।

২. আল্লামা শাববীর আহমদ ওসমানী (র.) বলেন, যদিও مِثْلَ শব্দটি সাদৃশ্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কখনো উপযোগী অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ -এর অর্থ হবে أَجِيْبُوْا بِالْقَوْلِ الَّذِيْ يُنَاسِبُهُ উপযুক্ত বাক্যযোগে আযানের জবাব দাও। আর হাইয়্যা'আলাতাইনের উপযুক্ত জবাব হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ নতুবা এটা ঠাট্টার শামিল হবে।

أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا هُوَ **-এর মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ হলেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্ব। সুতরাং বেহেশ্‌তের ঐ সম্মানিত স্থানটি একমাত্র তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এতদসত্ত্বেও তিনি কেন উক্ত স্থানটি পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন? এর উত্তর এই যে, রাসূল ﷺ এত বড় সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও নিজের বিনয়ী ভাব ও নম্রতা প্রকাশার্থে এরূপ আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন।

---

٦٠٧ - وَعَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمْ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

৬০৭. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন মুয়াজ্জিন বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার তখন তোমাদের কেউ বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। অতঃপর যখন মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সেও বলে, আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। আবার যখন

رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

মুয়াজ্জিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, সেও বলে, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। এরপর যখন মুয়াজ্জিন বলে, হাইয়্যা আলাস সালাহ্, সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। পুনঃ যখন মুয়াজ্জিন বলে, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, সে বলে; লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, পরে যখন মুয়াজ্জিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সেও বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একান্ত অন্তর হতে, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ اِجَابَةِ الْاَذَانِ আজানের জবাব দানের বিধান : মুয়াজ্জিনের আযানের জবাব দু'প্রকার। যথা- (১) قَوْلِىْ তথা মৌখিক উত্তর। (২) فِعْلِىْ তথা কর্মের মাধ্যমে উত্তর প্রদান।

১. قَوْلِىْ উত্তর দেওয়া মোস্তাহাব। قَوْلِىْ উত্তর প্রদানের পদ্ধতি হচ্ছে, মুয়াজ্জিন যা উচ্চারণ করে থাকে ঠিক তা-ই বলা। শুধুমাত্র حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর সময় বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ । এমনিভাবে আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া হচ্ছে মোস্তাহাব।

২. فِعْلِىْ তথা কর্মের মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার অর্থ হলো, আযান হওয়ার সাথে সাথে পার্থিব কাজকর্ম ছেড়ে নামাজের প্রস্তুতি নেওয়া তথা মসজিদের উদ্দেশ্যে গমন করা। আর আযানের এ فِعْلِىْ জবাব দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, জামাতের জন্য আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কিন্তু আযানের জবাব দেওয়া কারও কারও মতে, ওয়াজিব। তবে যদি কোনো বাধা থাকে তখন তাদের মতেও ওয়াজিব নয়। যেমন- খাওয়া-দাওয়ায় রত থাকলে, সঙ্গমে লিপ্ত থাকলে, প্রস্রাব-পায়খানায় থাকলে অথবা নামাজ অবস্থায় থাকলে আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়।

دَخَلَ الْجَنَّةَ এর অর্থ : রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যদি কেউ পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আযানের জবাব দেয়, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এখানে دَخَلَ الْجَنَّةَ বাক্য দ্বারা অতীতকাল বুঝা গেলেও মূলতঃ অর্থ হবে, ভবিষ্যৎকাল। অর্থাৎ নিশ্চিত সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

১. আল্লামা নববী এ বাক্যের অর্থে বলেছেন, আযানের জবাব দানকারী অন্যান্য নাজাতপ্রাপ্ত মু'মিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. অথবা অন্যান্য গুনাহের শাস্তি ভোগের পর হলেও এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের হকদার হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে শাস্তি ভোগ করার পর সব মু'মিনই তো জান্নাতে যাবে। সুতরাং আযানের জবাব দানকারীকে নির্দিষ্ট করার মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর উত্তরে বলা হয় যে, মু'মিনদের বেহেশ্তে প্রবেশের অন্যান্য গুণের মধ্যে এটাও অন্যতম বিশেষ গুণ।

৩. অথবা বেহেশতে প্রবেশের জন্য অন্য কোনো বাধা না থাকলে শুধু এই আমল দ্বারাই প্রবেশ করতে পারবে।

৪. অথবা এমন ব্যক্তি নির্দিষ্ট জান্নাতেই প্রবেশ করবে, তখন اَلْجَنَّةُ -এর আলিফ-লাম হবে- عَهْد خَارِجِىْ

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, 'লা-হাওলা' বাক্য তো কোনো অপ্রিয় ও শরিয়ত বিরোধী ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা'আলাতাইন' বাক্য তো অতি প্রিয় কাজের প্রতি আহবান করেন। এখানে 'লা-হাওলা' বলার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এর জবাব এই যে, 'লা-হাওলা' বাক্য যেমন অপ্রিয় ও শরিয়ত বিরোধী ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে প্রিয় ও শরিয়ত সম্মত ব্যাপারেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাক্যটির কিছু অংশ উহ্য রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি হবে, لَا حَوْلَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ اِلَّا بِعِصْمَةِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِعَوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা রক্ষা না করলে গুনাহ হতে বাঁচার কোনো উপায় নেই। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্যের উপর টিকে থাকার কোনো শক্তি নেই।

وَعَنْ ٦٠٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬০৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে– অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের তুমিই প্রভু! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে অসিলা ও মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে 'মাকামে মাহ্মূদে পৌঁছাও যার জন্য তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ" কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلدَّعْوَةُ التَّامَّةُ **-এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসে আযানকে দাওয়াতে তাম্মাহ তথা পূর্ণাঙ্গ আহবান নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, আযানে ঘোষিত বাক্যগুলো আল্লাহর বান্দাদের প্রতি তাঁর ইবাদতের জন্য আকুল আবেদন। এ দাওয়াত পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত। কেননা, এটা সমুদয় শিরক ও বিদ'আত উৎখাত করে। এ দাওয়াতে কোনো প্রকার পরিবর্তন সূচিত হতে পারে না। এটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকবে।

اَلصَّلٰوةُ الْقَائِمَةُ **-এর অর্থ :** আযান দিয়ে যে নামাজের দিকে মুসলমানদের আহবান করা হয়, তা চিরদিন স্থায়ী থাকবে। কোনো জাতি বা শরিয়ত এটা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবে না। যতদিন এ বিশ্বলোক স্থায়ী থাকবে, ততদিন নামাজ স্থায়ী থাকবে। এ জন্যই একে স্থায়ী ও চিরন্তন নামাজ বলা হয়েছে।

اَلْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ **কি?** 'মাকামে মাহমূদ' কোনো বিশেষ স্থানের নাম নয়, বরং যেখানেই আল্লাহর প্রশংসা (হামদ) করা হয় এবং যা-ই অতীব সম্মানজনক স্থান, তাই এ নামে অভিহিত হতে পারে।

আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, 'মাকামে মাহমূদ' বলে শাফায়াত করার অধিকার বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তিনি এক অতীব প্রশংসনীয় স্থানে উপবেশন করে তাঁর উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। সে স্থানেরই হয়তো অপর নাম 'আল-ওয়াসীলা' কিংবা 'আল-ফাদীলা'।

সাধারণত আযানের পর যে দোয়া পড়া হয়, এতে আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দোয়া হতে দু'টি বাক্য অতিরিক্ত রয়েছে। একটি হলো وَالْفَضِيْلَةَ-এর পর اَلدَّرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ আর দ্বিতীয়টি হলো দোয়ার শেষাংশে اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

এ সম্পর্কে হাদীসবিদদের অভিমত হলো, প্রথম শব্দদ্বয় হাদীসের কোনো বর্ণনায়ই উদ্ধৃত হয়নি। ইমাম সাখাবী (র.) বলেছেন, لَمْ اَرَاهُ فِىْ شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ হাদীসের কোনো একটি বর্ণনায়ও আমি এটা দেখতে পাইনি।

আর দ্বিতীয় বৃদ্ধিটি বায়হাকীর বর্ণনায় এসেছে। সুতরাং এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।

حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ **-এর অর্থ :** অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য অসিলার প্রার্থনা করে, তার 'খাতেমা বিল খায়ের' অর্থাৎ ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। আশা করা যায়, সে ঈমানের উপর বহাল থেকেই মারা যাবে। আর দয়াল নবী মানবতার মুক্তির দিশারী পাপী মু'মিনদের জন্য নাজাতের সুপারিশ করবেন, এটা তাঁর ওয়াদা। তাই তিনি বলেছেন, আমার জন্য সুপারিশ ওয়াজিব হবে।

وَعَنْ ٦٠٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوْا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ رَاعِى مِعْزًى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬০৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত. তিনি বলেন। নবী করীম ﷺ কোনো যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতেন যখন উষার আবির্ভাব হতো এবং আযান শোনার জন্য কান পেতে রাখতেন। যখন আযানের ধ্বনি শুনতে পেতেন, তখন আক্রমণ বন্ধ রাখতেন, নতুবা আক্রমণ করতেন। একদা তিনি এক ব্যক্তিকে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' বলতে শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সত্য ধর্মে আছ। অতঃপর সে বলল, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি দোজখ হতে বের হয়ে গেলে' [অর্থাৎ রেহাই পাবে]। অতঃপর তারা [সাহাবীগণ] তাঁর প্রতি দেখলেন যে, সে একজন ছাগলের রাখাল। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فِطْرَةٌ-এর অর্থ ও তার দ্বারা উদ্দেশ্য :

فِطْرَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : فِطْرَةٌ শব্দটি فِطْر থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ-

১. ছিঁড়ে ফেলা। যেমন, কুরআনের বাণী- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

২. সুন্নত, রীতি। যেমন, বলা হয়- فِطْرَةُ الْأَنْبِيَاءِ

৩. স্বভাব। যেমন, কুরআনের বাণী - فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

৪. উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা। যেমন, আল্লাহর বাণী- فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ

فِطْر-এর পারিভাষিক অর্থ :

১. আল্লামা তীবী, কুরতুবী, তুরপুশতী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেন, فِطْرَةٌ হলো, দীন বা সত্য কবুল করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা যা আল্লাহ তা'আলা, মানুষের মধ্যে প্রথম থেকেই সংস্থাপন করেছেন।

২. কারো কারো মতে, হাদীসে বর্ণিত فِطْرَةٌ হলো সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি, যা প্রভুর أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ প্রশ্নের উত্তরে সকল মানুষ بَلٰى বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

৩. অথবা فِطْرَةٌ শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো, সঠিক বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ, প্রত্যেক শিশু সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিসহ জন্মগ্রহণ করে।

৪. কেউ কেউ বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মানব সন্তানের প্রাথমিক অবস্থাকে فِطْرَةٌ বলে।

৫. কেউ কেউ বলেন, اَلطَّبِيْعَةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشِبْ بِعَيْبٍ অর্থাৎ, খোদাপ্রদত্ত কদর্যহীন সুস্থ প্রজ্ঞা ও মেধা-ই হলো فِطْرَةٌ

হাদীসে উল্লিখিত فِطْرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে فِطْرَةٌ দ্বারা প্রথম অভিমতটিই তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতার কথাই বুঝানো হয়েছে। তবে রাসূল ﷺ -এর বক্তব্য অনুযায়ী এখানের فِطْرَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য দীন বা ইসলাম

خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ-এর অর্থ : 'তুমি দোজখ হতে বেঁচে গেলে' এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি শাহাদাতাইনের অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়ে মৃত্যুবরণ করে সে বদ-আমলের দরুন প্রথমে দোজখে গেলেও শাস্তি শেষ হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। মোটকথা, সে হামেশার জন্য দোজখে থাকবে না।

وَعَنْ ٦١٠ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهٗ ذَنْبُهٗ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬১০. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে বলে– অর্থ– 'আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্‌কে প্রতিপালক প্রভু হিসাবে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি' তবে তার গুনাহ্ মাফ করা হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আযানের পর দোয়া পর্ব করা অতি ছওয়াবের কাজ। সাধারণত যে দোয়াটি প্রচলিত আছে তা ৬০৮ নং হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত দোয়ার পর উল্লিখিত হাদীসে উদ্ধৃত দোয়াটি পড়ার ব্যাপারে রাসূলে কারীম ﷺ পরোক্ষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম বায়হাকী বর্ণিত একটি হাদীসে দোয়াটি নিম্নরূপ উদ্ধৃত হয়েছে যে,

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ نَبِيًّا وَالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَالْكَعْبَةِ قِبْلَةً اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ شَهَادَتِىْ هٰذِهٖ فِىْ عِلِّيِّيْنَ وَاَشْهِدْ عَلَيْهَا مَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَاَنْبِيَائَكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَاَخْتِمْ عَلَيْهَا بِاٰمِيْنَ وَاجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ .

وَعَنْ ٦١١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬১১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে [অর্থাৎ আযান ও একামতের মধ্যে] নামাজ রয়েছে। প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে নামাজ রয়েছে। অতঃপর তৃতীয় বারে বলেছেন, যে পড়তে চায় তার জন্য। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** একামতও আযানের অনুরূপ। আযান দ্বারা নামাজের সময় হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একামতের দ্বারা নামাজ শুরু হওয়ার কথা ঘোষণা দেওয়া হয়। কাজেই একটার প্রাধান্যের ভিত্তিতে উভয়টিকে আযান বলা হয়েছে. এরূপ বলার প্রচলন আরবদের মধ্যে রয়েছে। যেমন তারা বলে থাকে اَلْقَمَرَيْنِ তথা চন্দ্র ও সূর্য بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ বাক্যটি তিন বার উচ্চারণ করার পিছনে রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো, আযান ও একামতের মাঝখানে নামাজ পড়ার প্রতি উম্মতদেরকে উৎসাহ প্রদান করা। অবশ্য এ নামাজ ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব। রাসূল ﷺ-এর উক্তি لِمَنْ شَاءَ দ্বারা এটাই বুঝা যায়।

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য নামাজে আযান ও একামতের মাঝখানে সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নতে যায়েদা ইত্যাদি নামাজ আছে, কিন্তু মাগরিবের নামাজের আযান ও একামতের মাঝখানে কোনো নামাজ পড়া যাবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَاَهْلِ الْحَدِيْثِ : ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আসহাবে হাদীসের মতে মাগরিবের নামাজের পূর্বে দুই রাকাত পড়া মোস্তাহাব। দলিল হিসাবে ইবনুল মুগাফফালের হাদীস পেশ করা হয়েছে যে, اَنَّهُ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ এ হাদীসের ব্যাপকতায় মাগরিবের নামাজও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হযরত ইবনে হিব্বান সহীহাইনের হাদীসের উপর বৃদ্ধি করেছেন– اَنَّهُ (ع) صَلَّاهُمَا اَىْ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِىِّ কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত প্রমাণিত নয়, যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন–

১. مَا رَاَيْتُ اَحَدًا يُصَلِّيْهِمَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَاِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَعَنِ الْخُلَفَاءِ الْاَرْبَعَةِ وَجَمَاعَةٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا لَايُصَلُّوْنَهُمَا حَتّٰى نَهٰى عَنْهُمَا اِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ فِيْمَا رَوَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ نَهٰى عَنْهُمَا وَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَكُوْنُوْا يُصَلُّوْنَهَا .

২. عَنْ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عِنْدَ كُلِّ اَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ خَلَا صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

৩. اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِمَنْ شَاءَ اِلَّا الْمَغْرِبَ .

৪. তদুপরি এর দ্বারা মাগরিবের নামাজে দেরি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে, অথচ মাগরিব নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ার প্রতি পরোক্ষ নির্দেশ রয়েছে। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَنْ تَزَالَ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَالَمْ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ اِلٰى اِشْتِبَاكِ النُّجُوْمِ–

প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর :

১. প্রতিপক্ষ ইবনুল মুগাফ্ফাল (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করছেন তার উত্তর এই যে, যেহেতু রাসূল ﷺ খুলাফায়ে রাশেদা ও বহু সংখ্যক সাহাবী হতে না পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ -এর ন্যায় অস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ প্রমাণিত হবে না।

২. ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূল ﷺ মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়েছেন, তা নফল নামাজ ছিল না; বরং তা ছিল অনাদায়ী নামাজের কাযা। তাবারানী শরীফে বর্ণিত আছে যে,

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ سَاَلْنَا نِسَاءَ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ رَاَيْتُنَّ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْنَ لَا غَيْرَ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّاهُمَا عِنْدِىْ مَرَّةً فَسَاَلْتُهُ مَاهٰذِهِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ (ع) نَسِيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ .

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٦١٢ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

৬১২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ইমাম হলেন দায়িত্বশীল, আর মুয়াজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামদেরকে সঠিক পথে চালাও এবং মুয়াজ্জিনদেরকে ক্ষমা করে দাও। [আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও শাফেয়ী, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে মাসাবীহে সংকলিত শব্দাবলি সহকারে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضَامِنٌ ও مُؤْتَمَنٌ**-এর বিশ্লেষণ এবং ইমাম ও মুয়াজ্জিনের মাঝে উত্তম কে?** আলোচ্য হাদীসে اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ বাক্যে ضَامِنٌ এর শব্দমূল ضَمَانٌ -এর অর্থ জরিমানা নয়; বরং এখানে অর্থ– হেফাজত ও সংরক্ষণ। কেননা, ইমাম মুক্তাদিগণের

নামাজের অর্থাৎ, তাদের কেরাত, রাকাতের সংখ্যার কফিল। আর মুক্তাদী ইমামকে রুকু অবস্থায় পেলে তখন ইমাম মুক্তাদির কেয়ামের দায়িত্বশীল। তাই ইমাম হলেন জামিন।

আর মুয়াজ্জিন مُؤْتَمَنٌ বা আমানতদার হওয়ার অর্থ হলো মানুষ মুয়াজ্জিনের আযানের আওয়াজের উপরই নামাজের ওয়াক্তের ব্যাপারে এবং অন্যান্য ওয়াক্তিয়া দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নির্ভর করে থাকে।

আল্লামা আশরাফ বলেছেন, উক্ত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, আযানের মর্যাদা ইমামতের চেয়ে অধিক। কেননা হাদীসে এসেছে اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ আর ضَامِنٌ-এর তুলনায় اَمِيْن উত্তম।

তবে সর্বসম্মত অভিমত এই যে, ইমামতের মর্যাদা অধিক। কেননা, মুয়াজ্জিন শুধু নামাজের ওয়াক্তের জিম্মাদার। আর ইমাম নামাজের সকল রুকনের জিম্মাদার এবং ইমাম মুক্তাদিগণ ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে দোয়ার দূতালি করে থাকেন। তা ছাড়া ইমাম, নবী করীম ﷺ-এর খলিফা। আর মুয়াজ্জিন হযরত বেলাল (রা.)-এর খলিফা।

এতদ্ব্যতীত হাদীসে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেন, اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) কেননা দোয়ার মধ্যে اِرْشَادْ-এর শব্দ রয়েছে। আর اِرْشَادْ এটা دَلَالَةٌ مُوْصِلَةٌ اِلَى الْمَطْلُوْبِ-কে বলে, যা নিশ্চিতভাবে উচ্চ মর্যাদার বিষয়। আর মুয়াজ্জিনদের জন্য مَغْفِرَتْ-এর দোয়া বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে, মাগফিরাত পাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। لِاَنَّ الْغُفْرَانَ مَسْبُوْقٌ بِالذُّنُوْبِ .

وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ দ্বারা উদ্দেশ্য : অর্থাৎ, ইমম শাফেয়ী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় হাদীসটি মাসাবীহে উল্লিখিত শব্দাবলি সহকারে সংকলিত হয়েছে। আর তা হল–

اَلْاَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَالْمُؤَذِّنُوْنَ اُمَنَاءُ فَاَرْشِدِ اللّٰهُ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ .

---

৬১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র ছওয়াবের উদ্দেশ্যেই সাত বছর আযান দেয়, তার জন্য দোজখের আগুন হতে মুক্তি নির্ধারিত। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٦١٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে سَبْعَ سِنِيْنَ বা সাত বছর দ্বারা নির্ধারিত সাত বছর উদ্দেশ্য নয়, বরং বেশির নিম্ন সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, তথা যে ব্যক্তি কমপক্ষে সাত বছর আযান দেয়। আর مُحْتَسِبًا-এর অর্থ হলো কোনো প্রকার লৌকিকতা প্রদর্শন বা পার্থিব স্বার্থ-হাসিল ব্যতীত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা।

---

৬১৪. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার প্রভু সেই ছাগল-ভেড়ার রাখালের উপর সন্তুষ্ট হন, যে পাহাড়ের চূড়ায় ছাগল-ভেড়া চরায়; নামাজের [সময় মতো] আযান দেয় এবং নামাজ পড়ে। তখন পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহ [ফেরেশতাদেরকে] বলেন, আমার এই বান্দার প্রতি দেখ! সে আযান দেয় এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, আর আমাকে ভয় করে [তোমরা সাক্ষী থাক] আমি আমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٦١٤ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلٰوةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِىُّ)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে 'সে আযান দেয় এবং নামাজ পড়ে।' এখানে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, রাখাল ছিল একা। সে কেন আযান দিল। আযান তো দেওয়া হয় জামাতের জন্য। ইবনুল মালিক এর উত্তরে বলেন যে, একাকী ব্যক্তির আযান দেওয়ার মধ্যে উপকারিতা হলো ফেরেশতা ও জিন জাতিকে নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার খবর দেওয়া। কেননা তাদের জন্য নামাজ রয়েছে। এখানে একামতের কথা উল্লেখ করা হয়নি এ জন্য যে, একামত দেওয়া হয় উপস্থিত জনতাকে নামাজ আরম্ভের প্রতি সতর্ক করার জন্য। আর যেহেতু ঐ ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়ার মতো কেউ ছিল না, তাই নামাজ আরম্ভ করার প্রতি সতর্ক করার জন্য একামত দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু এটা মাযহাব পরিপন্থি কথা। কেননা, একাকী নামাজ পালনকারীর জন্যও আজান ও ইকামত উভয়টি দেওয়া উত্তম। তাই এখানে এরূপ বলাই যুক্তিসঙ্গত যে, আযান দ্বারা এখানে ব্যাপক অর্থে জানান দেওয়া ও অবহিত করা উদ্দেশ্য। অতএব এ বিবেচনায় আযানের মধ্যে একামতও শামিল। অথবা একামতের কথা উহ্য রয়েছে। সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে একামতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তী বাক্যে উল্লিখিত يقيم শব্দটি এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে।

وَعَنْ ٦١٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ عَلٰى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدٌ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ تَعَالٰى وَحَقَّ مَوْلَاهُ وَ رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهٖ رَاضُوْنَ وَ رَجُلٌ يُنَادِىْ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৬১৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কস্তুরীর স্তূপের উপরে থাকবে। এক : ঐ ক্রীত দাস যে আল্লাহ তা'আলার হক এবং তার প্রভুর হক আদায় করেছে। দুই. ঐ ব্যক্তি যিনি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করেন, আর তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। তিন. ঐ ব্যক্তি যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রত্যেক দিনে ও রাতে আজান দেন। –[তিরমিযী। তিনি বলেন, এটা গরীব হাদীস]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে তিন ব্যক্তির পরকালীন সফলতার কথা ঘোষিত হয়েছে–

এক : যে আল্লাহর বান্দা একই সময় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর হক আদায় করে এবং একই সাথে তিনি পার্থিব জগতে যার অধীনে কোনো কাজে নিয়োজিত তার কাজেও বিন্দুমাত্র ফাঁকি না দিয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

দুই : যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করেন, আর সে সম্প্রদায়ের জনগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এখানে শুধু নামাজের ইমামতি উদ্দেশ্য নয়, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইমামতিও এর মধ্যে শামিল অর্থাৎ যিনি সমাজের নেতৃত্ব দান করেন এবং জনসাধারণের জন্য ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেন।

তিন : যিনি দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য আযান দেন। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুয়াজ্জিন আমানতদার। নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী আযান দেওয়ার দায়িত্ব মুয়াজ্জিনের উপর অর্পিত। কেননা, অনেক মানুষ নামাজে শরিক হওয়ার ব্যাপারে মুয়াজ্জিনের উপর নির্ভরশীল থাকে। মুয়াজ্জিন আযান দিলেই তারা নামাজের জামাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

وَعَنْ ٦١٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلٰوةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَابَيْنَهُمَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

وَ رَوَى النَّسَائِىُّ اِلٰى قَوْلِهٖ كُلُّ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ وَقَالَ وَلَهٗ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ صَلّٰى .

৬১৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মুয়াজ্জিনকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার স্বরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং তার জন্য প্রতিটি সজীব ও নির্জীব সাক্ষ্য দান করবে। আর [আযান শুনে] যে নামাজে উপস্থিত হয় তার জন্য এক নামাজে পঁচিশ নামাজের ছওয়াব লেখা হবে এবং তার উভয় নামাজের মধ্যকার [সগীরা] গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। [আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

কিন্তু নাসাঈ 'প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব' পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, 'তার জন্য রয়েছে যারা নামাজ পড়েছে তাদের সমান ছওয়াব।'

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهٗ مَدٰى صَوْتِهٖ-এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুয়াজ্জিনকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তার স্বরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।' মহানবী ﷺ-এর উক্তিটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে–

১. মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে তার পাপ ততদূর স্থান পূর্ণ করলেও তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
২. অথবা যে প্রান্ত পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি পৌঁছবে সেই প্রান্তে বসে যদি সে কোনো অপরাধ করে থাকে তবে তাও ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
৩. অথবা মুয়াজ্জিনের আযান-ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে তত দূরের মধ্যে যত লোক বসবাস করবে মুয়াজ্জিনের সুপারিশে তাদের সকলের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
৪. অথবা ততদূর স্থানের ঐসব শ্রোতাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে যারা তার আযান শুনে জামাতে শরিক হয়।
৫. অথবা يُغْفَرُ অর্থ– يَسْتَغْفِرُ অর্থাৎ, সব কিছু মুয়াজ্জিনের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করবে।
৬. অথবা অর্থ এই যে, মুয়াজ্জিন যখন আযানের ধ্বনিকে নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহও তার জন্য ক্ষমার শেষ সীমা নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ তাঁকে পূর্ণাঙ্গরূপে ক্ষমা করে দেন।

وَعَنْ ٦١٧ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৬১৭. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক আছে! তুমি তাদের ইমাম, তবে তুমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির অনুসরণ করো [অর্থাৎ, দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখো] এমন একজন মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করো যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেবে না।–[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর আলোচ্য হাদীস হতে দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, আর তা হলো,

১. মুক্তাদিদের মধ্যে কেউ দুর্বল বা সমস্যাগ্রস্ত থাকলে ইমামের উচিত তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। যথাসম্ভব নামাজ সংক্ষিপ্তাকারে পড়া।
২. আযানের ন্যায় ইমামতির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করাই উত্তম।

আযান ও অন্য সব দীনি কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদ : আযান ও অন্য সব দীনি কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ কি না এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ : ইমাম শাফেয়ী আহমদ মালিকের মতে আযান ইত্যাদি দীনি কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ।

ইবনুল আরাবী বলেন, আযান, নামাজ, বিচার-ফয়সালা, কুরআন শিক্ষা দান এবং অন্যান্য দীনি কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ, এটাই সঠিক অভিমত। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন করেন–

১. মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানগণ উক্ত কাজের বিনিময়-পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। সুতরাং তাদের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও এটা বৈধ হবে।

২. মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– **مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمَؤُوْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ** আর মুয়াজ্জিনও কর্মচারীর ন্যায়, সুতরাং তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে।

৩. হযরত আবূ মাহযূরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

فَاَلْقَى عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ الْاَذَانَ فَاَذَّنْتُ ثُمَّ اَعْطَانِيْ حِيْنَ قَضَيْتُ التَّاذِيْنَ مَرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ . (نَسَائِيْ)

এখানে আযানের উপর বিনিময় দেওয়া সাব্যস্ত হলো, তা ছাড়া সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার হাদীস দ্বারাও বিনিময়ের পক্ষে দলিল দেওয়া হয়। অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার পর যে বিনিময় নেয়া হয়েছে, তার উপর হুজুরের পক্ষ হতে কোনো বিরোধিতা হয়নি।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : তবে ইমাম আযম ও তাঁর প্রবীণ শিষ্যদের মতে আযান, একামত, তালীমে কুরআন ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণ হালাল হবে না। তাঁদের দলিল– হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস–

اِنَّهُ (عـ) قَالَ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاَحْمَدُ)

তা ছাড়া আযান, একামত, ইমামত ও তালীমে কুরআন ইত্যাদির ব্যাপারে বিনিময় গ্রহণ লোকদেরকে এ সকল দীনি ব্যাপার হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয় **لِاَنَّ ثِقْلَ الْاَجْرِ يَمْنَعُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ**

আর এ কথার প্রতিই আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন : **اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُوْنَ** সুতরাং বিনিময় নেওয়ার কারণে লোকজন দীনি বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– **وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اَىْ مَا تَسْئَلُهُمْ عَلَى التَّبْلِيْغِ اَجْرًا** এখন তাবলীগ হুযূর ﷺ নিজে করুন বা অন্যকে হুকুম দিয়ে তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দেওয়া হোক। যেমন– **فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ** সুতরাং হুযূর ﷺ নিজে তাবলীগ করলে যেমন বিনিময় গ্রহণ জায়েজ নয়, তদ্রূপ হুযূরের নির্দেশে যে তাবলীগ করে তার জন্যও বিনিময় গ্রহণ জায়েজ হবে না। **لِاَنَّ ذٰلِكَ تَبْلِيْغُ النَّبِيِّ مَعْنًى** তদ্রূপ হযরত ইবনে হিব্বান ইয়াহইয়া হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে,

اَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانٍ عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِنِّىْ لَاُبْغِضُكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ وَتُبْغِضُنِىْ فِى اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَعَمْ اَنْتَ تَسْئَلُ عَلٰى اَذَانِكَ اَجْرًا حَكَاهُ الشَّوْكَانِىْ فِى النَّيْلِ .

আহনাফের পক্ষ হতে তিন ইমামের দলিলের উত্তর :

১. আয়িম্মায়ে ছালাছা তাদের প্রথম দলিলে বলেছেন যে, খালীফাতুল মুসলিমীন আযান ও একামতের বিনিময় গ্রহণ করতেন। এর উত্তর এই যে, তারা রাষ্ট্রীয় এন্তেজাম ও হেফাজতের বিনিময় গ্রহণ করতেন, ইমামত ও ইকামতের বিনিময় নয়।

২. আর দ্বিতীয় দলিলের উত্তর এই যে, মুয়াজ্জিন ইত্যাদিকে **عَامِلٌ**-এর উপর কিয়াস করা হয়েছে এই কিয়াস ঐ **نَصٌّ** -এর প্রতিদ্বন্দ্বী যা হানাফীদের দলিলে বর্ণিত হয়েছে।

৩. তৃতীয় দলিলে হযরত আবূ মাহযূরা (রা.)-এর যেই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা ছিল। আর হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস-এর পরে মুসলমান হয়েছেন। সুতরাং ওসমান ইবনে আবুল আসের হাদীস দ্বারা সে হাদীস মানসসূখ হয়ে গেছে। তা ছাড়া এ ঘটনায় নানা বিশ্লেষণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নিকটতম সম্ভাবনা এই যে, হযরত আবূ মাহযূরা নও মুসলিম হওয়ার কারণে **تَالِيْفِ قَلْبٍ** -এর ভিত্তিতে তাঁকে রৌপ্যের থলি দেওয়া হয়েছে।

৪. আর চতুর্থ দলিলে সূরায়ে ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার হাদীস নেওয়া হয়েছে। এর উত্তর এই যে, এতে চিকিৎসার ভিত্তিতে বিনিময় নেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, যা সর্বসম্মতভাবে জায়েজ আছে। এতে তালিম ইত্যাদির জন্য বিনিময় নেওয়া হয়নি। মুতাকাদ্দেমীন-এর মাযহাব এই যে, لَا يَحِلُّ اَخْذُ الْاَجْرِ عَلَى الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ যা নিশ্চিতরূপে সঠিক ও কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে মুতায়াখখিরীন ইমামগণ যুগের অবস্থার পরিবর্তনে বাধ্য হয়ে ফতোয়া দিয়েছেন যে, বিনিময় নেওয়া জায়েজ. كَمَا قَالَ فِى الْهِدَايَةِ وَبَعْضُ مَشَائِخِنَا اِسْتَحْسَنُوا الْاِسْتِيْجَارَ عَلٰى تَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ لِظُهُوْرِ التَّوَانِىْ فِى الْاُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ فَفِى الْاِمْتِنَاعِ تَضْيِيْعُ حِفْظِ الْقُرْاٰنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى .

সুতরাং দীনি বিষয়ে অলসতা ও অমনোযোগ আসার কারণে اِذَا ابْتُلِىَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَاخْتَرْ اَهْوَنَهُمَا -এর ভিত্তিতে মুতায়াখখিরীন ইমামগণ বিনিময় গ্রহণের বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন, বর্তমানে হানাফী আলিমগণ একেই বিশুদ্ধ অভিমত হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন।

وَعَنْ ٦١٨ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

৬১৮. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ কথাগুলো মাগরিবের আযানের সময় বলতে শিখিয়েছেন [অর্থাৎ], হে আল্লাহ! এটা তোমার রাতের আগমন, তোমার দিনের প্রস্থান এবং তোমার আহ্বানকারীদের [মুয়াজ্জিনদের] ডাকার সময়। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। –[আবূ দাঊদ, বায়হাকী তাঁর দাওয়াতিল কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটি মাগরিবের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট, এটা আযানের জবাব দানের পরে অথবা জবাব দানের মধ্যেই পড়বে, কিংবা আযানের পূর্বমুহূর্তে পড়বে।

وَعَنْ ٦١٩ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَوْ بَعْضِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالًا اَخَذَ فِى الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِىْ سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِى الْاَذَانِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৬১৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বলেন, একদিন হযরত বেলাল (রা.) একামত দিতে লাগলেন। যখন তিনি 'কাদ কামাতিস সালাহ' বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা'। অর্থ– আল্লাহ [নামাজকে] সুপ্রতিষ্ঠিত করুন এবং তাকে চিরস্থায়ী করুন। আর অবশিষ্ট সমস্ত একামতে হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে আযানের জবাবে যেরূপ উল্লেখ রয়েছে সেরূপ বলেছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَقَالَ فِىْ سَائِرِ الْاِقَامَةِ -এর **অর্থ :** হাদীসে উল্লিখিত আলোচ্য বাক্যটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন– قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ ব্যতীত অন্যান্য বাক্যগুলো একামতের ন্যায়। অথবা নামাজের একামত ব্যতীত অন্যান্য একামতে অথবা একামত উচ্চারণকারী যেভাবে একামত বলেছেন অনুরূপই বলেছেন। তবে হাইয়্যা আলাদ্বয়ের সময় বলেছেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি।' অর্থাৎ আযানের জবাবে যেরূপে বলেছেন একামতের জবাবেও তদরূপই বলেছেন।

وَعَنْ ٦٢٠ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَايُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৬২০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া [আল্লাহর দরবার হতে] ফেরত দেওয়া হয় না।–[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَةِ **এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময় বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে—

১. আযানের শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া, এমনিভাবে একামতের শুরু ও শেষের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া আল্লাহর দরবার হতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

২. অথবা আযানের শুরু হতে একামত শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। এ শেষোক্ত অর্থটি গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٦٢١ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَاسِ حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَ فِيْ رِوَايَةٍ وَتَحْتَ الْمَطَرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ) اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَتَحْتَ الْمَطَرِ

৬২১. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দুই [সময়ের] দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, অথবা কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। (এক) আযানের সময়কালের দোয়া এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালীন দোয়া যখন একে অপরকে নিধন করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে, বৃষ্টির নিচের দোয়া। –[আবূ দাউদ, দারেমী]। কিন্তু দারেমী 'বৃষ্টির নিচের দোয়া' বাক্যাংশটি উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَتَحْتَ الْمَطَرِ **-এর মর্মার্থ :** বৃষ্টি হলো আল্লাহ তা'আলার বড় রহমত। এটা মানব-দানব ও জীব জগতের প্রয়োজনেই আসমান হতে বর্ষিত হয়ে থাকে। এ সময়ে মহান আল্লাহর রহমত অবারিত থাকে, সুতরাং এ সময়ে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অবারিত রহমত হতে তা দান করে থাকেন।

وَعَنْ ٦٢٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৬২২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুয়াজ্জিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মাহাত্ম্য লাভ করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তাঁরা যেরূপ বলে থাকেন তুমিও সেরূপ বলো এবং যখন শেষ করবে তখন প্রার্থনা করো – তোমাকেও দেওয়া হবে'। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে মুয়াজ্জিনদের মর্যাদা ও আযানের উত্তরদাতাদের মাহাত্ম্য প্রাপ্তির বিষয় আলোচিত হয়েছে। তথা আযানে যে রকম ফজিলত অর্জিত হয়, তেমনি আযানের জবাবদাতার জন্যও তদ্রূপ মর্যাদা অর্জিত হয়।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম আব্দুল্লাহ; উপনাম আবূ মুহাম্মদ অথবা আবূ আব্দুর রহমান বা আবূ নুসাইর, পিতার নাম আমর ইবনুল আস; মাতার নাম রাইতা বা রায়েতা বিনতুল মুনাব্বিহ। তাঁর ইসলাম পূর্ব নাম ছিল আস তথা অবাধ্য বা পাপী, ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল ﷺ তাঁর নাম রাখেন আব্দুল্লাহ।

২. **নসবনামা বা বংশ ধারা :** তাঁর নসবনামা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ইবনে ওয়ায়েল ইব্‌নে হাশেম ইব্‌নে সুয়াইদ ইবনে সাদ ইব্‌নে সাহাম ইব্‌নে আমর ইব্‌নে হুছাইছ ইব্‌নে কাব ইব্‌নে লুয়াই ইব্‌নে গালেব আল-কুরাশী আস-সাহমী। তাঁর বংশ কুরায়েশের একটি শাখা।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এ ব্যাপারে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না, তবে তিনি তাঁর পিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা বয়সের দিক হতে তাঁর তুলনায় এগার অথবা বারো অথবা তেরো বৎসরের বড় ছিল। অপর এক বর্ণনা মতে, উভয়ের বয়সের মধ্যে বিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পিতা কালিমা পড়েন।

৪. **ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান :** তিনি ইলমে হাদীস লেখে রাখার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন। তাই তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিক।

৫. **তাঁর বর্ণিত হাদীস :** তাঁর থেকে বর্ণিত মুখস্থ হাদীসের সংখ্যা ৬০০। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৭ খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮ খানা এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ২০ খানা হাদীস তাঁর বর্ণনায় স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

৬. **বিশেষ গুণ :** তিনি একজন আবেদ, আলিম ও হাফেজে কুরআন ছিলেন। হযরত ইয়ালা ইবনে আতা তাঁর মা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর মা আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমরের জন্য সুরমা তৈরি করতেন। তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে, তিনি গভীর রাতে জাগতেন এবং বাতি নিভিয়ে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। এমনকি এ কান্নার কারণে তাঁর দু' চোখের পাতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

৭. **মৃত্যু :** তাঁর মৃত্যুর তারিখ ও স্থান নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মঝে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি ৬৩ হিজরির যিলহজ মাসে ইন্তেকাল করেছেন। এ ছাড়াও তাঁর মৃতু সন সম্পর্কে ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৭ হিজরি, এ ছয়টি অভিমতও পাওয়া যায়। এমনিভাবে তাঁর মৃত্যুর স্থান নিয়েও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তিনি মক্কায়, কারো মতে তায়েফে, কারো মতে মিসরে, আবার ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٢٣ - عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ ذَهَبَ حَتّٰى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ الرَّاوِىْ وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى سِتَّةٍ وَثَلٰثِيْنَ مَيْلًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬২৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, শয়তান যখন নামাজের ডাক [অর্থাৎ আযান] শুনে তখন 'রাওহা' পর্যন্ত [পালিয়ে] যায়। বর্ণনাকারী বলেন, রাওহা মদীনা হতে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, শয়তান যখন আযানের আওয়াজ শুনে তখন রাওহা পর্যন্ত ভেগে যায়, এখানে রাওহা পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়ার কয়েকটি অর্থ হতে পারে—

১. শয়তান আযানের স্থান হতে অনেক দূর চলে যায়।
২. অথবা মদীনা হতে রাওহার দূরত্ব পরিমাণ তথা ৩৬ মাইল ব্যবধানে চলে যায়।
৩. অথবা শয়তান প্রকৃতই রাওহা নামক স্থানে পালিয়ে যায়।

وَعَنْ ٦٢٤ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ إِنِّىْ لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ (رض) كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ حَتّٰى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَقَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৬২৪. অনুবাদ : হযরত আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট ছিলাম। যখন তাঁর মুয়াজ্জিন আযান দিতে লাগলেন, তখন তাঁর মুয়াজ্জিন যেরূপ বললেন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও সেরূপ বলতে থাকেন। যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা 'আলাস সালাহ' বললেন, তিনি 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' বললেন। আর যখন মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা'আলাল ফালাহ বললেন, তখন তিনি 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল 'আলিয়্যিল আযীম' বললেন। এরপর মুয়াজ্জিন যা বললেন, তিনিও সেই বাক্যগুলো বললেন, অবশেষে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি।' –[আহমদ]

وَعَنْ ٦٢٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِىْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৬২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে ছিলাম। তখন হযরত বেলাল (রা.) দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। হযরত বেলাল (রা.) যখন থামলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এর মতো বলবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা شَرْحُ الْحَدِيْثِ : আলোচ্য হাদীসে আযানের জবাবের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা আযানের মধ্যে তাওহীদ, রিসালাত এবং পরোক্ষভাবে আখেরাতের স্বীকারোক্তি রয়েছে। আযানের মাধ্যমে মানুষকে পরম স্রষ্টার সান্নিধ্যে আসার জন্য ডাকা হয়, মানুষ এ ডাকে সাড়া দিলে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভে সমর্থ হয়।

وَعَنْ ٦٢٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৬২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মুয়াজ্জিনের আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলতে শুনতেন, তখন তিনি বলতেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি–আমি আল্লাহর রাসূল।–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা شَرْحُ الْحَدِيْثِ : নবী করীম ﷺ যখন মুয়াজ্জিনকে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলতে শুনতেন, তখন তিনি বলতেন وَاَنَا وَاَنَا 'আর আমিও আমিও' আর অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি। এখানে اَنَا পদটি দু'বার বলে দুই সাক্ষ্য বাক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ অথবা তাকিদের জন্য اَنَا পদটি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ নিজেও নিজের রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে বাধ্য ছিলেন। তবে তাঁর সাক্ষ্য দান পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি اَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ বাক্য দ্বারাই সাক্ষ্য দিয়েছে। আবার কেউ বলেছেন, اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্য দ্বারাই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় মতটিই বিশুদ্ধ যার সমর্থন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

وَعَنْ ٦٢٧ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِيْنِهٖ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلٰثُوْنَ حَسَنَةً - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬২৭. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি বারো বছর যাবৎ আযান দেয়, বেহেশত তার জন্য অবধারিত হয়ে যায়। আর তার জন্য তার আযানের বিনিময়ে প্রত্যেক দিন [প্রত্যেক ওয়াক্ত] ষাট নেকী করে এবং প্রত্যেক একামতে ত্রিশ নেকী করে লেখা হয়। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ وَ دَفْعُهٗ **দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান :** পূর্বে এক হাদীসে সাত বৎসরের কথা বলা হয়েছে, আর উক্ত হাদীসে ১২ বৎসরের কথা এসেছে ফলে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তার সমাধান হলো–

১. প্রথমে ১২ বছরের ওহি এসেছিল, এরপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে তা কমিয়ে সাত বছর করে দিয়েছেন।

২. অথবা এটাও হতে পারে যে, সাত বছরে জান্নাত লাভের উপযোগী হবে। আর বারো বছর আযান দিলে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য ষাট নেকী, আর প্রত্যেক একামতের জন্য ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হবে।

৩. অথবা, স্বল্প সংখ্যা অধিক সংখ্যার বিপরীত নয়।

وَعَنْهُ ٦٢٨ قَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

৬২৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে মাগরিবের আযানের সময় দোয়া করতে আদেশ করা হতো। –[বায়হাকী–দাওয়াতে কবীর]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসে আদেশকারী নিশ্চয়ই মহানবী ﷺ ছিলেন, আর মাগরিবের সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তখন দিনের প্রস্থান ও রাতের আগমন সময় তথা আলো হতে আঁধারের প্রবেশের সময়, এটা আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন কুদরতের বহিঃ প্রকাশের সময়, তাই এ সময়ের দোয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

بَابٌ فِيهِ فَصْلَانِ

পরিচ্ছেদ : আযান। এতে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٢٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلَالًا يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلًا اَعْمٰى لَا يُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ لَهٗ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬২৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বেলাল রাত থাকতে আযান দেয়, সুতরাং তোমরা ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেওয়া পর্যন্ত পানাহার করো। তিনি [ইব্‌নে ওমর] বলেন, ইব্‌নে উম্মে মাকতূম একজন অন্ধ লোক ছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে বলা না হতো যে, ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ فِى الْاَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ সময়ের পূর্বে আযান দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : এ কথার উপর সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার আযান সময় আসার পূর্বে দেওয়া জায়েজ নয়; তবে ফজরের আযান সময়ের পূর্বে দেওয়া জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, ইবনুল মুবারক, আওযায়ী, দাউদে জাহেরী ও ইবনে জারীর এবং ইমাম আবূ ইউসুফের এক উক্তি অনুযায়ী ফজরের আযান সময় হওয়ার পূর্বে দেওয়া জায়েজ। যেমন হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন–

اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ عَنِ السُّحُوْرِ فَاِنَّهٗ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ كَمَا فِى الْبَذْلِ عَنِ الْبَدَائِعِ ـ

যখন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, হযরত বেলাল (রা.) রাতে আযান দিতেন। বস্তুত রাতে তো ইশার নামাজের পর কোনো জামাত নেই। সুতরাং সে আযান অবশ্যই ফজরের নামাজের জন্য সময় আসার পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আযম, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান ছাওরীর প্রমুখের মতে ফজরের আযানও সময় আসার পূর্বে দেওয়া জায়েজ নেই। যদি সময় আসার পূর্বে আযান দেওয়া হয়, তবে আযান পুনরায় দেওয়া আবশ্যক হবে। সুতরাং হানাফীদের মতে সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া কোনো মতেই জায়েজ নয়।

দলিল হিসাবের হযরত শাদ্দাদ (রা.)-এর হাদীস পেশ করেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন–

١ـ لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

٢ ـ اِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا بِلَالُ لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ـ (بَيْهَقِىْ)

٣ ـ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْفَجْرِ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتّٰى يُصْبِحَ ـ (طَحَاوِىْ)

٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا كَانُوا يُؤَذِّنُونَ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ ـ (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ)

٥ ـ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَيُنَادِىْ اِلاَّ اَنَّ الْعَبْدَ نَامَ ـ (اَبُوْدَاوٗدَ ـ طَحَاوِىْ ـ دَارَ قُطْنِىْ)

٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِىْ اِلاَّ اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ـ (اَبُوْ دَاوٗدَ)

كَمَا فِى الْعَيْنِىِّ اَنَّهُ اَذَّنَ فِىْ حَالِ النَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ وَكَانَ يَبْكِىْ وَيَطُوْفُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَقَوْلُ لَيْتَ بِلاَلاً لَمْ تَلِدْهُ اُمُّهُ ـ وَاِنَّمَا قَالَ ذٰلِكَ لِكَثْرَةِ مَعْتَبَةِ النَّبِىِّ ﷺ اِيَّاهُ كَمَا فِى الْعِنَايَةِ ـ

كَمَا فِىْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَوَادٍ اَنَّهُ (ع) قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ كَمَا فِىْ فَتْحِ الْقَدِيْرِ ـ

٧. اِنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ (رضـ) يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ اَنَّهُ اِذَا اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يُنَادِىَ اَنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

٨. عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ اَنَّ مُنَادِىَ النَّبِىِّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ـ

যুক্তিভিত্তিক দলিল :

১. আযান অনুমোদিত হয়েছে সময় হওয়ার অবগতি প্রদানের জন্য, যেমন আযান শুরুর ইতিহাস হতে বুঝা যায়। অতএব সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়ার দ্বারা মিথ্যা অবগতি দেওয়া সাব্যস্ত হয়।

২. আযানের উদ্দেশ্য হলো ঘোষণা দেওয়া। সুতরাং সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া দ্বারা অবগতির ঘোষণা অজ্ঞতায় রূপান্তরিত হবে।

৩. সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া দ্বারা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। কেননা, তখন ঘুমের সময়। বিশেষ করে ঐ সকল লোকের জন্য ক্ষতি, যারা প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের জন্য ইহা বিভ্রান্তির ব্যাপার হয়, যা মাকরূহ।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি যখন সময়ের পূর্বে আযান শুনতেন তখন বলতেন, যদি এদেরকে হযরত ওমর (রা.) পেতেন তা হলে তাদেরকে শাস্তি দিতেন। كَمَا فِى الْبَدَائِعِ

হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব নিম্নরূপ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদের দলিলে যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ

১. এর উত্তর এই যে, হযরত বেলাল (রা.) রাতে যে আযান দিতেন তা যদি ফজরের জন্য হতো, তা হলে বিপক্ষীয়দের দাবি সঠিক হতো যে, সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, হযরত বেলালের সে আযান ফজরের জন্য ছিল না; বরং তাঁর রাতের এই আযান ছিল সাহরীর জন্য। তিনি ঘুমন্তদেরকে সাহরীর জন্য জাগানোর উদ্দেশ্যে এ আযান দিতেন।

فَقَالَ الْعَيْنِىُّ اِنَّ هٰذَا الاَذَانَ كَانَ لِرَجْعِ الْقَائِمِ وَاِيْقَاظِ النَّائِمِ وَبِهِ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَقَالَ لاَبُدَّ مِنْ اَذَانٍ اٰخَرَ كَمَا فَعَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ـ كَمَا رُوِىَ اَنَّهُ (ع) قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَثَبَتَ بِذٰلِكَ اَنَّ مَا كَانَ مِنْ اَذَانِ بِلاَلٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَمْ يَكُنْ لِلصَّلٰوةِ كَمَا فِى الْعَيْنِىِّ ـ

২. তা ছাড়া হযরত বেলাল (রা.)-এর আযানের উপর যথেষ্ট মনে করা হতো না; বরং সর্বদা সময়ের পরে আযান দেওয়া হতো। যেমন হাদীসে আছে– اِنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ كَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لاَ يُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ
যদি সময়ের পূর্বের আযান যথেষ্ট হতো তা হলে কোনো না কোনো সময় একে যথেষ্ট মনে করা হতো।

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান জবাবে বলেছেন, হযরত বেলাল (রা.) যে রাতে আযান দিতেন তা রমজানের সাহরী খাওয়ার জন্য ছিল। আর লোকেরা ফজরের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের আযানের উপর নির্ভর করতেন।

لِاَنَّهُ قَدْ جَاءَ حَدِيْثٌ اٰخَرُ يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ بِلاَلاً اِنَّمَا يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِسُحُوْرِ النَّاسِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً كَمَا فِىْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ (ع) قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سُحُوْرِهِ اَذَانُ بِلاَلٍ الْحَدِيْثَ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ اِنَّ ذٰلِكَ كَانَ فِىْ رَمَضَانَ ـ

৪. ইমাম তাহাবী উত্তর দিয়েছেন, মূলত হযরত বেলাল (রা.) এ ধারণায় আযান দিতেন যে, সম্ভবত ফজরের সময় হয়ে গেছে. কেননা, তাঁর দৃষ্টি শক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা ছিল।

كَمَا فِىْ رِوَايَةِ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهُ (ع) قَالَ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ فَاِنَّ فِىْ بَصَرِهِ شَيْئًا -

অতএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া জায়েজ নয়?

اَلتَّعَارُضُ وَ دَفْعُهُ **দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান :** আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে اِنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ অর্থাৎ, হাদীসটিতে ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান পর্যন্ত পানাহারের অনুমতির কথা রয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, اِنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ হাদীসটিতে বেলালের আযান পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি রয়েছে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, বেলাল রাতে আযান দিতেন. আর শেষোক্ত হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনে উম্মে মাকতূম রাতে আযান দিতেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মুহাদ্দিসগণ উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নরূপ করেছেন—

১. ইবনু আবদিল বার সহ কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন, اِنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ বাক্যটি মূলত পরিবর্তিত। কোনো বর্ণনাকারী বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। اِنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ বর্ণনা।

২. হতে পারে শেষ যুগে উভয়ের মধ্যে পালা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। কিছু দিন হযরত বেলাল (রা.) রাতে আযান দিতেন এবং ইবনে উম্মে মাকতূম সুবহে সাদেকের পরে আযান দিতেন। আর কিছুদিন ইবনে উম্মে মাকতূম রাতে আযান দিতেন এবং বেলাল সুবহে সাদেকের পর আযান দিতেন। রাসূল ﷺ-এর উক্তি اِنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ সে সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যখন বেলালের পালা ছিল রাতে আযান দেওয়া এবং তাঁর উক্তি اِنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ ঐ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত যখন ইবনে উম্মে মাকতূম রাতে আযান দিতেন। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।

وَعَنْ ٦٣٠ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِّنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ وَلٰكِنَّ الْفَجْرَ الْمُسْتَطِيْرَ فِى الْاُفُقِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ)

৬৩০. **অনুবাদ :** হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'তোমাদেরকে যেন বেলালের আযান এবং সুবহে কাযেব সাহরী খাওয়া হতে বিরত না করে, কিন্তু [বিরত করবে] দিগন্তে প্রসারিত উষা অর্থাৎ 'সুবহে সাদেক'।–[মুসলিম. হাদীসের উপরিউক্ত ভাষা তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ **-এর অর্থ :** ভোর রাতে প্রথমে যে আলোক রশ্মি ফর্সা হয়ে উপরের দিকে উঠে এবং কিছুক্ষণ পরে আকাশে মিলে যায় তাকে 'সুবহে কাযেব' বলে। আর যে ফর্সা উত্তর-দক্ষিণ দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে উঠে এবং না মিলে ধীরে ধীরে ভোর হয়ে যায় তাকে 'সুবহে সাদেক' বলে। সুবহে সাদেক শুরু হওয়ার পূর্বেই 'সাহ্রী' খাওয়া বন্ধ করতে হয় এং শুরু হলেই ফজরের আযানের সময় হয়।

وَعَنْ ٦٣١ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضـ) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَ ابْنُ عَمٍّ لِىْ فَقَالَ اِذَا سَافَرْتُمَا فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬৩১. **অনুবাদ :** হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই নবী করীম ﷺ-এর কাছে আসলাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, যখন তোমরা সফর কর, তখন [নামাজের সময় হলে] আযান দেবে এবং একামত বলবে এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, যিনি বয়সে বড় তিনিই ইমামতির বেশি হকদার। অথচ অন্যান্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যিনি অধিক কেরাত সম্পন্ন তিনিই বেশি হকদার। ইমাম শাফেয়ী এ অভিমতই পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যিনি অধিক জ্ঞানবিশিষ্ট, অর্থাৎ নামাজের যাবতীয় মাসায়েল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তিনিই অধিক হকদার। আর যদি এ উভয় গুণে ভূষিত একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ হয় তখন বয়সের তারতম্যে যিনি বড়, তিনিই অধিক হকদার। এ হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। সম্ভবত মালেক ও তাঁর চাচাত ভাই উভয়ই কেরাত ও ইলমে সমমানের ছিলেন, তাই হুযূর ﷺ বড়কে ইমামত করতে আদেশ দিয়েছেন।

وَعَنْهُ ٦٣٢ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৩২. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ, তোমরাও তেমনিভাবে নামাজ পড়। আর যখন নামাজের সময় হয় তখন তোমাদের কোনো একজন যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামত করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٦٣٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهٗ وَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهٗ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اِسْتَنَدَ بِلَالٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ مُوَجِّهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَىْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ اَخَذَ بِنَفْسِىْ الَّذِىْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ

৬৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বর যুদ্ধ হতে ফেরার সময় রাতে পথ চলছিলেন। অবশেষে তিনি যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তখন শেষ রাতে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং বেলালকে বললেন, আমাদের [নামাজের] জন্য রাতের প্রতি লক্ষ্য রেখো। অতঃপর বেলাল যতক্ষণ সম্ভব নামাজ পড়লেন। আর রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন ফজর নিকটবর্তী হলো তখন বেলাল সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে উটের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন। ফলে বেলালকে তার চক্ষুদ্বয় পরাভূত করল [অর্থাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন], অথচ তিনি তাঁর উটের গায়ে হেলান দিয়েই ছিলেন। অতঃপর সূর্য-কিরণ গায়ে এসে ঠেকা পর্যন্ত রাসূল ﷺ বা বেলাল (রা.) অথবা কোনো সাহাবী জাগরিত হতে পারেননি। তারপর রাসূল ﷺ-ই সর্বপ্রথম জাগরিত হলেন। তখন রাসূল ﷺ ব্যস্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, ওহে বেলাল! [তোমার কি হলো?] বেলাল (রা.) বলেন, হুজুর! আমাকে সে জিনিস পরাভূত করেছে যা আপনাকে পরাভূত করেছে। তিনি বললেন, সওয়ারি আগে নিয়ে চলো। তাঁরা তাঁদের উটসমূহ কিছু সামনে নিয়ে গেলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ অজু করলেন এবং বেলালকে [একামতের]

الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আদেশ দিলে বেলাল (রা.) একামত দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের ফজরের নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষ করে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে যায়, সে তা পড়ে নেবে, যখনই স্মরণ হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ অর্থাৎ আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : সপ্তম হিজরি সনের মহররম মাসে খায়বর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। খায়বর মদীনা শরীফ হতে তিন মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধি শেষে ফিরে এসে বিশ দিন মদীনা অবস্থান করে খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হন।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, খায়বর যুদ্ধ ৬ষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল।

এ মতভেদের কারণ হলো, কতিপয় লোক হিজরি সনকে মহররম মাস হতে গণনা করেন। এ কারণে তাঁদের মতে ঐ মহররম মাসেই ৭ম হিজরি আরম্ভ হয়েছিল। আবার অনেকে রবিউল আউয়াল মাসকে বছরের প্রথম মাস গণনা করেন। কেননা, রাসূল ﷺ রবিউল আউয়াল মাসেই মদীনায় হিজরত করেছেন। তাঁদের মতে মহররম ও সফর মাস ৬ষ্ঠ হিজরির শেষ দু'টি মাস ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না এমতাবস্থায় তাঁর সূর্যোদয় সম্পর্কে না জানার কারণ : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ-এর সূর্যোদয় সম্পর্কে কেন জানা হলো না? অথচ তিনি নিজেই বলেছেন– আমার চক্ষু ঘুমায়, অন্তর জাগ্রত থাকে? অন্তর জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও তিনি সূর্যোদয় সম্পর্কে কেন জানতে পারলেন না, কেন নামাজ কাজা হলো? এ প্রশ্নের জবাব নিম্নরূপ—

১. অন্তর জাগ্রত থেকে সূর্যোদয় সম্পর্কে জ্ঞাত না হওয়ায় ক্ষতির কিছু নেই। কারণ অন্তরাত্মা বাতেনী কার্যাবলি অনুভব করে। সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত এগুলো বাতেনী ব্যাপার নয়, এগুলো চর্মচক্ষুর কাজ। চর্মচক্ষু ঘুমানোর কারণে তিনি তা জানতে পারেননি।

২. এ নামাজ কাজা হওয়ার মধ্যে উম্মতের জন্য কল্যাণ নিহিত ছিল। নবীর নামাজ কাজা হওয়ার কারণে উম্মতের জন্য কাজার বিধান চালু হয়েছে।

৩. নবী করীম ﷺ সাধারণ মানুষের মতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ; এখানে তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। যেমন, আল্লাহ বলেন– قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

৪. ঘুম ও ক্লান্তি তাঁকেও অবসন্ন করত, তাঁকেও বিভোর করত। এটা প্রমাণ করাই ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্য।

নামাজ আদায়ের আগে সওয়ারি সামনে নিয়ে যাওয়ার কারণ : নবী করীম ﷺ যখন জেগে উঠলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে নামাজ কাজা না পড়ে অগ্রসর হাওয়ার কেন হুকুম দিলেন। অগ্রসর হতে হুকুম দেওয়ার কারণ হানাফীদের মতে সে সময় সূর্য উদয় হচ্ছিল– সূর্য তখনও পুরোপুরি উদয় হয়নি। এ কারণে সামনে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন, যাতে নামাজের মাকরূহ সময়টি অতিবাহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, সে স্থানে শয়তানের দখল ছিল। শয়তানী প্ররোচণা হতে সাথীদেরকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ করেছিলেন। যেমন– অন্য এক হাদীসে আছে اِنَّ هٰذَا وَادٍ فِيْهِ الشَّيْطَانُ শাফেয়ী মাযহাবে সূর্যোদয়ের সময় নামাজ জায়েজ আছে, এ কারণে তাঁরা শুধু দ্বিতীয় কারণটি গ্রহণ করেন।

কাজা নামাজের জন্য আযান ও একামত সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : কাজা নামাজের জন্য আযান ও একামত উভয়ই দেওয়া জায়েজ আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. **ইমাম শাফেয়ীর অভিমত :** আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাজা নামাজের জন্য আযান নেই; শুধু একামতই যথেষ্ট। উল্লিখিত হাদীসই তার দলিল।

২. **ইমাম আবূ হানীফার অভিমত :** ইমাম আযম, আবূ সওর ও ইবনুল মুনযির প্রমুখের মতে কাজা নামাজের জন্য আযান ও একামতের প্রয়োজন রয়েছে।

দলিল :

১ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ... ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ .

٢ - فِيْ حَدِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ فِيْ قِصَّةِ لَيْلَةِ التَّعْرِيْسِ .... ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلٰوةِ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى صَلٰوةَ الْغَدِ .

আকলী দলিল : আযান-একামত নামাজের সুন্নত; ওয়াক্তের সুন্নত নয়। সুতরাং ওয়াক্ত ছুটে গেলেও নামাজ কাজা করার সময় সুন্নত আদায় করা উচিত।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত হাদীসটি আবূ দাউদ শরীফে অবিকল রয়েছে, যেখানে আযানের কথা উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত করার জন্য আযানের কথা উল্লেখ করেননি।

একাধিক নামাজ কাজা হলে তার বিধান : একাধিক ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য আযান ও একামত আবশ্যক কি না, এ সম্পর্কেও ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবূ সওর প্রমুখের মতে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান ও একামত দেবে এবং অবশিষ্ট প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য শুধু একামত দেবে।

مَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মতে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আজান ও একামত প্রদান করবে এবং অবশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছাধিকার রয়েছে, আযান ও একামত উভয়টিই দিতে পারে অথবা শুধু একামতও দিতে পারে। তিরমিযী শরীফে ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاتَتْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

قَوْلُهُ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِيْ أَخَذَ بِنَفْسِكَ উক্তির বিশ্লেষণ : নবী করীম ﷺ যখন হযরত বেলাল (রা.)-কে ঘুমে অচেতন হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত বেলাল (রা.) বলেন– أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِيْ أَخَذَ بِنَفْسِكَ এর ব্যাখ্যা হলো, যেমনিভাবে আপনাকে ঘুম অচেতন করেছে তেমনিভাবে আমাকেও অচেতন করেছে।

২. অথবা, অর্থ এই যে, আমি ইচ্ছা কৃতভাবে ঘুমিয়ে পড়িনি; বরং অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার চোখে ঘুম চেপে আসে।

৩. আল্লামা তীবীর বিশ্লেষণ আল্লাহ তা'আলার এরশাদ– اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا (الاية) -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

مَنْ نَسِيَ الصَّلٰوةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا -এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যা এই যে, যে ব্যক্তি নামাজের কথা ভুলে গেছে, যখনই তার স্মরণ হবে তখন নামাজ পড়ে নেবে। হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, যখন স্মরণ হবে তখন যদি নিষিদ্ধ তিন সময় (সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বি-প্রহর)-এর যে কোনো এক সময়ও হয়, তবু নামাজ পড়বে। এ মত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর। হানাফী মতে নামাজ পড়বে যদি মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়। কেননা, হানাফী অনুসারীদের মতে ঐ তিন সময়ে নামাজ পড়া হারাম, আর শাফেয়ীদের মতে ফরজ হারাম নয়। কাজেই যখনই সে জাগ্রত হবে তখনই নামাজ পড়ে নেবে, যদিও এটা তিন নিষিদ্ধ সময়ে হয়। আমাদের মতে যদি কেউ মাকরূহ সময়ে জাগ্রত হয় তা হলে সে অপেক্ষা করবে। যখন মাকরূহ সময় পার হয়ে যাবে তখন সে কাজা করে নেবে।

---

٦٣٤ - وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِيْ قَدْ خَرَجْتُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৩৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন নামাজের জন্য একামত বলা হয়, তোমরা দাঁড়াবে না, যতক্ষণ না তোমরা আমাকে বের হতে দেখ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলা পর্যন্ত মুসল্লিগণ বসে থাকতে পারেন। কিন্তু কাতার সোজা বা ঠিক-ঠাক করার জন্য এর পূর্বে উঠাই ভালো। 'এর আগে উঠা যায় না', এমন ধারণা করা ভুল। তবে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর বসে থাকা যায় না। অবশ্য তখন পর্যন্ত যদি ইমাম না আসেন তবে বসে থাকবে। উক্ত হাদীস দ্বারা তাই বুঝা যায়।

وَعَنْ ٦٣٥ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلٰوةِ فَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِىْ .

৬৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন নামাজের একামত বলা হয় তখন তোমরা তাতে দৌড়ে এসো না, বরং তাতে শরিক হওয়ার জন্য এরূপ স্বাভাবিকভাবে হেঁটে এসো, যাতে তোমাদের উপরে শান্তি বিরাজ করে। অতঃপর যতটুকু নামাজ ইমামের সাথে পাবে পড়বে, আর যতটুকু নামাজ ছুটে যাবে তা, পরে [একা একা] পূর্ণ করে নেবে। -[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ার ইচ্ছা নিয়ে বের হয় তখন সে নামাজেই থাকে। [এ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদ নেই]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاٰيَةِ وَالْحَدِيْثِ আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা নামাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আর উক্ত হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে তার সমাধান নিম্নরূপ—

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত فَاسْعَوْا দ্বারা قَصْد বা ইচ্ছা করা উদ্দেশ্য। كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَ ذَرُوا الْبَيْعَ اَىْ اِشْتَغِلُوْا بِاَمْرِ الْمَعَادِ وَاتْرُكُوْا اَمْرَ الْمَعَاشِ সুতরাং فَاسْعَوْا এবং لَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ -এর হুকুমের মঝে কোনো দ্বন্দ্ব থাকল না।

كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ إِنَّهٗ لَيْسَ السَّعْىُ مُنْحَصِرًا عَلَى الْاَقْدَامِ لٰكِنَّهٗ عَلَى النِّيَّاتِ وَالْقُلُوْبِ .

২. অথবা উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলার এরশাদ فاسعوا -এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যাওয়া উদ্দেশ্য كَمَا يُقَالُ سَعَيْتُ إِلٰى كَذَا اَىْ ذَهَبْتُ اِلَيْهِ সুতরাং আয়াতে যাওয়ার হুকুম করা হয়েছে আর হাদীসে দৌড়াতে নিষেধ এসেছে। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

৩. سَعْىٌ শব্দটি عَمَلٌ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আয়াতে عَمَلٌ -এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর হাদীসে দৌড়ের নিষেধ এসেছে। সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

৪. শায়খ আকবর বলেন, যে সকল নস-এর মধ্যে سَعْىٌ -এর হুকুম এসেছে সেগুলোতে সময়ের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যে সকল নস-এর মধ্যে নিষেধ এসেছে সেগুলো দ্বারা দৌড় ও তাড়াহুড়া পরিহার পূর্বক শান্ত ও গাম্ভীর্যের সাথে যাওয়া উদ্দেশ্য।

তাকবীরে উলা ফওত হওয়া কালে দৌড়ের বিধান : ধীরস্থিরভাবে নামাজে গেলে যদি তাকবীরে উলা ফউত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন কারো কারো মতে দৌড়ে গিয়ে তাকবীরে উলা লাভ করবে। যেমন- হযরত ওমর (রা.) জান্নাতুল বাকীতে থাকা অবস্থায় একামত শুনে দৌড়ে মাসজিদে নববীতে গিয়ে তাকবীরে উলা পেয়েছেন। আর যে সকল নসে إِسْرَاعٌ বা দৌড়ানোর নিষেধ এসেছে তা দ্বারা অতি দ্রুত দৌড়ের নিষেধ এসেছে। নতুবা সাধারণভাবে দৌড় বা দ্রুত যাওয়া নবী করীম ﷺ হতে প্রমাণিত আছে-

كَمَا وَرَدَ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ رَافِعٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلٰى بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ فَيَنْحَدِرُ الْمَغْرِبَ قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ فَبَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيْعِ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

আর কিছুসংখ্যক আলিম ধীরস্থিরভাবে চলাকে উত্তম বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, إِنَّهٗ (ع) قَالَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ .(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) তবে প্রকাশ্য ও প্রবল অভিমত এই যে, যেহেতু নসের মধ্যে উভয় প্রকারের হুকুম রয়েছে যে, لَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ তারপর আয়াত-

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهِيَ الْعِبَادَةُ هٰهُنَا فَمَنْ سَارَعَ اِلَى الْعِبَادَةِ فَقَدْ سَارَعَ اِلَى الْمَغْفِرَةِ অনুরূপ অন্য আয়াতে আছে اُولٰئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ সুতরাং উভয় প্রকারের নসের উপর আমল করে উভয় ফজিলত অর্জন করার জন্য اِسْرَاعٌ مَعَ السَّكِيْنَةِ তথা ধীরস্থিরতার সাথে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٦٣٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رض) قَالَ عَرَّسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِطَرِيْقِ مَكَّةَ وَ وَكَّلَ بِلَالًا اَنْ يُّوْقِظَهُمْ لِلصَّلٰوةِ فَرَقَدَ بِلَالٌ وَ رَقَدُوْا حَتّٰى اسْتَيْقَظُوْا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ فَقَدْ فَزِعُوْا فَاَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّرْكَبُوْا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِيْ وَقَالَ اِنَّ هٰذَا وَادٍ بِهٖ شَيْطَانٌ فَرَكِبُوْا حَتّٰى خَرَجُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْوَادِيْ ثُمَّ اَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْزِلُوْا وَ اَنْ يَّتَوَضَّؤُوْا وَ اَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُّنَادِيَ لِلصَّلٰوةِ اَوْ يُقِيْمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ رَاٰى مِنْ فَزَعِهِمْ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا اِلَيْنَا فِيْ حِيْنٍ غَيْرِ هٰذَا فَاِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزِعَ اِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ اَتٰى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ فَاَضْجَعَهٗ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهٗ كَمَا يُهَدَّاُ الصَّبِيُّ حَتّٰى نَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৬৩৬. **অনুবাদ** : হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার পথে এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাতে সওয়ারি হতে অবতরণ করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং নামাজের সময় তাঁদেরকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য বেলালকে নিযুক্ত করলেন, কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং বেলালও ঘুমিয়ে পড়লেন এবং তাঁরাও ঘুমিয়ে থাকলেন। অবশেষে তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন সূর্য উদয় হয়ে গেছে। এদিকে তাঁরা জাগরিত হওয়ার পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে আদেশ দিলেন সওয়ার হয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তাঁরা এ ময়দান হতে বের হতে যায়। অতঃপর বললেন, এ ময়দানে শয়তান বিদ্যমান। সুতরাং তাঁরা সওয়ার হয়ে চলতে লাগলেন যে পর্যন্ত না সেই ময়দান হতে বের হয়ে গেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন সওয়ারি হতে অবতরণ করতে এবং অজু করতে, আর বেলালকে আদেশ করলেন আযান দিতে অথবা একামত বলতে। অতঃপর তিনি লোকদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন এবং নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলেন এবং দেখলেন তাদের ভীতিবিহ্বলতাকে। তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ আমাদের প্রাণসমূহকে কব্জ করে নিয়েছেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তবে অপর সময়েও এটা আমাদের ফেরত দিতে পারতেন। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা এটা আদায় করতে ভুলে যায়, অতঃপর [জেগে] এর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সে যেন তাকে সেরূপ পড়ে, যেরূপ যথাসময়ে পড়তো। এরপর তিনি হযরত আবূ বকরের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, 'শয়তান, বেলালের নিকট আসে, তখন সে নামাজ পড়ছিল এবং তাকে শুইয়ে দেয়। অতঃপর তাকে চাপড়াতে থাকে যেভাবে ছেলেকে চাপড়ানো হয় যে পর্যন্ত না সে ঘুমিয়ে পড়ে।' অতঃপর

بِلَالًا فَاَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ الَّذِىْ اَخْبَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

তিনি বেলালকে ডাকলেন, বেলাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপ সংবাদ দিলেন যা তিনি হযরত আবূ বকরকে দিয়েছিলেন। তখন আবূ বকর (রা.) বললেন, সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কেন হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল বলে সাক্ষ্য দিলেন, অথচ তিনি ইতঃপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন : আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'রাসূল' বলে সাক্ষ্য দেওয়া ঈমান আনার জন্য নয়। তিনি জিব্‌রাঈলের আগমন এবং ওহি নাজেল সম্পর্কে প্রথমেই বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। তা হলে এখানে সাক্ষ্য প্রদান উদ্দীপনা ও অতিরিক্ত ভক্তি-বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরও একটি মু'জিযা দেখতে পেলেন। হযরত বেলাল (রা.)-এর কি ঘটেছিল তা নবী করীম ﷺ পূর্বাহ্নেই হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলে দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٦٣٧ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِىْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صِيَامُهُمْ وَصَلٰوتُهُمْ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মুসলমানদের দু'টি জিনিস মুয়াজ্জিনদের কাঁধে ঝুলে আছে– (এক) তাদের রোজা (দুই) তাদের নামাজ। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইসলামে আযানের গুরুত্ব : ইসলামে আযানের গুরুত্ব অত্যধিক। যেমন–

১. আযান দ্বারা আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়।
২. আযানের মাধ্যমে সালাত যে ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়।
৩. আযানের দ্বারা গণমানুষের মধ্যে ইসলামি জাগরণ সৃষ্টি হয়।
৪. আযানে মুয়াজ্জিন যখন "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" ধ্বনি দেয়, তখন আল্লাহর ঘোষণায় অবিশ্বাসীদের আত্মা প্রকম্পিত হয়ে উঠে।
৫. আযানে "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" বলার দ্বারা মুশরিকদের অংশীবাদিত্বের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষিত হয় এবং গুরুগম্ভীর উপস্থাপনে তার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।
৬. আযানে "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" বলার সাথে সাথে আকাশ-বাতাস ছড়িয়ে রাসূল ﷺ-এর রিসালাত ও নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয় এবং তাঁর সপক্ষে যাবতীয় বাধা-বিপত্তির উপেক্ষা ও মোকাবেলা করার শপথ নেওয়া হয়।
৭. আযানে "حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ" এবং অন্যান্য বাক্যগুলো দ্বারা জামাতে নামাজের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, আমাদের জীবনের যাবতীয় ইবাদতের মূলে হলেন আল্লাহ তাআলা। আর তিনি যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ, একক ও অদ্বিতীয়, তাই ইবাদত একমাত্র তাঁরই জন্য হবে, অন্যের জন্য নয়।

بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعَ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও নামাজের স্থানসমূহ

تَعْرِيْفُ الْمَسْجِدِ -মাসজিদের সংজ্ঞা : اَلْمَسْجِدُ শব্দটি إِسْم ظَرْف একবচন, এর বহুবচন হলো اَلْمَسَاجِدُ শাব্দিক অর্থ হলো– সেজদা করার স্থান। পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

هُوَ الْمَوْضَعُ الَّذِىْ يُعَيَّنُ لِاَدَاءِ الصَّلٰوةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَةِ بِشَرْطِ الْوَقْفِ ـ

অর্থাৎ 'মসজিদ এমন স্থান যাকে নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তবে সে স্থানটি ওয়াক্‌ফ কৃত হতে হবে।' তবে নামাজের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত নয়; বরং জমিনের যে কোনো স্থানেই নামাজ পড়া যাবে। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ এরশাদ করেছেন– جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا অর্থাৎ, সমগ্র জমিন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ : পৃথবীর সর্বপ্রথম মসজিদ হলো মাসজিদে হারাম, যা মক্কায় অবস্থিত। মহান আল্লাহর ভাষায় إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ নিশ্চিয়ই সর্বপ্রথম ঘর, যা মানুষের ইবাদতের জন্য স্থাপিত হয়েছে তা হলো মক্কায় অবস্থিত। দ্বিতীয় মসজিদ হলো "আল-মাসজিদুল আকসা" তৃতীয় মসজিদ হলো "মসজিদে কোবা?" যা মহানবী ﷺ হিজরতের পর মাদীনার অদূরে কোবা নগরীতে নির্মাণ করেন এবং চতুর্থ মসজিদ হলো "মাসজিদে নববী" মহানবী ﷺ মদীনায় এসে এ মসজিদ নির্মাণ করেন।

কথিত আছে যে, আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ 'বায়তুল মামূর' নামক ঘরকে কেন্দ্র করে তওয়াফ-ইবাদত করে থাকেন। হযরত আদম (আ.) দুনিয়ায় এসে তদরূপ একটি ঘর নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মক্কায় তদ্রূপ একখানা ঘর নির্মাণ করতে নির্দেশ দেন। পরে তিনি ফিলিস্তিন গমন করলে তথায়ও তদরূপ একটি ঘর নির্মাণ করেন। এরই নাম 'আল-মাসজিদুল আক্‌সা'। অবশ্য কারো কারো মতে এটা তাঁর সন্তানদের কেউ নির্মাণ করেছেন। পরে এক সময় ঘরদ্বয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেলে মক্কার ঘরের পুনঃনির্মাণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং ফিলিস্তিনের ঘর পুনঃনির্মাণ করেন হযরত দাঊদ ও সুলাইমান (আ.)।

মসজিদের ফজিলত : মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, জমিনের উপর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান হলো মসজিদ, আর নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার। মসজিদে পাক-পবিত্র হয়ে প্রবেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো স্থানে প্রবেশের ব্যাপারে এ রকম নির্দেশ নেই।

পাঞ্জেগানা মসজিদের এক রাকাত মসজিদের বাইরে অন্য কোনো স্থানে পঁচিশ রাকাতের সমান, এমনিভাবে জুমা মসজিদের এক রাকাত বাইরে পাঁচশত রাকাতের, মসজিদে আকসায় পাঁচিশ হাজার, মসজিদে নববীতে পঞ্চাশ হাজার রাকাতের এবং মসজিদে হারামের এক রাকাতে এক লক্ষ রাকাতের ছওয়াব পাওয়া যায়।

আলোচ্য অধ্যায়ে মসজিদের ফজিলত ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের উপর হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِىْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ)

৬৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [মক্কা বিজয়ের দিন] মহানবী ﷺ যখন কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন, এর প্রত্যেক কোণে কোণে দোয়া করলেন। কিন্তু নামাজ পড়লেন না, যে পর্যন্ত না তা হতে বের হলেন। তারপর বের হয়ে কা'বা গৃহের সম্মুখে দু' রাকাত নামাজ পড়লেন এবং বললেন 'এটিই কেবলা'। –(বুখারী) ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে, তিনি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هٰذِهِ الْقِبْلَةُ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ-এর বাণী هٰذِهِ الْقِبْلَةُ -এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; যা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা তূরপুশ্তী বলেন, هٰذِهِ الْقِبْلَةُ দ্বারা কা'বা শরীফের ঐ অংশের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার মধ্যে দরজা রয়েছে।

২. আ'ল্লামা খাত্তাবী বলেন– هٰذِهِ الْقِبْلَةُ -এর অর্থ হলো—

إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدِ اسْتَقَرَّتْ عَلٰى هٰذَا الْبَيْتِ لَا يُنْسَخُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَصَلُّوْا إِلَى الْكَعْبَةِ أَبَدًا فَهِيَ قِبْلَتُكُمْ

৩. কারো মতে এ বর্ণনা দ্বারা দ্বারা হুজুর ﷺ সুন্নতের তা'লিম দিয়েছেন। অর্থাৎ যদিও কা'বার সকল দিকেই নামাজ জায়েজ। কিন্তু কা'বা শরীফের চেহারার দিকে ফিরে ইমামের দণ্ডায়মান হওয়া সুন্নত। এর অর্থ এই নয় যে, কেবলা শুধু এ দিকেই, অন্যান্য দিকে ফিরে নামাজ পড়া জায়েজ নেই। আর এর অর্থ এটাও নয় যে, বের হতে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে দাঁড়ালে নামাজ صَحِيْح হবে, আর কা'বার ভিতরে নামাজ ঠিক হবে না।

وَعَنْ ٦٣٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلٰثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلٰى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلّٰى - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বায় প্রবেশ করলেন। [প্রবেশকারীদের মধ্যে ছিলেন] তিনি, উসামা ইবনে যায়েদ, ওসমান ইবনে ত্বালহা হাজাবী ও বেলাল ইবনে রাবাহ। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ভিতরে থাকা অবস্থায় কেউ [বেলাল বা ওসমান] দরজা বন্ধ করে দিলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ এর ভিতরে থাকলেন। পরে বেলাল (রা.) যখন বের হলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম– রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কী করেছেন? হযরত বেলাল (রা.) বললেন, তিনি একটি স্তম্ভকে বামে, দু'টিকে ডানে এবং তিনটিকে পিছনে রাখলেন। তৎকালে কা'বা ছয়টি স্তম্ভের উপরে ছিল– অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ : ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, কা'বার অভ্যন্তরে নফল নামাজ পড়া জায়েজ আছে, কিন্তু ফরজ নামাজ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁরা বলেন, ফরজ নামাজ কা'বার অভ্যন্তরে জায়েজ নয়। পূর্বে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসই তাঁদের দলিল। অবশ্য বিভিন্ন সাহাবীদের কর্ম ও বর্ণনা হতে দেখা যায় নফল জায়েজ আছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফরজ, নফল কোনো নামাজই জায়েজ নয়। কেননা কুরআনের নির্দেশ হলো নামাজের মধ্যে কা'বাকে সম্মুখে রাখা, আর অভ্যন্তরে নামাজ পড়লে কা'বার কিছু অংশ পিছনে পড়তে বাধ্য। কাজেই কোনো নামাজই জায়েজ নয়।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানাফী ও তাঁর অনুসারীদের মতে ফরজ, নফল সব নামাজই জায়েজ। দলিল হলো— أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ সুতরাং যদি কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়া জায়েজ না হয়, তা হলে এর মধ্যে রুকু সেজ্‌দা করার অর্থ নিরর্থক হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে বলা হয় যে, 'গোটা ঘরকে' সম্মুখে রাখার নির্দেশ নয়, বরং সে 'দিকটিই' সামনে রাখতে বলা হয়েছে– فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীসে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মহানবী ﷺ ভিতরে নামাজ পড়েছেন।

বিপরীতমুখী দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান : আলোচ্য হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে নামাজ পড়েননি। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে বেলালের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ কা'বার ভিতরে নামাজ পড়েছিলেন। উভয় হাদীসে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো, জমহুর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উত্তরে বলেন–

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা নামাজ না পড়া প্রমাণিত হয়, না-জায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয় না। যখন অন্য হাদীস দ্বারা পড়া প্রমাণিত হয়।

২. উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির মূল রাবী হযরত উসামা (রা.) তাঁর নিকট থেকে শুনেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, সে সময় নবী করীম ﷺ হযরত উসামা (রা.)-কে পানি আনার জন্য বাইরে পাঠিয়েছেন, যাতে কা'বার দেওয়ালের ময়লা ইত্যাদি দূর করা যায়, তাই তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখেন নি। আর হযরত বেলাল (রা.) তখন রাসূল ﷺ-এর নিকটে ছিলেন। এ কারণে হযরত বেলাল (রা.)-এর উক্তিই সঠিক।

৩. হযরত বেলাল (রা.)-এর হাদীস مُثْبِتٌ অর্থাৎ, নামাজ পড়াকে সাব্যস্ত করে কাজেই বেলালের বর্ণিত হাদীসের প্রাধান্য হবে। উসূলে হাদীসের সিদ্ধান্তও এরূপই। তা ছাড়া ইমাম নববীর বর্ণনা মতে, সকল হাদীস বিশারদ হযরত বিলাল (রা.)-এর রেওয়ায়াতটি গ্রহণ করেছেন।

اَلْكَعْبَةُ -এর অর্থ : كَعْبٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– উচ্চ, ভর্তি করে দেওয়া, পায়ের টাখনা বা নিচের গিরা, মর্যাদা ও সম্মান ইত্যাদি। এটা একবচন, বহুবচনে كَوَاعِبُ 'ষোড়ষী যুবতী' যার স্তন বক্ষের উপর উঁচু হয়ে উঠেছে তাকে বলা হয় كَاعِبَة যেমন– কুরআনে বর্ণিত হয়েছে وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا বায়তুল্লাহ শরীফকে কা'বা করে নামকরণের ব্যাখ্যা হলো—

১. সমতল ভূমি হতে উক্ত স্থানটি স্বাভাবিকভাবে উঁচু।

২. অথবা, দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের তুলনায় উক্ত ঘরের মর্যাদা সু-উচ্চে প্রতিষ্ঠিত।

৩. আবার কেউ কেউ বলেছেন, كَعْب অর্থ– চতুর্ভুজ। বস্তুত বায়তুল্লাহ শরীফ চার বাহু বা কোণ দ্বারা বেষ্টিত। এ কারণে একে কা'বা বলে নামকরণ হয়েছে।

---

٦٤٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার এই মসজিদে এক নামাজ অন্যান্য মসজিদের হাজার নামাজ অপেক্ষা উত্তম– কেবল মসজিদে হারাম ব্যতীত। –[বুখারীও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মসজিদে নববী সংক্রান্ত আলোচনা : মসজিদে নববী-এর যে ফজিলত বা মাহাত্ম্য হাদীসের বর্ণিত হয়েছে তা কী রাসূল ﷺ-এর যুগে নির্মিত মসজিদের অংশের সাথে নির্দিষ্ট, না পরবর্তীতে বর্ধিতাংশের মধ্যেও উক্ত মাহাত্ম্য রয়েছে এ সম্পর্কে হাদীস বিশারদদের মতনৈক্য রয়েছে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, এ মাহাত্ম্য বা মর্যাদা রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্মিত মসজিদের অংশের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা, রাসূল ﷺ বলেছেন, مَسْجِدِىْ هٰذَا কিন্তু হানাফী মাযহাব মতাবলম্বী উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য ইমামদের মতে মসজিদে নববীর এ মর্যাদা রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ– অংশের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মসজিদ যে সম্প্রসারিত করা হয়েছে তার জন্যও ঐ একই মর্যাদা। কেননা, মহানবী ﷺ বলেছেন, لَوْ مُدَّ مَسْجِدِىْ اِلٰى صَنْعَاءَ لَكَانَ مَسْجِدِىْ

ইমাম নববীর উপস্থাপিত দলিলের উত্তর : ইমাম নববী মহানবী ﷺ-এর উক্তি مَسْجِدِىْ هٰذَا দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাব এই যে, এখানে مَسْجِدِىْ هٰذَا বলে মসজিদে নববী ছাড়া অন্য সব মসজিদ হতে পৃথক করা হয়েছে। রাসূল ﷺ কর্তৃক নির্মিত মসজিদের চৌহদ্দিকে উক্ত মর্যাদার সাথে নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়।

মসজিদে হারামের মর্যাদা সম্পর্কে মতভেদ : ইমাম মালেক (রা.)-এর মতে মর্যাদার দিক দিয়ে মসজিদে নববী পৃথিবীর অন্য সব মসজিদ, এমনকি মসজিদে হারামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–

১. মহানবী ﷺ মদীনায় অধিক কল্যাণ নাজিল করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছেন।

২. মক্কা শরীফ যদিও ইসলামের বিকাশ স্থল; কিন্তু মদীনায় ইসলামের বিজয় হয়েছে, সুতরাং এর মর্যাদাও বেশি।

৩. মসজিদে হারাম হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নামাজের স্থান, আর মদীনা মহানবী ﷺ-এর নামাজের স্থান।

৪. মসজিদে হারামের ভিত্তি স্থাপন করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ.), আর মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন মহানবী ﷺ।

৫. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ .

মালেকী মাযহাবের অনুসারীরা হাদীসটির ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, মসজিদে নববীতে এক নামাজ পড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার নামাজ হতে উত্তম; কিন্তু মসজিদে হারামে নামাজ পড়লে এ পরিমাণ ছওয়াব হবে না, বরং এর চেয়ে কম হবে।

مَذْهَبُ اَكْثَرِ الْاَئِمَّةِ : অধিকাংশ ইমামের মতে মর্যাদার দিক দিয়ে মাসজিদে হারাম অন্যসব মসজিদ, এমনকি মসজিদে নববীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন, মহান আল্লাহর বাণী–

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ . فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . (الاية)

উল্লিখিত আয়াতে মসজিদে হারাম শ্রেষ্ঠ হওয়ার কয়েকটি প্রমাণ রয়েছে—

১. মসজিদে হারামের প্রস্তুতকারী স্বয়ং আল্লাহ। কর্তৃবাচ্যের কেরাত এ কথারই প্রমাণ।

২. মসজিদে হারামকে مُبَارَكٌ (কল্যাণময়) বলা হয়েছে।

৩. মসজিদে হারামকে বিশ্ববাসীর জন্য 'হিদায়াত' বলা হয়েছে।

৪. এতে বহুসংখ্যক নিদর্শন (اٰيَاتٌ) রয়েছে।

৫. মসজিদে হারামে প্রবেশকারী নিরাপত্তা লাভ করে।

৬. মসজিদে হারামকে জিয়ারত করা ফরজ। মহান আল্লাহর বাণী – وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

৭. আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ হলো, মসজিদে নববীতে এক নামাজ পড়া অন্যান্য মসজিদে হাজার নামাজ পড়া হতে উত্তম, কিন্তু মসজিদে হারামের মর্যাদা এর তুলনায় অনেক বেশি।

ইমাম মালেক (রা.)-এর **উপস্থাপিত দলিলের উত্তর :** ইমাম মালেক (র.)-এর উপস্থাপিত প্রথমোক্ত চারটি দলিলের উত্তর এই যে, উক্ত চারটি দলিল দ্বারা আংশিকভাবে মদীনার মর্যাদা প্রমাণিত হয়। আর আমাদের বক্তব্য হলো মৌলিক মর্যাদা সম্পর্কে।

পঞ্চম দলিলের উত্তর এই যে, তাঁরা হাদীসটির যে অর্থ করেছেন, তা প্রকাশ্য অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং এ অর্থ কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

وَعَنْ ٦٤١ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِيْ هٰذَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– এ তিন মসজিদ ব্যতীত অপর কোনো দিকে ভ্রমণ করা যায় না [আর সে তিন মসজিদ হলো] (১) মাসজিদে হারাম, (২) মসজিদে আকসা এবং (৩) আমার এ মসজিদ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে আলোচিত তিনটি মসজিদের ফজিলতের বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসের মহানবী ﷺ-এর বাণী إِلَّا إِلَى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ দ্বারা ইঙ্গিতবহ তিন মসজিদ তথা মাসজিদে হারাম, মাসজিদে নববী ও মাসজিদে আকসার ফজিলত এবং মর্যাদা ইসলামে ব্যাপক। তন্মধ্যে অন্যতম কয়টি নিম্নে উপস্থাপিত হলো–

ক. মসজিদে হারাম : এ মসজিদটি পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর; যেমন কুরআনে এসেছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ .

※ এটির মর্যাদা তৈরি থেকে কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে।

※ এ ঘরটি মুসলমানদের কেবলা।

※ হজের অন্যতম রোকন হলো এ ঘরকে তওয়াফ করা।

※ সমস্ত নবী রাসূল এ ঘরটি তওয়াফ করেছেন।

※ এ ঘরের প্রতি প্রতিদিন অসংখ্য রহমত বর্ষিত হতে থাকে।

※ দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা হাজার হাজার মানুষ এ ঘর তওয়াফ করে।

※ এ স্থানে অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় তওয়াফই সর্বাধিক ছওয়াবের কাজ।

※ এ মসজিদ নির্মাণে অসংখ্য ফেরেশতা ও নবী-রাসূল অংশগ্রহণ করেন।

※ এ মসজিদ মানবজাতির মুক্তির একটা বড় ধরনের মাধ্যম।

※ এ মসজিদে ইবাদত করলে অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অনেক বেশি নেকী অর্জিত হয়। যেমন, হাদীস–

১. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত– وَصَلَاتُهُ فِىْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلٰوةٍ অর্থাৎ মসজিদে হারামে সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে এক লাখ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

২. ইমাম আহ্‌মদ (র.) বলেন, মসজিদে হারামে একটি সালাত অন্যস্থানে দশ কোটি সালাত অপেক্ষা উত্তম।

. হযরত আনাস (রা.)-এর অপর বর্ণনা মতে অবশ্যই মাসজিদে হারামে সালাত আদায় অন্যস্থানে সালাত আদায়ের চেয়ে পাঁচশ' কোটি গুণ বেশি ছওয়াব হয়।

খ. মাসজিদুল আক্‌সা'র মর্যাদা : মাসজিদুল আক্‌সা হলো বাইতুল মুকাদ্দাস। এ মসজিদের মর্যাদাও অনেক বেশি। কারণ–

※ এ মসজিদ বিগত নবী-রাসূলদের হাতে গড়া।

※ আল-কুরআনে এ মসজিদের বিবরণ গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হয়েছে।

※ এ মসজিদ থেকেই রাসূল ﷺ -এর ঊর্ধ্বাকাশে গমন, অর্থাৎ মিরাজের সূচনা হয়।

※ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, মসজিদে আক্‌সায় সালাত আদায় অন্যান্য মসজিদ হতে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়।

গ. মাসজিদে নববীর মর্যাদা :

※ স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর নিজ হাতে গড়া মসজিদ [তথা মসজিদে নববী]।

※ এ মসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর নিকট অনেকবার ওহি নাজিল হয়।

※ এ মসজিদকে কেন্দ্র করে রাসূল ﷺ ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

মাসজিদে নববীর মর্যাদা প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– 'যে ব্যক্তি এ মসজিদে কিছু শেখার জন্য আসে কিংবা শেখানোর জন্য, সে মুজাহিদদের সমমর্যাদায় ভূষিত হবে।' সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, এ তিনটি মসজিদ আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

নামাজ নির্ণয়ে ইমামদের মতভেদ : উপরোক্ত তিন মসজিদে নামাজ পড়ার ফজিলত কি ফরজ নামজের সাথে সম্পৃক্ত, না অন্য নামাজেও এ ফজিলত রয়েছে। এ বিষয়ে ইমামগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বর্ণনা করেন যে, এটা ফরজ নামাজের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়; বরং নফল নামাজেও ছওয়াব পাবে। তবে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের কতিপয় আলিম বলেন যে, এটা ফরজ নামাজের জন্য সুনির্দিষ্ট হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেন, এ সুনির্দিষ্ট বাড়তি ছওয়াব শুধু নামাজের জন্যই নয়, অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি, সদকা, দান ইত্যাদিতেও বেশি ছওয়াব পাওয়া যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), মুজাহিদ (র.), আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) প্রমুখ সহ এক দল আলিম বলেন, যদি কেউ মসজিদে হারামে পাপ করেন, তা হলে তার পাপও বেশি লেখা হবে। কিন্তু জমহুর ওলামার মত হলো, গুনাহ বর্ধিত হবে না।

তাদের দলিল-وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত নবী, ওলি ও সালেহীনদের কবর জেয়ারতে সফর করার বিধান : উল্লিখিত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সফর করার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে—

১. উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের দিকে সফর করা।

২. নবী, ওলি ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের কবর জেয়ারতের জন্য সফর করা।

৩. বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে সফর করা।

৪. কারো সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাপারে বা কোনো প্রয়োজনে সফর করা ইত্যাদি।

৬. বিদ্যা অর্জনের জন্য ভ্রমণ করা।

১. যদি নিজের এলাকায়-মহল্লায় মসজিদ না থাকে তখন অন্য মসজিদের দিকে সফর করা জায়েজ। কেননা, ঘরের মধ্যে নামাজ পড়া অপেক্ষা পাঞ্জেগানা মসজিদে নামাজ আদায় করার ছওয়াব বহু বেশি। তবে নিজের মহল্লায় মসজিদ থাকা সত্ত্বেও অন্য মসজিদের সফর করা জায়েজ নেই। এরূপ জুমার মসজিদের বিধানও তাই। কেননা, তিন মসজিদ ব্যতীত সব মসজিদের হুকুম ও ছওয়াব সমান।

২. নবীর মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শুধু জায়েজই নয়; বরং অনেক নেকী ও সৌভাগ্যের কাজও বটে। শায়খ আব্দুল হক দেহলবী (র.) বলেছেন– لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ দ্বারা যে কোনো ধরনের সফরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ছওয়াব ও পুণ্য কাজ বলে নিয়ত করে যাওয়া তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো স্থানের জেয়ারতে যাওয়া জায়েজ নেই।

ইমাম আহমদ তাঁর প্রসিদ্ধ মুসনাদ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন– لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ لِيُصَلِّيْ فِيْهِ এ হাদীসের মধ্যে 'নামাজ পড়া'-এর উদ্দেশ্যে শব্দটি বর্ণনা করায় বুঝা যাচ্ছে, নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ আছে। যেমন– বিদ্যাশিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির জন্য সফর করা জায়েজ।

ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে লিখেছেন, আবূ মুহাম্মদ বলেছেন, يَحْرُمُ شَدُّ الرِّحَالِ اِلٰى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ غَلَطٌ اِنْتَهٰى এতে বুঝা যায় যে, বিদ্বান ও পুণ্যবানদের কবর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা নাজায়েজ নয়। তবে কোনো প্রকার বিদ'আতের সম্ভাবনা থাকলে নাজায়েজ। যেমন– বর্তমান যুগে কবরকে কেন্দ্র করে শত প্রকার বিদ'আতী কার্যকলাপ চলছে। কবরে সেজদা করা, ফুল ছিটানো, নজর মানত দেওয়া, কবর গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা।

৩. দেশ-বিদেশে ভ্রমণ যদি শুধু রং-তামাশার জন্য বা নিছক উপভোগের জন্য হয়, তবে এ ধরনের ভ্রমণ জায়েজ নয়। কেননা এটা اَلْمَلَاهِيْ كُلُّهَا حَرَامٌ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি কেউ কুরআনের আয়াত سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ-এর উপরে আমল করে আল্লাহর কুদরতের মহিমা জানার জন্য এবং সৃষ্টি হতে উপদেশ গ্রহণের জন্য ভ্রমণ করে, তবে শুধু জায়েজই নয়; বরং অধিক পুণ্যের কাজ।

৪. জ্ঞানী ও পুণ্যবানদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করাও উত্তম ও পুণ্যের কাজ। আর দুনিয়ার অনুসারীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়।

৫. এ প্রকার ভ্রমণও জায়েজ যদি ভ্রমণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে।

৬. বিদ্যার্জনের জন্য ভ্রমণ নবী করীম ﷺ-এর হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে।

এ ছাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে শিক্ষালাভ ও খোদাভীতি অর্জনের লক্ষ্যেও ভ্রমণ করা জায়েজ আছে. যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে— قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

وَمَسْجِدِىْ هٰذَا দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল ﷺ-এর বাণী "ومسجدى هذا"-এর মধ্যে মসজিদ দ্বারা মাসজিদে নববী বুঝানো হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে নববীর বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন–

১. এ মসজিদ স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর হাতের গড়া।

২. এ মসজিদে রাসূল ﷺ-এর উপর বহু বার ওহি নাজিল হয়েছে।

৩. এ মসজিদকে কেন্দ্র করে রাসূল ﷺ ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

৪. রাসূল ﷺ বলেন. যে ব্যক্তি কিছু শেখার জন্য কিংবা শেখানোর জন্য এ মসজিদে আসে, সে একজন মুজাহিদের মর্যাদা পাবে।

৫. এ মসজিদে এক রাকাত নামাজ অন্যান্য মসজিদের এক হাজার রাকাত নামাজ অপেক্ষা উত্তম।

কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের বিধান নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ : কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার বৈধতা নিয়ে আলিমদের মতামত নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

কতিপয় ওলামার মতে কবর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়; যেহেতু হাদীসে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্যত্র সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।

مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : মুসলিম মনীষী, জ্ঞানী-গুণী, নবী-রাসূল বা ওলি-আউলিয়াদের মাজার তথা কবর জিয়ারত করা সাধারণভাবে জায়েজ এবং জেয়ারতকারীর জন্য উপকারী। নিম্নে তার কারণ উপস্থাপিত হলো—

এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। মৃত ব্যক্তির জীবনে ইসলামের জন্য করা কীর্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। আল্লাহভীতি তথা তাক্ওয়া অর্জিত হয়।

এ জন্য মুসলিম ব্যক্তিত্বের মাজার জিয়ারত করা জায়েজ এবং পুণ্যকর্ম। তা করা একজন মু'মিনের জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা, হাদীসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهٖ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقُوْمَ -

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرٍ يَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَرَفَهُ . اَلْحَدِيْثُ

তবে শর্ত হলো, এ জিয়ারত হতে হবে খাঁটি মনে, অনানুষ্ঠানিকভাবে। কোনো অনুষ্ঠান করে বা মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য বা দোয়া প্রার্থনার নিয়তে তার নিকট হতে নাজাত কামনা করে তার মাজারে সেজদা বা এমনি ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জিয়ারত করা জায়েজ নয় এবং তা শির্ক ও বিদ্'আতে পরিণত হয়ে যায়।

মোটকথা, যে সকল ক্ষেত্রে কবরকে কেন্দ্র করে বিদ'আত ও শিরকি কার্যকলাপ চলে থাকে বা বিদ'আত সৃষ্টি হতে পারে এরূপ ক্ষেত্রে কবর জিয়ারত জায়েজ হতে পারে না; বরং হারামে পরিণত হয়ে যায়।

وَعَنْ ٦٤٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যখানে যে স্থানটি রয়েছে তা বেহেশতের বাগানসমূহের মধ্যে একটি বাগান। আর আমার মিম্বারটি আমার হাওজের [হাওজে কাওসার] উপর [নির্মিত]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ-এর অর্থ : নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যখানে বেহেশতের একটি টুকরা আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি সে জায়গায় ইবাদত করবে, সে বেহেশতের বাগানে পৌছবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এ হাদীসটি প্রকৃতই এর বাহ্যিক অর্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে অর্থাৎ এ জায়গাটি এমন একটি টুকরা যা বেহেশত হতে স্থানান্তর করা হয়েছে, হাজরে আসওয়াদের মতো। পরে আবার এটা বেহেশতে স্থানান্তর করা হবে। জমিনের অন্যান্য অংশের ন্যায় এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে না।

১. আল্লামা ইবনে হাজর (র.) বলেন, এটাই অধিকাংশের অভিমত। প্রকৃতপক্ষে এটা বেহেশ্তের একটি টুকরা, যদিও সে স্থানের অবস্থানকারী ক্ষুধা, পিপাসা এবং শীত ও গরম উপলব্ধি হতে নিষ্কৃতি পায় না। কেননা এটা দুনিয়ার স্বভাব। যেমন, হুজুর ﷺ বলেছেন— اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ يُرِيْدُ اَنَّ الْجِهَادَ يُؤَدِّيْ اِلَى الْجَنَّةِ অর্থ– বেহেশ্ত তলোয়ারের ছায়ার নিচে। অর্থাৎ জিহাদ বেহেশ্তে পৌছে দেয়। এখানেও হাদীসের অর্থ হলো উক্ত স্থানের নামাজ ও জিকির ইত্যাদি আদায়কারী জান্নাতে পৌছে যাবে।

২. আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেছেন, এ জায়গার নাম রওজা বা বাগান এ কারণেই রাখা হয়েছে যে, এ স্থানের ফেরেশতা, জিন ও মানুষ ইবাদতে ও মহানবী ﷺ-এর জেয়ারতে ব্যস্ত থাকে। যেমন– অন্য হাদীসে জিকিরের মজলিসকে رِيَاضُ الْجَنَّةِ বেহেশ্তের বাগান বলা হয়েছে।

আমার মিম্বার আমার হাওজের উপর : কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আমার নিকট উপস্থিত হয়, [অর্থাৎ সাহাবীগণ] অথবা যারা এ হাদীস হতে কল্যাণ লাভ করবে [অর্থাৎ পরবর্তী যুগের উম্মতগণ] তারা 'হাওযে কাওসার' হতে উপকৃত হবেন। বস্তুত হাদীসটির অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, 'মিম্বার' তথা মিম্বারের উপর হতে যা প্রচার ও প্রকাশ করা হয় তা হলো অন্তরের মূর্খতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণের ঘাট, যেমন 'হাওযে কাওসার' হলো কিয়ামতের দিন তৃষ্ণার্ত দূরীভূত করণের ঘাট।

আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, হাদীসটির নিগুঢ় তত্ত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত জিনিস। সুতরাং একে এমনিই মেনে নেওয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

وَعَنْ ٦٤٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রত্যেক শনিবারে পায়ে হেঁটে বা বাহন জন্তুতে আরোহণ করে 'কুবার' মসজিদে আসতেন। অতঃপর সেখানের দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের সময় কুবা নামক স্থানে ১৩দিন অবস্থান করেন, আর সেখানে ইসলামের প্রথম জুমা ও একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, এটিই ইসলামের প্রথম মসজিদ। এটি মদীনা হতে পূর্ব দিকে তিন মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। এ মসজিদে রাসূল ﷺ প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ মসজিদে দু' রাকাত নামাজ পড়লে এক ওমরার ছওয়াব পাওয়া যায়।

وَعَنْ ٦٤٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হলো মসজিদসমূহ এবং সবচেয়ে ঘৃণ্য ও ধিকৃত স্থান হলো বাজারসমূহ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : শরিয়ত যে ধরনের স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি দিয়েছে তন্মধ্যে বাজার সর্ব নিকৃষ্ট এবং মসজিদ সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা, মসজিদ ইবাদত-বন্দেগি ও শরিয়ত প্রচার ও প্রসারের জায়গা, আর বাজার যাবতীয় শয়তানি কর্ম, লোভ-লালসা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচর্চা ও খেয়ানতের জায়গা। সর্বোপরি নামাজ, ইবাদত ইত্যাদি ভুলে থাকার জায়গা। শরিয়তে বাজার নির্মাণের অনুমতি থাকলেও শরাবখানা, বেশ্যালয় ইত্যাদি বানানোর অনুমতি নেই।

وَعَنْ ٦٤٥ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৫. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করেন।–[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ -এর মর্মার্থ : 'আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন' বাক্যটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে সে বেহেশতী হবে। কেননা মসজিদ হলো নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের স্থান। যে ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট সে ব্যক্তির পক্ষেই মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব। আর তার জন্যই বেহেশত। সুতরাং মসজিদ নির্মাণকারী বেহেশতে যাবে।

دَفْعُ التَّعَارُضِ দ্বন্দ্বের সমাধান : আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কীয় হাদীস مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ এর قَطَاةٌ হলো এক জাতীয় ছোট পাখি। আর مَفْحَصٌ বলতে ঐ ঘরকে বুঝানো হয়েছে যা ঐ ছোট পাখিটি মাটি খুঁড়ে ডিম পাড়ার জন্য তৈরি করে। সুতরাং كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ -এর অর্থ দাঁড়াল কাতাত নামক পাখিটি তার ডিম পাড়ার জন্য মাটি খনন করে যে ছোট গর্তটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ছোট গর্তে তো একটি পা রাখার স্থানও হয় না। সুতরাং উক্ত হাদীসে যে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ তৈরি করবে তার জন্য বেহেশত তা হলে কাতাত পাখির ঘরের ন্যায় যেই মসজিদ খানি হবে তাতে তো নামাজ পড়ার জায়গা হবে না এরূপ মসজিদ কি কাজে আসবে?

জবাব এই যে,

১. আলোচ্য মসজিদ তৈরির দ্বারা অর্থ হলো, মসজিদের এরূপ সামান্য পরিমাণ অংশও যদি মসজিদের প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হয় তবে তার জন্য উপরিউক্ত পুরস্কার রয়েছে।

২. অথবা অনেকে পয়সা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করল, প্রতিজনের অংশে যদি কাতাত পাখির বাসার পরিমাণ ক্ষুদ্র অংশও হয় তা হলেও এর ছওয়াবের ওয়াদা রয়েছে।

৩. হাদীসে এত ক্ষুদ্র অংশ বলে مُبَالَغَةٌ করা উদ্দেশ্য। মূলত এত ক্ষুদ্র অংশ হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

৪. হাদীসের বর্ণিত মসজিদ দ্বারা সেজদার স্থান উদ্দেশ্য আর সেজদার স্থানের জন্য কাতাত পাখির বাসা পরিমাণই যথেষ্ট।

* মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য তদরূপ ঘরের ওয়াদা করা হয়েছে অথচ আল্লাহ্ বলেন, যে একটি সৎকাজ করবে তার জন্য দশ গুণ বিনিময় রয়েছে।

  এর জবাব হলো যে,

১. আলোচ্য হাদীসখানি সম্ভবত مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ (الاية) -এর পূর্বের।

২. কারো মতে কোনো কোনো নুসখায় যে بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا مِثْلَهُ বলা হয়েছে তাতে مِثْل -এর বর্ণনা অধিক হওয়ার বিরোধী নয়।

৩. অথবা আলোচ্য হাদীসের অর্থ হলো بَنَى اللّٰهُ لَهُ عَشَرَ اَبْنِيَةٍ مِثْلَهُ

৪. অথবা উত্তর এই যে, এক নেকীর বিনিময়ে একটি ছওয়াব হওয়া এটা ইনসাফ। আর এক নেকীর বিনিময়ে ১০ ছওয়াব হওয়া এটা পুরস্কারের ভিত্তিতে। সুতরাং হাদীসে ইনসাফের এবং আয়াতে পুরস্কারের বর্ণনা এসেছে।

৫. অথবা উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীসের مِثْل দ্বারা বুঝানো হয়েছে মসজিদ ঘর নির্মাণের বিনিময়ে জান্নাতে ঘর দেওয়া হবে। যদিও দুনিয়ার ঘর ও জান্নাতের ঘরের মাঝে কোনো তুলনা নেই। إِذْ مَوْضَعُ شِبْرٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا "কেননা, জান্নাতের এক বিগত জায়গা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে উত্তম।"

٦٤٦ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে সকালে কিংবা বিকালে মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে মেহমানী প্রস্তুত করে রাখবেন, তার প্রত্যেকবারের জন্য– যখন সে সকালে বা বিকালে [মসজিদে] গমন করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়ার অর্থ হলো, যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাজ, জিকির, তেলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতের জন্য নিজেকে সারাক্ষণ মসজিদের সাথে সম্পর্কিত রাখে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের মধ্যে অপ্যায়নের বস্তুসমূহ প্রস্তুত করে রাখেন। এক কথায় এরূপ ব্যক্তির বেহেশতে যাওয়া সুনিশ্চিত।

٦٤٧ - وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلٰوةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নামাজের ছওয়াবের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক ছওয়াবের ভাগী, যে মসজিদে অধিক দূর হতে আগমনকারী তারপর সে ব্যক্তি, যে তার চেয়ে অপক্ষোকৃত কম দূরবর্তী স্থান হতে আগমনকারী। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করে সে ঐব্যক্তির চেয়ে অধিক ছওয়াবের ভাগী হবে যে একা নামাজ পড়ে তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মসজিদের দিকে যার পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তার পাপ তত কমে যাবে এবং ছওয়াব বৃদ্ধি হবে, এ জন্য দূর থেকে আসা ব্যক্তির ছওয়াবও বেশি হবে। আর যে ব্যক্তি জামাতের অপেক্ষায় থেকে জামাতে নামাজ পড়ে সেও ঐ ব্যক্তি হতে অধিক ছওয়াবের মালিক হবে যে একা একা নামাজ পড়ে, জামাতে পড়ার জন্য অপেক্ষা করে না।

٦٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِىْ أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا

৬৪৮. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মসজিদে নববীর পার্শ্বে কিছু জায়গা খালি হলো। তখন বনূ সালামা গোত্র মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে চাইল। এ সংবাদ নবী করীম ﷺ -এর নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে বললেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, তোমরা মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করছ। তখন তারা প্রত্যুত্তরে

رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ يَا بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বলল হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এরূপ ইচ্ছে পোষণ করেছি। তখন তিনি বললেন, হে বনূ সালামা! তোমরা তোমাদের নিজ স্থানেই থাক, তোমাদের পদচিহ্নগুলো লেখা হবে। তোমরা তোমাদের নিজ স্থানেই থাক, তোমাদের পদচিহ্নগুলো লেখা হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি شَانُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ : বর্ণিত আছে যে, বনূ সালামা মদীনার আনসারদের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। মাসজিদে নববীর আশ্‌পাশের কিছু পরিবারের লোকজন মরে যাওয়ায় অথবা অন্যত্র চলে যাওয়ায় মসজিদের পাশের এলাকা খালি হয়ে গেল। তখন মাসজিদে নববী হতে তিন মাইল দূরে অবস্থানরত বনূ সালামা মসজিদের নিকট আসার ইচ্ছা করল। নবী করীম ﷺ বনূ সালমার এই মনোভাব শুনে তাঁদেরকে স্ব স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন, দূর হতে মসজিদে আসার দ্বারা তোমাদের যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পুণ্য দেওয়া হবে। বনূ সালামার এ ঘটনা উল্লেখ করে নবী করীম ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেন।

دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ-এর মর্মার্থ : মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বনী সালামা গোত্র মসজিদে নববীর নিকট আসার ইচ্ছা পোষণ করলে তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের আবাস গৃহে অবস্থান কর। কেননা, তোমাদের পদচিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হবে অর্থাৎ দূর থেকে এসে মসজিদে উপস্থিত হওয়া আর নিকটে এসে অবস্থান করে মসজিদে উপস্থিত হওয়া অবশ্যই একই মর্যাদার বিষয় নয়। মূলত আল্লাহর কাছে মানুষের প্রতিটি কর্মই মর্যাদার দাবিদার। এ ক্ষেত্রে যে যত বেশি শ্রম ব্যয় করবে, সে তত বেশি পুণ্যের অধিকারী হবে। আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ দূর থেকে মসজিদে এসে উপস্থিত হওয়াকে উৎসাহিত করেছেন- دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ বাক্যের মাধ্যমে।

وَعَنْ ٦٤٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ و رَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ و رَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বণির্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. ঐ যুবক- যে নিজের যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে, ৩. ঐ ব্যক্তি যে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার অন্তর মসজিদের সাথে টানা থাকে, ৪. আর ঐ দুই ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর [সন্তুষ্টির] জন্য, উভয়ে একত্রে মিলিত হয় তাঁরই জন্য এবং পৃথক ও হয় তাঁরই জন্য, ৫. আর যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়, ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা [কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থে] আহবান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, এবং ৭. ঐ ব্যক্তি যে দান-সদ্‌কা করে তা গোপনে করে, এমনকি তার ডান হাত কি দান করে তা বাম হাত জানে না। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ-এর ব্যাখ্যা : ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে সংযুক্ত, যখন সে মসজিদ হতে বের হয়ে পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার মনটা অস্থির থাকে। সে সর্বদা অপেক্ষায় থাকে যে, কখন আযান হবে, কখন জামাত হবে। মাছ যেমন পানির বাইরে অবস্থান করতে পারে না, তদরূপ মু'মিন ব্যক্তিও মসজিদের বাইরে অবিচলিত থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে মুনাফিক ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে তদরূপ অশান্তি অনুভব করে, যেমন পাখি বদ্ধ খাঁচায় অস্বস্তি বোধ করে। যেমন বলা হয়ে থাকে- اَلْمُؤْمِنُ فِى الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِى الْمَاءِ وَالْمُنَافِقُ فِى الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِى الْقَفَصِ

وَعَنْهُ ٦٥٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلٰوتِهٖ فِىْ بَيْتِهٖ وَفِىْ سُوْقِهٖ خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَ ذٰلِكَ اَنَّهٗ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهٗ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَتْ لَهٗ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَ لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلٰوةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهٗ وَ زَادَ فِىْ دُعَاءِ الْمَلٰئِكَةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তির জামাতে আদায়কৃত নামাজের ছওয়াব তার ঘরে বা দোকানে আদায় কৃত নামাজের ছওয়াব অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি। আর এটা তখনই হয়, যখন সে অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয়। আর এ বের হওয়া তার নামাজ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। এ অবস্থায় সে যত কদমই হাঁটে, প্রত্যেক কদমেই জান্নাতে তার জন্য এক একটা পদমর্যাদা উন্নীত করা হয় এবং তার এক একটা গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সে নামাজ পড়তে থাকে ফেরেশ্তাগণ তার জন্য এক নাগাড়ে দোয়া করতে থাকেন, যে পর্যন্ত সে তার নামাজের জায়গায় থাকে; 'হে আল্লাহ্ তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর'। [অতঃপর মহানবী ﷺ বলেন,] তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজেই থাকে।

অপর বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ বলেন, যতক্ষণ সে মসজিদে প্রবেশ করে নামাজ তাকে আবদ্ধ রাখে। আর সে বর্ণনায় ফেরেশতাদের দোয়ায়-এই কথাটি বেশি বলা হয়েছে। 'হে আল্লাহ্! তুমি তাকে মাফ কর, তুমি তার তওবা কবুল কর।' ফেরেশতারা এরূপ দোয়া করতে থাকেন, যতক্ষণ সে মসজিদে কাউকেও কষ্ট না দেয় এবং অজু ভঙ্গ না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায়কারীর মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির জন্য নিষ্পাপ ফেরেশতারা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকে, পাক-পবিত্র অবস্থায় যতক্ষণ সে মসজিদে থাকবে ততক্ষণই তার জন্য দোয়া করবে।

وَعَنْ ٦٥١ اَبِیْ اُسَیْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৫১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উসাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মসজিদে ঢুকে, সে যেন বলে اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ 'হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।' আর যখন বের হয়ে যায়, তখন যেন বলে اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।' –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে رَحْمَة ও فَضْل -এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে رَحْمَة এবং বের হওয়ার ক্ষেত্রে فَضْل -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে সে এমন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, যার দ্বারা সে ছওয়াব লাভ করে থাকে এবং যা তাকে বেহেশতের নিকটবর্তী করে দেয়। আর এ ক্ষেত্রে رَحْمَة প্রার্থনা করাই যুক্তিসঙ্গত এবং যখন সে মসজিদ হতে বের হয় তখন রিজিক অন্বেষণে লিপ্ত হয়, যেমন কুরআনে এসেছে–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

وَعَنْ ٦٥٢ اَبِیْ قَتَادَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ মসজিদে ঢুকে সে যেন বসে পড়ার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেয়।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দুই রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাহিয়্যাতুল মসজিদ। আহলে জাহেরের মতে এ দু' রাকাত পড়া ওয়াজিব, আর আমাদের মতে মোস্তাহাব। তবে মাকরূহ সময়ে বা জামাত শুরু হওয়ার সময়ে প্রবেশ করলে উক্ত নামাজ থেকে বিরত থাকবে এবং নিম্নোক্ত তাসবীহ পাঠ করবে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

আর কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে সুন্নত, ফরজ পড়া শুরু করে, তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

وَعَنْ ٦٥٣ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِیُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلَّا نَهَارًا فِی الضُّحٰی فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰی فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৩. **অনুবাদ :** হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ দিনের পূর্বাহ্ন ব্যতীত সফর হতে বাড়ি আগমন করতেন না। আর যখন আগমন করতেন তখন প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং তথায় দু' রাকাত নামাজ আদায় করতেন। অতঃপর তথায় বসতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সফর হতে সাধারণত দিনের প্রথমাংশে বাড়িতে আসাই উত্তম। কেননা এ সময়ে আসলে বাড়ি ওয়ালাদের তেমন কষ্ট হয় না, আর প্রথমে মহল্লার মসজিদে এসে দু' রাকাত নামাজ পড়ে বাড়ি খবর দিয়ে তারপর বাড়ি যাওয়া উচিত। অন্যথা হঠাৎ বাড়ি গেলে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে অথবা নিজ স্ত্রীকে অপ্রস্তুত ও সাজ-সজ্জাহীন অবস্থায় পেয়ে মন খারাপ হয়ে উঠতে পারে।

---

৬৫৪. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি শোনে যে, কেউ মসজিদে এসে কোনো হারানো জিনিস তালাশ করছে, তবে সে যেন বলে, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তা ফেরত না দিন'। কারণ মসজিদসমূহ এ জন্য বানানো হয়নি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। এখানে দুনিয়াবী কোনো কাজকর্ম করা বা আলোচনা করা সম্পূর্ণ হারাম। এ স্থানসমূহ শুধু আল্লাহর ইবাদত ও পরকালীন বিষয়ে আলোচনার জন্যই নির্মিত। কাজেই কোনো হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া বা তালাশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

---

৬৫৫. وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تَتَأَذّٰى مِمَّا يَتَأَذّٰى مِنْهُ الْإِنْسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৫. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় গাছের [রসুন বা পিয়াজ] কিছু খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে। কেননা, যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তার দ্বারা ফেরেশতাগণও কষ্ট পায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : اَلشَّجَرَةُ الْمُنْتِنَةُ রসুন গাছকে বুঝানো হয়েছে, আর اَلْمُنْتِنَةُ অর্থ হলো– দুর্গন্ধময়, তাই এর দ্বারা পিয়াজ-রসুন সহ অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো কাঁচা হলে মাকরূহ হবে, আর রান্না করা হলে মাকরূহ হবে না। এমনিভাবে মুখের গন্ধের মতো শরীরের গন্ধ, তামাকের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ ও কেরোসিনের গন্ধ নিয়ে মসজিদে বা কোনো ওয়াজ মাহফিলে ও হালকায়ে জিকিরে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

ধূমপান করার বিধান : হুক্কা, বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি ধূমপান করে মসজিদের গমন করা মাকরূহ তাহ্‌রীমী।

১. মাজমূয়ায়ে ফতোয়া গ্রন্থে আছে, হুক্কা পান করে বা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ তাহ্‌রিমী। হুক্কার মাধ্যমে তামাক পান এবং আধুনিক কালের বিড়ি-সিগারেট হিজরি ১১১ (একশত এগারো) সনে প্রচলিত হয়েছে।

২. অবশ্য বর্তমান যুগে কেউ একে মুবাহ, কেউ মাকরূহ তান্‌যীহী।

৪. আবার কেউ কেউ একে মাকরূহ তাহ্‌রীমী বা হারাম বলেছেন।

৫. শাহ্ আলীউল আয্হারী মালেকী এবং আরেফ নাবেলী একে মুবাহ বলেছেন। শায়খ ইমাদী মাক্রূহ তাহ্রীমী বলেছেন এবং ধূমপায়ীর পিছনে এক্তেদা করাও মাক্রূহ বলেছেন।

৬. ধূমপান সম্পর্কে 'মাজ্মুয়ায়ে ফতোয়া'য় বলা হয়েছে, মাক্রূহ্, 'ফতোয়ায়ে আযীযী'তে আছে মাক্রূহ তাহরিমী। গায়াতুল আওতারেও তাহ্রীমী বলা হয়েছে। 'মুযাহিরে হক' গ্রন্থে বলা হয়েছে হারাম। 'শামী' গ্রন্থে আছে মাক্রূহ তান্যীহী।

৭. মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী (র.) 'তারবীহুল জেনান' গ্রন্থে বলেছেন, ধূমপান হারাম নয়, তবে মাক্রূহ হওয়াতে সন্দেহ নেই। চাই যে কোনো প্রকারের মাক্রূহ হোক। কাজেই যদি 'মাক্রূহ তাহরীমী' হয়, তা হলে এটা পান করা গুনাহ হবে। আর 'তানযীহী' হলে সগীরা গুনাহ হবে। 'দুররে মুখ্তার' কিতাবে আছে এটা বারবার করলে কবীরা গুনাহ হবে।

وَعَنْ ٦٥٦ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৬. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মসজিদে থুথু ফেলা পাপ, আর তার কাফ্ফারা হলো তা মুছে ফেলা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** থুথুকে মাটিতে পুঁতে ফেলার অর্থ হলো মসজিদ হতে একে সরিয়ে ফেলা। যেহেতু তখনকার যুগে মসজিদে নববী ছিল কাঁচা এবং ভিটিতে শুধু কঙ্কর বিছানো ছিল। কফ, থুথু ইত্যাদি মাটিতে পুঁতে ফেলা সহজসাধ্য ছিল, এ জন্যই মাটিতে পুঁতে ফেলার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু বর্তমান যুগের অধিকাংশ মসজিদই পাকা। সুতরাং এ যুগে পিক্দানী বা ঐ জাতীয় কোনো পাত্র ব্যবহার করে পরে দূরে ফেলে দিতে হবে।

وَعَنْ ٦٥٧ أَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِىْ مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَ وَجَدْتُ فِىْ مَسَاوِىْ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার উম্মতের ভাল ও মন্দ কাজসমূহ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। তখন আমি তাদের ভাল কাজসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু [কাঁটা] দূর করা; আর মন্দ কাজসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম কফ বা নাসিকার শ্লেষ্মা মসজিদে ফেলা, যা পুঁতে ফেলা হয়নি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মসজিদ হলো অতি পবিত্র স্থান আর তাকে সর্বদা পবিত্র রাখাই হলো উত্তম কর্ম। সেখানে থুথু বা শ্লেষ্মা ফেলা অনুচিত কর্ম। এ রূপ কর্ম হতে বিরত থাকাই হলো মু'মিনের কর্তব্য।

وَعَنْ ٦٥٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللّٰهَ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّ

৬৫৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাজের জন্য দাঁড়ায় তখন সে সম্মুখের দিকে থুথু ফেলবে না। কারণ, সে আল্লাহর সাথে মুনাজাতে রত আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজের স্থানে

عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ فَيَدْفِنُهَا وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِىْ سَعِيْدٍ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আছে। ডান দিকেও [থুথু ফেলবে] না। কেননা, ডান দিকে ফেরেশতা রয়েছে; বরং সে তার বাম দিকে অর্থাৎ কাপড়ে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলবে, অতঃপর মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, তার বাম পায়ের নিচে ফেলবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বন্দ্ব ও উহার সমাধান : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ডান দিকে ফেরেশতা থাকার কারণে থুথু ফেলা নিষেধ; কিন্তু বাম দিকেও তো ফেরেশতা থাকে। এতদসত্ত্বেও وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ বলার তাৎপর্য কি? উক্ত প্রশ্নের নিম্নরূপ উত্তর হতে পারে–

১. শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে নামাজ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইবাদত। সুতরাং নামাজের মধ্যে অন্যায় কাজের হিসাব রক্ষকের কোনো হস্তক্ষেপ নেই।

২. তাবারানী শরীফে আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, فَإِنَّهُ يَقُوْمُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَمَلَكِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَقَرِيْنِهِ عَنْ يَسَارِهِ সুতরাং থুথু قَرِيْن অর্থাৎ শয়তানের উপর পড়বে।

৩. অথবা উত্তর এই যে, বাম দিকের ফেরেশতা ডান দিকে চলে যায়।

৪. অথবা নামাজের অবস্থায় ফেরেশতা এমনভাবে অবস্থান করে যাতে থুথু ইত্যাদি তার নিকট পৌঁছে না।

৫. অথবা উত্তর এই যে, উভয় দিকের ফেরেশতার মর্যাদার মধ্যে যে কমবেশি রয়েছে তার প্রতি সতর্ক করার জন্য এবং রহমতের ফেরেশতা ও শাস্তির ফেরেশতার মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ উত্তরটিতে আপত্তি রয়েছে।

وَعَنْ ٦٥٩ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে রোগ হতে আর সুস্থ হয়ে উঠেননি, সে রোগ শয্যায় থেকেই বলেছেন, আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক ইহুদি ও নাসারাদের প্রতি। তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানানোর অর্থ : আলোচ্য হাদীসটি মাজার ভক্তি বা মাজার পূজার তীব্র প্রতিবাদ। কবরকে মসজিদ বানানোর মধ্যে দুই প্রকারের শিরক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথমতঃ ইহুদি ও নাসারাগণ তাদের নবীদের সম্মান প্রদর্শন ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে কবরকে সেজদা করতো। এটা ছিল 'শিরকে জলী' বা স্পষ্ট শিরক।

দ্বিতীয়তঃ তাদের দ্বিতীয় প্রকারের আচরণ ছিল এই নামাজ বা ইবাদত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই করতো, কিন্তু তারা এ কাজ করতো নবীদের মাজারের পার্শ্বে গিয়ে। কেননা, তারা মনে মনে এ বিশ্বাস রাখতো যে, কবরবাসীর প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ আছে, তাই তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করে দিতে পারবেন, তাঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং ইবাদতের সময় কবরবাসীর প্রতি মনোনিবেশ করলে আল্লাহ্‌ও সন্তুষ্ট হবেন, এটা ছিল নবীদের প্রতি তাদের সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা। অথচ এরূপ বিশ্বাস রাখলে এটা হবে 'শিরকে খফী' বা প্রচ্ছন্ন শিরক। বস্তুত উভয় আচরণই আল্লাহর কাছে

ঘৃণিত। অন্য হাদীসে মহানবী ﷺ নিজের কবর সম্পর্কে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার কবরকে মূর্তিতে পরিণত করো না। [যেভাবে বনী ইসরাঈল তাদের নবীগণের কবরসমূহকে করেছে।] তিনি উম্মতকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন– اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এমন সম্প্রদায়ের উপর অত্যধিক রাগান্বিত, যারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে।

وَعَنْ ٦٦٠ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ اِنِّىْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৬৬০. **অনুবাদ** : হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি– তিনি বলেন, সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবীগণের ও সাধু পুরুষদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবরস্থানে নামাজ পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : কবরস্থানে নামাজ পড়া যাবে কি না এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ—

১. ইমাম আহমাদ (র.) ও আবূ সওর প্রমুখ ইমামের মতে কবরস্থানে নামাজ পড়া যে কোনো ভাবেই নিষিদ্ধ। আহলে যাহেরও এ মত পোষণ করেন। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন– اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

২. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, যদি কবরের মাটি মৃত ব্যক্তির গোশত ও চামড়ার সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় তবে অপবিত্র হওয়ার ভিত্তিতে এর উপর নামাজ পড়া বৈধ নয়, তবে যদি কেউ পবিত্র স্থানের দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তা হলে তা বৈধ হবে।

৩. ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.), সুফিয়ান সওরী ও আওযায়ী প্রমুখের মতে কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ। ইমাম আহমদ প্রমুখ যে اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ দ্বারা দলিল উপস্থাপন করেছেন, তার উত্তর হলো, উক্ত হাদীসটি মাকরূহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ।

وَعَنْ ٦٦١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৬১. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কিছু কিছু নামাজ তোমাদের ঘরেও সমাধা করো, একে কবর (সম) বানিয়ে ফেলো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٦٦٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৬৬২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যখানেই কেবলা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ -এর ব্যাখ্যা : 'পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে কেব্‌লা।' এ বাক্যটির কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন–

১. উত্তর দিকের লোকদের দক্ষিণ দিকে মুখ করে নামাজ পড়লেই চলবে, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নাক বরাবর কেব্‌লাকে সোজা করতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। কা'বা শরীফ মদীনা হতে প্রায় ২৭০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণে অবস্থিত। অতএব মদীনাবাসীদের কেবলা হলো পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যখানে অর্থাৎ দক্ষিণে। এভাবে দক্ষিণ দিকের মুসলমানদের কেব্‌লা উত্তর দিকে, পশ্চিম দিকের লোকদের কেবলা পূর্বদিকে এবং পূর্বদিকের মুসলমানদের কেব্‌লা পশ্চিম দিকে। মোটকথা, শুধুমাত্র جِهَتْ বা দিককে সম্মুখে রাখলেই চলবে কা'বা শরীফকে নাক বরাবর সোজা সামনে রাখতে হবে না।

২. অথবা কেবলা তথা কা'বা শরীফ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত।

৩. অথবা পৃথিবীর মধ্যখানে কেব্‌লা। সুতরাং চতুর্দিকের মুসলমান কেবলাকে কেন্দ্র করে এবং কেবলামুখী হয়ে নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগী করলে কার্যত কেব্‌লা মধ্যবর্তী স্থানেই প্রমাণিত হয়।

৩. অথবা যারা দুই দিকের ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈর্ঋত যে কোনো এক কোণে অবস্থিত, তারা বিপরীত দিককে সামনে রেখে নামাজ আদায় করলে চলবে। কেননা কেব্‌লা তার মাঝখানে থাকবে।

وَعَنْ ٦٦٣ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَ اَخْبَرْنَاهُ اَنَّ بِاَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهٖ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهٗ لَنَا فِيْ اِدَاوَةٍ وَاَمَرَنَا فَقَالَ اُخْرُجُوْا فَاِذَا اَتَيْتُمْ اَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضِحُوْا مَكَانَهَا بِهٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا قُلْنَا اِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحَرَّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءَ يُنْشَفُ فَقَالَ مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهٗ لَا يَزِيْدُهٗ اِلَّا طِيْبًا ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৬৬৩. অনুবাদ : হযরত তাল্‌ক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা গোত্রীয় দূত রূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গমন করলাম, অতঃপর তাঁর কাছে বাইয়াত করলাম ও তাঁর সাথে নামাজ পড়লাম। এরপর আমরা তাঁকে জানালাম, হুযূর! আমাদের অঞ্চলে আমাদের একটি গির্জা আছে, [তা আমরা ভেঙ্গে ফেলব না কী করব?] অতঃপর আমরা তাঁর নিকট তাঁর অজু করা [ব্যবহৃত] পানি তাবারুক স্বরূপ চাইলাম। সুতরাং তিনি পানি আনালেন এবং অজু করতে শুরু করলেন এবং কুল্লি করলেন আর ঐ পানি আমাদের জন্য একটি পাত্রে ভরে দিলেন এবং আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা রওয়ানা হয়ে যাও। যখন তোমরা তোমাদের অঞ্চলে পৌছবে তখন তোমাদের গির্জাটিকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং ঐ স্থানটিতে এ পানিগুলো ছিটিয়ে দেবে, অতঃপর একে মসজিদে রূপান্তরিত করবে। আমরা বললাম, হুজুর আমাদের জনপদ অনেক দূরে এবং গরমও ভীষণ, পানি শুকিয়ে যাবে। তখন হুযূর বললেন, আরও পানি এতে মিশিয়ে বাড়িয়ে নেবে এতে তার পবিত্রতা বরং বৃদ্ধি পাবে, কমবে না। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গির্জাকে মসজিদে পরিবর্তন করার বিধান : হযরত তালক ইবনে আলী (রা.) ইসলামের পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন, গির্জা ছিল তাদের ইবাদতখানা, তাই আলোচনায় এর উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে, হুযূর মূলে গির্জাকে ভেঙ্গে মসজিদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আসলে তা নয়, বরং গৃহের যে যে অংশ মসজিদের বিপরীত তা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে 'মেহরাব'। তাদের কেবলা ছিল বায়তুল মাক্‌দাস, অথচ আমাদের কেব্‌লা হলো বায়তুল্লাহ শরীফ।

মোটকথা, গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশের মাধ্যমে কোনো সম্প্রদায়ের ইসলাম পূর্ব সময়ের পবিত্র ও সম্মানিত স্থানকে ইসলাম গ্রহণের পরও সম্মানিত স্থান হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার এবং তাকে অপমানিত না করার প্রতি পূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। মুসলমানরা বিধর্মীদের বহু দেশ জয় করেছে, কিন্তু তাদের কোনো একটি ধর্মীয়শালা মুসলমানরা অবমাননা করেছে এমন একটি নজিরও ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানরা যুদ্ধাভিযানে বের হলে মুসলমানদের মসজিদকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করতো, অথচ মুসলমানরা কখনো এরূপ করেনি।

وَعَنْ ٦٦٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ يُنَظَّفَ وَيُطَيَّبَ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬৬৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ বানাতে, তাকে পাক-পবিত্র রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন। −[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ بِالدُّوْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসের শব্দ اَلدُّوْرُ দ্বারা মহল্লা এবং গৃহকোণ উভয়টি বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকের গৃহকোণে অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মসজিদরূপে নির্দিষ্ট স্থান থাকতে হবে। নামাজ পড়ার স্থান হিসাবে একে মসজিদ বলা হয়েছে। সুতরাং শরিয়ত সম্মত মসজিদের সকল বিধি-বিধান এতে প্রযোজ্য নয়। আর যদি হাদীসে اَلدُّوْرُ শব্দের অর্থ 'মহল্লা' 'মহল্লা' নেওয়া হয়, তখন অর্থ হবে, যেখানেই জনপদ ও লোকের বসতি রয়েছে সেখানেই মসজিদ থাকতে হবে যেন মহল্লা বা পাড়ার লোকেরা জামাতে নামাজ আদায় করতে পারে, তবে অন্য কোনো মসজিদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে যেন না হয়। তখন এটা মাসজিদে ضِرَارٌ 'মসজিদে যিরার' এর আওতায় পড়বে, তা নির্মাণ করা হারাম।

وَعَنْ ٦٦٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৬৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন− মসজিদকে চাকচিক্যময় করার জন্য আমি নির্দেশপ্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, [কিন্তু পরিতাপের বিষয়] তোমরা একে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত, কারুকার্য মণ্ডিত ও চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদি ও নাসারাগণ করেছে। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যের এত উন্নত প্রক্রিয়া মানুষের জানা ছিল না। সে যুগের মানুষের বাড়ি-ঘর সাদামাঠা ছিল। মসজিদ ছিল তেমনি। এ যুগে মানুষের বাড়িঘরের চাকচিক্য ও অভিনবত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব অনেকের মতে, মসজিদেও যেন ঘর-বাড়ির সাথে সমতা রক্ষা করে চাকচিক্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। মসজিদকে ঘর-বাড়ি হতে হীন করে না রাখাই শ্রেয়। তবে এতে ইবাদতের স্থান হিসাবে যাতে ভাব-গাম্ভীর্য বজায় থাকে সে ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মসজিদকে সাজানো ও মজবুত করা সম্পর্কে মতভেদের বর্ণনা : মসজিদকে সাজানো ও চিত্রায়িত করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আত। কেননা নবী করীম ﷺ এরূপ করেননি এবং এতে আহলে কিতাবের অনুসরণ রয়েছে। বরং মসজিদ মজবুত করাও এ হাদীস দ্বারা বিদ'আত বুঝা যায়।

বদর ইবনে মুনীর ও অন্যান্য জায়েজ অভিমত পোষণকারীগণ বলেন, যখন লোকেরা নিজ নিজ বাড়ি ঘরকে সাজাচ্ছে, তখন মসজিদকে সাজানো উচিত, নতুবা মসজিদের অপমান হয়। তা ছাড়া মসজিদের সাজ-সজ্জার ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের থেকে বিরোধিতা পাওয়া যায়নি। সুতরাং যে এরূপ মসজিদকে চাকচিক্য করেছে সে বিদ'আতে হাসানা করেছে এবং মসজিদের প্রতি লোকদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

وَعَنْ ٦٦٦ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهِيَ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ - (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬৬৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, মানুষ মসজিদ নিয়ে একে অপরের সাথে গর্ব করবে। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মসজিদ নিয়ে গর্ব করার তাৎপর্য : এ কথার তাৎপর্য হলো, মানুষ নিজের নাম-কাম ও যশ-সুখ্যাতির জন্য এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বড় বড় শান্দার ও জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মাণ করবে, এতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থাকবে না। অথবা হাদীসটির দ্বিতীয় অর্থ হলো, মূলত মসজিদ হলো নিছক আল্লাহ্র ইবাদতে মশ্গুল হওয়ার স্থান, কিন্তু তদস্থলে মানুষ তথায় বসে বিভিন্ন ধরনের গর্ব-অহঙ্কার করবে।

মসজিদ নিয়ে গর্ব করা কিয়ামতের নিদর্শন : মসজিদ ইবাদত ও বিনয়াবনত হওয়ার স্থান। মসজিদে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকে না; কিন্তু এমন দিন আসবে যখন মসজিদেও এ ভেদাভেদ সৃষ্টি হবে, আল্লাহর দরবারে প্রকৃতই মানুষ অবনত হবে না। ধনী ও সম্ভ্রান্তগণ বাইরের অহঙ্কারবোধ মসজিদের ভিতরেও পোষণ করবে। ফলে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, ভেদাভেদ মসজিদের ভিতরেও বিরাজ করবে।

وَعَنْهُ ٦٦٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِيْ فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ أَوْ اٰيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৬৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার কাছে আমার উম্মতগণের প্রতিদান [ছওয়াব] সমূহ উপস্থাপন করা হয়, এমনকি কেউ মসজিদ হতে একটি খড়-কুটা বাইরে ফেলে থাকলে তার ছওয়াবও। এরূপে আমার কাছে আমার উম্মতগণের গুনাহসমূহও উপস্থাপন করা হয় তখন আমি এ থেকে বড় কোনো গুনাহ দেখিনি যে, কোনো ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা বা আয়াত দান করা হয়েছে, অতঃপর সে তা ভুলে গেছে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ বা একটি সূরা মুখস্থ করার শক্তি লাভ করা আল্লাহর বিরাট দান ছাড়া কিছুই নয়। যে মুখস্থ করল তার উচিত নিয়মিত তেলাওয়াত করে তাকে মানসপটে গেঁথে রাখা। এভাবে এর মর্যাদা রক্ষা পায়। আর চর্চা না করলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে যে ভুলে যায় সে তার অবমাননা বা অমর্যাদা করল বলে বুঝা যায়। এভাবে কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যাওয়া বিরাট গুনাহ। তাই মহানবী ﷺ এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

গুনাহে কবীরাহ-এর বিশ্লেষণ : بَابُ الْكَبَائِرِ -এর মধ্যে أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ -এর জবাবে শিরককে أَكْبَرُ الذُّنُوْبِ বলা হয়েছে। এখানে نِسْيَانُ سُوْرَةٍ -কে কিভাবে أَعْظَمُ الذُّنُوْبِ বলা হয়েছে? এর উত্তর এই যে, যদি أَكْبَرُ এবং أَعْظَمُ উভয় শব্দকে مُرَادِفٌ হওয়া মেনে নেওয়া হয় তা হলে উত্তরে বলা যাবে যে, উভয় স্থানে দুই ভিত্তিতে হুকুম হয়েছে—

১. শিরককে أَكْبَرُ বলা আল্লাহ তা'আলার জাতের দৃষ্টিতে আর نِسْيَانُ سُوْرَةٍ -কে أَعْظَمُ বলা আহকামের দৃষ্টিতে। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

২. অথবা বলা যায় যে, যদি اِسْتِخْفَافٌ -এর ভিত্তিতে না হয়, তা হলে نِسْيَانُ سُوْرَةٍ সগীরার মধ্যে أَعْظَمُ আর শিরক بَابُ الْكَبَائِرِ -এর মধ্যে أَكْبَرُ হবে।

وَعَنْ ٦٦٨ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاَنَسٍ)

৬৬৮. **অনুবাদ :** হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ্ সাহল ইবনে সা'দ ও আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, রাতের অন্ধকারে কষ্ট স্বীকার করে যারা ইশার জামাতে হাজির হয় তাদের জন্য কিয়ামতের দিবসে নূরের সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, সে এ কষ্ট আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করেছে। আজকাল আমাদের সমাজেও বাস্তব জীবনে এরূপ অবস্থা অনেক আছে যে, আমাদেরকে অনেক কষ্টে মসজিদে যেতে হয়, তখন আমাদেরকে এ আকিদা রাখতে হবে যে, আমরা এ কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট অবশ্যই বিরাট প্রতিদানের অধিকারী হবো। আর এ বিষয়ে সমাজের লোকদেরকে অবহিত করে তাদেরকেও জামাতের প্রতি উৎসাহিত করা আমাদের কর্তব্য।

شَانُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন [যা বর্তমানের মসজিদে নববী নামে প্রসিদ্ধ] এবং জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য মুসল্লিগণ যাতে যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারে এ জন্য আযানের বিধান প্রবর্তন করেন। মসজিদ হতে বহু দূরে অবস্থানকারী মুসল্লিগণের অন্ধকারের কারণে ইশার জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে আপত্তি তুলল। রাসূল ﷺ তখন মসজিদে এসে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার জন্য মুসল্লিদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

وَعَنْ ٦٦٩ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِىُّ)

৬৬৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি কাউকেও দেখো যে, সে নিয়মিত মসজিদে আসে যায় এবং তার তত্ত্বাবধান ও খেদমত করে তখন তোমরা তার ঈমান আছে বলে সাক্ষ্য দেবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে সে-ই মসজিদসমূহকে আবাদ রাখে। –[তিরমিযী, ইবনে, মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ-এর অর্থ : মসজিদকে আবাদ রাখার অর্থ–সব সময় মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখা, মসজিদের তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং নামাজ, দোয়া-কালাম ও জিকির-আয্কার এবং ইবাদতের দ্বারা একে আবাদ রাখা। আর এ পবিত্র দায়িত্ব ঐ ব্যক্তি করতে পারে, যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের এবং কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে। যেমন, কুরআনে আছে– اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَعَنْ ٦٧٠ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ (رض) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ لَنَا فِى الْاِخْتِصَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصٰى وَلَا اخْتَصٰى اِنَّ خَصَاءَ اُمَّتِى الصِّيَامُ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِى السِّيَاحَةِ قَالَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِى الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ ائْذَنْ لَنَا فِى التَّرَهُّبِ فَقَالَ اِنَّ تَرَهُّبَ اُمَّتِى الْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ اِنْتِظَارَ الصَّلٰوةِ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৬৭০. **অনুবাদ :** হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদেরকে খোজা হতে অনুমতি দিন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকেও খোজা করেছে কিংবা নিজে খোজা হয়েছে, সে আর আমার দলে নেই। আমার উম্মতের খোজাত্ব রোজা রাখা। [কেননা, রোজা কাম-প্রবৃত্তিকে দমন করে।] অতঃপর ইবনে মায্উন বললেন, হুযূর! আমাদেরকে দেশ ভ্রমণের অনুমতি দিন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের ভ্রমণ ও পর্যটন হলো আল্লাহ্র পথে জিহাদে গমন করা। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) বললেন, হুজুর! আমাদেরকে ঘর-বাড়ি ছেড়ে সংসার বিরাগী হতে অনুমতি দিন। উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বললেন, আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকা। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَانُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) রাসূল ﷺ-এর দুধভাই ছিলেন। আসহাবে সুফ্ফা মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁরা নিজেদের স্ত্রীদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন ঠিক, কিন্তু স্ত্রীদের ব্যয়ভারের সামর্থ্য তাঁদের ছিল না, এ জন্য তাঁরা হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.)-কে এই বলে রাসূল ﷺ পর্যন্ত পাঠালেন যে, স্ত্রী গ্রহণের প্রতি আমাদের কোনোরূপ আসক্তি না থাকে এমন কোনো উপায় আছে কি? অতঃপর রাসূল ﷺ উক্ত হাদীসটি এরশাদ করেন।

حُكْمُ الْاِخْتِصَاءِ وَالسِّيَاحَةِ وَالتَّرَهُّبِ **খোজা হওয়া, ভ্রমণ করা এবং বৈরাগী হওয়ার বিধান :** উল্লিখিত হাদীসটির মধ্যে তিনটি কাজের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছিল, খোজা হওয়া, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করা ও সন্ন্যাস জীবন-যাপন করা। প্রথমত খোজা হওয়া সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর কথার ব্যাখ্যা হলো, আধুনিক কালে একে বলা হয় 'ভ্যাসেকটমী' যা জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ যখন নিজের স্ত্রীর ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণ দিতে পারত না তখন খোজা বা নপুংসক হয়ে যেত। ইসলামে এরূপ ভ্যাসেকটমী বা খোজা হওয়া হারাম। জন্মনিয়ন্ত্রণের অপর পদ্ধতি হলো 'আযল'। আজাদ নারীদের সহবাসের বেলায় খাদ্যাভাবের ভয়ে এ আযল নীতি অবলম্বন করাও হারাম। দ্বিতীয়ত ভ্রমণ পর্যটন তথা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। বর্ণিত হাদীসই এর প্রমাণ। অবশ্য আল্লাহর কুদ্রতের নিদর্শন অবলোকন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করা জায়েজ আছে, কুরআন হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তৃতীয়ত সংসার ত্যাগী হয়ে বৈরাগ্য-সন্ন্যাস জীবন-যাপন করাও হারাম। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে لَا رَهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ ইসলামে কোনো বৈরাগ্য নেই।

وَعَنْ ٦٧١ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ رَبِّىْ جَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ اَنْتَ اَعْلَمُ قَالَ

৬৭১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– একবার আমি আমার মহাপরাক্রমশালী প্রভুকে অতি উত্তম অবস্থায় [স্বপ্নে] দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশ্তাগণ কী বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, আপনিই তা অধিক অবগত। তখন

فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَتَلَا وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর [কুদরতের] হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, যার শীতলতা আমি আমার বক্ষের মধ্যে অনুভব করলাম। তখন আমি আকাশসমূহে ও জমিনে যা কিছু আছে সবই অবগত হলাম। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উদাহরণ স্বরূপ এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন– وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الاية) অর্থ– 'এরূপে আমি দেখাই ইবরাহীমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজ্যসমূহ, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।' [দারেমী এহাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।]

وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَ زَادَ فِيْهِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِيْ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْاَعْلٰى قُلْتُ نَعَمْ فِي الْكَفَّارَاتِ وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَاِبْلَاغُ الْوُضُوْءِ فِي الْمَكَارِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِذَا صَلَّيْتَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ فَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِيْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ قَالَ وَالدَّرَجَاتُ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَاِطْعَامُ الطَّعَامِ وَالصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَلَفْظُ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَمَا فِي الْمَصَابِيْحِ لَمْ اَجِدْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَّا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ ـ

তিরমিযী-ও এরূপ একটি হাদীস সেই আব্দুর রহমান থেকে এবং ইবনে আব্বাস ও মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে এবং এতে এ কথাটি বেশি বলেছেন, 'তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মদ! ﷺ আপনি বলতে পারেন কি শীর্ষস্থানীয় ফেরেশ্তাগণ কী নিয়ে বিতর্ক করছে?' আমি বললাম, হাঁ, 'কাফ্ফারাত' নিয়ে বিতর্ক করছে। আর 'কাফ্ফারাত' হলো, (ক) নামাজের পর মসজিদে অবস্থান করা। (খ) পায়ে হেঁটে জামাতে হাজির হওয়া। (গ) কষ্টের সময়ও পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ অজু করা। যে এটা করবে সে কল্যাণের সাথে বাঁচবে এবং কল্যাণের সাথে মরবে এবং সে তার গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মুহাম্মদ! যখনই নামাজ পড়বেন, এই দোয়া করবেন ; اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ الخ অর্থ– হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট চাচ্ছি, ভাল কাজসমূহ সম্পাদন করতে, মন্দকাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালোবাসতে। হে খোদা! যখন তুমি তোমার বান্দাদেরকে ফেত্না -ফ্যাসাদ ও বিপর্যয়ে ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফেত্নামুক্ত রেখে তোমার দিকে উঠিয়ে নেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বললেন, 'দারাজাত' হলো, খুব বেশি সালামের প্রচলন করা, দরিদ্রকে খাদ্য দান করা এবং রাতে নামাজ পড়া যখন মানুষ নিদ্রায় মগ্ন থাকে।

[গ্রন্থকার বলেন, এ হাদীসের শব্দগুলো মাসাবীহ কিতাবে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তা আমি শরহে সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ হতে বর্ণিত পাইনি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উত্তম অবস্থায় দেখার তাৎপর্য : নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে যে অবস্থায় দেখেছেন তাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার আকার ও আকৃতি আছে। তিনি শারীরিক আকৃতি বিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যে কোনো আকৃতি হতে পবিত্র। সুতরাং এতে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

এ দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে, যদি দেখার দ্বারা স্বপ্নের দেখা অর্থ হয়, তবে এখানে কোনো দ্বন্দ্বই নেই। কারণ অনেক সময় স্বপ্নে অদৃশ্য বস্তুকে দৃশ্যমান, আবার দৃশ্যমান বস্তুকে অদৃশ্যমান মনে হয়। অতএব স্বপ্নে দৃশ্যমান মনে হলেও আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হয়নি। আর নিম্নলিখিত হাদীসগুলোতে বুঝা যায় যে, এ দেখা স্বপ্নে দেখা ছিল। যেমন–

১. তাবারানীর হাদীসে আছে– قَالَ (ص) إِنِّىْ صَلَّيْتُ اللَّيْلَةَ مَا قَضٰى رَبِّىْ وَضَعْتُ جَبْهَتِىْ فِى الْمَسْجِدِ الخ এবং ২. হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে– فَنَعَسْتُ فِىْ صَلٰوتِىْ الخ

※ আবার কেউ কেউ বলেন যে, জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন, যেমন– ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, قَالَ (ص) فَنَعَسْتُ فِىْ صَلٰوتِىْ حَتّٰى اسْتَيْقَظْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّىْ عَزَّ وَ جَلَّ فِىْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ. এমতাবস্থায় উপরোক্ত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। তা হলে দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে,

১. হাদীসে উল্লিখিত 'সূরাত' শব্দের প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং গুণ, মহিমা ও গরিমা এখানে উদ্দেশ্য। তা হলে হাদীসের অর্থ হবে– আমি আল্লাহ আয্‌যা ও জাল্লাকে তাঁর উত্তম গুণ-গরিমা, অপরিসীম মহিমা সহকারে দেখেছি। এখানের বাহিক্য অবস্থা নয়, বরং আল্লাহ যে, মহীয়ান গরীয়ান তা বুঝানো হয়েছে। ২. দ্বিতীয় জবাব এই যে, হাদীসটি প্রকাশ্য অর্থে আকৃতিই বুঝিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলারও আকৃতি আছে; কিন্তু ঐ আকৃতি সৃষ্ট কোনো বস্তুর মতো নয় এবং ধ্বংসশীল কোনো জিনিসের মতো নয়; বরং আমাদের কল্পনাতীত, অথচ মহা-মহীয়ান আল্লাহর মহীয়ান আকৃতি তারই মতো ছিল। ঐ আকৃতিতে রাসূল ﷺ দেখেছিলেন। ৩. তৃতীয় জবাব এই যে, সমস্যা তখন দেখা দেবে যখন فِىْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ বাক্যাংশকে رَبِّىْ শব্দের حَال বলে ধরা হবে; কিন্তু এটাও হতে পারে যে, فِىْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ বাক্যাংশ رَأَيْتُ শব্দের যমীর فَاعِلْ হতে حَالْ হয়েছে। তা হলে কোনো সমস্যাই থাকে না। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ হবে 'আমি আমার মহীয়ান-গরীয়ান প্রভুকে এমন অবস্থায় দেখেছি যখন আমি উত্তম অবস্থায় ছিলাম।'

وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ -**এর অর্থ :** এখানে 'হাত' অর্থ প্রকৃত হাত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হাত-পা বা কোনো প্রকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র। বরং বাক্যের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করলেন। ফলে তিনি অসীম মেহেরবানী করে আকাশসমূহ ও মাটির পৃথিবীর অনেক জ্ঞানদান করলেন। অবশেষে অনেক দুর্লভ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে মহানবী ﷺ আত্মতৃপ্তি পেলেন। ফলে তাঁর জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হলো, প্রাণ শীতল হলো। প্রকাশ্য বাক্য এই অপ্রকাশ্য অর্থেরই ইঙ্গিত বহন করে। এটাই হলো 'যার শীতলতা' আমি আমার বক্ষে অনুভব করলাম।

وَعَنْ ٦٧٢ أَبِىْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ وَ رَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ وَ رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৬৭২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিন ব্যক্তি আছে যারা সকলেই আল্লাহ্‌র দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে। (১) যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে বের হয়েছে সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করান অথবা ঐ যুদ্ধে সে যে ছওয়াব বা গনিমত লাভ করেছে, তা সহকারে তাকে সহীহ্ সালামতে ফিরিয়ে আনেন। (২) ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দায়িত্বে রয়েছে যে মসজিদে গমন করেছে। (৩) আর সে ব্যক্তিও আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে যে সালাম সহকারে ঘরে প্রবেশ করেছে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللّٰهِ এর অর্থ : এখানে عَلَى اللّٰهِ -এর মধ্যে عَلٰى শব্দের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে এদের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন; অথবা, ضَامِنٌ এখানে فَاعِلٌ -এর অর্থে ব্যবহার হয়নি বরং مَفْعُوْلٌ -এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং ضَامِنٌ بِمَعْنٰى مَضْمُوْنٍ যেমন আল্লাহ্র কালামে বর্ণিত হয়েছে دَافِقٍ -এর অর্থ مَدْفُوْقٌ আল্লাহ্র কালাম لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ -এ مَعْصُوْمٌ অর্থে عَاصِمٌ ব্যবহৃত হয় এবং مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ইত্যাদি। অর্থাৎ এদের সম্পর্কে যে ওয়াদা- অঙ্গীকার করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ, দুনিয়ার ক্ষতি ও আখেরাতের হতাশা হতে তাদেরকে হেফাজতে রাখবেন।

رَجُلٌ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ الخ -এর অর্থ : হাদীসে উল্লিখিত আলোচ্য বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে—

১. এমন ব্যক্তির হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজের উপর অপরিহার্য করে নেন।

২. আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে ছওয়াব প্রদান করেন এবং তার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন না।

رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهٗ -এর অর্থ : 'যে ব্যক্তি সালাম সহকারে নিজ গৃহে প্রবেশ করে সে আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থাকে'- ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তাকে প্রচুর ছওয়াব ও কল্যাণ দান করেন। বর্ণিত আছে-

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِاَنَسٍ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ

তবে গৃহাভ্যন্তরে যদি কেউ না থাকে তা হলে নিজের প্রতি সালাম করবে এবং اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বলবে। وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ যোগ করার রহস্য এই যে, হয়তো বা গৃহাভ্যন্তরে ফেরেশতা বা মুসলিম জিন রয়েছে।

وَعَنْ ٦٧٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يُنْصِبُهٗ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهٗ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اَثَرِ صَلٰوةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِيْ عِلِّيِّيْنَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৬৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি অজু করে ঘর হতে বের হয় এবং ফরজ নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে তার ছওয়াব একজন ইহ্রামধারী হাজীর ছওয়াবের সমতুল্য। আর যে ব্যক্তি যোহর নামাজ [পূর্বাহ্নে চাশতের নামাজ] -এর জন্য ঘর হতে বের হয় এবং শুধুমাত্র চাশ্তের নামাজের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে তার ছওয়াব এক ওমরা আদায়কারীর ছওয়াবের সমতুল্য। আর এক নামাজের পর দ্বিতীয় নামাজের জন্য অপেক্ষমান থেকে সে নামাজ পড়া এবং উভয় নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা বা বেহুদা কাজ না করা [এত উত্তম কাজ যে, তা] 'ইল্লিয়্যীনে' লেখা হয়। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَسْبِيْحُ الضُّحٰى -এর অর্থ : সূর্যোদয়ের পর হতে দুপুরের পূর্বে যে সব নফল নামাজ আদায় করা হয় তাকে যোহার নামাজ বলা হয়। যেমন- ইশ্রাক, চাশ্ত ইত্যাদি। দু' দু' রাকাত কিংবা চার চার রাকাত উভয়ভাবে আদায় করা যায়। একেই উক্ত হাদীসে "তাসবীহুযযোহা" বলা হয়েছে। 'ওম্রাহ' হজের মতো বায়তুল্লাহ শরীফকে কেন্দ্র করে একটি ইবাদত। এতে আরাফাতের মাঠে অবস্থান করা ব্যতীত হজের অন্যান্য কার্যগুলো সম্পন্ন করতে হয়, যেমন- ইহ্রাম, তওয়াফ ও সায়ী ইত্যাদি। 'ইল্লিয়্যীন' এটা উর্ধ্বলোকের একটি স্থানের নাম, যেখানে ফেরেশ্তাগণ মু'মিনদের আমল লিখে রাখেন। অথবা মু'মিনদের আত্মা যেখানে রাখা হয় তকে ইল্লিয়্যীন বলা হয়। এর বিপরীত স্থানকে বলা হয় 'সিজ্জীন', যেখানে জাহান্নামীদের আত্মা রাখা হয়।

وَعَنْ ٦٧٤ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ الْمَسَاجِدُ قِيْلَ وَمَا الرَّتْعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ . (رواه الترمذى)

৬৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "যখন তোমরা বেহেশতের উদ্যান দিয়ে যাবে তখন তার ফল খাবে [অর্থাৎ জিকির করবে নিশ্চুপ থাকবে না]। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বেহেশতের উদ্যান কি? তিনি বললেন, 'মসজিদসমূহ'। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, 'আর ফল খাওয়া কি? হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ বলা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসটিতে যে ফল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে এর অর্থ হলো, আল্লাহর জিকির করা তথা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা, প্রশংসা করা এবং একত্ব ও মহত্ত্বের ঘোষণা দেওয়া। এখানের জিকিরকে ফল খাওয়ার সাথে এ জন্য তুলনা করা হয়েছে যে, জিকির ছওয়াব লাভের কারণ। সুতরাং ফল খাওয়া দ্বারা যেমন উদর পূর্ণ হয় তেমনি জিকির দ্বারা আমলনামা পূর্ণ হয়।

উক্ত হাদীসে মসজিদকে বেহেশতের বাগান বলা হয়েছে। অথচ অপর এক হাদীসে জিকিরের মজলিসকে বেহেশতের উদ্যান বলা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা মসজিদের ক্ষেত্রেও জিকিরের মজলিস শব্দের প্রয়োগ প্রযোজ্য হয়। মূলত 'জিকিরের মজলিস' শব্দটি ব্যাপক এবং 'মসজিদ' শব্দটি নির্দিষ্ট। তবে মসজিদ যেহেতু ইবাদতের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থান, তাই এখানে বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٦٧٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৬৭৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'যে লোক মসজিদে যে উদ্দেশ্যে আসে তাই তার প্রাপ্য হয়।' –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে মসজিদে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে নিয়তে মসজিদে আসবে তা-ই হবে তার প্রাপ্য দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে আসলে দুনিয়া পাবে, আর আখেরাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে আসলে আখেরাত পাবে।

وَعَنْ ٦٧٦ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ (رض) عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ

৬৭৬. অনুবাদ : [মহিলা তাবেয়ী] হযরত ফাতিমা বিনতে হুসাইন (র.) আপন দাদী হযরত ফাতিমায়ে কুবরা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, মহানবী ﷺ [অর্থাৎ আমার পিতা] যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন মুহাম্মদের প্রতি [অর্থাৎ নিজের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন, হে আমার প্রভু!

رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِىْ رِوَايَتِهِمَا قَالَتْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَكَذَا اِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ بَدْلَ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ (وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الْكُبْرٰى) -

তুমি আমার গুনাহ্সমূহ মাফ করে দাও এবং তোমার রহমতের দ্বারসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন মসজিদ হতে বের হতেন, তখনও মুহাম্মদের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করতেন। আর বলতেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার গুনাহ্সমূহ মাফ করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দাও। – [তিরমিযী, আহ্মদ ও ইবনে মাজাহ্] কিন্তু শেষোক্ত দু' জনের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ফাতিমায়ে কুব্রা (রা.) বলেছেন, যখন মহানবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং এরূপে যখন তিনি মসজিদ হতে বের হতেন, তখন বলতেন, অর্থাৎ, আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করলাম, আর আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ বাক্যাংশের পরিবর্তে। তিরিমিযী বলেন, হাদীসটি বর্ণনাসূত্র [সনদ] মুত্তাসিল নয়। কেননা, ফাতিমা বিনতে হুসাইন ফাতিমায়ে কুব্রাকে দেখেননি, অর্থাৎ তাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ নিষ্পাপ এবং مَغْفُوْر হওয়া সত্ত্বেও নিজের উপর দরূদ ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এর কারণ হলো, এর দ্বারা তাঁর উম্মতদেরকে শিক্ষা দানই উদ্দেশ্য অথবা ক্ষমা প্রার্থনা উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্যই করেছেন।

৬৭৭ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْاِشْتِرَاءِ فِيْهِ وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فِى الْمَسْجِدِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِىُّ)

৬৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শোয়াইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, তাতে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুমার দিন নামাজের পূর্বে মসজিদে লোকজনকে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী ﷺ মসজিদের আদব রক্ষার্থে তিনটি বিষয় হতে নিষেধ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

১. কবিতা আবৃত্তি করা। এ নিষেধাজ্ঞাটি عَامٌ خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ-এর অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা মূলত অশ্লীল ও অলীক কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামি কবিতা এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, হাস্সান ইবনে সাবিত ও কা'আব ইবনে যুহায়েরের মতো সাহাবী-কবি মহানবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে মসজিদে নববীর মিম্বারে দাঁড়িয়ে ইসলামি

কবিতা এবং কাফির-মুশরিকদের নিন্দা বিষয়ক কবিতা আবৃত্তি করেছেন, অথচ মহানবী ﷺ নিষেধ করেননি; বরং তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেছেন–

اَلشِّعْرُ كَالْكَلَامِ حَسَنُهُ كَحَسَنِهِ وَقَبِيْحُهُ كَقَبِيْحِهِ .

২. মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা। তবে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। ই'তিকাফ অবস্থায় যদি তার ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের মতো অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তবে মাল তথায় উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

৩. জুমার দিন নামাজের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসা। কেননা, এভাবে বসলে বিভিন্ন পার্থিব কথাবার্তা সৃষ্টি ও স্বর উচ্চ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা অন্যান্য নামাজির অসুবিধার কারণ হবে এবং মসজিদের মর্যাদা ব্যহত হবে। কাজেই এভাবে বসা উচিত নয়; বরং শুরু হতেই নামাজের প্রস্তুতির জন্য সারিবদ্ধভাবে বসাই উচিত।

মসজিদে কবিতা আবৃত্তির হুকুম : আল্লামা তূরপুশ্তী বলেন, কবিতা আবৃত্তি যদি গর্ব-অহঙ্কারের জন্য হয় বা কবিতার বিষয়বস্তু শ্রবণে কামস্পৃহা জাগ্রত হয়, তা হলে তা আপত্তিকর হবে। কিন্তু কবিতা আবৃত্তি যদি হক ও আহলে হকের প্রশংসায় এবং বাতিল ও আহলে বাতিলের নিন্দায় রচিত হয় অথবা কবিতা দ্বারা যদি দীনের বিধি-বিধানের সাজানো বা শত্রুর অপমানের উদ্দেশ্য হয় তা হলে এ জাতীয় কবিতায় কোনো আপত্তি নেই। কেননা, এরূপ কবিতা নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে আবৃত্তি করা হয়েছে। মহানবী ﷺ -এর ভাল উদ্দেশ্য জানার কারণে এগুলো হতে নিষেধ করেননি। আইনী কিতাবে আছে– اَلشِّعْرُ الْحَقُّ لَا يُحَرَّمُ فِى الْمَسْجِدِ বরং যে সকল কবিতায় অশ্লীল ও মিথ্যা রয়েছে তা হারাম।

※ অতঃপর কবিতা চর্চা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হযরত মাসরুক, ইব্রাহীম নাখয়ী, সালেম ইব্নে আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী, আমর ইবনে শোয়াইব প্রমুখের মতে কবিতা চর্চা মাকরূহ।

بِدَلِيْلِ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا .

※ তবে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ প্রমুখের মতে এমন কবিতা চর্চাতে কোনো আপত্তি নেই, যাতে অশ্লীলতা, দুর্নাম, মিথ্যা ইত্যাদি নেই। কেননা, নবী করীম ﷺ হযরত হাস্সানের জন্য তার কবিতা চর্চার জন্য দোয়া করেছেন : قَالَ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ .

প্রতিপক্ষের জবাব : হযরত ওমর (রা.) -এর যে হাদীস দ্বারা কবিতা আবৃত্তির বিরোধিতা করা হয়েছে তা সে কবিতার ব্যাপারে যাতে অশ্লীলতা ও মিথ্যা রয়েছে। আর لِاَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ -এর উত্তরে বলা যায় যে, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়ে অধিক কবিতা আবৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া।

وَعَنْ ٦٧٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَاِذَا رَاَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا لَا رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ .(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৬৭৮. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি তোমরা দেখ যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করছে তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহ তোমার এ ব্যবসায়ে তোমাকে লাভবান না করুন।' আর যখন দেখো যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে হারানো বস্তু তালাশ করছে, তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিন'। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসটিতে মসজিদে দু'টি কাজ করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং যে ব্যক্তি এ দু'টি করবে তার জন্য বদদোয়া করতে বলেছেন। কাজ দু'টি হলো– (১) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা। কেননা, মসজিদ বাজার নয়, বরং তা হলো ইবাদতের স্থান। মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা হলে মসজিদের উদ্দেশ্যের অমর্যাদা করা হয়। (২) হারানো বস্তু তালাশ করা, সাধারণত হারানো বস্তু তালাশের জন্য উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ করতে হয়। আর মসজিদে স্বর উচ্চ করা বেআদবি, কাজেই এ সব কাজ পরিহার করা উচিত।

وَعَنْ ٦٧٩ - حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُسْتَقَادَ فِى الْمَسْجِدِ وَاَنْ يُنْشَدَ فِيْهِ الْاَشْعَارُ وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ سُنَنِهٖ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْاُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَكِيْمٍ وَفِى الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرٍ)

৬৭৯. **অনুবাদ :** হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে, সেখানে কবিতা আবৃত্তি করতে এবং শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন। [আবূ দাঊদ তাঁর সুনানে এবং জামেউল উসূলের গ্রন্থকার তাঁর জামেউল উসূলে হাকীম ইবনে হিযাম হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর মাসাবীহ -এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসটিতে তিনটি কাজ হতে নিষেধ করা হয়েছে—

১. মসজিদে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মসজিদ অতীব পবিত্র জায়গা; এখানে যদি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়, তবে রক্ত ইত্যাদি দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আল্লামা ইবনুল হাজার আল-আসকালানী (র.) বলেন, মসজিদ যদি অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে মসজিদে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা মাকরূহ, নতুবা হারাম।

২. কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে কবিতা দ্বারা অশ্লীল ও অলীক কবিতা উদ্দেশ্য।

৩. কোনো প্রকার শরয়ী শাস্তি কার্যকর করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এতে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং মসজিদ অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

وَعَنْ ٦٨٠ - مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِى الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَقَالَ مَنْ اَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ لَابُدَّ اٰكِلِيْهِمَا فَاَمِيْتُوْهُمَا طَبْخًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৬৮০. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররাহ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'টি গাছ খেতে নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ পিয়াজ ও রসুন। আর তিনি বলেছেন, যে এ দু'টি জিনিস খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। তিনি আরও বলেছেন, যদি তোমাদের এ দু'টি জিনিস একান্ত খেতে হয়, তবে রান্না করে তার গন্ধ নষ্ট করে দেবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে কাঁচা পিয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর অধীনে দুর্গন্ধযুক্ত সব বস্তুই শামিল হবে। কেননা এ দুর্গন্ধের ফলে মসজিদে অবস্থানরত মানুষ ও ফেরেশতাগণ কষ্ট পায়, তবে ঐ সব বস্তু রান্না করে দুর্গন্ধ দূর করে খেতে কোনো আপত্তি নেই।

وَعَنْ ٦٨١ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৬৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র জমিনই মসজিদ। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কোনো অপবিত্র বস্তু না থাকলে সকল জায়গায়ই নামাজ পড়া জায়েজ আছে। এতে কোনো প্রকার মাক্রূহও হবে না। কিন্তু কবরস্থান ও গোসলখানায় কোনো নাপাকি না থাকলেও তথায় নামাজ পড়া মাক্রূহ। কেননা সাধারণত এ স্থান দু'টিতে নাপাকি থাকেই, ফলে অন্তর ও মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

وَعَنْ ٦٨٢ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِيْ مَعَاطِنِ الْاِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৬৮২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত জায়গায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। আবর্জনা স্থলে, জবাইখানায়, কবরস্থানে, পথিমধ্যে, গোসলখানায়, উটের বাথানে এবং বায়তুল্লাহর ছাদে। –[তিরমিযী, ইবনে মাজা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাত জায়গায় নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : যদি আবর্জনাস্থল ও জবাইখানায় নাপাক বস্তু থাকে তখন সমস্ত ইমামের মতে সেখানে নামাজ পড়া হারাম। অন্যথা ইমাম আহ্মদ বলেন, তবুও হারাম, কিন্তু জমহুর ওলামার মতে নিষিদ্ধ অর্থ মাক্রূহ। 'কবরস্থান' সম্পর্কে ব্যাখ্যা হলো, যদি কবরস্থানে নামাজের জন্য কোনো একটি জায়গা নির্দিষ্ট থাকে এবং সেখানে কোনো কবর বা নাপাকি না থাকে তখন হানাফী ফকীহ্দের মতে তথায় নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

জামে' সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, কবরকে সামনে রেখে নামাজ পড়া মাকরূহ। তবে কিছুর দ্বারা আড়াল-অন্তরাল থাকলে কিংবা কবর ডানে-বামে যে কোনো এক পার্শ্বে থাকলে কোনো ক্ষতি নেই, তখন মাক্রূহও হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত নিষেধ অর্থ মাক্রূহ। কিন্তু ইমাম আহ্মদ (র.) বলেন, হারাম। তিনি আরো বলেছেন, নিষিদ্ধ তিন সময়ে নামাজ পড়া যেমন হারাম এবং পড়লেও বাতিল হয়ে যাবে– কবরস্থানের নামাজের হুকুমও তদ্রূপ।

গোসলখানায় নামাজ পড়া সম্পর্কে জম্হুর ওলামার মতে মাক্রূহ। কিন্তু জাহেরী সম্প্রদায়ের মতে হারাম। তদ্রূপ পথিমধ্যে এবং রাস্তার উপরে নামাজ পড়াও জম্হুরের মতে মাক্রূহ এবং জাহেরীয়াদের নিকট হারাম। আর উটের বাথানে নামাজ পড়া ইমাম আহ্মদ ও জাহেরীয়াদের মতে হারাম এবং জম্হুরের নিকট মাক্রূহ। বায়তুল্লাহ্ শরীফের ছাদের উপর নামাজ পড়া হানাফীদের মতে মাক্রূহ, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, সম্মুখে অন্তরাল বা সুত্রা না থাকলে নামাজ বাতিল হবে। আর সুত্রা থাকলে জায়েজ হবে। অবশ্য সেখানে নামাজ পড়া বেআদবী বটে।

سَبَبُ الْمُمَانَعَةِ **নিষেধের কারণ :**

১. আবর্জনা স্থল : এ সব স্থান সাধারণত অপবিত্র বস্তুতে ভরা থাকে।
২. কসাইখানা : এখানেও নাপাক রক্ত ইত্যাদি থাকে।
৩. কবর : তথায় নামাজ পড়লে কবরের প্রতি অতি মাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করা হয়।
৪. পথের মাঝখানে : মানুষের চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে, তা ছাড়া এতে একাগ্রতা নষ্ট হয়।
৫. গোসলখানা : এ স্থান সাধারণত অপবিত্র থাকে।
৬. উটের আস্তাবল : নাপাক ময়লা থাকার দরুন এখানে নামাজ পড়া নিষেধ। তা ছাড়া উট যে কোনো সময় মুসল্লিকে আঘাত করতে বা পেশাব করতে পারে।
৭. বায়তুল্লাহর ছাদ : বেআদবী থেকে বেঁচে থাকার জন্য।

وَعَنْ ٦٨٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَاتُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৬৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা ছাগলের খোঁয়াড়ে নামাজ পড়তে পারো, কিন্তু উটের বাথানে নামাজ পড়বে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছাগলের খোঁয়াড় ও উটের বাথানের মধ্যে পার্থক্য : ছাগল ও উটের আস্তাবলের মাঝে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রাণীদ্বয়ের বৈশিষ্ট্যের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই নিষেধাজ্ঞা অর্পিত হয়েছে। পার্থক্যের কারণগুলো যথাক্রমে—

১. উট যে কোনো সময় মুসল্লিকে আঘাত করতে পারে; অপর দিকে ছাগল শান্ত প্রাণী, তার থেকে এরূপ আশঙ্কা নেই।

২. উট দাঁড়িয়ে পেশাব করে যা বহুদূরে পর্যন্ত ছিঁটে যায়; পক্ষান্তরে ছাগলের পেশাব দূরে ছিঁটে যায় না।

৩. ছাগলের খোঁয়াড়ে মুসল্লির একাগ্রতা নষ্ট হয় না; কিন্তু উটের বাথানে একাগ্রতা নষ্ট হয়।

وَعَنْ ٦٨٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

৬৮৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবর জেয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে, কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নারীদের কবর জেয়ারতের মাসআলা :

※ 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ নারী-পুরুষ সবাইকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আবার অনুমতি প্রদান করেছেন। যেমন বলেছেন– نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ اَلَا فَزُوْرُوْهَا لِاَنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। অবশ্য এখন তোমরা কবর জেয়ারত করো। কেননা, এটা মানুষদেরকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।

※ কেউ কেউ বলেন, নিষেধের মধ্যে যেভাবে নারী-পুরুষ সবাই অন্তর্ভুক্ত ছিল, তদ্রূপ অনুমতির মধ্যেও সবাই সমানভাবে অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং তাদের মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস মনসুখ হয়ে গেছে।

※ আবার কিছু সংখ্যকের অভিমত যে, এ অনুমতি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য। নারীদের প্রতি নিষেধের হুকুম এখনও বহাল রয়েছে। কেননা, স্বভাবগতভাবে মহিলাদের এ ব্যাপারে ধৈর্য-সহ্য খুবই কম। তাদের মধ্যে অস্থিরতা অনেক বেশি। আপন লোকদের কবর দেখলে স্থির থাকতে পারে না, তাই তাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখার নিমিত্তে জেয়ারতকারিণী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। হানাফী ইমামগণ শেষোক্ত মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে নারীদের জন্য মাকরূহে তানযীহী বলেছেন। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর 'রওজা মুবারক' জিয়ারত করা এ নিষেধ-বাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, হুজুর ﷺ-এর 'রওজা' জিয়ারত করা কারো মতে মোস্তাহাব, আবার কারো মতে ওয়াজিব।

بِنَاءُ الْمَسْجِدِ وَالسُّرُجِ عَلَى الْقُبُوْرِ :

কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা ও বাতি জ্বালানো :

※ ইবনুল মালিক বলেন, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা হারাম। এটা ইহুদি ও নাসারাদের কর্ম। আল্লাহর নবী তাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ ـ

কাজেই এরূপ করা হারাম। তবে কবরের আশে-পাশে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ।

※ আর কবরে বাতি জ্বালানো এ জন্য হারাম যে, এতে মালের অপচয় করা হয়। কারণ, এতে কারো কোনো উপকার হয় না। তদুপরি বাতি বা আগুন জাহান্নামের নির্দশন এবং এটা বিদ'আতও; তাই হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

৬৮৫ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ حِبْرًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ اَسْكُتُ حَتّٰى يَجِئَ جِبْرَئِيْلُ فَسَكَتَ وَجَاءَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَاَلَ فَقَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ اَسْاَلُ رَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى ثُمَّ قَالَ جِبْرَئِيْلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ دَنَوْتُ مِنَ اللّٰهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ فَقَالَ شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا ـ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِىْ صَحِيْحِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)

৬৮৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদিদের একজন বিদ্বান ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, কোন স্থানটি উত্তম? রাসূল [এ ব্যাপারে] নীরব থাকলেন এবং বললেন, তুমিও চুপ থাক যতক্ষণ না জিব্‌রাঈল আসেন। তখন সে চুপ থাকল। এমতাবস্থায় হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) আসলেন। তখন রাসূল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি [হযরত জিব্‌রাঈল] উত্তরে বললেন, প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি অধিক জ্ঞাত নয়। তবে আমি আমার প্রভু তাবারাকা ও তা'আলাকে [এ বিষয়ে] জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি [আজ] আল্লাহ তা'আলার এত কাছে পৌছেছিলাম যে, ইতঃপূর্বে আর কোনোদিন এত কাছে পৌছিনি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিব্‌রাঈল! এ নৈকট্য কিরূপ ছিল? তখন তিনি বললেন, তখন আমার ও তাঁর মধ্যে সত্তর হাজার নূরের পর্দা অবশিষ্ট ছিল। [তখন আল্লাহ] বললেন, 'নিকৃষ্টতম স্থান হলো হাট-বাজার এবং উৎকৃষ্টতম স্থান হলো মসজিদ।' –[ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত জিবরাঈল (আ.) অন্যান্য সময় যত নিকটে যেতেন, সম্ভবত ঐ দিন সে তুলনায় অনেক নিকটে গিয়েছিলেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাঁর বন্ধুর এক প্রশ্নের জবাব দান করবেন, তাই জিব্‌রীলকে নৈকট্য দান করেছিলেন, যেমন– হাদীসের কুদসীতে বর্ণিত আছে– مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْهِ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا 'আর সত্তর হাজার নূরের পর্দা দ্বারা' এ সংখ্যা সীমিত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং অসংখ্য পর্দা। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ অসংখ্য নূরের পর্দায় বেষ্টিতে আছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٦٨٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَاْتِ اِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْيُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهٖ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৬৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে আসে এবং কেবলমাত্র ভালো কাজের জন্য আসে, যা সে ভাল কাজ শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয়, তার মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। আর যে লোক এ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসে, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্যের সম্পদের দিকে [শুধু অনুতাপের দৃষ্টিতে] তাকায়। [অথচ ভোগ করতে পারে না।] –[ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী– শু'আবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত مَسْجِدِىْ দ্বারা মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববী উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে ভাল কাজ শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা করার জন্য আসে তার মর্যাদা আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মতো। তাঁর এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের মধ্যে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ বৈধ। আর যে ব্যক্তি নামাজ ও শিক্ষাদান ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, সে ঐ ব্যক্তির মতো যে অন্যের সম্পদের দিকে তাকায়, অর্থাৎ অনুতাপের সাথে দেখে, অথচ ভোগ করতে পারে না। এর মর্মার্থ এই যে, তার মসজিদে আসা নিষ্ফল। সে কোনোরূপ কল্যাণপ্রাপ্ত হবে না।

وَعَنْ ٦٨٧ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ ـ(رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৬৮৭. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [অদূর ভবিষ্যতে] মানুষের জন্য এমন এক জমানা আসবে যখন মানুষ তাদের মসজিদসমূহে দুনিয়াবী কথাবার্তা আলোচনা করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসো না। আর আল্লাহ তা'আলার এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই। –[বায়হাকী–শু'আবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর, তাতে দীনি কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলা জায়েজ নেই।

ইমাম ইবনে হুমাম বলেছেন, মোবাহ কথাবার্তাও মসজিদে আলোচনা করা মাকরূহ যা নেক আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়। আর উক্ত হাদীসে উল্লিখিত "আল্লাহ তা'আলার এ ধরনের লোকদের কোনো প্রয়োজন নেই"–এর অর্থ হলো মসজিদে আসা ও বসা তার জন্য নিরর্থক হিসাবে গণ্য হবে।

وَعَنْ ٦٨٨ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِىْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِذْهَبْ فَأْتِنِىْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالَا مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْكُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৬৮৮. **অনুবাদ :** হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে [নববীতে] ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার প্রতি একটি কঙ্কর মারল। জাগ্রত হয়ে দেখলাম সে ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)। তিনি আমাকে বললেন, যাও, ঐ দু' ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস, [যারা মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলছে]। আমি দু'জনকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তখন হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক, অথবা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি [ওমর (রা.)] বললেন, তোমরা যদি মদীনার অধিবাসী হতে, তবে আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। কারণ, তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলেছ। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, অন্য মসজিদের মধ্যেও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বেআদবী। যদিও তা ইলম ও জ্ঞানের কথা হয়। তবে মসজিদে নববীতে উচ্চৈঃসরে কথা বলা আরো আধিক বেআদবী। কেননা, নবী করীম ﷺ সেখানে শায়িত।

وَعَنْ ٦٨٩ مَالِكٍ (رض) قَالَ بَنٰى عُمَرُ (رض) رَحْبَةً فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءُ وَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَّلْغَطَ اَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا اَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ اِلٰى هٰذِهِ الرَّحْبَةِ. (رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا)

৬৮৯. **অনুবাদ :** হযরত ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর এক পার্শ্বে একটি সমতল খোলা চত্বর তৈরি করেছিলেন। যার নাম ছিল 'বুতাইহা'। আর মানুষদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যারা [দুনিয়াবী] কথাবার্তা বলার এবং কবিতা আবৃত্তি করার কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার ইচ্ছা রাখে সে যেন মসজিদ হতে বের হয়ে সেই চত্বরে গিয়ে বসে। -[মুআত্তা মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْبُطَيْحَاءُ-এর পরিচিতি : এ শব্দটির অর্থ হলো কঙ্করময় স্থান। এ স্থানটি পরবর্তীতে হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগে মসজিদ সম্প্রসারণের সময় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের বসা বা কথাবার্তা বলার সুবিধার্থে মসজিদ সংলগ্ন একটি স্থান তৈরি করে নেওয়া উচিত।

وَعَنْ ٦٩٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِىَ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهٖ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِى الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِىْ رَبَّهٗ وَاِنَّ رَبَّهٗ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهٖ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهٖ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهٗ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৬৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী ﷺ মসজিদে কেবলার দিকে কিছু নাকের শ্লেষ্মা পড়ে থাকতে দেখলেন। এটা তাঁর কাছে খুব কষ্টদায়ক বোধ হলো। এমনকি এটা তাঁর চেহারায়ও প্রকাশ পেল। সুতরাং তিনি দাঁড়ালেন এবং নিজের হাতে তা খুঁচিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে কথোপকথনে থাকে। আর তার পরওয়ারদেগার তার ও তার কেবলার মাঝখানে থাকেন। অতএব কেউ যেন তার কেব্‌লার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে ফেলে। অতঃপর মহানবী ﷺ নিজের চাদরের একপার্শ্ব ধরলেন এবং এতে থুথু ফেললেন, তারপর তার একাংশকে অপরাংশ দ্বারা মলে দিলেন এবং বললেন, অথবা সে যেন এরূপ করে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদ অতি পবিত্রস্থান, সেখানে কোনো অবস্থাতেই থুথু বা শ্লেষ্মা ফেলা উচিত নয়। থুথু বাম দিকে বা পায়ের নিচে ফেলার হুকুম ছিল বালুকাময় কাঁচা মসজিদের বেলায়। বর্তমানের পাকা মসজিদে তাও করা যাবে না, বরং বাইরে বা নিজের কাপড়ে ফেলতে হবে।

وَعَنْ ٦٩١ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِقَوْمِهٖ يُصَلِّىْ لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ حِيْنَ فَرَغَ لَا اَنْ يُّصَلِّىَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ فَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّكَ قَدْ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৬৯১. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে খাল্লাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন– তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি একদল লোকের ইমামতি করলেন আর কেবলার দিকে থুথু ফেললেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা দেখে ফেলেন। যখন লোকটি নামাজ হতে অবসর হলো তখন রাসূল ﷺ তার দলকে বললেন, সে যেন তোমাদেরকে নামাজ না পড়ায়। এরপর একদিন লোকটি তাদের নামাজ পড়াতে চাইল। তখন লোকেরা তাঁকে নিষেধ করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার খবর জানাল। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি 'হ্যা' বলে এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন যে, 'তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে দুঃখ দিয়েছ'। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** যে লোকটি নামাজের ইমামতি করতে গিয়ে কিবলার দিকে থুথু ফেলেছিল তাকে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামতি করতে সরাসরি নিষেধ না করে তার চলে যাওয়ার পর মুসল্লীদের বলেছিলেন যে, সে যেন তোমাদের ইমামতি না করে। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মসজিদ, কিবলা ইত্যাদির আদব রক্ষা করে না, সে ইমামতির উপযুক্ত নয়। তা ছাড়া তার কিবলার প্রতি থু থু ফেলার আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হওয়ায় তাকে সরাসরি সম্বোধন করে নিষেধ করেন নি। পরবর্তীতে তাঁর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ বলে সে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

وَعَنْ ٦٩٢ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ اِحْتَبَسَ عَنَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى كِدْنَا نَتَرَاأٰى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهٖ فَقَالَ لَنَا عَلٰى مَصَافِّكُمْ كَمَا اَنْتُمْ ثُمَّ انْفَتَلَ اِلَيْنَا ثُمَّ قَالَ اَمَا اِنِّىْ سَاُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِىْ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ اِنِّىْ قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِىْ فَنَعَسْتُ فِىْ صَلٰوتِىْ حَتّٰى اِسْتَثْقَلْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَبِّىْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ لَا اَدْرِىْ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ فَرَاَيْتُهٗ وَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتّٰى وَجَدْتُّ بَرْدَ اَنَامِلِهٖ بَيْنَ

৬৯২. **অনুবাদ :** হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যুষে ফজরের নামাজে আমাদের নিকট হতে অনুপস্থিত ছিলেন, এমনকি আমরা সূর্য দৃষ্টিগোচর হওয়ার কাছাকাছি পৌছলাম, তখন তিনি দ্রুতপদে বের হয়ে আসলেন। নামাজের জন্য তাকবীর বলা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়ালেন এবং নামাজের কার্যাবলি সংক্ষিপ্ত করলেন। [কারণ পরে বর্ণিত হচ্ছে] সালাম ফিরিয়ে আমাদেরকে স্বশব্দে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা সারির যে যেখানে বসে আছ সেখানেই থাক। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, কিসে আজ আমাকে ভোরে আসতে বাধা দিয়েছে তা তোমাদেরকে বলব। আমি রাতে [তাহাজ্জুদ] নামাজের জন্য উঠলাম, অতঃপর অজু করলাম এবং আমার পক্ষে যেটুকু সম্ভবপর হলো নামাজ পড়লাম। তখন নামাজের মধ্যে আমার তন্দ্রা আসল, আমি অসাড় হয়ে পড়লাম। তখনই দেখি আমি আমার প্রতিপালক কল্যাণময় মহান আল্লাহর কাছে রয়েছি। আর তিনি অতি মনোরম অবস্থায় আছেন। তখন সম্বোধন করলেন, হে মুহাম্মদ! আমি জবাব দিলাম, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাজির আছি। আল্লাহ বললেন, শীর্ষস্থানীয় ফেরেশ্তাগণ কী নিয়ে তর্কবিতর্ক ও আলাপ আলোচনা করছে? আমি জবাব দিলাম, আমি জ্ঞাত নই প্রভু। এভাবে তিনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন [আমিও একই রকম জবাব দিলাম]। অতঃপর আমি দেখলাম আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন, এমনকি তাঁর আঙ্গুলের স্পর্শ আমার দুই কাঁধের মাঝখানে অর্থাৎ বক্ষে অনুভব করতে লাগলাম। তখন সব জিনিস আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠল। আর আমি সব কিছু

ثَدْيَىَّ فَتَجَلّٰى لِىْ كُلُّ شَىْءٍ وَعَرَفْتُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيْمَا يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلٰى قُلْتُ فِى الْكَفَّارَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ مَشْىُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ وَالْجُلُوْسُ فِى الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ وَاِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ قَالَ ثُمَّ فِيْمَ قُلْتُ فِى الدَّرَجَاتِ قَالَ وَمَا هُنَّ قُلْتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ وَلِيْنُ الْكَلَامِ وَالصَّلٰوةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ قَالَ سَلْ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَّ فِتْنَةً فِىْ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِىْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ وَاَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوْهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوْهَا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ

وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَسَاَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

অবগত হলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ ! আমি জবাবে বললাম, আমি হাজির আছি হে প্রভু! তখন তিনি বললেন, এখন বলো দেখি, কী বিষয় নিয়ে শীর্ষস্থানীয় ফেরেশ্তাগণ বিতর্ক করছে? আমি বললাম, গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারা নিয়ে বিতর্ক করছে। আল্লাহ বললেন, সেগুলো কি? আমি উত্তর করলাম, (ক) পায়ে হেঁটে জামাতে হাজির হওয়া, (খ) এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্য মসজিদে বসে থাকা, (গ) কষ্টের সময়ও যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে অজু করা এবং উত্তমরূপে অজু করা। অতঃপর আল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর কী বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? আমি জবাব দিলাম, দারাজাত (মর্যাদা) সমূহ নিয়ে। [অর্থাৎ ঐ সমস্ত মর্যাদা যা মানুষ বেহেশতে লাভ করবে।] তিনি বললেন, সেগুলো কি? আমি উত্তরে বললাম, (ক) অপরকে খাদ্য দান করা, (খ) নম্র ও বিনয়ভাবে কথাবার্তা বলা এবং (গ) রাত জেগে নামাজ পড়া, যখন সকল মানুষ নিদ্রায় বিভোর থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে যা খুশি প্রার্থনা কর। আমি বললাম, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে ভালো কাজ সম্পাদন করার এবং মন্দকাজ পরিহার করে চলার এবং গরিব ও নিঃস্বদেরকে ভালোবাসার প্রার্থনা করছি। আমি আরো প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করবে। আর যখন তুমি লোকদেরকে ফিত্না ও বিপর্যয়ে ফেলতে চাইবে তখন আমাকে বিপর্যয়মুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দান করবে, আমি তোমার কাছে তোমার প্রেম ও ভালোবাসা প্রার্থনা করছি এবং যে লোক তোমাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা প্রার্থনা করি, আর সে কাজের প্রতি ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যে কাজ আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেওয়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা সত্য স্বপ্ন। এটা তোমরা স্মরণ রাখো এবং অন্যকে জানিয়ে দাও। –[আহ্মদ ও তিরমিযী]

তিরমিযী আরো বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। আমি এই হাদীসটি সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে জিজ্ঞাসা করেছি; তিনিও বলেছেন এ হাদীসটি সহীহ্।

وَعَنْ ٦٩٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حَفِظَ مِنِّىْ سَائِرَ الْيَوْمِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৬৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন– اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থ– আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহ্র অর্থাৎ তাঁর অনুগ্রাহক সত্তার ও তাঁর অনাদি, অক্ষয় পরাক্রমশালিতার, বিতাড়িত শয়তানের কবল হতে। মহানবী ﷺ বলেন, যখন কেউ এরূপ বলে, তখন শয়তান বলে, আজকের সারাটা দিনের জন্য সে আমার কবল হতে রক্ষা পেল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসে উল্লিখিত দোয়ায় جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা, প্রভাব ইত্যাদি থেকে রক্ষা কর। এরূপ দোয়া করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কার্যকারণ হচ্ছে শয়তান। অন্যথা প্রকৃত হিদায়েত ও গুমরাহী দানের মালিক আল্লাহ তা'আলা। একারণে জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, لَوْلَا اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِالْاِسْتِعَاذَةِ مِنْهُ لَمَا تَعَوَّذْتُ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَحْقَرُ وَاَصْغَرُ অথবা শয়তান থেকে রক্ষার জন্য আশ্যয় প্রার্থনার মানে তার মন্দ স্বভাব-চরিত্র তথা হিসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মম্ভারিতা প্রতারণা, কুমন্ত্রণা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা।

وَعَنْ ٦٩٤ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

৬৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানায়ো না; যার পূজা হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলার ভয়ঙ্কর রোষ ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হয়েছে, যারা নিজেদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। –[মালেক, মুরসাল হিসাবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবরকে মসজিদ বানানোর হুকুম : 'কবরকে মসজিদ বানানো' অর্থ– আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য মানুষ যেভাবে মসজিদে যায় তদ্রূপ কবরবাসীর সম্মান প্রদর্শনার্থে পূজার জন্য কবরের কাছে গমন করা। বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক নামধারী মুসলমান ওলিআল্লাহ্ পীরমুরশিদদের কবরকে প্রায় কিবলা বানিয়ে ফেলেছে, আবার এক শ্রেণীর লোক আছে যারা শরিয়তের আদৌ ধার ধরে না; অথচ মাজারে মাজারে ঘুরে বেড়ায়। মাজারে মানত সাদ্কা করে। মৃত তথা কাল্পনিক পীরের কাছে পার্থিব উন্নতির জন্য প্রার্থনা করে। পক্ষান্তরে এরা কবরকে মূর্তি বানিয়ে তা পূজা করছে। এটা এক রকম প্রকাশ্য শিরক, যে অন্যায় আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। অতএব আমাদের এরূপ কর্ম হতে বিরত থাকা একান্তই আবশ্যক।

وَعَنْ ٦٩٥ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ الصَّلٰوةَ فِى الْحِيْطَانِ قَالَ بَعْضُ رُوَاتِهٖ يَعْنِى الْبَسَاتِيْنَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْحَسَنِ ابْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَدْ ضَعَّفَهٗ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ وَ غَيْرُهٗ ـ

৬৯৫. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগানে নামাজ পড়তে পছন্দ করতেন। হাদীসটির জনৈক রাবী হাদীসে উল্লিখিত حِيْطَانٌ শব্দের ব্যাখ্যা بَسَاتِيْن অর্থাৎ 'বাগান' দ্বারা করেছেন। –[আহমাদ, তিরমিযী]

তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন যে, এটা গরীব হাদীস এবং এর রাবী হাসান ইবনে আবূ জাফর এর মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনোভাবে হাদীসটি আমাদের জানা নেই, আর ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল রাবী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

وَعَنْ ٦٩٦ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِهٖ بِصَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلٰوةً وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهٗ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৬৯৬. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– কারো নিজের ঘরের এক নামাজে শুধু এক নামাজেরই সমান ছওয়াব পাবে। তার মহল্লার মসজিদের এক নামাজ পঁচিশ নামাজের সমান। আর যে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করা হয়, সে মসজিদে এক নামাজ পাঁচ শত নামাজের সমান। বায়তুল মুকাদ্দাসের এক নামাজ পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান। আমার এ মসজিদে এক নামাজ পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান এবং মাসজিদুল হারামে এক নামাজ, এক লক্ষ নামাজের সমান। [ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ তিন মসজিদের মর্যাদার বর্ণনা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ তিন মসজিদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, সে তিন মসজিদ হলো মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নববী।

* মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাসে এক রাকাত নামাজ আদায় করা নিজের ঘরে পঞ্চাশ হাজার রাকাত নামাজ আদায় করার সমতুল্য

* মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামের ফজিলত সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। অবশ্য মাসজিদে নববীর ফজিলত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেমন– এই হাদীসে বলা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান, কিন্তু ইমাম আহ্মদের বর্ণনায় রয়েছে এক হাজার নামাজের সমান। আবার মাসজিদুল হারামের ফজিলত সম্পর্কেও বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন– উপরিউক্ত হাদীসে এক লক্ষ নামাজের সমান বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে দশ কোটি রাকাত নামাজের চেয়েও অধিক বলা হয়েছে আবার এক হাদীসে মসজিদে নববী অপেক্ষা এক লক্ষ নামাজের সমান বলা হয়েছে, যেমন– হুজুর ﷺ-এর বাণী

اَلصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَفْضَلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ : এ হাদীস অনুযায়ী এক লক্ষকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে গুণ করলে পাঁচ শত কোটি ছওয়াব দাঁড়াবে। আর মাসজিদে নববীর এক নামাজকে যদি অন্যান্য মসজিদের এক হাজার নামাজের সমান ধরা হয়, তখন এক লক্ষকে এক হাজার দ্বারা গুণ করলে দশ কোটিতে দাঁড়াবে।

মূলকথা উল্লিখিত তিন মসজিদের মর্যাদার ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনায় পার্থক্য থাকলেও কোনোটি মূল ফজিলতকে অস্বীকার করে না; বরং উল্লিখিত রেওয়ায়াতের মাধ্যমে উক্ত মসজিদগুলোর মর্যাদা ও ফজিলত প্রমাণিত হয়। সমস্ত বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সাধারণ মসজিদগুলোর তুলনায় মসজিদে নববীর মর্যাদা অনেক অনেক বেশি এবং তার তুলনায় বায়তুল মুকাদ্দাসের মর্যাদা আরো বেশি। আর তা অপেক্ষা মাসজিদুল হারামের মর্যাদা আরো অধিক।

এ ফজিলত কোন নামাজের সাথে সম্পৃক্ত : এ বর্ধিত ছওয়াব ফরজ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, এটা ফরজ নামাজের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং নফল নামাজেও এ সব মসজিদে উপরিউক্ত ছওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু হানাফী ও মালেকী মায্হাবের কতিপয় ইমাম বলেন, এ বর্ণিত ছওয়াব শুধুমাত্র ফরজ নামাজের জন্য সুনির্দিষ্ট।

আবার কারো মতো, এ বর্ধিত ছওয়াব শুধু নামাজের ক্ষেত্রে নয়, বরং অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। ইবনে মাজাহ্ বর্ণিত হাদীসে আছে, "যে মক্কাতে রমজান মাসের রোজা রাখে তার আমলনামায় মক্কা ছাড়া অন্যান্য স্থানের এক হাজার রমজান মাসের রোজার সমান ছওয়াব লেখা হয়।" এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু নামাজ নয় অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও এ মসজিদগুলোর অনুরূপ মর্যাদা রয়েছে।

---

٦٩٧ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُ مَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (গিফারী) (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে কোন্ মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, মাসজিদুল হারাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদে আক্সা। আমি বললাম, উভয়ের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান?, তিনি বললেন, চল্লিশ বৎসরের, অতঃপর সমস্ত জমিনই তোমার জন্য মসজিদ, যেখানেই নামাজের সময় হবে সেখানেই নামাজ পড়বে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কা'বা শরীফ কতবার নির্মিত হয়েছিল? ওলামায়ে কেরাম ও ঐতিহাসিকগণ এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে,পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ ও পূর্ণ নির্মাণ সর্বমোট দশবার হয়েছিল। এ বিষয়ে জনৈক কবি বলেন,

بَنٰى بَيْتَ رَبِّ الْعَرْشِ عَشْرٌ فَخُذْهُمْ ✱ مَلَائِكَةُ اللّٰهِ الْكِرَامُ فَاٰدَمُ
فَشِيْثٌ ثُمَّ اِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ عَمَالِقٌ ✱ قُصَىٌّ قُرَيْشٌ قَبْلَ هٰذَيْنِ جُرْهُمُ
فَعَبْدُ الْاِلٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَنٰى كَذَا ✱ بَنٰى بَعْدَهٗ حَجَّاجٌ وَهٰذَا مُتَمِّمُ

১. সর্ব প্রথম ফেরেশতাগণ [আদম সৃষ্টির পূর্বে]।

২. আদম (আ.)।

৩. তাঁর পুত্র শীশ (আ.)।

৪. হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)।

৫. আমালিকা সম্প্রদায়।

৬. তার পর জুরহুম গোত্র।

৭. এরপর কুসাই সম্প্রদায়।

৮. কুরাইশ।

৯. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) (একে ভেঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর নির্মাণের ন্যায় নির্মাণ করেন)।

১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কা'বাকে ভেঙ্গে কুরায়েশদের ভিত্তির ন্যায় পুনরায় নির্মাণ করেন। অদ্যাবধি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই বিদ্যমান রয়েছে।

কেন চল্লিশ বছরের ব্যবধানের কথা বলেছেন ? আলোচ্য হাদীসে প্রশ্ন হতে পারে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী হযরত সুলাইমান (আ.)। উভয়ের ব্যবধান হাজার বছরের বেশি। এতদসত্ত্বেও নবী করীম ﷺ শুধু চল্লিশ বছরের ব্যবধানের কথা কেন বলেছেন?

এর জবাবসমূহ নিম্নরূপ—

১. হাদীসে প্রথম নির্মাণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এবং হযরত সুলাইমান (আ.) তাদের কেউই যথাক্রমে কা'বা ও বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণকারী নন। কথিত আছে যে, সর্ব প্রথম আল্লাহর হুকুমে ফেরেশ্‌তাগণ কা'বা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) এটা পুনঃ নির্মাণ করেছেন।

অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসও কা'বা শরীফের চল্লিশ বছর পরে ফেরেশ্‌তাগণ কর্তৃক সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে।

২. বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আ.) যখন বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করলেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ভ্রমণ করতে এবং তা নির্মাণ করতে আল্লাহ হুকুম করেছিলেন। সুতরাং তিনি জেরুজালেম গমন করে তা নির্মাণ করেন, উভয় ঘর নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল।

৩. হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর কা'বা শরীফ তৈরি করার চল্লিশ বছর পর হযরত ইয়াকূব (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। হযরত সুলাইমান (আ.) ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন না, বরং তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের সংস্কারক ও পুনঃ নির্মাণকারী ছিলেন। এতে বুঝা গেল যে, চল্লিশ বছর ব্যবধানের কথাটি সঠিক।

بَابُ السَّتْرِ

পরিচ্ছেদ : আচ্ছাদন

مَعْنَى السَّتْرِ সতরের অর্থ : اَلسَّتْرُ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– আবরণ করা বা ঢেকে রাখা। পুরুষের নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত, আর নারীদের মুখমণ্ডল, হাত ও পা এই তিন অঙ্গ ব্যতীত সমস্ত শরীরই আবৃত রাখা আবশ্যক। বিশেষ করে নামাজের মধ্যে এ সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন– خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এখানে زِيْنَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مَا يُوَارِيْ الْعَوْرَةَ তথা যা দ্বারা সতর ঢাকা হয়। আর মসজিদ তথা 'সিজদার ক্ষেত্র' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো صَلٰوةٌ বা নামাজ। অতএব আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ কর বা সতর ঢাক।

আলোচ্য অধ্যায়ে সতর সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٦٩٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ (رض) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهٖ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৯৮. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে আবূ সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাত্র এক কাপড়ে নামাজ পড়তে দেখেছি। অর্থাৎ তিনি উম্মে সালামার ঘরে এক কাপড়কে এমনভাবে শরীরে পেঁচিয়েছেন, যার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের উপরে ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْاِشْتِمَالِ ইশতিমালের অর্থ : ইশতিমালের নিয়ম হলো, কাপড়ের এক প্রান্তকে পিঠের দিক হতে বাম বগলের নিচে দিয়ে এনে ডান কাঁধের উপরে রাখা এবং অপর প্রান্তকে ডান বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখা, তারপর ডান কাঁধের প্রান্তকে বাম বগলের এবং বাম কাঁধের প্রান্তকে ডান বগলের নিচ দিয়ে টেনে বুকের উপর বাঁধাকে ইশতিমাল বলে। একে (تَوَشُّحٌ) তাওয়াশশুহও বলা হয়। এক কাপড়ে নামাজ পড়তে হলে তাওয়াশশুহ্ করতে হয়, নতুবা কাপড় খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের আরবগণের অনেকেই এক কাপড় পরিধান করত, ভিতরে তহবন্দ বা পায়জামা পরিধান করত না।

নামাজে কাঁধ ঢাকা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

ক. ইমাম আহমদ (র.) ও কোনো কোনো সলফে সালেহীন বলেছেন, যদি কারো কাঁধে কাপড় না থাকে তবে তার নামাজ সহীহ হবে না।

দলিল– لِقَوْلِهٖ (ع) لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْئٌ

খ. ইমাম আজম, মালেক, শাফেয়ী (র.) এমনকি জমহুর ইমামদের মতে যদি সতর ঢেকে নামাজ পড়ে, যদি কাঁধে কাপড় না থাকে তাহলে সহীহ হবে তবে এটা মাকরূহ। যেমন– হযরত জাবের (রা.) এর হাদীসে এসেছে যে,

اِنَّهٗ (ع) قَالَ اِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَاِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلٰى حَقْوِكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থাৎ কাপড় দীর্ঘ হলে কাপড়ের দুই মাথা দুই কাঁধের উপর দিয়ে কাঁধ ঢেকে দিবে। আর কাপড় ছোট হলে কাপড়টি কোমরে বেঁধে নিবে অর্থাৎ, লুঙ্গির ন্যায় পরবে। আর এমতাবস্থায় কাঁধ খোলাই থাকবে।

জমহুরের পক্ষ হতে অপর পক্ষের দলিলের উত্তর : ওলামায়ে কেরামের মতে لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ দ্বারা ওয়াজিব হুকুম সাব্যস্ত হয়নি; বরং এর রহস্য এই যে, যদি কাঁধের উপর কাপড় না থাকে তবে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

* অথবা যদি কাপড় কাঁধের উপর না থাকে তবে উভয় হাতে কাপড় ধরতে হয়, ফলে হাতের উপর হাত রাখার প্রক্রিয়া, যা সুন্নত বটে। তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

مُشْتَمِلًا **শব্দের মহল্লে ই'রাব** : مُشْتَمِلًا পদটি বুখারীর অধিকাংশ নুসখায় نَصَبْ -এর সাথে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় পদটি يُصَلِّىْ -এর যমীর হতে حَالْ হবে। কোনো কোনো নুসখায় যেরের সাথে উল্লিখিত হয়েছে নিকটবর্তী শব্দের হরকত অনুসারে।

* কিছু সংখ্যকের মতে পেশ দিয়ে পড়া হবে, এমতাবস্থায় مشتمل পদটি উহ্য মুবতাদার خَبَرْ হবে তথা وَهُوَ مُشْتَمِلٌ

وَعَنْ ٦٩٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৬৯৯. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন এরূপে এক কাপড় পরিধান করে নামাজ না পড়ে, যার কোনো অংশ তার উভয় কাঁধের ওপর না থাকে। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নবী করীম ﷺ-এর ভাষ্য 'চাদরের উভয় প্রান্ত উভয় কাঁধের উপর হওয়ার অর্থ হলো, যদি এক চাদর পরিধান করায় সমস্ত শরীর আবৃত না করা যায়, তবে এক কাপড় পরে নামাজ আদায় করবে না।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আবূ হানীফা ও ইমাম নববী প্রমুখের মতে এই নিষেধাজ্ঞা তান্‌যীহীর জন্য।

কাজেই যদি গোটা শরীর আবৃত করা ব্যতীতও এক কাপড় দিয়ে নামাজ পড়া হয়, আর সতর খোলা না থাকে তবে নামাজ জায়েজ হবে। তবে এরূপ করা মাকরূহ।

* ইমাম আহমদ প্রকাশ্য হাদীসের ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করে বলেন, মক্‌রূহে তাহ্‌রীমী হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে সমস্ত ইমামগণ একমত যে, দুই কাপড়ে [কামিস ও ইযার] নামাজ পড়া উত্তম। তৎকালে মহানবী ﷺ ও সাহাবাদের এক কাপড়ে নামাজ পড়ার যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা জায়েজের জন্য পড়েছেন, অথবা এটাও হতে পারে যে, তখন দু' কাপড় না থাকার কারণে এক কাপড় পরিধান করেই নামাজ পড়েছেন।

وَعَنْهُ ٧٠٠ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭০০. **অনুবাদ** : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে এক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়বে সে যেন তার দু' প্রান্তকে [দু' কাঁধের উপর] বিপরীত দিক হতে জড়িয়ে নেয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : কাপড় যদি লম্বা চওড়া হয় তবে তার দু' প্রান্তকে জড়িয়ে নিতে হবে। এটা এইভাবে যে, এর এক প্রান্ত লুঙ্গির ন্যায় পরিধান করবে এবং অপর প্রান্ত কাঁধের উপর রাখবে। অথবা এভাবে যে, ডান প্রান্ত বাম কাঁধে এবং বাম প্রান্ত ডান কাঁধে উপর রাখবে। আর কাপড়খানা যদি ছোট হয় তবে তা কোমরে বেঁধে নেবে।

وَعَنْ ٧٠١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اِعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلٰى اِعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهٖ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلٰوتِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ قَالَ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلٰوةِ فَاَخَافُ اَنْ يَّفْتِنَنِىْ .

৭০১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এমন চাদর পরিধান করে নামাজ পড়লেন যার কিনারায় কারুকার্য ছিল, তখন তিনি এর কারুকার্যের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন, যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন তখন বললেন, আমার এ চাদরদটি নিয়ে আবূ জাহম [ব্যবসায়ী]-এর নিকট যাও [এর পরিবর্তে] আমার জন্য আবূ জাহমের আম্বেজানিয়ার চাদর নিয়ে আস। কারণ, এ চাদর এখনই আমাকে নামাজ হতে [অর্থাৎ নামাজের একাগ্রতা হতে] বিরত রেখেছে। −[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বললেন, আমি নামাজের মধ্যে এর কারুকার্যের দিকে তাকাতে ছিলাম। সুতরাং আমার ভয় হয় যে, এটা আমাকে গোলমালে ফেলে দেবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** খামীসা এমন চাদরকে বলা হয়, যা তসর বা উল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়, যার রঙ কালো হয় এব ডোরাকাটা থাকে। এরূপ একটি চাদর আবূ জাহম নামক এক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসেন। তিনি সে চাঁদরটি পরে নামাজ পড়েন। নামাজের মধ্যে সেই চাদরটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি যায়। এটাকে তিনি নামাজের একাগ্রতায় ব্যঘাত বলে মনে করেন। তাই তিনি নামাজ শেষ করে সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা এ চাদরটি ফেরত দিয়ে আস। কিন্তু তিনি ভাবলেন যে, চাদরটি একেবারে ফেরত দিলে সেই সাহাবীর মনে দুঃখ পেতে পারেন। তাই তিনি বললেন, তার বদলে তার নিকট থেকে একটি আম্বেজানিয়া চাদর নিয়ে আস। আম্বেজান একটি জায়গার নাম। সেখানের প্রস্তুত চাদর সাদা মাঠা হতো। সেখানকার প্রস্তুত চাদরকে আম্বেজানিয়া বলা হয়।

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো বস্তুর বাহ্যিক কারুকার্য পবিত্র ও নির্মল অন্তরেও প্রভাব ফেলে। আর এরূপ প্রভাব অন্তরের নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার কারণেই হয়ে থাকে। যেমন কোনো ধবধবে সাদা কাপড়ে সামান্য ময়লার দাগও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। পক্ষান্তরে পাপাচারের কারণে যাদের অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাদের অন্তর বড় বড় পাপাচারেও বিচলিত হয় না।

উক্ত হাদীস থেকে এও বুঝা যায় যে, নামাজে এমন কোনো জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়, যা নামাজের একাগ্রতা নষ্ট করতে পারে।

وَعَنْ ٧٠٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهٖ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنَّهٗ لَا يَزَالُ تَصَاوِيْرُهٗ تَعْرِضُ لِىْ فِىْ صَلٰوتِىْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭০২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) -এর একটি পর্দা ছিল, যা দ্বারা তিনি তাঁর ঘরের একদিক ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার এ পর্দাখানি আমাদের সম্মুখ হতে সরিয়ে ফেল। কারণ, এর ছবিগুলো সর্বদাই নামাজের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে পড়ে। −[বুখারী]

وَعَنْ ٧٠٣ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭০৩. **অনুবাদ :** হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি রেশমের আলখেল্লা হাদিয়া দেওয়া হলো, তিনি তা পরিধান করে নামাজ পড়লেন এবং নামাজ শেষে উহা সজোরে খুলে ফেলে দিলেন, যেন তিনি তাকে খুব ঘৃণা করছেন। অত:পর বললেন, খোদাভীরু মুত্তাকীদের জন্য এরূপ পোশাক পরিধান করা উচিত নয়। -[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرُّوْجُ-এর পরিচিতি এবং তা কোথা হতে এসেছে? فَرُّوْجٌ অর্থ- আলখেল্লা যার পিছন দিক কাটা থাকে, যেমন- কোট বা আলেষ্টার ইত্যাদি। এ আলখেল্লাটি আলেকজান্দ্রিয়ার বাদ্শাহের পক্ষ হতে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। এটা ঐ সময়কার ঘটনা, যখন রেশমী বস্ত্র পরা পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে হাদীসের ভাষ্যে দেখা যাচ্ছে যে, নিষেধাজ্ঞার পূর্বেও মহানবী ﷺ এ ধরনের পোশাক খোদাভীরু লোকদের জন্য পছন্দ করেননি।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি 'দৌমাতুল জান্দালের' বাদশাহের তরফ হতে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। অন্য আর এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ এটা পরিধান করে নামাজ পড়েছেন এবং পরে খুলে ফেলেছেন; তারপর বলেছেন যে, জিব্রাঈল আমাকে এটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٠٤ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصِيْدُ اَفَاُصَلِّىْ فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهُ)

৭০৪. **অনুবাদ :** হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন শিকারী [শিকারীকে হালকা অবস্থায় চলতে হয়]। সুতরাং আমি কি একই জামা পরিধান করে নামাজ পড়তে পারব? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ পারবে, তবে গিরবান [বুকের উপরস্থ ফাঁকা] বন্ধ করে নিবে; যদিও কাঁটা দ্বারা হয়। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : এখানে গিরবান অর্থ বুকের উপরস্থ জামার ফাঁক। যেখানে বোতাম লাগানো হয়। নামাজের মধ্যে জামার বোতাম লাগিয়ে রাখা নামাজের সম্মান। তবে বোতাম না লাগানোর কারণে যদি নামাজের মধ্যে নামাজি ব্যক্তির নিজের সতরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তবে তার নামাজ বাতিল হবে না। কেননা, কারো নিজের সতর নিজের দৃষ্টিতে যাতে না পড়ে, এভাবে ঢেকে রাখা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। আর অবস্থা যদি এমন হয় যে, অন্যের নিকট সতর প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

আরবদের সাধারণ পোশাক ছিল লুঙ্গি ও চাদর। যারা ঢিলা লম্বা জামা পরিধান করত তারা ভিতরে কোনো পাজামা বা লুঙ্গি পরিধান করত না, বরং কোমরে একটি বাঁধ দিত। শিকারিদের জন্য এ ধরনের পোশাকই ছিল উপযোগী। আর এ জন্যই প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছিল যে, এক কাপড় পরিধান করে নামাজ পড়তে পারবে কি না?

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ **বর্ণনাকারী পরিচিতি :**

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম সালামা, কুনিয়াত বা উপনাম হলো, আবূ **মুসলিম**। আবার কারো মতে আবূ ইয়াস, কারো মতে আবূ আমের। তাঁর পিতার নাম আমর। আকওয়া তাঁর দাদার নাম। তিনি মদীনার অধিবাসী এবং আসলামী বংশের লোক।

২. **নসবনামা :** তাঁর নসবনামা আমাদের নিকট সামান্য কিছু পৌঁছেছে। তা হলো আবূ মুসলিম সালমা ইবনে আমর ইবনুল আকওয়া সিনান ইবনে আবদিল্লাহ্ আল-আসলামী আল-মাদানী।

৩. **ইসলাম গ্রহণ :** তিনি কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি একটি বাঘের তিরস্কারের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. **বাঘের সাথে কথোপকথন :** কথিত আছে যে, তাঁর সাথে বাঘ কথোপকথন করেছে। হযরত সালামা বলেন, আমি একদা একটি বাঘকে একটি হরিণ শিকার করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তখন বাঘটির নিকট হতে হরিণটি উদ্ধার করে নিয়ে আসলাম। তখন বাঘটি বলল, আমার মালটি ধ্বংস হলো, আর তুমি আমার রিজিক নিতে ইচ্ছা পোষণ করলে, যা আল্লাহ আমাকে রিজিক হিসাবে দান করেছেন। তুমি যে মালটা আমার নিকট হতে নিয়ে নিয়েছ তা তোমার নয়। বাঘের একথা শুনা মাত্র আমি বললাম, আশ্চর্যের ব্যাপারে একটি বাঘ কথা বলছে। তৎক্ষণাৎ বাঘটি বলে উঠল, এর চাইতে অত্যাধিক আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আল্লাহ তোমাদেরকে তার ইবাদতের দিকে ডাকছে, অথচ তোমরা তাঁর নিকট হতে দূরে সরে মূর্তির ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ছ। সালমা বলেন, বাঘের এ মন্তব্য শুনে আমি রাসূলে কারীম ﷺ-এর সাথে মিলিত হলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।

৬. **হাদীস বর্ণনা :** তিনি হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হতে সর্বমোট ৭৭ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম তাঁর বর্ণিত সম্মিলিতভাবে ১৬ খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে পাঁচখানা ও ইমাম মুসলিম এককভাবে ৯ খানা স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনাকারীদের একটি দল হাদীস শ্রবণ করেছেন।

৭. **তাঁর বিশেষ গুণ :** তিনি অত্যধিক সাহসী, তীরান্দাজ, নেক চরিত্রের অধিকারী, দয়ালু, ঘোড়দৌড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

৮. **মৃত্যুবরণ :** তিনি ৭৪ হিজরিতে ৮০ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।

وَعَنْ ٧٠٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّىْ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ قَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالَكَ اَمَرْتَهٗ اَنْ يَّتَوَضَّأَ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ صَلّٰى وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهٗ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৭০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছিল তখন তার লুঙ্গি ছিল [টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত] বেশি প্রলম্বিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যাও অজু কর, ফলে সে গেল এবং অজু করে ফিরে আসল। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন তাকে অজু করতে [এবং পুনরায় নামাজ পড়তে] বললেন? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, সে তার টাখনা গিরার চিন পর্যন্ত লুঙ্গি প্রলম্বিত করে নামাজ পড়ছিল, অথচ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না, যে ব্যক্তি আপন লুঙ্গি টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ কেন পুনরায় অজু করতে আদেশ করলেন? যদিও টাখনা গিরার নিচ পর্যন্ত জামা প্রলম্বিত হলে অজু নষ্ট হয় না, তথাপি তাকে কঠোরভাবে সাবধান করার জন্য পুনরায় অজু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তা হলে সে ব্যক্তি বুঝতে পারবে যে, সে গুনাহের কাজ করেছে।

আর এ জন্যও অজুর কথা বলেছেন যে, অজু তার গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। কেননা, অজু দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। অথবা এটাও হতে পারে যে, মানুষ সাধারণত অহমিকার কারণেই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জামা ঝুলিয়ে পরে থাকে। আর এ অহমিকাই কলুষিত অন্তরের পরিচায়ক। অজুর সাহায্যে তার বহিরাঙ্গ বিধৌত করার নির্দেশ দিয়ে রাসূল ﷺ তাকে তার অন্তর শুদ্ধির প্রতিই সূক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করেছেন।

حَدُّ الْاِسْبَالِ وَحُكْمُهُ ইসবালের সীমা ও তার হুকুম : ইসবাল বলা হয় টাখ্‌না গিরার নিচ পর্যন্ত লুঙ্গি-জামা ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরিধান করা। এরূপ কাপড় পরিধান করা মাকরূহ তাহরীমী। তা নামাজের মধ্যে হোক কিংবা নামাজের বাইরে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত। কিন্তু ইমাম মালেক (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে ইসবাল করা জায়েজ আছে। তবে নামাজের বইরে মাকরূহ, যদি অহঙ্কারের উদ্দেশ্যে এরূপে পরিধান করা হয়। কিন্তু যদি অনিচ্ছা বশত কাপড় টাখনা গিরার নিচে চলে যায় তবে তা মাকরূহ হবে না। যেমন– হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাপড় অনেক সময় টাখ্‌না গিরার নিচে পড়ে যেত। কেননা, তিনি কিছুটা মোটা ব্যক্তি ছিলেন, সব সময় কাপড়কে কাপড় টাখ্‌না গিরার উপরে রাখতে পারতেন না। অবশ্য কারো এভাবে অনিচ্ছাবশত কাপড় টাখনা গিরার নিচে চলে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা তুলে নিতে হবে। কিন্তু মহিলাদের জন্য কাপড় টাখ্‌না গিরার নিচে কিছুটা কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। তবে সীমাতিরিক্ত লম্বা করে ছেড়ে দিলে তাও ইসবালের আওতায় পড়বে।

আর হাদীসে যে বলা হয়েছে, এরূপ ইসবাল করে নামাজ পড়লে সে নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না, এর অর্থ হলো এরূপ ইসবালকারী ব্যক্তি পূর্ণ ছওয়াবপ্রাপ্ত হয় না।

وَعَنْ ٧٠٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৭০৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, উড়না ব্যতীত সাবালিকা মেয়ের নামাজ কবুল হয় না। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজের সতর ঢাকার বিধান : নামাজে সতর ঢাকা ফরজ। দলিল خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ এখানে زِيْنَتْ দ্বারা সতর ঢাকা উদ্দেশ্য। আর مَسْجِدْ দ্বারা নামাজ উদ্দেশ্য। অতএব এ আয়াতে নামাজে সতর ঢাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

※ তদ্রূপ নবী করীম ﷺ-এর ইরশাদ– لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ الْحَائِضِ اِلَّا بِخِمَارٍ এখানে حَائِضٍ দ্বারা বালেগা মহিলা উদ্দেশ্য لِاَنَّ الْحَيْضَ دَلِيْلُ الْبُلُوْغِ অতএব সতর ঢাকা যেহেতু ফরজ তাই সতর খোলা থাকলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যদি অতি সামান্য জায়গা অনাবৃত থাকে তবে তাতে নামাজ নষ্ট হবে না।

لِاَنَّ الثِّيَابَ لَا تَخْلُوْ عَنْ قَلِيْلِ خَرْقٍ عَادَةً وَكَثِيْرُ الْخَرْقِ يَمْنَعُ الْجَوَازَ لِعَدَمِ الْحَرَجِ وَالضَّرُوْرَةِ -

অতঃপর কম ও বেশির পরিমাণে মতভেদ আছে—

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, কোনো অঙ্গের অর্ধেকের অধিক হলে তা বেশি, আর অর্ধেকের কম হলে তা কম।

ইমাম আযম (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন $\frac{১}{৪}$ ও উহার অধিক হলে বেশি, আর $\frac{১}{৪}$ -এর কম হলে তা কম। কেননা শরিয়তে অনেক স্থানে $\frac{১}{৪}$ কে كُلْ বা সম্পূর্ণের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যেমন মুহরিমের ব্যাপারে মাথা মুণ্ডনের বিষয়ে। তদ্রূপ মাথার $\frac{১}{৪}$ অংশ মাসেহ করার হুকুম। তদ্রূপ আলোচ্য মাসআলাও।

আহনাফের পক্ষ হতে উত্তর : শরিয়তের হুকুম নির্ধারণের মোকাবিলায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

পুরুষের জন্য জানু হতে নাভি পর্যন্ত ঢাকা ফরজ। আর স্বাধীনা মহিলার জন্য চেহারা এবং হাতের কব্জী ব্যতীত সমস্ত দেহ সতর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا এখানে زِيْنَتْ দ্বারা زِيْنَتْ -এর অঙ্গ উদ্দেশ্য। আর زِيْنَتْ -এর প্রকাশ্য অঙ্গ হলো হাত এবং চেহারা। সুতরাং এ দুই অঙ্গ খোলা জায়েজ।

※ হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, দু' পায়ের প্রতি নজর করা জায়েজ আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা زِيْنَتْ প্রকাশ করাকে নিষেধ করে مَا ظَهَرَ مِنْهَا কে বাদ দিয়েছেন, আর مَا ظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা দু' পাও অন্তর্ভুক্ত।

※ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে পা খোলা থাকলেও নামাজ পুনঃ পড়া ওয়াজিব হবে।

كَمَا يُؤَيِّدُهُ حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّى ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا ـ

জবাব : এখানে سَابِغًا দ্বারা كَامِلاً وَاسِعًا হওয়া উদ্দেশ্য। যদি দু' পা সতর হতো তবে يُغَطِّى الْقَدَمَيْنِ (তথা উভয় পা ঢাকতে) বলা হতো।

মহিলাদের মাথার চুলের হুকুম : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের মাথার চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ঢেকে রাখা ফরজ, তবে এই হুকুম স্বাধীন নারীদের জন্য, তাই এটা খোলা রেখে নামাজ পড়লে নামাজ বিশুদ্ধ হবে না।

وَعَنْ ٧٠٧ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَذَكَرَ جَمَاعَةً وَقَفُوْهُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ)

৭০৭. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো মহিলা কি তহবন্দ ব্যতীত শুধু জামা ও ওড়না পরিধান করে নামাজ পড়তে পারে? রাসূল ﷺ বললেন, জামা যদি এতটুকু ঝুলানো হয় যে, পায়ের পাতার উপরিভাগ ঢেকে ফেলে [তবে নামাজ পড়তে পারবে]। –[আবূ দাউদ] আবূ দাউদ, মুহাদ্দিসগণের একদল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা এ হাদীসকে স্বয়ং উম্মে সালামার উক্তি বলে সাব্যস্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মেয়েদের পায়ের পাতার উপরিভাগও সতরের অন্তর্ভুক্ত। শরহুস সুন্নাহ গ্রন্থে আছে, ইমাম শাফেয়ী (র.) বলছেন, মেয়েদের মুখমণ্ডল ও হাতের দুই পাতা ব্যতীত অন্য কোনো অংশ যদি নামাজের মধ্যে প্রকাশ পায় তবে পুনরায় নামাজ পড়া ওয়াজিব।

কাজীখান ও শরহে মুনিয়া গ্রন্থে আছে যে, মেয়েদের পায়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক কথা হলো যে, মেয়েদের দুই পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হেদায়া ও দুররে মুখতার গ্রন্থে আছে যে, পায়ের এক-চতুর্থাংশ যদি প্রকাশ পায় তবে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।

মিরকাত ও ফতোয়ায়ে শামীতে আছে যে, মেয়েদের পায়ের ব্যাপারে তিনটি মাযহাব রয়েছে।

১. সম্পূর্ণ পা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

২. পা নামাজের বাইরের জন্য সতর, নামাজের ভিতরের জন্য নয়। ৩. সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মত এই যে, দুই পা সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَعَنْ ٧٠٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَأَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৭০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে সদল করতে এবং মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلسَّدْلُ -এর সংজ্ঞা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত سَدْل -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ :

১. মাজমাউল বিহার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, কাপড়কে কম্বলের মতো গায়ে দিয়ে তার ভেতরে উভয় হাত ঢুকিয়ে রেখে রুকু-সেজদা করাকে 'সদল' বলা হয়।

২. আবূ উবাইদা বলেছেন, কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার দুই প্রান্তকে হস্তদ্বয়ের সাথে না আটকিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া সদল বলে। যদি হস্তদ্বয়ের সাথে আটকিয়ে দেওয়া হয় তবে 'সদল' হবে না।

৩. আল্লামা খাত্তাবী বলেন, কাপড় এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া, যাতে তা মাটি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

৪. ইমাম কারখী (র.) বলেন, পরনে লুঙ্গি বা পায়জামা না থাকা অবস্থায় মাথা বা কাঁধের উপর কাপড় রেখে তার দুই প্রান্ত দু'দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া।

৫. কাঁধের উপর চাদর রেখে এর প্রান্তদ্বয় ঝুলিয়ে দেওয়া।

৬. কাবা বা জুব্বা কাঁধের উপর রেখে হস্তদ্বয় তার মধ্যে না ঢুকানো। কাযীখান গ্রন্থে আছে–

إِنَّهُ لَوْ لَبِسَ الْجُبَّةَ وَيَدَاهُ فِيْ خَارِجِ الْكُمَّيْنِ يَكُوْنُ سَدْلاً .

৭. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, ইসলামি শরিয়ত উত্তম ও মানানসই আকৃতির পোশাক পরার নির্দেশ দিয়েছে, তার বিপরীত করাকেই সদল বলে।

নামাজের মধ্যে 'সদল' করার বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো যে, নামাজের মধ্যে 'সদল' করা মাকরূহ। উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী নামাজের মধ্যে মুখ ঢেকে রাখাও মাকরূহ।

---

৭০৯ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِيْ نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭০৯. অনুবাদ : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা [নামাজের মধ্যে] ইহুদিদের বিপরীত কাজ করবে। কেননা তারা জুতা ও চামড়ার মোজা পরিধান করে নামাজ পড়ে না। [কাজেই তোমরা এটা পরিধান করে নামাজ পড়বে।] –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে দু'টি বিষয় জানা যায়–

১. জুতা-মোজা পাক থাকলে তা পরিধান করে নামাজ পড়া যায়। যদি জুতা বা মোজা এতটুকু নমনীয় হয় যে, সেজদার সময় পায়ের অঙ্গুলি কেবলার দিকে মুড়িয়ে সেজদা করা সম্ভব হয়। অবশ্য যে জুতায় নাপাক বা ময়লা লেগে থাকার সম্ভাবনা আছে তা পরিধান করে মসজিদে যাওয়া বেআদবি।

২. মোবাহ বিষয়েও ইহুদি, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিধর্মীদের অনুকরণ করা মুসলমানদের জন্য মাকরূহ। আর দীনি বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অনুকরণ করা হারাম।

যেহেতু হযরত ঈসা (আ.) ঘরের পূর্ব দিকে জন্মগ্রহণ করেছেন এ কারণে তারা পূর্ব দিকে মুখ করে ইবাদত করে।

وَعَنْ ٧١ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ الْقَوْمُ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهُ قَالَ مَاحَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ اَتَانِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِىْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

৭১০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় তিনি তাঁর চটি দুটি খুলে ফেললেন এবং বাম পার্শ্বে রাখলেন। জনতা যখন এটা দেখে তারাও নিজেদের চটিসমূহ খুলে রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ সমাপন করলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কারণে তোমাদের চটিসমূহ খুলে রাখলে? লোকেরা বলল, আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার চটিদ্বয় খুলে ফেলেছেন, তাই আমরাও আমাদের চটিগুলো খুলে ফেললাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার কাছে এসে খবর দিলেন যে, আমার চটি দুটিতে নাপাকি রয়েছে [এ জন্য আমি তা খুলে ফেলেছি]। তোমাদের কেউ যদি মসজিদে আসে সে যেন দেখে নেয়- যদি তার চটিদ্বয়ে ময়লা বা নাপাকি দেখে, তবে সে যেন তা মুছে ফেলে তারপর চটি পরে নামাজ পড়ে।-[আবূ দাঊদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الصَّلٰوةِ بِالنِّعَالِ **জুতা সহকারে নামাজ পড়ার বিধান :** যদি চটি পবিত্র হয় তবে তা নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ আছে। নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে সে যেন তার চটি দেখে নেয়। যদি তাতে নাপাক কিছু থাকে তবে তা মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে নামাজ পড়বে।' নাপাকি যদি শুকনা হয় বা খুঁটলে উঠে যায়, তবে মাটিতে রগড়ালে জুতা পবিত্র হবে। নাপাকি আর্দ্র হলে ধোয়া ব্যতীত পবিত্র হবে না। নাপাকি যদি শরাব বা প্রস্রাব জাতীয় হয় তবে শুকনা বা আর্দ্র যাই হোক না কেন, ধোয়া ব্যতীত পবিত্র হবে না।

※ আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, চটি পরে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মোস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

※ হাম্বলী মাযহাবের কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, চটি পরিধান করে নামাজ পড়া সুন্নত। কেননা, তাবারানী শরীফে রয়েছে মহানবী ﷺ বলেছেন, صَلُّوْا فِىْ نِعَالِكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ

※ দুররুল মুখতার গ্রন্থে রয়েছে যে, চটি পরিধান করেই নামাজ পড়া উত্তম। তবে মসজিদে ঢুকার পূর্বে চটিতে নাপাকি আছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত।

※ ইবনুল আবেদীন বলেছেন, চটি বা মোজা পরিধান করে নামাজ পড়া উত্তম, যদি তা পবিত্র হয়। কেননা, এটা ইহুদিদের বিরোধিতা করা।

※ ইবনু দাকীকিল ঈদ ও তা'লীক গ্রন্থকার বলেন যে, চটি পরিধান করে নামাজ পড়া সংক্রান্ত হাদীসমূহ দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। এর দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় না। রাসূল ﷺ যে জুতা পরিধান করে নামাজ পড়েছেন তার দু'টি কারণ- ১. ইহুদিদের বিরোধিতা করা এবং ২. জুতা পরিধান করে নামাজ পড়ার বৈধতা বর্ণনা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত কাজ উম্মতের উপর ওয়াজিব কি না? নবী করীম ﷺ-এর যে কোনো মৌখিক আদেশ-নিষেধ মান্য করা উম্মতের উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য, এর মধ্যে কারও দ্বিমত নেই। তবে তাঁর কোনো কাজ, যা তিনি নিজে করেছেন, কিন্তু সে সম্পর্কে উম্মতকে আদেশ কিংবা নিষেধ কিছুই করেননি, এমন কাজ করা উম্মতের উপর ওয়াজিব কি না এ সম্পর্কে মতভেদ আছে।

※ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী ﷺ-এর যুগ উম্মতের জন্য দলিল স্বরূপ, কাজেই তাঁর কথা ও কাজের অনুকরণ করা উভয়টি উম্মতের জন্য ওয়াজিব। আলোচ্য হাদীস হতেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন- মহানবী ﷺ-কে চটি খুলতে

দেখে লোকেরাও নিজ নিজ চটি খুলে ফেলেছেন। যদি রাসূলের কাজের অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব না হতো, তা হলে লোকেরা তাদের চটি খুলতেন না। এতদ্ভিন্ন খন্দকের যুদ্ধের দিন মহানবী ﷺ ও সঙ্গীদের চার ওয়াক্তের নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। হুজুর ﷺ ক্রমানুসারে সেই নামাজগুলো পরে কাজা আদায় করেছিলেন এবং তখন বলেছেন 'তোমরাও কাজা নামাজ এমনিভাবে পড়বে যেমনিভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছিলে।' صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ এসব হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মহানবী ﷺ -এর কাজগুলো অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব, যদিও মৌখিক নির্দেশ না থাকে।

※ হানাফীদের মতে মহানবী ﷺ -এর হুকুম ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাঁর যে কোনো আমল বা কাজের অনুকরণ করা উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়। তবে হ্যাঁ যদি মহানবী ﷺ যে কাজটি নিয়মিতভাবে করেছিলেন এবং তা ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে, তখন তার অনুকরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব হবে, অন্যথা নয়।

উল্লিখিত দলিলসমূহের জবাব হলো :

১. উল্লেখিত হাদীসের শব্দ صَلُّوْا নির্দেশসূচক। সুতরাং উক্ত নির্দেশের দরুনই ওয়াজিব হয়েছে, শুধু কাজ বা আমল দ্বারা ওয়াজিব হয়নি। যদি তাই হতো তবে صَلُّوْا শব্দ ব্যবহার করার আদৌ প্রয়োজন হতো না।

২. আলোচ্য হাদীসে মহানবী ﷺ চটি খুলতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধ করাটা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, নবী করীম ﷺ -এর সকল কর্মের অনুকরণ উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়। এর বিপরীত দলিল রয়েছে যে, এক সময় সাহাবীগণ নবী করীম ﷺ -কে صَوْم وِصَالْ ইফতার বিহীন উপর্যুপরি রোজা রাখতে দেখে তাঁরাও صَوْم وِصَالْ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এ খবর জানতে পেরে তিনি এরূপ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের নির্দেশ ব্যতীত তাঁর কোনো কাজ বা আমল উম্মতের জন্য ওয়াজিব নয়।

اَلتَّعَارُضُ وَ دَفْعُهٗ দ্বন্দ্ব ও সমাধান : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ চটিতে নাপাকিসহ যে কয় রাকাত নামাজ পড়েছেন তা পুনঃ পড়েননি, তা হলে তার পূর্বোক্ত রাকাতসমূহ বিশুদ্ধ হয়েছে কি না?

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর قَوْل قَدِيْم অনুসারে উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, পূর্বের রাকাতসমূহ যেহেতু নাপাকী সম্পর্কে অনবহিত অবস্থায় পড়া হয়েছে, তাই সেগুলো বিশুদ্ধ হয়েছে।

আর যারা বলেন যে, নাপাকী সম্পর্কে অনবহিত অবস্থায় নামাজ পড়া হলে তা শুদ্ধ নয়, তাদের মতে উক্ত হাদীসের উত্তর এই যে, নাপাকির পরিমাণ এত কম ছিল যে, তা ক্ষমার যোগ্য। তবু হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজ যাতে পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয় তাই তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

অথবা এ উত্তর ও হতে পারে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চটিতে ময়লা ছিল, নাপাকী ছিল না। তবু সে ময়লা যাতে সিজদায় গেলে তাঁর কাপড়ে না লাগে সে জন্য তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٧١١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ يَدَيْهِ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلَا عَنْ يَسَارِهٖ فَتَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهٖ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ عَلٰى يَسَارِهٖ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا رِجْلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ أَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ)

৭১১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে তখন সে যেন তার জুতা বা চটি তার ডান দিকে না রাখে এবং বাম দিকেও না রাখে, যাতে তা অন্যের ডান দিকে হয়ে যায়। অবশ্য যদি বাম দিকে কোনো লোক না থাকে, [তবে বাম দিকে রাখা যেতে পারে।] বরং তা যেন নিজের দু পায়ের মাঝখানে [কিছুটা সামনে] রাখে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অথবা, [পাক থাকলে] তা পরেই নামাজ পড়বে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মসজিদে যদি জুতার নিরাপত্তা না থাকে এবং পাহারাদারও না থাকে আর ডান পার্শ্বে বা বাম পার্শ্বে রাখার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তখন এভাবে দু' পায়ের মধ্যখানে একটু সম্মুখ দিকে রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ জুতা কাছে না থাকলে নামাজে মনের একাগ্রতা থাকে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧١٢ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ عَلٰى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَاَيْتُهُ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭১২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন দেখলাম তিনি মাদুরের উপর নামাজ পড়ছেন, আর এর উপরই সিজদা করছেন। রাবী বলেন, আমি আরও দেখলাম যে, তিনি বিপরীত দিক হতে কাঁধের উপর জড়িয়ে এক কাপড় পরিধান করেই নামাজ পড়ছেন। -[মুসলিম]

---

٧١٣ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ حَافِيًا وَمُتَنَعِّلًا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭১৩. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খালি পায়ে এবং জুতা পরিহিত [উভয়] অবস্থায় নামাজ পড়তে দেখেছি। -[আবূ দাউদ]

---

٧١٤ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (رحـ) قَالَ صَلّٰى بِنَا جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهٗ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهٗ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهٗ قَائِلٌ تُصَلِّىْ فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ اَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهٗ ثَوْبَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭১৪. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র.) বলেন, একবার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) আমাদের সাথে নামাজ পড়লেন মাত্র একটি লুঙ্গি পরিধান করে, যার গিরা লাগিয়ে ছিলেন পিছনে ঘাড়ের উপরে। অথচ তাঁর অন্যান্য কাপড় আলনার উপর রক্ষিত ছিল। এতে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি যে একটি মাত্র ইযার [তহ্বন্দ] পরিধান করে নামাজ পড়লেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন, তোমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি যেন দেখে, এ জন্য আমি এরূপ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় আমাদের কোন্ ব্যক্তির দু'টি কাপড় ছিল? -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এতে বুঝা গেল যে, দুই কাপড়ে অর্থাৎ লুঙ্গি ও চাদর অথবা লুঙ্গি ও জামা পরে নামাজ পড়া উত্তম হলেও এক কাপড়ে পড়া ও জায়েজ।

---

٧١٥ وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ اَلصَّلٰوةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةٌ كُنَّا نَفْعَلُهٗ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا كَانَ ذَاكَ اِذَا كَانَ فِى الثِّيَابِ قِلَّةٌ فَاَمَّا اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَالصَّلٰوةُ فِى الثَّوْبَيْنِ اَزْكٰى - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৭১৫. **অনুবাদ :** হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কাপড়ে নামাজ পড়া সুন্নত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক অনুমোদিত। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে এরূপ করেছি। এতে আমাদের কোনো দোষ ধরা হতো না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এরূপ ছিল যখন কাপড়ের খুব অভাব ছিল; কিন্তু আল্লাহ যখন স্বচ্ছলতা দান করেছেন তখন দুই কাপড়ে নামাজ পড়াই উত্তম। -[আহমদ]

بَابُ السُّتْرَةِ
পরিচ্ছেদ : সুত্‌রা

سُتْرَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– অন্তরাল, আর শরিয়তের পরিভাষায় খোলা বা উন্মুক্ত স্থানের নামাজ পড়তে নামাজির সম্মুখে যে দণ্ড দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় তাকে سُتْرَةٌ বলে। একাকী হোক বা জামাতের সাথে হোক সর্বাবস্থায় সুত্‌রা আবশ্যক। তবে জামাতে নামাজ আদায় করার সময় শুধু ইমামের সম্মুখে সুতরা থাকাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মুক্তাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুতরার আবশ্যকতা নেই। এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত, যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ وَاَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَ دَخَلْتُ عَلَى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلٰى اَحَدٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

সুত্‌রার পরিমাণ : এটা এক হাত লম্বা ও অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা দণ্ড হওয়া আবশ্যক, তিন হাতের চেয়ে বেশি লম্বা হওয়া উচিত নয়, যদি দণ্ড বা তদ্রূপ কোনো বস্তু পাওয়া না যায় তবে পাথর বা মাটির স্তূপ তৈরি করে নেবে। এটাও সম্ভব না হলে জায়নামাজ বা কোনোকিছু লটকিয়ে দেবে।

সুত্‌রার হুকুম : সুতরা স্থাপন করা মোস্তাহাব আর পরিহার করা করা মাকরূহে তানযীহী। আলোচ্য অধ্যায়ে সুতরা স্থাপন করার ক্ষেত্রে যে নির্দেশ এসেছে সবগুলো মোস্তাহাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, সুতরা পরিহার সংক্রান্ত হাদীস রয়েছে যে, عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ رَاَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ بَادِيَةٍ لَنَا يُصَلِّيْ فِيْ صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ -(اَبُوْ دَاوُدَ)

তবে যদি এমন জায়গায় নামাজ পড়া হয় যা মানুষের চলাচলের রাস্তা নয়, কিংবা তার সম্মুখ দিয়ে কেউ যাবার সম্ভাবনা নেই, তা হলে সুতরা পরিহার করা মকরূহ নয়। কিন্তু সতর্কতার লক্ষ্যে সুত্‌রা স্থাপন করাই উত্তম।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧١٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ খুব সকালে ঈদগাহের দিকে যেতেন। তাঁর সম্মুখে একটি বর্শা বহন করে নেওয়া হতো এবং তা ঈদগাহে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো। অতঃপর হুজুর ﷺ তা সামনে রেখে নামাজ পড়তেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ঈদের নামাজ সাধারণত মুক্ত মাঠেই আদায় করা হয়, কাজেই সেখানে সুত্‌রা ব্যবহার করা আবশ্যক, আর তা ইমামের সম্মুখেই স্থাপন করতে হয়।

وَعَنْ ٧١٧ اَبِيْ جُحَيْفَةَ (رض) قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْاَبْطَحِ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَ رَاَيْتُ

৭১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ জুহাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কায় দেখলাম, তিনি তখন আবতাহা নামক স্থানে একটি লাল চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন। বেলালকে রাসূলুল্লাহ

بِلَالًا اَخَذَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ رَاَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهٖ ثُمَّ رَاَيْتُ بِلَالًا اَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلّٰى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَ رَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَىِ الْعَنَزَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ﷺ-এর অজুর [উদ্বৃত্ত] পানি নিতে এবং লোকদেরকে অজুর [উদ্বৃত্ত] পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে দেখলাম। যে সে পানির কিছু পেল সে তা আপন গায়ে মুখে মুছে দিল, আর যে পেল না সে তার সঙ্গীর ভিজা হাত হতে সিক্ততা গ্রহণ করল। অতঃপর বেলালকে একটা বর্শা হাতে নিতে দেখলাম। সে তা মাটিতে পুঁতে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লাল রংয়ের ডোরাদার পোশাক পরিধান করে তার আঁচল সামলিয়ে নিয়ে বের হলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে লোকজন সমভিব্যহারে দু' রাকাত নামাজ পড়লেন। আমি দেখলাম, লোকজন এবং গবাদি পশু বর্শার সম্মুখ দিয়ে [অর্থাৎ বাইরে দিয়ে] চলাচল করছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاَبْطَحُ-এর পরিচিতি : 'আবতাহ্' মক্কা হতে মিনা যাতায়াতের পথে একটি নিচু জায়গা। সাধারণত এ স্থান দিয়ে পানি গড়িয়ে থাকে। উক্ত স্থানটিকে 'বাতীহা' 'বাত্হা' বা 'মুহাস্সাব'ও বলা হয়। এ হাদীস হতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সুত্রার বাইরে দিয়ে অবাধে চলাচল করা যেতে পারে।

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ বর্ণনাকারী পরিচিতি :

১. **নাম ও পরিচিতি :** তাঁর নাম ওহাব, কুনিয়াত বা উপনাম আবূ জুহাইফা, পিতার নাম আব্দুল্লাহ আস্ সুওয়ায়ী। কারো মতে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার উভয়ের নাম ছিল ওহাব। তাঁকে ওহাব আল খায়রও বলা হয়। ইনি কূফা নগরীতে একটি বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করতেন এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর বয়ঃকনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন।

২. **ইসলাম গ্রহণ :** সম্ভবত তিনি ফিতরতে ইসলামিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেননা, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর ইন্তেকালের সময় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হননি।

৩. **হযরত আলীর (রা.) সাথে সম্পর্ক :** হযরত আলী (রা.) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। এমনকি তিনি অনেকাংশে তাঁর উপর নির্ভরশীল হতেন। এ কারণেই তিনি তাঁর খেলাফত আমলে তাঁকে কূফার বায়তুল মালের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।

৪. **বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ :** পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি রাসূলে পাক ﷺ -এর ইন্তেকালের সময়ে নাবালেগ ছিলেন। অতএব হুজূরের ﷺ যুগে কোনো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। তবে তিনি হযরত আলী (রা.) -এর সাথে সকল যুদ্ধেই তাঁর স্বপক্ষে অংশ গ্রহণ করেন।

৫. **তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা :** তাঁর নিকট হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৪৫ খানা। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ২ খানা, ইমাম বুখারী এককভাবে দুইখানা ও ইমাম মুসলিম এককভাবে ৩ খানা হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেন।

৬. **তাঁর নিকট হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন :** তাঁর নিকট হতে তাঁর ছেলে আউন, শা'বী ও তাবেয়ীদের একটি জামাত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭. **ইহলোক ত্যাগ :** তিনি ৭২ হিজরিতে মতান্তরে ৭৪ হিজরিতে ৮০ বছরের অধিক বয়সে বসরা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বসরাতেই সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٧١٨ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ الْبُخَارِىُّ قُلْتُ اَفَرَاَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَاْخُذُ الرَّحْلَ فَيَعْدِلُهُ فَيُصَلِّىْ اِلَى اٰخِرَتِهٖ ـ

৭১৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ [খোলা ময়দানে নামাজ পড়তে] সওয়ারি উটকে আড়াআড়িভাবে বসাতেন এবং তার দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন -[বুখারী ও মুসলিম]

কিন্তু বুখারীর বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, নাফে' বলেন, আমি ইবনে ওমরকে জিজ্ঞাস করলাম, আচ্ছা বলুন তো! যখন উট মাঠে চরতে চলে যেতো, তখন তিনি কি করতেন? ইবনে ওমর বললেন, তখন তিনি উটের হাওদাটিকে নিয়ে সম্মুখে সোজা করে রাখতেন এবং তার পিছনের দণ্ডের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন।

وَعَنْ ٧١٩ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭১৯. অনুবাদ : হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- যখন তোমাদের কেউ নিজেদের সম্মুখে হাওদার পেছনের দণ্ডের মতো একটি দণ্ড স্থাপন করবে তখন এর দিকে ফিরে নামাজ পড়বে এবং যারা এর বাইরে দিয়ে যাতায়াত করবে তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٢٠ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لَا اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭২০. অনুবাদ : হযরত আবূ জুহাইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যদি নামাজির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, এতে তার কত পাপ হয়, তবে সে নামাজির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করে বরং চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। রাবী আবূ নজর বলেন, আমি জানি না [অর্থাৎ আমার স্মরণ নেই] আবূ জুহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস বলেছেন, না চল্লিশ বছর বলেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত ৪০ দ্বারা ৪০ বছর উদ্দেশ্য, ৪০ দিন বা ৪০ মাস উদ্দেশ্য নয়।

* কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে এখানের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়, বরং আধিক্য উদ্দেশ্য। কেননা, অপর এক বর্ণনায় ১০০ বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন- হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে,

لَكِنَّ اَنْ يَّقِفَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرًا لَهٗ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِىْ خَطَاهَا ـ

وَعَنْ ٧٢١ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ . (هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ)

৭২১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিসকে লোকজন হতে সুত্‌রা রূপে দাঁড় করিয়ে নামাজ পড়ে আর যদি কেউ সে নামাজির সম্মুখ দিয়ে [সুত্‌রার ভিতর দিয়ে] অতিক্রম করতে চায় তবে সে নামাজি যেন অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়। যদি সে বাধাকে অমান্য করে তবে তার সাথে লড়াই করে। কেননা, এমতাবস্থায় সে [মানুষরূপী] শয়তান। [বুখারী, আর মুসলিমও উক্ত হাদীসের মর্মার্থ ব্যক্তকারী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَلْيُقَاتِلْهُ এবং فَلْيَدْفَعْهُ-এর অর্থ : فَلْيَدْفَعْهُ-এর অর্থ হলো, তাকে হাতের ইশারা দ্বারা বা অতিক্রমকারীর বক্ষের উপর হাত রেখে বাধা দেবে। শরহে মুনিয়া গ্রন্থে রয়েছে যে, অতিক্রমকারীকে হাতের ইশারা বা তাসবীহ ইত্যাদি বলে বিরত রাখবে।

فَلْيُقَاتِلْهُ : এর অর্থ তাকে হত্যা করা নয়, বরং এর অর্থ হলো শক্তি প্রয়োগে বাধা প্রদান করা। তবে যেন আমলে কাছীরের পর্যায়ে না যায়। কেননা এতে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

বাধা প্রদানের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : নবী করীম ﷺ ঘোষণা করেছেন فَلْيَدْفَعْهُ সে যেন তাকে বাধা প্রদান করে। এ বাধা প্রদানের হুকুম কি? সে সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

১. আহলে যাহেরের মতে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন—

١ ـ حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَلْيَدْفَعْهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ سَعِيْدٍ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ ـ

২. ইমাম চতুষ্টয় ও জমহুর ফিকহবিদদের মতে বাধা প্রদান করা ওয়াজিব নয়। কাজি ইয়ায ও ইমাম কুরতুবী বলেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা অপরিহার্য নয়। কেননা এটা اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغْلًا হাদীসের পরিপন্থি। কারণ قِتَالٌ নামাজের বহির্ভূত কাজ। সুতরাং এতে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়।

শায়খ আবূ মানসূর মাতুরিদী আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, اَلْاَفْضَلُ اَنْ يَّتْرُكَ الدَّرْءَ অর্থাৎ বাধা দান পরিহার করা উত্তম।

প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : যে সব হাদীসে বাধা দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা رُخْصَتْ (অনুমতি)-এর জন্য।

※ অথবা উক্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে। যেমন ইমাম যাইলাঈ সারাখসী (র.) হতে বর্ণনা করেছেন,

اِنَّ الْاَمْرَ بِهَا مَحْمُوْلٌ عَلَى الْاِبْتِدَاءِ حِيْنَ كَانَ الْعَمَلُ فِى الصَّلٰوةِ مُبَاحًا ـ

হাদীসে উল্লিখিত নির্দেশটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের জন্য প্রযোজ্য, যখন নামাজের মধ্যে নামাজ বহির্ভূত কর্ম বৈধ ছিল।

নিহত হওয়ার পর কিসাসের বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : ইমাম কাজি ইয়ায (র.) বলেছেন যে, বৈধ পন্থায় বাধা দানের পর অতিক্রমকারী ব্যক্তি যদি মারা যায়, তবে আলিমগণের ঐকমত্যে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে কি না এ ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে ওয়াজিব, আবার কারো মতে ওয়াজিব নয়।

※ হানাফীগণের মতে কিসাস বা দিয়াত কোনোটাই ওয়াজিব হবে না, দুররুল মুখতার গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত আছে।

হাদীসের মধ্যে যে, فَلْيُقَاتِلْهُ এসেছে এর দ্বারা قَتْل বা হত্যার বৈধতা প্রমাণিত হয় না; বরং সুত্‌রা ও নামাজি ব্যক্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রম না করার নির্দেশকে কড়াকড়িভাবে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। অথবা এখানে مُقَاتَلَةٌ দ্বারা পরস্পর হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কি করা উদ্দেশ্য, হত্যা উদ্দেশ্য নয়।

فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ **-এর অর্থ :** উক্ত হাদীসের এ পদটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে—
১. তার এ কাজটি শয়তানের কাজের ন্যায়।
২. শয়তান তাকে এরূপ কাজ করতে উৎসাহিত করেছে। এ জন্য তাকে শয়তান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
৩. শয়তান বলে এখানে অবাধ্য ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, অবাধ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রেও শয়তান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন, شَيَاطِيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

---

৭২২ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِيْ ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭২২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− নামাজ নষ্ট করে স্ত্রীলোক, গাধা ও কুকুর এবং এটা হতে রক্ষা করে হাওদার পেছনের লাঠির ন্যায় কোনো জিনিস। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লিখিত তিনটিকে নির্দিষ্ট করার কারণ : মহিলা সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য ছাড়াও দার্শনিকদের মতে তারা মনোহারি ও প্রলুব্ধকারিণী। হাদীসে বলা হয়েছে, 'নারী হলো পুরুষদেরকে শিকার করার জন্য শয়তানের ফাঁদ বিশেষ।' কুকুর সম্বন্ধে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'কালো কুকুরই শয়তান।' সুতরাং কুকুর কঠোরভাবে নাপাক। আর গাধা চিৎকার করলে শয়তান এগিয়ে আসে। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, এ তিন বস্তু শয়তানের সাথে সম্পর্কিত, কাজেই এগুলোকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে।

নামাজি লোকের সম্মুখ দিয়ে মহিলা, গাধা ও কুকুর অতিক্রম করার হুকুম : নামাজি লোকের সম্মুখ দিয়ে যাই অতিক্রম করুক না কেন তা একজন মহিলা হোক, একটি গাধা হোক কিংবা কুকুর হোক অথবা অন্য কিছু হোক এতে নামাজ নষ্ট হবে না। এটাই জমহুর ইমামদের অভিমত। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.), মুহাম্মদ (র.), শাফেয়ী (র.), মালেক (র.) প্রমুখ ও অন্যান্য ফিকহবিদদের মাযহাব এই যে, নামাজি লোকের সম্মুখ দিয়ে যা কিছু অতিক্রম করুক না কেন তাতে নামাজ নষ্ট হবে না। তবে ইমাম আহমদ (র.) বলেন যে, কালো কুকুর অতিক্রম করলে নামাজ বিনষ্ট হবে; কিন্তু মহিলা ও গাধা অতিক্রম করাতে নামাজ নষ্ট হবে কি না এ বিষয়ে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছি।

আহলে যাওয়াহেরগণ বলেন যে, মহিলা, কুকুর ও গাধা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। শুধু এটাই নয়, তাঁরা আরও বলেন যে, গাধা ও কুকুর সামনে থাকুক কিংবা সামনে দিয়ে অতিক্রম করুক, আর এগুলো ছোট হোক বা বড় হোক, জীবিত হোক কিংবা মৃত হোক যে কোনো অবস্থাতেই নামাজ নষ্ট হবে। মহিলার ব্যাপারেও তাঁদের একই অভিমত, তবে ব্যবধান এই যে, উক্ত মহিলা মুমূর্ষু বা বেহুঁশ অবস্থায় থাকলে নামাজ বিনষ্ট হবে না।

জমহুর ইমামদের দলিল :

১. عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কোনো কিছুই নামাজকে বিনষ্ট করে না।

২. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ وَادْرَأُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো কিছুই নামাজকে বিনষ্ট করে না। এরূপভাবে হযরত আনাস (রা.), হযরত জাবির (রা.), হযরত হুযাইফা (রা.) ও হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : জমহুর হাদীসবিদগণ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত (৭২২ নং) হাদীসের নিম্নলিখিত জবাব দিয়েছেন− ১. এ হাদীস রহিত হয়ে গেছে। ২. নামাজ নষ্ট দ্বারা নামাজ বাতিল অর্থ নয় বরং নামাজের একাগ্রতা ও ধ্যান-গম্ভীরতা বিনষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য। (৩) যখন বিপরীত দুই হাদীস পাওয়া গেছে, তখন আমাদেরকে দেখতে হবে যে, রাসূলের সাহাবীগণ কোনটির উপর আমল করেছেন, তা হলে আমরাও তার উপরেই আমল করব। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, অধিকাংশ সাহাবী নামাজ বিনষ্ট না হওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন, ফলে আমরা একেই গ্রহণ করেছি।

وَعَنْ ٧٢٣ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭২৩. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় নামাজ পড়তেন, আর আমি তাঁর এবং কেব্‌লার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম যেভাবে জানাজাকে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোক সম্মুখে থাকলে এমনকি আড়াআড়ি শুয়ে থাকলেও নামাজ বাতিল হবে না।

وَعَنْ ٧٢٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَ اَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَ دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭২৪. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এক গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে উপস্থিত হলাম, তখন আমি যৌবনে পদার্পণ আসন্ন কিশোর ছিলাম, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনাতে কোনো দেওয়ালের অন্তরাল ছাড়াই লোকজন সমভিব্যহারে নামাজ পড়ছিলেন। তখন আমি [নামাজ সারির] একাংশের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম, অতঃপর অবতরণ করলাম। আর গর্দভীকে চরতে দিয়ে আমি নামাজের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হলাম, অথচ এতে আমার প্রতি কেউই আপত্তি করল না।—[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের সংখ্যা :** উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নামাজের সম্মুখ দিয়ে গাধা চলাচল করলে নামাজ নষ্ট হয় না, আর অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের অজ্ঞতাবশত চলাচল করলেও তা ধর্তব্য নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٢٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ اَمَامَهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৭২৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— যদি তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে সে যেন নিজের সামনে একটা কিছু রেখে দেয়। যদি সে কিছুই না পায় তবে যেন নিজের লাঠিখানা খাড়া [লম্বা] করে দেয়, আর যদি তার সাথে লাঠিও না থাকে তবে সে যেন একটি রেখা টেনে দেয়। অতঃপর কেউ তার সম্মুখ দিয়ে গেলেও তার অনিষ্ট করবে না।—[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ نَصَبِ السُّتْرَةِ بِالْخَطِّ **রেখা টেনে সুতরা স্থাপন করার ব্যাপারে ইমামদের মতান্তর** : ইমাম শাফেয়ীর পূর্বের মত ও ইমাম আহ্মদের মতানুসারে এবং পরবর্তীকালে হানাফী ইমামদের মতানুসারে সুত্রা হিসেবে রেখা টেনে দেওয়া যথেষ্ট। তবে রেখা টানার ধরনের মধ্যে মতভেদ আছে—

কেউ কেউ বলেন, নতুন চাঁদের ন্যায় করবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, কেব্লার দিকে লম্বা করে লাইন টেনে দেবে।

আবার কারো মতে ডানে-বামে আড়াআড়িভাবে লাইন রেখা টানতে হবে।

ইমাম শাফেয়ীর পরবর্তী মত, ইমাম মালেক ও হানাফী মাশায়েখদের মতে রেখা টানায় কোনো লাভজনক গুরুত্ব নেই। এক দিকে তাঁরা এ হাদীসটিকে যঈফ মনে করেন, অপর দিকে অন্য হাদীসের সাথে বিরোধও দেখেন।

※ ইবনে হুমাম বলেন, রেখা টানা এ জন্য জায়েজ আছে যে, এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে। সুতরাং হাদীসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনে এর উপর আমল করা উচিত, যদিও এ রেখা টানায় অতিক্রমকারীকে নিবৃত করার জন্য যথেষ্ট নয়, তবুও মনের সান্ত্বনার জন্য এবং নিজের খেয়ালকে সংযত করার জন্য এটা অবশ্যই উপকারী।

উল্লেখ্য যে, নামাজি তার সম্মুখে একটি ছড়ি বা লাঠি পুঁতে দেওয়া ওয়াজিব কিংবা মোস্তাহাবও নয়; বরং নামাজির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে গমনকারীরই কবীরা গুনাহ্ হবে, তবে কা'বা শরীফে সব সময় মানুষের ভিড় জমে থাকে, তাই হেরেম শরীফে নামাজ পড়ার সময় সম্মুখে দিয়ে অতিক্রম করলে গুনাহ্ হবে না। অবশ্য ভিড় না থাকলে অতিক্রম করা জায়েজ হবে না।

وَعَنْ ٧٢٦ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهٗ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭২৬. অনুবাদ : হযরত সাহ্ল ইবনে আবূ হাস্মা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি তোমাদের কেউ সুতরার দিকে নামাজ পড়ে সে যেন তার কাছাকাছি দাঁড়ায়, তাহলে শয়তান তার নামাজ বিনষ্ট করতে পারবে না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : মহানবী ﷺ যখন সম্মুখে সুত্রা রেখে নামাজ পড়তেন তখন তা একেবারে সোজাসুজি নাক বরাবর রাখতেন না। মূর্তিপূজার সাথে সাদৃশ্য হতে বাঁচার জন্য তিনি এরূপ করতেন।

وَعَنْ ٧٢٧ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضـ) قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ اِلٰى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ اِلَّا جَعَلَهٗ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهٗ صَمْدًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭২৭. অনুবাদ : হযরত মিক্দাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো কাঠ, স্তম্ভ বা গাছকে সম্মুখে রেখে নামাজ পড়তে দেখেছি তখন তা তাঁর ডান ভ্রু বা বাম ভ্রু বরাবর সম্মুখে রেখেছেন, নাক বরাবর সোজা রাখার ইচ্ছা করেননি। –[আবূ দাউদ]

وَعَنِ ٧٢٨ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ فِىْ بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهٗ عَبَّاسٌ فَصَلّٰى فِى الصَّحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالٰى بِذٰلِكَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ نَحْوَهٗ)

৭২৮. অনুবাদ : হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা বনে ছিলাম। তাঁর সাথে [আমাদের পিতা] হযরত আবাবাস (রা.) ছিলেন। তখন তিনি [বনের মধ্যস্থিত] ময়দানে নামাজ পড়লেন, তাঁর সম্মুখে কোনো অন্তরায় ছিল না। আমাদের একটি গর্দভী ও কুকুর তার সম্মুখ দিকে খেলা করছিল। এতে তিনি পরোয়া করলেন না। -[আবূ দাউদ এবং নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٧٢٩ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো কিছুই নামাজকে ভঙ্গ করতে পারে না [যা কিছুই নামাজির সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করুক না কেন] তোমরা সাধ্য মতো যাতায়াতকারীকে প্রতিহত করবে। কারণ সে শয়তান। -[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٣٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ رِجْلَاىَ فِىْ قِبْلَتِهٖ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখ দিকে ঘুমাতাম। আর আমার দু'পা থাকত তাঁর কিবলার দিকে। যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি আমাকে টোকা দিতেন। আর আমি আমার পা দু'টি গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি দু'পা প্রসারিত করে দিতাম। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তখন ঘরগুলো এমন ছিল যে, তাতে বাতি থাকত না। [বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'তৎকালে ঘরে বাতি থাকতো না' বাক্যটি দ্বারা হযরত আয়েশা কেবলার দিকে পা রাখার ব্যাপারে স্বীয় ওজর পেশ করছেন। অর্থাৎ বাতি না থাকার কারণে অন্ধকার হেতু অজান্তে আমার পা কেবলার দিকে চলে যেতো। অবশ্য রাসূল ﷺ টোকা দিলেই সতর্কতা অবলম্বন করতাম।

হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজি ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে কোনো স্ত্রীলোক গমন করলে বা অবস্থান করলে নামাজ নষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে এটাও প্রমাণিত হয় যে, مَسُّ مَرْأَةٍ বা নারী স্পর্শ দ্বারা অজু নষ্ট হয় না।

وَعَنْ ٧٣١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَالَهُ فِىْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِى الصَّلٰوةِ كَانَ لَاَنْ يُّقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِىْ خَطَا - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৭৩১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি তোমাদের কেউ এটা জানতো যে, তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের নামাজের সম্মুখ দিয়ে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করা কত বড় পাপ তবে সে অবশ্যই একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকতো আর সে যে পদক্ষেপটি নিয়েছে সে পদক্ষেপের চেয়ে এটাই উত্তম মনে করতো। –[ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٧٣٢ كَعْبِ الْاَحْبَارِ (رح) قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّخْسِفَ بِهٖ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَهْوَنُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৭৩২. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত কা'বে আহবার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নামাজির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, এতে তার কত বড় পাপ হয়, তবে সে নামাজির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম অপেক্ষা নিজে জমিনে প্রোথিত হয়ে যাওয়াকে শ্রেয় মনে করতো। অপর বর্ণনায় আছে যে, [প্রোথিত হওয়াকে] বেশি সহজ ভাবতো। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসে একশত বছর দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু অন্য হাদীসে চল্লিশ দিন বা মাস বা বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে। বাহ্যিকভাবে উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্ব দেখা গেলেও মূলত কোনো বৈপরীত্ব নেই। কেননা, এর দ্বারা গুনাহের ভয়াবহতার কথা বুঝানো উদ্দেশ্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়।

وَعَنْ ٧٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى غَيْرِ السُّتْرَةِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلٰوتَهُ الْحِمَارُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْيَهُوْدِىُّ وَالْمَجُوْسِىُّ وَالْمَرْاَةُ وَتُجْزِئُ عَنْهُ اِذَا مَرُّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭৩৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ সুতরা ছাড়া নামাজ পড়ে তখন তার নামাজকে গাধা, শূকর, ইহুদি, অগ্নিপূজারী ও মহিলা ভঙ্গ করে দেয়। আর যদি ওগুলো কাঁকর নিক্ষেপ পরিমাণ দূর দিয়ে অতিক্রম করে তবে তাতে তার নামাজ ত্রুটিমুক্ত থাকবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** 'নামাজকে নষ্ট করে দেয়'-এর অর্থ হলো– নামাজের একাগ্রতা ও মনোনিবেশ নষ্ট করে দেয়। কাঁকর বা পাথরের কণা নিক্ষেপ পরিমাণ দূর অর্থ– সিজ্দার স্থানে দৃষ্টি রাখলে এর বাইরেও যতটুকু স্থান দৃষ্টি সীমার ভিতরে আসে। অর্থাৎ কোনো কিছুর নড়াচড়া বা চলাচলের প্রতি দৃষ্টি করে না চাইলেও দৃষ্টিতে পড়ে, ততটুকু পরিমাণ দূরত্বকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী বলেছেন, ন্যূনতম তিন গজ বা ছয় হাত কিংবা তার চেয়ে বেশি দূর দিয়ে অতিক্রম করলে কোনো ক্ষতি হবে না। বস্তুত তিন গজের বাইরে দৃষ্টির সীমা ব্যাপৃত হয় না।

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের নিয়ম-কানুন

صِفَةُ الصَّلٰوةِ -এর অর্থ হলো– নামাজের গুণ। তবে এখানে صِفَتْ বলতে নামাজের যাবতীয় বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে। যেমন– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত মোস্তাহাব ইত্যাদি, এক কথায় কোন কাজের সাথে নামাজের কী পর্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে, আলোচ্য অধ্যায়ে সে সব বিষয়সহ নামাজ সংশ্লিষ্ট অনেক বিধি-বিধান আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٣٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوْ فِى الَّتِىْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلٰوتِكَ كُلِّهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল এবং নামাজ পড়ল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে বসেছিলেন। অতঃপর সে তাঁর নিকট আসল এবং তাঁকে সালাম করল। তখন তিনি তাকে বললেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম, যাও এবং আবার নামাজ পড়। তোমার নামাজ পড়া হয়নি।' সে পুনঃ গেল আবার নামাজ পড়ল, অতঃপর আসল এবং রাসূল ﷺ-কে সালাম করল। রাসূল ﷺ বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্ সলাম, আবার যাও এবং পুনঃ নামাজ পড়। তোমার নামাজ পড়া হয়নি।' অতঃপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে তখন পূর্ণরূপে অজু করবে। এরপর কেব্‌লার দিক হয়ে দাঁড়াবে এবং তাক্‌বীর বলবে। তারপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। এরপর রুকু করবে এবং রুকুতে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে, এরপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, তারপর সেজদা করবে এবং সেজদাতেও স্থির থাকবে কিছু সময়। তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে, তৎপর দ্বিতীয় সেজ্‌দা করবে এবং স্থির থাকবে সেজ্‌দাতে। এরপর মাথা তুলবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে তারপর মাথা তুলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাজে এরূপ করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا اسْمُ هٰذَا الرَّجُلِ এই ব্যক্তির নাম কি : আল্লামা ইবনে হাজার আস্‌কালানী (র.) বলেন, এ প্রবেশকারী লোকটি ছিলেন খাল্লাদ ইবনে রাফে' আন্‌সারী। অবশ্য অন্য কারো মতে তার নাম আলী ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া। কিন্তু ইবনে হাজারের বর্ণনাটিই অধিক বিশুদ্ধ।

এখানে একটি প্রশ্ন : হাদীসটির বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম হিজরিতে। অথচ উক্ত ঘটনার নায়ক হযরত 'খাল্লাদ' এর বহু পূর্বেই দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন। কাজেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কিভাবে এ হাদীসের ঘটনা বর্ণনা করলেন? এর জবাবে বলা হয় যে, এক সাহাবী অন্য সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এর নজির বহু হাদীসে উল্লেখ আছে। এ হিসাবে বলা হয় সম্ভবত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসটি সে সমস্ত সাহাবীদের নিকট হতে অবগত হয়েছেন যাঁরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন।

কেন বললেন 'যাও, নামাজ পড়' : লোকটি নামাজের রোকনগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করেনি, অথচ তা ফরজ কিংবা ওয়াজিব ছিল। তবে অন্যান্য রিওয়ায়াত হতে বুঝা যাচ্ছে যে, লোকটি ওয়াজিব তরক করেই নামাজ পড়েছিল। সুতরাং এখানে 'পুনরায় নামাজ পড়' এর মানেই হলো, 'নামাজকে পরিপূর্ণভাবে আদায় কর।'

তা'দীলে আরকান সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী, আহ্‌মদ ও আবূ ইউসুফের মতে রুকু, সেজদা, বৈঠক এবং কিয়ামের মধ্যে তা'দীলে আরকান ফরজ।

※ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদের মতে তা'দীলে আরকান ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব। তা'দীলে আরকান না করলে নামাজ পূর্ণ হয় না। এ কারণে উল্লিখিত হাদীসে না-বাচক উক্তিটি না-জায়েজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং নামাজের অপূর্ণতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযীর হাদীস এ কথারই সহায়তা করে। নবী করীম ﷺ তাকে নামাজের পূর্ণ নিয়ম বাতলানোর জন্য বলেছেন 'যখন তুমি এ রকম করবে তখন তোমার নামাজ পূর্ণ হবে। আর যদি এটা হতে কোনো কিছু অসম্পূর্ণ থাকে তা হলে তোমার নামাজও অসম্পূর্ণ হবে।' এটা তা'দীলে আরকান ফরজ না হওয়ারই ইঙ্গিত। যদি তার নামাজ মোটেই শুদ্ধ না হতো তা হলে নষ্ট হয়ে যাওয়া নামাজের জন্য পুনঃ পুনঃ হুকুম করতেন না; বরং প্রথমবারেই তাকে জায়েজ পন্থা বলে দিতেন। ইবনে হুমাম বলেন, নামাজের কোনো ফরজ পরিত্যক্ত হলে নামাজ পুনরায় পড়া ফরজ। আর ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলে পুনরায় পড়া ওয়াজিব। সুন্নত ছুটে গেলে নামাজ পুনরায় পড়া মোস্তাহাব। কাজেই প্রবেশকারী সুন্নত ও ওয়াজিব দু'টিই ছেড়ে দিয়েছিল এ কারণে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় সিজদার পর এবং দাঁড়ানোর পূর্বে খানিকটা বসাকে জলসায়ে ইসতেরাহাত [আরামের জন্য বসা] বলে। এটা ইমাম শাফেয়ীর মতে সুন্নত, ইমাম আবূ হানীফার মতে সুন্নত নয়।

আর তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা হানাফীদের মতে শর্ত, আর ইমাম শাফেয়ী-এর মতে রোকন। নিয়তের কথা বলা হয়নি। কেননা নিয়ত সব আমলেই জরুরি এটা একটি স্বীকৃত বিষয়।

---

٧٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهٗ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا

৭৩৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ আরম্ভ করতেন তাকবীর সহকারে এবং কেরাত আরম্ভ করতেন আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন সহকারে। যখন রুকু করতেন মাথা বেশি জাগাতেন না এবং বেশি নিচুও করতেন না; বরং এর মাঝামাঝি রাখতেন। যখন রুকু হতে মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সেজদায়

وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهٰى اَنْ يَّفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

যেতেন না এবং সেজদা হতে যখন মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত [পুনরায়] সেজদায় যেতেন না এবং তিনি প্রতি দুই রাকাতে একবার আত্‌তাহিয়্যাতু পড়তেন, তারপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো নিতম্বের উপর বসতে [কুকুর-বৈঠক] নিষেধ করতেন এবং কোনো ব্যক্তিকে তাঁর নামাজে দুই হাত হিংস্র জন্তুর মতো বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন এবং সালাম সহকারে নামাজ শেষ করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজ শুরু করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, নবী করীম ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দ্বারা নামাজ শুরু করতেন, তা হলে বিসমিল্লাহ্ পড়া আবশ্যক কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নামাজ জাহ্‌রী হোক বা খফী (অর্থাৎ, যে নামাজে কেরাত চুপে চুপে শব্দবিহীন ভাবে পড়তে হয়) হোক, উভয় অবস্থায় বিসমিল্লাহ্ চুপে চুপে পড়া সুন্নত। তাঁর দলিল—

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ আউযু বিল্লাহ, বিস্‌মিল্লাহ এবং সুব্‌হানাকা নামাজের মধ্যে চুপে চুপে পড়তেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, নামাজের মধ্যে চারটি জিনিস চুপে চুপে পড়তে হয়। যথা– আউযু বিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্, হাম্‌দ [অর্থাৎ রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ], আমীন ও তাশাহহুদ [অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু]। হযরত আনাস হতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ : ইমাম মালেক ও আহমদ (র.) আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে বলেন যে, সূরায়ে ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ার আদৌ প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফেয়ী বলেন, জাহ্‌রী নামাজে বিস্‌মিল্লাহ্‌ও জাহ্‌রীভাবে পড়া সুন্নত। এ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

তাঁদের জবাবে হানাফীগণ বলেন : হুজুর ﷺ যে, কখনও কখনও বিসমিল্লাহ সরবে পড়েছেন তা আমরাও অস্বীকার করি না, তবে এটা তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম ছিল না। অবশ্য এটা জায়েজের প্রমাণ স্বরূপ অথবা সাহাবী তথা উম্মতের শিক্ষার জন্য করেছেন।

নামাজে বসার নিয়ম : মহানবী ﷺ -এর নামাজে বসার সাধারণ নিয়ম ছিল, উভয় বৈঠকের মধ্যে বাম পা বিছিয়ে তার পাতার উপর বসতেন এবং ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলো কেবলামুখী রেখে পায়ের মুড়ি ওপরের দিকে খাড়া করে রাখতেন। সাধারণত যেভাবে আমরা বসি। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মায্‌হাব মতে সুন্নত।

* ইমাম শাফেয়ী বলেন, প্রথম বৈঠকে এরূপ বসবে। কিন্তু যখন নামাজ দুই, তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, তখন শেষ বৈঠকে এরূপে বসা সুন্নত নয়, [অর্থাৎ যে নামাজে মাত্র একটি বৈঠক রয়েছে, তাতে এবং একাধিক বৈঠক বিশিষ্ট নামাজের শেষ বৈঠকে] বরং স্ত্রী লোকদের ন্যায় উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে বাম নিতম্বের উপর বসাই সুন্নত। পরবর্তী আবূ হুমাইদের হাদীসে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।
* ইমাম মালেক (র.) বলেন, উভয় বৈঠকেই মেয়েলোকের ন্যায় বাম নিতম্বের উপর বসা সুন্নত।
* ইমাম আহমদ (র.) তিন ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ইমাম শাফেয়ীর অভিমতের অনুকরণে এবং দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের অনুকরণে বসার অভিমত প্রকাশ করেন।

* আবূ হুমাইদের হাদীসে তথা ইমাম শাফেয়ী, মালেক প্রমুখের অভিমতের জবাবে ইমাম আবূ হানীফ (র.) বলেন, হুযূর ﷺ -এর নারীদের ন্যায় বসাটা হয়তো বার্ধক্যের কারণে কিংবা শারীরিক দুর্বলতা ক্লান্তির দরুনই হয়েছিল। আর তা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত নিজস্ব আ'মল। কিন্তু তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী বা হুকুম ছিল তা-ই, যা হানাফীগণ গ্রহণ করেছেন।

عُقْبَةُ الشَّيْطَانِ **বা শয়তানের ন্যায় [কুকুর বৈঠক] বসা** : শয়তানের বসা দু' ধরনের হতে পারে–

এক. উভয় পা খাড়া করে কটিদেশকে পায়ের গোড়ালির উপর রেখে বসা। এটা সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরূহ। তবে ইমাম নববী ও বায়হাকীর মতে দুই সেজদার মধ্যখানে এরূপে বসা মাকরূহ নয়।

দুই. নিতম্ব জমিনের উপর রেখে দুই হাঁটু খাড়া করে দুই হাত জমিনের উপর রেখে কুকুরের মতো বসা। এটাও সকলের মতে মাকরূহ। সালামের সাথে নামাজ শেষ করা ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব।

وَعَنْ ٧٣٦ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اِسْتَوٰى حَتّٰى يَعُوْدَ كُلُّ فِقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْأُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৩৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুমাইদ আস, সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একদল সাহাবীর মধ্যে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজ পড়া আপনাদের চেয়ে বেশি স্মরণ রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি যখন তিনি তাকবীর বলতেন, দুই হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকু করতেন তখন দুই হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠকে নত করে [পাছা ও ঘাড়ের বরাবর সোজা সমতল] রাখতেন। আর যখন রুকু হতে মাথা উত্তোলন করতেন তখন ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, যাতে পিঠের প্রতিটি হাড় [জোড়া] নিজ নিজ স্থানে পৌছে যায়। অতঃপর যখন সেজদা করতেন তখন দুই হাতকে জমিনের উপর এমনভাবে রাখতেন যাতে না মাটির সাথে বিছিয়ে থাকে, আর না পেটের সাথে মিশে থাকে এবং দুই পায়ের অঙ্গুলিসমূহের মাথাকে কেবলামুখী করে রাখতেন। অতঃপর যখন দুই রাকাতের পরে বসতেন, তখন বাম পায়ের পাতার উপর বসতেন এবং ডান পা-কে খাড়া রাখতেন। আর যখন শেষ রাকাতে বসতেন তখন বাম পা ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং ডান পা যথারীতি খাড়া রাখতেন এবং নিতম্বের উপর বসতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ مِقْدَارِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ **উভয় হাত উত্তোলনের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ** : তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত কতটুকু পর্যন্ত উঠাতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে—

مَذْهَبُ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) -এর মতে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হবে। তাঁদের দলিল হলো—

١ - عَنِ ابْنِ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ

٢ ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ـ

رَأْىُ اِبْنِ الْحَبِيْبِ : ইবনে হাবীবের মতে হাতকে মাথার উপরে যতটুকু সম্ভব ততটুকু পর্যন্ত উঠাবে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ـ (طَحَاوِىْ)

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে পুরুষ কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে আর মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, তাঁর দলিল হলো–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِاِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شُحْمَةِ اُذُنَيْهِ ـ (رَوَاهُ الطَّحَاوِىْ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তিন ইমামের হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, তাঁদের হাদীস আমাদের মতের বিপরীত নয়। কেননা, বৃদ্ধাঙ্গুলি شُحْمَةَ الْاُذُنَيْنِ -এর নিকটবর্তী করা হলে হাতের তালু কাঁধ বরাবর হয়।

---

৭৩৭ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শুরু করার সময় দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপভাবে হাত উঠাতেন, এবং সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন; কিন্তু তিনি সেজদায় এরূপ করতেন না। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উভয় হাত উত্তোলন সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে মাথা উঠিয়ে উভয় হাত উত্তোলন করতে হবে কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

১. مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে رَفْعِ يَدَيْنِ করা সুন্নত ও উত্তম। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا قَضٰى قِرَاءَتَهُ وَاِذَا اَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا فَرَغَ وَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ ـ (طَحَاوِىْ)

২. مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন ও সুফিয়ান ছাওরীর মতে رَفْعِ يَدَيْنِ সুন্নত নয়; এটা না করাই উত্তম। তাঁদের দলিল হচ্ছে এই—

١ ـ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

٢ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِاِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شُحْمَتَىْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ (رَوَاهُ الطَّحَاوِىْ)

* অপরদিকে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাজে নড়াচড়া কম করা; رَفْعِ يَدَيْنِ -এর মধ্যে নড়াচড়া বেশি হয় তাই এটি বর্জন করাই উত্তম।

* اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّتِهِمْ : ইমামদ্বয়ের পেশকৃত হাদীসগুলোর জবাবে বলা হয়—

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে اِضْطِرَابْ রয়েছে।

১. আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী 'আল-জাওহারুন নাকী' গ্রন্থ বলেন ইবনে ওমর (রা.)-এর প্রথম হাদীসে একটি অতিরিক্ত অংশ আছে "هِىَ الرَّفْعُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ" অথচ তাঁরা এখানে رَفْع يَدَيْن -কে মানে না। এ ক্ষেত্রে عَدَمْ رَفْع -এর ব্যাপারে তারা যে উত্তর দেবেন আমরাও رُكُوْع ও رَفْع رَأْس -এর মধ্যে عَدَمْ رَفْع -এর একই উত্তর দেব।

২. হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে এর বিপরীত আমল পাওয়া যায়—

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلاَّ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى .

৩. অথবা, رَفْع يَدَيْن প্রথম যুগে ছিল, পরে মনসূখ হয়ে গেছে।

৪. অথবা, হুজুর ﷺ بَيَانْ جَوَازْ -এর জন্য رَفْع يَدَيْن করেছেন।

৫. দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আলী তার বিপরীত আমল করেছেন। যেমন–

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا (رض) كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ . (طَحَاوِىْ)

* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরীর মতে رَفْع يَدَيْن করা ও না করা উভয়টি জায়েজ এবং মুসল্লীর ইচ্ছাধীন।

وَعَنْ ٧٣٨ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ رَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭৩৮. অনুবাদ : হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যখন নামাজ আরম্ভ করতেন দুই হাত উঠিয়ে তাক্বীর বলতেন, আর যখন রুকু করতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন, যখন দু' রাকাত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এ হাদীসকে নবী করীম ﷺ পর্যন্ত মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ **তাসমী' ও তাহমীদ সম্পর্কে মতভেদ :** তাসমী' এবং তাহমীদ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আলোচ্য হাদীসটি একাকী যে নামাজ পড়ে তার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ একাকী যে নামাজ পড়ে সে রুকু হতে উঠার সময় তাসমী' [সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্] ও তাহমীদ [রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ] উভয়টিই বলবে, যদি জামাতে নামাজ হয় তবে ইমাম তাসমী' বলবে এবং মুক্তাদি তাহমীদ বলবে। কেননা, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখনই ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে তখন মুক্তাদিগণ বলবে, রাব্বানা লাকাল হামদ। সাহেবাইনের মতে ইমাম তাসমী' ও তাহমীদ দু'টিই বলবে। তাসমী' প্রকাশ্যে বলবে এবং তাহমীদ চুপে চুপে বলবে। আর মুক্তাদি শুধুমাত্র তাহমীদ বলবে। ইমাম ত্বাহাবীও এ মতই গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার অন্য একটি বর্ণনাও এরূপ। ইমাম শাফেয়ীর মতে ইমাম মুক্তাদি প্রত্যেকেরই তাসমী' ও তাহমীদ দু'টাই বলতে হবে।

وَعَنْ ٧٣٩ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىْ بِهِمَا اُذُنَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৩৯. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীরে তাহ্রীমা বলতেন, তখন দুই হাত তাঁর কান পর্যন্ত উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা তুলতেন তখন বলতেন, সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ: তখনও ঐরূপ করতেন [অর্থাৎ হাত উঠাতেন]। অপর এক বর্ণনায় আছে, এমনকি দুই হাত দুই কানের লতি পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٧٤٠ اَنَّهٗ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فَاِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلٰوتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭৪০. অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ﷺ -কে নামাজ পড়তে দেখেছেন যখন তিনি তাঁর বেজোড় রাকাত হতে দাঁড়াতে যেতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দাঁড়াতেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ جَلْسَةِ الْاِسْتِرَاحَةِ জলসায়ে ইসতেরাহাত সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য : প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সেজদার পর দাঁড়ানোর পূর্বে খানিকটা বসাকে জালসায়ে ইসতেরাহাত বলে। এটা জায়েজ আছে কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ীর মতে এবং ইমাম আহমদের এক রিওয়ায়াত মতে এ সময় খানিকটা বসা সুন্নত। গমায়ের মুকাল্লিদগণও এরূপ আমল করে থাকেন। তারা উক্ত হাদীস হতেই দলিল গ্রহণ করেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالثَّوْرِىِّ وَالْاَوْزَعِىِّ وَغَيْرِهٖ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, আওযায়ী, ইসহাক ও অন্যান্য হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, 'জল্সায়ে ইস্তেরাহাত' সুন্নত নয়। ইমাম আহ্মদের দ্বিতীয় রিওয়ায়াত মতে 'জলসায়ে ইস্তেরাহাত' না করাই উচিত। তাঁদের দলিল হলো—

১. ইমাম তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী ﷺ বেজোড় রাকাতের পর সোজাসুজি পায়ের মুড়ির উপর দাঁড়িয়ে যেতেন। অর্থাৎ সেজদার পর বসতেন না।

২. ইমাম ত্বাহাবী বলেছেন, হুজূর ﷺ কোনো বিশেষ ওজরের দরুন বসেছেন। যেমন– তিনি হয়তো শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করেছেন অথবা বার্ধক্য জনিত দুর্বলতার দরুন কখনও কখনও বসেছেন।

৩. 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে' বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন। ইমাম শা'বী বলেন, হযরত ওমর, আলী এবং অন্যান্য প্রথম সারির প্রবীণ সাহাবীগণও না বসে সরাসরি দাঁড়িয়ে যেতেন।

৪. আল্লামা শামসুল আয়েম্মা হুলওয়ানী হানাফী বলেন, হানাফী ও শাফেয়ীর এ মতবিরোধ উত্তমতা সম্পর্কে। এমনকি যদি কোনো শাফেয়ী আমাদের ন্যায় না বসে নামাজ সম্পাদন করে, তা হলে শাফেয়ী ওলামাগণ এটা আপত্তিকর বলে মনে করেন না। এরূপে আমরাও যদি তাদের ন্যায় আমল করি তাতেও আপত্তির কিছুই নেই। এতে বুঝা গেল যে, উভয়টাই রাসূল ﷺ-এর সুন্নত, অর্থাৎ মহানবী ﷺ কখনও বসেছেন, আবার কখনও বসেননি। ফলে উভয় রকমের হাদীসের মধ্যে আর কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

وَعَنْ ٧٤١ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৪১. **অনুবাদ :** হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছেন যে, তিনি যখন তাকবীর বলে নামাজে প্রবেশ করলেন তখন দু' হাত উঠালেন। অতঃপর নিজ কাপড় দ্বারা উভয় হাত ঢাকলেন, তারপর ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখলেন। আর যখন রুকুতে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন কাপড়ের মধ্য হতে হস্তদ্বয় বের করলেন অতঃপর হাত উপরে উঠালেন এবং তাকবীর [আল্লাহু আকবার] বললেন এবং রুকু করলেন। আর যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন তখন দু' হাত উঠালেন, অতঃপর যখন সেজদা করলেন, দুই হাতের [পাতার] মধ্যখানে করলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, শীতের সময় হাত কাপড়ের ভিতর রাখা জায়েজ। তবে হাত কাপড়ের ভিতরে থাকলে তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষ লোকের কাপড়ের নিচ থেকে হাত বের করে উত্তোলন করা উত্তম। সম্ভবত শীতের কারণে রাসূল ﷺ হাত মুবারক চাদরের ভিতর ঢুকিয়ে ছিলেন। আর রাবী নামাজের বাইরে থেকে রাসূল ﷺ -এর আমল প্রত্যক্ষ করছিলেন।

اَلْإِخْتِلَافُ فِيْ مَكَانِ وَضْعِ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ হাতের উপর হাত রাখার স্থান সম্পর্কে মতভেদ : ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার ব্যাপারে যদিও সকল ইমাম একমত, তবে হস্তদ্বয় কোথায় রাখবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন ইমাম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কোনো হাদীসে রাসূল ﷺ হস্তদ্বয় সিনার নিকটে, আবার কোনো কোনো হাদীসে নাভির নিচে রেখেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

অতএব ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সিনার নিকটে রাখাই উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নাভির নিচে রাখাতেই অধিক আদবের কাজ।

ইমাম মালেক (র)-এর মতে হাত নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখাই শ্রেয়। মোটকথা, সবই রাসূলের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে হাত বাঁধতেন।

وَعَنْ ٧٤٢ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِي الصَّلٰوةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৪২. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, [রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে] লোকদেরকে আদেশ করা হতো যেন তারা নামাজের মধ্যে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٧٤٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ

৭৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন তখন তাক্বীর [আল্লাহু আকবার] বলতেন। অতঃপর রুকু করার সময়ও 'আল্লাহু আকবার'

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهٗ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا حَتّٰى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বলতেন এবং রুকু হতে পিঠ সোজা করে উঠবার সময় 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তৎপর দাঁড়িয়ে বলতেন 'রাব্বানা লাকাল হামদ', অতঃপর যখন নিচের দিকে ঝুঁকতেন অর্থাৎ সেজদায় যেতেন তখন তাক্‌বীর বলতেন। আবার সেজদা হতে মাথা তুলবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। অতঃপর [পুনরায়] তাক্‌বীর বলে সেজদায় যেতেন এবং মাথা উঠানোর সময় তাক্‌বীর বলতেন। এভাবে তিনি নামাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত পুরো নামাজেই এরূপ করতেন। আর দুই রাকাত নামাজ পড়ে বৈঠক শেষে যখন দাঁড়াতেন তখনও আল্লাহু আকবার বলতেন। –বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٧٤٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ. (رواه مسلم)

৭৪৪. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– উত্তম নামাজ তাই যাতে কুনূত [অর্থাৎ দাঁড়ানো] দীর্ঘ হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : (اَلْقُنُوْتُ) কুনূত শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। হাদীস বিশারদদের মতে এখানে কুনূত অর্থ– দাঁড়ানো। যে নামাজে বেশি দাঁড়ানো হয়, অর্থাৎ অধিক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করা হয় এটাই উত্তম নামাজ। এর অন্যান্য অর্থ যেমন বশ্যতা, বিনয়, দোয়া, মৌনতা ইত্যাদিও সামগ্রিকভাবে নামাজে প্রয়োগ হওয়ার অর্থ হতে পারে। কারণ, এ সবগুলো গুণের সমাবেশ যে নামাজে তা-ই উত্তম নামাজ। অপর এক হাদীসে আছে যে, 'যখন বান্দা সেজদাতে যায় তখন আল্লাহর অতি নিকটে হয়।' এতে কেউ কেউ সেজদাকেই নামাজের উত্তম অংশ বলেন। অবশ্য কেউ কেউ উভয় হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান এভাবে করেন যে, দিনের নামাজে সেজ্‌দা এবং রাতের নামাজে কিয়াম দীর্ঘ করাই উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٤٥ اَبِىْ حُمَيْدِ السَّاعِدِىِّ (رضـ) قَالَ فِىْ عَشَرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ

৭৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুমাইদ আস সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দশজন সাহাবীর মধ্যে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ সম্পর্কে আপনাদের চেয়েও বেশি অবগত। তাঁরা বললেন, তা হলে আপনি বলুন! তিনি বললেন, যখন নবী করীম ﷺ নামাজের জন্য দাঁড়াতেন, নিজ দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন তারপর আল্লাহু আকবার বলতেন, অতঃপর কেরাত পাঠ করতেন, তারপর তাকবীর বলে দুই

يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّىْ رَأْسَهٗ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِىْ اِلَى الْاَرْضِ سَاجِدًا فَيُجَافِىْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهٖ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهٖ ثُمَّ يَنْهَضُ ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِىْ بَقِيَّةِ صَلٰوتِهٖ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالدَّارِمِىُّ وَ رَوَى التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর রুকুতে যেতেন এবং দুই হাতের করকে দু' হাঁটুর উপরে রাখতেন এবং কোমরকে সোজা [সমান্তরাল] রাখতেন, মাথা নিচের দিকে ঝুঁকাতেন না এবং উপরের দিকেও উঁচু করতেন না। অত:পর মাথা উঠাতেন এবং বলতেন, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' অতঃপর সোজা হয়ে দু' হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে জমিনের দিকে সেজদায় নত হতেন, আর দু' হাতকে দু' পার্শ্ব হতে আলাদা রাখতেন এবং দু' পায়ের অঙ্গুলিসমূহকে [কেবলার দিকে] খুলে রাখতেন, অতঃপর [সেজদা হতে] মাথা উঠাতেন এবং বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন, তারপর সোজা হয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর জোড়ার প্রত্যেকটি হাড় স্বস্থানে ঠিক ঠিক মতো ফিরে আসতো। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদায় যেতেন। আর 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং মাথা উঠাতেন, আর বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন। এমনভাবে সোজা হয়ে বসতেন যে, তাঁর সমস্ত জোড়ার হাড়গুলো স্বস্থলে ফিরে আসে। অতঃপর দ্বিতীয় সেজদায় যেতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং মাথা উঠাতে উঠাতে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন। এ সময় এমনভাবে সোজা হয়ে বসতেন যে, তাঁর সমস্ত গ্রন্থির জোড়াগুলো স্ব-স্ব স্থলে ফিরে আসতো। অতঃপর দাঁড়াতেন এবং দ্বিতীয় রাকাতেও এরূপ করতেন। অতঃপর যখন দু' রাকাত পড়ে দাঁড়াতেন তখনও তাক্বীর বলতেন এবং দুই হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন, যেভাবে নামাজ শুরু করতে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর অবশিষ্ট নামাজে এরূপ করতেন। অবশেষে যখন শেষ সেজদায় যেতেন যার পর সালাম ফিরাতে হয়, তাঁর বাম পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর চেপে বসতেন, এরপর সালাম ফিরাতেন। এটা শুনে তাঁরা বলে উঠলেন আপনি সত্য বলেছেন, মহানবী ﷺ এরূপ নামাজ পড়েছেন।–[আবূ দাউদ ও

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ حُمَيْدٍ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْنِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَ وَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَقَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْأَرْضَ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ وَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلٰى شَىْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ وَ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهٖ يَعْنِى السَّبَّابَةَ وَفِىْ أُخْرٰى لَهُ وَإِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَإِذَا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ أَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

দারেমী] তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এরূপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় আবূ হুমাইদের হাদীসে এটাও আছে যে, অতঃপর রাসূল ﷺ রুকু করতেন এবং তাঁর দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন যেন হাঁটুদ্বয়কে শক্ত করে ধরে রেখেছেন এবং ধনুকের 'জ্যা' এর মতো দুই হাতকে করতেন এবং পাঁজর হতে দূরে রাখতেন। রাবী বলেন যে, অতঃপর তিনি সেজদা করতেন এবং নাক ও কপালকে উত্তমরূপে মাটিতে লাগাতেন এবং দুই হাত পাঁজর হতে দূরে রাখতেন এবং দুই হাত (করদ্বয়) মাটিতে দুই কাঁধ বরাবর স্থাপন করতেন। আর দুই উরুকে খোলা রাখতেন, পেটের সাথে ঠেকাতেন না। এভাবে তিনি সেজদা শেষ করতেন, অতঃপর বসতেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের সম্মুখ ভাগকে কেব্‌লার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন এবং ডান করকে ডান হাঁটুর উপর বাম করকে বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা অর্থাৎ অনামিকা দ্বারা ইঙ্গিত করতেন। আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে, যখন তিনি দ্বিতীয় রাকাতে বসতেন, তখন বাম পায়ের পেটের উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন এবং যখন তিনি চতুর্থ রাকাতে যেতেন বাম নিতম্বকে জমিনে লাগিয়ে বসতেন এবং দুই পা একদিকে [ডানদিকে] বের করে দিতেন।

وَعَنْ ٧٤٦ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضـ) أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلٰى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ ـ

৭৪৬. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছেন যখন তিনি নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন, তিনি তাঁর দুই হাত উপরে উঠালেন যাতে তা কাঁধ সমান হলো এবং তিনি দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই কান বরাবর করলেন এবং তাক্‌বীর বললেন। -[আবূ দাউদ]

আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই কানের লতি পর্যন্ত উঠালেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفِيَّةُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ وَالْجَلْسَةِ **শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা ও বসার নিয়ম :** শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করার অর্থ– 'লা ইলাহা' বলার সময় অঙ্গুলি উপরের দিকে উঠালেন এবং 'ইল্লাল্লাহু' বলবার সময় নিচের দিকে নামালেন। এরূপ করা মোস্তাহাব। 'দুই পা একদিকে বের করে দিলেন' এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শেষ বৈঠকের নিয়ম সম্পর্কে হাদীসে তিন প্রকারের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে এবং সকল প্রকারই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত।

১. বাম পায়ের পেটের উপর বসবে এবং ডান পায়ের মুড়ি খাড়া রেখে অঙ্গুলিসমূহকে কেব্‌লামুখী রাখবে। হানাফীগণ পুরুষদের জন্য এটাই উত্তম মনে করেন।

২. বাম পায়ের পাতা আগে বাড়িয়ে দিয়ে নিতম্বের উপর চেপে বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। শাফেয়ীগণ একেই উত্তম মনে করেন।

৩. উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর চেপে বসা, অর্থাৎ বাম কটিদেশ মাটির সাথে লাগিয়ে বসা। হানাফীদের মতে এ পদ্ধতি মহিলাদের জন্য উত্তম। উল্লেখ্য যে, এ মতভেদ শুধু উত্তমতা সম্পর্কে, তবে সবক'টি পদ্ধতি সকলের মতে জায়েজ।

وَعَنْ ٧٤٧ قُبَيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৭৪৭. অনুবাদ : হযরত কাবীসা ইবনে হুল্‌ব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমামতি করতেন এবং [দাঁড়ানো অবস্থায়] বাম হাত [এর কব্জি]-কে ডান হাত দ্বারা ধরতেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٧٤٨ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعِدْ صَلٰوتَكَ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اُصَلِّىْ قَالَ اِذَا تَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ فَاِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَمَكِّنْ رُكُوْعَكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاَقِمْ صُلْبَكَ وَ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَرْجِعَ الْعِظَامُ اِلٰى مَفَاصِلِهَا فَاِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلسُّجُوْدِ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلٰى

৭৪৮. অনুবাদ : হযরত রিফা'আহ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নামাজ পড়ল। অতঃপর অগ্রসর হয়ে নবী করীম ﷺ-কে সালাম করল। মহানবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার নামাজ পুনরায় পড়ো। কেননা, তুমি নামাজ পড়নি। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কিভাবে নামাজ পড়ব, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হুজুর ﷺ বললেন, যখন তুমি কেব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়াবে প্রথমে তাকবীর বলবে, তারপর সূরায়ে ফাতিহা পড়বে এবং এর সাথে আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি যা পাঠ করতে পার তা পাঠ করবে। অতঃপর যখন রুকু করবে তখন দু' হাতের করদ্বয় দু' হাঁটুর উপরে রাখবে এবং রুকুতে বহাল অবস্থায় স্থির থাকবে, আর পিটকে সঠান রাখবে। অতঃপর যখন রুকু হতে উঠবে পিঠকে সোজা রাখবে এবং মাথাকে এমনভাবে উঠাবে যাতে হাড়সমূহ নিজ নিজ স্থানে পৌছে যায়। অতঃপর যখন সেজদা করবে, সেজদাতে স্থির থাকবে আবার যখন সেজদা হতে উঠে বসবে তখন বাম উরুর উপরে বসবে। অতঃপর প্রত্যেক রুকু ও সেজদাতে এরূপ করতে

فَخِذِكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ اصْنَعْ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ ـ (هٰذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْحِ وَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ وَ رَوَى التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ مَعْنَاهُ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ بِهٖ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ وَاِلَّا فَاحْمِدِ اللّٰهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ ـ

থাকবে, অবশেষে ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করবে। এটা 'মাসাবীহ'-এর বাক্য। আবূ দাউদ কিছুটা পরিবর্তন সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ এরই অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযীর অপর বর্ণনায় আছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, যখন তুমি নামাজের জন্য দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, তখন অজু করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাকে আদেশ করেছেন, অতঃপর 'কালিমায়ে শাহাদাত' পড়বে [অর্থাৎ, আযান দেবে] তৎপর একামত বলবে এবং নামাজ আরম্ভ করবে, আর যদি কুরআনের কিছু জানা থাকে তা হতে পাঠ করবে, অন্যথা কিছু হাম্দ, তাকবীর ও তাহ্লীল পাঠ করবে তারপর রুকু করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন জানা না থাকলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসূচক কিছু বাক্য যথা– اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ ـ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ইত্যাদি পাঠ করলেও নামাজ শুদ্ধ হবে। এ মাসআলাটি নতুন মুসলমানদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। তবে তাড়াতাড়ি কুরআন শিখার চেষ্টা করতে হবে। আর এখানে رَجُلٌ দ্বারা খাল্লাদ ইবনে রাফে' উদ্দেশ্য অর্থাৎ رِفَاعَه-এর ভাই। ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ الخ অর্থাৎ নামাজ পড়ে হক্কুল্লাহ্ আগে আদায় করেছেন। আর সালাম তথা হক্কে মাখলূক পরবর্তীতে আদায় করেছেন।

٧٤٩ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهَّدٌ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشُّعٌ وَتَضَرُّعٌ وَتَمَسْكُنٌ ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُوْلُ : تَرْفَعُهُمَا اِلٰى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَهُوَ خِدَاجٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৭৪৯. অনুবাদ : হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [নফল] নামাজ দু' দু' রাকাত করে আদায় করা শ্রেয়। প্রত্যেক দু'রাকাতে তাশাহহুদ রয়েছে। আর নামাজ আদায় করতে হবে একাগ্রতা, বিনয় ও দীন- হীনতার সাথে। অতঃপর তোমার হাতদ্বয় উত্তোলন করবে। বর্ণনাকারী বলেন, হাতদ্বয় উত্তোলন করার মর্ম হলো– তুমি দোয়ার জন্য তোমার প্রতিপালকের দিকে এমনভাবে হাতদ্বয় উত্তোলন করবে যেন উভয় হাতের তালু তোমার মুখের সম্মুখে থাকে। অতঃপর তুমি বলবে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! ...... যে ব্যক্তি এরূপ করে না, সে অর্থাৎ, তার নামাজ এরূপ এরূপ। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তার নামাজ অসম্পূর্ণ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ تِعْدَادِ الرَّكْعَةِ النَّافِلَةِ **নফল নামাজের রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ :** নফল নামাজ কয় রাকাত করে পড়া উত্তম, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নফল নামাজ দু' রাকাত করে পড়া উত্তম। তিনি আলোচ্য হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

مَذْهَبُ أَبِي حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চার চার রাকাত করে পড়া উত্তম, দিনে হোক কিংবা রাতে হোক। সাহেবাইন [আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ] বলেন, রাতে দু' দু' রাকাত করে এবং দিনে চার চার রাকাত করে পড়াই উত্তম। তাঁরা তারাবীহ নামাজের উপর কিয়াস করেন। কারণ, তারাবীহ নামাজ দু' দু' রাকাত করে পড়া উত্তম। তাঁদের মতে রাতের নফল নামাজও দু' দু' রাকাত করে পড়া উত্তম হবে। দিনে চার চার রাকাত বলার কারণ একই, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) বর্ণনা করেছেন।

دَلِيْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নিম্নলিখিত কারণে চার চার রাকাত করে নফল নামাজ পড়া উত্তম। সহীহ হাদীস দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ এশার নামাজের পরে একই নিয়তে চার রাকাত পড়তেন এবং চাশতের নামাজও এক সঙ্গে চার রাকাত পড়তেন। এ ছাড়া এক নিয়তে চার রাকাত নামাজ পড়া বেশি কষ্টসাধ্য। সুতরাং যে ইবাদত বেশি কষ্টসাধ্য তাতে ছওয়াবও বেশি হওয়ার কথা। সুতরাং চার রাকাত পড়া উত্তম।

جَوَابُ دَلِيْلِ الشَّافِعِيِّ : ইমাম শাফেয়ীর পেশকৃত দলিলের জবাব ইমাম আবূ হানীফা (র.) এভাবে প্রদান করেন যে, আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর বাণী اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى কথার অর্থ হলো, নফল নামাজ এক রাকাত এক রাকাত হয় না; বরং নফলের নিম্নতম স্তর হলো দুই রাকাত।

অথবা অর্থ এই যে, নফল নামাজের দু' রাকাত করে এক এক জোড়া আছে। তাই বলে দু' দু' রাকাত করে পড়া উত্তম– এ কথা নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য নয়।

اَلْخُشُوْعُ ও اَلْخُضُوْعُ-**এর মধ্যকার পার্থক্য** : আলোচ্য শব্দদ্বয়ের অর্থের ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে—

১. কতিপয় আলিমের মতে শব্দ দু'টি সমার্থবোধক। তবে خُشُوْع অর্থ– দৈহিক বিনয় এবং خُضُوْع অর্থ– চক্ষু, স্বর, ধ্বনি ইত্যাদির মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করা।
২. আবার কারো মতে خُشُوْع অর্থ হলো– আভ্যন্তরীণ বিনয় এবং خُضُوْع অর্থ হলো– বাহ্যিক বিনয়।
৩. ইমাম ইবনুল মালিকের মতে যে বিষয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করে, তাকে خُشُوْع বলা হয় এবং নামাজে পূর্ণ একাগ্রতাকে خُضُوْع বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٧٥٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلّٰى (رحـ) قَالَ صَلّٰى لَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ (رضـ) فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৭৫০. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে হারেস ইবনে মুআল্লা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) আমাদের নামাজ পড়ালেন। তিনি যখন সেজদা হতে মাথা উঠালেন, যখন সেজদা করলেন এবং দু' রাকাতের পর মাথা উত্তোলন করলেন উচ্চৈঃস্বরে তাক্বীর [আল্লাহু আকবার] বললেন। অতঃপর বললেন, আমি মহানবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে তিন স্থানে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলার কথা আলোচিত হয়েছে, আর এ তিন স্থানের উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা সুন্নত কি না? এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে। তবে ইমামের জন্য তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলা সুন্নত। আর একাকী নামাজির জন্য স্বরবে বা নীরবে তাকবীর বলার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে।

وَعَنْ ٧٥١ عِكْرِمَةَ (رح) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَ عِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৭৫১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মক্কায় এক বৃদ্ধের পিছনে নামাজ পড়েছি: তিনি মোট বাইশ বার তাকবীর বলেছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বললাম, লোকটি বোকা বটে: এটা শুনে তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হালাক করুক অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও। এটা তো আবুল কাসেম [নবী করীম] ﷺ -এর সুন্নত [পদ্ধতি]। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত বৃদ্ধ কে এবং তাকে কিভাবে আহমক বলা হলো : মক্কার বৃদ্ধ বলতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর কথা বুঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে আহমক বলার দ্বারা তা গালি অর্থে ব্যবহার হয়নি। এটা একটি আরবদের সামাজিক প্রথা বা রেওয়াজ মাফিক প্রবাদ বাক্য। কোনো কিছুর প্রতি গুরুত্ব প্রদান, চমক সৃষ্টি, বিরাগ প্রদর্শন ও বিস্ময় প্রকাশার্থে এ বাক্যগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এটা একটি বাগধারা। অভিসম্পাত কিংবা ঘৃণা প্রকাশ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বলা হয় না। 'তোমার মা তোমাকে হারাক' এটাও এরূপ একটি তিরস্কারসূচক বাক্য।

চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের তাকবীরের সংখ্যা : বনি উমাইয়্যার শাসনামলে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার নিয়ম পরিত্যাগ করা হয়েছিল। হযরত ইকরিমা তাকবীর বলার নিয়ম হতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এ মাশ্হুর ও প্রসিদ্ধ কথাটি তিনি কেন জানতেন না? আশ্চর্যবোধ করে ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে তিরস্কার করেছেন। তাকবীরে তাহরীমাসহ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের তাকবীর সংখ্যা বাইশ বারই হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٧٥٢ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (رض) مُرْسَلًا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الصَّلٰوةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَ رَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوتَهُ ﷺ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৭৫২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আলী ইবনে হুসাইন (র.) মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, যখন মাথা নত করতেন এবং মাথা উঠাতেন। নবী করীম ﷺ -এর নামাজ সর্বদা এরূপই ছিল যতক্ষণ না তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। –[মালিক]

وَعَنْ ٧٥٣ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرِ الْاِفْتِتَاحِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَقَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا الْمَعْنٰى)

৭৫৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আলকামাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আমাদেরকে বললেন, আমি কী তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মতো নামাজ পড়ে দেখাব না? অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন, অথচ নামাজ আরম্ভ করা কালীন তাকবীর বলার সময় একবার ব্যতীত আর হস্তদ্বয় উঠালেন না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। আবূ দাউদ বলেন, এ অর্থে হাদীসটি সহীহ নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** তাকবীরে তাহরীমার সময় ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় হাত উত্তোলনের ব্যাপারে ইমামদের ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা ৭৩৭ নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

وَعَنْ ٧٥٤ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ إِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৭৫৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুমায়দ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখন কেবলামুখী হতেন এবং দুই হাত উত্তোলন করে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। -[ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ٧٥٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ وَفِيْ مُؤَخَّرِ الصُّفُوْفِ رَجُلٌ فَاَسَاءَ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا فُلَانُ اَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ اَلَا تَرٰى كَيْفَ تُصَلِّيْ اِنَّكُمْ تَرَوْنَ اَنَّهُ يَخْفٰى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُوْنَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرٰى مِنْ خَلْفِيْ كَمَا اَرٰى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ . (رواه احمد)

৭৫৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের নামাজ পড়ালেন, তখন এক ব্যক্তি সর্ব পিছনের সারিতে ছিল এবং খারাপভাবে নামাজ পড়ছিল। যখন সে নামাজে সালাম ফিরাল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন, হে অমুক! তুমি আল্লাহকে ভয় করো না? দেখো না তুমি কিরূপে নামাজ পড়? তোমরা মনে কর যে, তোমরা যা করো তা আমার নিকট অজ্ঞাত থাকে; আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি দেখি আমার পিছন দিকে, যেভাবে দেখি আমার সম্মুখ দিকে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের দ্বন্দ্ব ও সমাধান : আলোচ্য হাদীসে اِنِّيْ لَاَرٰى مِنْ خَلْفِيْ প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ অদৃশ্য বস্তুও দেখতে পান। পক্ষান্তরে অপরে হাদীস لَا اَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِيْ প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ অদৃশ্য বস্তু দেখতে পান না।

উভয় হাদীসের মধ্যে সমাধান এভাবে দেওয়া হয়েছে যে,

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর মু'জিযার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ ওহি ও এলহাম দ্বারা অদৃশ্যের খবর রাখেন। আর لَا اَعْلَمُ وَرَاءَ جِدَارِيْ-এর অর্থ হলো ওহি ও এলহাম ব্যতীত আমি দেয়ালের অপর দিকের খবর বলতে পারি না।

২. অথবা হতে পারে যে, আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে নামাজের মধ্যকার কথা বলা হয়েছে এবং অন্যান্য হাদীসে নামাজের বাইরের কথা বলা হয়েছে। পার্থক্যের কারণ এই যে, নামাজের অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে একাগ্রতা ও একাকীত্বের অবস্থা হয়। সে সময় জাগতিক সমগ্র ধ্যান-ধারণা হতে এক দিক হয়ে রাব্বুল ইজ্জত আল্লাহ তা'আলার নূরসমূহ দেখায় নিমগ্ন থাকার কারণে সৃষ্টির রহস্য বেশি উদ্ঘাটিত ও দীপ্তিমান হয়। তখন তিনি যেভাবে সামনের জিনিস দেখতেন তেমনিভাবে পিছনের জিনিসও দেখতেন; কিন্তু নামাজের বাইরের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

মহানবী ﷺ কি গায়েব জানতেন ? : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কেবলমাত্র আল্লাহ্ই গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। কোনো নবী-রাসূল কিংবা আল্লাহ্র সৃষ্ট কোনো মাখলুক গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত নয়; বরং এমন কিছু আকিদা রাখা বা তাদেরকে 'আলেমুল গায়েব মনে করা শিরক। আল্লাহ্র কালামে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ গায়েব জানতেন না। হাদীসেও এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। অবশ্য মহানবী ﷺ হতে কোনো কাজ বা তাঁর কোনো কোনো কথা হতে বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি গায়েব জানতেন। বস্তুত তা হয়েছিল ওহি বা এল্হামের দ্বারা। আল্লাহ্ তা'আলা ওহি ও এল্হামের দ্বারাই কোনো কোনো গায়েবী ইল্ম তাঁকে দান করেছিলেন। সুতরাং যারা এ ধারণা ও আকিদা রাখে যে, তিনি সরাসরি গায়েব জানতেন, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও গোম্রাহী।

بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

পরিচ্ছেদ : তাকবীরে তাহরীমার পর যা পড়তে হয়

ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, নবী করীম ﷺ নামাজের ভিতরে বা বাইরে যে সব দোয়া পড়েছেন, শরিয়তের পরিভাষায় এসব দোয়াগুলোকে دُعَائِے مَاثُوْرَہ [দোয়ায়ে মাছূরা] বলা হয়। তাকবীরে তাহরীমার পর এবং সূরা ফাতিহার পূর্বে পড়ার জন্য হাদীসে বিভিন্ন দোয়ায়ে মাছূরার উল্লেখ রয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করেছেন। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে ফরজ বা নফল সব নামাজেই ঐ সমস্ত দোয়ার কোনো একটি বা একাধিক পড়লে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। আর হানাফীদের মতে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ দোয়া দ্বারা নামাজ আরম্ভ করতে হবে এবং অন্য সকল দোয়া নফল নামাজের জন্য প্রযোজ্য। তবে ফরজ নামাজে অন্যান্য দোয়া পড়তে চাইলে তাশাহহুদের পরে পড়তে পারবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٥٦ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাত পাঠের মধ্যে কিছু সময় নীরব থাকতেন। একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা ও মা আপনার প্রতি উৎসর্গীকৃত হোক। আপনি তাক্‌বীরে তাহরীমা ও কেরাত পাঠের মধ্যখানে নীরব থাকেন, এতে কি পাঠ করেন? তিনি বললেন, আমি বলি 'হে আল্লাহ তুমি আমার এবং আমার পাপসমূহের মধ্যে ব্যবধান করে দাও, যেভাবে তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছ। হে আল্লাহ! পাপ হতে আমাকে নির্মল রাখ, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে নির্মল রাখা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপসমূহকে পানি, বরফ এবং বারিধারায় ধুয়ে ফেল।' –[বুখারী মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাকবীর ও কেরাতের মধ্যে দোয়া পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : তাকবীরে তাহরীমা ও কেরাতের মধ্যখানে দোয়া পড়ার হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ— ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা' পড়াই সুন্নত। যদিও সহীহ্ হাদীসে অন্যান্য দোয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আহ্মদ ও মালেক (র.)-এর প্রকাশ্য মাযহাবও এরূপ।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, 'সুবহানাকা ও ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু' উভয়টি পড়া সুন্নত। এটা ব্যতীত অন্যান্য দোয়াসমূহ তাহাজ্জুদ ও নফল ইত্যাদিতে পড়া সুন্নত। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে মহানবী ﷺ ফরজ নামাজেও অন্যান্য 'দোয়ায়ে মাছূরা' পাঠ করেছেন এবং পরবর্তীকালে উম্মতকে শিক্ষা দানের জন্য কখনও কখনও ফরজ নামাজেও অন্যান্য দোয়া পাঠ করেছেন।

৭৫৭ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ فَإِذَا رَفَعَ

৭৫৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন নামাজে দাঁড়াতেন, অন্য বর্ণনায় আছে যখন নামাজ আরম্ভ করতেন তখন প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বলতেন [দোয়া] "আমি আমার মুখ সেই সত্তার প্রতি ফিরিয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে হকের প্রতি মনোনিবেশ করেছি এবং বাতিল হতে প্রত্যাবর্তন করেছি । আর আমি সেই লোকদের দলভুক্ত নই যারা শির্ক করে। নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নিবেদিত, যিনি বিশ্বজাহানের প্রভু! যাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর এ জন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ্! তুমি সার্বভৌম বাদ্শাহ্, তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমি আমার প্রভু, আর আমি তোমার গোলাম [দাস]। আমি আমার নিজের উপর অবিচার করেছি এবং আমি আমার নিজের অপরাধ স্বীকার করছি। তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করো। নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথে চালিত কর, নিশ্চয়ই তুমি ছাড়া উত্তম চরিত্রের পথে অন্য কেউ চালিত করতে পারে না। আমার থেকে মন্দ আচরণকে দূরে রাখ, তুমিই আমাকে মন্দ আচরণ হতে রক্ষা করতে পার। হে আল্লাহ! তোমার সমীপে আমি হাজির আছি, তোমার আদেশ পালনের জন্য সদা প্রস্তুত আছি, যাবতীয় কল্যাণ তোমারই করতলে এবং কোনো অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমারই ভরসায় আছি এবং তোমারই শক্তির প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি মঙ্গলময়, তুমি মহীয়ান! তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। যখন তিনি রুকুতে যেতেন তখন বলতেন, [দোয়া] "হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে রুকু করছি, তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তোমারই কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছি। আমার শ্রবণশক্তি, আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার মজ্জা, আমার অস্থি ও আমার স্নায়ুতন্ত্র তোমার নিকট অবনত"। অতঃপর যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন "হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক, তোমারই

رَأْسَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ لَا مَنْجَاَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَاَ اِلَّا اِلَيْكَ تَبَارَكْتَ ـ

প্রশংসায় পরিপূর্ণ আকাশসমূহ এবং জমিন, আর তদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব। এরপরও তুমি যা কিছু সৃষ্টি করবে তাও [তোমার প্রশংসায়] পরিপূর্ণ এবং যখন তিনি সেজদা করতেন, তখন বলতেন, [দোয়া] "হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশ্যেই সেজ্দা করছি, তোমার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তোমার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করলাম। আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার উদ্দেশ্যে সেজদা করল, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, অবয়ব দান করেছেন এবং তার কর্ণ ও চক্ষু খুলে দিয়েছেন। অতি মঙ্গলময় আল্লাহ্– শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা"। অতঃপর সর্বশেষে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে যা পাঠ করতেন তা হলো, "হে আল্লাহ ! তুমি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও, যা আমি আগে করেছি, যা আমি পরে করব, যা আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, যা আমি সীমাতিরিক্ত করেছি এবং সেই অপরাধ যা তুমি আমার চেয়ে বেশি জান। তুমিই বান্দাকে ইজ্জতে অগ্রসরতা দানকারী এবং তুমি বান্দাকে পশ্চাতে অপসারণকারী, তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।" –[মুসলিম] ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক বর্ণনায় তাকবীরে তাহরীমার পর রাসূল ﷺ যে দোয়া পাঠ করেছেন তাতে وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ অর্থাৎ, "যাবতীয় কল্যাণ তোমারই করতলে"-এর পরে নিম্নলিখিত বাক্যসমূহ রয়েছে– "কোনো অকল্যাণই তোমার প্রতি বর্তায় না, সঠিক পথ পেয়েছে সে ব্যক্তিই যাকে তুমি সঠিক পথ দেখিয়েছ। আমি তোমারই দেওয়া শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, তোমার সত্তা হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো স্থান নেই; আর তোমার সত্তা ভিন্ন আশ্রয় পাওয়ারও কোনো স্থান নেই; তুমি অতি বরকতময়।"

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَبَّيْكَ মাসদারে তাছনিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ। মূলে ছিল اُلِبُّ لَكَ اِلْبَابَيْنِ পদটি مَفْعُوْلُ مُطْلَقٌ-এর আমেলটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

اَلشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ বাক্যে اليك টি উহ্য ফেয়েলের সাথে মুতা'আল্লাক। অর্থাৎ اَلشَّرُّ لَا يَتَقَرَّبُ بِهِ اِلَيْكَ

اَنَا بِكَ অর্থাৎ اَعْتَمِدُ بِكَ আর اِلَيْكَ মানে اَنَا اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ

مِلْأَ السَّمٰوَاتِ এটি اَلْحَمْدُ-এর সিফাত হেতু মারফূ', অথবা حَالٌ হেতু মানসূব।

اَنْتَ الْمُقَدِّمُ অর্থাৎ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ بَعْضَ الْعِبَادِ اِلَيْكَ بِتَوْفِيْقِ الطَّاعَاتِ অর্থাৎ, ইবাদতের ফলে কাউকে মর্যাদাদাতা। আর اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ অর্থাৎ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ بَعْضَ الْعِبَادِ بِالْخُذْلَانِ عَنِ النُّصْرَةِ অর্থাৎ, কাউকেও সাহায্য করা হতে লাঞ্ছনা সহকারে বঞ্চিতকারী।

وَعَنْ ٧٥٨ - أَنَسٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوتَهٗ قَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَاِنَّهٗ لَمْ يَقُلْ بَاْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ فَقَدْ رَاَيْتُ اِثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৫৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি এসে নামাজের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হলো, তখন তার শ্বাস দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, [এ অবস্থায়] সে বলল- " اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ " অর্থাৎ "আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর জন্যই প্রচুর প্রশংসা, এতে অনেক পবিত্রতা ও বরকত দেওয়া হয়েছে"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ সমাপ্ত করলেন, তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই কথাগুলো বলল? লোকেরা [ভয়ে ও সংশয়ে] চুপ থাকল। রাসূল ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এই কথাগুলো বলল? জনতা চুপচাপ থাকল। রাসূল আবারও বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এগুলো বলল ? সে তো খারাপ কিছু বলেনি। তখন লোকটি উঠে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি [দ্রুত] এসেছিলাম। ফলে আমার শ্বাস দীর্ঘ হয়েছিল। [তাই আপনি আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন] আমিই [এ কথাগুলো] বলেছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি বারোজন ফেরেশ্তাকে দেখেছি যারা এই কথাগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তড়িঘড়ি করেছে কে কার আগে আল্লাহর দরবারে নিয়ে হাজির করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা :

حَفْزُ النَّفْسِ অর্থ- দৌড়ে আসার কারণে শ্বাস বড় হয়ে যাওয়া। যদিও এ হাদীসে ঐ কথাগুলো বর্ণনাকারীর জন্য সু-সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হুজুর ﷺ অন্য সহীহ্ হাদীসে দৌড়ে এসে নামাজে শরিক হতে নিষেধ করেছেন; বরং ধীরস্থিরভাবে গাম্ভীর্য বজায় রেখে আসতে আদেশ করেছেন।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَالْجَوَابُ দু' হাদীসের মাঝে দ্বন্দ্ব ও এর উত্তর : আলোচ্য হাদীসটি নিম্ন বর্ণিত হাদীসটির পরিপন্থি।

হাদীসটি হলো-

اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَلَا تَاْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ بَلْ اِئْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ . فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَاَتِمُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا .

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে রাসূল ﷺ দৌড়ে আসাকে নিষেধ করেননি। اِذَا اَتَيْتُمْ الخ হাদীসটিতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এমনভাবে দৌড়ে আসা মাকরূহ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার জামাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর **فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ** আয়াতে **سَعْىٌ** দ্বারা জুমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٧٥٩ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَارِثَةَ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ)

৭৫৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন তখন বলতেন– سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ [অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসাসহকারে, তোমার নাম মঙ্গলময়, তোমার কৃতিত্ব সুমহান, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি এমন একটি হাদীস, যা হারেছা ব্যতীত অন্য কারও সূত্র হতে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে আপত্তি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِىْ تَعْيِيْنِ الدُّعَاءِ দোয়া নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : কোন দোয়া দ্বারা নামাজ শুরু করা হবে এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতান্তর রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে إِنِّىْ وَجَّهْتُ ... الخ দোয়া দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব। তিনি মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন। হাদীসটি হলো—

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا قَامَ الصَّلٰوةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

مَذْهَبُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَأَحْمَدَ ইমাম আযম আবূ হানীফা, আহমদ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ الخ দ্বারা নামাজ আরম্ভ করা মোস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নলিখিত দলিলগুলো পেশ করেন—

(١) قَوْلُهُ تَعَالٰى بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ـ

ইমাম আবূ বকর জাসসাস (র.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِ ... الخ উদ্দেশ্য।

(٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... الخ ـ (تِرْمِذِىُّ ـ أَبُوْ دَاوُدَ)

(٣) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ ـ (دَارَقُطْنِىْ)

(٤) عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الخ ـ (دَارَ قُطْنِىْ)

(٥) عَنْ وَائِلَةَ وَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ... الخ ـ (طَبْرَانِىْ)

(٦) عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلٰوةَ بِسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ..... الخ

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উপস্থাপিত দলিলের উত্তর :

১. সম্ভবত এ হাদীসটি ইসলামের প্রথম যুগের। সুতরাং তা রহিত হয়ে গেছে।

২. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ ... الخ তাকবীরে তাহরীমার পরে পড়তেন। এবং إِنِّىْ وَجَّهْتُ ... الخ তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে পড়তেন।

وَعَنْ ٧٦٠ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلٰوةً قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ثَلٰثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ وَهَمْزِهٖ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَ ذَكَرَ فِيْ اٰخِرِهٖ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقَالَ عُمَرُ نَفْخُهُ الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ .

৭৬০. **অনুবাদ :** হযরত জুবাইর ইবনে মুত্‌ইম (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ পড়তে দেখলেন, তিনি [তাকবীরে তাহরীমার পর] বললেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا . পর্যন্ত। [অর্থাৎ আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর জন্যই প্রচুর প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই প্রচুর প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই প্রচুর প্রশংসা, সকাল সন্ধ্যা আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি] শেষ কথাটিও তিনবার বললেন। আপনি বিতাড়িত শয়তান হতে অর্থাৎ তার অহমিকা, তার যাদু ও তার ওয়াসওয়াসা হতে আল্লাহর নিকট মুক্তি চাচ্ছি। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্] কিন্তু ইবনে মাজাহ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا বাক্যগুলো বলেননি। অধিকন্তু তিনি مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলে শেষ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, নাফ্‌খ (نَفْخٌ) অর্থ– অহমিকা, নাফ্‌স (نَفْثٌ) অর্থ– কবিতা এবং হাময (هَمْزٌ) অর্থ– ওয়াসওয়াসা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নফল নামাজে এ জাতীয় দোয়া কালাম পাঠ করার কথা মহানবী ﷺ হতে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। 'সকাল-সন্ধ্যা' বলে দুই ওয়াক্তকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, হয়তো দিনের ও রাতের ফেরেশ্‌তাদের আগমন ও প্রস্থানের সময়, অথবা 'বিশ্বের সময় পরিবর্তনের পালা'। সুতরাং এ সময় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা একটি শুভ কাজের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

وَعَنْ ٧٦١ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَصَدَّقَهُ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ نَحْوَهُ)

৭৬১. **অনুবাদ :** হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে দু'টি নীরবতার কথা স্মরণ রেখেছেন– প্রথম নীরবতা যখন তিনি 'তাকবীরে তাহরীমা' বলতেন তারপর এবং দ্বিতীয় নীরবতা যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ পাঠ শেষ করে অবসর হতেন। হযরত সামুরার এ উক্তি হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমীও এরূপভাবে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রথম নীরবতা ছিল 'সুব্হানাকা' পড়ার জন্য অথবা এরূপ কোনো দোয়া পাঠের জন্য, এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু দ্বিতীয় নীরবতার মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, মুক্তাদিদের 'সূরায়ে ফাতিহা' পড়ার জন্য, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, 'আমীন' বলার জন্য। ইমাম শাফেয়ী বলেন, দ্বিতীয় সিক্তা বা নীরবতা অবলম্বন করাই সুন্নত। আর ইমাম মালেকের প্রকৃত রায় হলো, প্রথমটি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো সিক্তাই নেই।

وَعَنْ ٧٦٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ، هٰكَذَا فِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَ ذَكَرَهُ الْحُمَيْدِىُّ فِىْ إِفْرَادِهٖ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنْ مُسْلِمٍ وَحْدَهٗ .

৭৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে দ্বিতীয় রাকাত পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন 'আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' বলে কেরাত আরম্ভ করতেন এবং নীরব থাকতেন না।-[মুসলিম]

ইমাম হুমাইদী ইমাম মুসলিম কর্তৃক এ সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে জামেউল উসূল প্রণেতাও শুধুমাত্র মুসলিম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** তৃতীয় রাকাতের শুরুতে 'আল্হামদু' -এর পূর্বে আর কোনো দোয়া পড়তেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, 'বিসমিল্লাহ্' হলো সূরায়ে ফাতিহার একটা অংশ বিশেষ। কাজেই আল্হামদু লিল্লাহ কেরাত শুরু করার মানে হলো 'বিসমিল্লাহ্'সহ আরম্ভ করতেন। পক্ষান্তরে হাদীসটি হতে সুস্পষ্টভাবে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, নামাজের মধ্যে 'বিসমিল্লাহ্' সূরায়ে ফাতিহার অংশ কি না? এটা একটি স্বতন্ত্র মাস্আলা। এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদও রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٦٣ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَعْمَالِ وَاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَقِنِىْ سَيِّئَ الْاَعْمَالِ وَسَيِّئَ الْاَخْلَاقِ لَا يَقِىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৭৬৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন নামাজ শুরু করতেন [প্রথমে] 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন যার অর্থঃ— আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহরই জন্য; যিনি গোটা বিশ্বের প্রতিপালক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, আর এর জন্যই আমি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। আর আমি হলাম এর প্রতি প্রথম অনুগত ব্যক্তি। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ভালো কাজ ও ভালো চরিত্রের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া আর কেউই ভালো কাজ ও ভালো চরিত্রের পথ প্রদর্শন করতে পারে না। তুমি আমাকে খারাপ কাজ ও খারাপ চরিত্র হতে রক্ষা কর। কারণ, খারাপ কাজ ও চরিত্র হতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ রক্ষা করতে পারে না। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ الخ কোনো কোনো সময় রাসূল ﷺ تَوَاضُعًا 'আউয়াল' শব্দটির স্থলে مِنْ ব্যবহার করে বলেছেন اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ الخ আর কখনো اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বলেছেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ভাষায়। আর প্রত্যেক নবীই তাদের উম্মতদের তুলনায় اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বা প্রথম মুসলিম। আর এ হিসাবেই রাসূল ﷺ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ বলেছেন।

وَعَنْ ٧٦٤ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (رض) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِثْلَ حَدِيْثِ جَابِرٍ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأُ. (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৭৬৪. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল নামাজে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন, "اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ" [অর্থাৎ আল্লাহ সুমহান, সর্বদিক হতে প্রত্যাবর্তন করে আমি সেই সত্তার দিকে অভিমুখী হয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন।]

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা হাদীসটির অবশিষ্টাংশ হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসের মতোই বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -এর পরিবর্তে اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ বলেছেন। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে খোদা! তুমি মালিক, তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি তোমার গুণ-কীর্তন সহকারে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। অতঃপর নবী করীম ﷺ কেরাত পাঠ শুরু করতেন। –[নাসায়ী]

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজে কেরাত পাঠ

নামাজে কেরাত পাঠ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ আর হাদীসে এসেছে যে, لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এ আয়াত ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে সকল ইমাম এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নামাজের মধ্যে কেরাত পাঠ করা ফরজ। তবে কয় রাকাতে পড়া ফরজ এ বিষয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে—

※ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সব রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ।
※ ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তিন রাকাতে পড়া ফরজ।
※ হাসান বসরী ও যুফার (র.)-এর মতে কেবল এক রাকাতে পড়া ফরজ।
※ হানাফীদের মতে প্রথম দুই রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ।

আলোচ্য অধ্যায়ে কেরাত পড়া সংক্রান্ত হাদীসসমূহ একত্রিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٧٦٥ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا .

৭৬৫. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি নামাজে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামাজ হয়নি। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন বা তার বেশি কিছু পড়েনি [তার নামাজ বিশুদ্ধ হয়নি]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম** : নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ না ওয়াজিব এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ- ইমাম আহমদ ও শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মতে নামাজে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ফরজ। তাঁরা আলোচ্য হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। হাদীসের না-বাচক উক্তি দ্বারা অশুদ্ধ হওয়ার অর্থ গ্রহণ করেন। কারণ ফরজ পরিত্যক্ত হলেই নামাজ অশুদ্ধ হয়।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ اَحْمَدَ ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদের প্রসিদ্ধ মতে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল কুরআনের আয়াত– فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ উক্ত আয়াতে কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট না করে শুধু কুরআন তেলাওয়াতের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া রাসূল ﷺ জনৈক বেদুইনকে শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছিলেন, কুরআন শরীফের যেখান থেকেই তুমি পাঠ করা সহজ মনে কর, সেখান থেকেই পাঠ কর। এ জন্য হানাফীগণ বিশেষ কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট না করে কেরাত পাঠকে ফরজ বলেছেন এবং এ হাদীসের দ্বারা তাঁরা সূরায়ে ফাতিহা পাঠকে ওয়াজিব বলেছেন। এতে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকে না। এটা ছাড়াও উক্ত হাদীসটি অর্থাৎ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ খবরে ওয়াহেদ। خَبَرِ وَاحِدْ দ্বারা কোনো আদেশ ফরজ হতে পারে না। হানাফীগণ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রমাণের জবাবে বলেন যে, لَا صَلٰوةَ অংশের না-বাচক শব্দ দ্বারা নামাজ শুদ্ধ না হওয়ার অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়, বরং এর অর্থ পরিপূর্ণ না হওয়া। ওয়াজিব ও সুন্নত ত্যাগ করলে নামাজ অপূর্ণ থেকে যায়। উদাহরণ স্বরূপ অন্য হাদীসে আছে যে, لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ আবার, "যে দাস মনিবের কাছ হতে পলায়ন করে, তারও নামাজ হবে না।" এ সমস্ত হাদীসে নামাজ হবে না

কথা দ্বারা 'নামাজ পূর্ণ হবে না' বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি হাদীসকে এ মতের পক্ষে পেশ করা যেতে পারে। যথা- مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَءْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ এ হাদীসটির দ্বারাও বুঝা যায় যে, সূরায়ে ফাতিহা পাঠ না করলে নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কিন্তু নামাজ বাতিল হয় বলে বুঝা যায় না। আর সাধারণত ওয়াজিব পরিত্যক্ত হলেই নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শাফেয়ীর মতে সূরা মিলানো সুন্নত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মতে সূরা মিলানো ও ফাতিহা পাঠ উভয়ই ওয়াজিব। ইমাম মালেক বলেন, ফাতিহা পাঠ ও সূরা মিলানো উভয়টি ফরজ।

وَعَنْ ٧٦٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَ لِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ فَاِذَا قَالَ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَاَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَاَلَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামাজ অসম্পূর্ণ। একথা তিনি তিনবার বললেন। তখন হযরত আবূ হুরায়র (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা তো ইমামের পিছনে থাকি। তিনি বলেন, তুমি মনে মনে পড়বে। কেননা, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন, আমি নামাজকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আধাআধি করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দা তখন যা চাইবে, তাই পাবে। যখন বান্দা বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ["সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য"] তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।" যখন বান্দা বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ["আল্লাহ পরমদাতা এবং দয়ালু"] তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ ব্যক্ত করল এবং যখন বান্দা مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ["আল্লাহ কিয়ামত দিবসের মালিক"] বলে, তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল" এবং যখন বান্দা বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ["হে আল্লাহ! আমি তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই"] তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আধাআধি। "এ মুহূর্তে আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তা রয়েছে।" আর যখন বান্দা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ["হে আল্লাহ! আমাদের সরল পথ দেখান, এমন পথ, যে পথপ্রাপ্তদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের উপর আপনি গজব নাজিল করেছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে"] তখন আল্লাহ বলেন, "এটা আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চায়, তার জন্য তাই রয়েছে।" [মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلِ الْقِرَاءَةُ فَرْضٌ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে কেরাত ফরজ কি না? নামাজের প্রতি রাকাতে কেরাত ফরজ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে কোনো দু'রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ। তবে প্রথম দু'রাকাতে নির্দিষ্ট করে নেওয়া ওয়াজিব।

দলিল– فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

* ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে সব রাকাতেই কেরাত পড়া ফরজ।
* ইমাম মালিক (র.)-এর মতে যে কোনো তিন রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ।
* ইমাম হাসান বসরী ও যুফার (র.)-এর মতে শুধু এক রাকাতে কেরাত পড়া ফরজ।
* ইমাম আহমদের মতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ।
* হানাফীদের মতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব।

নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া নিয়ে ইমামদের মতভেদ : সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক রাকাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমামের পিছনে মুক্তাদির কেরাত পঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যথা–

১. مَذْهَبُ الْاِمَامِ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে কেরাত جَهْرِىْ হোক বা سِرِّىْ সর্বাবস্থায় মুক্তাদির উপর কেরাত পড়া ফরজ। তাঁর দলিল হচ্ছে–

١ - قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

٢ - مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ - اَلْحَدِيْث

٣ - قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مَعَ الْاِمَامِ فَيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

২. مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ اَحْمَدَ : ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে جهرى সালাতে কেরাত পড়তে হবে না। তাঁর দলিল–

١ - قَوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَاِذَا اَسْرَرْتُ قِرَاءَتِىْ فَاقْرَءُوْا - (دَارَ قُطْنِىْ)

৩. مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالصَّاحِبَيْنِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও সাহেবাইন (র.) বলেন, মুক্তাদির উপর সূরা ফাতিহা পাঠ করার কোনো বিধান নেই; বরং সে নীরব থাকবে। শুধুমাত্র ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর উপর এটি পড়া ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হচ্ছে–

١ - قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

٢ - وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - (اَلْاٰيَةَ)

٣ - عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) وَاِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا - (مُسْلِمٌ)

٤ - عَنِ الشَّعْبِىِّ مُرْسَلًا لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ -

٥ - عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ اَحَدٌ خَلْفَ الْاِمَامِ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهٗ قِرَاءَةُ الْاِمَامِ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّتِهِمْ : ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও মালিক (র.)-এর দলিলের জবাবে আহনাফ বলেন—

১. لَا صَلٰوةَ দ্বারা اِمَامٌ ও مُنْفَرِدٌ -এর সালাতের نَفِىْ করা হয়েছে, মুক্তাদির সালাতের نَفِىْ করা হয়নি।

২. لَا صَلٰوةَ দ্বারা كَمَالِيَّتْ -এর نَفِىْ করা হয়েছে।

৩. দ্বিতীয় হাদীসের সনদে اِضْطِرَابْ রয়েছে।

৪. ইমাম মালিক ও আহমদের হাদীসের জবাবে ইমাম দারে কুতনী (র.) বলেন,

تَفَرَّدَ بِهٖ زَكَرِيَّا وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ مَتْرُوْكٌ -

وَعَنْ ٧٦٧ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ (رضـ) وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلٰوةَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ এবং হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) তাঁরা সকলেই 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন' বাক্য দ্বারা নামাজ আরম্ভ করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** 'আলহামদু লিল্লাহ রাব্বিল আলামীন' বাক্য দ্বারা সূরায়ে ফাতিহা বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য হাদীসের রাবী সূরায়ে ফাতিহাকে সশব্দে পড়তে শুনেছিলেন, বিসমিল্লাহকে পড়তে শুনেননি। কারণ বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়া হয়েছিল। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বিসমিল্লাহকে চুপে চুপে পড়ার পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন যে, সূরায়ে 'নমল' ব্যতীত বিসমিল্লাহ কোনো সূরার অংশ নয়।

ইমাম শাফেয়ীর মতে বিসমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার অংশ। সুতরাং প্রকাশ্য নামাজে তা সশব্দে পড়া আবশ্যক। এ মতের অনুকূলে তিনি কতিপয় হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

وَعَنْ ٧٦٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ وَفِيْ أُخْرٰى لِلْبُخَارِيِّ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ইমাম যখন 'আমীন' বলবেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা, যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হবে তার বিগত যত গুনাহ আছে, তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [বুখারী-মুসলিম] অপর এক রিওয়ায়তে আছে মহানবী ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবেন, তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, যার বলা ফেরেশতাদের বলার সাথে সাথে হবে, তার বিগত যত পাপ আছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এটা বুখারীর বর্ণিত ভাষ্য। মুসলিমও এরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেরাত পাঠকারী 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। কেননা, ফেরেশ্তাগণও 'আমীন বলেন। যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হবে তার বিগত যত পাপ আছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْمُوَافَقَةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي التَّامِيْنِ **আমীন বলার মধ্যে ফেরেশতাদের সাথে সাথে হওয়ার অর্থ :** ফেরেশ্তাদের আমীনের 'সাথে সাথে' হওয়ার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যা নিম্নরূপ—

১. ফেরেশ্তাগণ যখন 'আমীন' বলে সে ওয়াক্ত বা সময়ে তোমরাও আমীন বল। আর এটাই অধিকাংশের মতে সহীহ অর্থ।

২. কারো মতে, তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে 'আমীন' বলে থাকেন তোমরাও তদ্রূপভাবে বল।

৩. আবার কারো অভিমত এই যে, তারা যেভাবে 'আমীন' বলে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের শেষে জবাব দেন, তোমরাও অনুরূপভাবে জবাব প্রদান কর। অর্থাৎ তারা চুপে চুপে 'আমীন' বলেন, তোমরাও তাই কর। তবেই ফেরেশ্‌তাদের সাথে সঠিক ভাবে مُوَافِقْ হবে।

مَعْنٰى غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে-এর ব্যাখ্যা : এখানে গুনাহ অর্থ– 'সগীরা' বা ছোট ছোট গুনাহ। আল্লাহ স্বীয় কালামেই ঘোষণা দিয়েছেন 'নেক আমলের দ্বারা সগীরা গুনাহের মার্জনা হয়ে যায়।' বস্তুত কবীরা গুনাহেরও মার্জনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, বান্দা নামাজের মধ্যে থেকেই অমীন শব্দ বলছে। আর নামাজ হলো ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম। এতদ্ভিন্ন নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর ফেরেশ্‌তাগণও এ শব্দে 'আমীন' বলে সে বান্দার জন্য দোয়া করেন। কাজেই কবীরা গুনাহ্‌ও মাফ হতে পারে।

وَعَنْ ٧٦٩ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُجِبْكُمُ اللّٰهُ فَاِذَا كَبَّرَ وَ رَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الْاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ قَالَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَ قَتَادَةَ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا ـ

৭৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা নামাজ পড়বে, তখন প্রথমে তোমরা নিজেদের কাতার সোজা করবে। অতঃপর যেন তোমাদের একজন ইমামতি করে। যখন তিনি তাকবীর [তাহরীমা] বলবেন, তোমরাও [সাথে সাথে] তাকবীর বলবে এবং যখন তিনি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলবেন, তখন তোমরা বলবে 'আমীন'। আল্লাহ তা কবুল করবেন। অতঃপর যখন তিনি তাকবীর বলবেন ও রুকু করবেন, তোমরাও তাকবীর বলবে এবং রুকু করবে। ইমাম তোমাদের আগে রুকুতে যাবেন আর তোমাদের আগেই মাথা উঠাবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এটা এর পরিবর্তে [অর্থাৎ তোমরা দেরিতে রুকুতে গেলে এবং দেরিতে মাথা উঠালে ইমাম সকালে রুকুতে গেলে এবং সকালে মাথা উঠালে উভয়ের সময় সমান হয়ে গেল]। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, আর যখন ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে, তখন তোমরা বলবে–اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। –[মুসলিম] অপর বর্ণনায় আবূ হুরায়রা ও কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম কেরাত পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বাক্যে ইমামদের বক্তব্য : আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, ইমামের দায়িত্ব হলো سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং মুক্তাদির দায়িত্ব رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদি উভয়েই উভয়টি বলবেন। অবশ্য তিনি অন্য হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। আর সকল ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি একাকী নামাজ পড়বে সে উভয় বাক্যই বলবে; তবে শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না; বরং নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

تِلْكَ بِتِلْكَ -এর ব্যাখ্যা : تِلْكَ بِتِلْكَ বাক্যটির ব্যাখ্যা তিন প্রকার হতে পারে। সব প্রকারের মর্মার্থ একই।

১. اَللَّحْظَةُ الَّتِىْ سَبَقَكُمُ الْإِمَامُ بِهَا فِىْ تَقَدُّمِهِ إِلَى الرُّكُوْعِ تَنْجَبِرُ بِتَأَخُّرِكُمْ فِى الرُّكُوْعِ بَعْدَ رَفْعِهِ لَحْظَةً فَتِلْكَ اللَّحْظَةُ بِتِلْكَ اللَّحْظَةِ وَصَارَ قَدْرَ رُكُوْعِكُمْ كَقَدْرِ رُكُوْعِهِ ـ

১. প্রথম تِلْكَ দ্বারা মুক্তাদির لَحْظَةَ উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় تِلْكَ দ্বারা ইমামের لَحْظَةَ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম মুক্তাদি অপেক্ষা যেই সময়টুকু পূর্বে রুকুতে গেছে, আর ইমাম রুকু হতে উঠার যে পরিমাণ সময় মুক্তাদির বিলম্ব হয়েছে। সুতরাং রুকুতে ইমাম এবং মুক্তাদির সমপরিমাণ সময় ব্যয় হবে। এ ব্যাখ্যা হলো উল্লিখিত এই হাদীসটির জন্য। কেননা– تِلْكَ بِتِلْكَ -এর সম্পর্কটি এখানে রুকুর সাথে।

২. زِيَادَةُ إِمَامِكُمْ أَوَّلاً فِى السُّجُوْدِ مُنْجَبِرَةٌ بِزِيَادَتِكُمْ عَلَيْهِ فِى السُّجُوْدِ أَخِرًا

৩. زِيَادَتُكُمْ أخِرًا فِى السُّجُوْدِ فِىْ مُقَابَلَةِ زِيَادَةِ إِمَامِكُمْ عَلَيْكُمُ السُّجُوْدَ أَوَّلاً

উল্লিখিত দু' নং এবং তিন নং ব্যাখ্যা সিজদার হাদীসের تِلْكَ بِتِلْكَ -এর মর্মার্থ।

---

৭৭ وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الْأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُوْرَتَيْنِ وَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ يُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى مَالَا يُطِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজের প্রথম দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন এবং শেষ দু' রাকাতে কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করতেন, তিনি মাঝে মধ্যে কখনও কখনও আমাদেরকে আয়াত শুনিয়ে পাঠ করতেন। আর তিনি প্রথম রাকাতে কেরাত এত দীর্ঘ করতেন, যা তিনি দ্বিতীয় রাকাতে করতেন না, এভাবে তিনি আসর এবং ফজর নামাজেও করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا -এর অর্থ : এটা সুস্পষ্ট যে, দিবা ভাগের নামাজে إِخْفَاء قِرَات ওয়াজিব; কিন্তু রাসূল ﷺ কোনো কোনো সময় আয়াতসমূহ কতক শব্দাবলি উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন, যাতে সাহাবীগণ সূরা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারেন এবং তাঁরা রাসূল ﷺ-এর অনুকরণ করতে পারেন। মূলকথা হলো, এটা রাসূল ﷺ-এর জন্যই একমাত্র খাস ছিল।

وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى الخ -এর অর্থ : প্রথম রাকাতে কেরাত দীর্ঘায়িত করার কারণ হলো, যাতে মুক্তাদিগণ নামাজে শরিক হওয়ার সুযোগ পায়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক, হানাফীদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (র.) সহ প্রায় সমস্ত ইমামগণই বলেন, সকল নামাজেই প্রথম রাকাতে কেরাত দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকাতে খাটো করে পড়াই উত্তম। এ হাদীসটি তাঁদের দলিল। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ফজর নামাজ ব্যতীত সকল নামাজে উভয় রাকাতে সমানভাবে দীর্ঘ কিংবা হ্রাস হওয়া উত্তম। মূলত ফজরের সময় নিদ্রা ও অসচেতনের সময়, তাই মুক্তাদিদের সহানুভূতির লক্ষ্যে কেরাত লম্বা করা বাঞ্ছনীয়। আর কেরাতের মধ্যে উভয় রাকাতের মর্যাদা সমান। কাজেই উভয় রাকাতই সমপরিমাণ হওয়া উচিত। যেমন– অন্য আরেক হাদীসে বর্ণিত আছে তিনি ফজরের প্রত্যেক রাকাতে প্রায় ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। আর প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন মানে বিস্‌মিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ ও ছানা ইত্যাদির দরুন দীর্ঘায়িত হতো।

وَعَنْ ٧٧١ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الٓمّٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةُ وَفِى رِوَايَةٍ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلٰثِيْنَ اٰيَةً وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ قِيَامِهِ فِى الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যোহর ও আসর নামাজের কিয়াম [দাঁড়িয়ে থাকা] সম্পর্কে অনুমান করতাম। আমরা অনুমান করেছি যে, তিনি যোহর নামাজের প্রথম দু' রাকাতে 'আলিফ-লাম মীম তানযীলুস সিজদাহ' নামক সূরা পাঠ পরিমাণ সময় কিয়াম করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, প্রত্যেক রাকাতেই ত্রিশ আয়াত পড়া পরিমাণ সময় তিনি কিয়াম করতেন। আমরা আরও অনুমান করেছি যে, তাঁর শেষের দু' রাকাতের কিয়াম প্রথম দু' রাকাতের কিয়ামের তুলনায় অর্ধেক হতো। আমরা এটাও অনুমান করেছি যে, আসরের প্রথম দু' রাকাত নামাজের কিয়াম জোহরের শেষ দু' রাকাত নামাজের কিয়ামের সমান। আর আসরের শেষ দু' রাকআত প্রথম দু' রাকাতের কিয়ামের তুলনায় অর্ধেক হতো। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ জোহরের শেষ রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করতেন। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের শেষ দু' রাকাতে সূরা ফাতিহার পরেও অন্যান্য আয়াত পাঠ জায়েজ আছে এটা দেখানোর জন্য রাসূল ﷺ মাঝে মধ্যে সূরা পড়তেন। মূলত শেষ দু' রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

وَعَنْ ٧٧٢ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَفِى رِوَايَةٍ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِى الْعَصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ وَفِى الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭২. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জোহর নামাজে وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى অর্থাৎ সূরায়ে 'লাইল' পড়তেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى সূরা পড়তেন এবং আসরেও অনুরূপ সূরা পড়তেন; কিন্তু ফজরের নামাজে এটা হতে দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : তারাবীহের নামাজ ব্যতীত এক রাকাতে একটি পূর্ণ সূরা পাঠ করাই সুন্নত, অংশ বিশেষ পড়া জায়েজ তবে সুন্নত নয়। রাসূল ﷺ এ রকমই পড়তেন। কোনো একটি নামাজের জন্য বিশেষ কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট

وَعَنْ ٧٧٣ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭৩. অনুবাদ : হযরত জুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিব নামাজে সূরায়ে তূর পড়তে শুনেছি।

وَعَنْ ٧٧٤ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে ফজল বিনতে হারেস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাজে সূরা মুরসালাত পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ কোনো বিশেষ নামাজের জন্য বিশেষ সূরাকে নির্দিষ্ট করে পড়েননি; বরং একই নামাজে বিভিন্ন সূরা পড়েছেন। তবে যে নামাজে যে সূরা অধিকাংশ সময় পড়েছেন, আমাদেরও সে নামাজে তা অধিকাংশ সময় পড়া উত্তম। রাসূল ﷺ মুক্তাদির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কখনও কেরাত দীর্ঘ করেছেন আবার কখনও সংক্ষিপ্ত করেছেন। হযরত ওমর (রা.) কুরআনের সূরাসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন–

১. তেওয়ালে মুফাস্সাল অথবা দীর্ঘ সূরা। সূরায়ে হুজরাত হতে সূরায়ে বুরূজ পর্যন্ত সূরাগুলো তেওয়ালে মুফাস্সাল। ফজর ও জোহর নামাজে তেওয়ালে মুফাস্সাল উত্তম।
২. আওসাতে মুফাস্সাল বা মধ্যম সূরা। সূরায়ে বুরূজ হতে لَمْ يَكُنْ পর্যন্ত সূরাগুলো আওসাতে মুফাস্সাল। আসর ও ইশার নামাজে এ সূরাগুলো পড়া উত্তম।
৩. কেসারে মুফাস্সাল বা সংক্ষিপ্ত সূরা। আর তা হলো لَمْ يَكُنْ হতে শেষ পর্যন্ত সূরাগুলো। মাগরিবের নামাজে এই সূরাগুলো পড়া সুন্নত।

وَعَنْ ٧٧٥ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (رض) يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِىْ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلّٰى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ اَتٰى قَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوْا لَهُ اَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا وَاللّٰهِ وَ لَاٰتِيَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَاُخْبِرَنَّهُ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابُ

৭৭৫. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) মহানবী ﷺ-এর সাথে জামাতে নামাজ পড়তেন। অতঃপর নিজ মহল্লায় গিয়ে মহল্লাবাসীদের ইমামতি করতেন। একদা রাতে তিনি মহানবী ﷺ-এর সাথে ইশার নামাজ পড়লেন এবং এরপর নিজ মহল্লায় গিয়ে তাদের ইমামতি করলেন এবং নামাজে পূর্ণ সূরায়ে বাকারা পাঠ করা শুরু করলেন। এতে এক ব্যক্তি [অপারগ হয়ে] সালাম ফিরিয়ে জামাত হতে পৃথক হয়ে গেল এবং একাকী পৃথকভাবে নামাজ পড়ে অবসর গ্রহণ করল। লোকেরা তাকে বলল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি মুনাফিক হইনি। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাকে অবহিত করব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ إِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

নিকট গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা ক্ষেতে-মাঠে পানি সেচনকারী লোক। সারা দিন সেচের কাজে পরিশ্রম করে থাকি, এমতাবস্থায় মুআয আপনার সাথে ইশার নামাজ পড়ে নিজ মহল্লায় এসে সূরা বাকারা দিয়ে ইশার নামাজ শুরু করে দিলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআযকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুআয! তুমি কি সমস্যা–সৃষ্টিকারী! তুমি ইশার নামাজে সূরা 'ওয়াশ্ শামসি ওয়া দোহাহা' 'ওয়াদ দোহা' 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগ্শা' এবং 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা'[-এর ন্যায় ছোট সূরা] পড়বে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ও আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর এক্তেদা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ—

১. আলোচ্য হাদীসে হযরত মুআয (রা.)-এর ঘটনা যা হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি হুজুর ﷺ -এর পিছনে প্রথমে ফরজ হিসেবে আদায় করে পরে নফল আদায়কারী হিসেবে ইমামতি করতেন। যদি এটা জায়েজ না হতো, তবে মহানবী ﷺ অবশ্যই তাকে দ্বিতীয়বারের ইমামতি করতে নিষেধ করতেন।

২. হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতি করেছেন। অথচ ফেরেশতার উপর নামাজ ফরজ নয়। যদি এটা জায়েজ না হতো তা হলে ফরজ আদায়কারী মহানবী ﷺ -এর পক্ষে নফল আদায়কারী জিব্রাঈলের পেছনে একতেদা করা কিভাবে জায়েজ হলো?

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ وَمَالِكٍ হানাফীদের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর এক মতানুযায়ী নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা জায়েজ নেই।

دَلَائِلُ الْاَحْنَافِ হানাফী মতাবলম্বীদের দলিল : হানাফীগণ নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন—

১. নবী করীম ﷺ বলেছেন, ইমাম মুক্তাদির নামাজের জামিন হয়। এখানে এটা যুক্তিযুক্ত যে, নফল আদায়কারী দুর্বল এবং ফরজ আদায়কারী শক্তিমান। দুর্বল কখনও শক্তিমানের জামিন হতে পারে না। সুতরাং নফল আদায়কারী কখনও ইমাম হিসেবে ফরজ আদায়কারী মুক্তাদির জামিন হতে পারে না।

২. দ্বিতীয়ত যদি ফরজ নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির একতেদা নফল আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে জায়েজ হতো, তা হলে সালাতুল খাওফে নবী করীম ﷺ একই নামাজে দু' দলের ইমাম না হয়ে; বরং এক দলকে নামাজ পড়িয়ে দ্বিতীয়বার নফল নিয়তের সাথে অন্য দলকে নামাজ পড়াতেন। অথচ তিনি এরূপ করেননি। এটা সহজ পন্থা ছিল। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা জায়েজ নেই।

শাফেয়ী মতাবলম্বীদের দলিলের জবাব : হানাফীদের পক্ষ হতে শাফেয়ী মতাবলম্বীদের দলিলের নিম্নলিখিত জবাব প্রদান করা হয়েছে—

১. হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম ﷺ -এর পিছনে নফলের নিয়তে নামাজ পড়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূলের সাথে নামাজ পড়ে নামাজের নিয়মকানুন ও আদব শিক্ষা করবেন। অথবা এটাও হতে পারে যে, নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়ার বরকত ও ফজিলত পাওয়ার জন্য তিনি নফল নামাজের নিয়ত করে নামাজ পড়েছিলেন। অতঃপর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে ফরজ নামাজ পড়েছিলেন।

২. হযরত মু'আয (রা.)-এর এ কার্যকলাপ ঐ সময়ের ছিল, যখন একই ফরজ নামাজ দু'বার পড়ার অনুমতি ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসেও আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই ফরজ

নামাজকে দু'বার পড়তে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে আরও আছে, তিনি বলেছেন– একই নামাজকে একই দিনে দু'বার পড়ো না। এ হাদীসগুলোতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফরজ নামাজকে দু'বার পড়ার শরয়ী বিধান ছিল, পরবর্তীকালে নবী করীম ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ বৈধতার উপরেই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে থাকে।

৩. জিব্রাঈলের ইমামতি সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তর হচ্ছে–

ক. আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে নামাজ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন, এ আদেশের ফলেই তার উপরে নামাজ ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং হযরত জিব্রাঈল (আ.) নফল নামাজ আদায়কারী ছিলেন না ; বরং ফরজ নামাজ আদায়কারী ছিলেন। সুতরাং এখানে ফরজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীরই একতেদা করা হয়েছে।

খ. হযরত জিব্রাঈল (আ.) এ প্রশিক্ষণ দানের পূর্বে নবী করীম ﷺ-এর উপরে নামাজ ফরজ ছিল না; বরং নামাজ নফল ছিল। এতে বুঝা যায় যে, নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর একতেদা করা হয়েছিল। এরূপ একতেদা সকলের মতেই জায়েজ।

وَعَنِ ٧٧٦ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৭৬. **অনুবাদ :** হযরত বারা' ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-কে ইশার নামাজে সূরা ওয়াত তীনি ওয়ায যায়তূনি পাঠ করতে শুনেছি। আমি তাঁর চেয়ে উত্তম কণ্ঠস্বর কারও শুনিনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٧٧٧ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ تَخْفِيْفًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজে সূরা ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ এবং এরূপ দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন এবং এটা ছাড়া অন্যান্য নামাজগুলো সংক্ষেপ করতেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٧٨ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭৮. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, নবী করীম ﷺ ফজরের নামাজে 'ওয়াল লাইলি ইযা আসআসা' [সূরায়ে তাকবীর] পড়তেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٧٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ (رض) قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ عِيْسٰى اَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سُعْلَةٌ فَرَكَعَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [মক্কা বিজয়ের দিন] রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় আমাদেরকে ফজরের নামাজ পড়ালেন এবং সূরায়ে মু'মিনীন পাঠ করা শুরু করলেন। যখন তিনি হযরত মূসা ও হারূন অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর কাহিনী পর্যন্ত পৌছলেন, [ক্রন্দনের দরুন] তাঁর হেঁচকি এসে গেল। তখন তিনি রুকুতে চলে গেলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীসে جَاءَ- এর فَاعِلْ রাসূল ﷺ হলে ذِكْرٌ পদটি মানসূব, তা না হলে মারফূ', আর ذكر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়াত ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هَارُوْنَ আর ذِكْرُ عِيْسٰى দ্বারা উদ্দেশ্য আয়াত وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اَوْ اُمَّهُ অর্থাৎ এ সমস্ত আম্বিয়াদের অতীত ঘটনাবলি স্মরণ পড়ায় কান্নায় তাঁর হেঁচকি এসে যায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে তিনি সূরাটি সমাপ্ত করতে পারেননি।

নামাজে কেরাত পড়তে গিয়ে কোনো কারণে যদি বাধার সৃষ্টি হয়, আর এ পরিমাণ কেরাত পড়া হয়ে থাকে যার দ্বারা নামাজ শুদ্ধ হয় অর্থাৎ বড় এক আয়াত বা ছোট তিনি আয়াত পরিমাণ, তবে তৎক্ষণাৎ রুকুতে চলে যাওয়াই উত্তম।

وَعَنْ ۷۸۰ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالٓمّٓ تَنْزِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৭৮০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজের প্রথম রাকআতে 'আলিফ লাম-মীম তানযীল' এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'হাল আ'তা আলাল ইনসান' তথা সূরা দাহ্‌র পাঠ করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ۷۸۱ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ الْاُوْلٰى وَفِى الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮১. **অনুবাদ :** হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার [খলিফা] মারওয়ান হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) জুমার নামাজে আমাদের ইমামতি করলেন এবং এতে তিনি প্রথম রাকাতে সূরায়ে জুমু'আ এবং অপর রাকাতে 'ইযা জা-আকাল মুনাফিকূন' পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জুমার দিনে এ দু'টি সূরা পড়তে শুনেছি। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জুমার দিন উক্ত সূরা দু'টি পড়ার মধ্যে সম্ভবত এর অন্তর্নিহিত কারণ হলো, মানুষের সৃষ্টি, সূচনা, পরিণতি ও পরকাল, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, বেহেশত ও দোজখ এবং এর অধিবাসীদের অবস্থার বিরবণ এবং অবশেষে দুনিয়ার ধ্বংস-প্রলয় তথা কিয়ামত কায়েম হবে সেই জুমার দিনেই। তাই প্রায়শঃ হুজুর ﷺ উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করতেন। তবে তিনি সর্বদা এটা পড়তেন না।

وَعَنْ ۷۸۲ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَفِى الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِىْ يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِى الصَّلٰوتَيْنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮২. **অনুবাদ :** হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই ঈদে এবং জুমার নামাজে 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' এ দুই সূরা পাঠ করতেন। রাবী বলেন, যদি ঈদ ও জুমা একই দিনে হতো, তখনও তিনি এ দুই সূরাই উভয় নামাজে পাঠ করতেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٧٨٣ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮৩. **অনুবাদ :** হযরত ওবায়দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একবার আবূ ওয়াকেদ লাইসী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্‌রের নামাজে কি পাঠ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল ﷺ এ দুই ঈদে 'ক্বাফ্‌ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' এবং 'ইক্বতারাবাতিস সা'আহ' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উপরে উল্লিখিত কয়েকটি হাদীসে পরস্পর বিপরীত বর্ণনা এসেছে। মূলত এটা বৈপরীত্য প্রকাশ নয়। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি হুজুর ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় একই নামাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সূরা পাঠ করেছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ অবগতি অনুসারে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর (রা.) অবশ্যই জানতেন যে, মহানবী ﷺ দুই ঈদে কি পড়েছেন, তবু লোকদের সম্মুখে প্রমাণের উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করেছেন।

وَعَنْ ٧٨٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের [সুন্নত] দু' রাকাতে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ সূরাদ্বয় পাঠ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে ফজরের দুই রাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফজরের সুন্নত রাকাতদ্বয়। রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নত নামাজে প্রায়ই ছোট ছোট সূরা পড়তেন।

وَعَنْ ٧٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَالَّتِىْ فِىْ اٰلِ عِمْرَانَ قُلْ يَآ اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৭৮৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাকাতে যথাক্রমে সূরায়ে বাকারার 'কূলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা ইলাইনা' এবং সূরায়ে আলে ইমরানের 'কুল ইয়া আহলাল কিতাবি তা'আলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়ায়িম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম' পাঠ করতেন। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٧٨٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهٗ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِذَاكَ)

৭৮৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যসহকারে নামাজ শুরু করতেন। –[তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সুদৃঢ় নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : বিস্‌মিল্লাহ সহকারে শুরু করার অর্থ হলো, বিসমিল্লাহকে প্রকাশ করে পড়তেন, এমন নয় বরং তা চুপে চুপেই পড়তেন। কেননা, পূর্বে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' দ্বারাই নামাজ শুরু করতেন এ পর্যায়ে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে। মূলত বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

---

৭৮৭ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৭৮৭. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে 'গায়রিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন, পড়তে শুনেছি। অতঃপর তিনি নিজের স্বরকে উঁচু করে 'আমীন' বলেছেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى التَّامِيْنِ فِى الصَّلٰوةِ নামাজে আমীন বলা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : নামাজে সূরা 'ফাতিহা'-এ আমীন বলা সম্পর্কে তিন ধরনের আলোচনা হতে পারে, যা নিম্নরূপ—

প্রথমত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে একমত যে, নামাজের মধ্যে সূরায়ে ফাতিহার সমাপ্তিতে আমীন বলা মোস্তাহাব। জাহেরিয়া সম্প্রদায় বলেন, ওয়াজিব এবং রাফেজীগণ বলেন, বিদ'আত। তাদের মতে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত : ইমাম 'আমীন' বলবে কি না? ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.) বলেন, ইমাম 'আমীন' বলবে না। কেবলমাত্র মুক্তাদিগণই বলবে। কেননা, আবূ হুরায়রা (রা.) -এর বর্ণিত হাদীসে আছে, ইমাম বলবে– وَلَا الضَّالِّيْنَ এবং মুক্তাদিগণ বলবে اٰمِيْنَ এ হাদীস হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইমামের অংশ হলো وَلَا الضَّالِّيْنَ পর্যন্ত বলা এবং মুক্তাদির অংশ হলো 'আমীন' বলা। ফলে উভয়টির মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ। তবে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, ইমামও আমীন বলবেন। এরূপ এক রিওয়ায়াত ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতেও বর্ণিত আছে। কেননা এক হাদীসে বর্ণিত আছে, ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও আমীন বলবে।

তৃতীয়ত : আমীন চুপে চুপে বলবে না কি প্রকাশ্যে বলবে? তবে যে নামাজের কেরাত চুপে চুপে পড়তে হয়, সে নামাজে 'আমীন'ও চুপে চুপে পড়তে হবে এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু সরব কেরাতের নামাজে 'আমীন' বলার মধ্যে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়ই চুপে চুপে 'আমীন' বলবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন, নামাজি ইমাম হন কিংবা মুক্তাদি 'আমীন' সশব্দে উচ্চারণ করতে হবে।

ইমাম মালেক (র.) বলেন, ইমাম সরব কেরাতে 'আমীন' বলবে না, বরং শব্দবিহীন কেরাতে 'আমীন'ও চুপে চুপে বলবে।

'আমীন' চুপে চুপে বলার সমর্থকদের দলিল : ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফী আলিমগণ বলেন,

১. মহানবী ﷺ বলেছেন, 'যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। অন্য আরেক হাদীসে আছে, فَاِنَّ الْاِمَامَ يَقُوْلُهَا অর্থাৎ 'ইমাম তা বলে'। এ কথাটি বলার আদৌ প্রয়োজন ছিল না। এটাই স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইমামের 'আমীন' বলাটা চুপে চুপেই হবে।

২. হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর আমলও হাদীসে বর্ণিত আছে, يُخْفِى الْاِمَامُ اَرْبَعَةَ اَشْيَاءَ اَلتَّعَوُّذَ وَالْبَسْمَلَةَ وَاٰمِيْنَ وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُ الخ তাঁরা চারটি বস্তুকে নামাজের মধ্যে চুপে চুপে পড়তেন, তা হলো আউযু, বিসমিল্লাহ, আমীন ও সুবহানাকা।

৩. আল্লামা সুয়ূতী হযরত আবূ ওয়ায়েল হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ও আলী (রা.) আউযু, বিস্‌মিল্লাহ্ ও আমীনকে প্রকাশ করে পড়তেন না।

৪. শো'বা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আমীন' বললেন এবং স্বরকে নিচু করলেন।

সরবে 'আমীন' বলার পক্ষপাতীদের দলিলের জবাব : যখন ইমাম 'আমীন' বললেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। এ হাদীসের জবাব চুপে চুপে বলার পক্ষপাতীদের তরফ হতে এই যে, اٰمِيْن-এর অর্থ– قَرُبَ اَنْ يُؤْمِنَ অর্থাৎ 'ওয়ালাদ দ্বাল্লীন, বলে 'আমীন' বলার যখন নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। এখানে مجاز। অর্থাৎ বোধগম্য বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করণার্থে اٰمِيْن বলা হয়েছে এবং অপর হাদীসে 'আমীন' বললেন এবং স্বরকে দীর্ঘায়িত করলেন, এর জবাব এই যে, এখানে মাদ্দা শব্দটির অর্থ স্বরকে উচ্চ করা নয়, বরং 'আমীন' (اٰمِيْن)-এর হামযাকে মদসহকারে দীর্ঘায়িত করেছেন ও লম্বা করে উচ্চারণ করেছেন। এটা নয় যে, 'আমীন' (اٰمِيْن)-এর হামযাকে সংক্ষিপ্ত করে উচ্চারণ করেছেন। আর যে বর্ণনায় رَفَعَ بِهَا صَوْتَهٗ অর্থাৎ 'স্বরকে উচ্চ করলেন' আছে, এর জবাব এই যে, এ বর্ণনাটি অনুবাদমূলক। অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী مَدَّ-এর অর্থ رَفَعَ বুঝেছেন। যেমন সশব্দে বলার পক্ষপাতীগণ বুঝেছেন। প্রকৃতপক্ষে মূল বর্ণনায় مَدَّ بِهَا صَوْتَهٗ-ই ছিল। আর এ বাক্যাংশ আমাদের মতের পরিপন্থি নয়।

وَعَنْ ٧٨٨ اَبِىْ زُهَيْرِ النُّمَيْرِىِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِى الْمَسْئَلَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِاَىِّ شَىْءٍ يَخْتِمُ قَالَ بِاٰمِيْنَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৭৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ যুহাইর নুমাইরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নৈশ ভ্রমণে বের হলাম এবং এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম যিনি খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছিলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যদি সে মোহরাঙ্কিত করত, তবে নিজের জন্য বেহেশ্‌ত অবধারিত করে নিত। জনতার মধ্য হতে একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী জিনিস দ্বারা মোহর অঙ্কন করবে? রাসূল ﷺ বললেন, 'আমীন' বলে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٧٨٩ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِسُوْرَةِ الْاَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৭৮৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরায়ে 'আ'রাফ' দ্বারা মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন এবং উক্ত সূরাটিকে উভয় রাকাতে ভাগ করে পড়লেন। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাগরিবের নামাজে দীর্ঘ কেরাত পড়া নাজায়েজ নয়, এটা বুঝানোর জন্য হুজুর ﷺ কখনো দীর্ঘ কেরাত দ্বারা মাগরিবের নামাজ পড়েছেন।

وَعَنْ ٧٩٠ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَاقَتَهٗ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَا عُقْبَةُ اَلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ

৭৯০. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর নস্যি ধরে টেনে চলতাম। একদা হুজুর ﷺ আমাকে বললেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে উত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না

سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اِلْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ

যা পড়া হয়? এ বলে তিনি আমাকে সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" এবং কুল আউযু বিরাব্বিন নাস" শেখালেন। কিন্তু এতে আমি তেমন খুশি হয়েছি বলে তিনি মনে করলেন না। এরপর যখন তিনি ফজরের নামাজের জন্য অবতরণ করলেন তখন এ দু'টি সূরা দ্বারাই আমাদের নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন তখন আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কেমন দেখলে, হে উকবা!-[আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلَا اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ-এর মর্মার্থ : সম্পূর্ণ কুরআনই উত্তম, তবে উক্ত সুরাদ্বয়ের অনেক মর্যাদা রয়েছে। এতে মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্কে কথা বর্ণিত হয়েছে। অকল্যাণ হতে আল্লাহর শরণ লাভের জন্য বিশেষভাবে ভ্রমণে এবং মুখস্থ করার জন্য এ দু'টি সূরা অতি সহজ ও উত্তম। বর্ণিত আছে যে, একবার নবী করীম ﷺ জনৈক যাদুকরের যাদুটোনায় আক্রান্ত হলে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ এ সূরাদ্বয় পাঠ করেন। সূরাদ্বয়ে এগারটি আয়াত রয়েছে। এগারোটি আয়াতে যাদুর এগারোটি গিরা খুলে যায়। রাসূল ﷺ যাদুটোনার ক্ষতি হতে রক্ষা পান। আজ-কালও উক্ত সূরাদ্বয় পাঠ করলে যে কোনো যাদু-টোনা জিনের ক্ষতি হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

وَعَنْ ٧٩١ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ)

৭৯১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমার রাতে [অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে] মাগরিবের নামাজে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। -[শরহে সুন্নাহ] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি জুমার রাত কথাটি উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ٧٩٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ مَا اُحْصِىْ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ بِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ . وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ)

৭৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ ﷺ -কে মাগরিবের পরের দু' রাকাত নামাজে এবং ফজরের পূর্বের দু' রাকাত নামাজে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সূরাদ্বয় কতবার যে পাঠ করতে শুনেছি তার হিসাব নেই।-[তিরমিযী]

ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, কিন্তু এতে তিনি বা'দাল মাগরিব কথাটি উল্লেখ করেননি।

وَعَنْ ٧٩٣ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ سُلَيْمَانُ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَ يَقْرَأُ فِى الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ إِلٰى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ)

৭৯৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, একমাত্র অমুকের পিছনে ছাড়া আর কারও পিছনে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজের ন্যায় নামাজ পড়িনি। সুলাইমান বলেন, আমি তার তথা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি জোহরের প্রথম দু' রাকাতকে দীর্ঘ করতেন এবং শেষ দুই রাকাতকে সংক্ষিপ্ত করতেন। আর আসর নামাজকেও। সংক্ষিপ্ত করতেন। মাগরিব নামাজে কেসারে মুফাসসাল [সংক্ষিপ্ত] সূরাসমূহ হতে পাঠ করতেন। ইশার নামাজে আওসাতে মুফাসসাল বা মধ্যম সূরাসমূহ হতে পাঠ করতেন এবং ফজরের নামাজে তিওয়ালে মুফাসসাল বা দীর্ঘ সূরাসমূহ হতে পাঠ করতেন। –[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

তবে ইবনে মাজাহ্ 'আসর নামাজকেও সংক্ষিপ্ত করতেন' পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন।

وَعَنْ ٧٩٤ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ مَعْنَاهُ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِأَبِىْ دَاوُدَ قَالَ وَأَنَا أَقُوْلُ مَالِىْ يُنَازِعُنِى الْقُرْاٰنُ فَلَا تَقْرَءُوْا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ .

৭৯৪. অনুবাদ : হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা ফজরের নামাজে রাসূল ﷺ -এর পিছনে ছিলাম, তিনি নামাজের কেরাত পাঠ করলেন, তবে কেরাত পাঠ করা তার জন্য খুবই কষ্টকর হলো। অতঃপর তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন, তখন [আমাদেরকে লক্ষ্য করে] বললেন, সম্ভবত তোমরাও ইমামের পেছনে কেরাত পড়েছ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোনো কেরাত পড়বে না। কেননা, যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার নামাজ হয় না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

কিন্তু আবূ দাউদ শরীফের অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বললেন, কি হলো, আমার সাথে কুরআন এরূপ টানাটানি করছে কেন? আমি যখন শব্দ করে কেরাত পড়ি তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত কুরআনের আর কিছু পড়ো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমামের পিছনে মুক্তাদির উপরে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব কি না? এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। এ মতভেদপূর্ণ মাসআলাটিকে اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ বলা হয়। নিম্নে এ ব্যাপারে ফিকহ্ বিদদের মতামত প্রদান করা হলো—

১. আহনাফ এবং সাহেবাঈনের মতে ইমামের পেছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তাঁদের দলিল–

١ . قَوْلُهُ تَعَالَى "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ".

٢. عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) مَرْفُوْعًا "وَإِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَانْصِتُوْا" .

٣. عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوْعًا "مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ" .

٤ . عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا "لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ" .

২. ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখের মতে ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য সব নামাজেই শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব, অন্য কেরাত পড়া ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

١ . حَدِيْثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ "قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" .

٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ "مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ".

٣ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مَعَ الْاِمَامِ فَيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৩. ইমাম মালেক ও আহমদের মতে যে নামাজে কেরাত জোরে পড়া হয় তাতে মুক্তাদির জন্য কেরাত পড়তে হবে না; কিন্তু যে নামাজে কেরাত চুপে পড়া হয়, তাতে মুক্তাদির কেরাত পড়তে হবে।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ তিন ইমামের দলিলের জবাব :

ইমামত্রয়ের দলিলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন,

১. صَلٰوة দ্বারা ইমাম ও مُنْفَرِدْ-এর নামাজের نَفِيْ করা হয়েছে; মুক্তাদির নামাজের نَفِيْ করা হয়নি।

২. অথবা প্রথমে قِرَاءَةُ خَلْفَ الْاِمَامِ জায়েজ ছিল, পরে مَنْسُوْخ হয়ে গেছে।

৩. জায়েজ ও নাজায়েজ নিয়ে হাদীসের বর্ণনায় দ্বন্দ্ব দেখা দিলে নাজায়েজের হাদীস প্রাধান্য লাভ করবে।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَالتَّوْفِيْقُ দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমাধান :

উদ্ধৃত হাদীস অনুসারে জানা যায়, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হয় না। অপর হাদীসে বলা হয়েছে, আনুগত্য করার জন্য ইমাম নির্বাচিত হয়। সুতরাং ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে, তোমরা তা শুনবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বন্দ্বের সমাধান :

১. উদ্ধৃত হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান যা আল্লাহর বাণী– وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَانْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

২. ইমাম শাফেয়ীর মতে اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ দ্বারা اَفْعَال ظَاهِرَة বা বাহ্যিক কর্মের উপর অনুসরণ বুঝানো হয়েছে।

৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস খবরে ওয়াহেদ। সুতরাং তা দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না; আর এর বিরুদ্ধে রয়েছে কুরআন। সুতরাং উদ্ধৃত হাদীসের বিধান মনসূখ।

৪. আবূ বকর রাযী (র.) বলেন, اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ দ্বারা ইমামের আনুগত্য করার হুকুম পাওয়া যায়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি মতে কুরআন শ্রবণ করা ন্যায়সঙ্গত কথা। যে লোক কুরআন শ্রবণ করে না সে এ হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করে।

سَبَبُ ثِقْلِ الْقِرَاءَةِ عَلَيْهِ ﷺ রাসূল ﷺ-এর উপর কেরাত ভারী হওয়ার কারণ :

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কেরাত ভারী বোধ হওয়ার কারণ ছিল, মুক্তাদিগণ তাঁর কেরাতের উপর যথেষ্ট না করার কারণে সৃষ্ট অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি। কেননা সম্পূর্ণ বস্তু অনেক তৎপরবর্তী অসম্পূর্ণ বস্তুর কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর নামাজে সূরা রূম পড়তে শুরু করেন এবং তিনি তাতে ভুলের শিকার হন। অতঃপর দেখা গেল যে, এটা তার পিছনে এক্তেদাকারী এক গোত্রের কারণে হয়েছিল, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করত না।

وَعَنْ ٧٩٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيْ اَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازِعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ)

৭৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এক নামাজ হতে অবসর হলেন, যাতে তিনি প্রকাশ্যে কেরাত পড়েছিলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ এখন আমার সাথে কেরাত পড়েছে? এক ব্যক্তি উত্তর করল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আমি [নামাজে মনে মনে] বলছিলাম, আমার কী হলো, কুরআন পড়তে আমি এরূপ টানা-হেচড়া অনুভব করছি কেন? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে এটা শুনল তখন হতে তারা প্রকাশ্য কেরাতের নামাজে [ইমামের পিছনে] কেরাত পড়া হতে বিরত হয়ে গেল। -[মালেক, আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী] ইবনে মাজাহ্ও এরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, এই হাদীস দ্বারা ইমামের পেছনে কেরাত পড়ার সমস্ত হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

وَعَنِ ٧٩٦ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيَاضِيِّ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِيْهِ بِهٖ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ بِالْقُرْاٰنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৭৯৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর ও বায়াযী [আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস] হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজরত ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সঙ্গোপনে কথাবার্তা বলে। সুতরাং তার লক্ষ্য রাখা উচিত, সে তার সাথে কি কথোপকথন করছে। সুতরাং একজনের কুরআন পড়ার সময় আরেকজন যেন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পাঠ না করে। -[আহমদ]

وَعَنْ ٧٩٧ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَانْصِتُوْا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৭৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ইমাম এ জন্য নির্ধারিত হয়েছেন, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। আর যখন তিনি কেরাত পাঠ করেন তখন চুপ থাকবে। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামের পেছনে কেরাত না পড়া সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত হাদীস দু'টিও ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) -এর দলিল। এ ছাড়াও অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ অর্থাৎ 'যার ইমাম রয়েছেন তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত।" সুতরাং ইমামের পেছনে কেরাত পড়া ঠিক নয়। হিদায়াপ্রণেতা আল মারগীনানী বলেন, ইমামের পেছনে মুক্তাদির কেরাত নাপড়া সম্পর্কে সাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

وَعَنْ ٧٩٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِىْ مَا يُجْزِئُنِىْ قَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَاذَا لِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَانْتَهَتْ رِوَايَةُ النَّسَائِىِّ عِنْدَ قَوْلِهِ اِلَّا بِاللّٰهِ)

৭৯৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে আরজ করল, আমি কুরআনের কোনো অংশ মুখস্থ করতে অক্ষম। সুতরাং আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বলবে– سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ মহাপবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ ব্যতীত কারও কোনো উপায় নেই, কারও কোনো শক্তি নেই। [এতদশ্রবণে] লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো সবই আল্লাহর জন্য; আমার জন্য কি? রাসূল ﷺ বললেন, তুমি বলবে– اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ "হে আল্লাহ! আমাকে দয়া করো, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমাকে রিজিক দাও"। রাবী বলেন, লোকটি দুই হাত দ্বারা এভাবে [পেয়েছি বলে] ইঙ্গিত করল এবং দু' হাত বন্ধ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি তার দু' হাত কল্যাণ দ্বারা ভরে নিল।–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী বর্ণনা الا بالله পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى قَوْلِهِ "فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا" -এর অর্থ : فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدَيْهِ وَقَبَضَهُمَا আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, উভয় হস্ত দ্বারা ইশারা করল। অর্থাৎ কালিমাগুলো একটি একটি করে আঙ্গুলে গণনা করার পর একটি একটি আঙ্গুল বন্ধ করল। এর মর্মার্থ হলো, লোকটি এ কথা বলতে চাচ্ছে যে, আমি কালিমাসমূহ মুখস্থ করেছি; এটা কখনো ভুলব না। তবে এটা প্রাথমিক যুগের হুকুম। সুতরাং পরবর্তী যুগে এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

অথবা এ হুকুম এমন ব্যক্তির জন্য, যে সবে মাত্র মুসলমান হয়েছে এবং নামাজের সময় উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার সময় পায়নি।

وَعَنْ ٧٩٩ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ)

৭৯৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ যখন "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' বাক্য পাঠ করতেন, তখন বলতেন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা-অর্থাৎ পরম পবিত্র আমার প্রভু সুমহান। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে এবং নামাজের বাইরে এই জাতীয় দোয়ার বাক্য সংযোজন করা জায়েজ আছে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এটা শুধুমাত্র নফল নামজের মধ্যে জায়েজ। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে জায়েজ নেই; অবশ্য নামাজের বাইরে জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٨٠٠ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَمَنْ قَرَأَ لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى فَلْيَقُلْ بَلٰى وَمَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلَاتِ فَبَلَغَ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ) .

৮০০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে, 'ওয়াত্তীনি ওয়ায যাইতূনি' সূরা পড়ে এবং 'এ পর্যন্ত পৌছে– "اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ" অর্থাৎ আল্লাহ কি শ্রেষ্ঠ বিধানদাতা নন? তখন সে যেন বলে ' بَلٰى "وَاَنَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ" অর্থাৎ হ্যাঁ, আমিও এর সাক্ষ্যদাতাদের অন্যতম। আর যে " لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ" সূরা পাঠ করে এবং এ পর্যন্ত পৌছে– "اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى" অর্থাৎ তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? তখন সে যেন বলে, بَلٰى অর্থাৎ নিশ্চয়। আর যে সূরায়ে ওয়ালমুরসালাত পাঠ করে এবং "فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ" পর্যন্ত পৌছে সে যেন বলে, "আমান্না বিল্লাহি" অর্থাৎ আমরা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী] কিন্তু তিরমিযী وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইমাম শাফেয়ীর মতে নামাজে বা নামাজের বাইরে কুরআনের শব্দের পরে وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ বাক্য কিংবা এ ধরনের সমর্থক সূচক বাক্য বা শব্দাবলি অতিরিক্ত সংযোজন করা জায়েজ আছে। ইমাম মালেকের মতে নফল নামাজে এ রূপ সংযোজন করা জায়েজ, কিন্তু ফরজ নামাজে জায়েজ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে নামাজের বাইরে বলা জায়েজ, নামাজের মধ্যে জায়েজ নেই। তবে তাঁর মাযহাবের সহীহ্ মত এই যে, নফল নামাজে জায়েজ আছে। কাজেই তিনি বলেন, এ ধরনের শব্দ বা বাক্য কুরআনের শেষে অতিরিক্ত সংযোজন করার আদেশ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ নামাজের বাইরে সাধারণ তেলাওয়াত কিংবা নফল নামাজের জন্য প্রযোজ্য হবে, ফলে ফরজ নামাজের বেলায় উক্ত হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য নয়।

৮০১. وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا فَسَكَتُوْا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوْا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا اَتَيْتُ عَلٰى قَوْلِهٖ فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قَالُوْا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৮০১. **অনুবাদ** : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক দলের কাছে আসলেন এবং তাদের সম্মুখে সূরা আর-রাহমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরবে শুনে রইলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি জিনের রাতে [যে রাতে জিন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং পবিত্র কুরআন শ্রবণের জন্য সমবেত হয়েছিল।] এটা জিনদের সম্মুখে পাঠ করেছিলাম। তারা [জিন সম্প্রদায়] তোমাদের চেয়ে ভাল জবাব দিয়েছিল। আমি যখনই "ফাবি আইয়্যি আ-লাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান" অর্থাৎ –তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে? বাক্য পাঠ করেছি তখনই তারা বলেছে لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ –অর্থাৎ হে প্রভু তোমার কোনো নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করি না, আর তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা"। –[তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এবং বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **[বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ]** :

قَالُوْا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ বাক্যে فَكَانُوْا اَحْسَنَ مَرْدُوْدًا আর مَنْصُوْب পদটি তামঈয হেতু مَرْدُوْدًا বাক্যে بِشَيْءٍ পদটি পরবর্তী نُكَذِّبُ-এর সাথে যুক্ত হয়েছে رَبَّنَا পদটি মুনাদা মুযাফ হেতু মানসূব।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৮০২. عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ (رض) قَالَ اِنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا اَدْرِيْ اَنَسِيَ اَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمْدًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৮০২. **অনুবাদ** : হযরত মুআয ইবনে আব্দুল্লাহ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে খবর দিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের দুই রাকাতের উভয় রাকাতেই 'ইযা যুলযিলাত' সূরা পাঠ করতে শুনেছেন। রাবী বলেন, আমি বলতে পারি না রাসূল ﷺ ভুলে গেছেন, না ইচ্ছাকৃতভাবেই এভাবে পাঠ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : রাসূল ﷺ একই সূরা উভয় রাকাতে পড়েছেন এ কথা বুঝানোর জন্য যে, দু' রাকাতে একই সূরাও পাঠ করা জায়েজ তবে প্রত্যেক রাকাতে ভিন্ন ভিন্ন সূরা পাঠ করা সুন্নত।

وَعَنْ ٨٠٣ عُرْوَةَ (رضـ) قَالَ اِنَّ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৮০৩. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত ওরওয়া [ইবনে জুবাইর] (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদা ফজরের নামাজ পড়লেন এবং উভয় রাকাতেই সূরায়ে বাকারা [বিভক্ত করে] পাঠ করলেন। –[মালিক]

وَعَنْ ٨٠٤ الْفَرَافِصَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ (رحـ) قَالَ مَا اَخَذْتُ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৮০৪. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত ফারাফিসাহ ইবনে উমাইর হানাফী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরায়ে ইউসুফ কেবল হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর কেরাত শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি তা ফজরের নামাজে পুনঃ পুনঃ পড়তেন [ফলে শুনতে শুনতে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে]।–[মালিক]

وَعَنْ ٨٠٥ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ (رضـ) قَالَ صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيْهِمَا بِسُوْرَةِ يُوْسُفَ وَسُوْرَةِ الْحَجِّ قِرَاءَةً بَطِيْئَةً قِيْلَ لَهُ اِذًا لَقَدْ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطْلَعُ الْفَجْرُ قَالَ اَجَلْ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৮০৫. **অনুবাদ :** হযরত আমের ইবনে রাবীআ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর পিছনে ফজর নামাজ পড়লাম। তিনি ঐ নামাজের দু' রাকাতেই দু'টি পূর্ণ সূরা-সূরায়ে ইউসুফ ও সূরায়ে হজ্জ ধীর গতিতে থেমে থেমে পড়লেন। আমেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হযরত ওমর সম্ভবত ফজর নামজের প্রথম ওয়াক্তেই নামাজ শুরু করেছিলেন; আমের বললেন, হ্যাঁ। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ [বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ] :

قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرٍ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى مَا ذَكَرْتَ اِذًا وَاللّٰهِ لَقَامَ فِي الصَّلٰوةِ اَوَّلَ কালামটি হলো নিম্নরূপ– اِذًا لَقَدْ كَانَ الخ بَطِيْئَةً উদ্দেশ্য নয়। مُوَاظَبَتْ কিন্তু হাদীসে مَاضِىْ اِسْتِمْرَارِىْ বাক্যটি যদিও الْوَقْتِ حِيْنَ الْغَلَسِ قَالَ اَجَلْ كَانَ يَقُوْمُ পদটি হলো حَالٌ -

---

وَعَنْ ٨٠٦ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ اِلَّا قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৮০৬. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি মুফাস্সাল সূরার ছোট বড় সব কয়টি সূরা দ্বারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফরজ নামাজের ইমামতি করতে দেখেছি। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِسُوْرَةِ الْمُفَصَّلِ সূরা মুফাসসাল দ্বারা উদ্দেশ্য : সূরায়ে হুজুরাত হতে নাস পর্যন্ত সব কয়টি সূরাকে 'মুফাস্‌সাল' বলা হয়। মুফাস্‌সাল তিন ভাগে বিভক্ত। 'হুজুরাত' হতে 'বুরূজ' পর্যন্ত সূরা গুলোকে 'তেওয়ালে মুফাস্‌সাল, 'বুরূজ' হতে 'লাম ইয়াকুন' পর্যন্ত সূরাসমূহকে 'আওসাতে মুফাস্‌সাল' এবং 'লামইয়াকুন' হতে 'নাস' পর্যন্ত সমস্ত সূরাগুলোকে 'কিসারে মুফাস্‌সাল' বলা হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর জামানায় এটা নির্ধারণ করা হয়েছে।

---

৮০৭ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُقْبَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِـحٰمٓ الدُّخَانِ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ مُرْسَلًا)

৮০৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উত্‌বা ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাজে 'হা-মীম আদ্দুখান' এই সূরাটি পাঠ করেছেন।—[নাসায়ী হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث হাদীসের বাখ্যা : আলোচ্য হাদীসসমূহ দ্বারা এটা বুঝা যায়, যে রাসূল ﷺ এক এক সময় এক এক সূরা পাঠ করতেন এবং কখনো একই সূরাকে ভাগ করেও পড়েছেন। এ ভাবে তিনি সমস্ত কুরআনই পাঠ করেছেন; আর বর্ণনাকারীগণ যা শুনেছেন বা অবগত হয়েছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الرُّكُوْعِ
পরিচ্ছেদ : রুকু

اَلرُّكُوْعُ শব্দটি বাবে فَتَحَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْاِنْحِنَاءُ তথা অবনত হওয়া, অর্ধনমিত হওয়া বা ঝুঁকে যাওয়া। আবার এটা কখনো اَلْخُضُوْعُ বা বিনয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাঁটুর উপর হাত রেখে অর্ধনমিত হওয়াকে রুকু বলে। এটা নামাজের অভ্যন্তরীণ ফরজসমূহের একটি, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ আর নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন যে, اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللّٰهِ اِنِّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য রুকু ছিল না, শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীরই এই বৈশিষ্ট্য। নিম্নে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আলোচিত হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٠٨ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللّٰهِ اِنِّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮০৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রুকু ও সেজদা যথাযথভাবে সমাধা করো। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আমার পশ্চাৎ হতেও দেখি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** পিছনের দিকে দেখতে পাওয়া এটা মহানবী ﷺ-এর একটি বিশেষ মু'জিযা। কিছু সংখ্যকের মতে হুজুর ﷺ-এর মোহরে নবুয়তের কারণে পিছনের দিকে দেখতে পেতেন বা তিনি অন্তরদৃষ্টি দ্বারাও পিছনের দিকে দেখতে পেতেন। রাসূল ﷺ-এর এ কথায় সাহাবীদেরকে সুন্দরভাবে রুকু-সেজদা করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে, যাতে কেউ রুকু-সেজদাতে গাফিলতি না করে।

٨٠٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِىِّ ﷺ وَسُجُوْدُهٗ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَاخَلَا الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮০৯. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর রুকু তাঁর সেজদা, দুই সেজদার মধ্যখানে বসা ও রুকুর পরে মাথা উঠিয়ে দাঁড়ানো, এ চারটি কাজের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল; কিন্তু কিয়াম ও কুউদের পরিমাণে ব্যতিক্রম ছিল। –[বুখারী মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** 'কিয়াম' অর্থ– দাঁড়ানো। শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের কেরাত পাঠকালীন দাঁড়ানোকে 'কিয়াম' বলে। আর 'আত্যাহিয়্যাতু' পড়াকালীন বসাকে বলা হয় 'কুউদ'। কিয়াম এবং শেষ বারে তাশাহহুদ পড়াকালীন বসা নামাজের রোকন তথা ফরজ। অবশ্য তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম দু' রাকাতের পর বসা ওয়াজিব।

وَعَنْ ٨١٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা [মনে মনে] বলতাম, তিনি সম্ভবতঃ ভুলে গিয়েছেন। অতঃপর সেজ্দা করতেন এবং দু' সেজ্দার মধ্যখানে এতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকতেন যে, আমরা [মনে মনে] বলতাম, তিনি সম্ভবত ভুলে গেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নবী করীম ﷺ সাধারণত ফরজ ব্যতীত অন্যান্য নফল নামাজে বিভিন্ন দোয়া-কালাম পাঠ করার জন্য এরূপ দীর্ঘ সময় দেরি করতেন, সম্ভবত কোনো কোনো সময় ফরজ নামাজেও এরূপ করতেন। حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهَمَ ফলে আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি ভুলে গেছেন। এর অর্থ হলো, তিনি এত দীর্ঘ সময় রুকু হতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম সম্ভবত তিনি উক্ত রুকু ও রাকআতকে বাতিল সাব্যস্ত করে নতুনভাবে কিয়ামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং নামাজকে প্রথম হতে শুরু করবেন।

وَعَنْ ٨١١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ" يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮১১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর রুকূ-সেজদার মধ্যে খুব বেশি বেশি বলতেন, যার অর্থ- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ "হে আমাদের আল্লাহ! হে প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর"। তিনি এ কার্য কুরআনের আদেশ মতোই করতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামের সূরায়ে 'নসর'-এ বলেছেন- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ 'তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।' উক্ত আয়াতের নির্দেশ মোতাবেকই মহানবী ﷺ এভাবে তাস্‌বীহ পাঠ করতেন।

وَعَنْهَا ٨١٢ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। [[তিনি বলেন] যে, নবী করীম ﷺ তাঁর রুকুতে এবং সেজদাতে বলতেন, سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ অর্থ- আল্লাহ অতি পাক ও পবিত্র; তিনি ফেরেশতাগণের প্রতিপালক এবং রুহ বা জিবরাঈল ফেরেশ্তারও প্রতিপালক। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٨١٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১৩. **অনুবাদ** : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সাবধান! আমাকে রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা রুকুতে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে এবং সেজদাতে প্রার্থনায় খুব প্রচেষ্টা করবে অর্থাৎ খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করবে। খুবই সম্ভাবনা আছে যে, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : রুকু ও সেজদা অবস্থায় কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশ পাঠ করা মাকরূহে তাহরীমী। কেননা, বান্দা স্বয়ং নিজে অবনত হয়ে খোদার কাছে নিজের অসহায়তা ও বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে। রুকু সেজ্দা হলো বিনয়ের চরম বহিঃপ্রকাশ, বস্তুত বান্দা স্বয়ং অবনত ও বিনয় প্রকাশ করবে। কিন্তু আল্লাহ তথা আল্লাহর কালামকে অবনত করা যায় না। সুতরাং উক্ত দুই অবস্থায় কুরআন পাঠ করা হারাম। ফলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ এবং সেজদায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ফরজ নামাজে পড়াই শ্রেয়। অবশ্য নফল নামাজে অন্যান্য তাসবীহ বা দোয়াও পাঠ করা যায়।

وَعَنْ ٨١٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهٗ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهٗ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮১৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ইমাম যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবেন তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ" অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! সকল প্রশংসা তোমারই" এ কথা বলবে। কারণ যার বলা ফেরেশ্‌তাদের বলার সময়ে হবে তার বিগত জীবনের [ছোটখাটো] পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ مَعًا **তাসমী' ও তাহমীদ একত্র করবে কি না এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে** : ইমাম শাফেয়ী, আতা, আবূ বুরদা, মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, ইসহাক, দাউদ যাহেরী ও ইমাম মালেক [এক মতে]-এর মতে নামাজী ব্যক্তি ইমাম হোক বা মুক্তাদি, একাকী নামাজ আদায়কারী হোক বা জামাতে, সর্বাবস্থায় তাসমী' ও তাহমীদ একসাথে করবে।

مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَمَالِكٍ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রা.)-এর মতে ইমাম ও একাকী নামাজি তাসমী' ও তাহমীদ উভয়ই একত্র করে পড়বে। ইমাম ত্বাহাবী (র.) এ মতই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ ـ

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّعْبِىِّ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ **ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালেক, শা'বী, আহমাদ, ইবনে মাসউদ, আবূ হুরায়রা** (রা,) প্রমুখের মতে ইমাম শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলবে এবং মুক্তাদি শুধু رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ বলবে। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে আনয়ন করেন–

عَنْ اَنَسٍ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ .

আলোচ্য হাদীসটিতে ইমাম ও মুক্তাদির অংশ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তথা ইমামের অংশ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ আর মুক্তাদির অংশ হলো رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের উপস্থাপিত দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ যে হাদীসদ্বয় প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেন তার জবাব এই যে, উক্ত হাদীসদ্বয়ে একাকী নামাজ পড়ার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ একাকী নামাজ পড়া অবস্থায় رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ও سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ উভয়টি বাক্য পড়তেন।

وَعَنْ ٨١٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ ظَهْرَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু হতে পিঠ উঠিয়ে সোজা হতেন, তখন বলতেন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ অর্থ– "যে আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! প্রশংসা তোমরাই, সমগ্র নভোমণ্ডল ভরা, পৃথিবী ভরা এবং পরবর্তীতে তুমি যা চাও, সবকিছু ভরা।

وَعَنْ ٨١٦ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! প্রশংসা তোমারই সমগ্র নভোমণ্ডল ভরা, পৃথিবী ভরা এবং পরবর্তীতে তুমি যা চাও, সবকিছু ভরা হে প্রশংসা ও মর্যাদার পাত্র! তোমার গুণগানে বান্দা যা বলে, তুমি তা হতেও বেশি যোগ্য। আমরা সকলেই তোমার গোলাম। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করবে, তাতে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই, আর যাতে তুমি বাধা দেবে, তাও দান করার মতো কেউ নেই। কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার শাস্তির মোকাবিলায় কাজে আসবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ : أَهْلَ الثَّنَاءِ পদটি মারফূ' হলে উহ্য أَنْتَ অথবা هُوَ মুবতাদার খবর হবে, আর মানসূব পড়লে উহ্য أَعْنِيْ -এর মাফউল হবে। অথবা, মুনাদা মুযাফ হেতু মানসূব হবে। অর্থাৎ يَا أَهْلَ الثَّنَاءِ
اَللّٰهُمَّ الخ অর্থাৎ أَحَقُّ পদটি খবর হেতু মারফূ'। অথবা أَحَقُّ মুবতাদা أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ লَكَ অর্থাৎ أَنْتَ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ খবর, আর كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ টি জুমলায়ে মু'তারেজা।
অথবা أَحَقُّ পদটি সীগায়ে মাযী আর مَا قَالَ الْعَبْدُ-এর مَا পদটি مَوْصُوْلَةٌ অথবা مَوْصُوْفَةٌ আর عَبْد হতে রাসূল ﷺ উদ্দেশ্য। শব্দটি تَوَاضُعْ-এর প্রতি ইঙ্গিত করে।

وَعَنْ ٨١٧ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ انِفًا قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلٰثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৮১৭. অনুবাদ : হযরত রিফাআ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়ছিলাম। রাসূল ﷺ যখন রুকু হতে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" তখন তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি বলে উঠল, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ" অর্থাৎ "হে প্রভু! আর সকল প্রশংসা তোমারই; অনেক অনেক প্রশংসা, পূত ও পবিত্র প্রশংসা, কল্যাণময় প্রশংসা"। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন বললেন, এইমাত্র কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, "আমি বলেছি"। রাসূল ﷺ বললেন, আমি ত্রিশের উর্ধ্বে ফেরেশ্‌তাদের দেখলাম, তারা খুব তাড়াহুড়া করছে যে, কার আগে কে কথাগুলোকে লিখবে [এবং আল্লাহর দরবারে পৌঁছাবে]। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ [বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ] :
أَنَا পদটি خَبَرْ হেতু মারফূ'র স্থলে। অর্থাৎ ذٰلِكَ الْمُتَكَلِّمُ أَنَا অথবা এর উল্টা হতে পারে। অর্থাৎ أَنَا পদটি মুবতাদা।
أَوَّلُ পদটি যরফ হেতু মানসূব। অর্থাৎ أَوَّلَ مَرَّةٍ অথবা হাল হেতু مَنْصُوْبٌ অথবা পদটি مَبْنِى عَلَى الضَّمِّ আর أَيُّهُمْ শব্দটি মুবতাদাতা يَكْتُبُهَا তার খবর।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨١٨ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৮১৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মাসউদ আন্‌সারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারও নামাজ কবুল হয় না, যে পর্যন্ত না সে রুকুতে ও সেজদাতে তার পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নামাজের রুকু ও সেজদাকে ধীরস্থিরভাবে সম্পাদন করাকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় تَعْدِيْلُ اَرْكَانٍ 'তাদীলে আরকান'। রুকু কিংবা সেজদাতে ন্যূনতম এক তাস্‌বীহ পরিমাণ সময় স্থির না থাকলে তা'দীলে আরকান হবে না, আর সহীহ্ শুদ্ধভাবে একবার 'সুব্‌হানাল্লাহ্' বলতে যেটুকু সময় লাগে, তাই এক তাস্‌বীহ পরিমাণ সময়। এ সময় পরিমাণ রুকু সেজদাতে না থাকলে তার ওয়াজিব আদায় না হওয়ার কারণে নামাজ পরিপূর্ণ হবে না। উপরিউক্ত হাদীস অনুসারে ইমাম মালিক, ইমাম শায়েয়ী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নামাজের মধ্যে তাদীলে আরকান অর্থাৎ, নামাজের রুকূ-সিজদা ধীরস্থির ভাবে সম্পাদন করাকে ফরজ বলেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এটাকে ওয়াজিব বলেন। এক তাসবীহ পরিমাণ সময়ের কম হলে তাকে স্থিরতা বলা যায় না।

وَعَنْ ٨١٩ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا نُزِلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

৮১৯. **অনুবাদ :** হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন "ফাসাব্বিহ বি-ইস্‌মি রাব্বিকাল আযীম" [তোমাদের মহা প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো] আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তোমাদের রুকুর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে নাও, আর যখন "সাব্বিহিসমি রাব্বিকাল আ'লা" অর্থাৎ "তোমার উচ্চ মর্যাদাবান প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো" আয়াত নাজিল হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একে তোমাদের সিজদায় অন্তর্ভুক্ত করে নাও। –[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লাহ বলেছেন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ এ নির্দেশ অনুযায়ী মহানবী ﷺ আমাদেরকে রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলতে আদেশ করেছেন। এখানে اَلْعَظِيْمُ অর্থ– মহান এবং اَلْاَعْلٰى অর্থ– উচ্চ মর্যাদাবান।

وَعَنْ ٨٢٠ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَ ذٰلِكَ اَدْنَاهُ وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهٗ وَ ذٰلِكَ اَدْنَاهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ)

৮২০. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত আওন ইবনে আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [ইবনে মাসউদ] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ রুকু করে এবং সে রুকুতে তিনবার বলে– "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'যীম তখন তার রুকু পূর্ণ হলো। আর এটাই হলো তার সর্ব নিম্নস্তর। আর যখন কেউ সিজ্দা করে এবং সে তার সেজ্দায় তিনবার বলে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" তখন তার সেজ্দা পূর্ণ হলো, আর এটাই হলো তার সর্ব নিম্নস্তর। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটির বর্ণনা সূত্র মুত্তাসিল বা পর্যায়ক্রমিক নয়, বরং বিচ্ছিন্ন। কেননা হযরত আওন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) -এর সাক্ষাৎ পাননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রুকু ও সেজদার তাসবীহ তিনবার পড়া পূর্ণতার সর্বনিম্নস্তর; তবে একবার বললেও সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। ইমাম ইবনুল মালিক (র.) বলেন, পূর্ণতার সর্বনিম্নস্তর হলো তিনবার তাসবীহ বলা মধ্যমস্তর হলো পাঁচবার বলা সর্বোচ্চ হলো সাত বা ততোধিক বলা।

وَعَنْ ٨٢١ حُذَيْفَةَ (رضـ) اَنَّهٗ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَفِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلَّا وَقَفَ وَسَاَلَ وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ عَذَابٍ اِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ الْاَعْلٰى وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৮২১. **অনুবাদ :** হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়েছেন। তিনি তাঁর রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজদাতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলতেন। আর যখনই কোনো রহমতের আয়াতে পৌঁছতেন থেমে যেতেন এবং [আল্লাহর নিকট রহমত] প্রার্থনা করতেন এবং যখন কোনো শাস্তির আয়াতে পৌঁছতেন তখন থেমে যেতেন এবং শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাইতেন। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী এবং নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটি হাসান সহীহ]

وَعَنْ ٨٢٢ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৮২২. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাথে নামাজে দাঁড়িয়েছিলাম। যখন তিনি রুকুতে গেলেন তখন তিনি সূরায়ে 'বাকারাহ্' পরিমাণ রুকুতে অবস্থান করলেন এবং তিনি রুকুতে [এই দোয়া] বলতে লাগলেন, আমি প্রতাপশালী, সার্বভৌম ও সুমহানের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। -[নাসাঈ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٢٣ ابْنِ جُبَيْرٍ (رحـ) قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضـ) يَقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَحَزَرْنَا رُكُوْعَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَسُجُوْدَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৮২৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, আমি শুনেছি যে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেছেন– এ যুবকের অর্থাৎ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের পিছনে ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে আর কারও পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের সদৃশ নামাজ পড়িনি। সাঈদ ইবনে জুবায়ের বলেন, হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, আমরা অনুমান করেছি যে, তাঁর রুকু, দশ তাসবীহ পরিমাণ সময় এবং সেজদা ও দশ তাস্‌বীহ পরিমাণ সময় ছিল। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٨٢٤ شَقِيْقٍ (رحـ) قَالَ اِنَّ حُذَيْفَةَ (رضـ) رَاٰى رَجُلًا لَا يَتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْمُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِىْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৮২৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হুযাইফা (রা.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজে তার রুকু ও সিজদা পূর্ণ করেছে না। যখন সে নামাজ সমাপ্ত করল তখন হযরত হুযাইফা (রা.) তাকে ডেকে বললেন, তুমি তো নামাজ পড়নি। রাবী শাকীক (র.) বলেন, আমি বোধকরি যে, তিনি [হুযাইফা] এটাও বলেছেন, যদি তুমি [এ অবস্থায় অসম্পূর্ণ রুকু সিজদার নামাজ সহকারে] মরে যাও তবে ফিতরাতের বাইরে মরবে, যে ফিতরাতের উপরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفِطْرَةُ - এর অর্থ : فِطْرَةٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নির্দেশিত পথ বা তাঁর অনুঃসৃত সুন্নত অথবা দীন ও মিল্লাতে ইসলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতে স্বেচ্ছায় নামাজ বর্জনকারী সরাসরি কাফের হয়ে যায়, যেমন পরবর্তীকালে ইমাম আহমদের অভিমতও এরূপই। অবশ্য অন্যান্য ইমামগণ বলেন, যদি কেউ নামাজ বর্জন করাকে বৈধ বা হালাল মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর এখানে 'ফিত্‌রাতের উপর মরবে না' এর অর্থ হলো, পরিপূর্ণ দীনে ইসলামের উপর তার মৃত্যু হবে না।

وَعَنْ ٨٢٥ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلٰوتِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلٰوتِهٖ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৮২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে চুরির দিক দিয়ে জঘন্য চোর সেই ব্যক্তি যে নিজের নামাজের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে মানুষ তার নামাজের অংশ চুরি করে? রাসূল ﷺ বললেন, নামাজের রুকু ও সিজ্‌দা পূর্ণ করে না। [এটাই নামাজের অংশ চুরি করা]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : প্রচলিত চুরির দ্বারা দুনিয়াতে অনেক সময় চোরের বাহ্যিক লাভ বা সম্ভাবনা থাকে। যেমন– চুরি করার পর তার প্রকৃত মালিককে বলল এবং তার কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করে মালটিকে নিজের জন্য হালাল করে নিল। অথবা কখনো তার হাত কাটা হলো ফলে আশা করা যায় আখেরাতের আজাব ও শাস্তি হতে অব্যাহতি লাভ করবে। পক্ষান্তরে নামাজের অংশ চুরি করার মধ্যে অপরের কোনো ক্ষতি তো হয় না; বরং ক্ষতি যা কিছু হয় তা সবটা নিজেরই। কেননা এতে সে কোনোরূপ লাভবান তো হয়ই না; বরং তদস্থলে আজাব বা শাস্তি তার জন্য অবধারিত। তাই নামাজের চুরিকে জঘন্যতম বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٨٢٦ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا تَرَوْنَ فِى الشَّارِبِ وَالزَّانِىْ وَالسَّارِقِ وَ ذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ فِيْهِمُ الْحُدُوْدُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيْهِنَّ عُقُوْبَةٌ وَاَسْوَءُ السَّرِقَةِ الَّذِىْ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ قَالُوْا وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلٰوتَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَ رَوَى الدَّارِمِىُّ نَحْوَهٗ)

৮২৬. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে মুররাহ (রা.) হতে হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবীদেরকে] বললেন, তোমরা মদখোর, ব্যভিচারী ও চোরের শাস্তি সম্পর্কে কি মত পোষণ কর? এটা ছিল এগুলো সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভাল জানেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এগুলো জঘন্য অপরাধ, আর এগুলোর জন্য শাস্তিও রয়েছে। চুরির মধ্যে জঘন্য চুরি হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজ নামাজের অংশ চুরি করে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে তার নামাজের অংশ চুরি করবে? রাসূল ﷺ বললেন, সে নামাজের রুকু ও সিজদা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে না। –[মালেক, আহমদ ও দারেমী]

بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهٖ

পরিচ্ছেদ : সিজদা ও তার মাহাত্ম্য

اَلسُّجُوْدُ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার; শাব্দিক অর্থ হলো– وَضْعُ جَبْهَةِ الرَّأْسِ عَلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ জমিনের উপর কপাল রাখা। আর শরিয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো, আল্লাহ নিকট চরম বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে কপাল, নাক, উভয় হাত, পা ও হাঁটু জমিনের উপর রাখা, এটি নামাজের রোকনসমূহের একটি। এটা ফরজ হয়েছে পবিত্র কুরআন দ্বারা ; যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا মহানবী ﷺ বলেন– اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

নাক ব্যতীত শুধু কপাল জমিনে রাখলেও ফিকহবিদদের মতে সিজদা আদায় হয়ে যাবে এবং নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিনা ওজরে শুধু কপাল কিংবা শুধু নাকের উপর সিজদা করলে মাকরূহ হবে। আর সাহেবাইনের মতে শুধু নাকের উপর সিজদা করা জায়েজ নেই।

সবচেয়ে বিনয় প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো সিজদা করা। আলোচ্য অধ্যায়ে সিজদা ও তার মাহাত্ম্য সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٢٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَاَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮২৭. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন আমি সাতটি হাড় [অঙ্গ] দ্বারা সিজদা করি। [আর তা হলো] কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের মাথা। আর কাপড় ও চুল যেন না গোছাই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহ্মদ ও যুফার-এর মতে সপ্তাঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। উল্লিখিত হাদীসের উপরই তাঁদের আমল।

ইমাম আবূ হানীফা ও মালেকের মতে শাফেয়ী ও আহমদের অসমর্থিত এক বর্ণনা অনুসারে সিজদার জন্য শুধুমাত্র কপালই জমিনে রাখা ওয়াজিব, উভয় পা জমিন হতে পৃথক রাখলে নামাজই হবে না। অবশ্য এক পা আলগ রাখলে মাকরূহ হবে। সিজদায় অন্তত পায়ের একটি অঙ্গুলি হলেও কেবলামুখী করে রাখবে, অথচ অনেক নামাজিকে দেখা যায় এ ব্যাপারে বড়ই অসাবধান। বিনা ওজরে এক পা জমিন হতে পৃথক রাখলে নামাজ মাকরূহ হবে।

সিজদায় কপাল ও নাক উভয়টি রাখা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং কোনো কোনো মালেকী মতালম্বীর মতে সিজদা করার সময় কপাল ও নাক দু'টি লাগানোই ফরজ। একটা দ্বারা সিজদা করলে শুদ্ধ হবে না।

مَذْهَبُ الْاَحْنَافِ : হানাফী মাযহাবের তিন ইমামের মতে এবং ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের অন্য এক বর্ণনা মতে যদি নাকের মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকে তা হলে শুধু কপাল দ্বারা সিজদা করাই যথেষ্ট হবে, এতে নামাজ মাকরূহ হবে না। আর যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তা হলে নামাজ সহীহ হবে কিন্তু মাকরূহ হবে। আর যদি কপালে কোনো অসুবিধা থাকে তা হলে শুধু নাক দ্বারা সিজদা করা হানাফী মাযহাবের তিন ইমাম এবং ইমাম শাফেয়ীর এক রিওয়ায়াত অনুসারে জায়েজ আছে।

যদি কোনো অসুবিধা না থাকে তা হলে শুধু নাক দ্বারা সিজদা করা কোনো কোনো মালেকী মতাবলম্বী এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে মাকরূহ সহকারে জায়েজ হবে। ইমাম শাফেয়ী, সাহেবাইন [আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ]-এর এক বর্ণনা অনুসারে বৈধ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অন্য এক মতও এরূপ, আর এর উপরেই ফতোয়া। তিরমিযী শরীফের টীকা, হিদায়া ও দুররে মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থে আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) সাহেবাইনের মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং এর উপরেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

سَبْعَةُ أَعْظُم দ্বারা উদ্দেশ্য : أَعْظُم বহুবচন, একবচনে عَظْمٌ অর্থ– হাড়। এখানে শরীরের কয়েকটি অঙ্গ উদ্দেশ্য। মূলত সিজদা করতে উল্লিখিত সাতটি অঙ্গই একত্রে ব্যবহৃত হয়। কাজী ইয়ায (র.) বলেন, أُمِرْتُ শব্দ দ্বারা স্বাভাবিকভাবে এটাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্দেশ দানকারী স্বয়ং আল্লাহই। সুতরাং সিজদার মধ্যে উল্লিখিত অঙ্গসমূহ জমিনে রাখা যে ওয়াজিব তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

حُكْمُ كَفْتِ الثِّيَابِ وَالشَّعْرِ সিজদাকালে কাপড় ও চুল গোছানোর বিধান : নামাজে সিজদায় যেতে মাটি-কাদা হতে রক্ষা করার জন্য কাপড় গুটানো এবং জামা টেনে তোলা মাকরূহ। পুরুষ মানুষ নামাজে মাথার চুল ছেড়ে রাখবে। এটিই মোস্তাহাব। কিন্তু মহিলাদের চুল ছেড়ে রাখবে না; বরং বেঁধে রাখবে। মেয়েলোকদের জন্য চুল ছেড়ে রাখা মাকরূহ, আর বেঁধে রাখা মোস্তাহাব। কারণ মেয়েলোকদের চুল 'সতর'-এর অন্তর্ভুক্ত। বেঁধে না রাখলে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَنْ ٨٢٨ - أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮২৮. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা সিজদায় তা'দীল রক্ষা কর [অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর]। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন [সিজদার সময়] কুকুরের মতো মাটিতে হাত বিছিয়ে না দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সিজদায় তা'দীল রক্ষা করার অর্থ ধীরস্থিরভাবে সিজদা করা, উভয় হাতের তালু জমিনে রাখা, উভয় হাতের কনুই জমিন হতে উপরে তুলে রাখা এবং পেটকে উরুদ্বয় হতে পৃথক রাখা। এ নির্দেশ পুরুষের জন্য। এর ব্যতিক্রম করা পুরুষের জন্য মাকরূহ। অবশ্য মহিলাদের জন্য উভয় হাতের কনুই মাটির সাথে এবং পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখাই মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٨٢٩ - الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَ ارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮২৯. **অনুবাদ** : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি সিজদা কর তখন তোমার দুই করতল [হাতের তালু] মাটির উপরে রাখ এবং তোমার দুই কনুই জাগিয়ে [উঁচু করে] রাখ। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٣٠ - مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ جَافٰى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بُهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ هٰذَا لَفْظُ اَبِى

৮৩০. **অনুবাদ** : উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ সিজদা করতেন তখন দু' হাতকে পৃথক রাখতেন, এমনকি যদি ছাগল ছানা তার দুই হাতের নিচ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইত, তবে অতিক্রম করতে পারত। এটা আবূ দাউদের বর্ণনা, শরহে সুন্নাহে সনদসহকারে এভাবেই

دَاوُد كَمَا صَرَّحَ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ بِاِسْنَادِهٖ وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بُهْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ ـ

উল্লেখ করা হয়েছে। একই অর্থে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত মাইমূনা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন যদি একটি ছাগল ছানা ইচ্ছা করত তবে তাঁর দুই হাতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যেতে পারত।

وَعَنْ ٨٣١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সিজদা করতেন তখন দু' হাত [বাহুদ্বয়] পাঁজর হতে পৃথক রাখতেন, এমনকি তাঁর দুই বগলের শুভ্রতা নজরে পড়ত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ -এর ব্যাখ্যা : বুহাইনাহ হলো মালিকের স্ত্রী এবং আব্দুল্লাহর মা, আর মালিক হলো আব্দুল্লাহর বাপ।

اِبْنٌ শব্দ ব্যবহারের মূলনীতি এই যে, যে দুই ইসমের মধ্যে اِبْنٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যকার সম্পর্ক যদি পিতা-পুত্র হয় তবে اِبْنٌ শব্দটি আলিফবিহীনভাবে ব্যবহৃত হবে। যেমন– عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَالِكٍ ـ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ কিন্তু اِبْنٌ শব্দটি যদি দু'টি ইসমের মধ্যে আলিফসহ ব্যবহৃত হয় তবে মনে করতে হবে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্র নয়, যেমন বলা হয়েছে مَالِكُ ابْنُ بُحَيْنَةَ এখানে বুহাইনাহ হলো আব্দুল্লাহর মা। যেমনি বলা হয় عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلٍ এখানে سَلُوْلٌ হলো আব্দুল্লাহর মাতা এবং উবাইর স্ত্রী।

وَعَنْ ٨٣٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجُلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَّتَهٗ وَسِرَّهٗ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় পাঠ করতেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجُلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার সমস্ত অপরাধ–ছোট, বড়, আগের ও পরের, প্রকাশ্য ও গোপনীয় সব ক্ষমা করে দাও। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٣٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهٗ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا

৮৩৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানা হতে হারিয়ে ফেললাম (অর্থাৎ বিছানায় পেলাম না) অতঃপর আমি তাঁকে [অন্ধকারে] খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তার দুই পায়ের তালুতে লাগল। তিনি মসজিদে ছিলেন আর দুই পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায়

مَنْصُوبَتَانِ وَيَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

[সিজদায় রত] ছিল। তিনি তখন বলছিলেন- اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ . অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে, তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি হতে রেহাই চাচ্ছি এবং তোমারই রহমতের দ্বারা তোমার আক্রোশ হতে পানাহ কামনা করছি। আমি তোমার প্রশংসা করার সাধ্য রাখি না। তুমি তা-ই যেরূপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।" -[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٣٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৩৪. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- বান্দা আপন প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় তখনই, যখন সে সিজদায় রত থাকে। সুতরাং তোমরা তখন বেশি বেশি দোয়া প্রার্থনা করতে থাকবে। -[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٨٣٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَأَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَتٰى اُمِرَ ابْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৩৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পাঠ করে আর [সাথে সাথে] সিজদা করে তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে এক দিকে চলে যায় এবং বলে, হায়রে আমার পোড়া কপাল! আদম সন্তান সিজদার আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সিজদা করল, ফলে তার জন্য নির্ধারিত হলো বেহেশত। আর আমাকে সিজদা করতে আদেশ করা হলো, কিন্তু আমি তা আদায় করতে অস্বীকার করলাম, ফলে আমার জন্য ধার্য হলো জাহান্নামের আগুন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَا وَيْلَتٰى -এর ব্যাখ্যা : মূলে ছিল يَا وَيْلِىْ এখানে يَاء -কে تَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পরে اَلِفْ বর্ধিত করা হয়েছে। وَيْلٌ অর্থ হলো- দুঃখ ও ধ্বংস। পূর্ণ বাক্যটি তখন এরূপ হবে يَا حُزْنِىْ وَيَا هَلَاكِىْ اُحْضُرِىْ نُدْبَةً هٰذَا وَقْتُكِ وَ اَوَانُكِ অর্থাৎ হে আমার দুর্ভাগ্য! একবার এসে আমার ধ্বংসের পরিমাণটি প্রত্যক্ষ কর।

وَعَنْ ٨٣٦ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوُضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِيْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৩৬. **অনুবাদ** : হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত যাপন করতাম। একদা আমি তাঁর অজু ও এস্তেঞ্জা করার জন্য পানি আনলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চাইতে পার। তখন আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বেহেশতে আপনার সঙ্গ লাভ করতে চাই। হুজুর ﷺ বললেন, এটা ছাড়াও আর কিছু চাও কি? আমি বললাম, যা চাই তাও এটাই। এবার হুজুর ﷺ বললেন, তা হলে বেশি বেশি সিজদার দ্বারা তুমি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ **-এর ব্যাখ্যা** : মহানবী ﷺ রাবীয়াহ ইবনে কা'বকে বলেছেন, তুমি যদি বেহেশতে আমার সঙ্গী হতে চাও, তবে তোমরা নিজের ব্যাপারে আমাকে সহায়তা করো, বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে অর্থাৎ বেশি বেশি নামাজ পড়ে তুমি তোমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করো তবেই তুমি বেহেশতে আমার সঙ্গী হতে পারবে। কেননা অধিক নামাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। এ কথাটি অনুরূপ– যেমন কোনো চিকিৎসক রোগীকে বলল, আমি তোমার রোগ নিরাময় করে দেব, তবে তোমাকে আমার আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

মোটকথা, বেহেশতে তুমি আমার সঙ্গী হতে চাইলে আমার উপস্থাপিত দীন তোমাকে মেনে চলতে হবে।

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **[বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ]** : اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ বাক্যাংশে هَمْزَةٌ টি ইসতেফহামিয়া এবং وَاوْ টি عَاطِفَه হলে বাক্যটি হবে اَتَمَنّٰى ذٰلِكَ اَطْلُبُ غَيْرَ ذٰلِكَ এ ব্যাখ্যানুযায়ী غَيْر পদটি মাফউল হেতু মানসূব। পক্ষান্তরে শব্দটি (اَوْ) عَاطِفَه হলে غَيْر পদটি মারফূ' হবে এবং অর্থ হবে مَسْئُوْلُكَ ذٰلِكَ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ "তোমার মনোবাসনা এই হোক, কিংবা অন্য কোনো কিছু হোক।" তবে এটা অতি মর্যাদার স্থান। যার মধ্যে বিভিন্নমুখী যোগ্যতা রয়েছে সে-ই ঐ স্থানের যোগ্য। قُلْتُ هُوَ অর্থাৎ قُلْتُ سُؤَالِيْ ذَاكَ

وَعَنْ ٨٣٧ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ (رح) قَالَ لَقِيْتُ ثَوْبَانَ (رض) مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِيَ اللّٰهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَاَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَاِنَّكَ لَا

৮৩৭. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত মা'দান ইবনে ত্বালহা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত করা গোলাম হযরত ছাওবান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা আমি করলে তার কল্যাণে আল্লাহ আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এবারও তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর আমি তৃতীয়বার তাঁকে [একই কথা] জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি [ছাওবান] বললেন, এ বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট [তাঁর জীবদ্দশায়] জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহকে বেশি বেশি সিজদা করা

تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِيْ مِثْلَ مَا قَالَ لِيْ ثَوْبَانُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তোমার উপরে আবশ্যক করে নাও [অর্থাৎ বেশি বেশি সিজদা কর]। কারণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তুমি যতবারই সিজদা করবে, আল্লাহ ততবারই তার ফলে তোমার মর্যাদা উঁচু করবেন এবং তার কল্যাণে গুনাহসমূহ দূরীভূত করে দেবেন। রাবী মা'দান বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকেও একই প্রশ্ন করলাম, হযরত ছাওবান আমাকে যা বলেছেন তিনিও আমাকে তা বললেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : হযরত ছাওবান (রা.) দীর্ঘক্ষণ উত্তর দানে বিরত থাকার দু'টি কারণ হতে পারে। যথা–

১. প্রশ্নকৃত বিষয়টির উত্তর জানার জন্য প্রশ্নকারী কি পরিমাণ আগ্রহী ছিল তা পরীক্ষা করা।

২. অথবা উত্তরটি তৎক্ষণাৎ স্মরণে ছিল না বিধায় তিনি জবাব দিতে বিলম্ব করেন।

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ** :

اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ اَعْمَلُهُ বাক্যটিতে اَعْمَلُهُ-এর লামটি পেশ বিশিষ্ট عَمَلٌ-এর সিফাত। অথবা اَعْمَلْهُ-এর লামটি জযম বিশিষ্ট এবং আমরের জবাব। আর يُدْخِلُنِيْ ও জযম বিশিষ্ট এবং اَعْمَلْهُ-এর বদল।

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ বাক্যে عَلَيْكَ টি اَلْزِمْ অর্থে সুতরাং بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ টি عَلَيْكَ-এর مَفْعُوْلٌ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৮৩৮ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৩৮. **অনুবাদ** : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তিনি তাঁর দু' হাতকে মাটিতে রাখার আগে দুই হাঁটুকে মাটিতে রাখতেন এবং যখন [সিজদা হতে] উঠতেন তখন দুই হাঁটু উঠানোর আগে দুই হাত উঠাতেন। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : শরীরের যে অঙ্গ জমিনের নিকটবর্তী সিজদা করার সময় যথাক্রমে সে অঙ্গকে আগে রাখতে হবে। আর উঠাবার সময় যে অঙ্গ জমিন হতে দূরবর্তী তাকে আগে উঠাতে হবে। যেমন সিজদা করার সময় প্রথমে হাঁটু. পরে হাত, তারপর নাক ও সর্বশেষ কপাল রাখবে, আর উঠানোর সময় বিপরীত প্রথমে কপাল, পরে নাক, তারপর উভয় হাত ও সর্বশেষ হাঁটু উঠাবে। এটাই হলো সুন্নত নিয়ম।

وَعَنْ ٨٣٩ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ قَالَ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِىُّ حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ اَثْبَتُ مِنْ هٰذَا وَقِيْلَ هٰذَا مَنْسُوْخٌ)

৮৩৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে সে যেন উট যেভাবে বসে সেভাবে না বসে। আর সে যেন তার দু' হাতকে তার দু' হাঁটুর পূর্বে মাটিতে রাখে।−[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]

আবূ সুলাইমান খাত্তাবী বলেন, পূর্বে উল্লিখিত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র-এর হাদীসটি এ হাদীস হতে বেশি নির্ভরযোগ্য। কারো মতে এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَاَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ **দু'টি হাদীসের দ্বন্দ্ব ও এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত** : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু এবং পরে হাত মাটিতে রাখতে হয়। অথচ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এ হাদীস তার বিপরীত কার্যের প্রমাণ করে।

ইমাম মালেক ও ইমাম আওযায়ী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস অনুসারে আমল করেন। ইমাম আহমদের এক বর্ণনাও এর অনুরূপ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের অপর বর্ণনা মতে তাঁরা হযরত ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ আমল করেন। কেননা আশিয়াতুল লুময়াতে আছে যে, ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী। এ ছাড়া ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীস দ্বারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতেও হযরত ওয়ায়েলের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজ্‌দা করে, সে যেন হাত রাখার আগেই হাঁটুতে প্রথম রাখে। সুতরাং তাঁর এ পরস্পরবিরোধী হাদীস গ্রহণযোগ্য না হয়ে বরং ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র-এর হাদীস গৃহীত হবে। কারণ হযরত ওয়ায়েল হতে বিপরীত কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। উপরন্তু ওয়ায়েলের সমর্থনে অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে কাইয়িম বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের শেষ অংশ প্রথম অংশের বিরোধী। তাঁর বর্ণনায় প্রথম অংশে রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যদি সিজ্‌দা করে, সে যেন উটের বসার মতো না বসে, অথচ উট বসার সময় প্রথমেই সামনের হাত গুটিয়ে সামনের দিক নিচু হয়ে বসে। তাঁর হাদীসের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বরং সে যেন হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাতকে মাটিতে রাখে, এখানে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যাচ্ছে। কারণ হাদীসের দ্বিতীয় অংশের ভাষ্য অনুযায়ী আমল করলে উটের মতো হাত আগে মাটিতে রেখে সামনের দিক নিচু করে সিজদায় যেতে হয়। সুতরাং তিনি [ইবনে কাইয়িম] বলেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনায় সম্ভবত ভুল করে ফেলেছেন। প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি ছিল وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ তা হলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের প্রথম অংশ ও শেষ অংশে বিরোধ থাকে না। এমনকি এ মর্মে বর্ণিত অন্যান্য হাদীসগুলোর সাথেও তাঁর হাদীসের দ্বন্দ্ব থাকে না।

كَيْفِيَّةُ بُرُوْكِ الْبَعِيْرِ **উটের বসার অবস্থা** : উট বসবার সময় প্রথমে সামনের পা দু'টি গুটিয়ে বসে এবং পিছনের দিক উপরে তুলে রাখে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি প্রথমে হাত মাটিতে রাখলে, তার অবস্থাও উটের বসার ন্যায় হবে। এভাবে সিজদায় যেতে হুজুর ﷺ নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٨٤٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ)

৮৪০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও; আমাকে শান্তি ও স্বস্তি দান কর এবং আমাকে রিজিক দাও। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ٨٤١ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ رَبِّ اغْفِرْلِىْ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৪১. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দু' সিজ্দার মধ্যখানে বলতেন, "রাব্বিগফির্লী' অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। –[নাসাঈ ও দারেমী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٤٢ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৪২. অনুবাদ : হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিব্ল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [নামাজের মধ্যে তিনটি কাজ করতে] নিষেধ করেছেন। (১) সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, (২) হিংস্র জন্তুর ন্যায় দু' হাতের বাহু মাটিতে বিছিয়ে দিতে এবং (৩) মসজিদের মধ্যে করো নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেভাবে উট নিজের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। –[আবূ দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মসজিদ সবার ইবাদতের স্থান। অএতব সেখানে কারো স্থান নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত নয় বরং মাকরূহ। ইমাম হুলওয়ানী (র.) বলেন, মসজিদের জন্য কোনো কাপড় নির্দিষ্ট করে রাখা মাকরূহ। এর উপর মসজিদের কোনো স্থান নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার মাসআলাটিও অনুমান করা যায় যে, নিজের জন্য নির্ধারিত স্থানে অন্যকে বসতে বাধা দেওয়া শরিয়তে কোনো ভালো কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

وَعَنْ ٨٤٣ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَلِيُّ اِنِّىْ اُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِىْ لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৪৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আলী! অবশ্য আমি যা নিজের জন্য পছন্দ করি তা তোমার জন্যও পছন্দ করি, আর যা নিজের জন্য অপ্রিয় মনে করি তা তোমার জন্যও অপ্রিয় মনে করি। তুমি দু' সিজ্দার মধ্যবর্তী সময় ইকআ করে বসো না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : কুকুরের ন্যায় নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে দুই পা সম্মুখে উভয় হাঁটু উপরের দিকে তুলে হাতের পাতা দুই পাশে মাটিতে স্থাপন করে বসাকে 'ইকআ' বসা বলে। আবার কেউ কেউ দুই পায়ের গোড়ালি খাড়া করে এর ওপর নিতম্ব রেখে বসাকে 'ইকআ' বলেছেন।

وَعَنْ ٨٤٤ طَلْقِ بْنِ عَلِيِّ الْحَنَفِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلٰى صَلٰوةِ عَبْدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ خُشُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৮৪৪. অনুবাদ : হযরত তালক ইবনে আলী আল-হানাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ ঐ বান্দার নামাজের প্রতি সুদৃষ্টি করেন না, যে বান্দা নামাজের রুকু ও সিজদার মাঝে নিজের পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفِيَّةُ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ রুকু ও সেজদার পদ্ধতি : রুকু ও সিজদাতে পিঠ এমনভাবে সমান্তরাল রাখবে যেন রুকুতে কোমর হতে মাথা পর্যন্ত এবং সিজ্‌দাতে কোমর হতে ঘাড় পর্যন্ত একটি সরল রেখার ন্যায় দেখায়। ফকীহগণ উদাহরণ স্বরূপ বলেছেন, যাতে পানিপূর্ণ একটি পাত্র পিঠের উপর রাখলে পাত্রটি পড়ে না যায় এবং পানিও না পড়ে।

মোটকথা, যথাসম্ভব আগে পিছে সমান রাখতে চেষ্টা করতে হবে। অনেক লোককে দেখা যায় রুকুতে মাথা খুব বেশি নিচু করে ফেলে এবং আবার অনেকেই সিজ্‌দায় পাছার দিকটাকে খুব বেশি উপরে তুলে রাখে। কাজেই উভয়টির মধ্যবর্তী একটি অবস্থা অবলম্বন করাই শরিয়তের নির্দেশ।

وَعَنْ ٨٤٥ نَافِعٍ (رحـ) اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) كَانَ يَقُوْلُ مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِىْ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ اِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَاِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৮৪৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ কপাল জমিনে ঠেকায় অর্থাৎ সিজদা করে সে যেন উভয় করপুট [হাতের তালু] সেখানে স্থাপন করে, যেখানে নিজের কপালকে স্থাপন করেছে। অতঃপর যখন কপাল উঠাবে তখন উভয় হাত উঠাবে। কারণ উভয় হাতের তালুও সিজদা করে, যেভাবে তার মুখমণ্ডল সিজ্‌দা করেছে। –[মালিক]

بَابُ التَّشَهُّدِ

পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদ

اَلتَّشَهُّدُ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– সাক্ষ্য প্রদান করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের উভয় বৈঠকে যে আত্তাহিয়্যাতু পড়া হয় তাকে তাশাহহুদ নামে অভিহিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আত্তহিয়্যাতুকে তাশাহ্হুদ বলা হয় এ জন্য যে, এতে তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য উচ্চারিত হয়েছে।

এ তাশাহ্হুদ পড়া ওয়াজিব না সুন্নত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব, আর ইমাম শাফেয়ী ও অপর কিছু সংখ্যকের মতে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ সুন্নত এবং দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহহুদ ওয়াজিব। তাশাহহুদের শব্দ সম্পর্কেও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে তাশাহ্হুদ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٤٦ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلٰثَةً وَخَمْسِيْنَ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ رَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنٰى الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ يَدْعُوْ بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহহুদ পড়তে বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপরে রাখতেন এবং ডান হাতকে ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন ও তিপ্পান্ন গণনার মতো করে অঙ্গুলি বন্ধ করতেন, আর তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন তিনি নামাজের মধ্যে বসতেন, দু' হাত দু' হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্তী অঙ্গুলি উত্তোলন করতেন এবং এর দ্বারা প্রার্থনা করতেন অর্থাৎ ইশারা করতেন। আর বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে খোলা অবস্থায় থাকতো। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ عَقْدِ الْاَنَامِلِ আঙ্গুল গণনার বর্ণনা : আরবদের মধ্যে আঙ্গুলের কর গণনা করার একটি নিয়ম রয়েছে। একে عَقْدِ اَنَامِلْ বলে। নামাজের তাশাহহুদে অঙ্গুলি পেচানোর পদ্ধতি বর্ণনায় তিন ধরনের হাদীস বর্ণিত আছে। আর তা হলো, তিপ্পান্ন, নব্বই ও তেত্রিশ।

তিপ্পান্ন গণনার মতো : এ কথার অর্থ হলো, আরবের লোকেরা যখন অঙ্গুলির কর দ্বারা গণনা করতো তখন তিপ্পান্ন গণনার সময় কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলি বন্ধ করে তর্জনীকে খাড়া রাখতো এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ তর্জনীর গোড়ার সাথে লাগিয়ে রাখতো। আমাদের দেশেও সাধারণত তিপ্পান্ন গণনা করার সময় এরূপ করা হয়ে থাকে।

নব্বই গণনার মতো : অন্য হাদীসে নব্বই সংখ্যা গণনার মতো করে অঙ্গুলি বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ কনিষ্ঠা ও তার পার্শ্ববর্তী অনামিকা অঙ্গুলিকে বন্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথাকে পরস্পরে মিলিয়ে বৃত্তের মতো করা এবং তর্জনীকে খাড়া রাখা।

তেত্রিশের গণনা : এটি হলো কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বন্ধ করে তর্জনীর সাথে মিলিয়ে রাখা। তখন ধারণা হবে যেন, তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা.) এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করতেন।

মোটকথা, এ জাতীয় কতিপয় হাদীস হতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদ পড়ার সময় তর্জনী খাড়া রেখে 'আল্লাহ্ এক' এ কথার প্রতি ইশারা করতেন, কাজেই এটা হুযূরের সুন্নত। আর এটাই হলো বিশ্বস্ততার কথা। তবে এ জন্য তিনি কখনও ৫৩ আবার কখনও ৯০-এর বন্ধনের ন্যায় বন্ধন করতেন। আবার কখনও তর্জনীকে খাড়া রেখে অপর সমস্ত অঙ্গুলিকে উরুর উপরে বিছিয়ে রাখতেন।

হানাফী ইমামদের মতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় অঙ্গুলি উঠাতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় অঙ্গুলি নামাতে হয়। তবে শায়েফীদের মতে 'আশহাদু' বলার সময় অঙ্গুলি তুলে ইশারা করতে হয় এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সাথেই অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলতে হয়।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ سُنَّةِ الْاِشَارَةِ وَكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ অঙ্গুলি ইশারা সুন্নত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ ও অঙ্গুলি গুটানোর পদ্ধতি : কোনো কোনো হানাফী মতাবলম্বী ইমাম তাশাহ্হুদে ইশারা করতে নিষেধ করে থাকেন। আবার কেউ কেউ ইশারা করাকে উত্তম বলেন। ইবনে হুমাম ইশারাকে প্রাধান্য দান করেছেন। তাশাহ্হুদের মধ্যে ইশারা করা হানাফী মাযহাবের তিন ইমামের মতে সুন্নত। 'আর-কাওকাবুদ দুররী' গ্রন্থে আছে যে, ছয় ইমামের ঐকমত্যে তাশাহ্হুদের মধ্যে ইশারা সুন্নত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) লেখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ মত গ্রহণ করেছেন।

ফতোয়ায়ে শামীতে আছে, এটা করা সুন্নত। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর উক্তি। ইশারা করার সময় তর্জনীকে উপরের দিকে করবে না, তা হলে নিজের দিকেই ইশারা করা হবে। কেননা ইবনে যুবায়েরের বর্ণনায় لَا يُحَرِّكُهَا এসেছে। শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে ইশারার সময় অঙ্গুলি নাড়াতে হবে। তাঁরা হযরত ওয়ায়েল বর্ণিত হাদীসে يُحَرِّكُهَا -এর উপর আমল করেন। হানাফী মতে এটা দ্বারা ঐ নড়া বুঝানো হয়েছে, যা তর্জনী উঠানোর সময় হয়। আর অঙ্গুলি যখন উঠাবে তখন নড়বে না। ইবনে হাজারের মতে না নাড়ানোই সঠিক। আর ইশারা করার সময় অঙ্গুলিগুলো পেঁচিয়ে নেওয়া সুন্নত। পেঁচানো ব্যতীতও ইশারা করার প্রমাণ আছে। হয়তো রাসূল ﷺ উভয় পদ্ধতিতে আমল করেছেন। অঙ্গুলি পেঁচানোর পদ্ধতি বর্ণনায় তিন ধরনের হাদীস আছে। যেমন—

১. তিপ্পান্ন গণনার ন্যায় আঙ্গুল পেঁচানো। এতে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে বন্ধ করে তর্জনীকে খাড়া রেখে বৃদ্ধার মাথাকে তর্জনীর গোড়ার সাথে মিলিয়ে রাখা। এটা হযরত ইবনে ওমরের বর্ণনাতে আছে এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর পছন্দনীয় অভিমত।

২. নব্বই গণনার মতো করে পেঁচানো। নব্বইয়ের জন্য কনিষ্ঠা ও অনামিকা বন্ধ করে এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধার মাথাকে পরস্পরের মুখামুখি মিলিয়ে বৃত্তাকারে হালকা করা এবং তর্জনীকে খাড়া রাখা। এটা হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর-এর বর্ণনাতে আছে এবং এটাই হানাফী উলামায়ে কেরাম ও ইমাম আহমদ (র.)-এর পছন্দনীয় মত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিতাবুল আমালীতে এ পদ্ধতিই বর্ণনা করেছেন।

৩. তেত্রিশ সংখ্যা গণনার মতো করে পেঁচানো। এটা এই যে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলিকে বন্ধ করে তর্জনীর সাথে মিলানো। এমনভাবে যে, মনে হবে যে, তর্জনী দ্বারা ইশারা করবে। এটা হযরত ইবনে যুবাইর (রা.)-এর পছন্দনীয় পদ্ধতি। হানাফী মাযহাব মতে 'লা-ইলাহা' বলার সময় অঙ্গুলি গুটিয়ে ইশারা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় তর্জনীকে নিচু করে হালকা করবে। শাফেয়ী মাযহাব মতে তাশাহহুদের প্রথম অবস্থায় হালকা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় ইশারা করবে। আল-আরফুশ শাযী গ্রন্থে আছে যে, শাফেয়ী মাযহাব মতে আশহাদু বলার সময় ইশারা করবে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলবে।

---

٨٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلٰى اِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৪৭. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজে তাশাহহুদ পাঠ করার জন্য বসতেন তখন তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপরে ও বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপরে স্থাপন করতেন এবং তাঁর শাহাদাত [তর্জনী] অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। এ সময় তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি তাঁর মধ্যমা অঙ্গুলির উপরে রাখতেন আর বাম হাত [হাতের তালু] বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ : وَضَعُ اِبْهَامِهِ বাক্যটি اَشَارَ -এর যমীর হতে হাল। يُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ বাক্যে كَفَّهُ টি فَاعِلْ হেতু مَرْفُوْعٌ। অর্থাৎ يُدْخِلُ رُكْبَتَهُ فِىْ رَاحَةِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى অর্থাৎ হাতের তালু হাঁটুকে তাঁর পেটের ভিতর নিতো। ফলে হাঁটু হাতের মধ্যে লোকমার ন্যায় হয়ে যায়। কোনো কোনো রেওয়ায়তে عَلٰى فَخِذِهٖ আবার কোনো কোনো রেওয়ায়তে قَرِيْبًا مِنَ الرُّكْبَةِ উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং عَلٰى فَخِذِهٖ قَرِيْبًا مِنَ الرُّكْبَةِ -এর উপর আমল করলে উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

وَعَنْ ٨٤٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهٖ اَلسَّلَامُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ قَالَ لَاتَقُوْلُوْا اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّهٗ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهٗ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৪৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা মহানবী ﷺ সাথে নামাজ পড়তাম তখন তাশাহ্হুদে বলতাম, আল্লাহর উপরে শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের পূর্বে। জিব্রাঈলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মীকাঈলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং অমুকের অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। একদা মহানবী ﷺ নামাজ শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বসলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর উপরে শান্তি বর্ষিত হোক' তোমরা এ কথা বলো না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং শান্তির আধার ; বরং তোমাদের কেউ যখন নামাজের মধ্যে তাশাহ্হুদের জন্য বসে, সে যেন বলে– اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ "সকল ইজ্জত, সকল ইবাদত, সকল পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, আল্লাহর অনুগ্রহ ও আল্লাহর বরকত বর্ষিত হোক। আর আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

যখন সে এভাবে বলবে, আসমান ও জমিনের সকল পুণ্যবান বান্দার উপরে এর দরুন শান্তি ও রহমত পৌঁছবে। অতঃপর সে যেন বলে– اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ অর্থাৎ "আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি আরও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত রাসূল।" অতঃপর যে দোয়া তাঁর পছন্দ হবে প্রার্থনা করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى التَّشَهُّدِ তাশাহহুদ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন তাশাহ্হুদের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং নামাজে যে তাশাহ্হুদই পাঠ করা হোক নামাজ শুদ্ধ হবে এবং ওয়াজিব আদায় হবে। এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। তবে মতভেদ শুধু শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত তাশাহ্হুদই উত্তম। অর্থাৎ 'আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাত' শেষ পর্যন্ত। তিরমিযীর টীকাতে আছে যে, এটা ইমাম আহমদের মতেও পছন্দনীয়।

مَذْهَبُ مَالِكٍ : ইমাম মালেকের নিকট হযরত ওমরের তাশাহ্হুদ উত্তম। হযরত ওমর (রা.)-এর তাশাহ্হুদ হলো, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি আয্যাকিয়াতু লিল্লাহি আত্তায়্যিবাতু আস্সালাওয়াতু লিল্লাহি আস্সালামু আলাইকা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" শেষ পর্যন্ত।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدَ : ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (র.)-এর নিকট হযরত আব্দুল্লাহ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদ যথা- "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু" উত্তম। হাদীসবিদগণ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাশাহ্হুদকেই বিশুদ্ধতম বলেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তাশাহ্হুদের ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসই অন্যান্য হাদীসের তুলনায় বিশুদ্ধতম। অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীনদের রায়ও এটাই। এ কারণে ইমাম ত্বাহাবী 'শরহে মাআনিল আসার' কিতাবে লিখেছেন যে, এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ হতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মাধ্যমে মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোনো বিপরীত বর্ণনার প্রমাণ নেই। সুতরাং এর বিপরীত অন্য কোনো তাশাহ্হুদ পাঠ করা ঠিক হবে না।

এ ছাড়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন, যা বিশুদ্ধ হওয়ার আরও অতিরিক্ত প্রমাণ। তাশাহ্হুদের ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসগুলো বুখারী ও মুসলিম উভয়ে বর্ণনা করেননি। উপরে বর্ণিত মতান্তর কেবলমাত্র উত্তম হওয়ার ক্ষেত্রে, উপরে নতুবা উল্লিখিত তাশাহ্হুদ হতে যেটাই পড়ুক না কেন, সকলের মতেই নামাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেন, এ মতভেদ শুধুমাত্র ফজিলতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফতোয়া-ই-শামীতে আছে যে, তাশাহ্হুদের মধ্যে কমবেশি করা মাকরূহ।

بَدْءُ التَّشَهُّدِ **তাশাহ্হুদের সূচনা :** 'আর-রওজুল উনুফ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদিও বর্ণনার সূত্র অজ্ঞাত, মি'রাজ রজনীতে মহানবী ﷺ যখন মহা পরাক্রমশালী আল্লাহু তা'আলার নিকটবর্তী হয়ে আল্লাহ পাকের নূর স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন তখন তাঁর প্রশংসায় বলে উঠলেন, اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ অতঃপর নূরের আড়াল হতে জবাব এলো- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ এ পরিবেশেও মহানবী ﷺ উম্মতকে ভুলেননি ; বরং তিনি বলে উঠলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ এতদশ্রবণে হযরত জিব্রাঈল (আ.)-ও নীরব থাকলেন না ; বরং তিনি বলে উঠলেন, اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

وَعَنْ ٨٤٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ اَجِدْ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ سَلَامٌ عَلَيْكَ وَسَلَامٌ عَلَيْنَا بِغَيْرِ اَلِفٍ وَلَامٍ وَلٰكِنْ رَوَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ عَنِ التِّرْمِذِىِّ)

৮৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে আমাদেরকে কুরআন শরীফের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন, তিনি সেভাবে আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ সমস্ত ইজ্জত- সম্মান, সমস্ত ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের উপরে ও আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আরও ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।-[মুসলিম] মাসাবীহ -এর গ্রন্থকার বলেন, আমি সালামুন আলাইকা এবং 'সালামুন আলাইনা' আলিফ লাম ব্যতীত বুখারী, মুসলিম ও উভয়ের সমন্বিত সংকলন হুমাইদীর কিতাবে কোথাও পাইনি, কিন্তু জামে'উল উসূল প্রণেতা তিরমিযীর বরাতে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٥٠ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَمَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ اِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৫০. অনুবাদ : হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে [তাশাহহুদের বৈঠক সম্পর্কে] বর্ণনা করেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [নামাজের মধ্যে] বসলেন এবং তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর স্থাপন করলেন এবং ডান হাতের কনুইকে পাঁজর হতে পৃথক করে ডান উরুর উপর স্থাপন করলেন এবং দুই অঙ্গুলি [কনিষ্ঠা ও অনামিকা] বন্ধ করলেন এবং [মধ্যমা ও বৃদ্ধা] এ দুই অঙ্গুলি দ্বারা বৃত্ত রচনা করলেন। অতঃপর [তর্জনী] উত্তোলন করলেন এবং [তর্জনী] অঙ্গুলি উঠালেন। রাবী বলেন, এ সময় আমি তাঁকে দেখলাম তিনি অঙ্গুলি নাড়াচ্ছিলেন এবং তাশাহহুদ পাঠরত অবস্থায় তার দ্বারা ইশারা করছেন। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বি. দ্র. উল্লিখিত হাদীসের রাবী এ হাদীসের প্রথমাংশ উল্লেখ করেননি। আর তা হলো–

لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّىْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ـ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ ـ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ـ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ ـ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذٰلِكَ الْمَنْزِلِ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ ـ

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** বাহ্যত উক্ত হাদীস ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবের সমর্থন করে, যেখানে তিনি বলেছেন, ইশারার জন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করে তাকে নাড়াতে হবে। অথচ সামনের হাদীসে ইবনে যুবাইর হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ অঙ্গুলি নাড়তেন না, এভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার সমাধানে বলা যায় যে, অঙ্গুলি নাড়ানো ছাড়া উত্তোলন করা সম্ভব নয়। কাজেই এখানে অঙ্গুলি নাড়ানো মানেই উত্তোলন করা। তবে ইশারার জন্য উত্তোলন করার পর নাড়ানো হবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য সহীহ্ ও সঠিক কথা হলো, হুযূর ﷺ শুধুমাত্র অঙ্গুলি উত্তোলন করেছেন, কিন্তু নাড়েননি।

وَعَنْ ٨٥١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ اِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ اَبُوْدَاوُدَ وَلَايُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ)

৮৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন তাশাহহুদ [কালিমায়ে শাহাদাত] পাঠ করতেন, তখন অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন, কিন্তু একে নাড়াতেন না। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী] আবূ দাউদ এ কথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, এ সময় রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি ইশারার দিক হতে সামনের দিকে যেতো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَ دَفْعُهُ **দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান :** পর পর বর্ণিত ইবনে হুজর ও ইবনে যুবায়ের এর হাদীসদ্বয়ের মধ্যে স্পষ্ট ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে বলা হচ্ছে যে, 'অঙ্গুলি নাড়াতেন' এ বাক্যের অর্থ হলো, তর্জনী উঠাতেন আর নাড়ানো ব্যতীত উঠানো সম্ভব নয়। ইবনে যুবায়েরের হাদীসে 'অঙ্গুলি নাড়াতেন না' এ বাক্যের অর্থ হলো, অঙ্গুলিটিকে পুনঃ পুনঃ উঠানামা করতেন না, বরং একবারেই উঠিয়ে রাখতেন এবং নামাবার সময় اِلَّا اللّٰهُ বলার সাথে সাথে নামিয়ে ফেলতেন। এভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٨٥٢ أَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُوْ بِاِصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحِّدْ اَحِّدْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

৮৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি [সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)] তাঁর দুই অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, একটি দ্বারা, একটি দ্বারা। –[তিরমিযী ও নাসায়ী এ ছাড়াও বায়হাকী কর্তৃক দাওয়াতুল কবীরে বর্ণিত।]

وَعَنْ ٨٥٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ)

৮৫৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে নামাজের মধ্যে তার হাতের উপরে ভর দিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। –[আহমদ ও আবূ দাউদ] আবূ দাউদের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে নামাজে সিজ্দা হতে দু' হাতে ভর দিয়ে উঠতে নিষেধ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের মধ্যে হাতে ভর দিয়ে বসা বা উঠা যাবে না। পক্ষান্তরে বুখারী শরীফে উল্লিখিত একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূল ﷺ উভয় হাত দ্বারা মাটিতে ভর করেছেন। হাদীসটি হলো– عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ . (عِنْدَ الْقِيَامِ)

সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান এই যে, বুখারী শরীফে উল্লিখিত হাদীসটি মূলত বৈধতা বর্ণনার জন্য। অথবা এটা ছিল রাসূল ﷺ-এর বার্ধক্যকালীন অবস্থার বর্ণনা। কাজেই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ **উঠা নামার প্রক্রিয়া :** আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, শরীরের যে অঙ্গ জমিন হতে যথাক্রমে নিকটে সিজ্দা ও বসার সময় তা আগে যাবে, যেমন– প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক ও সর্বশেষ কপাল। অনুরূপভাবে সিজদা বা বসা হতে দাঁড়াবার সময় যে অঙ্গ জমিন হতে দূরে যথাক্রমে তা আগে উঠাতে হবে, যেমন– প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাঁটু।

وَعَنْ ٨٥٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهٗ عَلَى الرَّضْفِ حَتّٰى يَقُوْمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৮৫৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ প্রথম দুই রাকাতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাড়াতেন যেন তিনি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসেছেন। [তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উত্তপ্ত পাথরের উপর বসা অর্থাৎ বেশিক্ষণ না বসে থাকা। রাসূল ﷺ প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর বেশি কিছুও পড়তেন না; বরং তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যেতেন। আমাদের জন্য এ বিধান পালন করা অপরিহার্য। এর চেয়ে এক বাক্য বেশি পড়লেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ :** كَاَنَّهٗ عَلَى الرَّضْفِ বাক্যে عَلَى الرَّضْفِ শব্দটি উহ্য جَالِسٌ-এর মুতাআল্লিক। অর্থাৎ كَاَنَّهٗ جَالِسٌ عَلَى الرَّضْفِ

وَعَنْ ٨٥٥ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوٰتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৮৫৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাশাহহুদ শিখাতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআন মাজীদের কোনো সূরা শিখাতেন, [তাশাহহুদ এই] بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوٰتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ "আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহরই সাহায্যে আরম্ভ করছি। সমস্ত সম্মান, সমস্ত বন্দেগি ও সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও মনোনীত রাসূল। আমি আল্লাহর সকাশে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি কামনা করছি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٥٦ نَافِعٍ (رضـ) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاَشَارَ بِاُصْبُعِهٖ وَاَتْبَعَهَا بَصَرَهٗ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَهِىَ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৮৫৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) যখন নামাজে বসতেন, তখন তাঁর দুই হাতকে দুই হাঁটুর উপরে রাখতেন ও অঙ্গুলির [তর্জনী] দ্বারা ইশারা করতেন এবং অঙ্গুলির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই এটা অর্থাৎ অঙ্গুলির ইশারা শয়তানের উপরে লোহার গদা হতেও অধিক কঠিন। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **[বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ] :** لَهِىَ اَشَدُّ বাক্যাংশে هِىَ -এর উদ্দেশ্য اَلْاِشَارَةُ بِالسَّبَّابَةِ ইসমে তাফযীলটি مِنْ সহ ও সর্বদা মুফরাদ মুযাক্কার ব্যবহৃত হয়। يَعْنِىْ বাক্যটি দ্বারা রাবী বলেন যে, هِىَ পদটি দ্বারা রাসূল ﷺ اَلسَّبَّابَةُ উদ্দেশ্য করেছেন।

وَعَنْ ٨٥٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) كَانَ يَقُوْلُ مِنَ السُّنَّةِ اِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৮৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি সাধারণত বলতেন, তাশাহহুদ [আত্তাহিয়্যাতু] চুপে চুপে পড়াই সুন্নত। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ ও তার মাহাত্ম্য

اَلصَّلٰوةُ শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো– দরূদ যা ফারসি ভাষার শব্দ। এ اَلصَّلٰوةُ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনেই এটি দশটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ এখানে صَلٰوة টি রহমত ও اِسْتِغْفَارٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাসূল ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

পবিত্র হাদীস শরীফে তাকিদ এসেছে যে, قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ অর্থাৎ যে লোকের নিকট আমার স্মরণ করা হয় সে যদি আমার প্রতি দরূদ পাঠ না করে তবে সে কৃপণ ব্যক্তি।

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, شَقِيٌّ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ (طَبَرَانِى) "যে লোকের নিকট আমার স্মরণ করা হয়, সে যদি আমার প্রতি দরূদ না পড়ে তবে সে হতভাগ্য।"

দরূদের হুকুম : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দরূদ পাঠ করা জীবনে একবার ফরজ। যেমন তাঁর নবুয়তের স্বীকৃতি দেওয়াও একবার ফরজ। এটা ব্যতীত যতবার তাঁর নাম শুনবে ততবার দরূদ পাঠ করা সুন্নত। কারো মতে যতবার শুনবে প্রত্যেকবার দরূদ পড়া ওয়াজিব।

হানাফী ইমামদের মতে নামাজের মধ্যে তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নত। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজের শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ করা ফরজ। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামাদের মতে সুন্নত। তবে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহ্লভী (র.) বলেছেন, হানাফীদের মতে মূলত রাসূল ﷺ -এর প্রতি দোয়া, দরূদ ও সালাম পাঠ করা ওয়াজিব, কিন্তু শেষ তাশাহ্হুদের পরে পাঠ করা সুন্নত। অবশ্য দরূদ পাঠের বহু ফজিলত ও মর্যাদা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৮৫৮ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى (رحـ) قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

৮৫৮. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [সাহাবী] হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, [হে আব্দুর রহমান!] আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা উপঢৌকন দেব না, যা আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট শুনেছি? তখন আমি বললাম, জি-হ্যাঁ, আমাকে তা উপঢৌকন দিন। তিনি বললেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি সালাত বা দরূদ পাঠ করব, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দরূদ ও সালাত পাঠ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা এভাবে বলবে, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اِلَّا اَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ)

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করো, যেভাবে তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পরিজনের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছ। অবশ্যই তুমি প্রশংসিত এবং সম্মানিত"। –[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় দুই স্থানের 'আলা ইব্রাহীমা কথাটি উচ্চারিত হয়নি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নবী করীম ﷺ নবীকুলের শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পূর্ব পুরুষ ও পিত্রতুল্য ছিলেন বলে তাঁর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তদুপরি আমাদেরকে দীনের ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ তাই বলে আমাদের নবীর মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

اٰلْ ও اَهْل-এর মধ্যকার পার্থক্য : اٰلْ ও اَهْل উভয়ই সমার্থবোধক। অর্থ– পরিবার বা বংশধর। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে–

(ক) اٰلْ-এর সম্বন্ধ শুধু বিবেকবানদের সাথে হয়ে থাকে। যেমন– اٰلُ الرَّسُوْلِ

আর اَهْل -এর সম্বন্ধ বিবেকবান ও বিবেকহীন উভয়ের সাথে হয়ে থাকে। যেমন– اَهْلُ اللّٰهِ ـ اَهْلُ الْبَيْتِ

(খ) اٰلْ -এর সম্বন্ধ বিবেকবানদের মধ্য হতে শুধু পুংলিঙ্গের সাথে হয়ে থাকে। সুতরাং اٰلُ فَاطِمَةَ বলা যাবে না। কিন্তু اَهْل -এর সম্বন্ধ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের সাথে হতে পারে।

(গ) اٰلْ শব্দটি শুধু সম্ভ্রান্ত পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। চাই পার্থিব ব্যাপারে সম্ভ্রান্ত হোক, যথা– اٰلُ فِرْعَوْنَ অথবা পরকালীন জগতের হোক। যেমন– اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ

مَنْ هُمْ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ **মহানবী ﷺ-এর পরিজনের অন্তর্ভুক্ত কারা?** : কিছু সংখ্যকের মতে যাদের উপর যাকাত খাওয়া হারাম তারাই মহানবী ﷺ-এর পরিজন। যেমন– বনী হাশেম, বনী মুত্তালিব, হযরত ফাতিমা, হাসান, হুসাইন, আলী (রা.) এবং তাঁর দু'ভাই-জা'ফর ও 'আকীল এবং হুজুর ﷺ -এর চাচাগণ যেমন– আব্বাস, হারেস ও হাম্‌যা এবং তাঁদের আওলাদসমূহ।

※ আবার কারো মতে প্রত্যেক দীনদার মোত্তাকী ব্যক্তিই মহানবী ﷺ-এর পরিজনভুক্ত। হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, উক্ত সম্বোধনের মধ্যে মহানবী ﷺ-এর বিবিগণও শামিল রয়েছেন।

※ اٰلْ (আল) শব্দের আরেক অর্থ হলো– আনুগত্য করা। এ পর্যায়ে প্রত্যেক মু'মিনই মহানবী ﷺ-এর পরিজনভুক্ত। ইমাম মালেক (র.) ও সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখগণ এ অর্থকেই পছন্দ করেছেন। আর এটাই ইমাম নববীর অভিমত।

※ কারো মতে اٰلُ مُحَمَّدٍ বলতে মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রীগণ, কন্যাগণ, জামাতাগণ ও জামাতাদের সন্তানদেরকে বুঝায়।

اٰلُ اِبْرَاهِيْمَ **-এর পরিচয়** : اٰلُ اِبْرَاهِيْمَ বলতে হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ.) ও তাঁদের বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে।

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ** :

يَا اَهْلَ الْبَيْتِ-এর ই'রাব– اَهْل পদটি উহ্য اَخُصُّ-এর مَفْعُوْل হেতু মানসূব। অথবা مُنَادٰى مُضَافٌ হেতু। অর্থাৎ اَهْلَ الْبَيْتِ بَدَلُ الْكُلِّ অথবা عَلَيْكُمْ-এর كُمْ হতে عَطْفُ بَيَانٍ হেতু মাজরূর; কিন্তু বদল হতে পারে না। কেননা সাধারণত যমীরে গায়েব হতে হয়, যমীরে মুখাতাব হতে নয়।

٨٥٩ - وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমরা বলবে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরগণের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস সালামের পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরগণের প্রতি তোমার কল্যাণ নাজেল করো, যেভাবে তুমি হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি কল্যাণ নাজেল করেছ। অবশ্যই তুমি খুব প্রশংসিত এবং খুব সম্মানিত"।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ذُرِّيَّةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ذُرِّيَّاتٌ শাব্দিক অর্থ– বংশধর। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালামী (র.) বলেন, নারী হোক কিংবা পুরুষ, মানুষের বংশধরকেই যুররিয়্যাত বলা হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির কেবলমাত্র স্বীয় কন্যার সন্তানগণ যুররিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ নিজের দুহিতা ও দৌহিত্রীকে যুররিয়্যাত বলা হয়, কিন্তু তাদের সন্তানগণ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

٨٦٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৬০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা বলেন, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি 'সালাত' তথা দরূদ পাঠ করা আমাদের উপর ফরজ। এতদ্ভিন্ন মহানবী ﷺ মানব গোষ্ঠীর জন্য যে কল্যাণ ও রহমত নিয়ে এসেছেন তার হক আদায় করা এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, প্রত্যেক ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত।

* আল্লামা ইবনে 'আল্লান বলেন, 'সালাত' শব্দটি নিষ্পাপ-মাসুম ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট। যেমন– নবী বা ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁদের সম্মানার্থে 'সালাত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ফলে তাঁদের মর্যাদা অন্যদের তুলনায় বিশেষায়িত করা হয়। সুতরাং যারা নবী-রাসূল নন, তাদের বেলা 'সালাত' শব্দের ব্যবহার মাকরূহ।
* আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'সালাত' শব্দটি মহানবী ﷺ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট, কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়, বরং অন্যান্য নবী-রাসূলদের প্রতিও সালাত-সালাম পাঠ করা যায়। ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এ মর্মে একটি নির্ভরযোগ্য মা'রূফ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٨٦١ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَیَّ صَلٰوةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِیْئَاتٍ وَ رُفِعَتْ لَهٗ عَشْرَ دَرَجَاتٍ . (رَوَاهُ النَّسَائِیُّ)

৮৬১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত নাজিল করেন এবং তার দশটি গুনাহ মার্জনা করা হয় এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। –[নাসাঈ]

٨٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلَى النَّاسِ بِیْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَیَّ صَلٰوةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ)

৮৬২. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে সে ব্যক্তি আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে, যে আমার উপর বেশি দরূদ পাঠ করে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِیْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, নবী করীম ﷺ-এর উপরে প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে একবার দরূদ পাঠ করা ফরজ। আর যখন তাঁর পবিত্র নাম কেউ উচ্চারণ করে বা করতে শুনে, তখন দরূদ পড়া ওয়াজিব। নবী করীম ﷺ বলেছেন, কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ সে আমার উপরে দরূদ পাঠ করেনি। যদি কোনো মজলিসে বারবার রাসূল ﷺ-এর পবিত্র নাম উচ্চারিত হয় অথবা বারংবার রাসূল ﷺ-এর নাম শুনে, তা হলে ইমাম ত্বাহাবীর মতে বারংবার দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম কারখী (র.) বলেন যে, একবার পাঠ করা ওয়াজিব, আর অবশিষ্টবার পড়া মোস্তাহাব। অভিজ্ঞ আলিমদের মতানুসারে ফতোয়া ইমাম ত্বাহাবীর কথার উপরই ধার্য করা হয়েছে।

নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফ পাঠ করা ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরজ।

হানাফী মাযহাব মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেউ কেউ আবার এই দরূদ শরীফ পাঠকে ওয়াজিব বলেন। সর্বাবস্থায় জিকর হিসাবে রাসূল ﷺ-এর উপরে দরূদ পাঠ করা মোস্তাহাব।

শাফেয়ী (র.) নিম্নলিখিত দলিল পেশ করেন–

১. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঈমানদারদেরকে নবী করীম ﷺ-এর উপরে দরূদ পৌঁছানোর আদেশ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদেশ দ্বারা ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয়েছে।

২. তাঁদের অপর দলিল নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামাজে আমার উপরে দরূদ পাঠ করেনি, তার নামাজ হয়নি।"

হানাফী মতাবলম্বী ইমামদের দলিল এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত আমর ইবনে আস (রা.) প্রমুখ বর্ণিত হাদীসমূহে আছে যে, রাসূলে আকরাম ﷺ তাশাহহুদ পরিমাণ বসলেই নামাজ পূর্ণ হবে বলে আদেশ করেছেন, তিনি দরূদ পাঠের শর্ত আরোপ করেননি। যদি দরূদ পাঠ ফরজ হতো, তবে তিনি এর জন্য শর্তারোপ করতেন।

হানাফী মতাবলম্বীদের পক্ষ হতে শাফেয়ীর দলিলের নিম্নলিখিত জবাব প্রদান করেছেন–

১. صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا বাক্যে صَلُّوْا আদেশ দ্বারা দরূদ ফরজ হওয়া প্রমাণিত হয় না; বরং আদেশ মোস্তাহাবের জন্য করা হয়েছে।

২. لَا صَلٰوةَ الخ হাদীসে 'না-বাচক অব্যয় لَا' দ্বারা শুদ্ধ না হওয়া বুঝায় না; বরং পরিপূর্ণ না হওয়া বুঝায়। অর্থাৎ "তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়নি, যে ব্যক্তি নামাজে আমার উপরে দরূদ পাঠ করেনি"।

وَعَنْهُ ٨٦٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِىَ السَّلَامَ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৮৬৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কতিপয় ফেরেশ্তা রয়েছেন, তাঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করতে থাকেন। তাঁরা আমার উম্মতের পক্ষ হতে আমার কাছে সালাম পৌঁছে দেন। –[নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, উম্মতের পঠিত দরূদ ফেরেশতাগণ মহানবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছে থাকেন। পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর ﷺ উক্ত সালামের জবাবও দিয়ে থাকেন।

মিরকাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ফেরেশতা দ্বারা পৌঁছানো দূরের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং যদি কেউ রওজা পাকের কাছে উপস্থিত হয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করে, তখন হুজুর ﷺ কোনো মাধ্যম ছাড়াই নিজে শুনেন এবং জবাব দেন।

* মহানবী ﷺ বলেছেন, আশেকে রাসূল অর্থাৎ প্রেমিকদের দরূদ ও সালাম আমি দূর হতে শুনতে পাই এবং জবাবও দিয়ে থাকি।

বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব 'শামী'-এর মধ্যে বর্ণিত আছে যে, বান্দার কোনো কোনো আমল বা কাজ আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণীয় হয়, আবার কোনো কোনোটি গ্রহণীয় হয় না, কিন্তু মহানবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ সব সময়ই কবুল হয়ে থাকে, কোনো সময়ই ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

'শিফা' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যে দোয়ার পূর্বে ও পরে দরূদ পাঠ করা হয় সে দোয়া কখনও ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

حُكْمُ الصَّلٰوةِ عَلٰى غَيْرِ الْاَنْبِيَاءِ **নবী ছাড়া অন্যের উপর দরূদ পাঠের হুকুম :** নবী নন, এমন ব্যক্তির উপর দরূদ পাঠ করা কারো কারো মতে উত্তমতার বরখেলাফ। আবার কিছু সংখ্যক বলেন, মাকরূহ কিন্তু অনেকের মতে হারাম। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম বলেন, স্বতন্ত্রভাবে জায়েজ নেই, তবে আম্বিয়াদের প্রতি দরূদ সালামের সঙ্গে জায়েজ আছে। আ'ল্লামা নববী (র.) বলেন, বিশুদ্ধতম মত হলো, যারা নবী নন তাদের জন্য দরূদ ও সালাম স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করা মাকরূহ তানযীহী।

وَعَنْ ٨٦٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ عَلٰى رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

৮৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখনই কেউ আমার উপর সালাম পৌঁছায় তখনই আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ আমার প্রতি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি। –[আবূ দাউদ ও বায়হাকী দাওয়াতে কবীর গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর পর নবীদের পবিত্র রূহও শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়। অথচ প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে পবিত্র দেহ হতে একবার আলাদা করে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ নয়, বরং মহানবী ﷺ 'আলমে বরযখে' সদাসর্বদা আল্লাহ তা'আলার দর্শনে বিভোর থাকেন। সুতরাং কেউ দরূদ ও সালাম পেশ করলে তখন মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর রূহকে দর্শন নিমগ্ন অবস্থা হতে মনযোগ ফিরিয়ে প্রেরিত সালামের দিকে মনোযোগী করেন। ফলে তাঁর রূহের মনোযোগ প্রত্যাবর্তনকেই রূহের প্রত্যাবর্তন বলে বলা হয়েছে।

যেমন মহানবী ﷺ দুনিয়াতে তাঁর জীবদ্দশায় যখন ওহি নাজিল হতো, তখন স্বাভাবিক অবস্থা হতে ভিন্নতর অন্য আরেক অবস্থায় নিমগ্ন থাকতেন, ওহি নাজিল হওয়া তখনকার মতো শেষ হলে তিনি পুনরায় পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতেন। আলোচ্য হাদীসের মর্মার্থও এটাই।

٨٦٥ - وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ تُبَلِّغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৮৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না এবং আমার কবরকে উৎসর্গ স্থলে পরিণত করো না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছবে তোমরা যেখানেই থাক না কেন। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত তোমাদের ঘরসমূহকে কবর না বানানোর তাৎপর্য হলো, তোমরা তোমাদের বাসস্থানকে দরূদ ও আল্লাহর জিকর হতে শূন্য রেখো না, বরং ঘরকেও নফল ইবাদত, আল্লাহর জিকর ও কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা আবাদ রাখ।

কেউ কেউ বলেন, এর মর্ম এই যে, ঘরগুলোকে কবর বানাবে না অর্থাৎ মানুষকে ঘরের মধ্যে সমাহিত করো না।

অথবা কবররের উপরে ঘর, সমাধিসৌধ নির্মাণ করো না। এ ব্যাখ্যা খুবই দুর্বল। কারণ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের মধ্যে সমাহিত হয়েছেন।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা নবীদের বিশেষত্ব। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণ যেখানে লোকান্তরিত হতেন, তাঁদেরকে সেখানেই সমাহিত করা হতো।

অথবা এর অর্থ হলো– কবরকে বাসস্থানস্বরূপ বানাবে না, মাঝে মধ্যে জেয়ারত করবে মাত্র। অথবা অর্থ এই যে, ঘরকে কেবল নিদ্রাস্থান বানাবে না।

অথবা তোমরা মৃতের ন্যায় হয়ো না, আর ঘরে ইবাদত ব্যতীত থেকো না। ইবাদতবিহীন ঘর কবরস্বরূপ। অথবা ঘরে আসতে চায় এবং দেখা করতে চায় এমন ব্যক্তিকে বাধা বা নিষেধ করো না।

لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا -এর অর্থ : মহানবী ﷺ-এর বাণী "আমার কবরকে আনন্দ উৎসবস্থলে পরিণত করো না"। এর তাৎপর্য এই যে, তোমরা আমার কবর জেয়ারত ঈদের মতো করো না। ঈদ যেমন বৎসরে দু'বার আসে; এতে হাসি-খুশি, আনন্দ-আহলাদ ও সাজসজ্জা হয়ে থাকে, তোমরা ঐভাবে আমার কবর জেয়ারত করে না, সাজসজ্জা ও খুশিতে মেতে উঠো না, বরং কবর জেয়ারত এর বিপরীত। কারণ কবর জেয়ারতে মৃত্যুচিন্তা, পরকাল চিন্তা ও ধ্যান-গম্ভীরতা রয়েছে।

অথবা ঈদ শব্দ দ্বারা اِعْتِيَادٌ যার অর্থ অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া বারংবার আসা। তা হলে বাক্যটির অর্থ হবে, তোমরা আমার কবরের কাছে বারংবার আসায় অভ্যস্ত হয়ে যেয়ো না। কারণ এভাবে ঘন ঘন আসলে আমার কবরের মাহাত্ম্য ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। যেহেতু তোমরা সব সময় কবরের শিষ্টাচার রক্ষা করে চলতে পারবে না।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন যে, এর দ্বারা খুব বেশি বেশি কবর জেয়ারতের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ঈদ যেমন বৎসরে একবার কি দু'বার আসে, ঐরূপ তোমরাও বৎসরে একবার দু'বার মাত্র আমার কবর জেয়ারত করো না, বরং আমার কবর বারবার জেয়ারত করো। –[মিরকাত]

وَعَنْهُ ٨٦٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفِرَ لَهٗ وَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهٗ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৬৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ঐ ব্যক্তির নাসিকা ধুলায় মলিন হোক অর্থাৎ অপমানিত হোক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, অথচ সে দরূদ পাঠ করেনি। সে ব্যক্তিরই নাসিকা ধুলায় মলিন হোক যার কাছে রমজান এসেছে, অতঃপর চলেও গেছে, অথচ সে নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারেনি এবং সেই ব্যক্তিরই নাসিকা ধুলায় মলিন হোক বা অপমানিত হোক, যার কাছে তার পিতামাতা বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়েছে অথবা যে কোনো একজন বাধ্যক্যে পৌছেছে অথচ তাকে তাঁরা বেহেশতে প্রবেশ করায়নি অর্থাৎ তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে সে বেহেশ্ত পাওয়ার উযুক্ত হয়নি। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٨٦٧ اَبِىْ طَلْحَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِىْ وَجْهِهٖ فَقَالَ اِنَّهٗ جَاءَنِىْ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৮৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ ত্বালহা আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সেখানে হাজির হলেন, তখন তাঁর চেহারায় খুশির ভাব পরিস্ফুট ছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার নিকট জিব্রাঈল (আ.) এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রতিপালক বলছেন, এটা কী আপনাকে সন্তুষ্ট করবে না যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউই আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আমি তার উপর দশবার রহমত নাজিল করব। আর আপনার উম্মতের মধ্যে যে কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পেশ করবে আমি তার প্রতি দশবার শান্তি বর্ষণ করবো। –[নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا "যে কেউ একটি পুণ্যের কাজ করে, তার জন্য অনুরূপ দশটি [পুরস্কার] রয়েছে।" বস্তুত এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এক বিশেষ অনুগ্রহ। উল্লিখিত হাদীসটি এ আয়াতটিরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যদি কেউ রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করে বা সালাম পেশ করে তবে আল্লাহ তার প্রতি দশটি রহমত নাজিল করেন বা দশবার শান্তি বর্ষণ করেন।

وَعَنْ ٨٦٨ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ أُكْثِرُ الصَّلٰوةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلٰوتِىْ فَقَالَ مَاشِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌلَّكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا يَكْفِىْ هَمَّكَ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৮৬৮. **অনুবাদ :** হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি [একটি নির্ধারিত সময়ে] আপনার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করি, এর কি পরিমাণ সময় আপনার উপর দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব? রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমার ইচ্ছা। আমি বললাম, তা হলে এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি জবাবে বললেন, তা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি আরও অধিক কর, তা হলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তা হলে কি অর্ধেক সময় নির্ধারিত করে নেব? রাসূল ﷺ বললেন, এটা তোমার ইচ্ছা। তবে যদি এটা অপেক্ষা অধিক কর তা হলে তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, তা হলে কি দুই-তৃতীয়াংশ সময় নির্ধারিত করে নেব? রাসূল ﷺ বললেন, তা তোমার ইচ্ছা। আর এর থেকে যদি অধিক কর তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। তখন আমি বললাম, তা হলে সম্পূর্ণ সময়টাই আপনার দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِىْ كُلَّهَا-এর ব্যাখ্যা : اَجْعَلُ لَكَ صَلٰوتِىْ كُلَّهَا আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, আমি সম্পূর্ণ সময়টাই আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। এর মর্মার্থ হলো, যখনই আমি আমার নিজের জন্য দোয়া করব তখনই আপনার প্রতি দরূদ পড়ব। অর্থাৎ আপনার প্রতি খুব বেশি বেশি দরূদ পড়ব।

وَعَنْ ٨٦٩ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رض) قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَّ فَاحْمِدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَصَلِّ عَلَىَّ ثُمَّ ادْعُهٗ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ اٰخَرُ بَعْدَ

৮৬৯. **অনুবাদ :** হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন, তখন এক ব্যক্তি প্রবেশ করল এবং নামাজ পড়ল আর বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং অনুগ্রহ কর। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে নামাজি! প্রার্থনা করতে খুব তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি নামাজ পড়বে আর [প্রার্থনার জন্য] বসবে, তখন আল্লাহ তা'আলার কিছু প্রশংসা করবে, যার তিনি যোগ্য এবং আমার উপর দরূদ পাঠ করবে, অতঃপর প্রার্থনা করবে। রাবী ফুযালা বলেন, অতঃপর অপর এক ব্যক্তি এর পরে এসে নামাজ

ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اُدْعُ تُجَبْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوٰى اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

পড়ল। সে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করল এবং নবী করীম ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করল, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, হে নামাজি ব্যক্তি! তুমি আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা কর কবুল করা হবে। [তিরমিযী, আবূ দাঊদ এবং নাসায়ী ও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٨٧٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ وَالنَّبِيُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ الصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِىْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَلْ تُعْطَهْ سَلْ تُعْطَهْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৭০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নামাজ পড়ছিলাম। তখন নবী করীম ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর যখন আমি নামাজ শেষে দোয়া করতে বসলাম, প্রথমে আমি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলাম, অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করলাম, অতঃপর নিজের জন্য প্রার্থনা করলাম। এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, তুমি প্রার্থনা কর তোমাকে তা [প্রার্থিত বস্তু] দেওয়া হবে, তুমি প্রার্থনা কর তোমাকে তা দেওয়া হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٧١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৮৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পাল্লা পরিপূর্ণ করে [ছওয়াব] মেপে নিতে ভালবাসে, সে যখন আমার ও আমার পরিজনের উপর দরূদ পাঠ করে তখন যেন এভাবে বলে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ اَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ অর্থাৎ হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মদ, তাঁর বিবিগণ যারা মু'মিনদের মা, তাঁর বংশধর ও পরিবার-পরিজনের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যেভাবে তুমি হযরত ইবরাহীমের পরিবারের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاُمِّىْ শব্দের অর্থ এবং নবী করীম ﷺ উম্মি হওয়ার অর্থ : সাধারণত اَلْاُمِّىْ 'উম্মী' বলতে অশিক্ষিত ও মূর্খ লোককে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর বেলায় এ অর্থ প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি ছিলেন ওহি প্রদত্ত জ্ঞান ও বিদ্যার ভাণ্ডার। মূলত উম্মী শব্দটি আরবী 'উম্ম' শব্দ হতে লেখা হয়েছে। আর 'উম্ম' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– মূল, আসল, মা ইত্যাদি। এ পর্যায়ে উম্মী শব্দের অর্থ হবে, যিনি মূল ও আসলের উপর জন্মগতভাবে বহাল রয়েছেন। বস্তুত কেউ লেখা পড়ায় পণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আর 'নবী' শব্দটিকে 'মা' অর্থবোধক শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাধারণত নারীরা লেখা-পড়ায় অভ্যস্ত ছিল না, বিশেষ করে তদানীন্তন আরবসমাজে। মূলকথা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোনো প্রকার আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষা করেনি। বাহ্যত মানুষের মধ্যে কেউই তার শিক্ষাগুরু ছিল না, বরং মায়ের কাছে যা কিছু শিখেছেন, তাই তাঁর বাইরের বিদ্যার সম্বল। এ পর্যায়ে তিনি উম্মি বা নিরক্ষর ছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহিজ্ঞান দ্বারা মহাজ্ঞানী হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ

কারো মতে উম্মি অর্থ মক্কাবাসী। কেননা মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়। এ অর্থে اَلنَّبِىُّ الْاُمِّىُّ বলতে মক্কাবাসী নবী বুঝানো হয়েছে, আর মহানবী ﷺ যেহেতু মক্কার অধিবাসী ছিলেন তাই তাকে উম্মী বলা হয়েছে।

বস্তুত এটা তাঁর একটি অন্যতম মু'জিযা বটে। কেননা তদানীন্তন আরবসমাজ সাহিত্য চর্চায় চরম খ্যাতি লাভ করেছিল, বলতে গেলে পৃথিবীতে তাদের জুড়ি ছিল না। আর দেড় হাজার বৎসর পরেও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষের যুগেও সে উম্মি নবীর কোনো একটি কথা বা বাক্যকেও আধুনিক বিশ্ব চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না।

---

৮৭২. وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَخِيْلُ الَّذِىْ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৮৭২. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ, যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না। –[তিরমিযী] ইমাম আহমদ হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রা.) হতে এহাদীস এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ [বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ] : اَلْبَخِيْلُ পদটির اَلْ টি জাতিবাচক। এখানে اَلْ ব্যবহার করে পরিপূর্ণতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি পূর্ণ কৃপণ বা চরম কৃপণ। مَنْ ও اَلَّذِىْ দু'টি اِسْمُ مَوْصُوْل একসাথে এসেছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, দ্বিতীয় মাওসূলটি প্রথম মাওসূল ও তার সিলার মধ্যে তাকিদ হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

ইবনে হাজার (র.)-এর মতে, হাদীসটির আসল ভাষ্য مَنْ দ্বারাই। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো নুসখায় اَلَّذِىْ ও রয়েছে।

وَعَنْ ٨٧٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৮৭৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমার কবরের কাছে এসে, আমি তা সরাসরি শুনতে পাই; আর যে দূরে থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌছে দেওয়া হয়। –[বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ الخ **-এর ব্যাখ্যা** : উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমি তা সরাসরি শুনতে পাই"। হাদীসাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ কবরের মধ্যে জীবিত আছেন। তবে জীবিত থাকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন।

وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ **-এর অর্থ** : নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যে দূরে থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, তা আমার নিকট পৌছে দেওয়া হয়"। হাদীসাংশ দ্বারা এক শ্রেণীর লোকের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। তাঁরা মনে করে যে, দরূদ পড়া বা মিলাদ পড়ার সময় রাসূল ﷺ-এর রূহ তথায় উপস্থিত হয়। কেননা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, রাসূল ﷺ-এর রূহ তথায় উপস্থিত হয়, তবে "আমার নিকট পৌছে দেওয়া হয়" রাসূল ﷺ-এর এ উক্তিটি নিরর্থক হয়ে যায়। অতএব এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করা উচিত। কেননা এরূপ ধারণা শিরকের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না।

وَعَنْ ٨٧٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلٰئِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৮৭৪. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ ও তার ফেরেশ্তাগণ তার উপর সত্তরবার অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসটি ইবনে আমর রাসূল ﷺ হতে শুনেই বলেছেন, সাধারণত কোনো নেক কাজের বিনিময়ে কমপক্ষে দশগুণ অবস্থা ভেদে সত্তরগুণ বা তার বেশিও হতে পারে।

অথবা এটাও হতে পারে যে, দরূদের ছওয়াব প্রথমে দশগুণ ঘোষণা করা হয়েছে, অতঃপর অনুগ্রহ করে সত্তরগুণ বৃদ্ধি করেছেন।

وَعَنْ ٨٧٥ رُوَيْفِعٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৮৭৫. **অনুবাদ** : হযরত রুওয়াইফি' ইবনে সাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মদের প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং বলে হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তুমি তাঁকে [মুহাম্মাদ ﷺ-কে] তোমার নিকট সম্মানিত স্থান দান করো। তার জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যায়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : কিয়ামতের দিবসে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ লাভের বিভিন্ন উপায় আছে। তন্মধ্যে এটাও একটা, অর্থাৎ তার প্রতি দরূদ পাঠ করবে এবং উল্লিখিত দোয়াটি পাঠ করবে।

وَعَنْ ٨٧٦ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَاطَالَ السُّجُوْدَ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدْ تَوَفَّاهُ قَالَ فَجِئْتُ اَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهٗ فَقَالَ مَالَكَ فَذَكَرْتُ لَهٗ ذٰلِكَ قَالَ فَقَالَ اِنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ اَلَا اُبَشِّرُكَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُوْلُ لَكَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلٰوةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৮৭৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জনপদ হতে বের হয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন, অতঃপর সিজ্‌দায় রত হলেন এবং এত দীর্ঘ সময় সিজদায় পড়ে থাকলেন যে, আমি মনে মনে ভয় করছিলাম যে, না জানি আল্লাহ তাঁকে তুলে নিয়েছেন। তিনি [আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)] বলেন, আমি দেখতে নিকটে আসলাম। তখন রাসূল ﷺ মাথা উঠালেন এবং বললেন, কি হয়েছে? [কি দেখছ?] তাঁকে আমার ভাবনার কথা বললাম। রাবী বলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন, জিব্‌রাঈল (আ.) আমাকে বললেন, আপনাকে কি একটি সুসংবাদ দেব না যে, আল্লাহ আয্‌যা ও জাল্লা আপনার সম্পর্কে বলেছেন, "যে আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আমি তার প্রতি রহমত নাজিল করি এবং যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করি। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : হাদীসটি হযরত ওমর (রা.)-এর কথাও হতে পারে, অথবা তিনি হুজুর ﷺ হতে শুনে বলেছেন। আর نَبِيِّكَ দ্বারা সম্বোধন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ হলেও মূলত উদ্দেশ্য আম বা ব্যাপক।

وَعَنْ ٨٧٧ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৭৭. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্যে অবস্থান করতে থাকে এর কিছুই উপরের দিকে উঠে না [অর্থাৎ গ্রহণ করা হয় না] যে পর্যন্ত না তোমরা নবীর উপর দরূদ পাঠ কর।-[তিরমিযী]

بَابُ الدُّعَاءِ فِى التَّشَهُّدِ

পরিচ্ছেদ : তাশাহহুদের মধ্যে দোয়া

এখানে তাশাহহুদ বলতে নামাজের শেষ বৈঠককে বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ব্যতীত অন্য কোনো দোয়া-দরূদ পড়া জায়েজ নেই। আর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদের পর এবং সালামের পূর্বে যে কোনো দোয়া করা মোস্তাহাব, ইহকালীন ও পরকালীন যে কোনো দোয়া করা জায়েজ। যেমন– মুসলিম শরীফে এসেছে যে, ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَاءَ। অতঃপর যে কোনো বিষয়ে ইচ্ছা প্রার্থনা করবে।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, لَا يَجُوْزُ اِلَّا الدَّعْوَاتِ الْوَارِدَةَ فِى الْقُرْاٰنِ وَالسُّنَّةِ অর্থাৎ, এ সময়ে কুরআন ও হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া ছাড়া অন্য কোনো দোয়া করা জায়েজ নয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে তবে সম্ভবত গ্রন্থকারের বেখেয়ালে অন্য অধ্যায়েরও কিছু হাদীস এতে এসে গেছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٧٨ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَ وَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৭৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে (শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে] প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আজাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি এবং কানা দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট জীবন ও মৃত্যুর ফিত্না হতে পানাহ কামনা করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমারই নিকট আশ্রয় চাই পাপ ও ঋণের বোঝা হতে"। [এটা শুনে] এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন দেনার বোঝা হতে বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন, অবশ্যই কোনো ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বলে তো মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তো তা ভঙ্গ করে [অর্থাৎ ওয়াদা ঠিক রাখতে পারে না]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ-এর শিখানো এ দোয়াটিতে কবরের আজাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়। শেষকালে দাজ্জাল বের হবে, এরও সুস্পষ্ট ঘোষণা এর দ্বারা বুঝা যায়। এটা ছাড়া সব রকমের বিপদ-আপদ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাওয়ার শিক্ষাও এতে রয়েছে এবং এগুলো থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা রয়েছে। এর দ্বারা এ ধারণা জাগ্রত করাই উদ্দেশ্য যে, বিপদ-আপদ হতে মানুষকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউই উদ্ধার বা রক্ষা করতে পারে না। অতএব এগুলো হতে কেবল তাঁরই নিকট পানাহ চাইতে হবে। শেষ বাক্যে ঋণগ্রস্ততার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলে লোকদেরকে এটা হতে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত মুনাফেক হতে বাধ্য হয়। কেননা মিথ্যা কথা বলা ও ওয়াদা খেলাপ করা সুস্পষ্টরূপে মুনাফেকীর লক্ষণ।

فِتْنَةُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ **-এর অর্থ** : دَجَّالٌ পদটি اِسْمُ فَاعِلٍ مُبَالَغَةٌ -এর সীগাহ। এর অর্থ– চরম ধোঁকাবাজ, চরম মিথ্যাবাদী বা চরম প্রতারক। হাদীসে উল্লিখিত দাজ্জাল দ্বারা নির্দিষ্ট এক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কিয়ামতের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করবে। সে হবে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক। সে সুকৌশলে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের ঈমান হরণ করবে। তার ললাটে 'কাফের' শব্দ লেখা থাকবে। একমাত্র খাঁটি মুমিনরাই তা দেখতে পাবে। যারা তার অনুসরণ করবে তারা কাফের হয়ে যাবে। দাজ্জালের প্রতারণা হতে বাঁচার পথ হলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। একমাত্র আল্লাহই তার খপ্পর হতে মানুষদেরকে রক্ষা করতে পারেন।

দাজ্জালকে মাসীহ বলার কারণ : দাজ্জালকে মাসীহ বলার কয়েকটি কারণ হতে পারে। যথা–

১. مَسِيْحٌ অর্থ– অতিক্রমকারী। কথিত আছে যে, দাজ্জাল এত বেশি দ্রুতগামী হবে যে, মাত্র অল্প কয়দিনে মক্কা ও মদীনা ব্যতীত সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করবে।

২. অথবা এর অর্থ সমস্ত কল্যাণ হতে তাকে দূরে রাখা হবে। এমতাবস্থায় مَسِيْحٌ পদটি مَمْسُوْحٌ অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ مَمْسُوْحٌ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ অর্থাৎ مُبْعَدٌ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ

৩. অথবা তার একটি চক্ষু মুখাবয়বে মিশে একাকার হয়ে থাকবে। এমতাবস্থায়ও শব্দটি مَمْسُوْحٌ অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ أَحَدُ عَيْنَيْهِ مَمْسُوْحَةٌ

وَعَنْ ٨٧٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাজের শেষ [বৈঠকের] তাশাহহুদ পাঠ হতে অবসর হয়, তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার নিকট চারটি জিনিস হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে– (১) জাহান্নামের শাস্তি হতে, (২) কবরের শাস্তি হতে, (৩) জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় হতে এবং (৪) কানা দাজ্জালের অনিষ্ট হতে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٨٠ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে এ দোয়া এ ভাবে শিক্ষা দিতেন। যেভাবে তিনি তাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমরা এভাবে বল, হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোজখের শাস্তি হতে, আশ্রয় চাই কবরের আজাব হতে, তোমার কাছে পানাহ চাই কানা দাজ্জালের বিপর্যয় হতে এবং তোমার কাছে রেহাই চাই জীবন ও মরণের পরীক্ষা হতে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 'কুরআনের সূরার ন্যায় শিক্ষা দিতেন' এর অর্থ হলো, একান্ত দৃঢ়তার সাথে গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দিতেন। আর কুরআনের সূরা যেমন যেন ভুলে না যায় সেজন্য সতর্ক থাকে তেমনি এই দোয়াটিকেও স্বরণে রাখতে তাকিদ করতেন।

وَعَنْ ٨٨١ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَ ارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

৮৮১. **অনুবাদ** : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটা দোয়া শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আমার নামাজের মধ্যে প্রার্থনা করতে পারি। রাসূল ﷺ বললেন, আপনি বলুন, "হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর খুব বেশি অবিচার করেছি, তুমি ছাড়া আমার অপরাধ ক্ষমা করার মতো আর কেউ নেই। তুমি নিজ ক্ষমাগুণে আমার অপরাধ মাফ কর এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু"। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটি দোয়া'য়ে মাসূরা নামে প্রসিদ্ধ। আমরা হানাফীগণ শেষ বৈঠকের দরূদের পর এ দোয়াটি পাঠ করে থাকি। অন্যান্য দোয়ার চেয়ে এর প্রাধান্য এ কারণে যে, মহানবী ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর প্রশ্নের জবাবে তিনি যখন উক্ত দোয়াটির কথা বর্ণনা করেছেন, তখন এরই প্রাধান্য থাকবে। কেননা হুযূরের নিজস্ব আমল কোনো কোনোটি এমনও আছে যে, তা তাঁর জন্য সুনির্দিষ্টও ছিল।

وَعَنْ ٨٨٢ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ يَسَارِهٖ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮২. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত আমের ইবনে সা'দ (র.) তাঁর পিতা [সাবাহী] হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতে দেখতাম। এমনকি আমি তাঁর গণ্ডদেশের শুভ্রতাও দেখতে পেতাম। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِىْ تِعْدَادِ السَّلَامِ **সালামের সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ** : আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, কোনো কোনো ইমামের মতে ছোট মসজিদে এক সালাম এবং বড় মসজিদে দুই সালাম আবশ্যক।

'বযলুল মাজহুদ' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মূসা ইবনে জা'ফরের মতে তিন সালাম ওয়াজিব। কারণ উল্লিখিত আমের ইবনে সা'দের হাদীসে দুই সালামের কথা উল্লেখ থাকলেও এ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে সম্মুখের দিকেও এক সালামের কথা উল্লেখ রয়েছে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَ الْاَوْزَاعِىْ : ইমাম মালেক ও আওযায়ী (র.) বলেন, শুধু সম্মুখের দিকে এক সালামই ওয়াজিব। এরূপ মতের সমর্থক হযরত ইবনে ওমর, আনাস, সালামা ইবনে আকওয়া, আয়েশা, হাসান বসরী, ইবনে শিরীন ও ওমর ইবনে আব্দুল আযীয প্রমুখ ইমামগণ তাঁরা সকলেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসকে এবং হযরত সা'দ বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। হযরত সা'দ (রা.)ও বলেছেন যে, নবী করীম ﷺ নামাজে সালাম ফিরাতেন একই সালামের দ্বারা।

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : কিন্তু জমহুর আলেমগণ, তাদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইস্‌হাক, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক প্রমুখও রয়েছেন- তারা বলেন, দুই সালামই শরিয়তসম্মত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, আলী, ইবনে

মাসউদ, আম্মার, নাফে, আতা, আলকামা ও শা'বী প্রমুখ মনীষীগণও নামাজে দুই সালাম করতেন বলে ইবনে মন্‌যির বর্ণনা করেছেন। দু' সালামের অনুকূলে উক্ত আমের ইবনে সা'দের হাদীস তো রয়েছে , উপরন্তু নিম্নলিখিত হাদীসমূহও এর প্রমাণ। যেমন–

১. ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ডানদিকে এবং বামদিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।

২. হযরত আলকামা ইবনে ওয়াইল তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়েছি, তিনি ডানদিকে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি এবং বামদিকে সালাম ফিরাতে বলতেন আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি – [আবূ দাউদ]।

৩. হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা.) হতে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আইনী (র.) বুখারীর শারাহ্‌তে বিশজন সাহাবী হতে দুই সালামের সমর্থনে হাদীস উল্লেখ করেছেন।

জমহুরের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত দলিলের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করা হয়েছে–

১. আল বাহরুক রায়েক গ্রন্থে যে ছোট মসজিদে এক সালাম এবং বড় মসজিদে দুই সালামের কথা কারো কারো অভিমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা একটা ভ্রান্ত অভিমত। কারণ এটা যুক্তি ও কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত।

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে মূসা যে বলেছেন, এক সালামের হাদীস এবং দুই সালামের হাদীস পৃথক পৃথক আছে। সবগুলোকে এক সাথে করে তিন সালাম বলা হবে। বযলুল মাজহুদ গ্রন্থে এ ধারণাকেও ভ্রান্ত ধারণা বলা হয়েছে। কারণ এক সালামের বর্ণনা ও দুই সালামের বর্ণনায় বৈপরীত্য থাকাতে তার সমাধানের জন্য তিন সালাম করা একটা ভ্রান্ত ধারণা বৈ কিছুই নয়। কারণ এ তিন সালামের প্রমাণ কোনো সাহাবী তাবেয়ীনের নিকট হতে পাওয়া যায়নি।

৩. ইমাম মালেক ও আওযায়ী (র.) -এর দলিলে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) -এর হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হবে إِنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ অর্থাৎ রাসূল ﷺ এক সালামকে জোরে বলতেন আর অপর সালাম আস্তে বলতেন। কেননা এক সালাম জোরে বলাতে মুসল্লিরা বুঝতে সক্ষম হতো যে, নামাজ শেষ হয়ে গেছে।

৪. আর সম্মুখ দিকে এক সালাম বলতেন হাদীসের জবাব হলো, রাসূল ﷺ কেবলার দিকে মুখ রেখে সালামের বাক্য বলা শুরু করতেন।

উল্লিখিত দলিল প্রমাণ দ্বারা এটা সাব্যস্ত হলো যে, নামাজে দুই সালামই আবশ্যক।

وَعَنْ ٨٨٣ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৮৮৩. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো নামাজ পড়া শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِكْمَةُ اِقْبَالِ الْاِمَامِ اِلَى الْمُقْتَدِىْ ইমাম মুক্তাদির দিকে মুখ করে বসার হিকমত : ইবনে হাজার আসাকালানী (র.) বলেন. রাসূল ﷺ নামাজের সালাম শেষে কোনো কোনো সময় তার ডান পার্শ্বের মুক্তাদিগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়ে বসতেন, আর বাম পার্শ্বকে কেবলার দিকে রাখতেন, বিশেষ করে ফজর ও আসর নামাজ শেষে। আর এরূপ করে বসার হেকমত হলো–

১. সালাম ফিরানোর পর যদি ইমাম কেবলামুখী হয়ে পূর্বের অবস্থায় বসে থাকে তবে এ সময় নামাজের উদ্দেশ্যে আগত মুসল্লিগণ মনে করবে যে জামাত শেষ হয়নি, ফলে সে জামাতে শরিক হওয়ার চেষ্টা করবে। কোনো ব্যক্তি যাতে এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় পতিত না হয় এ জন্য তিনি নামাজ শেষে মুক্তাদিগণের দিকে মুখ করে বসতেন।

২. কারো মতে, ফজরের নামাজের পর মহানবী ﷺ মুক্তাদিগণের দিকে মুখ করে বসতেন এ উদ্দেশ্যে যে, রাতের বেলায় কে কিভাবে কাটিয়েছেন তা তিনি জিজ্ঞাবাদ করতেন। কেউ কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে এর ব্যাখ্যা করতেন এবং নিজে

কোনো স্বপ্ন দেখে থাকলে তাও বর্ণনা করতেন। কাউকেও কোনো অভিযানে প্রেরণ করতে হলে ঐ বৈঠকেই সিদ্ধান্ত দিতেন এবং তার কাজ ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিতেন। আর আসরের নামাজের পর বসতেন সারাদিনের কাজের হিসাব নেওয়ার জন্য। অতএব আমাদের উচিত উল্লিখিত হাদীসের উপর যথাযথ আমল করা।

وَعَنْ ٨٨٤ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজ পড়া শেষ করে ডান দিকে মুখ করে বসতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : ফরজ নামাজ আদায় করার পর মহানবী ﷺ আর কেবলামুখী হয়ে বসে থাকতেন না, বরং সঙ্গে সঙ্গেই ডান দিকে আবার কখনও কখনও বাম দিকে ফিরে বসতেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে নামাজের ফরজের পর সুন্নত নেই, মহানবী ﷺ সে নামাজের পর ঘুরে বসতেন। অবশ্য যে নামাজের মধ্যে পরে সুন্নত আছে এর জন্য দাঁড়ালেই অবস্থা ও দিকের পরিবর্তন হয়ে যায়।

وَعَنْ ٨٨٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ لَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلٰوتِهِ يَرٰى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لَا يَنْصَرِفَ اِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার নামাজের কিছু অংশ শয়তানের জন্য নির্ধারণ করে না রাখে, এই ভেবে যে, এটাই তার জন্য অবধারিত যে, সে ডানদিক ছাড়া আর অন্য কোনো দিকে ফিরবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেকবারই বাম দিকে ফিরতে দেখেছি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفَ تَكُوْنُ الصَّلٰوةُ لِلشَّيْطَانِ **নামাজ কিভাবে শয়তানের জন্য হবে** : এখানে প্রশ্ন হয় যে, নামাজের কিছু অংশ আবার শয়তানের জন্য কিভাবে হতে পারে? এর জবাবে বলা হয় যে, যদি কেউ এই ধারণা বা বিশ্বাস রাখে যে, শুধু ডান দিকেই ফিরে বসতে হবে, তখন এটা শয়তানের অংশ হবে। কেননা এটা সুন্নতের খেলাফ।

প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, যদি ডান দিকের কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো প্রয়োজন থাকত তখন তিনি ডান দিকে ফিরে বসতেন। এমনিভাবে যদি বাম দিকে হুযূরের কোনো প্রয়োজন থাকত তখন বাম দিকেই ঘুরে বসতেন। অতএব শুধু ডান দিকেই নির্ধারণ করে নিলে পক্ষান্তরে শয়তানকেই খুশি করানো হলো। এটা করা ঠিক নয়।

وَعَنْ ٨٨٦ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৮৬. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়তাম, তাঁর ডানদিকে বসতে ভালোবাসতাম [এই আসায় যে, নামাজ শেষে] তিনি আমাদের দিকে মুখ করে বসবেন। হযরত বারা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার শাস্তি হতে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে (পুনরায়) উঠাবে অথবা তোমার বান্দাদেরকে একত্রিত করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ** : اَنْ نَكُوْنَ অংশটি اَحْبَبْنَا -এর مَفْعُوْل আর يَقْبَلُ الخ টি اَحْبَبْنَا এর ইল্লত, رَبِّ পদটি مُنَادٰى مُضَافْ হেতু মানসূব।

وَعَنْ ٨٨٧ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ صَلّٰى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِيْ بَابِ الضِّحْكِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى)

৮৮৭. **অনুবাদ** : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে মহিলাগণ ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই উঠে যেতেন অর্থাৎ উঠে চলে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল পুরুষ নামাজি কিছু সময় বসে থাকতেন আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়াতেন, লোকজনও উঠে দাঁড়াত এবং প্রস্থান করত। –[বুখারী] জাবের ইবনে সামুরার হাদীস ইনশা'আল্লাহ بَابُ الضِّحْكِ -এ শীঘ্রই বর্ণনা করব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসটির ব্যাখ্যা এই যে, মেয়েলোকের চলাচল এবং যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা পুরুষদের জন্য মোস্তাহাব। আর নামাজ শেষে যতক্ষণ না ইমাম দাঁড়াবে ততক্ষণ মুক্তাদিদেরও বসে থাকা মোস্তাহাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কেননা, হতে পারে, ইমাম কোনো জরুরি হুকুম কিংবা অতি প্রয়োজনীয় মাসআলা বর্ণনা করতে পারে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٨٨ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) قَالَ اَخَذَ بِيَدِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُلْتُ وَاَنَا اُحِبُّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَدَعْ اَنْ تَقُوْلَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ رَبِّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ اِلَّا اَنَّ اَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَالَ مُعَاذُ وَاَنَا اُحِبُّكَ)

৮৮৮. **অনুবাদ** : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ভালবাসি। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে তুমি প্রত্যেক নামাজের শেষে এই কথাগুলো (দোয়া) বলা ত্যাগ করো না। رَبِّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণে থাকতে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে এবং তোমার ইবাদত উত্তমরূপে সম্পাদন করতে সাহায্য করো"।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আল্লাহর ইবাদতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়– (ক) মৌখিক, (খ) আন্তরিক ও (গ) আনুষ্ঠানিক। হাদীসে উল্লিখিত দোয়াটির মধ্যে তিন প্রকার ইবাদতেরই উল্লেখ রয়েছে। এ তিন প্রকার ইবাদতই সম্পাদন করা

আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আর এ জন্যই আল্লাহর রাসূল প্রতি নামাজের পরে উক্ত দোয়াটি পড়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। আর তা হলো- عَلٰى ذِكْرِكَ দ্বারা মৌখিক ইবাদত, شُكْرِكَ দ্বারা আন্তরিক ইবাদত এবং حُسْنِ عِبَادَتِكَ দ্বারা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٨٨٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ الْاَيْسَرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ وَلَمْ يَذْكُرِ التِّرْمِذِىُّ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ)

৮৮৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন, আর বলতেন 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি' যাতে তাঁর ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত এবং বাম দিকেও [এমনভাবে] সালাম ফিরাতেন আর বলতেন 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি' যাতে তাঁর বাম গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেত। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী] কিন্তু তিরমিযী "যাতে তার মুখের শুভ্রতা দেখা যেত" এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। ইবনে মাজাহ্‌ও হাদীসটি সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٨٩٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كَانَ اَكْثَرُ انْصِرَافِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ صَلٰوتِهِ اِلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ اِلٰى حُجْرَتِهِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৮৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ শেষে অধিকাংশ সময়ই রাসূল ﷺ-এর নামাজ হতে বাইরে আগামন বাম দিকে তার ঘরের দিকেই হতো। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীসটিতে সালাম ফিরানো সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান আলোচিত হয়েছে যথা- (ক) নামাজ শেষে দুই সালাম ফিরাতে হবে। (খ) সালাম নিজের ডানদিকে ও বামদিকে ফিরাতে হবে। (গ) সালাম ফিরানোর সময় মুখমণ্ডল ও ঘাড় ডানে এবং বামে ভালভাবে ফিরাতে হবে। তবে বক্ষ কিবলার দিক হতে ফিরানো যাবে না। (ঘ) সালামের বাক্য হবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ

وَعَنْ ٨٩١ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُصَلِّى الْاِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ حَتّٰى يَتَحَوَّلَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِىُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيْرَةَ)

৮৯১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা খোরাসানী (র.) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরজ নামাজ আদায় করেছেন সেখানে যেন অন্য নামাজ [সুন্নত, নফল ইত্যাদি] না পড়ে, যে পর্যন্ত না সরে দাঁড়ান। [আবূ দাউদ] কিন্তু আবূ দাউদ বলেছেন, মুগীরার সাথে আ'তা খোরাসানীর সাক্ষাৎ হয়নি। [কাজেই হাদীসটি মুন্‌কাতি' বা বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা** : কোনো রকম সমস্যা বা অসুবিধা না থাকলে, ফরজ নামাজ পড়ার পরে একটু স্থান পরিবর্তন করে সুন্নত বা নফল নামাজ পড়া ইমাম বা মুক্তাদি সকলের জন্যই মোস্তাহাব। কারণ অন্য কোনো নামাজ যেন ফরজের মতো গুরুত্বহ বুঝা না যায়, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ নামাজ পড়া মাত্রই তার স্থান পরিবর্তন করে নিতেন এবং একটু স্থান পরিবর্তন করে নামাজ পড়তেন।

কারো মতে স্থান পরিবর্তনের কারণ এই যে, আদম সন্তান পৃথিবীর যে যে স্থানে সিজদা করবে কিয়ামতের দিন সে সব স্থান ঐ ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে।

আবার কারও মতে এর কারণ এই যে, জামাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো লোক বিলম্বে এসে যেন ধোঁকায় না পড়ে যে, জামাত শেষ হয়নি।

وَعَنْ ٨٩٢ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَّنْصَرِفُوْا قَبْلَ اِنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৮৯২. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ﷺ তাদেরকে নামাজের প্রতি উৎসাহ দান করেছেন এবং নামাজ থেকে তাঁর বাইরে গমনের পূর্বে তাদেরকে বাইরে গমন করতে নিষেধ করেছেন। [আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নামাজের পর মসজিদ থেকে তাড়াতাড়ি বের না হয়ে সেখানে বসে কিছু দেওয়া-কালাম পড়ার উদ্দেশ্যেই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এ নিষেধ করেছেন। এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাদেরকে কিছু বলারও সম্ভাবনা থাকত। তাই তাদেরকে তাঁর আগে বলে যেতে নিষেধ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٨٩٣ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ صَلٰوتِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الثُّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَ رَوٰى اَحْمَدُ نَحْوَهٗ)

৮৯৩. **অনুবাদ** : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাজে [তাশাহহুদের পরে] বলতেন– অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কাজের মধ্যে দৃঢ়তা ও সৎপথে চলার সুদৃঢ় ইচ্ছা প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা করতে এবং তোমার বন্দেগি উত্তমরূপে করতে শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট আরও প্রার্থনা করছি একটি নির্দোষ অন্তর এবং একটি সত্যবাদী রসনা। তোমার কাছে আরও প্রার্থনা করি তা যা তুমি ভাল বলে জান এবং মুক্তি চাই তা হতে, যা মন্দ বলে জান। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই [ঐ সমস্ত গুনাহের জন্য] যেগুলো তুমি জান [অথচ আমি জানি না]"। –[নাসায়ী। আহমদও এর অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]।

وَعَنْ ٨٩٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ صَلٰوتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৮৯৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাজের শেষে তাশাহহুদের পরে বলতেন– অর্থাৎ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাণী আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর আদর্শ। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে "اَلْهَدْيُ" অর্থ– এমন পথ বা রাস্তা যা কাজের দ্বারা কিংবা আচার-ব্যবহার দ্বারা স্থাপন করা হয় এবং পরবর্তী লোকেরা উক্ত পথ নির্দেশকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে পথে অনুগমন করে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে উত্তম পথ নির্দেশক দ্বিতীয় কেউ নেই। স্বয়ং আল্লাহর বাণী–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ . اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

وَعَنْ ٨٩٥ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ تَسْلِيْمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৮৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের মধ্যে সম্মুখের দিকে সালাম ফিরাতেন, অতঃপর ডান দিকে সামান্য মোড় দিতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِي التَّسْلِيْمِ **সালাম সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ** : আলোচ্য হাদীস অনুসারে ইমাম মালেক (র.) সম্মুখের দিকে এক সালাম ফিরানোর মত ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে অপর সকল ইমামগণ এর অর্থ করেন, মহানবী ﷺ এক সালাম শব্দ করে বলতেন এবং অপর সালাম তুলনামূলক আস্তে নিচুস্বরে বলতেন।

অথবা সালামের শব্দ সম্মুখের দিক হতে শুরু করে ডানে এবং বামে ফিরাতেন। অন্যথা ডানে-বামে দুই দিকে সালাম ফিরানোর হাদীসসমূহের কোনো অর্থই থাকে না।

অথবা এটাও হতে পারে যে, হুজূর ﷺ কখনো কখনো শুধু এক সালামই ফিরিয়েছেন।

وَعَنْ ٨٩٦ سَمُرَةَ (رض) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَاَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৮৯৬. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইমামের সালামের জবাব দিতে, পরস্পরকে ভালবাসতে এবং একে অপরকে সালাম করতে আদেশ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : নামাজের শেষের দোয়া

মহানবী ﷺ নামাজের পর কিছু সময় বিভিন্ন দোয়া-কালাম পড়তেন এবং উম্মতকেও পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন। তবে যে সব ফরজ নামাজের পর সুন্নত-নফল নামাজ আছে তাতে সংক্ষিপ্ত আর যে সকল নামাজের পর সুন্নত-নফল নামাজ নেই তাতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দোয়া-কালাম পড়তেন। নামাজ শেষে অন্য নামাজির নামাজে অসুবিধা না হলে উচ্চৈঃস্বরেও জিকর বা দোয়া করা জায়েজ আছে। আলোচ্য অধ্যায়ে নামাজের পর যে সব দোয়া পাঠ করা হয় সে সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আলোচিত হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٨٩٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ اِنْقِضَاءَ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের পরিসমাপ্তি তাকবীর দ্বারা বুঝতাম। —[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ নামাজের শেষে উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা প্রসঙ্গে ইমামদের মতভেদ : নামাজান্তে উচ্চৈ:স্বরে দোয়া করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, আল্লামা আইনী ও ইমাম নব্বী উল্লেখ করেছেন যে, কেনো কোনো সালাফের মতে এবং পরবর্তীকালের অনেক ইমাম, যেমন ইবনে হাযম প্রমুখ বলেন, নামাজের পরে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা বা জিকর করা মোস্তাহাব। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল। আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন, চার ইমামের মতে উচ্চৈঃস্বরে তাক্বীর বলা মোস্তাহাব নয়। কারণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বুখারী শরীফের অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় লোকেরা যখন ফরজ নামাজ শেষ করত তখন উচ্চৈঃস্বরে জিকর-আযকার ও দোয়া-কালাম পাঠ করত। পক্ষান্তরে হাদীসটির ভাবার্থ হতে বুঝা যায় যে, পূর্বে হতো, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সময় হতো না। ফলে হুজুরের একটি সুন্নত কার্যত পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, নামাজের পরে বিশেষ নিয়মে এ জাতীয় মোস্তাহাব পর্যায়ের কাজ বা দোয়া-কালাম মহানবী ﷺ সারা জীবন নিয়মিতভাবে করেননি। তাই সাহাবীগণ বুঝে নিয়েছেন যে, এভাবে পাঠ করা অত্যাবশ্যক নয়। আর হুযূর ﷺ ও এ আশংকায় তা ত্যাগ করেছেন, যেন লোকেরা তা বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করতে না থাকে।

جَوَابٌ لَهُمْ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, (১) দোয়া-কালামের প্রশিক্ষণের জন্য রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে জোরে জোরে পাঠ করতেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, এটা রাসূল ﷺ-এর সার্বক্ষণিক কার্য ছিল না। (২) অথবা এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় ছিল আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহের। ঐ দিনগুলোতে মিনা বা অন্য কোনো স্থানে নামাজ শেষে উচ্চৈঃস্বরে তাক্বীর বলা হতো। (৩) অথবা এটাও হতে পারে যে, তাক্বীর অর্থে দোয়া-কালামকেই বুঝানো হয়েছে, আর দোয়া-কালামের মধ্যে কখনও দুই একবার আল্লাহু আক্বার বলা হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন ছোট ছিলেন তাই পিছনের সারিতে থেকে অথবা বাইরে থেকে শুধু আল্লাহু আক্বার ধ্বনিই শুনতে পেয়েছিলেন। মূলত অন্য নামাজির ক্ষতি না হলে কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে দোয়া-কালাম পড়া জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٨٩٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৯৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজের সালাম ফিরাতেন, তখন এ দোয়া পাঠ পরিমাণ সময়ের বেশি বসে থাকতেন না– অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি নিজেই শান্তিময়, আর তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপশালী ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকতময়" –[মুসলিম]

وَعَنْ ٨٩٩ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلٰثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৮৯৯. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তেগফার করতেন, অতঃপর বলতেন– অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি নিজেই শান্তিময় এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে প্রতাপশালী! হে সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকতময়।" –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষে তিনবার اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ বলতেন অথবা এটা বলতেন اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ তাই আমাদেরও এসব দোয়া-কালাম পড়া একান্ত আবশ্যক।

وَعَنْ ٩٠٠ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯০০. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফরজ নামাজের শেষে বলতেন– অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, যার কোনো শরিক নেই তারই সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা, তিনিই সকল কিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেউ রোধ করতে পারে না এবং তুমি যা রোধ কর, কেউ তা দিতে পারে না। কোনো অর্থশালীকে তার সম্পদ তোমার শাস্তি হতে [রক্ষা করার মতো] কোনো উপকার করতে পারে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ : مَكْتُوْبَةٌ পদটি صَلَاةٌ-এর সিফাত, وَحْدَه পদটি حَالٌ হেতু মানসূব عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ -এর যোগসূত্র পরবর্তী শব্দ قَدِيْرٌ-এর সাথে। আর شَرِيْكَ ـ مَانِعَ ـ مُعْطِىَ পদগুলো ইসমে لَاۓ نَفِىْ جِنْس এবং نَكِرَةٌ মুফরাদ হেতু مَبْنِىْ عَلَى الْفَتْحِ

وَعَنْ ٩٠١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلٰوتِهٖ يَقُوْلُ بِصَوْتِهِ الْاَعْلٰى لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯০১. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ হতে সালাম ফিরাতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন– অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর অধিক ক্ষমতাবান। কারো কোনো উপায় নেই, শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমরা কারও ইবাদত করি না, একমাত্র তাঁরই বন্দেগি করি। যাবতীয় নিয়ামত, অনুগ্রহ ও উত্তম প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। একনিষ্ঠভাবে দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি– যদিও কাফেরগণ অপ্রিয় মনে করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعْرِيْفُ بِالرَّاوِىْ **বর্ণনাকারী পরিচিতি** :

১. **নাম ও পরিচিতি** : তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবূ বকর। হযরত ﷺ তাঁর নানার নামানুসারে এ নামকরণ করেন। এটা ছাড়াও তাঁকে আবূ খুবাইব বলা হতো। তাঁর পিতার নাম যুবাইর ইবনুল আওয়াম। মাতার নাম আসমা বিনতে আবী বকর। তিনি সাহাবী ছিলেন এবং তাঁর পিতা-মাতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

২. **জন্ম** : তিনি হিজরি প্রথম সনে হযরত যুবাইরের ঔরসে এবং হযরত আসমার উদরে কোবা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। মক্কার মুহাজিরদের মাঝে তিনি প্রথম সন্তান, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর কানে আযান দেন এবং রাসূল ﷺ তাহনীক করেন।

৩. **রাসূল ﷺ-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক** : প্রথমত তাঁর বংশধারার সাথে রাসূল ﷺ-এর বংশধারা কুসাই পর্যন্ত গিয়ে মিলে যায়। অপর দিকে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভাই আওয়াম-এর পুত্রের ছেলে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর। অর্থাৎ হযরত খাদীজার ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘরের নাতী। আবার হযরত আয়েশার বোন-পুত হওয়ার দিক হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভায়রার ছেলে।

৪. **দৈহিক গঠন** : তাঁর গায়ের রং শ্যামল ছিল। আরবদের তুলনায় কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। তাঁর দেহে পশম ছিল খুবই কম। কোনো রকম দাঁড়ি গোঁফ তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল না।

৫. **ইবাদতে মনোযোগ** : সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই ইবাদতে মনোযোগী ছিলেন। তবে কেউ কেউ মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট সাধনা করতেন। তাঁদের মাঝে তিনি একজন। তিনি অত্যধিক রোজা রাখাতেন, রাতে বেশি বেশি জাগতেন। এমনকি তিনি রাতে রুকু সেজদাতে এত মনোনিবেশ করতেন যে, এতে রাত শেষ হয়ে যেত।

৬. **ইলমে হাদীসে অবদান** : তিনি হুযূরের ইন্তেকালের সময় মাত্র দশ বৎসরের শিশু ছিলেন। তাই তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম। তিনি মোট ৩৩ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তাঁর নিকট হতে ৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৭. **খেলাফতের দায়িত্ব পালন** : হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর ছেলে ইয়াযীদের মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরিতে তাঁর হাতে হিজাজ, ইয়ামন, ইরাক, খোরাসান, সিরিয়ার কিয়দংশ খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন।

৮. **বায়তুল্লাহর মেরামত ও হজ পালন** : রাসূলে কারীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট বায়তুল্লাহর মেরামত সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে তিনি তাঁর খেলাফতের সময় বায়তুল্লাহকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বেনার উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং মানুষকে নিয়ে আটবার হজ কার্য সমাধা করেন।

৯. **শাহাদাত বরণ** : তাঁর খেলাফতের আমলে ৭২ হিজরিতে জিলহজ মাসের প্রথম রাতে মক্কা অবরোধ করা হয়। ইত্যবসরে তাঁর প্রতি একটি পাথর নিক্ষেপিত হয় এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত দেহকে শূলে লটকানো হয় এবং মাথা কেটে খোরাসনে নিয়া যাওয়া হয়। এভাবে এক মহান নেতার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

وَعَنْ ٩٠٢ سَعْدٍ (رض) اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৯০২. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ সন্তানদেরকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের শেষে এ দোয়াগুলো পাঠ করে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন– অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভীরুতা হতে আশ্রয় কামনা করছি। আরও আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জরাজীর্ণ বার্ধক্য হতে এবং তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি পার্থিব বিপর্যয় ও কবরের শাস্তি হতে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٩٠٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا قَدْ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَلَا اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهٖ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُوْنُ اَحَدٌ اَفْضَلُ مِنْكُمْ اِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمِدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ مَرَّةً قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الْاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৯০৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে আগমন করে বললেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ] সম্পদশালী লোকেরাই তো উচ্চ মর্যাদাসমূহ ও স্থায়ী কল্যাণসমূহ নিয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ বললেন, এটা কেমন কথা? তখন তারা বললেন, তাঁরা আমাদের মতো নামাজ পড়েন, [আমাদের মতো] রোজা রাখেন, কিন্তু তাঁরা দান সদ্কা করেন, আর আমরা দান সদ্কা করতে পারি না। তাঁরা দাস-দাসী মুক্ত করেন, আর আমরা [সামর্থ্যের অভাবে] দাস-দাসী মুক্ত করতে সক্ষম হই না। তখন এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দেব না, যার বদৌলতে তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের সমমর্যাদায় পৌঁছবে যারা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছিল [অথবা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে] এবং যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের পরবর্তীদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবে এবং তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম আর কেউ হতে পারবে না? তবে হ্যাঁ যারা তোমাদের মতো কাজ করবে কেবলমাত্র তারাই তোমাদের মতো মর্যাদা লাভ করবে। তখন তারা বললেন, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল [আমাদেরকে তা বলে দিন]। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা প্রত্যেক নামাজের পরে তেত্রিশ বার করে 'সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ করবে। [অধস্তন রাবী] আবূ সালেহ বলেন, অতঃপর আর একদিন দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَلَيْسَ قَوْلُ اَبِىْ صَالِحٍ اِلٰى اٰخِرِهٖ اِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ

تُسَبِّحُوْنَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا بَدَلَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ.

ﷺ-এর সমীপে এসে বললেন, রাসূল! আমাদের ধনী ভাইগণও এটা শুনেছেন এবং আমরা যেরূপ করি তারাও সেরূপ করতে আরম্ভ করেছেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা আল্লাহ্র বিরাট দান, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন। [অর্থাৎ এতে তোমাদের হিংসা করার কিছুই নেই।] -[বুখারী , মুসলিম]

রাবী আবূ সালেহ্ হতে পরবর্তী বাক্যগুলো মুসলিম ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি; বুখারীর এক বর্ণনায় তেত্রিশ সংখ্যার পরিবর্তে এরূপ রয়েছে যে, তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর দশবার সুবহানাল্লাহ্র, দশবার আল-হামদুলিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার বলবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تُدْرِكُوْنَ بِهٖ مَنْ سَبَقَكُمْ **-এর অর্থ** : উক্ত হাদীসাংশের অর্থ হলো, তোমাদের পূর্বে এ উম্মতের যে সমস্ত মুসলমানরা অতীত হয়ে গেছে, তোমরা তাদের মর্যাদায় পৌছে যাবে।

অথবা পূর্বে যতসব উম্মত অতীত হয়ে গেছে, তোমরা তাদের সমমর্যাদায় পৌছে যাবে। আর ভবিষ্যতে যত মুসলমান কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে আগমন করবে অথবা তোমাদের যুগের যে সমস্ত লোক তোমাদের পরে আসবে তাদের কেউই তোমাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

وَعَنْ ٩٠٤ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلٰثٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ تَكْبِيْرَةً. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯০৪. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে বলার মতো কতিপয় কথা আছে। সেগুলো যারা বলবে [রাবীর সন্দেহ] অথবা কতিপয় কাজ আছে, সেগুলো যারা করবে তারা কখনও বিফল মনোরথ হবে না- আর তা হলো- (১) তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, (২) তেত্রিশবার 'আল্-হামদুলিল্লাহ' এবং (৩) তেত্রিশবার 'আল্লাহু আক্‌বার' বলো। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নামাজের পরে উল্লিখিত জিকিরগুলোকে مُعَقِّبَاتٌ বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে, যা নিম্নরূপ- (১) عَقْبٌ শব্দের অর্থ একের পর এক আসা। আর উল্লিখিত শব্দগুলো যথাক্রমে একটির পর আরেকটি উচ্চারণ করা হয়। (২) উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর উচ্চারণকারী ছওয়াব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। (৩) একই শব্দকে পর পর বহুবার উচ্চারণ করা হয় বিধায় مُعَقِّبَاتٌ বলা হয়। (৪) অথবা, مُعَقِّبَاتٌ অর্থ- রহিতকারী। যেহেতু এ শব্দগুলো গুনাহসমূহ রহিতকারী তাই তাকে مُعَقِّبَاتٌ বলা হয়। যেমনি আল্লাহর ভাষায় لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ অর্থাৎ لَا نَاسِخَ لِحُكْمِهٖ (৫) অথবা উক্ত জিকিরগুলো নামাজের পর পর পড়া হয় তাই একে مُعَقِّبَاتٌ বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٩٠٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে, আর এতে মোট নিরানব্বই বার হবে এবং একশত পূর্ণ হওয়ার জন্য বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই জন্য বিশ্বের সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান–তার [বিগত] অপরাধ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা [আধিক্যের দিক দিয়ে] সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٠٦ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৯০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন দোয়া সর্বাগ্রে কবুল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের দোয়া এবং ফরজ নামাজসমূহের পরের দোয়া। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٩٠٧ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

৯০৭. অনুবাদ : হযরত উক্‌বা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাজের পরে 'মুয়াব্বাযাত' অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ সূরাদ্বয় পাঠ করতে আদেশ করেছেন। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। এ ছাড়াও বায়হাকী 'দাওয়াতুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : مُعَوِّذَاتٌ বলতে সূরা নাস ও ফালাককে বুঝানো হয়েছে। কেননা مُعَوِّذٌ অর্থ এমন জিনিস, যার দ্বারা কোনো কিছুর মন্দ প্রভাব হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, এক ইহুদি কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য যাদু-টোনা করেছিল, তা হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরা দু'টি নাজিল করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তা পাঠ করে স্বীয় শরীরে ফুঁ দেওয়ার পর আরোগ্য লাভ করেন। বুজুর্গানে দীনের আমলের কিতাবে উল্লেখ আছে, নামাজের পর উক্ত সূরা দু'টি পড়ে স্বীয় শরীরে দম করলে যাদু-টোনার অনিষ্টকারিতা হতে নিরাপদে থাকা যায়। আর যাদু-টোনা করলেও তা ক্রিয়াশীল হয় না। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সূরা কুল হুওয়াল্লাহ এবং নাস, ফালাক তিন তিনবার করে পড়ে নিজের উভয় হাতে ফুঁক দিতেন এবং মাথা হতে পা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব হাত দিয়ে মুছতেন।

وَعَنْ ٩٠٨ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتِقَ اَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ وَلَاَنْ اَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ اَرْبَعَةً ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৯০৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যারা ফজরের নামাজের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় [নামাজের স্থানে বসে] আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি ইসমাঈল বংশীয় চারজন লোককে আযাদ করা হতেও উত্তম মনে করি। অনুরূপভাবে যারা আসরের নামাজের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় বসে আল্লাহকে স্মরণ করে, আমি তাদের সাথে যোগদান করাকে চারজন গোলাম আজাদ করার চেয়েও প্রিয় মনে করি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالْعِتْقِ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ ইসমাঈল বংশের গোলাম আজাদ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, 'ইসমাঈলের বংশধর' দ্বারা কুরাইশদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে এ প্রশ্নটি বড় জটিলভাবে উত্থাপিত হয় যে, কুরাইশরা কারো গোলাম হওয়ার প্রশ্নই তো উঠে না, বরং আরবরা যখনই কোথাও কয়েদ হয়েছে তখন গোলামে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আজাদ হয়ে গেছে। সুতরাং ইসমাঈলের বংশধরের চারজন লোক আজাদ করার চেয়ে উত্তম, এ কথাটি কিভাবে সহীহ হলো? এর জবাবে ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এখানে গোলাম আজাদ করা কথাটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি ; বরং 'মেনে নেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, তারা গোলামে পরিণত হয়েছিল, তবে তারা বংশীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে উত্তম গোলাম হয়ে থাকবে। আর উত্তম গোলাম আজাদ করাও উত্তম কাজ। মূলত রাসূল ﷺ এ উক্তি দ্বারা উক্ত সময়দ্বয়ের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন হয় যে, চারজন আজাদ করার কথা বলা হলো কেন? উক্ত প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, উত্তমতা চারটি বিষয়ের সাথে জড়িত– (১) আল্লাহর জিকির করা, (২) জিকিরের উদ্দেশ্যে বসা, (৩) জিকিরের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ও (৪) সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত জিকিরের সাথে অবস্থান করা। আর এ জন্যই চারজন গোলাম আজাদ করার কথা বলা হয়েছে।

ইবনুল মালিক (র.) বলেন, বিষয় চারটি হলো– (১) জিকিরের জন্য বসা, (২) এমন সম্প্রদায়ের সাথে অবস্থান করা যারা জিকির করে, (৩) ফজর বা আসরের পর হতে বসে থাকা, (৪) সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাধারে বসে থাকা।

وَعَنْهُ ٩٠٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৯০৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, অতঃপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করে। অতপর [অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পরে] দুই রাকাত নফল পড়ে, তার জন্য এক হজ ও এক উমরার সমান ছওয়াব রয়েছে। রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, পূর্ণ এক হজ ও এক উমরার, পূর্ণ এক হজ ও এক উমরার, পূর্ণ এক হজ ও এক উমরার। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : হাদীসে আলোচ্য এই দু' রাকাত নামাজকে 'সালাতুদ দোহা' নামাজ বলা হয়। এর সময় সূর্যোদয় হতে সূর্য সোজা মাথার উপরে স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু সূর্য সামান্য উপরে উঠার পর আদায় করা অধিক উত্তম। সাধারণতঃ সকালে আদায় করা হলে একে 'ইশরাক' এবং দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সামান্য পূর্বে পড়া হলে একে 'চাশতের' নামাজ বলা হয়ে থাকে। মূলত উভয়টি সালাতুদ্ দোহা বা চাশ্‌ত নামাজ। এটা কমপক্ষে দুই রাকাত এবং উর্ধ্বে বারো রাকাত। যারা ইশরাক ও চাশ্‌তের নামে দুই বার পড়েন তারা সম্ভবত একই নামাজকে দুই ভাগ করে দুই সময়ে পড়েন। কারণ হাদীসে দুই পৃথক নামাজের কথা বলা হয়নি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩١٠ - عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ (رحـ) قَالَ صَلّٰى بِنَا اِمَامٌ لَنَا يُكْنٰى اَبَا رِمْثَةَ قَالَ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ يَقُوْمَانِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى رَاَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اَبِىْ رِمْثَةَ يَعْنِىْ نَفْسَهٗ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ عُمَرُ فَاَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهٗ ثُمَّ قَالَ اِجْلِسْ فَاِنَّهٗ لَنْ يُّهْلِكَ اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا اَنَّهٗ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلٰوتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَصَرَهٗ فَقَالَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৯১০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আযরাক ইবনে কায়িস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক ইমাম যার উপনাম ছিল আবূ রিম্‌ছা একদিন আমাদের নামাজ পড়ালেন এবং বললেন, 'এই নামাজ' অথবা 'এই নামাজের মতো নামাজ' আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে পড়েছিলাম। আবূ রিম্‌ছা বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) দু'জনই নামাজের সামনের সারিতে রাসূল ﷺ-এর ডান দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। আরও এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি নামাজের প্রথম তাকবীর পেয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ নামাজ পড়ালেন, অত:পর তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরালেন। এতে [অর্থাৎ এতটুকু মোড় ঘুরলেন যে] আমরা তাঁর পবিত্র গণ্ডদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অতঃপর রাসূল ﷺ আবূ রিম্‌ছার ন্যায় [এ বলে রাবী নিজেকে উদ্দেশ্য করেন।] একদিকে ফিরলেন। এ সময় ঐ ব্যক্তি যিনি নামাজের প্রথম তাকবীর রাসূল ﷺ-এর সাথে পেয়েছেন, তিনি দু' রাকাত সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। তখন হযরত ওমর (রা.) ঝট করে দাঁড়ালেন এবং তার দুই বাহুমূলে ধরে নাড়া দিলেন আর বললেন, বস। আহলে কিতাবগণ শুধু এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের দুই নামাজ [ফরজ ও সুন্নত]-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। তখন নবী করীম ﷺ চোখ উঠিয়ে তাকালেন এবং বললেন, হে খাত্তাব তনয়! আল্লাহ তোমাকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত লোকটি প্রথম তাকবীর রাসূল ﷺ-এর সাথে পেয়েছিলেন। অতএব তার ফরজ নামাজের কোনো রাকাতই বাকি ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি করে উঠারও প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন যে, কিতাবীগণের ধ্বংসের কারণ এটাই ছিল যে, তাদের ফরজ ও সুন্নত নামাজের

মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, ফরজ ও সুন্নত নামাজের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ করা উচিত। প্রভেদ সৃষ্টির কয়েকটি পন্থা রয়েছে। যেমন- (ক) ফরজ নামাজের পর স্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র সুন্নত পড়া। (খ) অথবা কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকা। (গ) অথবা কথাবার্তা বলা। (ঘ) অথবা সালামের পর দোয়া-কালাম পাঠ করা।

وَعَنْ ٩١١ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ أُمِرْنَا اَنْ نُسَبِّحَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَنَحْمَدَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَنُكَبِّرَ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَاَتٰى رَجُلٌ فِى الْمَنَامِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقِيْلَ لَهُ اَمَرَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُسَبِّحُوْا فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْاَنْصَارِيُّ فِيْ مَنَامِهِ نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوْا فِيْهَا التَّهْلِيْلَ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَافْعَلُوْا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৯১১. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরফ হতে আদেশ করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক নামাজের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পাঠ করার জন্য। আনসারদের এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তাকে বলা হলো, তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পরে এতবার তাসবীহ পাঠ করতে আদেশ করেছিলেন? আনসারী স্বপ্নে [স্বপ্নের লোকটিকে অর্থাৎ ফেরেশ্তাকে] বললেন, হ্যাঁ। স্বপ্নের লোকটি বলল, তোমরা ঐ তিনটি বাক্যের সংখ্যাকে পঁচিশ পঁচিশ করে নির্ধারণ করবে, আর এতে [সমসংখ্যকবার] 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করবে [তাতে মোট একশত বার হবে]। যখন সকাল হলো, খুব ভোরেই তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং স্বপ্নের ঘটনা অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাই কর। -[আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত স্বপ্নের মধ্যে আনসারী ব্যক্তির সাথে যিনি কথোপকথন করেছিলেন তিনি ছিলেন ফেরেশতা। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করার সাথে সাথেই তিনি সে অনুযায়ী আমল করতে অনুমতি প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ٩١٢ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَعْوَادِ هٰذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتُ وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ اٰمَنَهُ اللّٰهُ عَلٰى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَاَهْلِ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ)

৯১২. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই মিম্বারের কাঠের উপরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা দিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি শয্যা গ্রহণের সময় এটা [আয়াতুল কুরসী] পাঠ করে, আল্লাহ তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং তার আশে পাশে যতগুলো ঘর আছে, নিরাপদ রাখেন। -[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ হাদীসটির সনদ দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসের ফলে একটি প্রশ্ন সৃষ্ট হয় যে, মৃত্যু জান্নাতে প্রবেশে বাধাদানকারী, অথচ কোনো কোনো মৃত্যু জান্নাতে প্রবেশের অসিলা হয়। সুতরাং উক্ত হাদীসটির উদ্দেশ্য কি? এর উত্তরে বলা যায়– হাদীসের اِلَّا الْمَوْت দ্বারা ঈমানবিহীন মৃত্যু উদ্দেশ্য।

অথবা اَلْمَوْت মানে اِلَّا عَدَمُ الْمَوْت অর্থাৎ বেঁচে থাকা।

অথবা মৃত্যু বাধা দানকারী এই অর্থে যে, মৃত্যু না আসার দরুন হায়াতও শেষ হচ্ছে না। আর এ কারণে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ আসছে না।

অথবা اِلَّا الْمَوْت অর্থ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَرَائِطِ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا الْمَوْتَ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশের জন্য এখন তার মৃত্যুই বাধা রয়েছে।

অথবা কালামটির অর্থ হলো– কোনো কিছু তার জান্নাতে প্রবেশে অন্তরায় হবে না।

অথবা اِلَّا الْمَوْت অর্থাৎ اِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ كَافِرًا অর্থাৎ কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাই তার জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র অন্তরায়।

وَعَنْ ٩١٣ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَيْهِ مِنْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهٗ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَ رُفِعَ لَهٗ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ اَنْ يُّدْرِكَهٗ اِلَّا الشِّرْكُ وَكَانَ مِنْ اَفْضَلِ النَّاسِ عَمَلًا اِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهٗ يَقُوْلُ اَفْضَلَ مِمَّا قَالَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اِلٰى قَوْلِهٖ اِلَّا الشِّرْكُ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ وَلَا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৯১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ফজর নামাজ শেষে পা প্রসারিত করা ও বাইরে গমনের পূর্বে [অর্থাৎ নামাজের স্থান হতে উঠার পূর্বে] দশবার পাঠ করবে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই'। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই, তাঁরই জন্য বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্ব, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা, তাঁর হাতেই কল্যাণ। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মারেন, তিনি সমস্ত কিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান। তার জন্য প্রতিটি শব্দের জন্য দশটি করে নেকী [তার আমলনামায়] লেখে দেওয়া হবে; তার দশটি গুনাহ [আমলনামা হতে] মুছে দেওয়া হবে; তার দশ দফা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এটা ছাড়াও এ তার জন্য প্রত্যেক খারাপ কর্ম হতে রক্ষার কবচস্বরূপ হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবচ হবে। অধিকন্তু শিরক ব্যতীত কোনো গুনাহই তাকে পাবে না। [অর্থাৎ যখন সে তাওহীদ ত্যাগ করবে তখন শিরক তাকে ধ্বংস করবে] এবং কর্মফলের দিক দিয়ে সে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ, ঐ ব্যক্তি তার চেয়েও উত্তম হবে, যে ব্যক্তি তার চেয়েও উত্তম দোয়া পাঠ করবে। –[আহমদ] ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস হযরত আবূ যার (রা.) হতে 'শিরক ব্যতীত' পর্যন্ত বর্ণনা করেন, "এ ছাড়াও মাগরিব নামাজ" এবং "তার হাতে সব কল্যাণ", শব্দদ্বয়ও বর্ণনা করেননি। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।

وَعَنْ ٩١٤ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيْرَةً وَ اَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا لَمْ يَخْرُجْ مَا رَاَيْنَا بَعْثًا اَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا اَفْضَلَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى قَوْمٍ اَفْضَلَ غَنِيْمَةً وَاَفْضَلَ رَجْعَةً قَوْمًا شَهِدُوْا صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاُولٰئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً وَاَفْضَلُ غَنِيْمَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَحَمَّادُ بْنُ اَبِيْ حُمَيْدٍ الرَّاوِيْ هُوَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ)

৯১৪. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ নজদের দিকে অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। তারা প্রচুর গণিমতের মাল অর্জন করল এবং ফিরেও এলো খুব তাড়াতাড়ি। আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি যিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি তিনি বললেন, আমরা এই অভিযানের তুলনায় দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ও শ্রেষ্ঠ গনিমত লাভকারী কোনো সৈন্যাভিযান দেখিনি। এটা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একদল লোকের কথা বলব না, যারা গনিমত লাভে এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রত্যাবর্তনেও এদের চেয়েও দ্রুত? তাঁরা সে দল যারা ফজরের জামাতে উপস্থিত হয়েছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করেছে। তারাই হলো এদের চেয়ে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী দল এবং এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গনিমত লাভকারী দল। –[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী হাম্মাদ ইবনে আবূ হুমাইদ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বিবেচিত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণ করাকে জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এর দ্বারা জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মর্যাদাকে খাটো করা হয়নি। বরং এরূপ ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই এরূপ কথা বলা হয়েছে। কেননা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা অতীব ছওয়াবের কাজ।

بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِى الصَّلٰوةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ : নামাজের মধ্যে যা করা জায়েজ নয় এবং যা করা জায়েজ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩١٥ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ (رض) قَالَ بَيْنَا اَنَا اُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَاشَانُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِاَبِىْ هُوَ وَاُمِّىْ مَارَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ فَوَ اللّٰهِ مَا كَهَرَنِىْ وَلَا ضَرَبَنِىْ وَلَا شَتَمَنِىْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ وَاِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَاْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَاْتِهِمْ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُوْنَهٗ فِىْ

৯১৫. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ছিলাম। হঠাৎ জনতার মধ্য হতে একব্যক্তি হাঁচি দিল। তখন আমি বললাম, ইয়ারহামুকাল্লাহ "আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন"। এটা শুনে, জনতা আমার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল [কারণ আমি নামাজের মধ্যে হাঁচির জবাব দিয়েছি]। আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের মা তোমাদেরকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কেন আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ? লোকেরা নিজ হস্তদ্বয় তাদের উরুতে মারতে লাগল যেন আমি চুপ থাকি। যখন আমি বুঝলাম, জনতা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি [যদিও নিজের অজ্ঞতা ও তাদের বাড়াবাড়ির কারণে রাগান্বিত হয়েছিলাম তবুও] চুপ হয়ে গেলাম। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলেন– তাঁর প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক, আমি তাঁর পূর্বে বা পরে [তালিমের দিক দিয়ে] তাঁর চেয়ে কোনো উত্তম শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর কসম, রাসূল ﷺ আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে মারলেন না এবং আমাকে মন্দও বললেন না, বরং [শান্তভাবে] বললেন, এটা নামাজ। একে এমন কথাবার্তা বলা ঠিক নয়, যা মানুষের সাথে বলা যায়। নামাজ তো আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা, মহত্ত্ব বর্ণনা ও কুরআন পাঠের নাম। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ কিছু বললেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এ অল্পদিন আগেও জাহেলিয়াতের অজ্ঞতায় ছিলাম [অর্থাৎ আমি নতুন মুসলমান হয়েছি]। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দান করেছেন। আমাদের ভিতরে এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা গণকের নিকট গমন করে [এবং ভবিষ্যতের কথা জানতে চায়]। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা তাদের [গণক ঠাকুরের] কাছে যেয়ো না। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যারা শুভাশুভ ফল নির্ণয়ের জন্য পাখি উড়ায়। রাসূল ﷺ বললেন, এটা এমন একটি বিষয়, মানুষ তাদের অন্তরে অনুভব করে। ভাল বা মন্দের উপরে এর কোনো প্রভাব নেই। তবে এটা যেন

صُدُوْرِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

قَوْلُهُ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ هٰكَذَا وَجَدْتُّ فِىْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَكِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَصُحِّحَ فِىْ جَامِعِ الْاُصُوْلِ بِلَفْظِهِ كَذَا فَوْقَ لٰكِنِّىْ

তাদেরকে সংকল্প হতে বিচ্যুত না করে। বর্ণনাকারী হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম বলেন, আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম, হুজুর! আমাদের মধ্যে কতক লোক এমনও আছে যারা মাটিতে রেখা টেনে ভবিষ্যৎবাণী করে থাকে, রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ নবীদের মধ্যে একজন এরূপ রেখা টেনে ভবিষ্যতের কথা বলতেন। তবে যার রেখা তাঁর [নবীর] রেখার মতো হয় অবশ্যই তা ঠিক আছে, তাকে করতে দাও। –[মুসলিম]

মাসাবীহ্ গ্রন্থকার বলেন, لٰكِنِّىْ سَكَتُّ 'লাকিন্নী সাকাত্তু' অর্থ– 'কিন্তু আমি চুপ হয়ে গেলাম'। এরূপ সহীহ্ মুসলিম ও হুমাইদীর গ্রন্থে পেয়েছি। কিন্তু 'জামেউল উসূল' গ্রন্থে لٰكِنِّىْ শব্দের উপর পর্যন্ত বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَاهِنٌ-এর অর্থ, كَاهِنٌ ও عَرَّافٌ এর মধ্যকার পার্থক্য এবং এ সম্পর্কিত বিধান : كَاهِنٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন كُهَّانٌ শাব্দিক অর্থ হলো– গণক, জ্যোতিষী, ভাগ্য গণনাকারী। পারিভাষিক অর্থ হলো, যারা হাত দেখে অথবা অন্য কোনোভাবে ভাগ্যের ভাল মন্দের কথা অনুমান করে বলে তাদেরকে كَاهِنٌ বলে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন– كَاهِنٌ ও عَرَّافٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, كَاهِنٌ বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে অনুমানের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোনো বিষয়ের সংবাদ দেয়। আর عَرَّافٌ বলা হয় যে গণার মাধ্যমে চোরাইকৃত বা হারানো মালের সন্ধান দেয়।

حُكْمُهُمَا : হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গণকঠাকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে গণকঠাকুরের নিকট ভবিষ্যত জানার জন্য যেতে নিষেধ করলেন।

জমহুর আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, গণকঠাকুরের নিকট যাওয়া এবং অদৃশ্য-বিষয় জানতে চাওয়া হারাম। গণকের কথায় যে বিশ্বাস করে তার মহাপাপ হবে। এমনকি তার এ কাজ কুফরি পর্যায়ের গুনাহ। কারণ গায়েব তো শুধু আল্লাহই জানেন।

অনুরূপভাবে عَرَّافٌ-এর নিকট যাওয়া এবং তার কাছে হারানো মালের সন্ধান চাওয়াও হারাম। মহানবী ﷺ বলেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى عَرَّافًا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ . (اَحْمَدُ)

وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ-এর ব্যাখ্যা : طَيْرٌ একবচন, বহুবচনে طُيُوْرٌ অর্থ– পাখি। اَلطَّيْرُ অর্থ– শুভাশুভ ফলাফল জানার জন্য পাখি উড়ানো। জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ কোথাও রওয়ানা করতে ইচ্ছা করলে প্রথমে কোনো বসা পাখিকে সেখান হতে তাড়া দিয়ে উড়িয়ে দেখত পাখিটি ঐ লোকটির ডান না বাম দিকে যায়। যদি ডান দিকে যেত তা হলে তার যাত্রা শুভ এবং উদ্দেশ্যের কাজটি তার জন্য মঙ্গলময় বলে শুভলক্ষণের 'ফাল' নিত। আর যদি বাম দিকে উড়ে যেত, তখন যাত্রা অশুভ এবং কাজটি নিজের জন্য অমঙ্গল জনক বলে অশুভ লক্ষণের 'ফাল' নিত। মহানবী ﷺ এভাবে 'ফাল' গ্রহণ করাকে নিরর্থক, ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার বলে বর্ণনা করেছেন। বর্মতান যুগেও এ জাতীয় বহু অনৈসলামিক-কুসংস্কার আমাদের সমাজে অবাধে প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং উক্ত হাদীসের আলোকে এগুলো পরিহার করে আমাদের তওবা করা উচিত।

وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّوْنَ-এর ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী রেখাঙ্কন বা জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর কোনো নবীও রেখাঙ্কন করতেন, যার রেখা তার মতো হবে, তবে ঠিক আছে মনে করবে। অর্থাৎ ঐরূপ রেখাঙ্কন তাদের কখনও হবে না, অতএব রেখাঙ্কন করাও যাবে না।

কথিত আছে যে, হযরত ইদ্রীস (আ.) অথবা হযরত দানিয়াল (আ.) রেখাঙ্কন বিদ্যা জানতেন। এটা নবুয়্যতের মু'জিযা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জবাবে এই কথা বুঝা যায় না যে, রেখাঙ্কন বিদ্যা জায়েজ। রাসূল ﷺ-এর উক্তি 'তা'লীক বিল মাহাল' বা অসম্ভব সম্পর্কিত। কারণ যারা নবী নয়, তাদের রেখাঙ্কন নবীদের মতো হওয়া অসম্ভব। আর এই অসম্ভাব্যতার কারণেই তা না

জায়েজ। সুতরাং জমহুর আলেমদের মতে জ্যোতির্বিদ্যার দ্বারা কিছু জানা জায়েজ নেই। হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিরস্কারের স্বরে বলেছেন যে, 'যার রেখাঙ্কন তার রেখার মতো হয়' অর্থাৎ কারও সাধ্য আছে যে, রেখা নবীর মতো টানবে? কেউ কেউ বলেন যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা হতে যদি জানা যায় যে, এই রেখা নবীর রেখার মতো, তা হলে জায়েজ হবে, নতুবা জায়েজ হবে না।

নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বৈধ কিনা? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে– ইমাম আওযায়ীসহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে ভুল সংশোধনের লক্ষ্যে নামাজের মধ্যে স্বেচ্ছায় কথা বলা বৈধ। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে ذُو الْيَدَيْنِ -এর হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটি হলো, একদা রাসূল ﷺ জোহর বা আসরের নামাজ আদায় করার সময় দু' রাকাতের পর সালাম ফিরালেন। তখন যুল-ইয়াদাইন (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ অতঃপর রাসূল ﷺ উপস্থিত মুসল্লিগণকে লক্ষ্য করে বললেন, যুল-ইয়াদাইন যা বলে ব্যাপারটি কি এরূপ? উত্তরে সকলে বললেন, হ্যাঁ। পরে রাসূল ﷺ অবশিষ্ট দু' রাকাত নামাজ আগের দু' রাকাতের সাথে মিলিয়ে পড়ে নিলেন। হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, সংশোধনের উদ্দেশ্যে নামাজের মধ্যে কথা বলা বৈধ। যদি বৈধ না হতো তবে রাসূল ﷺ কথা বলা সত্ত্বেও পূর্বের দু' রাকাতের ওপর ভিত্তি করে শেষের দু' রাকাত পড়তেন না।

ইমাম নববী (র.)-এর মতে নামাজের মধ্যে কথা বলা– কোনো প্রয়োজনে হোক অথবা অপ্রয়োজনে, নামাজের সংশোধনের উদ্দেশ্যে হোক অথবা অন্য কোনো কারণে ইচ্ছাকৃত হলে নামাজ নষ্ট হবে। ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মত এটাই।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবূ সওর, ইবনুল মুনযির, হাসান বসরী, আতা ইবনে আবী রাবাহ, উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের, ইবনে আব্বাস ও ইবনুল যুবায়ের প্রমুখের মতে নামাজি ব্যক্তি ভুলবশত নামাজের মধ্যে কথা বললে নামাজ নষ্ট হবে না, যদি কথা কম হয়। তাঁদের মতে যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে রাসূল ﷺ ভুলবশত কথা বলেছিলেন, আর এ কারণেই নামাজ নষ্ট হয়নি। তদুপরি অন্য হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে– اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ . (اِبْنُ مَاجه . دَارُ قُطْنِى)

ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, সুফিয়ান সওরী, ইবনুল মুবারক, ইব্রাহীম নখয়ী ও হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমান প্রমুখের মতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জেনে-শুনে কিংবা ভুলবশত যে, কোনোভাবেই নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বললে, চাই কথা কম হোক কিংবা বেশি হোক সর্বাবস্থায় নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

(١) قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ .

(٢) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَىْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هِىَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ . (مُسْلِمٌ)

(٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهٗ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نُزِلَتْ "قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ" فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ . (مُسْلِمٌ)

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهٖ مَا شَاءَ وَاَنَّهٗ قَضٰى اَنْ لَا تَتَكَلَّمُوْا فِى الصَّلٰوةِ .

(٥) اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّ الْكَلَامَ يَنْقُضُ الصَّلٰوةَ لَا الْوُضُوْءَ . (دَارُ قُطْنِىْ)

তারা যুল-ইয়াদাইনের হাদীসের উত্তরে বলেন যে, হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। ইসলামের প্রথম যুগে নামাজে কথা বলা সিদ্ধ ছিল, পরে নিষিদ্ধ হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস এ কথারই সমর্থন করে। হাদীসটি হলো,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ نَاْتِىَ اَرْضَ الْحَبْشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ اَتَيْتُهٗ فَوَجَدْتُهٗ يُصَلِّىْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ ...... الخ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

এটা ছাড়াও আলোচ্য হাদীসটির সনদে ও ঘটনার বর্ণনায় অনেক গরমিল রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় ذو اليدين আবার কোনো কোনো বর্ণনায় ذُو الشِّمَالَيْنِ কোথাও জোহর নামাজ, আর কোথাও আসরের নামাজের কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণায় বলা হয়েছে যে, দু' রাকাত পড়ে সালাম ফিরানো হয়েছিল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরানোর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি মুযতারিব। অতএব হানাফীদের মতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٩١٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغُلًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ নামাজ পড়তেন, এমন অবস্থায় আমরা তাকে সালাম করতাম এবং তিনিও আমাদের সালামের উত্তর দিতেন; কিন্তু যখন আমরা [হাবাশা হিজরতের পর] নাজ্জাশীর নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তাঁকে নামাজ অবস্থায় সালাম করলাম, তিনি তার উত্তর দিলেন না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আগে আমরা আপনাকে নামাজের মধ্যে সালাম করতাম, আর আপনি আমাদের উত্তর দিতেন [এখন তা কেন করেন না?] রাসূল ﷺ বললেন, নামাজের মধ্যে একটি মহৎ কাজ রয়েছে [অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ধ্যান ও তন্ময়তা]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ السَّلَامِ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজের মধ্যে সালামের বিধান** : নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম দেওয়া বা সালামের জবাব দেওয়ায় নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। তবে ভুলবশত এরূপ করলে নামাজ নষ্ট হয় না। যদি কেউ নামাজরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়, তবে এর জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে নামাজ শেষে সালামের জবাব দেওয়া মোস্তাহাব, না দিলেও কোনো ক্ষতি নেই।

اَلنَّجَاشِيُّ مَنْ هُوَ **নাজাশী কে?** : নাজাশী হাবাশা বা আবিসিনিয়া [ইথিওপিয়া] রাজ্যের বাদশাহর উপাধি ছিল। তিনি নবী করীম ﷺ-এর সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম আসহামা ছিল। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ পবিত্র মদীনায় থেকে তার জানাজা পড়েছিলেন। কিছু সংখ্যক আলেম এ হাদীস ও ঘটনার প্রেক্ষিতে 'গায়েবী জানাযা' পড়া জায়েজ বলে প্রমাণ গ্রহণ করেন, কিন্তু আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, উপস্থিত মুসলমানদের জন্য তার লাশ অদৃশ্য থাকলেও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তার লাশ মদীনায় উঠিয়ে আনা হয়েছিল এবং মহানবী ﷺ চাক্ষুস তার লাশকে দেখতে পেয়েছিলেন। সুতরাং 'গায়েবী জানাযা' প্রমাণিত হয় না।

اَلْهِجْرَةُ اِلَى الْحَبْشَةِ وَالرُّجُوْعُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ **হাবশায় হিজরত ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন** : পবিত্র মক্কায় যখন তাওহীদের বাণী ও ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল, ফলে এ আদর্শে প্রভাবিত হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন ইসলামের শত্রুরা নিরীহ মুসলমানদের উপর সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার শুরু করল। এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু সংখ্যক নর-নারী মুসলমান রাসূল ﷺ-এর অনুমতি ও পরামর্শে হাব্‌শায় হিজরত করেন। সেখানকার রাজা নাজ্জাশী ছিলেন অত্যন্ত ভাল স্বভাবের ন্যায়পরায়ণ লোক। তিনি এ সমস্ত দেশত্যাগী মুসলমানদের সাথে উত্তম আচরণ ও মধুর ব্যবহার করেন এবং পরে নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তারাও হুযূরের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় পবিত্র মদীনায় হিজরত করলেন। কথিত আছে যে, তাঁরা নৌকা যোগে হাবাশা হতে মদীনায় আগমন করেছিলেন, এ জন্য তারা 'আসহাবে সফীনা' বা নৌকার আরোহী নামেও প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তারা মদীনায় আগমন করলে নবী করীম ﷺ ও মুসলমানদেরকে নামাজ পড়া অবস্থায় পেয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত সে সময়ের সালামের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এরই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা নিষেধ ছিল না। পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ হয়েছে।

اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغُلًا**-এর মর্মার্থ** : মহানবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই নামাজের মধ্যে একটি কাজ রয়েছে। এখানে কাজ বলতে কেরাত পঠন, তাসবীহ ও অন্যান্য দোয়াকে বুঝানো হয়েছে।

অথবা شُغُلٌ দ্বারা আল্লাহর ধ্যান ও তন্ময়তা বুঝানো হয়েছে। কাজেই নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা যাবে না।

وَعَنْ ٩١٧ مُعَيْقِيْبٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৭. অনুবাদ : হযরত মুয়াইকীব (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে সিজদার সময় সিজদার স্থানের মাটি সমান করে বলেন, যদি এরূপ করা প্রয়োজনই হয়, তবে শুধু একবার কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : সিজদার স্থানের মাটি বা কংকর একবারের বেশি সরালে আমলে কাসীর হিসেবে পরিগণিত হবে। ফলে তাতে নামাজ ছুটে যাবে।

وَعَنْ ٩١٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِكْمَةُ النَّهْيِ عَنِ الْخَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করার রহস্য** : নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখার ব্যাপারে হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে মুহাদ্দিসগণ এর নিম্নরূপ কারণ উল্লেখ করেছেন–

(ক) ইবলিসকে আসমান হতে অভিশপ্ত করে কোমরে হাত রাখা অবস্থায় পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। ইবনু আবী শায়বা এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(খ) অথবা ইহুদিরা এ কাজটি খুব বেশি বেশি করত। তাই তাদের সাদৃশ্য হতে বাঁচার জন্য মু'মিনদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

اِنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلٰى خَاصِرَتِهٖ وَتَقُوْلُ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ -

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে– لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ

(গ) কেউ কেউ বলেন, কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো দোজখীদের শাস্তি হতে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায়। এ কারণে নামাজে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু আবী শায়বা (রা.) বর্ণনা করেন–

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْحَقْوِ اِسْتِرَاحَةُ اَهْلِ النَّارِ -

সম্ভবত দোজখীরা শাস্তি হতে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, কিন্তু তারা নিষ্কৃতি পাবে না।

(ঘ) অথবা যেহেতু এরূপ করা অহঙ্কারীদের আচরণ তাই এরূপ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মুহাল্লাব ইবনে আবী সফরা এরূপ বলেছেন।

حُكْمُ الْخَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখার বিধান** : নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখার ব্যাপারে ইমামগণের মতান্তর রয়েছে।

আহলে জাহেরের মতে নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখা হারাম। তারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের নিষেধাজ্ঞাকে হারাম অর্থে ব্যবহার করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আওযাঈ, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাখঈ, আয়েশা, ইবনে আব্বাস ও ইবনে ওমর প্রমুখের মতে নামাজের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ। তারাও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ٩١٩ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯১৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজের মধ্যে আড়চোখে দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি জবাবে বললেন, এটা তো ছোঁ মেরে নেওয়া। শয়তান বান্দার নামাজের কিছু অংশ [অর্থাৎ কিছু ছওয়াব] ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : এ কথা স্বীকৃত যে, চোখের কিনারা দ্বারা আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালে নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, নামাজ আদায় হলেও পূর্ণতা থাকে না; বরং ছওয়াবের ঘাটতি হয়। এ ছওয়াব হারানোকেই উক্ত হাদীসে রূপক হিসেবে 'শয়তানের ছোঁ মারা বলেছেন'। আড়চোখে এদিক ওদিক তাকালে নামাজ নষ্ট হয় না, মাথা ফিরিয়ে একদিকে তাকালে নামাজ মাকরূহ্ হয় এবং ঘাড় বা বক্ষ ঘুরিয়ে তাকালে যাতে কেবলা পরিবর্তন হয়ে যায় তার দ্বারা নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়।

وَعَنْ ٩٢٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- অবশ্যই লোকেরা নামাজের মধ্যে দোয়ার সময় আকাশের দিকে চক্ষু উঠিয়ে তাকানো হতে বিরত থাকবে অথবা তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজের মধ্যে দোয়াকালে আকাশের দিকে চক্ষু উঠিয়ে তাকানো নিষিদ্ধ। তবে নামাজের বাইরে দোয়াকালে আকাশের দিকে তাকানো বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। কাজী শুরাইহ ও আরো অনেকের মতে দোয়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো মাকরূহ। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে দোয়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো বৈধ। তাঁরা বলেন, "আকাশ দোয়ার কেবলা- যেরূপ কা'বা নামাজের কেবলা"। সুতরাং দোয়ার মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো অবৈধ বা মাকরূহ বলা যাবে না।

وَعَنْ ٩٢١ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِى الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهٖ فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ اَعَادَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯২১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মানুষের ইমামতি করতে দেখেছি, তখন আবুল আসের কন্যা উমামা তাঁর [রাসূলুল্লাহর] কাঁধের উপরে ছিল। যখন রাসূল ﷺ রুকু করতেন তখন তাকে নিচে রেখে দিতেন, আর যখন তিনি সিজ্‌দা হতে মাথা উঠাতেন উমামাকে পুনরায় কাঁধে উঠিয়ে বসাতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ حَمْلِ الصَّبِىِّ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজের মধ্যে শিশু বহন করা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ** : নামাজের মধ্যে শিশুদেরকে কোলে নেওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে- ইমাম মালেক (রা.)-এর অভিমত হলো,

নফল নামাজে শিশু কোলে নেওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু ফরজ নামাজে জায়েজ নয়। কারণ হাদীসে আছে যে, اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ। অর্থাৎ তোমরা নামাজে নীরব ও শান্ত থাকো। শিশু কোলে বা কাঁধে নেওয়া নীরবতার বিপরীত। তবে ফরজের তুলনায় নফল নামাজে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামাজে উমামাকে কাঁধে উঠাতেন।

অথবা শিশু কোলে নেওয়ার হুকুমই রহিত হয়ে গেছে। আইনী (র.) বাদায়ে গ্রন্থকার হতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আযমের মতে যদি কোনো মহিলা নামাজের মধ্যে নিজের বাচ্চাকে উঠিয়ে দুধ খাওয়ায়, তবে তার 'আমলে কাসীর' হবে, ফলে তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। শুধু শিশু কোলে নিলে আর দুধ না খাওয়ালে নামাজ বিনষ্ট হবে না। এরূপভাবে ইমাম নববী ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব ব্যক্ত করেন যে, কোনো পশুর কবল হতে রক্ষার জন্য নামাজে থেকেও শিশুকে কোলে নেওয়া জায়েজ হবে। শিশু কোলে নেওয়ার ব্যাপারে আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "একবার আমরা জোহর কিংবা আসরের নামাজে রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম, হযরত বেলাল (রা.) নামাজের আযান দিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের দিকে আসলেন, তখন উমামা তাঁর কাঁধে ছিল। রাসূল ﷺ নামাজের মুসল্লায় দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর পিছনে একতেদা করলাম। রাসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বললেন, আমরাও তাকবীর বললাম, তখনও উমামা তার পূর্ব স্থানে অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর কাঁধে ছিল। এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যাতে নামাজে শিশু কোলে নেওয়া জায়েজ প্রমাণিত হয়।

جَوَابًا لَهُمْ : জমহুর ওলামাদের পক্ষ হতে জবাব দেওয়া হয় যে, শিশু কাঁধে নিয়ে যে রাসূল ﷺ নামাজ আদায় করেছেন, এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো যে সহীহ্ তাতে কারো দ্বিমত নেই এবং এখানে অন্য কোনো ব্যাখ্যারও অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, 'নীরবতা বা শান্ত' থাকার ব্যাখ্যা নিয়ে। কেননা যদি নামাজের মধ্যে আদৌ নড়া-চড়া করা নিষিদ্ধ হয় তবে রুকু-সিজদাও তো 'শান্ত নীরবতার' পরিপন্থি। কাজেই এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, রাসূল ﷺ হতে যে আমল পাওয়া গেছে তা 'সুকূন' বা শান্ত থাকার বিপরীত ছিল না এবং এর উপরে নিষেধের আদেশও প্রয়োগ হবে না।

'এ হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে' এ কথা বলাও ঠিক হবে না। কারণ إِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغْلًا এ হাদীসটি বদরের যুদ্ধের পূর্বেকার। যখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হাবশা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে রাসূল ﷺ এবং মুসলমানদেরকে নামাজ পড়া অবস্থায় সালাম করে সালামের উত্তর পাননি, তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন, নামাজ একটি স্বতন্ত্র বিশেষ কাজ। এর ভিতরে থেকে সালাম-কালাম ও কথাবার্তা বলা যায় না। আর যয়নবের কন্যা উমামাকে নিয়ে রাসূল ﷺ যে বের হয়েছিলেন এবং লোকদেরকে নামাজ পড়ালেন তা বদরের যুদ্ধের পরের ঘটনা। –[ফাত্হুল মুলহিম ফী শরহে সহীহ্ মুসলিম]

মোটকথা, শিশু কোলে-কাঁধে নিয়ে নামাজ আদায় করাটা একটি আংশিক ব্যাপার মাত্র। প্রকৃত কথা হলো, 'আমলে কাসীর' নামাজকে বিনষ্ট করে 'আমলে কালীল' দ্বারা নামাজ নষ্ট হয় না। অবশ্য 'কাসীর' ও 'কালীল'-এর সংজ্ঞায় মতভেদ আছে–

১. ফতোয়ার কিতাবে আছে, নামাজির যে কাজের কারণে দূর হতে কোনো ব্যক্তি দেখে সন্দেহ হয় যে, ঐ ব্যক্তি নামাজে রত নয়, এটা হলো 'আমলে কাসীর'। আর যদি দর্শক সন্দেহ করে এটা 'আমলে কালীল' তা হলে আমলে কালীল।

২. দুই হাতে যে কাজ করা হয় তা 'আমলে কাসীর' এবং এক হাতে যা করা হয় তা 'আমলে কালীল'।

৩. উপর্যুপরি যে কাজ তিনবার করা হয় সে কাজ 'কাসীর', অন্যথা তা 'কালীল'।

৪. মুসল্লীর নিজের রায় ও মতের ভিত্তিতে 'কাসীর' নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ যে কাজকে মুসল্লী নিজে 'কাসীর' মনে করবে তা 'কাসীর' অন্যথা 'কালীল'। এ চতুর্বিদ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, শুধু শিশু কোলে তুলে নিলে আর দুধ না খাওয়ালে নামাজ ফাসেদ হবে না। কারণ রাসূল ﷺ-এর এ কাজটি জায়েজ বর্ণনার জন্য ছিল।

অথবা উক্ত শিশুটির অন্য কোনো হেফাজতকারী না থাকার কারণে উমামাকে নামাজে থেকেও কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যেমন– কোনো বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি নামাজে রত থাকা অবস্থায়ও লাঠি দ্বারা মারলে নামাজ ফাসেদ হবে না। এটাই জমহুর ওলামাদের অভিমত।

قِصَّةُ اَبِى الْعَاصِ مُخْتَصَرًا **আবুল আসের সংক্ষিপ্ত ঘটনা** : রাসূল ﷺ-এর প্রিয়তম মেয়ে হযরত যয়নব (রা.)-এর স্বামী ছিলেন আবুল আস। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর যুদ্ধে যোগদান করলে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তখন যয়নব (রা.) স্বীয় স্বামীকে মুক্ত করার জন্য গলার সেই হারটি রাসূল ﷺ-এর দরবারে পাঠিয়ে দেন, যা শুভ পরিণয়ের মুহূর্তে হযরত খাদীজা (রা.) তাঁর মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ হারটি দেখে চোখের অশ্রু সংবরণ করতে

পারলেন না। অতঃপর ঐ হারসহ (সাহাবীদের পরামর্শে) আবুল আসকে মুক্তি দিয়ে বিনা বাধায় মক্কায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস মূলত বদর যুদ্ধে দলের চাপে পড়ে শরিক হয়েছিল। রাসূল ﷺ আবুল আসকে বিদায়কালে বলে দেন, সে যেন যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। ফলে যয়নব অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে মদীনায় এসে পৌছেন। পরবর্তী বছর আবুল আস বাণিজ্য শেষে সিরিয়া হতে মক্কা ফিরে যাওয়ার সময় পুনরায় সাহাবায়ে কেরামের অবরোধের সম্মুখীন হয়। অনেক ভেবেচিন্তে হযরত যয়নব (রা.)-এর সুপারিশের শরণাপন্ন হলে হযরত যয়নব তাঁকে এই ব্যাপারে অনেকটা সহযোগিতা করেন এবং রাসূল ﷺ যয়নবের সুপারিশ রক্ষা করে আবুল আসকে মুক্তি প্রদান করেন ; কিন্তু আবুল আস মক্কায় পৌছে ব্যবসার সমস্ত আমানতের সম্পদ-এর মুদ্রা বণ্টন ও লাভের অংক বুঝিয়ে দিয়ে গোত্র হতে শেষ বিদায় নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবুল আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ পুনরায় হযরত যয়নব (রা.)-কে তাঁর নিকট সোপর্দ করেন এবং তাদের পূর্বোক্ত বিবাহ বহাল রাখেন। অবশেষে হযরত আবুল আস (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফত কালে ইয়ামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

وَعَنْ ٩٢٢ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ الشَّيْطٰنَ يَدْخُلُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَقُلْ هَا فَاِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطٰنِ يَضْحَكُ مِنْهُ .

৯২২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে হাই আসে, তবে সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাকে রোধ করে অর্থাৎ মুখ বন্ধ করে নেয়। কেননা হাই তোলার সময় শয়তান মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। –[মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে হাই আসে, সে যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করে হাই বন্ধ করে এবং সে হা করে মুখ খুলে না দেয়। কারণ হাই শয়তানের তরফ হতে আসে, শয়তান এতে হাসতে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِضِحْكِ الشَّيْطَانِ وَ دُخُوْلِهِ **শয়তানের হাসা ও প্রবেশের অর্থ** : শয়তান 'হাসে' এবং মুখের ভিতরে 'প্রবেশ করে' এর অর্থ হলো, শয়তান এতে সন্তুষ্ট হয়। স্নায়ুবিক দুর্বলতার দরুনই সাধারণত হাই আসে। আর এ দুর্বলতাই আলস্যের সৃষ্টি করে। নামাজের মধ্যে অলসতাই শয়তান কামনা করে। সুতরাং শয়তান নিজের কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উপস্থিতি দেখলেই সন্তুষ্ট হয়। যে কোনো সময় হাই আসলে নিচের ওষ্ঠ দ্বারা উপরের ওষ্ঠকে চেপে ধরবে অথবা বাম হাতের পিঠ দ্বারা মুখ ঢেকে রাখবে। নামাজ অবস্থায় এরূপ করলে নামাজ ফাসেদ হবে না।

وَعَنْ ٩٢٣ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلٰوتِىْ فَاَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَرْبِطَهُ عَلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ

৯২৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বন্দীকৃত] জিনদের মধ্য হতে একটি দেও ছাড়া পেয়ে গতরাতে আমার নামাজ নষ্ট করতে আসে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন, ফলে আমি তাকে ধরে ফেলি। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি ; যাতে তোমরা সকলে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু

حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ فَرَدَدْتُّهُ خَاسِئًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখনই আমি আমার ভাই সুলায়মান নবীর দোয়ার কথা স্মরণ করলাম। তিনি এভাবে দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রভু! আমাকে এমন একটি ক্ষমতা দান করো, যে ক্ষমতা আমার পরে আর কারো জন্য না হয়।' অতঃপর আমি তাকে ব্যর্থ মনোরথ অর্থাৎ নিরাশ অবস্থায় ছেড়ে দিলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ وُجُوْدِ الْجِنِّ **জিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** জিনদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে কি না? এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ– ইমামুল হারামাইন বলেন যে, দার্শনিকগণ, যিনদীক ও কাদরিয়া সম্প্রদায় জিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কারণ তাদেরকে চোখে দেখা যায় না। আব্দুল জব্বার মু'তাযিলী বলেন যে, অদৃশ্য শরীর প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ কোনো বস্তু অপর বস্তুর নিকট প্রমাণিত হয় না, যতক্ষণ না উভয় বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক থাকবে।

কিন্তু মুসলিম দার্শনিক ও সকল মনীষীগণের বিশ্বাস যে, জিন বিদ্যমান আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসে জিনের অস্তিত্বের কথা রয়েছে। এরূপ অনেক আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা জিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

جَوَابًا لَهُمْ : বিরুদ্ধবাদীদের জবাব এই যে, জিন যদিও চোখে দেখা যায় না, তবু তাদের অস্তিত্ব নেই বলে বুঝায় না। এ জন্যই হযরত কাসেম নানূতুবী (র.) বলেন, দুনিয়ায় প্রত্যেকটি জিনিসেরই গোলা বা কোষাগার থাকে সুতরাং জাগতের ভালো মন্দের জন্যও একটি গোলা বা কোষাগার থাকা দরকার। সুতরাং ভালোর খনি ফেরেশতা এবং মন্দের খনি জিন সম্প্রদায়। এভাবে যুক্তির নিরিখেও জিন জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ **-এর মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ-এর উক্ত বাণী "আমার ভাই সোলায়মান নবীর কথা স্মরণ করলাম"-এর অর্থ এই হলো, যদি আমি দৈত্য (জিন) টিকে বেঁধে রাখতাম, তবে সোলায়মান (আ.)-এর দোয়া কবুল হয়েছিল বলে প্রমাণিত হতো না। আর কোনো নবীর দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়া জায়েজ নেই। এ জন্য আমি দৈত্যটিকে ছেড়ে দিয়েছি। শায়খ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ.) উপরোক্ত رَبِّ هَبْ لِىْ الخ দোয়ার মাধ্যমে বাতাস, দৈত্য-দানব ও জিনকে নিজের করায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন। এ করায়ত্তকরণ হযরত সোলায়মানের জন্যই সুনির্দিষ্ট ছিল। তাঁর দোয়া তাঁর জন্য নিরঙ্কুশ থাকার জন্যই রাসূল ﷺ দৈত্যটিকে ছেড়ে দিলেন, নতুবা দৈত্যকে ধরার মতো পূর্ণশক্তি আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদান করেছিলেন। অবশ্য শাইখুল ইসলাম আল্লামা উসমানী এ দোয়ার আয়াতের আর একটি ব্যাখ্যা করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করো যা অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। তিনি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুচ্চ করার জন্যই এই দোয়া করেছিলেন। কারণ তখন জোর-জবরদস্তির রাজ্য পরিচালনার জমানা ছিল। তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারেই এ দোয়া করেছিলেন। এতে তাঁর প্রতাপ ও শান-শওকত প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না।

وَعَنْ ٩٢٤ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯২৪. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি কারো নামাজের মধ্যে কোনো ব্যাপার ঘটে (অর্থাৎ কেউ ডাকে বা কেউ কিছু চায়) তবে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে– আর তালি বাজানো মেয়েলোকদের জন্য নির্দিষ্ট। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, 'সুবহানাল্লাহ' বলা পুরুষ লোকদের কাজ, আর হাতে তালি বাজানো স্ত্রীলোকদের কাজ। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** 'সুবহানাল্লাহ' বলা একটি সংকেত বিশেষ, যার ফলে অন্য লোক বুঝতে পারে যে, লোকটি নামাজরত আছে। আর মহিলাদের গলার স্বর যেহেতু গায়রে মুহাররাম পুরুষকে শুনানো নিষেধ, তাই তারা 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে তালি বাজাবে। তবে নামাজে হাতে তালি বাজানোর নিয়ম এই যে, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর মারবে এবং আওয়াজ সৃষ্টি করবে। উভয় হাতের তালুতে তালি বাজানো নিষেধ।

وَعَنْ ٩٢٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ نَاْتِيَ اَرْضَ الْحَبْشَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ اَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحَدِّثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ اَنْ لَّا تَتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَقَالَ اِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَانُكَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৯২৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হাবাশায় আগমন করার পূর্বে নবী করীম ﷺ-কে নামাজে রত অবস্থায় সালাম করতাম। তিনিও আমাদের সালামের জবাব দিতেন। আমরা যখন হাবাশা [আবিসিনিয়া] হতে প্রত্যাবর্তন করলাম, একদিন আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম, তিনি তখন নামাজ পড়ছিলেন। অতঃপর আমি সালাম করলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না যতক্ষণ না তিনি নামাজ শেষ করলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর যে আদেশকে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবার তিনি যে নতুন আদেশ জারি করেছেন তার মধ্যে একটি এই যে, তোমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলবে না। অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, নামাজ শুধু কুরআন পাঠ ও আল্লাহর জিকির করার জন্যই। সুতরাং তুমি যখন নামাজে থাকবে তখন তোমার কাজও এরূপই হওয়া চাই। -[আবূ দাঊদ]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٢٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ نَحْوَهُ وَعِوَضَ بِلَالٍ صُهَيْبٌ)

৯২৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহাবীরা যখন নবী করীম ﷺ-কে সালাম করতেন, আর তিনি নামাজে রত থাকতেন, তখন কিভাবে তিনি তাঁদের সালামের জবাব দিতেন। হযরত বিলাল (রা.) বললেন, তখন রাসূল ﷺ নিজ হাত দ্বারা ইশারা করতেন।-[তিরমিযী] নাসায়ীর বর্ণনায়ও এরূপই বর্ণিত হয়েছে, তবে বিলাল (রা.)-এর স্থলে সুহাইব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ جَوَابِ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ **ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দেওয়ার বিধান :** নামাজের মধ্যে ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। হাতের দ্বারা নামাজের মধ্যে সালামের জবাব দেওয়ার নিয়ম হলো, হাতের তালুকে খোলা অবস্থায় নিচের দিকে রেখে হাতের পিঠকে উরুতে রাখা।

ইবনুল মালিক হতে মিরকাতে বর্ণিত আছে, হাত, চোখ কিংবা মাথার ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দিলে নামাজ নষ্ট হবে না। ঐরূপভাবে যহিরিয়্যা গ্রন্থেও বর্ণিত আছে যে, মাথা, হাত, কিংবা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলে নামাজ ফাসেদ হবে না।

কিন্তু খুলাসাতুল ফাতাওয়ায় বলা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে হাত বা মাথার দ্বারা ইশারা করাটা কথাবার্তা বলারই অন্তর্ভুক্ত, কাজেই ইশারা দ্বারাও নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। সুতরাং যে সমস্ত হাদীসে ইশারায় জবাব দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে তা 'নসখে কালাম'-এর সাথে মানসূখ হয়ে গেছে।

হযরত বিলাল ও সুহাইব (রা.) ইসলামের একেবারে প্রথম যুগের মুসলমান, তাঁরা উভয়ই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, পরে আজাদ হয়েছেন। ইসলামের প্রথম যুগের বহু বিষয় সম্পর্কে তাঁরা যা অবগত ছিলেন, পরবর্তী মুসলমানরা তা জানতেন না। এ কারণে হযরত ইবনে ওমর হযরত বেলাল বা সুহাইবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

وَعَنْ ٩٢٧ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ (رضـ) قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَّثَلٰثُوْنَ مَلَكًا اَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ)

৯২৭. অনুবাদ : হযরত রিফা'আহ ইবনে রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়লাম। হঠাৎ আমি হাঁচি দিয়ে বললাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর, অনেক প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, কল্যাণময় প্রশংসা এবং প্রশংসাকারীর জন্য কল্যাণজনক প্রশংসা, যে প্রশংসাকে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন এবং যে প্রশংসায় সন্তুষ্ট হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাজ শেষ করে অবসর হলেন, তখন আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, নামাজের মধ্যে কে কথা বলল? কিন্তু কেউ কথা বলল না। রাসূলে করীম ﷺ দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কোনো কথা বলল না। অতঃপর রাসূল ﷺ তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, তখন রিফা'আ বললেন, আমি বলেছি, হে আল্লাহর রাসূল! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! ত্রিশের বেশি ফেরেশতা এ শব্দগুলোকে উপরে তুলে নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিল, কে কার পূর্বে তা উপরে তুলে নেবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসের ঘটনাটি নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষেধ হওয়ার পূর্বের। সুতরাং হাদীসটির বিধান রহিত হয়ে গেছে। অবশ্য ইবনুল মালিকের মতে হাদীসটির বিধান এখনও কার্যকর আছে।

وَعَنْ ٩٢٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلتَّثَاؤُبُ فِى الصَّلٰوةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَفِىْ اُخْرٰى لَهٗ وَلِابْنِ مَاجَةَ فَلْيَضَعْ يَدَهٗ عَلٰى فِيْهِ) .

৯২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নামাজের মধ্যে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হতে এসে থাকে। সুতরাং যখনই তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন সাধ্যানুযায়ী রোধ করতে চেষ্টা করে। –[তিরমিযী]

তিরমিযী ও ইবনে মাজার অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন নিজের হাতকে মুখের উপরে রাখে।

وَعَنْ ٩٢٩ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَاِنَّهٗ فِى الصَّلٰوةِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৯২৯. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ অজু করে এবং অজুকে উত্তমরূপে সম্পন্ন করে, অতঃপর নামাজের সংকল্পে মসজিদের দিকে যায়, সে যেন নিজ আঙ্গুলে আঙ্গুলে প্যাঁচ [তাশবীক] না দেয়। কারণ সে নামাজের মধ্যে আছে। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى التَّشْبِيْكِ وَحُكْمُهٗ **তাশবীকের অর্থ ও তার হুকুম** : দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকে প্রবেশ করিয়ে একসাথে করাকে বাংলায় প্যাঁচ দেওয়া এবং আরবিতে 'তাশবীক' বলে।

ইবনুল মালিক বলেন, "নামাজের মধ্যে তাশবীক করা মাকরূহ। কেননা এটা নামাজের মধ্যে একাগ্রতা ও বিনয়ের পরিপন্থি।"

আল্লামা মীরক শাহ বলেছেন, সম্ভবত তাশবীক করতে এ জন্যই নিষেধ করেছেন যে, এটা দ্বারা ঝগড়া-বিবাদ ও বিপর্যয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। যেমন রাসূল ﷺ কিয়ামতের নিকটবর্তী ফিতনা বা বিপর্যয়ের আলোচনা কালে তাশবীক করে দেখিয়েছেন।

আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, "নামাজের মধ্যে 'মাথার চুল গোছান' এবং 'হাই তোলা' যে পর্যায়ের নিষিদ্ধ তাশবীক করাও সেই পর্যায়ের নিষিদ্ধ [অর্থাৎ মাকরূহ তানযীহী]।"

তাশবীক নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইমাম আহমদ আবূ সা'দ হতে মারফূ' পর্যায়ের একটি হাদীস উল্লেখ করেছে। হাদীসটি হলো–

اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَاِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِى الصَّلٰوةِ مَادَامَ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْهُ ـ

উক্ত হাদীসে তাশবীককে শয়তানের কর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাই এটা যথাসম্ভব পরিহার করা উচিত।

وَعَنْ ٩٣٠ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِىْ صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৯৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা আপন নামাজে এদিক-ওদিক না তাকায় [একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে সম্মুখে দৃষ্টি অবনত রাখে] ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সম্মানিত ও মহীয়ান বান্দার উপরে রহমতের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন। অতঃপর যখন সে এদিক ওদিক তাকায় তখন আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। –[আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : তিরমিযী শরীফের অপর এক সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা এটাও বলেন, হে বান্দা! তুমি যেদিকে তাকাচ্ছ, সে দিকে আমার চেয়ে বড় কে আছে যে, তুমি তার দিকে দেখছ? বরং আমার দিকেই তাকাও। এভাবে দু'বার বলেন। তৃতীয় বারও যদি বান্দা অপর দিকে তাকায় তখন আল্লাহ তা'আলা আপন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ বান্দার প্রতি কতটুকু অনুগ্রহশীল।

وَعَنْ ٩٣١ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا أَنَسُ اِجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ)

৯৩১. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে বললেন, হে আনাস! নামাজে যেখানে তুমি সিজদা কর সেখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ। –[বায়হাকী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, নামাজের সকল অবস্থাতেই সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, শুধু দাঁড়ানো অবস্থায়ই সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। রুকু অবস্থায় পায়ের পাতার উপরে, সিজদায় নাকের ডগার দিকে এবং তাশাহ্হুদে বসা অবস্থায় নিজের দু' হাঁটুর মাঝে দৃষ্টি রাখতে হবে। এটাই মোস্তাহাব। তবে যার সম্মুখে কা'বা শরীফ থাকবে সে তাশাহ্হুদের শাহাদাতের সময় ব্যতীত সর্বদাই কা'বা ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

وَعَنْ ٩٣٢ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلٰوةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيْضَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৯৩২. **অনুবাদ** : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, হে বৎস! নামাজের মধ্যে কখনও এদিক-ওদিক তাকাবে না। কেননা, নামাজে এদিক-ওদিক তাকানো ধ্বংসের কারণ। আর যদি তাকাতেই হয়, তবে নফল নামাজে, ফরজ নামাজে নয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নামাজের মধ্যে এদকি-ওদিক তাকানো নিষিদ্ধ। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ঘাড় ও বক্ষ না ঘুড়িয়ে তাকানো যেতে পারে। আর নফল নামাজের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। তাই নফলে তাকানো জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٩٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلٰوةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

৯৩৩. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের মধ্যে ডানদিকে ও বামদিকে চোখের কিনারা দ্বারা দেখতেন কিন্তু ঘাড় পিছনে পিঠের দিকে ফিরাতেন না। –[তিরমিযী ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে اَلصَّلٰوةُ (নামাজ) দ্বারা নফল নামাজ উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে এ হাদীসের কোনো দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। কেননা পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনে নফল নামাজে এদিক-ওদিক তাকানোর অনুমতি রয়েছে। অবশ্য اَلصَّلٰوةُ দ্বারা ফরজ নামাজও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এমতাবস্থায় পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে আলোচ্য হাদীসের স্পষ্ট দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কেননা পূর্বোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফরজ নামাজে এদিক-ওদিক তাকানোর অনুমতি নেই।

উক্ত দ্বন্দ্ব সমাধানে হাদীসবিসারদগণ বলেছেন যে, রাসূল ﷺ কখনও কখনও বৈধতা বর্ণনার জন্য এরূপ করতেন। অর্থাৎ তিনি এরূপ করে উম্মতকে জানিয়ে দিতেন যে, এটা নামাজ বিনষ্টকারী নয়।

অথবা রাসূল ﷺ কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ করতেন। তবে ঘাড় পিছনের দিকে ফিরানো বা বক্ষ কেবলা হতে ফিরানো ব্যতীত। কেননা ঘাড় ও বক্ষ কেবলা হতে ঘুরে গেলে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٩٣٤ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ (رض) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَفَعَهُ قَالَ الْعُطَاسُ وَالنُّعَاسُ وَالتَّثَاؤُبُ فِى الصَّلٰوةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَىْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৯৩৪. **অনুবাদ** : হযরত আদী ইবনে ছাবিত তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তাঁর পিতামহ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাঁচি, তন্দ্রা এবং নামাজের মধ্যে হাই তোলা এবং ঋতুস্রাব, বমি আসা এবং নাক হতে রক্ত পড়া [নামাজের মধ্যে কি বাইরে] সব শয়তানের পক্ষ হতে হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলো কোনো না কোনোভাবে নামাজে অলসতা আনে, একাগ্রতা নষ্ট করে, এমনকি নামাজ পরিত্যাগ করায়। এ জন্য শয়তান আনন্দিত হয় এবং এগুলোতে সহায়তা করে। مِنَ الشَّيْطَانِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শয়তান হতে সৃষ্ট।

আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়ের প্রথমোক্ত তিনটিকে শেষোক্ত তিনটি হতে পৃথক করে বর্ণনা করা হয়েছে এ জন্য যে, শেষোক্ত তিনটি দ্বারা নামাজ বাতিল হয়ে যায় ; কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি দ্বারা নামাজ বাতিল হয় না। উল্লেখ যে, এখানে হাঁচি দ্বারা নামাজের ভিতরের হাঁচি উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ٩٣٥ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ أَبِيْهِ (رض) قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَلِجَوْفِهٖ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِىْ يَبْكِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهٖ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ الرِّوَايَةَ الْأُوْلٰى وَأَبُوْ دَاوٗدَ الثَّانِيَةَ)

৯৩৫. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। তাঁর অভ্যন্তর হতে চুলার উপরে তপ্ত ডেগের ফুটন শব্দের ন্যায় আওয়াজ আসছিল। অর্থাৎ তিনি কাঁদছিলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-কে নামাজ পড়তে দেখলাম তখন তাঁর বক্ষের ভিতরে কান্নার দরুন যাঁতা পেষার ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। –[আহ্‌মদ] এ ছাড়া পৃথকভাবে নাসাঈ প্রথম রেওয়ায়াতটি এবং আবূ দাউদ দ্বিতীয়টি রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, নামাজের মধ্যে ক্রন্দন করলে নামাজ বিনষ্ট হয় না। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, নামাজের মধ্যে জাহান্নাম বা পরকালীন শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত পাঠ কালে ভয়-বিহ্বল অবস্থায় যদি ক্রন্দন করে এবং কান্নার শব্দ বক্ষের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে নামাজ বিনষ্ট হবে না, আর যদি পার্থিব কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে ক্রন্দন করে তবে নামাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে।

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ** :

وَهِىَ يُصَلِّىْ বাক্যটি হাল, وَلِجَوْفِهٖ أَزِيْزٌ বাক্যটিও হাল, لِجَوْفِهٖ খবরে মুকাদ্দাম। أَزِيْزٌ পদটি ذُو الْحَالِ অথবা مَوْصُوْف كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ অর্থাৎ مِثْلُ أَزِيْزِ الْمِرْجَلِ হাল বা সিফাত। অতঃপর তা মুবতাদা মুয়াখখার।

وَعَنْ ٩٣٦ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصٰى فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهٗ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৯৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাজের জন্য দাঁড়ায় সে যেন তার সম্মুখের কংকর [সমতল করার জন্য] না মুছে। কারণ আল্লাহর রহমত তখন তার সম্মুখে থাকে। –[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আল্লাহর রহমত সম্মুখে থাকার অর্থ এই যে, যখন সে একাগ্রচিত্তে নড়াচড়া না করে নামাজ পড়ে, তখন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। নামাজি অন্যমনস্ক হলে আল্লাহ তাঁর বিশেষ দৃষ্টি প্রত্যাহার করে নেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাজি ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় তার সিজদার স্থানের কংকর সমতল করার জন্য মুছতে পারবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে একবার মুছা জায়েজ। এ মর্মে আবূ দাউদ শরীফে একটি হাদীসও এসেছে যে,

لَا تَمْسَحِ الْحَصٰى وَاَنْتَ تُصَلِّىْ فَاِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةً لِلْحَصٰى .

وَعَنْ ٩٣٧ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهٗ اَفْلَحُ اِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا اَفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৯৩৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাদের এক ক্রীতদাসকে দেখলেন, যারা নাম ছিল আফলাহ; সে যখন সিজদা করত, ফুঁক দিয়ে ধুলা সরাত [যাতে ধুলা তার নাকে বা কপালে না লাগে]। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে আফলাহ্! তোমার মুখমণ্ডলে মাটি লাগাও [অর্থাৎ ধুলাবালি লাগুক, এটা বিনয়ের পরিচায়ক]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সিজদার স্থান হতে নামাজরত অবস্থায় ধুলা-বালি সরানো জায়েজ নেই, চেহারায় লাগলে তা মুছাও ঠিক নয়। কেননা শরীরে ধুলা-বালি লাগা বিনয়ের পরিচায়ক, তবে সিজদা দিতে একেবারে কষ্টকর হলে একবার সরানো জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٩٣٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِخْتِصَارُ فِى الصَّلٰوةِ رَاحَةُ اَهْلِ النَّارِ . (رَوَاهُ شَرْحُ السُّنَّةِ)

৯৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন– নামাজের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো দোজখবাসীদের শান্তি লাভের চেষ্টাতুল্য। –[শরহে সুন্নাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জাহান্নামীরা চরম কষ্টের মাঝেও একটু শান্তি লাভের চেষ্টায় কোমরে হাত রেখে দাঁড়াবে ; কিন্তু শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। নামাজের মধ্যে, এমনকি নামাজের বাইরেও কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো দোজখবাসীদের দাঁড়ানোর সাথে তুলনীয়। সুতরাং এভাবে দাঁড়ানো কোনো অবস্থাতেই ঠিক নয়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, নামাজের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো ইহুদি ও নাসারাদের কাজ। আর তারা হবে দোজখী। সুতরাং এখানে দোজখী দ্বারা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

مَعْنَى الْإِخْتِصَارِ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজের মধ্যে** اِخْتِصَارْ **করার অর্থ** : নামাজের মধ্যে ইখতিসার করার অর্থ নির্ণয়ে আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ– (১) কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো ইহুদিদের অভ্যাস। উক্ত হাদীসে 'দোজখী' দ্বারা ইহুদিদেরকে বুঝানো হয়েছে। (২) বর্ণিত আছে যে, অভিশম্পাত প্রাপ্ত অবস্থায় যখন ইব্‌লিসকে জমিনে পাঠানো হয় তখন সে কোমরে হাত রেখে অবতীর্ণ হয়েছে। (৩) আবার কেউ কেউ 'ইখ্‌তিসার'-এর এ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, নামাজের মধ্যে সূরা এবং কেরাতকে খুব সংক্ষিপ্ত করা। (৪) আবার কেউ বলেছেন, নামাজের– কিয়াম, রুকু ও সিজদা ইত্যাদিকে খুব তড়িৎ বেগে আদায় করতে গিয়ে এগুলোকে সংক্ষিপ্ত করা। (৫) কারো মতে তালাশ করে সিজদার আয়াত পাঠ করে নামাজ পড়া এবং (৬) কারো অভিমত হলো নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে সিজদা না করে রুকু করা। (৭) আরেক দলের মতে খুব তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করা তবে এ অর্থই অধিক যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٩٣٩ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ اَلْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَلِلنَّسَائِىِّ مَعْنَاهُ)

৯৩৯. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দুই কালো (শত্রু)-কে নামাজের মধ্যে মেরে ফেলতে পার; সাপ ও বিচ্ছু। –[আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী। নাসায়ী ও উক্ত হাদীসের অর্থবোধক একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَتٰى يَجُوْزُ اَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ فِى الصَّلٰوةِ **নামাজে কখন সাপ ও বিচ্ছুকে হত্যা করা জায়েজ** : শরহে মুনিয়্যার মধ্যে কোনো কোনো মনীষীর অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে যে, নামাজের মধ্যে থেকে এগুলোকে তখনই মারার অনুমতি আছে, যদি খুব বেশি হাঁটাহাঁটি করার প্রয়োজন না হয়। যেমন– উর্ধ্বে তিন কদম, অথবা একাধারে তিনবার আঘাত করা ইত্যাদি। কিন্তু যদি এর বেশি হাঁটতে হয় কিংবা তিনবারের বেশি আঘাত করতে হয় তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা তা 'আমলে কাসীরের' আওতায় গণ্য হবে। অবশ্য যদি কোনো নিতান্ত দীন-দুঃখীকে সাহায্য করা, অথবা কেউ ছাদ হতে পড়ে যায়, বা আগুনে পুড়ে অথবা পানিতে ডুবে মরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তখন নামাজের মধ্যে থেকেও তাকে রক্ষা করার অনুমতি আছে, এতে নামাজ ফাসেদ হবে না।

وَعَنْ ٩٤٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَ ذَكَرَتْ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهُ)

৯৪০. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামাজ পড়ছিলেন, তখন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। এমতাবস্থায় আমি ঘরে আসবার জন্য দরজা খুলতে চাইলাম। তখন রাসূল ﷺ কিছু হেঁটে আসলেন এবং আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর পুনরায় জায়নামাজে গেলেন [এবং একই নামাজ পড়তে থাকলেন]। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, দরজাটি কেবলার দিকে অবস্থিত ছিল। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী। নাসায়ীও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ-এর দরজা খুলে দেওয়ার উক্ত কাজটিকে 'আমলে কাসীর' বলা যায় না। কেননা তখন হযরত আয়েশার হুজরা খুব একটা প্রশস্ত ছিল না, তাই অনুমান করা যায় যে, রাসূল ﷺ সম্ভবত দরজার অতি নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, দুই এক পা অগ্রসর হয়েই দরজাটি খুলে দিয়েছিলেন। আবার নামাজটিও ছিল নফল। অথচ নফল নামাজের মধ্যে ফরজের তুলনায় অনেক শিথিলতা রয়েছে। আর এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, হযরত আয়েশারও তাৎক্ষণিক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার একান্তই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এতসব সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে হুযূরের উক্ত কাজটিকে স্বতন্ত্র ঘটনা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

وَعَنْ ٩٤١ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ)

৯৪১. অনুবাদ : হযরত তাল্ক ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাজের মধ্যে বাতকর্ম [পশ্চাৎ বায়ু নির্গত] করে, সে যেন নামাজ ছেড়ে চলে যায় এবং অজু করে পুনঃ নামাজ পড়ে। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী হাদীসটি কিছুটা কম-বেশি বর্ণনা সহকারে উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নামাজে পশ্চাৎ বায়ু নির্গমনের বিষয়ে ইমামদের মতভেদ : নামাজের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে 'হদ্স' [অজু ভঙ্গের কোনো কারণ] করলে নামাজকে প্রথম হতে পড়তে হবে, এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি অনিচ্ছা বশত হদ্স হয়ে যায় তখন ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, এ অবস্থায়ও নামাজ প্রথম হতে পড়তে হবে। তাঁদের দলিল– لِقَوْلِهٖ (ع) مَنْ اَصَابَهُ قَيْئٌ اَوْ رُعَافٌ اَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ আলোচ্য হাদীসে وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নামাজকে পুনরায় শুরু হতে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন, নামাজ প্রথম হতে পড়তে হবে না, বরং 'বেনা' [অর্থাৎ যে পর্যন্ত পড়া হয়েছিল তার পর হতে অবশিষ্ট নামাজ আদায়] করলে চলবে। অবশ্য এর জন্য শর্ত হলো, অজু ভঙ্গের সাথে সাথেই অজু করার জন্য যেতে হবে, কোনো প্রকার কথাবার্তায় কিংবা নিষ্প্রয়োজন কোনো কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। এ হদসটিও অনিচ্ছাকৃতভাবে হতে পারে।

আর আলোচ্য হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, শুরু হতে নামাজ পড়ার নির্দেশ ওয়াজিব হিসেবে নয়; বরং উক্ত নির্দেশটি মোস্তাহাব পর্যায়ের। অথবা উত্তমতার জন্য ছিল। অথবা নামাজির মানসিক প্রবোধ ও প্রশান্তির জন্য ছিল।

وَعَنْ ٩٤٢ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَاْخُذْ بِاَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৯৪২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের মধ্যে কারো নামাজের মধ্যে অজু ভঙ্গ হয়, সে যেন নিজের নাক ধরে বাইরে চলে যায়। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নামাজের মধ্যে বায়ু নির্গত হলে অনেকে লজ্জার ভয়ে বের হয় না, বরং অনেকে নামাজ পড়তে থাকে, অথচ এটা একেবারে শরিয়ত বিরোধী। তাই রাসূল ﷺ নাক ধরে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ মনে করতে পারে যে, তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। এর ফলে সে এক দিকে লোক লজ্জা হতে বাঁচতে পারবে এবং অপরদিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতেও বাঁচতে পারবে।

٩٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ صَلٰوتِهٖ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلٰوتُهٗ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهٗ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَقَدِ اضْطَرَبُوْا فِىْ اِسْنَادِهٖ)

৯৪৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন তোমাদের কেউ তাঁর নামাজের শেষ সময়ে বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বক্ষণে অজু ভঙ্গ করে তা হলে তার নামাজ শুদ্ধ হয়ে গেছে। –[তিরমিযী] তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়। এর সনদে বৈপরীত্য ও গরমিল রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ اِخْتِتَامِ الصَّلٰوةِ **নামাজ সমাপ্তির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :** ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে যে কোনো কাজের মাধ্যমেই নামাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে। সুতরাং বাতকর্ম হলেও নামাজ সমাপ্ত হয়ে গেল, ফলে নামাজও শুদ্ধ হয়ে গেল।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত হলো, সালাম দ্বারাই নামাজ সমাপ্ত করা ফরজ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সালাম দ্বারা নামাজ সমাপ্ত করা ফরজ নয়; বরং ওয়াজিব। তবে যে কোনো কাজ দ্বারাই নামাজ সমাপ্ত করুক না কেন সমাপ্তির নিয়ত থাকতে হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ শেষ করার উদ্দেশ্যে বাতকর্ম বা অন্য কিছু করলে নামাজ শেষ হয়ে যাবে। তবে সালাম ফিরানো যেহেতু ওয়াজিব তাই সালাম ছাড়া অন্য কোনো কাজ দ্বারা নামাজ সমাপ্ত করলে উক্ত নামাজ পুনঃ আদায় করতে হবে। আর অনিচ্ছাকৃত অজু ভঙ্গ হয়ে গেলে অজু করে অবশিষ্ট নামাজ আদায় করলেই যথেষ্ট হবে, পুনঃ আদায় করতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) সালামকে ফরজ বলেন, তাঁর মতের পক্ষে কোনো শক্তিশালী দলিল নেই। কেননা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে রাসূল ﷺ নামাজ শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেছেন, اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُكَ অর্থাৎ তাশাহহুদ পড়লে কিংবা সে পরিমাণ সময় বসে থাকলে তোমার নামাজ পূর্ণ হয়ে যাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٤٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا كَبَّرَ اِنْصَرَفَ وَاَوْمٰى اِلَيْهِمْ اَنْ كَمَا كُنْتُمْ ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهٗ يَقْطُرُ فَصَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ رَوٰى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا)

৯৪৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী করীম ﷺ নামাজ পড়তে বের হলেন। যখন তাকবীর বললেন, তখন তিনি নামাজ ছেড়ে দিলেন এবং সাহাবীদেরকে এই বলে ইশারা করলেন যে, তোমরা যেভাবে আছ থাক। অতঃপর তিনি মসজিদ হতে বের হয়ে গেলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর পুনরায় ফিরে আসলেন, তখনও মাথা হতে পানি ঝরছিল এবং সাহাবীদেরকে নামাজ পড়ালেন। যখন নামাজ সমাধা করলেন, তখন তিনি [সাহাবীদের উদ্দেশ্যে] বললেন, আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম; কিন্তু গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। –[আহমদ] ইমাম মালেক (র.) হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার হতে মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ صَلٰوةِ الْمُقْتَدِيْ بِفَسَادِ صَلٰوةِ الْاِمَامِ ইমামের নামাজ নষ্ট হওয়ার পর মুক্তাদির নামাজের বিধান : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনো কারণে ইমামের নামাজ ফাসেদ হলেও মুক্তাদির নামাজ ফাসেদ হবে না। আলোচ্য হাদীসই তাঁর দলিল। তিনি বলেন, হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে যে, মহানবী ﷺ পুনরায় এসে যখন নামাজের তাক্‌বীর বলেছেন তখন মুক্তাদিগণ নতুনভাবে কোনো তাকবীর বলেননি। এটা হতে বুঝা যায় যে, তাদের নামাজ নষ্ট হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা তথা হানাফীগণ বলেন, ইমামের নামাজ ফাসেদ হলে মুক্তাদিদের নামাজও ফাসেদ হয়ে যাবে। তাঁরা বলেন, অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, صَلٰوةُ الْاِمَامِ صَلٰوةٌ لِمَنْ خَلْفَهٗ এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, মুক্তাদির নামাজ ইমামের নামাজের উপরেই নির্ভরশীল। সহীহ্ হওয়া কিংবা নষ্ট হওয়া উভয় অবস্থায় ইমামের নামাজের উপর নির্ভর করে। আর আলোচ্য হাদীসে 'মুক্তাদিগণ পুনরায় তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলেননি' বলেও কোনো শব্দ বা ইঙ্গিত নেই। অতএব এটাও হতে পারে যে, তাঁরা পুনরায় তাহ্‌রীমা বলেছেন, আর সংক্ষিপ্ততার দরুন তা হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি।

اَلْمَسَائِلُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ উক্ত হাদীস হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য হাদীস হতে সুস্পষ্টভাবে কতিপয় মাস্‌আলা নির্গত হয়। যেমন– (১) কোনো ব্যক্তি জুনুবী হওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক গোসল করা তথা পবিত্রতা অবলম্বন করা ওয়াজিব বা জরুরি নয়, অবশ্য পূর্ণ একটি ফরজ নামাজের সময় অতিক্রম হলে তখন ফেরেশতা তাকে লানত করতে থাকে, সুতরাং তা হারাম। (২) জুনুবী অবস্থায় জমিনের উপর চলাফেরা করা, কথাবার্তা বলা ইত্যাদি জায়েজ আছে। (৩) জুনুবী অবস্থায় চলাফেরা করতে অজু কিংবা তায়াম্মুম করতে হবে না, করলে উত্তম, না করলেও কোনো ক্ষতি নেই ইত্যাদি।

وَعَنْ ٩٤٥ جَابِرٍ (رض) قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاٰخُذُ قُبْضَةً مِنَ الْحَصٰى لِتَبْرُدَ فِىْ كَفِّىْ اَضَعُهَا لِجَبْهَتِىْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ نَحْوَهٗ)

৯৪৫. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জোহর নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে পড়তাম। একমুষ্টি কংকর আমি হাতে তুলে নিতাম, যাতে আমার হাতের শীতলতায় ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত গরমের কারণে [নিজেকে উত্তপ্ততা হতে বাঁচানোর জন্য] তা আমার সিজদার স্থানে রেখে তার উপর সিজদা করতে পারি।–[আবূ দাউদ] নাসায়ীও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٩٤٦ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ ثَلٰثًا وَبَسَطَ يَدَهٗ كَاَنَّهٗ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُوْلُهٗ

৯৪৬. অনুবাদ : হযরত আবুদ্ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে দাঁড়ান। এমন সময় আমি তাঁকে বলতে শুনলাম যে, 'আউযুবিল্লাহি মিন্‌কা। অর্থ–আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ [আশ্রয়] চাই। অতঃপর তিনবার বললেন, আল'আনুকা বিলা'নাতিল্লাহি। অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত দ্বারা আমি তোমার উপরে অভিশাপ করি।' আর নিজ হাত এমনভাবে সম্মুখে প্রসারিত করলেন যেন তিনি কিছু ধরতে চাচ্ছেন। যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে এই নামাজের মধ্যে এমন কিছু কথা বলতে

قَبْلَ ذٰلِكَ وَ رَأَيْنَاكَ بَسَطْتَّ يَدَكَ قَالَ اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهٗ فِىْ وَجْهِىْ فَقُلْتُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَاْخِرْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَرَدْتُّ اَنْ اٰخُذَهٗ وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ اَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَاَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهٖ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

শুনলাম, এর পূর্বে আর কখনও আপনাকে এরূপ কথা বলতে শুনিনি। আর আমরা আপনাকে দেখলাম যে, আপনি নিজের হাত সম্মুখের দিকে প্রসারিত করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলিস আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ এনেছিল, যাতে তা আমার চেহারায় নিক্ষেপ করতে পারে। অতঃপর 'আমি তিনবার বললাম, আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই।' আরও তিনবার বললাম, 'আল্লাহ্‌র পূর্ণ অভিসম্পাত দ্বারা আমি তোমার উপরে অভিশাপ করি।' কিন্তু সে আমার সম্মুখ হতে গেল না। অতঃপর আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করি। আল্লাহর কসম! যদি আমাদের ভাই হযরত সুলাইমান (আ.)-এর দোয়া না হতো তা হলে সে সকাল পর্যন্ত এখানে বাঁধা অবস্থায় থাকত। আর মদীনার বালকেরা তাকে নিয়ে খেলা করত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসটি নামাজে কথাবার্তা বলা নিষেধ হওয়ার পূর্বেকার। আর এটা হাদীসে আমলী, যা হাদীসে কাওলী اِنَّ الصَّلٰوةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। অথবা এটা রাসূল ﷺ-এর বিশেষত্ব, এজন্যই তাঁর নামাজ বাতিল হয়নি। আর এখানে ইবলীস বলতে জিন বিশেষকে বুঝানো হয়েছে। এ ইবলীস হযরত আদম (আ.)-এর ইবলীস নয়।

وَعَنْ ٩٤٧ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا فَرَجَعَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهٗ اِذَا سُلِّمَ عَلٰى اَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهٖ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৯৪৭. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। তখন সে নামাজ পড়ছিল। আব্দুল্লাহ (রা.) তাকে সালাম করলেন, আর সে ব্যক্তি কথার মাধ্যমে তার সালামের জবাব দিল। পুনরায় যখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তার নিকট দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাকে বললেন, যখন তোমাদের কাউকে সালাম করা হয়, আর সে নামাজে রত থাকে, তবে সে যেন কথার মাধ্যমে জবাব না দেয়; বরং হাত দ্বারা ইশারায় সালামের জবাব দেয়। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সম্ভবত এ সালাম-কালামের বিষয়টি নামাজের মধ্যে কথাবার্তা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

অথবা এটা নফল নামাজ ছিল যাতে সালাম দেওয়া ও ইশারায় জবাব দেওয়া ইবনে ওমরের মতে জায়েজ।

بَابُ السَّهْوِ

পরিচ্ছেদ : সিজদায়ে সাহু

اَلسَّهْوُ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– ভুলে যাওয়া অথবা এর অর্থ হলো– اَلْغَفْلَةُ عَنِ الشَّيْءِ وَ ذَهَابُ الْقَلْبِ اِلٰى غَيْرِهٖ অর্থাৎ কোনো বিষয়ে বেখেয়াল হয়ে যাওয়া এবং সেদিক হতে অন্য দিকে মন চলে যাওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায় নামাজের মধ্যে ভুলবশতঃ কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা কোনো ওয়াজিব আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা অতিরিক্ত হলে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষ করে ডানদিকে সালাম ফিরিয়ে যে দু'টি সেজদা করতে হয় তাকে সিজদায়ে সাহু বলে।

এক বা একাধিক ভুলের জন্য একবারই সাহু সেজদা করতে হয়। ইমামের সাহু সিজদা ওয়াজিব হলে মুক্তাদিরও সাহু সিজদা করতে হবে, আর মুক্তাদির ভুল হলে ইমাম মুক্তাদি কারো উপর সাহু সিজদা আবশ্যক হবে না।

উল্লেখ্য যে, সাহু সিজদা কেবল ওয়াজিবের ব্যাপারেই অনুমোদিত। কিন্তু কোনো ফরজ ছুটে গেলে সাহু সিজদা করলে চলবে না; বরং নামাজ পুনরায় পড়তে হবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে সাহু সিজদা সম্পর্কীয় হাদীসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٤٨ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ নামাজে দাঁড়ায়, তখন শয়তান তার নিকটে আসে এবং তার নামাজের মধ্যে গোলযোগ ঘটায় তথা তাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কখনো বলতে পারে না যে, নামাজ কত রাকাত পড়েছে। সুতরাং যখন তোমাদের কারো এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন সে যেন দুই সিজদা [সাহু] করে, যখন সে শেষ বৈঠকে থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে সর্বদা মানুষকে বিপথগামী করার জন্য চেষ্টা করে, এমনকি নামাজের মধ্যেও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। সুতরাং কেউ যদি নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে রাকাত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে তবে তার হুকুম এই যে, যদি এরূপ ঘটনা জীবনে প্রথমবারের মতো হয়, তা হলে সে নতুন করে প্রথম হতে নামাজ শুরু করবে ; কিন্তু যদি তার এরূপ সন্দেহ প্রায়শ সৃষ্টি হয় তবে সে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে এবং সাহু সিজদা করবে। আর যদি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার উপর মন দৃঢ় না হয় তবে কম সংখ্যাকে ধরে নিয়ে অবশিষ্ট নামাজ আদায় করবে এবং সাহু সিজদা করবে। এভাবে তার নামাজ সমাপ্ত করবে।

وَعَنْ ٩٤٩ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّٰى ثَلٰثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلٰى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ فَاِنْ كَانَ صَلّٰى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهٗ صَلٰوتَهٗ وَاِنْ كَانَ صَلّٰى اِتْمَامًا لِاَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلاً وَفِىْ رِوَايَتِهٖ شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ)

৯৪৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যদি তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, আর সে বলতে পারে না যে তিন রাকাত পড়েছে, না চার রাকাত? তখন সে যেন সন্দেহ দূর করে [অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত রাকাতকে বাদ দিয়ে দেয়] এবং নিশ্চিত রাকাতের উপর ভিত্তি স্থাপন করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দুই [সাহু] সেজ্‌দা করে। যদি সে পাঁচ রাকাতই পড়ে ফেলে, তা হলে তার এ দুই সেজ্‌দা তার বেজোড় রাকাতকে জোড়া অর্থাৎ ছয় রাকাত করবে। আর যদি বাস্তবে পূর্ণ চার রাকাতই পড়ে ফেলে, তা হলে এ দু' সিজদা শয়তানের অপমানস্বরূপ হবে। –[মুসলিম] মালেক (র.) আতা হতে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনায় আছে যে, যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাকাতই পড়ে থাকে তবে এ দু সিজদা দ্বারা তাকে জোড় [অর্থাৎ ছয় রাকাত] করে নিবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ مَحَلِّ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ :

সিজদায়ে সাহুর স্থান সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : সাহু সিজদা কখন দেওয়া হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়; যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ **ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত :** ইমাম মালেক (র.)-এর মতানুসারে নামাজে কোনো রোকন কম হওয়ার কারণে যদি সাহু সিজদা করতে হয় তবে সালামের পূর্বে সিজদা করতে হবে। আর যদি কোনো রোকন বেশি হওয়ার কারণে সাহু সিজদা দিতে হয়, তবে সালামের পরে সিজদা করতে হবে। তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন–

সালাম পূর্বে সিজদা করার দলিল :

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ . (بُخَارِىْ)

(٢) رَوَى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَامَ فِىْ مَثْنٰى مِنْ صَلٰوتِهٖ فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ .

সালামের পরে সিজদা করার দলিল :

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ **ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত :** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নামাজের কোনো অঙ্গ কম হোক কিংবা বেশি উভয় অবস্থাতে তাশাহ্হুদের পর সালামের পূর্বেই সাহু সিজদা করতে হবে। তাঁর দলিল–

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা.) বলেন, ... মহানবী ﷺ দু'টি সাহু সিজদা করেছেন। তারপর সালাম ফিরিয়েছেন।

(২) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ .... فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ - (رواه مسلم)

مَذْهَبُ اِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের অভিমত : ইমাম আহমদ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ হতে সর্বমোট চার স্থানে ভুলের দরুন সাহু সিজদা করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তা হলো– (১) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে শেষ রাকাতের পর পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। (২) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দু' রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছিলেন। (৩) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিয়েছিলেন। (৪) সূরা ফাতিহার পর কুরআন-এর আয়াত পাঠ না করে রুকু করেছিলেন। সুতরাং তিনি বলেন, এ সকল জায়গাতে মহানবী ﷺ যেভাবে সাহু সিজদা করেছিলেন, যদি কেউ এ জাতীয় কোনো ভুল করে, সেই ভাবেই সাহু সিজদা করতে হবে। অর্থাৎ যদি সালামের পূর্বে করা প্রমাণিত হয়, তবে তদনুযায়ী সালামের পূর্বেই করতে হবে। আর যদি সালামের পর করা প্রমাণিত হয়, তবে পরেই করতে হবে। আর উল্লিখিত স্থান ব্যতীত যদি অন্য কোনো প্রকারের ভুল হয়, তবে সালামের পূর্বেই সাহু-সিজদা করতে হবে। যেমন– ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন। এ অবস্থায় তাঁর ও ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব একই। ইমাম শাফেয়ীর যে দলিল, তাঁরও সে একই দলিল।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নামাজের ওয়াজিব তরক করার মত যে কোনো প্রকারের ভুলের জন্য সালামের পরে অর্থাৎ একদিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি সাহু সিজদা করবে। পরে তাশাহ্হুদ, দরুদ ও দোয়া ইত্যাদি পাঠ করে নামাজ শেষে সালাম ফিরাবে। যেভাবে আমরা করে থাকি। তাঁর দলিল–

رَوٰى ثَوْبَانُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ

অর্থাৎ হযরত ছাওবান (রা.) মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক ভুলের জন্য সালামের পরে দু'টি সাহু সিজদা করতে হয়। অথচ এ হাদীসে নামাজের কোনো অঙ্গ 'কম বা বেশি' হওয়ার ব্যাপারে কোনো তারতম্য করেননি। যেরূপ ইমাম মালেক (র.) বলে থাকেন। এতদ্ভিন্ন এমন বহু সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সাহু সিজদা এক সালামের পর করতে হবে।

جَوَابًا لَهُمْ : ইমাম মালেক (র.)-এর উক্তি, তথা নামাজের 'কমবেশির' ত্রুটির দরুন তিনি যে প্রভেদ বলেছেন, তাঁর এ কথা সঠিক ও সমর্থিত নয়। কথিত আছে যে, একবার ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) মালেক (র.)-কে খলিফা মনসূরের সম্মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলুন তো! যদি কোনো ব্যক্তি একই নামাজে একটি 'কম' ও আরেকটি 'বেশি' উভয় প্রকারের ভুল করে, তখন সে কিভাবে সাহু সিজদা করবে? অথচ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, একই নামাজে এক বা একাধিক ভুলের জন্য সাহু সিজদা কেবল মাত্র একবারই করতে হয়। এ কথা শুনে ইমাম মালেক নির্বাক ও হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা যায় যে, হাদীসে উল্লিখিত সালামের পূর্বে অর্থ হলো নামাজ সমাপ্তির সালামের পূর্বে, একদিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে নয়। কেননা যদি কোনো ব্যক্তি এক সালামের পূর্বে সাহু সিজদা আদায় করে ফেলে এরপরে যদি সে এক বা একাধিক ভুল করে তখন সে কি করবে। অথচ এটা সর্বস্বীকৃত যে, একাধিক সাহু সিজদা জায়েজ নেই। কাজেই এক সালামের পরে সাহু সিজদা করাই যুক্তিযুক্ত।

وَعَنْ ٩٥٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهٗ اَزِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ

৯৫০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূল ﷺ জোহরের নামাজ পাঁচ রাকাত পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো হুজুর! জোহরের নামাজ কি [আল্লাহ্র পক্ষ হতে] এক রাকাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হুজুর ﷺ বললেন, সেটা আবার কি কথা? লোকেরা বলল, হুজুর! আপনি যে পাঁচ রাকাত পড়লেন? এটা শুনে হুজুর ﷺ সালাম ফিরাবার পর দু'টি

سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِى وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

সিজদা করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বললেন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই। আমিও [কখনও] ভুলে যাই, তোমরা যেরূপ ভুলে যাও। সুতরাং আমি যখন কিছু ভুলে যাই তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কাজেই যখন তোমাদের কারো নামাজের মধ্যে সন্দেহ হয়, তখন সে যেন সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং চেষ্টার ফলের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ সমাপ্ত করে। অতঃপর সালাম ফিরায়, তারপর সাহুর জন্য দু'টি সিজদা করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, চতুর্থ রাকাতের পর না বসে ভুলে যদি পঞ্চম রাকাত পড়ে ফেলে এবং পরে সাহু সিজদা দেয় তবে তার নামাজ ফরজ হিসেবে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, চতুর্থ রাকাতে না বসে পঞ্চম রাকাত পড়লে তখন তার নামাজ ফরজ হিসেবে আদায় হবে না, বরং তার নামাজ নফলে পরিণত হয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, যদি চতুর্থ রাকাতের পর বসে ভুলে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তখন ফরজ বাতিল হবে না। উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত ঘটনায়ও সম্ভবত রাসূল ﷺ চতুর্থ রাকাতের পর বসেছিলেন এবং ভুলে দাঁড়িয়ে গেছেন।

كَيْفِيَّةُ الصَّلٰوةِ إِذَا حَدَثَ الشَّكُّ فِى الْمُصَلِّىْ **মুসল্লির সন্দেহ হলে নামাজের প্রক্রিয়া :** যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের মধ্যে এ অবস্থায় পৌঁছে যে, সে কত রাকাত পড়েছে তা স্মরণ করতে পারছে না। এ সন্দেহের অবস্থায় নামাজ কিরূপে সমাপ্ত করতে হবে, এ সম্পর্কে হাদীসে তিনটি ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে—

১. 'বেনা' অর্থাৎ নিশ্চিতটাকে ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ সমাপ্ত করা, যেমন- হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে 'তিন'-কে নিশ্চিত ভিত্তি করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যখন তিন ও চার রাকাতের মধ্যে সন্দেহ জাগে, তখন 'চার' হওয়াটা সন্দেহযুক্ত কিন্তু 'তিন' হওয়াটা সন্দেহমুক্ত।

২. 'তাহাররী' অর্থাৎ সত্য নির্ণয় ও নির্ধারণের চেষ্টা করা। এ চেষ্টার পর তার মনে যা প্রবল হয় তদনুযায়ী কাজ করা। বাস্তবে প্রকৃত ব্যাপারে যা হোক না কেন? তা হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় রয়েছে।

৩. 'ইসতিনাফ' অর্থাৎ নামাজকে শুরু হতে নতুনভাবে পড়া, যা অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। পরস্পর বিরোধী এ সমস্যার সমাধানে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, কারো প্রথমবার এই সন্দেহ হলে তখন সে 'বেনা' করবে। বার বার এরূপ হতে থাকলে সে তাহাররী করবে। এরপরও যদি কোনো দিকে ধারণার প্রাবল্যতা না জন্মায় তখন 'ইসতিনাফ' করবে।

كَيْفَ صَحَّتْ سَجْدَةُ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ **কথা বলার পর কিভাবে সাহু সেজদা বিশুদ্ধ হলো :** ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ভুলবশত কথা বললে নামাজ বিনষ্ট হয় না, যা উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। ইমাম আহমদ (র.) বলেন যে, নামাজের প্রয়োজনে কথা বললে নামাজ নষ্ট হয় না। আর হানাফী মাযহাব মতে ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় ভুলবশত কি নামাজেরই স্বার্থে সর্বাবস্থায়ই নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কথা বলায় নামাজ নষ্ট হতো না। ঐ সময় নামাজের মধ্যে কথা বলা জায়েজ ছিল। পরে কথা বলা জায়েজের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। যেমন- মুসলিম শরীফে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমরা নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলতাম, মানুষ নিজের সাথীর সাথে আলাপ করত। কুরআন মাজীদের আয়াত قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ الخ অবতীর্ণ হওয়ার পরে আমাদেরকে চুপ থাকার জন্য বলা হয়েছে এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। -[হেদায়া, তিরমিযী, ত্বাহাবী] সুতরাং এটাও হতে পারে যে, কথা বলার পরে সাহু সিজদা শুদ্ধ হয়েছে এ জন্য যে, তখন নামাজে কথা বলা জায়েজ ছিল।

وَعَنْ ٩٥١ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى صَلٰوتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ قَدْ سَمَّاهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَاَنَّهٗ غَضْبَانَ وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ وَ وَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتْ سَرْعَانُ الْقَوْمِ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهٗ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهٖ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَاَلُوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ

৯৫১. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত ইবনে সীরীন (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্নের দুই নামাজের মধ্যে কোনো এক নামাজ আমাদেরকে পড়ালেন। ইবনে সীরীন (র.) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সে নামাজের নাম [জোহর কিংবা আসর] বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে [চার রাকাতের স্থলে] দু' রাকাত পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদের মধ্যে এলোপাতাড়ি রাখা একটি কাঠ খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন তিনি খুব রাগান্বিত আছেন। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন এবং উভয় হাতের অঙ্গুলি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। তাঁর ডান গণ্ডদেশ বাম হাতের পিঠের উপর স্থাপন করলেন। [এই ধারণাবশত যে, তিনি নামাজ হতে অবসর হয়েছেন]। এদিকে দ্রুতগামী জনতা মসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, নামাজ সংক্ষিপ্ত করা হলো না কি? জনতার মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) ছিলেন। তাঁরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এই বিষয়ে কথা বলতে ভয় [সংকোচ] করছিলেন। লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যার দুই হাত কিছুটা দীর্ঘ ছিল। তাঁকে 'যুল ইয়াদাইন; [লম্বা হাতওয়ালা] বলা হতো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুল করেছেন, না [আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে] নামাজ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, আমি ভুলিনি এবং নামাজও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে তাই কি ঠিক? তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে সম্মুখে গেলেন এবং বাকি নামাজ পড়ালেন, যা ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বললেন এবং সিজদা করলেন নামাজের [সাধারণ] সিজদার মতো অথবা এর চেয়েও কিছু দীর্ঘ সময়। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন। অতঃপর পুনরায় তাকবীর বললেন এবং নামাজের সাধারণ সিজদার মতো কিংবা তার চেয়েও দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং "আল্লাহু আকবার" বললেন। রাবী ইবনে সীরীনকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আবূ হুরায়রা কি এটাও বলেছেন? "অতঃপর হুজুর সালাম ফিরালেন।" তখন

قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِيْ أُخْرٰى لَهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدَلَ لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ)

ইবনে সীরীন বললেন, আমার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে যে, ইমরান ইবনে হুসাইন [সাহাবী] বলেছেন, অতঃপর হুজুর ﷺ সালাম ফিরালেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

এটা বুখারীর ভাষা, কিন্তু তাদের উভয়ের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি ভুলিনি এবং নামাজ সংক্ষিপ্তও করা হয়নি।' এ বাক্যের পরিবর্তে 'এর কোনোটাই হয়নি।' তখন যুল ইয়াদাইন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কোনো একটি অবশ্যই হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবনে সীরীনের পরিচিতি : تَعْرِيْفُ ابْنِ سِيْرِيْن سِيْرِيْن শব্দটি غِسْلِيْن-এর ন্যায়। শব্দটি عَلَمْ এবং عُجْمَة হেতু غَيْر مُنْصَرِف তবে عُجْمَة টি প্রকাশ্য নয়। কেননা তিনি আরবের লোক ছিলেন। কিন্তু ইবনে আরাবীর মতে শব্দটি مُنْصَرِف যেমন অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, يَاء এবং نُوْن ও غَيْر مُنْصَرِف-এর সবব। আর এ জন্যই এটা غَيْر مُنْصَرِف মূলত তাঁর নাম হলো মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হযরত আনাস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের দুই বৎসর অতিবাহিত হলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। প্রায় ৩০ জন সাহাবী (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বপ্নের তাবীর করতে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি اَلثُّرَيَّا اَلْجَوْزَاءُ নক্ষত্রকে -এর অগ্রে দেখে বলেছেন, يَمُوْتُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ثُمَّ اَنَا পরে ঘটনা সত্যই প্রমাণিত হয়েছে। জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল তার স্ত্রীর সাথে কুকুর সহবাস করছে। এর তাবীর জানতে চাইলে তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী কাঁচি দ্বারা লজ্জাস্থানের পশম কাটে। পরে স্ত্রীকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তার স্ত্রী এর সত্যতা স্বীকার করে।

كَيْفَ صَارَ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ খবরে ওয়াহেদ কিভাবে দলিল হলো, অথচ রাসূল ﷺ-এর পরে জিজ্ঞাসা করেছেন : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে খবরে ওয়াহেদ শরিয়তের জন্য দলিল নয়। কারণ খবরে ওয়াহেদ যদি দলিল হতো, তবে اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ বলে রাসূল ﷺ অন্যান্য সাহাবীদের সাক্ষ্য নেবেন কেন?

এর উত্তরে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এ জন্য যে, মজলিসে অন্যান্য বড় বড় সাহাবীও বিদ্যমান রয়েছেন, অথচ তাঁদের কেউই প্রশ্ন করছে না শুধু ذُو الْيَدَيْنِ একাই প্রশ্ন করেছেন। অতএব সাক্ষ্য গ্রহণ এ জন্য নয় যে, খবরে ওয়াহেদ দলিলে শরয়ী হওয়ার উপযুক্ত নয়।

وَعَنْ ٩٥٢ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ حَتّٰى اِذَا قَضَى الصَّلٰوةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهٗ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৫২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাদেরকে জোহর নামাজ পড়ালেন। প্রথম দু' রাকাত পড়ে তিনি [ভুলবশত] দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না। তখন লোকজনও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি বাকি নামাজ শেষ করলেন, আর লোকজন তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করছিলেন, তখন বসা অবস্থায়ই তিনি তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর [যথারীতি] সালাম ফিরালেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَ صَدَرَ السَّهْوُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ নবী করীম ﷺ হতে ভুল প্রকাশ পেয়েছে কেন? মাঝে মাঝে মহানবী ﷺ অধিক তন্ময়তার দরুন নামাজের মধ্যে ভুল করেছেন। এর দু'টি কারণ হতে পারে। (১) তিনি যে মানবীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একজন মানুষ, সম্ভবত এটা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা কদাচিৎ তাঁর কাজে ভুল সৃষ্টি করাতেন। (২) উম্মতের জন্য তালিম বা শিক্ষা। অর্থাৎ নামাজে ভুল হলে তা কিভাবে সংশোধন করতে হয়, নবীর আমলের দ্বারা উম্মতগণ বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করবে। তাই আল্লাহ ইচ্ছা করে নবীর দ্বারা ভুলও পরে সংশোধন করিয়েছেন। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত রাখতে পারতেন। যেমন ওহির ব্যাপারে তাঁকে ভুল-ত্রুটি হতে সম্পূর্ণরূপে হেফাজতে রেখেছিলেন।

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُّسَلِّمَ সালামের পূর্বে দুই সিজদা করেছেন : আমরা পূর্বেই বলেছি যে, এ হাদীসের ভিত্তিতে শাফেয়ীগণ আমল করেন এবং সালামের পূর্বেই সাহু সিজদা করেন। এর জবাবে হানাফীগণ বলেন, এমন বহু হাদীস বর্ণিত আছে যাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহানবী ﷺ সালামের পরেই সিজদায়ে সাহু করেছেন। বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.) সালামের পরই সাহু সিজদা করেছেন। এটাই এ কথার প্রমাণ করে যে, 'ইবনে বুহাইনার বর্ণিত হাদীস মনসুখ হয়ে গেছে। وَلِاَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ اُخِرَ عَنْ مَحَلِّ النُّقْصَانِ بِالْاِجْمَاعِ وَاِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى يَقْتَضِى التَّاخِيْرَ عَنِ السَّلَامِ অর্থাৎ এটা সকলের ঐকমত্য যে, সাহু সিজদা ভুল-ত্রুটির সর্বশেষ প্রান্তে হওয়াই এর স্থান। কেননা সালামের আগে সাহু সিজদা করলে পরে যদি আবার ভুল করে তখন কি করবে? কেননা একই নামাজে যাবতীয় ভুলের জন্য একবারই সাহু সিজদা করাটা শরিয়ত সম্মত। বার বার ভুলের জন্য একাধিক বার সাহু সিজদা করার বিধান নেই। এ কারণেই এটা যুক্তি সঙ্গত যে, সাহু সিজদা সালামের পরে হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯৫৩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهٰى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৯৫৩. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাদেরকে নামাজ পড়ালেন এবং ভুল করলেন, অত:পর দু'টি [সাহু] সিজদা করলেন। তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। –[তিরমিযী] তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ فِى التَّشَهُّدِ وَ السَّلَامِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহহুদ ও সালাম ফিরানো সম্পর্কে ইমামদের মতামত : সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহ্হুদ পড়া ও সালাম ফিরানোর বিধান সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহ্হুদ নেই : ইবনে সীরীন ও ইবনে আবী লায়লা প্রমুখ ইমামের মতে সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহ্হুদ পড়া যাবে না। তাঁদের মতে সিজদায়ে সাহুর পর কোনো বিলম্ব না করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হবে।

সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহহুদ ও সালাম কিছুই নেই : হযরত আনাস (রা.) আতা, তাউস, হাসান বসরী প্রমুখের মতে সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহ্হুদ ও সালাম কিছুই নেই। তাঁরা বলেন, সিজদায়ে সাহুর সাথে সাথেই নামাজ শেষ হয়ে যায়।

সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহহুদ ও সালাম উভয়ই প্রয়োজন : অধিকাংশ হাদীসবিশারদ ও ফিকহবিদের মতে সিজদায়ে সাহুর পরে তাশাহ্হুদও পড়তে হবে এবং সালামও ফিরাতে হবে। আলোচ্য হাদীসটিকেই তাঁরা দলিল হিসেবে পেশ করেন।

وَعَنْ ٩٥٤ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৯৫৪. অনুবাদ : হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন ইমাম দু' রাকাত পড়েই [না বসে] দাঁড়িয়ে যায় আর যদি সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বেই স্মরণ করে, তবে সে যেন বসে পড়ে। আর যদি সোজা হয়ে যায় তবে যেন না বসে। আর যেন [এই ভুলের জন্য] দু'টি [সাহু] সিজদা করে। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের প্রথম বৈঠক ওয়াজিব এবং শেষ বৈঠক ফরজ। কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সিজদা করতে হয়। তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে– দ্বিতীয় রাকাতের পর না বসে উঠে যেতে লাগলে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে অর্থাৎ জমিন হতে উঠার অবস্থাটি নিকটবর্তী হলে স্মরণে আসার সাথে সাথে বসে যাবে এবং পরে সাহু সিজদা করবে। কিন্তু যদি অবস্থাটি দাঁড়ানোর কাছাকাছি হয় কিংবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, এরপর স্মরণ হলে বসবে না, বসলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ নামাজে 'কিয়াম' ফরজ। আর প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। সুতরাং ওয়াজিব রক্ষা করার জন্য কোনো ফরজকে ত্যাগ করা জায়েজ নেই। তাই মহানবী ﷺ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আর বৈঠকের দিকে ফিরে আসেননি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٥٥ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِىْ ثَلٰثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهٗ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ لَهٗ صَنِيْعَهٗ فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ اَصَدَقَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৫৫. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাজ পড়ালেন এবং তিন রাকাত পড়েই সালাম ফিরালেন। অতঃপর [মসজিদ সংলগ্ন] নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গেল যার নাম ছিল খিরবাক। তাঁর হাত দু'টি ছিল কিছুটা লম্বা। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ বলে সে রাসূল ﷺ-কে নামাজের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিল। এটা শুনে রাসূল ﷺ [দুঃখে] রাগান্বিত হয়ে আপন চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং লোকজনের কাছে পৌছলেন এবং বললেন, এ ব্যক্তি কি সত্য বলছে? সাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ। তখন রাসূল ﷺ [অবশিষ্ট] এক রাকাত পড়লেন; তারপর সালাম ফিরালেন এবং দু'টি [সাহু] সিজদা করলেন এবং সর্বশেষ সালাম ফিরালেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذُو الْيَدَيْنِ **কে? :** 'যুল-ইয়াদাইন' হিজাযের বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি। তার প্রকৃত নাম উমাইর বা খিরবাক। কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ। তবে তিনি 'যুল-ইয়াদাইন' নামে পরিচিত। তার হস্তদ্বয় স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা

কিছুটা লম্বা ছিল অথবা দানশীলতায় তার হস্তদ্বয় প্রশস্ত ছিল, অথবা হস্তশিল্প তার পেশা ছিল, ইত্যাদি কারণে তাকে যুল-ইয়াদাইন বলা হতো।

كَيْفَ صَحَّتِ الصَّلٰوةُ بَعْدَ التَّكَلُّمِ **কথা বলার পরও কিভাবে নামাজ বিশুদ্ধ হলো :** আলোচ্য হাদীস ও উপরের একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ কথা বলার পর সাহু সিজদা করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, এখানে নবী করীম ﷺ ভুলে কথা বলেছিলেন। সুতরাং তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর ন্যায় কথা বলার পর সাহু সিজদা করা যেতে পারে।

মালেকী ফিকহবিদগণ বলেন যে, রাসূল ﷺ যেহেতু নামাজ সংশোধন সম্পর্কীয় কথাবার্তাই বলেছেন, সেহেতু তাঁদের মতে এরূপ অর্থাৎ নামাজ সংশোধন সম্পর্কীয় কথা বলার পর সিজদা দেওয়া জায়েজ আছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতে এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা। কেননা সাহাবী খিরবাক যুল-ইয়াদাইন ইসলামের প্রথম যুগে দ্বিতীয় হিজরিতে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। সুতরাং এটা দ্বিতীয় হিজরির পূর্বেকার ঘটনা। ইসলামের প্রথম যুগে নামাজে কথা বলা জায়েজ ছিল, পরে নিষিদ্ধ হয়েছে।

---

٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً يَشُكُّ فِى النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتّٰى يَشُكَّ فِى الزِّيَادَةِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৯৫৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ল আর তার এই সন্দেহ হলো যে, সে নামাজ কম পড়েছে, তবে সে যেন আরও কিছু [অর্থাৎ এক রাকাত] পড়ে নেয়, যাতে সন্দেহ হয় যে, সে এক রাকাত বেশি পড়ল। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِىْ تِعْدَادِ الرَّكْعَةِ **রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তির বিধান :** যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ তিন রাকাত পূর্ণ হয়েছে, না চার রাকাত– এ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, তবে তার বিধান কি? এ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

আওযায়ী, শা'বী প্রমুখ ইমামের মতে সর্বাবস্থায় তার নামাজ পুনঃ পড়তে হবে। হ্যাঁ, যদি রাকাতের কোনো সংখ্যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়, তবে নিশ্চিতের উপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামাজ সমাপ্ত করবে।

হাসান বসরী (র.)-এর মতে রাকাতের কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করা হোক বা বেশি সংখ্যার উপর ভিত্তি করা হোক ; উভয় অবস্থায়ই সাহু সিজদা করতে হবে।

ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের মতে কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করা ওয়াজিব।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ ঘটনা যদি নামাজি ব্যক্তির জীবনে প্রথমবারের মতো হয়, তবে সে প্রথম হতে পুনরায় নামাজ পড়বে; কিন্তু যদি এরূপ সন্দেহ তাঁর বারবার সৃষ্টি হয় তবে সে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে নামাজ আদায় করবে। অর্থাৎ তিন রাকাত পড়েছে বলে প্রবল ধারণা হলে তিন রাকাতকে ভিত্তি করে আর এক রাকাত পড়ে নেবে এবং সাহু সিজদা করবে।

بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

পরিচ্ছেদ : কুরআনের সিজদা

سُجُوْدٌ শব্দটি বাবে نَصَرَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- اَلْاِنْحِنَاءُ বা ঝুঁকে যাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হলো- وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْاَرْضِ بِنِيَّةِ الْعِبَادَةِ مَعَ الطَّهَارَةِ অর্থাৎ পবিত্রতা সহকারে ইবাদতের নিয়তে চেহারা মাটিতে রাখা। এখানে سُجُوْدُ الْقُرْاٰنِ দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াত বুঝানো হয়েছে।

তিলাওয়াতে সিজদার সংখ্যা : তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ- مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِىِّ : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সিজদার আয়াত ১৪টি। ইমাম আহমদ, ইসহাক, লায়স, ইবনে ওহাব, ইবনুল মুনযির প্রমুখের মতে সিজদার আয়াত ১৫টি। ইমাম মালেক, হাসান বসরী, ইবনে মুসায়্যিব, ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস প্রমুখের মতে সিজদার আয়াত ১১টি।

তিলাওয়াতের সিজদার বিধান : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক,আওযায়ী ও দাউদ যাহেরী প্রমুখের মতে তিলাওয়াতের সিজদা সুন্নত। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় আছে যে, নামাজের মধ্যে ওয়াজিব, নামাজের বাহিরে ওয়াজিব নয়।

তিলাওয়াতের সিজদার পদ্ধতি : এ সিজদা তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই করতে হয়। এটা আদায় করার নিয়ম হলো, নামাজের সিজদার ন্যায় পবিত্রতার সাথে দু' তাকবীরের মাঝখানে একটি সিজদা করা। আলোচ্য অধ্যায়ে তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٩٥٧ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৯৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরা আন নাজমে সিজদা করেছেন এবং তার সাথে মুসলমান, মুশরিক, জিন এবং মানব সকলে সিজদা করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَ سَجَدَ الْمُشْرِكُوْنَ **মুশরিকগণ কেন সিজদা করেছিল :** মুসলমানগণ নবী করীম ﷺ-এর অনুসরণে সিজদা করেছিলেন। কাফের মুশরিকগণ কেন সিজদা করেছিল এ বিষয়ে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কারো মতে উক্ত আয়াতে লাত, মানাত, উয্যা প্রভৃতি দেবতার নাম উল্লেখ ছিল এজন্য ঐ নাম শুনে তারা দেবতাদের সম্মানে সিজদা করেছিল।

শায়খ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, ঐ আয়াত তিলাওয়াতের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতী নূরে প্রকাশিত হয়েছিলেন যে, তার সম্মোহনী শক্তিতে সকলেই এমন অভিভূত হয়েছিল যে, ভক্তি গদগদ চিত্তে সিজদা করা ছাড়া অন্য কোনো পথ ছিল না। তখন বৃক্ষরাজিও সিজদা করেছিল। এ সময় মুশরিকগণ আয়াতের সম্মোহনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে অভিভূত অবস্থায় সিজদা করেছিল। তবে বদবখত উমাইয়্যা ইবনে খালফ একমুষ্টি কংকর নিয়ে নিজ কপালে লাগিয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, এখানে একটি কথা বহুল প্রচলিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরায়ে 'নাজমের' এ আয়াতটি اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى তেলাওয়াত করলেন, তখন কে বা কারা আল্লাহর নবীর স্বরের সাথে স্বর মিলিয়ে বলে উঠল تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى অর্থ- এটা সবই উচ্চ মর্যাদাশালী দেবতা; অবশ্যই তাদের সুপারিশের আশা করা যায়। [নাউযু বিল্লাহ] এ কথাটি যে সম্পূর্ণ বাতুলতা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না; বরং যদি কেউ এরূপ আকিদা পোষণ করে তা হবে প্রকাশ্য কুফরি। আবার কারো মতে দ্বিতীয় ছন্দটি ভুলবশত মহানবী ﷺ-এর মুখ হতে প্রকাশ হয়ে গেছে। এ

কথাটিও কোনো মুসলমানের আকিদা রাখাটা জায়েজ নেই। বরং এটা কোনো বেঈমান-নাস্তিক যিন্দীকের মনগড়া রূপ কাহিনী মাত্র।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِيْ وُجُوْبِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَعَدَمِهِ তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব না সুন্নত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, দাউদে জাহেরীসহ প্রমুখ ইমামদের মতে তিলাওয়াতে সিজদা সুন্নত। তাঁরা নিম্নোক্ত দলিলসমূহ উপস্থাপন করেন।

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا . (تِرْمِذِيّ)

(٢) وَاقِعَةُ عُمَرَ اَنَّهُ قَرَأَ سَجْدَةً عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ اِنَّهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا اِلَّا اَنْ نَشَاءَ فَلَمْ يَسْجُدْ وَلَمْ يَسْجُدُوْا . (تِرْمِذِيّ)

مَذْهَبُ اَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ আমাদের তিন ইমামের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (র.) বলেন, এটা ওয়াজিব। ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় আছে সিজদার আয়াত নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করলে তখন সিজদা করা ওয়াজিব। কিন্তু নামাজের বাইরে তেলাওয়াতে ওয়াজিব হয় না।

হানাফীদের দলিল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন, যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত পাঠ করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় আর বলে, বনী আদমকে সিজদা করতে আদেশ করা হলো তখন সে সিজদা করল, আর তার জন্য নির্ধারিত হলো জান্নাত। অথচ আমাকে সিজদা করতে আদেশ করা হলো, আমি সিজদা করলাম না, ফলে আমার জন্য নির্ধারিত হলো জাহান্নাম। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বনী আদম সিজদা করার জন্য আদেশপ্রাপ্ত। আর আদেশ সাধারণত ওয়াজিবই হয়। এটা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা সিজদা পরিত্যাগকারী এক সম্প্রদায়কে ধিক্কার ও তিরস্কার করে বলেছেন, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ এবং এ বাক্যের সংলগ্ন পূর্বে বলা হয়েছে وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ পরপর দু'টি বাক্যকে একত্রে বর্ণনা করার এ কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, সিজদা পরিত্যাগকারী মু'মিন নয়। এতদ্ভিন্ন সিজদা মূলত নামাজেরই একটি বিশেষ অংশ, যা বান্দার উপরে সহজতরভাবে অর্পিত করা হয়েছে। এটা ছাড়াও فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا – وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ইত্যাদি আয়াতে اَمْر -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আর اَمْر -এর সরাসরি অর্থ হলো, নির্দেশ, যা ওয়াজিব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে ওয়াজিব হতে বাধা নেই, তাই আল্লামা ইবনে কায়্যেম বলেছেন, এ সম্পর্কে হানাফীদের দলিল অধিকতর মজবুত।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : তাদের দলিলের জবাব হলো– (১) প্রথম হাদীসটিতে উল্লিখিত فَلَمْ يَسْجُدْ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। আর আমাদের মতে তখনই সিজদা করা ওয়াজিব নয়। সম্ভবত রাসূল ﷺ পরবর্তীতে সিজদা আদায় করেছেন। অথবা রাসূল ﷺ তখন অজুবিহীন অবস্থায় ছিলেন, পরে সিজদা আদায় করেছেন।

উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিলাওয়াতের সিজদা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়। আর এ কারণেই হযরত ওমর (রা.) তখন সিজদা দেননি। অথবা لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا -এর মর্মার্থ হলো–

لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا بِهَيْئَةِ الْجَمَاعَةِ

---

৯৫৮ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ সাথে সূরা 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' এবং সূরা 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা'-তে সিজদা করেছি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উল্লিখিত দু' সূরার সিজদা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই।

وَعَنْ ٩٥٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদার আয়াত পাঠ করতেন, আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, যখন তিনি সিজদা করতেন আমরাও তাঁর সাথে সাথে সিজদা করতাম। তখন এমন ভিড় পড়ত যে আমাদের কেউ কেউ সিজদায় কপাল রাখার মতো স্থান পেত না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিলাওয়াতের সিজদাসহ আদায় করা ওয়াজিব।

وَعَنْ ٩٦٠ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৬০. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সূরা 'আন নাজম' পাঠ করলাম। কিন্তু তিনি তাতে সিজদা করলেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَ لَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ **নবী করীম ﷺ কেন সিজদা করলেন না :** সিজদার আয়াত শ্রবণ করা সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ কেন সিজদা করলেন না। ইমামগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত পেশ করেন, যা নিম্নরূপ—

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সিজদা পরিহার করাও যে বৈধ তা বর্ণনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব নয়। উক্ত হাদীস-ই তার প্রমাণ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অজুবিহীন অবস্থায় ছিলেন এ জন্য তখন সিজদা করেননি। পরে সিজদা আদায় করেছেন।

অথবা তখন ছিল নিষিদ্ধ সময় তাই তিনি সিজদা করেননি। কেননা নিষিদ্ধ সময় সিজদা করা বৈধ নয়।

অথবা যাতে লোক একে ফরজ মনে না করে সেজন্য কখনও সিজদা করতেন, আবার কখনও পরিত্যাগ করতেন।

অথবা তিলাওয়াতের সিজদা তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরেও আদায় করা যায়– তা প্রমাণ করার জন্য মহানবী ﷺ তখন সিজদা করেননি।

মোটকথা, হানাফীদের মতে হাদীসটি দ্বারা কোনো মতেই প্রমাণিত হয় না যে তিলাওয়াতের সিজদা সুন্নত ; বরং তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব।

وَعَنْ ٩٦١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَجْدَةُ صٓ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ مُجَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَاَسْجُدُ فِيْ صٓ فَقَرَأَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوٗدَ

৯৬১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'সাদ'-এর সিজদা গুরুত্বপূর্ণ সিজদাসমূহের অন্তর্গত নয়, তবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সূরায় সিজদা করতে দেখেছি। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আমি [আমার ওস্তাদ] ইবনে আব্বাসকে বললাম, আমি কি সূরা 'সাদ'-এ সিজদা করব? তখন তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, অর্থাৎ তার

وَسُلَيْمَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

[ইব্রাহীমের] বংশধরগণের মধ্য হতে দাউদ ও ইব্রাহীম রয়েছেন। সুতরাং তাদের আদর্শের অনুসরণ কর। তারপর বললেন, তোমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁদেরই একজন– এ আয়াতে যাদের আদর্শের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِى سَجْدَةِ سُوْرَةِ صٓ **সূরা 'সাদ' এর সিজদা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** সূরায়ে صٓ সিজদা সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এখানে কোনো সিজদা নেই। তবে সূরায়ে হজের উভয় সিজদাই স্বীকৃত। সূরা 'সোয়াদ' সম্পর্কে তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ অর্থ– "অতঃপর তিনি তাঁর [ভুলের জন্য] নিজের প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন ও তাঁর অভিমুখী হলেন।" এটা একটি সংবাদ মাত্র সরাসরি নির্দেশ নয়। অতএব তিনি একে সিজদার মধ্যে গণ্য করেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এটাও ওয়াজিব। তাঁর দলিল, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী ﷺ 'সোয়াদের' মধ্যে সিজদা করেছেন। মুজাহিদ (র.) বলেন, ইবনে আব্বাসকে সোয়াদের সিজদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বলেছেন أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَبِهٰذَا نَأْخُذُ যখন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সুতরাং আমাদেরও হুজুরের অনুকরণে সিজদা করা উচিত। প্রশ্নকারীর জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ কথাটিই বলেছেন, তাঁর অনুসরণে তোমারও সিজদা করা বাঞ্ছনীয়।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে হানাফীগণ বলেন, কুরআনের মধ্যে এমন বহু আয়াত আছে যেখানে 'মাগফিরাতের' কথা উল্লেখ আছে, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ (الاية) অথচ এখানে সিজদার কোনো কথা উল্লেখ নেই এবং হুজুর ﷺ ও এতে সিজদা করেননি। অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, এখানে [সোয়াদের] সিজদা আল্লাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে নয় বরং 'তেলাওয়াতের' দরুন ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথা لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ এটা তার নিজস্ব উক্তি বা অভিমত। মহানবী ﷺ-এর মুখনিঃসৃত বাণী নয়। এসব কারণে সোয়াদের সিজদা ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٩٦٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ اَقْرَأَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسَ عَشَرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلٰثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৯৬২. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুরআন শরীফের পনেরোটি সিজদা পড়ালেন। তন্মধ্যে তিনটি সিজদা 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহের মধ্যে এবং দু'টি সিজদা সূরা হজের মধ্যে।–[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِىْ تِعْدَادِ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ **তিলাওয়াতের সিজদার সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :**

مَذْهَبُ الْإِمَامِ اَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আহমদ, ইসহাক, লায়স, ইবনে ওহাব ও ইবনুল মুনযিরের মতে কুরআনের মধ্যে ১৫টি সিজদার আয়াত রয়েছে। যথা– (১) সূরা আ'রাফে, (২) রা'দে, (৩) নাহলে, (৪) বনী ইসরাঈলে,

(৫) মারয়ামে, (৬ + ৭) হাজ্জে দু'টি, (৮) ফুরকানে, (৯) নামলে, (১০) আলিফ-লাম-মীম তানযীলে, (১১) সাদে, (১২) হামীম আস সিজদাতে, (১৩) আন-নজমে, (১৪) ইনশিকাকে ও (১৫) ইকরাতে। তাঁদের মতে সূরা হাজ্জে দুই সেজ্দা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক সিজদা। তাঁরা নিজেদের মতের পক্ষে নিম্নোক্ত দলিল উপস্থাপন করেন–

(١) قَوْلُهُ تَعَالٰى فِىْ اٰخِرِ الْحَجِّ : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا .

(٢) رَوٰى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ (ع) نَعَمْ . (اَبُوْ دَاوُدَ . تِرْمِذِيُّ)

مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম মালেক, হাসান বসরী, ইবনুল মুসায়্যিব, ইবনুল জুবায়ের, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস প্রমুখের মতে কুরআনের মধ্যে ১১টি সিজদার আয়াত আছে। তারা সূরা আন-নাজম, ইনশিকাক ও ইকরার আয়াতসমূহকে এবং সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদার আয়াতটিকে সিজদার আয়াত হিসেবে গণ্য করেন না। সুতরাং তাঁদের মতে সিজদার আয়াতের সংখ্যা ১৫ – (১ + ১ + ১ + ১) = ১১টি। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস দলিল পেশ করেন–

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِىْ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ . (اَبُوْ دَاوُدَ)

উল্লেখ্য যে, সূরা اَلنَّجْمُ . اِنْشِقَاقٌ ও اِقْرَأْ-কে মুফাসসাল বলা হয়।

(٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا . (اَبُوْ دَاوُدَ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ : ইমাম আযম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরআনের মধ্যে সিজদার আয়াত সংখ্যা ১৪টি। অবশ্য তাঁদের মধ্যে ১৪টি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী হজের উভয় সিজদার আয়াতকেই সিজদার আয়াতরূপে গণ্য করেন। তবে তাঁর মতে সূরা 'সাদ'-এর মধ্যে সিজদা নেই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, 'সাদ'-এর মধ্যে সিজদা আছে। অপর পক্ষে তিনি সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদার আয়াতটিকে সিজদার আয়াতরূপে গণ্য করেন না।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ :

اَلْجَوَابُ عَنْ مَذْهَبِ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ : আহমদ ও ইসহাক প্রমুখ ইমামগণ সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদা প্রমাণ করার জন্য প্রথম যে দলিলটি তথা আয়াতটি আনয়ন করেছেন এর উত্তর তাফসীরে রূহুল মাআনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা হজের দ্বিতীয় সিজদাটি নামাজের সিজদা, তিলাওয়াতের সিজদা নয়। কেননা এখানে সিজদা করার নির্দেশটি রুকুর নির্দেশের সাথে সংযুক্ত। আর এ ব্যাপারে আলিমগণ একমত যে, রুকুর সাথে সিজদার নির্দেশ থাকলে সেখানে উক্ত সিজদা দ্বারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী– يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ এখানে সিজদা দ্বারা নামাজের সিজদা উদ্দেশ্য।

তাঁরা যে দ্বিতীয় দলিলটি পেশ করেছেন তার উত্তরে ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন– لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ আর তাঁদের উপস্থাপিত তৃতীয় দলিলের তথা হাদীসটির উত্তরে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন যে, হাদীসটি দুর্বল।

ইমাম মালেক (র.)-এর পেশকৃত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন– هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ তা ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ অথবা উত্তর এই যে, ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ সম্পর্কে জানা ছিল না, তিনি তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী বলেছেন।

তাঁদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় হাদীসের জবাব এই যে, রাসূল ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে সিজদা করেননি। পরে সিজদা করেছেন। যেমন বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে– اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ তদুপরি হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

اَلْعَزَائِمُ اَرْبَعٌ الٓمٓ تَنْزِيْل . حٰمٓ السَّجْدَةُ . اَلنَّجْمُ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .

وَعَنْ ٩٦٣ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِاَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَفِي الْمَصَابِيْحِ فَلَا يَقْرَأْهَا كَمَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৯৬৩. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরায়ে হজের মর্যাদা বেশি দেওয়া হয়েছে, কারণ তাতে দু'টি সিজদার আয়াত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যে ব্যক্তি ঐ দু' সিজদা না করে সে যেন ঐ দু' আয়াতই না পড়ে। -[আবূ দাউদ ও তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র শক্তিশালী নয়। মাসাবীহ গ্রন্থেও শরহে সুন্নাহর অনুরূপ 'ফালা ইয়াক্‌রাহা' অর্থাৎ "অতএব সে যেন তা না পড়ে" কথাটি রয়েছে।

وَعَنْ ٩٦٤ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَوْا اَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৯৬৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন নবী করীম ﷺ জোহরের নামাজে একটি সিজদা করলেন এবং দাঁড়ালেন, অতঃপর [নিয়মিত] রুকু করলেন- এতে সাহাবীগণ মনে করলেন যে, রাসূল ﷺ সূরা 'তানযীলুস সিজদা' পাঠ করেছেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যাচ্ছে যে, কেরাত জেহরী পড়া হোক কিংবা নীরবে পড়া হোক, তেলাওয়াতের মধ্যে সিজদার আয়াত আসলে তা পাঠের পর সিজদা করতে হবে। যেমন- রমজানের তারাবীহের 'জেহরী' কেরাতে আমরা হাফেজ ইমামের পিছনে সিজদা করে থাকি। আর এখানে সাহাবীগণ 'ইখফা' নামাজে হুজুরের পিছনে সিজদা করেছেন।

وَعَنْهُ ٩٦٥ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৯৬৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াত অতিক্রম করতেন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং সিজদা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইবনুল মালিক (র.) বলেন, সিজদার জন্য তাকবীর বা 'আল্লাহু আকবার' বলা আবশ্যক। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও অভিমত এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে অপর একটি রেওয়াত আছে যে, সিজদায় যাওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে না, বরং আয়াতটি পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আবার কেউ উল্লেখ করেছেন যে, সিজদার শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে সিজদার শেষে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বলতে হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফের মতে বলতে হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দুই হাত উত্তোলন করে ইহরামের জন্য তাকবীর বলতে হবে, অতঃপর সিজদার জন্য তাকবীর বলতে হবে। সিজদা দাঁড়িয়ে করা মোস্তাহাব। হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপই বর্ণিত আছে। তবে কারো মতে সিজদা দাঁড়িয়ে করা মোস্তাহাব নয়। -[মিরকাত]

وَعَنْهُ ٩٦٦ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ حَتّٰى أَنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهٖ - (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

৯৬৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের বছর একটি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেন তখন সমস্ত লোক সিজদা করল। তাদের মধ্যে কেউ সওয়ারীর উপরই সিজদা করল, আর কেউ জামিনের উপর সিজদা করল এমনকি কোনো কোনো সওয়ার ব্যক্তি আপন হাতের উপর সিজদা করল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস হতে প্রথমত এটা বুঝা যায় যে, সিজদায়ে তিলাওয়াত অবশ্যই আদায় করতে হয়, নতুবা লোকেরা যে কোনো অবস্থায় সিজদা করতে বাধ্য হতো না।

দ্বিতীয়ত, 'হাতের উপরে সিজদা করেছেন' এ কথা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সিজদায়ে তেলাওয়াতের জন্য সওয়ারি হতে জমিনে অবতরণ করা আবশ্যক নয়। সওয়ারির পিঠের গদীর উপর হাত রেখে সেই হাতের উপর ঘাঁড়কে একটু ঝুঁকালে সিজদা আদায় হয়ে যাবে। এটা হানাফীদের অভিমত। শাফেয়ীগণ বলেন, হাতের উপর বা সওয়ারির উপর থেকে সিজদা করা জায়েজ নেই, অবশ্যই জমিনে অবতরণ করতে হবে।

وَعَنْ ٩٦٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৯৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমনের পর 'মুফাস্সাল' সূরাসমূহের কোনো সূরায়ই সিজদা করেননি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

دَفْعُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ **দু'টি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান :** পূর্বে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, আমরা মহানবী ﷺ-এর সাথে 'মুফাস্সালের' অমুক অমুক সূরায় সিজদা করেছি। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস এর বিপরীত। হাদীসবিশারদগণ এর জবাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসটিকে বিভিন্ন কারণে অধিক বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। (১) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের সাত বৎসর পর মদীনায় আগমন করে উক্ত সপ্তম হিজরিতেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর তিনিই বলেন, আমরা হুযূরের সাথে মুফাসসালের অমুক অমুক সূরায় সিজদা করেছি। (২) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ছাড়াও বহু সংখ্যক সাহাবী বলেন, মুফাসসালে' সিজদা আছে। (৩) উসূল বা সূত্রের কথা ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচকের মধ্যে বিরোধ হলে ইতিবাচককে গ্রহণ করাই উত্তম।

جَوَابًا لَهُ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্ত হাদীস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার। শায়খ আব্দুল হক দেহলবী (র.) তাঁর 'আহকাম' গ্রন্থে বলেছেন, এ হাদীসটির সনদ সুদৃঢ় নয়। অধ্যায়ের প্রথম হাদীসেই ইবনে আব্বাস (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ সূরায়ে 'আন নাজম' তেলাওয়াত করে সিজদা করেছেন, অথচ এটা মুফাসসালের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পরিশেষে এ কথাই বলা যায় যে, মহানবী ﷺ 'মুফাস্সালে' সিজদা করেছেন এটাই সঠিক। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অবগত ছিলেন না; বরং নিজের অবগতিটাই বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনার পর হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

وَعَنْ ٩٦٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৯৬৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তিলাওয়াতে সিজদায় এ দোয়া পাঠ করতেন, যার অর্থ : "আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার জন্য সিজদা করল, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে।" –[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : হযরত আয়েশা (রা.) রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দোয়া পড়তে শুনেছেন বলে তিনি রাতের বেলার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দিনেও এরূপ দোয়া পড়া যেতে পারে। আর সিজদার নিয়মিত দোয়া 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়তেও চলে।

وَعَنْ ٩٦٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُنِي اللَّيْلَةَ وَاَنَا نَائِمٌ كَاَنِّيْ اُصَلِّيْ خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِيْ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اُكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَرَاَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَ تَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৯৬৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ রাতে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় নিজেকে [স্বপ্নে] দেখলাম, যেন আমি একটি বৃক্ষের পিছনে নামাজ পড়ছি। তখন আমি তেলাওয়াতের সিজদা করলাম। বৃক্ষটিও আমার সাথে সিজদা করল। তখন আমি বৃক্ষটিকে বলতে শুনলাম যার অর্থাৎ "হে আল্লাহ! এই সিজদার বিনিময়ে তুমি আমার জন্য ছওয়াব লিখে রাখ এবং এর কারণে আমার পাপসমূহ দূর করে দাও, একে আমার জন্য তোমার দরবারে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখ এবং তা আমার পক্ষ হতে গ্রহণ কর, যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ হতে গ্রহণ করেছ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর এটা শুনে নবী করীম ﷺ এক সিজদার আয়াত পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। তখন আমি শুনলাম যে, তিনি এভাবে দোয়া পাঠ করছেন, যেভাবে ঐ লোকটি বৃক্ষের ঘটনা বর্ণনা করেছিল। অর্থাৎ তিনিও সেই একই দোয়া পাঠ করলেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। কিন্তু তিরমিযী وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ, এ বাক্যটি বর্ণনা করেননি। তিরমিযী আরও বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِىْ رَاٰى فِى الْمَنَامِ سُجُوْدَ الشَّجَرَةِ وَمَا هِىَ الْوَاقِعَةُ **গাছের সিজদা দেওয়া স্বপ্নে কে দেখেছিল আর সে ঘটনাটি কি?** অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যিনি স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)। **ইবনে মালিক বলেছেন,** হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যেভাবে বৃক্ষ কথা বলেছিল, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা এ বৃক্ষটিকেও বাকশক্তি দান করেছিলেন। আল্লামা শায়খ জাযরী বলেন, উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা সহজে মেনে নেওয়া যায় না যে, তা কোনো ফেরেশতা ছিলেন– যা বৃক্ষের আকৃতিতে কথা বলেছে। কেননা মানুষ স্বপ্নে যা কিছু দেখে তা একটি ধারণা প্রসূত ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং এটা তাবিল বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। কাজেই তা বৃক্ষই ছিল।

আর সূরায়ে ص 'সোয়াদ'-এর সিজদার আয়াতটি হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গেই কুরআনে এসেছে। সুতরাং এজন্যই দোয়াতেও হযরত দাউদের উল্লেখ হয়েছে। পক্ষান্তরে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সূরা সোয়াদের সিজদাটি তিলাওয়াতের সিজদা।

بَيَانُ الْوَاقِعَةِ مَعَ دَاوُدَ (ع) **হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার বর্ণনা :** বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.) তাঁর নিজের জন্য একটি সময়সূচি নির্ধারণ করেছিলেন। আর সে সময়সূচি হিসেবেই তিনি স্বীয় কার্যাদি সমাধা করতেন। যেমন– সপ্তাহে একদিন তিনি দরবারে বসতেন আবার একদিন পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকতেন। আর একদিন আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হতেন। আর ঐ সময় তাঁর সাথে কারো সাক্ষাতের অনুমতি ছিল না। এ অভ্যাস অনুসারে তিনি একদিন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল ছিলেন, এমতাবস্থায় কয়েকজন লোক প্রাচীর টপকিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তখন তিনি এই আকস্মিক ঘটনার দরুন ঘাবড়ে যান, তিনি ভাবলেন– এত উঁচু দেয়াল কেমন করে তারা ডিঙ্গাতে সক্ষম হলো? আর কি তাদের উদ্দেশ্য? ফলে হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে নিমগ্নতা আর অবশিষ্ট ছিল না; বরং তিনি ইবাদত ছেড়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

হযরত দাউদ (আ.)-কে এমন বিচলিত অবস্থায় দেখে লোকেরা এ বলে সান্ত্বনা দিল যে, আমরা মূলত একটি বিবাদের মীমাংসা করতে এসেছি। সুতরাং আপনার ভয়ের কোনোই কারণ নেই ; বরং আমাদের বিবাদটি কোনো রকম কালক্ষেপণ না করে সুবিচারের মাধ্যমে মীমাংসা করে দিন। মোটকথা, ইনসাফ বা সুবিচার কাকে বলে তা অবগত হওয়ার জন্যই আজকে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। তাদের কথাবার্তার এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে হযরত দাউদ (আ.) আশ্চর্যান্বিত হলেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَهَلْ اَتَاكَ نَبَؤُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ـ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ الخ ـ (ص ـ ٢٢ ـ ٢١)

অতঃপর তারা বলল–

اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَ عَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ـ (ص ـ ٢٣)

অর্থাৎ "এ ব্যক্তি আমার ভাই। তার ৯৯টি ভেড়ী রয়েছে, আর আমার রয়েছে মাত্র একটি। সে আমার এই একটিও তাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছে এবং বাধ্য করছে। অথচ সে সম্পদ, বাকপটুতা তথা সার্বিক ক্ষেত্রে আমার অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ। আবার মানুষও তার সাথে হাত মিলায়। তাই সে সর্বদাই আমার উপর অত্যাচার করে থাকে।" তখন হযরত দাউদ (আ.) বললেন– (ص ـ ٢٤) لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ অর্থাৎ "তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বার সাথে মিলানোর আবেদন করে সে তোমার উপর অবিচার করেছে।"

এরপর হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারলেন যে, এটা তার বিরাট একটি পরীক্ষা মাত্র এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সতর্কবাণী স্বরূপ। আর এ খেয়াল আসা মাত্র হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দরবারে ক্ষমার জন্য ঝুঁকে পড়েন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুল এটাই ছিল যে, তিনি ইবাদতের জন্য একটি দিন নিজের পক্ষ হতে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, যে দিনটিতে তিনি শুধুমাত্র ইবাদতই করবেন, অন্য কোনো কাজ করবেন না, এ জন্য নবী হিসেবে তাঁর মধ্যে গর্ব ছিল। আর এ গর্বটিই তাঁর ভুল হয়েছিল। এমনকি ঘরের সবার জন্য ২৪ ঘণ্টা ভাগ করে কোন কোন ঘণ্টায় ইবাদত করবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আর এ সুন্দর নিয়মতান্ত্রিকতার দরুন স্বাভাবিকভাবেই তিনি কিছুটা গর্ববোধ করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, হে দাউদ! কোথায় সুন্দর ব্যবস্থাপনা, আর কোথায়ই বা তোমার ইবাদতের নিমগ্নতা, জানো সবইতো মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে। এতে বান্দার কোনোরূপ গর্ববোধ করার মতো কিছু আছে কি? সুতরাং তোমার ঐ কৃতকর্মের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো ও সিজদায় অবনত হও।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٩٧٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ وَالنَّجْمِ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ اَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهٖ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ زَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ وَهُوَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ) .

৯৭০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সূরা 'আন্ নাজম' পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদা করলেন এবং যারা তাঁর কাছে ছিল [মুসলমান ও অমুসলমান] সকলেই সিজদা করল। কিন্তু কুরাইশদের একবৃদ্ধ সিজদা করল না। সে একমুষ্টি কংকর অথবা মাটি হাতে নিয়ে নিজ কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বলল, 'আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট'। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এ ঘটনার পর আমি তাকে [বদর প্রান্তরে] কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। –[বুখারী ও মুসলিম] বুখারী তাঁর বর্ণনায় আরও বর্ধিত করে বলেছেন, সে বৃদ্ধ লোকটি হলো উমাইয়্যা ইবনে খালফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ شَيْخِ قُرَيْشٍ **কুরাইশের বৃদ্ধ লোকটির পরিচয়** : হাদীসে উল্লিখিত কুরাইশ বৃদ্ধটির পরিচয় সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে– ইমাম বুখারী (র.) নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, উক্ত কাফের বৃদ্ধ লোকটি ছিল উমাইয়্যা ইবনে খালফ। কিন্তু হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) বলেছেন যে, তাঁর নামে মতভেদ রয়েছে– (১) কারো মতে সে হলো ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা। (২) অন্য এক দলের মতে সাঈদ ইবনুল আস। (৩) আরেক দলের মতে আবূ লাহাব।

٩٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ صٓ وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوٗدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

৯৭১ অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূরায়ে 'সোয়াদে' সিজদা করলেন এবং বললেন, হযরত দাউদ (আ.) এতে সিজদা করেছিলেন 'তওবা' স্বরূপ। আর আমরা সিজদা করছি তওবা কবুলের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। –[নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে হাজর (র.) বলেন, তওবা কবুলের শোকরিয়া অর্থ– আমাদের নবীর বা আমাদের নিজেদের তওবা কবুলের শোকরিয়া নয়, বরং হযরত দাউদ (আ.)-এর তওবা কবুল। কেননা 'নবীগণ সবই এক ব্যক্তি সাদৃশ্য'। একজনের উপর আল্লাহর নিয়ামত বর্ষিত হওয়া পক্ষান্তরে সকলেই সে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তাই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদা করছি। এ ব্যাখ্যা হতে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, সূরা সোয়াদের সিজদা ওয়াজিব।

بَابُ اَوْقَاتِ النَّهْيِ
পরিচ্ছেদ : নিষিদ্ধ সময়সমূহ

اَوْقَاتٌ শব্দটি إِسْم বহুবচন, একবচনে, وَقْتٌ শাব্দিক অর্থ হলো– সময় তথা দিন বা রাতের অংশ বিশেষ।

সাধারণত যে সব সময়ে নামাজ, তেলাওয়াতের সিজদা বৈধ নয় সে সময়কে اَوْقَاتُ النَّهْي বলা হয়, এ সব সময়ে নামাজ পড়া হারাম। সূর্য উদয়, অস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় কোনো নামাজই জায়েজ নেই।

আর হানাফীদের মতে ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়া মাকরূহ। এ সময়ে জানাযার নামাজ এবং তিলাওয়াতের সিজদাও বৈধ নয়। কিন্তু যদি তখন জানাজা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায় এবং কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় সিজদার আয়াত পাঠ করা হয়, তবে উক্ত মাকরূহ সময়েও জানাজা ও তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা জায়েজ আছে। এমনিভাবে সেই দিনকার আসরের নামাজ সূর্যাস্তের সময়ও আদায় করা জায়েজ আছে, তবে তা মাকরূহে তানযীহী হিসাবে পরিগণিত হবে। আলোচ্য অধ্যায়ে নিষিদ্ধ সময়সমূহের হাদীসগুলো সংকলন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৯৭২ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَتَحَرّٰى اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَبْرُزَ فَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلٰوةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلٰوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭২. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সূর্যোদয়ের সময় নামাজ পড়তে ইচ্ছা না করে, আর সূর্যাস্তের সময়ও নামাজ পড়তে ইচ্ছা না করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, সূর্যের গোলকটা যখন উদয় হতে থাকে, তখন নামাজ ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। আর যখন সূর্যের চাকতিটা অস্ত যেতে থাকে, তখন নামাজ ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তা পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর তোমরা তোমাদের নামাজকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত দেরি করো না। কেননা, তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্য দিয়ে উদিত হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ **-এর ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ কথাটি মূলত রূপকার্থবোধক একটি উপমামাত্র। কেননা শয়তানের প্রকৃতপক্ষে কোনো শিং নেই। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় শয়তান সূর্যকে পিছনে রেখে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় সূর্যরশ্মি তার মস্তকের উভয় পার্শ্ব দিয়ে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তখন সূর্য পূজারী কাফির-মুশরিকরা সেই দিকে মুখ করে পূজা-অর্চনা করে, আর শয়তান তাদের অভিবাদন গ্রহণ করতে থাকে। সুতরাং তাদের অনুকরণে সেই সময় কোনো সালাত বা সিজদা আদায় না করার জন্য মহানবী ﷺ স্বীয় উম্মতকে নিষেধ করেছেন।

কারো মতে শয়তানের প্রকৃতই দু'টি শিং রয়েছে, সে সূর্য উদয়ের সময়ে উদয়স্থলে গিয়ে দাঁড়ায় যাতে সূর্য তার দুই শিংয়ের মধ্যখানের উদিত হয়।

وَعَنْ ٩٧٣ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُّصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৭৩. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামাজ পড়তে এবং আমাদের মৃতকে দাফন করতে [অর্থাৎ জানাজা পড়তে] রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করতেন। যেমন– (১) যখন সূর্য কিরণময় হয়ে উদয় হতে থাকে, যতক্ষণ না তা কিছু উপরে উঠে যায়। (২) যখন দুপুরের ছায়া স্থির হয়ে দাঁড়ায় যতক্ষণ না এর ছায়া কিছুটা ঢলে পড়ে। (৩) যখন সূর্য অস্তমিত হতে থাকে, যতক্ষণ না তা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : 'ফাতহুল মুলহিম' গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে যে, দাউদ যাহেরীর মতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, ঠিক দ্বি-প্রহর, ফজরের পর এবং আসরের পর এই পাঁচ সময় সাধারণতঃ সকল ধরনের নামাজ পড়া বৈধ। তাঁর যুক্তি হলো, কেননা এ পাঁচ সময় নামাজ পড়ার বৈধতা সম্পর্কে একদল সাহাবীদের অভিমত বিদ্যমান রয়েছে; কিন্তু জমহুর ওলামা এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য এদের মাঝেও মতপার্থক্য রয়েছে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মত দলিলসহকারে প্রদত্ত হলো—

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন– যে নামাজের জন্য কোনো সবব বা কারণ নেই, সাধারণত উপরিউক্ত পাঁচ সময়– সে নামাজ পড়া বৈধ নয়। অবশ্য যে নামাজের কারণ রয়েছে, যেমন মানতের নামাজ এবং কাযা নামাজ তা আদায় করা এ সময়গুলোতে জায়েজ। তার দলিল হলো হযরত কুরাইব বর্ণিত হাদীস, যা তিনি হযরত উম্মে সালামা হতে বর্ণনা করেছেন।
عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) حَيْثُ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২. مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَاَحْمَدَ ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উক্ত নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামাজ পড়া হারাম. কিন্তু ফরজ নামাজ পড়া হারাম নয়। তাঁদের দলিল হলো– اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ نَسِىَ عَنْ صَلٰوةٍ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا
مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় কোনো ধরনেরই নামাজ পড়া বৈধ নয়। চাই তা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল, কাজা বা মানত যাই হোক না কেন। তিনি নিজ অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন।

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَا نَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ اَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَغْرِىْ اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّىْ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا الخ .(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلٰوتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَتَصِلُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

جَوَابًا لَهُمْ দাউদের জাহেরীর দলিলের জবাবে বলা যায় যে,

১. হয়ত সে সাহাবীগণ নিষিদ্ধ সময় নামাজ পড়ার ব্যাপারে রাসূলের নিষেধের কথা শুনেননি।

২. অথবা তাঁদের নিকট রাসূল ﷺ -এর নিষেধ পৌছানোর পূর্বেই তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সে অনুযায়ী নিজেরাও আমল করেছেন। –[ফাতহুল মুলহিম]

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত কুরাইব হতে বর্ণিত উম্মে সালমার যে হাদীসটি দলিল হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন এর প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, এটা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ছিল।
অথবা রাসূল ﷺ তা জীবনে একবারই করেছিলেন।

ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.)-এর দলিলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.) فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে, যখন মুবাহ এবং হারাম একত্রিত হবে তখন হারামকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। অতএব এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর নিষিদ্ধ হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. অথবা এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে নিষিদ্ধ হাদীসের তুলনায় দুর্বল বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. অথবা এর উত্তরে বলা যায় যে, فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا -এর অর্থ হলো যখন স্মরণ আসবে তখন নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য সময় নামাজ আদায় করবে।

وَعَنْ ٩٧٤ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজরের নামাজের পর আর কোনো নামাজ নেই যতক্ষণ না সূর্য কিছু উপরে উঠে যায় এবং আসরের নামাজের পরও কোনো নামাজ নেই যতক্ষণ না সূর্য সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ **আসর ও ফজরের পর নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ** : হানাফী মতাবলম্বী আলিমগণ বলেন, হযরত কায়েস (রা.)-এর হাদীস [৯৭৭ নং হাদীস] তাকরীরী বা সামর্থনমূলক হাদীস। হযরত আবূ সাঈদ (রা.)-এর কাওলী হাদীসের তুলনায় তা দুর্বল। এ ছাড়া আসরের পরে দু' রাকাত নফল পড়া নবী করীম ﷺ-এর বিশেষত্ব ছিল। কেননা ত্বাহাবী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন হযরত উম্মে সালমা (রা.) নবী করীম ﷺ-কে আসরের ও ফজরের পরে নামাজ পড়তে দেখেছেন, তখন প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও কি পড়ব? তখন রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন। মেশকাত শরীফে আছে, হযরত ওমর (রা.) আসরের পরে নফল নামাজ পাঠকারীদেরকে নিষেধ করতেন। অনেক সময় তরবিয়াতের জন্য প্রহার করতেন।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এক সময় ফরজ নামাজ জায়েজ আছে, তবে ওয়াজিব ও নফলসমূহ জায়েজ নেই। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে নফল জায়েজ নেই, মক্কায় হোক বা মক্কার বাইরে হোক; কারণ সম্বলিত হোক বা না হোক। তবে তাঁর মতে তওয়াফের দুই রাকাত, কাজা ও মানত নামাজ জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٩٧٥ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتّٰى تَرْتَفِعَ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا

৯৭৫. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, আমিও মদীনায় আসলাম এবং রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, [হে রাসূল ﷺ!] আমাকে নামাজের সময় সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি ফজরের নামাজ পড়বে অতঃপর সূর্য উদয় হতে থাকলে নামাজ হতে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না তা কিছুটা উপরে উঠে। কারণ সূর্য যখন উদয় হয়, তখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে উদয় হয়। ঐ সময় কাফেরগণ তাকে পূজা করে। অতঃপর [ইশ্‌রাক] নামাজ

الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَإِنَّ حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا اَقْبَلَ الْفَيْئُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتّٰى تُصَلِّى الْعَصْرُ ثُمَّ اَقْصِرْ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِيْنَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ قُلْتُ يَانَبِيَّ اللّٰهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِيْ عَنْهُ قَالَ مَامِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهٗ فَيَمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهٖ وَفِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهٖ ثُمَّ اِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهٖ مِنْ اَطْرَافِ لِحْيَتِهٖ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهٖ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَاْسَهٗ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهٖ مِنْ اَطْرَافِ شَعْرِهٖ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ اِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ اَنَامِلِهٖ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلّٰى فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهٗ بِالَّذِيْ هُوَ لَهٗ اَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهٗ لِلّٰهِ اِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْئَتِهٖ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

পড়বে। কেননা তখনকার নামাজে ফেরেশতাগণ হাজির হয়ে থাকেন এবং সাক্ষ্য হন– যতক্ষণ না বর্শার ছায়া সংক্ষিপ্ততম পর্যায়ে পৌছে [অর্থাৎ ঠিক দ্বিপ্রহর হয়] তখন নামাজ হতে বিরত থাকবে। কেননা ঐ সময় দোজখকে উত্তপ্ত করা হয়। অতপর বর্শার ছায়া যখন ঢলে পড়বে তখন নামাজ পড়বে, যতক্ষণ না আসর নামাজ পড়বে। কেননা তখন ফেরেশতা হাজির হয়ে থাকেন এবং সাক্ষ্য হন। অতঃপর নামাজ হতে বিরত থাকবে যতক্ষণ না সূর্য অস্তমিত হয়। কেননা সূর্য অস্তমিত হয় শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যে। তখন কাফেরগণ একে পূজা করে। রাবী হযরত আমর (রা.) বলেন, আমি পুনরায় বললাম, হে আল্লাহর নবী! এবার অজু প্রসঙ্গ, আমাকে অজুর ফজিলত সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের যে কেউই অজুর পানি সংগ্রহ করে কুলি করে, নাকে পানি দেয় এবং নাক ঝাড়ে নিশ্চয় তার মুখমণ্ডলের যাবতীয় গুনাহ, তার মুখ গহ্বর ও নাকের অভ্যন্তর ভাগের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে এমনভাবে নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করে যেরূপ ধোয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তার মুখমণ্ডলের যাবতীয় গুনাহ তার দাড়ির পার্শ্ব দিয়া পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার দুই হাতের যাবতীয় গুনাহ তার হাতের আঙ্গুলের পার্শ্ব দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে নিজ মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার গুনাহসমূহ চুলের পার্শ্ব দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন দুই গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার দুই পায়ের গুনাহসমূহ অঙ্গুলির পার্শ্ব দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায় এবং একাগ্র মনে নামাজ পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, আল্লাহ মর্যাদা ঘোষণা করে যার প্রকৃত অধিকারী তিনি এবং নিজের অন্তরকে আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট করে তাহলে সে অবশ্যই তার গুনাহসমূহ হতে পবিত্র হয়ে যায় সেদিনের ন্যায়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে অজু করে, সে ব্যক্তির অজুর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে গুনাহ ঝরে যায় এবং এ ব্যক্তি সেই দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যায়, যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। এর দ্বারা একথা বুঝা ঠিক নয় যে, তার কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়। শুধুমাত্র সগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। অবশ্য তাও তখন যখন তার কবীরা গুনা থাকে না। কেননা সগীরা গুনাহ তখনই মাফ হয়, যখন কবীরা গুনাহ থাকে না। আর কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। সুতরাং হাদীসাংশের অর্থ এই যে,– যে ব্যক্তির কবীরা গুনাহ নেই সে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অজু করার কারণে সদ্য প্রসূত নিষ্পাপ বাচ্চার মতো হয়ে যায়।

وَعَنْ ٩٧٦ كُرَيْبٍ (رحـ) اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رضـ) وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ (رضـ) وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَزْهَرِ (رضـ) اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ (رضـ) فَقَالُوْا اِقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا ثُمَّ دَخَلَ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৭৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কুরাইব হতে বর্ণিত। একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস মিস্ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা ও আব্দুর রহমান ইবনে আয্‌হার (রা.) এই কয়জন সাহাবী তাঁকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তারা বললেন, তুমি তাঁকে আমাদের সালাম বলবে এবং আসরের পরে দু' রাকাত নামাজ পড়া সম্পর্কে [তাঁর কি মতামত] তা জিজ্ঞাসা করবে। বর্ণনাকারী কুরাইব বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং সাহাবীত্রয় যে উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠিয়েছেন তা বললাম। তখন তিনি বললেন, এ সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা কর। তখন আমি তাদের [সাহাবীত্রয়ের] কাছে ফিরে গেলাম। তখন তাঁরা আমাকে উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বললেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ দু' রাকাত পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। এরপর একদিন আমি দেখেছি তিনি ঐ দু' রাকাত পড়ছেন। পরে যখন তিনি ঘরে পৌছলেন, তখন আমি আমার এক দাসীকে তাঁর খেদমতে পাঠালাম। তাকে এ কথা বলে পাঠালাম যে, তুমি গিয়ে হুজুর ﷺ-কে এই কথা বল যে, উম্মে সালামা বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এই দু' রাকাত নামাজ পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি, অথচ আমি আপনাকে ঐ দু' রাকাত পড়তে দেখলাম [এর কারণ কি?] তখন হুজুর ﷺ বললেন, হে আবূ উমাইয়্যার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পর দু' রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ [যা আজ তুমি আমাকে পড়তে দেখেছ।] প্রকৃত ঘটনা এই যে, আব্দুল কায়স গোত্রের কিছু লোক [অদ্য] আমার কাছে এসেছিল, তাদের সাথে [দীনি আলোচনায়] ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুন জোহরের পরের দু' রাকাত থেকে গেল। আর তাই সেই দু' রাকাত [যা আমি আসরের পরে পড়েছি।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِى الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ :

আসরের পর নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আসরের পর নামাজ পড়া জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. ইমাম মালেক (র.)-এর মতে আসরের পর ফরজ নামাজ আদায় করা বৈধ; কিন্তু নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই। কেননা ফরজের গুরুত্ব অত্যধিক। ইমাম আহমদ (র.) ও এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আসরের পর মানত ও কাজা এই জাতীয় নামাজ আদায় করা বৈধ। তিনি স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে বর্ণিত হযরত কুরাইব (রা.)-এর হাদীসসহ নিম্নের হাদীসগুলো পেশ করেন।

(الف) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) مَا تَرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِىْ قَطُّ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(ب) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا تَرَكَهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِىْ بَيْتِىْ قَطُّ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে আসরের পরে সূর্যাস্তের পূর্বে নফল, মানত নামাজ সবই হারাম। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলা ইবনে যিয়াদ প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَ دَفْعُهُمَا :

দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত انه كان يصليهما دائما মহানবী ﷺ এই দু' রাকাত নামাজ সদা সর্বদাই পড়তেন। অথচ উম্মে সালামার হাদীসে মাত্র একদিনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর জবাবে ইবনুল মালিক বলেছেন, এটা মহানবী ﷺ-এর বিশেষত্বের অন্তর্ভুক্ত, তাই স্বয়ং নিজে পড়তেন এবং অন্যের জন্য নিষেধ করতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ত্বাহাবী সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) হুজুর ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি উক্ত দুই রাকাত পড়ব? উত্তরে হুজুর ﷺ বললেন, না। তাই ইবনে হাজর বলেন, হুযূরের এই উত্তরের অর্থ হলো, 'এটা আমার বিশেষত্ব'। আর আমি যখন কোনো আমল শুরু করি, তখন তা সদাসর্বদা করতে থাকি।

اَلْمَسْئَلَةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ :

উক্ত হাদীস হতে নির্গত মাসআলাসমূহ : আলোচ্য হাদীস হতে প্রথমত দু'টি বিষয় প্রতিভাত হয়। [প্রথমত] দীনের দাওয়াত ও দীনের তালিমের কাজ সুন্নত নামাজ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ব্যক্তিগতভাবে দীনের কাজ সম্পাদন করার চেয়ে দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা অনেক উত্তম আমল। (দ্বিতীয়ত) ওয়াক্তের ভিতরে হোক কিংবা বাইরে হোক সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাজ কাজা করা উচিত। এটাই ইমাম শাফেয়ীর অভিমত। কিন্তু হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সুন্নতের কাজা আবশ্যকীয় নয়। তবে ওয়াক্তের ভিতরে হলে কাজা করা যেতে পারে। সুতরাং উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণিত সে দিনকার জোহরের পরের দু' রাকাত শুরু করেছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে তা ছেড়ে দিয়েছিলেন, এ পর্যায়ে শুরু নামাজ তার জিম্মায় ওয়াজিব হয়ে পড়েছিল যা তিনি আসরের পরে কাজা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৯৭৭ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ (رحـ) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ رَاَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ وَقَالَ اِسْنَادُ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَنُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ نَحْوَهٗ)

৯৭৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] মুহাম্মদ ইবনে ইব্‌রাহীম [সাহাবী] হযরত কায়েস ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে ফজরের পরে দু' রাকাত নামাজ পড়তে দেখে বললেন, ফজরের নামাজ দু' রাকাত, দু' রাকাত? [অর্থাৎ ফরজ দু' রাকাতের পরে কি আরও দু' রাকাত পড়ছ?] সে ব্যক্তি উত্তরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফজরের পূর্বের দু' রাকাত [সুন্নত] পড়িনি, তাই তা এখন পড়ে নিলাম। [কায়েস বলেন] এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। –[আবূ দাঊদ]

কিন্তু তিরমিযী এর অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে ইব্‌রাহীম স্বয়ং কায়েস হতে এটা শুনেননি। এতদ্ব্যতীত শরহে সুন্নাহ ও মাসাবীহ-এর বিভিন্ন সংস্করণে কায়েস ইবনে আমরের পরিবর্তে 'কায়েস ইবনে কাহদ' থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَقْوَالُ الْاَئِمَّةِ فِيْ قَضَاءِ سُنَّةِ الْفَجْرِ **ফজরের সুন্নতের কাজা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত :** ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে তা কাজা করতে হবে কি না? এই ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَمَّدٍ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে এর কাজা পড়া আবশ্যক। তাঁরা উক্ত হাদীস দ্বারাই দলিল গ্রহণ করেন। যদি ফজরের সুন্নত ফজরের পূর্বে না পড়া যায়, তা হলে অবশ্যই পরে কাজা পড়বে। তবে শাফেয়ীদের মতে সূর্যোদয়ের পূর্বে কাজা পড়া জায়েজ আছে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কাজা পড়া যাবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গেলে আর কাজা পড়া যাবে না।

مَذْهَبُ الشَّيْخَيْنِ ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি শুধু ফজরের সুন্নত ছুটে যায়, তাহলে কাজা পড়া আবশ্যক নয়। সূর্যোদয়ের পূর্বে হোক বা পরে; কিন্তু যদি ফরজসহ এক সঙ্গে কাজা হয়ে যায়, তা হলে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে সুন্নতসহ কাজা পড়বে। এরূপ যদি জোহরের সুন্নত ছুটে যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে পরের রাকাতগুলোর পূর্বেই কাজা করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে পরের দু' রাকাতের শেষে কাজা করবে। এটাই সহীহ অভিমত। শায়খাইন (র.)-এর মতে এ হাদীসটি দুর্বল বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٩٧٨ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَابَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلّٰى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৯৭৮. **অনুবাদ** : হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আবদে মনাফের বংশধরগণ! তোমরা কাউকেও এ ঘর [পবিত্র কা'বা] তওয়াফ করতে বাধা দিয়ো না এবং রাতে বা দিনে যে কোনো সময় [তওয়াফের নফল] নামাজ পড়তে চায়, নিষেধ করো না। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ-কে নির্দিষ্ট করার কারণ : মহানবী ﷺ নিম্নলিখিত কারণে আবদে মানাফের বংশধরগণকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন-

১. প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র তারাই হবে। এ জন্য বনূ আবদে মানাফকে খাস করে উল্লেখ করেছেন।

২. অথবা কুরাইশদের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় আবদে মানাফের বংশধরগণ নেতৃস্থানীয় ছিল এবং হজের মৌসুমে হাজীদেরকে পানি পান করানো সহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত ছিল। আর এ জন্যই রাসূল ﷺ হাদীসে বিশেষভাবে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

নিষিদ্ধ সময়ে হারাম শরীফে নামাজ পড়া সম্পর্কে মতভেদ : পবিত্র কা'বা শরীফ তওয়াফের পর দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়, তা মাকরূহ সময়ে পড়া জায়েজ আছে কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁর মতাবলম্বীগণ বলেন, হেরেম তথা মক্কাভূমিতে সকল সময়ই নফল নামাজ পড়া যায়। নিষিদ্ধ সময় এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তিনি স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর হাদীসসহ নিম্নের হাদীসটিও দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন-

(١) فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلٰى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ وَمَنْ عَرَفَنِيْ فَقَدْ عَرَفَنِيْ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِيْ فَأَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا بِمَكَّةَ إِلَّا بِمَكَّةَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ رَزِيْنٌ)

١. مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন, তওয়াফের দু' রাকাত নফল যে কোনো সময় জায়েজ আছে; কিন্তু অন্য নামাজ নিষেধের হাদীস অনুসারে জায়েজ নেই।

٢. مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মক্কার হুকুম অন্যান্য শহরের মতোই হবে। অর্থাৎ তিন সময়ে নামাজ পড়া হারাম, চাই তা যেখানেই পড়া হোক না কেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। এর কয়েকটি নিম্নরূপ-

(الف) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ . اَلْحَدِيْثُ

(ب) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

جَوَابًا لَهُمْ **প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব** : ইমাম শাফেয়ী (র.) হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর জবাবসমূহ নিম্নরূপ—

১. প্রথমতঃ হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি হারাম বা নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত অন্য সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. তার উত্তরে আল্লামা তুরেবিশ্তী (র.) বলেন, কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্র বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে বসবাস করত এবং তাদের প্রত্যেক কাবিলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দরজা ছিল। বহিরাগত লোক তাদের উক্ত দরজা দিয়ে বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। এ জন্য তারা বিরক্ত হয়ে মাঝে মধ্যে রাতে তা বন্ধ করে দিত। যার পরিপ্রেক্ষিতে লোকেরা বাইতুল্লাহর জিয়ারত এবং তওয়াফ করা হতে বঞ্চিত হতো। একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনে তাদেরকে কখনই দরজা বন্ধ না রাখার নির্দেশ দিলেন। এটাই হলো জুবাইর ইবনে মুতইম (রা.) বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য।

৩. অথবা হাদীসে উল্লিখিত أَيَّةَ سَاعَةٍ -এর অর্থ হবে أَيَّةَ سَاعَةٍ غَيْرِ مَكْرُوْهٍ [অর্থাৎ অনিষিদ্ধ যে কোনো সময়]।

১. হযরত আবূ যার (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করা হয়েছে এর জবাব হলো, হযরত আবূ যার (রা.)-এর হাদীসটি হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট বিভিন্ন দোষে দুষ্ট বিধায় তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

২. অথবা হাদীসে নাহীর মোকাবিলায় হযরত আবূ যার (রা.) -এর হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা হাদীসে নাহীর ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই।

৩. অথবা আদেশ ও নিষেধ একসাথে হলে নিষেধের হুকুমকেই প্রাধান্য দিতে হয়।

وَعَنْ ٩٧٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

৯৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যাহ্ন সময়ে অর্থাৎ ঠিক দুপুরে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না সূর্য কিছুটা ঢলে যায়– জুমার দিন ব্যতীত। –[শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِى الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ **জুমার দিনে নিষিদ্ধ সময়ে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ** : জুমার দিনে দ্বি-প্রহরের সময় নামাজ পড়া বৈধ কি না? সে সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জুমার দিন ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় তাহিয়্যাতুল অজু ও দুখূলুল মসজিদ এ জাতীয় নফল পড়া নাজায়েজ নয়। তারা নিজেদের স্বপক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসসহ নিম্নের দলিল উল্লেখ করেন।

(١) عَنْ أَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

এটা ছাড়াও তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনে লোকদেরকে তাড়াতাড়ি মসজিদে গিয়ে নামাজে মাশগুল থাকার উপদেশ দিতেন এবং উৎসাহিত করতেন।

২. পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, জুমার দিন দ্বি-প্রহরের সময় নফল নামাজ জায়েয নেই। আর দলিল হলো–

(١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً وَحِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ وَحِيْنَ تَضِيْفُ لِلْغُرُوْبِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এটা ব্যতীত তিনি আরো অনেক হাদীস দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

অন্যদের উপস্থাপিত হাদীসের জবাব : ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর দলিলসমূহের জবাব নিম্নরূপ—

প্রথমত তারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার মধ্যে إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ বাক্য রয়েছে। নাহুবিদদের কায়দা অনুযায়ী এটা إِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعٌ হয়েছে, যা مُسْتَثْنٰى مَسْكُوْتٌ عَنْهُ -এর হুকুম অনুযায়ী হবে।

দ্বিতীয়ত যেমনটি আহনাফ বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মূলত এর অর্থ হলো إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ نِصْفِ النَّهَارِ بِغَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ অতএব নিষিদ্ধের হুকুম ব্যতীত হাদীসের অন্য অংশের সাথে مُقَيَّدٌ বা সম্পৃক্ত, যার সম্পর্ক إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ অংশের সাথে আদৌ নেই। সুতরাং إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ হাদীসের এ অংশের হুকুম অন্যান্য নিষিদ্ধ হাদীসের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত হাদীসের উত্তরে বলা যায় যে, তাঁদের এ সমস্ত হাদীসের তুলনায় হাদীসে نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيَّةِ অধিক জোরালো ও শক্তিশালী বিধায় তাদের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ٩٨٠ اَبِى الْخَلِيْلِ (رحـ) عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَقَالَ اَبُو الْخَلِيْلِ لَمْ يَلْقَ اَبَاقَتَادَةَ)

৯৮০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আবুল খলীল [সাহাবী] হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠিক দুপুরে নামাজ পড়াকে অপ্রিয় ভাবতেন, যতক্ষণ না সূর্য কিছুটা হেলে পড়ে কেবলমাত্র জুমার দিন ব্যতীত। তিনি আরও বলেন, জুমার দিন ব্যতীত অন্য দিনে মধ্যাহ্ন সময়ে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। −[আবূ দাউদ]

আবূ দাউদ বলেন যে, আবুল খলীল হযরত আবূ কাতাদার সাক্ষাৎ পাননি। সুতরাং হাদীসটি মুনকাতে'।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٨١ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّنَابِحِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطٰنِ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ اِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَاِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَاِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَاِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ تِلْكَ السَّاعَاتِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ)

৯৮১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ সুনাবহী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন− যখন সূর্য উদয় হতে থাকে, তখন তার সাথে শয়তানের শিংও থাকে। যখন কিছুটা উপরে উঠে তখন শয়তান তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর যখন সূর্য মধ্যাহ্নে স্থির হয়, তখন শয়তান সূর্যের সাথে মিলিত হয়, আর যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন সে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যখন সূর্য ডুবতে থাকে তখন শয়তান এসে তাতে মিলিত হয়। এরপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। [রাবী বলেন,] এ সময়গুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। −[মালেক, আহমদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ٩٨٢ اَبِىْ بُصْرَةَ الْغِفَارِىِّ (رضـ) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَخْمَصِ صَلٰوةَ الْعَصْرِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ صَلٰوةٌ عُرِضَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهٗ اَجْرُهٗ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَهَا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ বাসরা গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামাজ পড়লেন। তারপর বললেন, এটা এমন একটি নামাজ যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের সামনেও পেশ করা হয়েছিল। (অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছিল) কিন্তু তারা একে নষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি একে যথাযথ রক্ষা করবে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। কিন্তু পরে 'শাহেদ' উদিত হওয়া পর্যন্ত আর কোনো নামাজ নেই। আর শাহেদ হলো তারকা। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : উল্লেখ্য যে, আসরের নামাজের ফরজিয়াত পূর্ববর্তী জাতি ইহুদি নাসারাদের উপরও ফরজ ছিল। এ জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন আল্লাহ বলেন, حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এখানের মুফাসসিরগণ اَلصَّلٰوةُ الْوُسْطٰى -এর ব্যাখ্যা صَلٰوةُ الْعَصْرِ দ্বারাই করেছেন; কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে আদায় করেনি। সুতরাং উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে যারা আসরের নামাজ পড়বে তাদের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আলোচ্য হাদীসাংশে এ কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য এর ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন–

১. কারো মতে একটি ছওয়াব হলো এই কারণে যে, পূর্ববর্তী ইহুদি-নাসারাদের বিপরীতে এর সংরক্ষণ করেছেন এবং দ্বিতীয় ছওয়াব হলো স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য নামাজের ন্যায় এটা আদায়ের জন্য।
২. আল্লামা তীবী এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি ছওয়াব হলো, স্বাভাবিক ইবাদতের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো, নামাজের সময় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করার কারণে। কেননা আসরের সময়টি হলো কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার সময়।
৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, একটি ছওয়াব হলো, আসরের বিশেষ ফজিলতের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো, তা ঠিকমত আদায়ের জন্য।

٩٨٣- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلٰوةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا رَاَيْنَاهُ يُصَلِّيْهِمَا وَلَقَدْ نُهِىَ عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৯৮৩. **অনুবাদ :** হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিশ্চয়ই এমন [দু' রাকাত] নামাজ পড়ে থাক, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে ছিলাম, অথচ তাঁকে এ দু' রাকাত নামাজ পড়তে কখনো দেখিনি; বরং তিনি তা পড়তে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ আসরের পরে দু' রাকাত নামাজ পড়া। –[বুখারী]

٩٨٤- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ وَقَدْ صَعِدَ عَلٰى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ مَنْ عَرَفَنِىْ فَقَدْ عَرَفَنِىْ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِىْ فَاَنَا جُنْدُبٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ اِلَّا بِمَكَّةَ اِلَّا بِمَكَّةَ اِلَّا بِمَكَّةَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ رَزِيْنٌ)

৯৮৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আমাকে চিনেছ, সে তো চিনেছই অর্থাৎ আমার নাম জেনেছই। আর যারা আমাকে চিননি, তারা জেনে রাখ আমি জুনদুব [যে সদা সত্যবাদী]। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই, তদ্রূপভাবে আসরের পরেও সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো নামাজ নেই, তবে একমাত্র মক্কাতে, একমাত্র মক্কাতে, একমাত্র মক্কাতে। [অর্থাৎ আসরের পর সূর্যাস্তের পূর্বে এবং ফজরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে একমাত্র মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কোনো নামাজ পড়া যাবে না]। –[আহমদ ও রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ফজরের পরে ও আসরের পরে طَوَافُ زِيَارَةٍ -এর দু' রাকাত নামাজ পড়া যাবে কি না? এই বিষয়ে পূর্বের এক হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا

পরিচ্ছেদ : জামাত ও তার ফজিলত

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো নামাজ, সাধারণত এর মাধ্যমেই মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়। মহান আল্লাহর দরবারে বিনয়ী হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো এই নামাজ। জামাতের মাধ্যমেই এই নামাজ ফরজ হয়, তাই ইসলামি শরিয়তে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এর জন্য ছওয়াবও রয়েছে অনেক বেশি। মহানবী ﷺ বলেছেন, জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ফজিলত একাকী নামাজ আদায় করা অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি।

জামাতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব :

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, নামাজের মতো এত উত্তম আর কোনো ইবাদত নেই, সুতরাং এর প্রসারের জন্য সমবেতভাবে নামাজ আদায় করাই বাঞ্ছনীয়।

২. মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোক বিদ্যমান রয়েছে; এরা অনেকেই নামাজের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, এদেরকে সমবেত করে শিক্ষা না দিলে অজ্ঞ থেকে যাবে, তাই জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে তা যথাযথভাবে শিখতে সক্ষম হবে।

৩. মানুষ হিসাবে রাজা, প্রজা, উঁচু-নীচু সকলেই একই স্তরের, এ কথা বুঝানোর জন্যই ইসলামি শরিয়ত জামাতের মাধ্যমে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে।

৪. ইসলামি সমাজে পারস্পরিক সহমর্মিতা জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমেই ফুটে উঠে।

৫. দৈনন্দিন পাঁচবার জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে একে অপরের খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতার ভাব সৃষ্টি হয়।

৬. দৈনিক পাঁচবার জামাতে নামাজ পড়ার মাধ্যমে মানুষ তার কাজ-কর্মে সচতেন হয় এবং নিয়ামানুবর্তী হয়, এ ছাড়াও আরো অনেক ফজিলত রয়েছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে জামাতে নামাজ পড়া সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৯৮৫ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, জামাতের সাথে নামাজ একাকী নামাজের চেয়ে সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : উল্লিখিত হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে জামাতে নামাজ পড়ার ছওয়াব একাকী পড়া হতে ২৭ গুণ বেশি বলা হয়েছে। অথচ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে ২৫ গুণের কথা বলা হয়েছে, এ উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ—

১. এর সমাধানে বলা যায় যে, ذِكْرُ الْقَلِيْلِ لَا يَنْفِى الْكَثِيْرَ অর্থাৎ স্বল্প সংখ্যার উল্লেখ আধিক্যকে নিষেধ করে না। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো تَعَارُضْ নেই। আল্লামা শাওকানী এ সমাধানটিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

২. অথবা রাসূলে কারীম ﷺ প্রথমত خَمْسًا وَّ عِشْرِيْنَ বলেছেন। পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জামাতের অধিক ছওয়াব সম্পর্কে অবহিত করেছেন বিধায় তিনি পরে سَبْعًا وَّ عِشْرِيْنَ বলেছেন।

৩. অথবা সম্পূর্ণ নামাজ জামাতে পেলে ২৭ গুণ, পক্ষান্তরে কিছু নামাজ পেলে ২৫ গুণ।

৪. অথবা জামাতে লোক বেশি হলে ২৭ গুণ আর কম হলে ২৫ গুণ।
৫. অথবা ফজর ও ইশার নামাজে ২৭ গুণ আর এটা ব্যতীত অন্যান্য নামাজে ২৫ গুণ।
৬. অথবা ফজর ও আসরের জন্য ২৭ গুণ আর অন্যান্য নামাজের জন্য ২৫ গুণ।
৭. অথবা যে নামাজের কেরাত জোরে পড়া হয় সে নামাজের ছওয়াব ২৭ গুণ, আর যে নামাজে আস্তে কেরাত পড়া হয় সে নামাজের জন্য ২৫ গুণ।
৮. অথবা ইমামের মর্যাদার কারণে এ ছওয়াবেরও ব্যবধান হতে পারে।
৯. অথবা ২৫ গুণ হবে যদি মসজিদ নিকটবর্তী হয় আর ২৭ গুণ হবে যদি মসজিদ দূরবর্তী হয়।
১০. অথবা এ তারতম্য মুসল্লির উপর ভিত্তি করে। মুসল্লি যদি অধিক খোদাভীরু এবং নামাজের পূর্ণ সংরক্ষণকারী হয় তা হলে তার জন্য ২৭ গুণ নতুবা ২৫ গুণ।
১১. অথবা নামাজ আদায়ের স্থানের পার্থক্যের কারণে ছওয়াবেরও পার্থক্য হবে। যেমন– মসজিদে জামাতসহ আদায় করলে ২৭ গুণ আর অন্য স্থানে আদায় করলে ২৫ গুণ।
১২. অথবা নামাজের জন্য যে ব্যক্তি অপেক্ষায় থাকবে তার জন্য ২৭ গুণ, আর যে অপেক্ষায় থাকবে না তার জন্য ২৫ গুণ। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

وَعَنْ ٩٨٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرُ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرُ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهٗ يَجِدُ عِرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهٗ)

৯৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার কসম! আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি কিছু লাক্‌ড়ি একত্র করার নির্দেশ দেব, আর তা জমা করা হবে। অতঃপর নামাজের আযান দিতে আদেশ করব, আর আযান দেওয়া হবে। তারপর আমি কাউকে হুকুম দেব লোকদের ইমামতি করতে, সে লোকদের ইমামতি করবে। আর আমি সেই সমস্ত লোকদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে দেখব।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, যারা নামাজে হাজির হয়নি, তাদের সহ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব। সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তাদের কেউ যদি জানত যে, মসজিদে একটা গোশতযুক্ত হাড্ডি কিংবা দুই টুক্‌রা ভাল খুর পাবে, তাহলে সে অবশ্যই ইশার নামাজে উপস্থিত হতো।–[বুখারী] আর মুসলিমের বর্ণনাও প্রায় এরূপ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْجَمَاعَةِ **জামাতের হুকুম :** জামাতে নামাজ পড়ার হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

১. مَذْهَبُ اَهْلِ الظَّوَاهِرِ আহলে যাহেরদের মতে জামাত ওয়াজিব এবং নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। তাদের দলিল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীস–

(١) قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىْ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهٖ عُذْرٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلَّاهَا كَمَا فِى التَّعْلِيْقِ.

২. مَذْهَبُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে জামাতে নামাজ আদায় করা فَرْض عَيْن বা অবশ্য কর্তব্য। ইবনে খুযাইমা, ইবনুল মুনযির, আতা, আওযায়ী, আবূ সওর প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

كَمَا فِى الْعَيْنِىْ وَالْفَتْحِ

৩. مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ ইমাম শাফেয়ী (র.), ইমাম কারখী এবং ইমাম ত্বাহাবী (র.)-এর মতে জামাতে নামাজ পড়া ফরজে কেফায়া। যারা জামাতকে ফরজে আইন এবং ফরজে কেফায়া বলেছেন তারা নিজেদের দাবির সমর্থনে একই ধরনের দলিল পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

(الف) قَوْلُهُ تَعَالٰى إِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ـ (الاية)

(ب) إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ)

(ج) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

(د) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا اَعْمٰى اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَىْ عَدَمُ حُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَجِبْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

এগুলো ব্যতীতও তার উপরে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসও দলিল হিসাবে পেশ করেন।

৪. مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জামাতে নামাজ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। (كَمَا فِى الْعَيْنِىْ وَالتَّعْلِيْقِ)—

তাঁদের দলিল সে সব হাদীস যাতে জামাতের ফজিলতের বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে এর কয়েকটি পেশ করা হলো–

(الف) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(ب) عَنْ اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَهُ فَهُوَ اَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَالْحَاكِمُ)

(ج) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ لِاَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَأْ بِالْعَشَاءِ وَلَا يُعَجِّلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَلَا يَاْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (هٰذَا كُلُّهُ فِى الْعَيْنِىْ وَ اَوْجَزِ الْمَسَالِكِ)

প্রতি পক্ষের দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং অন্যান্যরা সালাতুর খাওফের আয়াত দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন, এর উত্তরে বলা যায় যে, এতে সালাতুল খাওফের কাইফিয়াত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, জামাত ফরজ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ হাদীস দ্বারা যে দলিল নেওয়া হয়েছে এর জবাবে আল্লামা বাজী বলেন, এ হাদীসটি দ্বারা ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য। এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

অথবা এ ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সেই সম্প্রদায় উদ্দেশ্য যারা নামাজই পরিহার করে থাকে।

প্রতিপক্ষ لَا صَلٰوةَ الخ হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন, এর উত্তরে বলা যায় যে, জামাত ব্যতীত একাকী নামাজ আদায় করলে নামাজ পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং পুরা ছওয়াব পাওয়া যাবে না। لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ এ হাদীসের জন্যও এ একই উত্তর প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْهُ ٩٨٧ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّهٗ لَيْسَ لِىْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرَخِّصَ لَهٗ فَيُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهٗ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৮৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সমীপে এক অন্ধ ব্যক্তি [আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম] আসলেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার এমন কোনো সহায়তাকারী লোক নেই, যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই অনুমতি প্রার্থনা করলেন যেন তিনি [মাসজিদে না এসে] নিজ গৃহে নামাজ আদায় করতে পারেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। যখন তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আযানের ধ্বনি শুনতে পাও? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ, তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তা হলে সে ডাকে তুমি সাড়া দাও অর্থাৎ মসজিদে [কষ্ট করে হলেও] হাজির হও। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, যে অন্ধকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো কোনো লোক নেই, তার পক্ষে মসজিদে উপস্থিত হওয়া জরুরি নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নেওয়ার মতো লোক থাকলেও ওয়াজিব নয়। কিন্তু সাহেবাইন বলেন, তখন হাজির হওয়া ওয়াজিব। ইমাম সাহেব বলেন, এখানে জামাতের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য হুজুর ﷺ এ অন্ধ সাহাবীকে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার আদেশ করেছেন। যেন অন্যান্য লোকেরা বুঝতে পারে যে, নামাজের জামাত কত জরুরি।

رَجُلٌ اَعْمٰى **দ্বারা উদ্দেশ্য :** আলোচ্য হাদীসে رَجُلٌ اَعْمٰى তথা অন্ধ ব্যক্তি দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنِ ٩٨٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهٗ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَ رِيْحٍ ثُمَّ قَالَ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক শীত ও ঝড়-তুফানের রাতে তিনি আযান দিলেন, তারপর জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, শোন, তোমরা নিজ নিজ আবাসস্থলে নামাজ পড়। অতঃপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিতেন। যখন শীত ও বর্ষা-বাদলের রাত হতো তখন সে যেন ডেকে বলে- শোন তোমরা যার যার আবাসস্থলে নামাজ পড়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আরব ও মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় সাধারণত গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় না; বরং ভূমধ্য সাগরীয় আবহাওয়ার কারণে শীতকালে কিছুটা বৃষ্টিপাত হয়। তখনকার বৃষ্টি ও হিমেল হাওয়ায় এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলোচ্য হাদীসের মর্মানুসারে শীত, বর্ষা, বান ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জামাত তরক জায়েজ হবে, তবে আমাদের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সাধারণত বৃষ্টি বা শীত তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে বন্যা-তুফান বা প্লাবনের সময় যদি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে ঐ সময় জামাত তরক করা জায়েজ হবে।

اَلرِّحَالُ اَیِ الْعَوْرُ وَالْمَسَاكِنُ -এর ব্যাখ্যা : رِحَالٌ অর্থ– ঘর বা অবস্থান। আল্লামা তীবী বলেন, صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ অর্থাৎ রেহাল অর্থ গৃহ এবং বাসস্থান। যেমন বলা হয় رَحْلُ الرَّجُلِ রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত হাদীসে ঘরে নামাজ পড়ার অনুমতি প্রদান করেছেন। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার দরুন অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে মসজিদে যেতে অক্ষম হলে ঘরে বসে নামাজ পড়া শরিয়তের পরিপন্থি নয়। এ কথাই বর্ণিত হাদীসাংশে উল্লিখিত হয়েছে।

وَعَنْهُ ٩٨٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَلَا يَاْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْاِمَامِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৮৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কারো সম্মুখে রাতের খাবার উপস্থিত করা হয় অপর দিকে ইশার নামাজের একামতও বলা হয়, তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার খেয়ে নেবে। আর সে যেন তাড়াহুড়া না করে যে যাবৎ না খাদ্য হতে অবসর হয়। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, তাঁর জন্য নামাজের ইকামত দেওয়ার সময় খাদ্য হাজির করা হলে তখন তিনি নামাজে উপস্থিত হতেন না, যতক্ষণ না তিনি খাওয়া শেষ করতেন। অথচ তিনি ইমামের কেরাত পাঠ শুনতে পেতেন।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ-**এর অর্থ :** عَشَاءُ শব্দটির عَيْن বর্ণটি যবর বিশিষ্ট। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে– মিরকাত প্রণেতা عَشَاءُ-এর অর্থ বর্ণনায় বলেন وَهُوَ مَا يُؤْكَلُ فِى الْعِشَاءِ অর্থাৎ ইশার সময়ের খাওয়াকে আশা (عَشَاء) বলে।
আবার কারো মতে, مَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الزَّوَالِ অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে খাদ্য খাওয়া হয় তাকে عَشَاء বলে।
আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন– اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ وَهُوَ مِثَالٌ وَالْمُرَادُ طَعَامٌ تَتَوَّقُ نَفْسُهُ اِلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ عَشَاءً অর্থাৎ এই বাক্যটি একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। এর দ্বারা এমন উত্তম খাদ্যকে বুঝানো হয়েছে যা ভক্ষণে আত্মা উদ্গ্রীব। সে খাদ্য ইশার সময়ের হোক বা না হোক।

حُكْمُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ الْاَكْلِ **খাওয়ার সময় জামাতের বিধান :** খাওয়ার সময় জামাত শুরু হয়ে গেলে খাওয়া ছেড়ে জামাতে উপস্থিত হতে হবে কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়– আহলে যাওয়াহেরদের মতে খাওয়ার সময় জামাত আরম্ভ হলে খাওয়া সম্পন্ন করা ওয়াজিব। তাঁরা বলেন فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ-এর মধ্যে فَابْدَءُوْا হুকুমটি ওয়াজিব সাব্যস্ত করে। অবশ্য জমহুর ওলামা এ আমলকে মোস্তাহাব বলেছেন।

ইমাম আহমদ, সুফইয়ান সওরী এবং ইসহাক (র.) বলেন, فَابْدَءُوْا এ হুকুমটি মুতলাক। কেননা এর উপর রাবী ইবনে ওমরের কর্মটি বুঝায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় জামাত ছেড়ে খাওয়ায় নিমগ্ন থাকা বৈধ ; কিন্তু এ অবস্থা না হলে খাওয়া পরিহার করে জামাতে শরিক হওয়াই উত্তম।

আল্লামা ইবনুল মুনযির ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার মতে সামান্য হালকা খাবার হলে খাওয়া যেতে পারে, নতুবা জামাতে শরিক হতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, নামাজরত অবস্থায় খাওয়ার দিকে মন থাকার চেয়ে জামাত পরিত্যাগ করে তার দিকে মন মশগুল রেখে খাওয়ায় নিমগ্ন থাকা শ্রেয়।

فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ-**এর উত্তর :** আহলে যাওয়াহের فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ দ্বারা যে وُجُوْب সাব্যস্ত করেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে, এ আমরটি ওয়াজিবের জন্য নয়; বরং এটা দ্বারা নুদুব বা মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয়েছে। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারাই প্রতীয়মান হয়। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, (الاية) فَاصْطَادُوْا এখানে নুদুব বুঝানো হয়েছে।

একটি تَعَارُض ও তার সমাধান : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا تُؤَخِّرِ الصَّلٰوةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ এটা দ্বারা বুঝা যায় খাওয়া বা অন্য কিছুর জন্য নামাজ বিলম্ব করা যাবে না। এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ হাদীসের পরিপন্থি। উভয় হাদীসের মধ্যে تَعَارُض সৃষ্টি হয়েছে। এর সমাধানে বলা হয়েছে যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসটি যয়ীফ। এটা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অথবা বলা যেতে পারে– নামাজের সময় যখন সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং খাওয়া খেলে নামাজের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে لَا تُؤَخِّرِ الصَّلٰوةَ হাদীস প্রয়োগ হবে। আর যদি খাবার খাওয়ার পরও নামাজের সময় বাকি থাকে সে অবস্থায় فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ এ হাদীস প্রযোজ্য হবে।

وَعَنْ ٩٩٠ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا صَلٰوةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খাদ্য উপস্থিত হওয়ার পর নামাজ পড়া যাবে না। তদ্রূপভাবে যখন সে দুই 'হদস্' অর্থাৎ– পেশাব পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, খাবার সম্মুখে এলে নামাজের সময় বাকি থাকলে জামাআত পরিত্যাগ করে খাওয়া শেষ করে নেওয়া উত্তম, তবে নামাজের শেষ ওয়াক্ত হলে তখন খাওয়া রেখে নামাজ পড়ে নিতে হবে।

এমনিভাবে নামাজের সময় থাকা অবস্থায় পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামাজ পড়া মাকরূহ।

وَعَنْ ٩٩١ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– যখন জামাতের জন্য একামত বলা হয় তখন ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো নামাজ নেই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ النَّفْلِ فِيْ وَقْتِ الْجَمَاعَةِ **জামাতের সময় সুন্নত বা নফল নামাজের বিধান :** জামাত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত বা নফল পড়া জায়েজ আছে কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম যায়লায়ী (র.) বলেন, ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত নামাজ যদি ইমামের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে শেষ করা সম্ভবপর হয় তা হলে সুন্নত সমাপ্ত করে ইমামের একতেদা করতে হবে; কিন্তু যদি প্রথম রাকাত না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সুন্নত ছেড়ে জামাতে শরিক হবে।

আহলে জাহেরদের মতে ফজরের সুন্নত অথবা অন্য কোনো নফল নামাজ শুরু করার পর যখন ফরজ নামাজের একামত দেওয়া হয় তখন সুন্নত বাতিল হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল হলো রাসূল ﷺ-এর এই হাদীস–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

জমহুর ওলামার মতে একামতের পর সেই সুন্নত ও নফল বাতিল হয়ে যাবে না। তাঁদের দলিল হলো আল্লাহর বাণী–

لَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ

উল্লেখ্য, জমহুর ওলামা ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবূ ছওর, ইবনে সীরীন, উরওয়াহ, সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রমুখের মতে ইমাম সাহেব ফজরের নামাজ শুরু করে দিলে সুন্নত পড়া মাকরূহ। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন–

(الف) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(ب) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ وَاَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاِقَامَةِ فَجَذَبَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اَتُصَلِّى الصُّبْحَ اَرْبَعًا ـ

(ج) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَرَاٰى نَاسًا يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعُجْلَةِ فَقَالَ اَصَلَاتَانِ مَعًا فَنَهٰى اَنْ تُصَلِّيَا فِى الْمَسْجِدِ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ ـ

(د) اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ـ

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمَا : ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), আওযায়ী এবং সাওরীর মতে মসজিদের বাইরে ফজরের সুন্নত পড়াতে কোনো ক্ষতি নেই। আবশ্য এদের মধ্যেও কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ফরজের দ্বিতীয় রাকাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নত পড়ে নিতে হবে। ইমাম মালেক (র.) বলেন, প্রথম রাকাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নত পড়তে হবে। ইমাম সাওরী এ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু তিনি মসজিদের ভিতরে সুন্নত পড়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ٩٩٢ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَتْ اِمْرَاَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْنَهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৯৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো স্ত্রী যদি মসজিদে [জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে] যেতে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন সে যেন তাকে বাধা না দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের অভিমত : জামাতে শরিক হওয়া মহিলাদের জন্য বৈধ কি না? এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তিনি ইবনে ওমরের এই হাদীসটিসহ নিম্নের হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন–

عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ـ (كَمَا فِىْ حَاشِيَةِ الْهِدَايَةِ عَنِ النِّهَايَةِ)

مَذْهَبُ الصَّاحِبَيْنِ : সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঈদের জামাতে মহিলাদের হাজির হওয়া যেমনিভাবে বৈধ, তেমনিভাবে বৃদ্ধা মহিলাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে হাজির হওয়া বৈধ। কেননা তাদের ক্ষেত্রে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ইমাম মালেক (র.)-ও একে বৈধ বলেছেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বৃদ্ধা মহিলাদের ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাতে হাজির হওয়া অবৈধ নয়। এ তিন ওয়াক্তকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

اَمَّا الْفُسَّاقُ نَائِمُوْنَ فِى الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَفِى الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُوْلُوْنَ وَفِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ مُنْتَشِرُوْنَ فَلَا يَخْرُجْنَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ ـ (كَمَا فِى الْهِدَايَةِ)

অর্থাৎ ফাসেকরা ফজর ও এশায় ঘুমিয়ে থাকে এবং মাগরিবের সময় খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত থাকে। জোহর, আসর এবং জুমার সময় তারা বইরে চলাফেরা করতে থাকে। অতএব মহিলারা যেন জোহর, আসর ও জুমার সময় বের না হয়।

※ ইমাম আবূ হানীফা, মালেক এবং সাহেবাইন (র.) বলেন, যুবতী মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া মাকরূহ। কেননা তাদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে।

ওলামায়ে মুতায়াখখেরীন বলেন, বৃদ্ধা-যুবতী সকল মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া মাকরূহ। এর উপরই ফতোয়া।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের উত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র.) যে দু'টি হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করেছেন এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়–

১. এ ধরনের সমস্ত হাদীস সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া বৈধ ছিল। পরবর্তী সময় ফেতনা সৃষ্টির কারণে এর হুকুম রহিত করা হয়।

২. অথবা বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলারা শরিয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের জন্য জামাতে উপস্থিত হতেন। বর্তমানে শরিয়তের আহকাম সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হওয়ার কারণে সে প্রয়োজন আর নেই বিধায় মহিলাদের জামাতে হাজির না হওয়াই শ্রেয়।

وَعَنْ ٩٩٣ زَيْنَبَ اِمْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيْبًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে [মহিলাদেরকে] বলেছেন, যখন তোমাদের [স্ত্রী সমাজের] কেউ মসজিদে উপস্থিত হয় তখন সে যেন কোনো সুগন্ধি জিনিস স্পর্শ না করে [অর্থাৎ, না লাগায়। কেননা এটা পুরুষদের মনকে প্রলুব্ধ করে]। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٩٩٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৯৯৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মহিলাই বাখুর [সুগন্ধি] লাগাবে, সে যেন আমাদের সাথে ইশার নামাজে উপস্থিত না হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** بَخُوْر 'বাখুর' এমন জিনিসকে বলা হয়, যা আগুনে পোড়ালে সুগন্ধ বের হয়, যেমন– চন্দন কাঠ, লোবান বা আগর বাতি ইত্যাদি। তৎকালীন মহিলা সমাজ 'বাখুর' নামীয় কাষ্ঠকে জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া গায়ে লাগাত। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মাগরিবের নামাজকে 'এশায়ে উলা' বা প্রথম এশা এবং ইশার নামাজকে 'এশায়ে আখিরা' বা দ্বিতীয় এশা বলত। আর এ সময়ের নামাজে মহিলাদেরকে সুগন্ধি গায়ে মেখে আসতে নিষেধ করার কারণ বলার অপেক্ষা রাখে না। দুশ্চরিত্র লোকদের দ্বারা এ সময়ে অঘটন বা বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٩٩٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوْا نِسَائَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৯৯৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে বাধা দিও না, তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম স্থান –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٩٩٦ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلٰوتُهَا فِيْ مِخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِيْ بَيْتِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৯৯৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্ত্রীলোকদের ঘরের নামাজ তার বারান্দার নামাজ অপেক্ষা উত্তম এবং প্রকোষ্ঠের নামাজ তার ঘরের নামাজ অপেক্ষা উত্তম। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মহিলাদের যথা সম্ভব পর্দা অবলম্বন করে থাকাই উচিত। তাই নবী করীম ﷺ মহিলাদেরকে গৃহাভ্যন্তরে বিশেষ করে নিজ কক্ষে নামাজ পড়াকে উত্তম বলেছেন।

وَعَنْ ٩٩٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ حِبِّيْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُقْبَلُ صَلٰوةُ اِمْرَاَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتّٰى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوٰى اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

৯৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম ﷺ-কে বলতে শুনেছি– ঐ মহিলার নামাজ কবুল হবে না, যে মাসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার করে এসেছে, যতক্ষণ না সে নাপাকির গোসলের মতো গোসল করে। [অর্থাৎ উত্তমরূপে ধৌত করে সুগন্ধি দূর করে]। –[আবূ দাউদ। আহমদ এবং নাসায়ীও এরূপ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَتّٰى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ-এর ব্যাখ্যা : যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদে নামাজ পড়তে গমন করে তার নামাজ সম্পূর্ণরূপে কবুল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা ধৌত করে ফেলে।

ইমাম ইবনে মালিক বলেন, এর দ্বারা অধিক সংযম ও কঠোরতা বুঝানোই উদ্দেশ্য। নাপাকির সাদৃশ্য বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কি পরিমাণ বা কতটুকু ধৌত করতে হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে– যদি সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মাখে তাহলে পুরা শরীরই ধৌত করতে হবে।

অথবা যে পরিমাণ স্থানে তা মাখা হবে সে পরিমাণ স্থান ধৌত করতে হবে। আর যদি পরিধেয় বস্ত্রে সুগন্ধি ব্যবহার করে তা হলে সে কাপড় পরিবর্তন করে ফেলতে হবে, নতুবা তা দূর করতে হবে। উল্লেখ্য এ সমস্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মসজিদে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করবে। আর যদি মসজিদে গমন না করে ঘরে বসে নামাজ পড়ে তা হলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না।

وَعَنْ ٩٩٨ اَبِيْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَاِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِيْ زَانِيَةً ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلِاَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ نَحْوَهُ)

৯৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। সুতরাং কোনো মহিলা যখন সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং সমাবেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, সে এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। –[তিরমিযী। আবূ দাউদ ও নাসায়ীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উল্লেখ্য যে, যৌনাঙ্গ দ্বারা যেমন জেনা হয় তদ্রূপ চক্ষু ও হাত প্রভৃতি দ্বারা জেনা হয়ে থাকে। চক্ষুর জেনা কাম নজরে দেখা, হাতের জেনা স্পর্শ করা এবং অন্তরের জেনা হলো তার আকাঙ্ক্ষা করা। পরস্ত্রীর প্রতি বা পরপুরুষের প্রতি কামভাবে বা কামুক দৃষ্টিতে তাকানো জেনারই শামিল।

আর সুগন্ধি ব্যবহার করে অন্তপুরে পর্দার আড়ালে থেকেও পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বললে সুগন্ধি তাকে প্রলুব্ধ করে। সম্মুখে আসলে বা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে তো কথাই নেই, চক্ষু তখন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। দুঃশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের দ্বারাই এরূপ কার্য হয়ে থাকে। মূলত এটাই জেনার প্রাথমিক সূচনা। সুতরাং এটাও জেনার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ অবস্থায় কোনো মহিলার মসজিদে যাওয়া জায়েজ নেই। অথচ আজকাল নারী সম্প্রদায় কত প্রকারের প্রসাধনী ব্যবহার করে রাস্তায় তথা জনসমাগমের ভিড়ের মধ্যে যাওয়াটা গর্ববোধ করে। তিরমিযীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত– قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ মেয়েলোক আপাদ-মস্তক আবরণীয় বা গোপনীয় বস্তু, যখন তারা নিজ ঘর হতে বের হয় তখন (মানব ও দানব) শয়তান তাদের দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকে।

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ **-এর ব্যাখ্যা :** ব্যভিচার একটি মারাত্মক অপরাধ। এটা যেমন যৌনাঙ্গ দ্বারা হয়ে থাকে তেমনি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও হতে পারে। বর্ণিত হাদীসে প্রত্যেক চক্ষুকে ব্যভিচারী বলা হয়েছে। কামভাবের দৃষ্টিতে পরস্ত্রী অথবা পরপুরুষের প্রতি তাকালে এটাও ব্যভিচারের মধ্যে শামিল। কেননা চক্ষুর দৃষ্টি অন্তরে সঙ্গমের প্রবল ইচ্ছার উদ্রেক করে। যাকে জেনার প্ররোচণা বলা চলে। অন্য হাদীসে এসেছে যে, যৌনাঙ্গ দ্বারা যেমন জেনা হয় তদ্রূপ চক্ষু ও হাত প্রভৃতির দ্বারাও জেনা হয়। এ হাদীসটি বর্ণিত উক্তিরই পরিপূরক ও সম্পূরক। সুতরাং কামভাবপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

فَهِيَ كَذَا وَكَذَا **-এর মর্মার্থ :** মহিলারা সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হলে অথবা এ অবস্থায় গৃহের অভ্যন্তরে পর্দার অন্তরালে বসে যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলে তা হলে এটাও ব্যভিচারের সমান অপরাধ। কেননা সুগন্ধির ঘ্রাণে পরপুরুষ স্বভাবতই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং যৌন ভোগের প্রবল ইচ্ছা অন্তরে সৃষ্টি হবে। মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে যেহেতু এ অবস্থার সূচনা হলো সেহেতু জেনার অপরাধের বিরাট একটা অংশ তার স্কন্ধেই অর্পিত হবে। এ কথাই আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٩٩٩ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لَا قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لَا قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلٰئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهٖ

৯৯৯. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একদিন ফজরের নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক উপস্থিত আছে কি? সাহাবীগণ আরজ করলেন, না হুযূর! রাসূল ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর অমুক উপস্থিত আছে কি? লোকেরা বললেন, জি না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় এই দু'টি নামাজ [অর্থাৎ ফজর ও ইশা] মুনাফিকদের পক্ষে খুব কঠিন নামাজ। যদি তোমরা জানতে এ দুই নামাজের মধ্যে কি মাহাত্ম্য রয়েছে, তা হলে তোমরা হাঁটুতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই নামাজে হাজির হতে। [এটাও জেনে রাখ] নামাজের প্রথম সারি ফেরেশ্‌তাদের সারির তুল্য। যদি তোমরা এর ফজিলত সম্পর্কে জানতে তা হলে কার আগে কে আসবে চেষ্টা করতে। [আরও জেনে রাখ] কোনো ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে একত্রে নামাজ পড়া

وَحْدَهٗ وَصَلٰوتُهٗ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهٖ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

তার একাকী নামাজ পড়া হতে উত্তম। আর তার দুই ব্যক্তির সাথে নামাজ পড়া, এক ব্যক্তির সাথে নামাজ পড়া হতে উত্তম। এভাবে নামাজের লোক যতই অধিক হবে, ততই তা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রিয়তর হবে। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** প্রথম সারিতে স্থান লাভের জন্য পূর্বেই মসজিদে আসা উচিত। পরে এসে প্রথম সারির ফজিলত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ ঠেলে সামনের সফে যাওয়া পাপের কাজ। এরূপভাবে প্রথম এসে প্রথম সারিতে জায়গা খালি রেখে পিছনে গিয়ে বসাও গুনাহ্। তবে সামনের সফে খালি জায়গা থাকলে এমতাবস্থায় লোক ঠেলে সামনের সারিতে গেলে গুনাহ্ হবে না। কোনো ব্যক্তি মসজিদে পরে এসে সামনের সারি হতে কাউকে সরিয়ে উক্ত স্থানে নিজে বসা বা সামনের সারির কোনো ব্যক্তি স্বয়ং পিছনের সারিতে গিয়ে পরে আগমনকারীকে নিজের স্থানটি ছেড়ে দেওয়া উভয়টি অনুচিত। কেননা, সম্মুখের সারির লোকটি নিজের স্থানটি ছেড়ে পিছনে চলে গেলে পক্ষান্তরে এটাই বুঝা যায় যে, তার অধিক ছওয়াবের প্রয়োজন নেই। আর 'কোনো ব্যক্তির ছওয়াব বা নেকের প্রয়োজন নেই' এমন ধারণা পোষণ করা গুনাহ্। অবশ্য কোনো সম্মানিত ব্যক্তির একরামের উদ্দেশ্যে উঠলে তা জায়েজ হবে।

اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ-**দ্বারা উদ্দেশ্য :**

১. প্রকাশ থাকে যে, اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ-এর মধ্যে এক ওয়াক্তের উল্লেখ- এ হাদীসেই রয়েছে। আর তা হলো ফজরের নামাজ। এর উপর ভিত্তি করে হাদীস বিশারদগণ বলেন, দ্বিতীয় ওয়াক্ত ইশা-ই হবে। কেননা ফজর হলো দিনের প্রথম নামাজ, আর দিনের শেষ নামাজ হলো ইশার নামাজ।

২. অথবা هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ দ্বারা ফজরের দু' রাকাত ফরজ নামাজকে বুঝানো হয়েছে।

৩. অথবা ফজরের দু' রাকাত সুন্নত ও দু' রাকাত ফরজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٠٠٠ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

১০০০. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- এমন তিন ব্যক্তি- চাই তারা লোকালয়ে থাকুক বা জন-বিরল জঙ্গলে থাকুক- যারা নিজেদের মধ্যে জামাত কায়েম করে না, নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান আধিপত্য লাভ করবে। সুতরাং তোমরা জামাত কায়েম করবে। কেননা, দলছুট মেষকেই নেকড়ে বাঘ ভক্ষণ করে [অর্থাৎ জামাত ছাড়া একা একা নামাজ পড়লেই শয়তানের খপ্পরে পড়তে হয়]। -[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ **-এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ثَلَاثَةٍ শব্দ দ্বারা তিনজন পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। এতে মহিলা অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা মহিলাদের জামাতে শরিক হওয়া এবং ইমামতি করা মাকরূহ। এখানে তিন সংখ্যা উল্লেখের মাধ্যমে শুধু তিনজনের মাঝেই জামাতকে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর বেশি হলে ছওয়াবও বেশি হবে। সম্ভবত গ্রামের স্বল্প লোকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ثَلَاثَةٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ **-এর ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ এ বাক্যে জামাতবিহীন নামাজ আদায়কারীকে দলছুট মেষের সাথে তুলনা করেছেন। মেষের পাল ছেড়ে যে মেষ একাএকা বিচরণ করে সে এক সময় রাখালের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। ফলে অনায়াসেই নেকড়ে বাঘ তার উপর আক্রমণ করতে পারে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি জামাত পরিহার করে একা একা নামাজ পড়ে, অল্পতেই সে শয়তানের কু-প্ররোচণার খপ্পরে পতিত হয় এবং শয়তান তার নামাজ নষ্টের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। একসময় দেখা যায় সত্যই তার নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। কেননা শয়তান সর্বদাই মানুষের ভাল কাজের পিছনে লেগে থাকে।

اَلْقَاصِيَةُ **-এর অর্থ :** اَلْقَاصِيَةُ 'আল-কাসীয়াহ্' অর্থ– ঐ মেষ-বকরি, যা রাখাল হতে দূরে এবং দল হতে বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করে। আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, কমপক্ষে তিন ব্যক্তি হলে অবশ্যই জামাত কায়েম করতে হবে এবং এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, নামাজের জামাত কায়েম করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিব।

وَعَنْ ١٠٠١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِيْ صَلّٰى - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِيْ)

১০০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের আযান শুনল অথচ এর অনুকরণ করে জামাতে হাজির হতে কোনো 'ওজর' তাকে বারণ করল না, [তথাপি সে যথারীতি জামাতে হাজির হলো না; বরং একা একা নামাজ পড়ল] তার একা একা পড়া নামাজ কবুল করা হবে না। সাহাবীগণ আরজ করলেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ] ওজর কি? রাসূল ﷺ বললেন, শত্রুর ভয় অথবা রোগ-ব্যাধি। –[আবূ দাউদ ও দারকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি বিনা কারণে জামাত পরিত্যাগ করে একাকী নামাজ পড়ে তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তির নামাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। এর অর্থ হলো, তার নামাজ পরিপূর্ণ হয় না এবং সে পূর্ণ ছওয়াব হতে বঞ্চিত হয়। অবশ্য নামাজের ফরযিয়াত তার আদায় হয়ে যায়। ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে বলেন, জামাতে নামাজ পড়া ফরজ; কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে জামাতে নামাজ পড়া ফরজ নয়। বড়জোর ওয়াজিব হতে পারে। কেননা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত হতে পারে না। পরিশেষে বলা চলে لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلٰوةُ দ্বারা জামাতের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٠٠٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوٰى مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ)

১০০২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন নামাজের ইকামত বলা হয় আর তোমাদের কেউ পায়খানা-প্রস্রাবের বেগ অনুভব করে, তখন সে যেন প্রথমে তার প্রয়োজন সেরে নেয়। –[তিরমিযী। আর ইমাম মালেক, আবূ দাউদ এবং নাসায়ীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١٠٠٣ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَفْعَلَهُنَّ لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهٗ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرْ فِىْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يَسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحْوَهٗ)

১০০৩. **অনুবাদ :** হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিনটি কাজ করা কারো জন্য বৈধ নয়– (১) এমন কোনো ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে না, যে নিজের জন্য নির্দিষ্টভাবে দোয়া করবে, অথচ তাদের জন্য দোয়া করবে না। যদি কেউ এরূপ করে তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করল। (২) কেউ কারো অন্দর মহলের দিকে তাকাবে না, তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণের পূর্বে, যদি সে এরূপ করে, তা হলে সে তাদের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করল। (৩) এবং কোনো ব্যক্তি প্রস্রাব বা পায়খানার বেগ ধারণ করে আছে, এমতাবস্থায় নামাজ পড়বে না। যতক্ষণ না সে তা হতে অবসর হয়ে হালকা হয়। –[আবূ দাউদ। তিরমিযীও এর এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَقَدْ خَانَهُمْ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য বাক্যটি উক্ত হাদীসে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে যে, ইমাম সাহেব শুধু নিজের জন্য দোয়া করল কিন্তু অন্যান্য মুসল্লীদের জন্য দোয়া করল না, সে যেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। কেননা ইমাম মুসল্লিদের দ্বারাই নির্বাচিত এবং তিনি তাদেরই প্রতিনিধি। আর মুসল্লিদের তুলনায় ইমাম আল্লাহর নৈকট্য লাভে অগ্রগামী। সুতরাং সে যদি মুসল্লিদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের জন্যই আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তা হলে সে যেন মুসল্লিদের প্রদত্ত আমানতের খেয়ানত করল। অতএব তাকে বিশ্বাসঘাতক বলাই যুক্তিযুক্ত।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, যদি কেউ কারো ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে তাকাল অথবা প্রবেশ করল, সে যেন তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। কেননা অপরিচিত ব্যক্তি কারো ঘরে অনুমতি ব্যতীত তাকানো শরিয়ত সম্মত নয়। এটা একপ্রকার হক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সে ব্যক্তি হক্কুল ইবাদ পালন না করার অপরাধে অপরাধী হবে। হাদীসের ভাষায় এ ব্যক্তিকেও বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে।

وَعَنْ ١٠٠٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُؤَخِّرُوا الصَّلٰوةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهٖ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

১০০৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা নামাজকে বিলম্ব করবে না। চাই খাওয়া-দাওয়ার জন্য হোক বা অন্য কোনো [পার্থিব] প্রয়োজনে হোক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَ دَفْعُهُمَا দুই হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার উত্তর : আলোচ্য لَاتُؤَخِّرُوا الصَّلٰوةَ لِطَعَامٍ হাদীসাংশের সাথে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত ৯৮৯ নং হাদীসটির দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কারণ তাতে فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ বাক্যটি রয়েছে। অর্থাৎ সন্ধ্যাকালীন খাবারের জন্য জামাত বর্জন করা জায়েজ আছে। অথচ আলোচ্য হাদীসটিতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর সমাধানে বলা যায় যে, (ক) হযরত জাবের (রা.) -এর হাদীসটিতে তাবিল করা হয়েছে لَاتُؤَخِّرُوا الصَّلٰوةَ অর্থ لَاتُؤَخِّرُوا الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا لِلطَّعَامِ অর্থাৎ আহারের জন্য নামাজ কাজা করো না। (খ) لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلٰوةَ অর্থ– لَاتُؤَخِّرُوا الصَّلٰوةَ لِغَرَضِ الطَّعَامِ لٰكِنْ اِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ اَخِّرُوْهَا لِلطَّعَامِ অর্থাৎ আহারের জন্য খানার আশায় আশায় বসে থেকে নামাজ কাজা করবে না। যদি খানা এসে যায়, তবে বিলম্ব করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلٰوةِ اِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ اَوْ مَرِيْضٌ اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ لَيَمْشِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى يَاْتِىَ الصَّلٰوةَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّىْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِىْ بَيْتِهٖ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ اِلٰى مَسْجِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهٗ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتٰى بِهٖ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০০৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের সাহাবীদল সম্পর্কে জানি [তারা কখনও জামাত ত্যাগ করেন না] নামাজের জামাত তরক করে কেবল প্রকাশ্য মুনাফিকরাই অথবা রোগী। আর আমি এটাও দেখেছি যে, রোগী দুই ব্যক্তির মধ্যখানে [তাদের সাহায্যে] পথ চলেছে যাতে মসজিদে নামাজ লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে 'সুনানে-হুদা' শিক্ষা দিয়েছেন। আর আযান হয় এমন মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা 'সুনানে হুদা'রই অন্তর্গত।

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আগামীকাল [কিয়ামতে] পূর্ণ মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালবাসে; সে যেন এই পাঞ্জেগানা নামাজের [জামাতের] প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে যেখানে এই আযান দেওয়া হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবীর জন্য 'সুনানে হুদা' নির্ধারণ করেছেন। আর এ পাঞ্জেগানা নামাজ জামাতে আদায় করাও সুনানে হুদা'রই অন্তর্গত। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে-বাড়িতে নামাজ আদায় কর, যেভাবে এ জামাত বরখেলাফকারী তার ঘরে আদায় করে, তা হলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত ত্যাগ কর তা হলে নিশ্চয়ই গোমরাহ্ হয়ে যাবে। [অতঃপর তিনি বললেন,] আর যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ করে এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করে এ মসজিদসমূহের মধ্যে কোনো মসজিদের দিকে গমন করে, তাহলে সে যে সকল পদক্ষেপ দেয় তার প্রত্যেক কদমেই তার জন্য আল্লাহ একটি নেকী নির্ধারণ করেন এবং এর দ্বারা তার একটি মর্যাদা উন্নত করেন, এতদ্ব্যতীত তা দ্বারা তার একটা গুনাহও মার্জনা করে দেন। খোদার কসম! আমি তাদেরকে [সাহাবীদলকে] দেখেছি [তারা কখনও জামাত ছাড়তেন না] জামাত ছাড়ে কেবল প্রকাশ্য-মুনাফিকরাই। নিশ্চয়ই পূর্বে এরূপ ব্যক্তিও দেখা যেত যাকে দুই ব্যক্তির মধ্যখানে তাদের গায়ে ভর দিয়ে মসজিদে আনা হতো, যাতে তাকে নামাজের ছকে দাঁড় করানো যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের ফলে একটি প্রশ্ন হয় যে, মুনাফেকী প্রকাশ্যভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে শরয়ী কোনো বিধান প্রয়োগ করা হয় না কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত দুর্বল ঈমানদারগণ অপবাদ রটাতে পারে– إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ "মুহাম্মদ ﷺ আপন লোকদেরকে হত্যা করছেন"। যেমন রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ার দিন মক্কা আক্রমণ করেননি। কারণ এ সময় মক্কায় মুসলমানগণও ছিল। তখন অন্যান্যভাবেও যদি কোনো মুসলমান মারা যেত তবুও কাফিররা অপপ্রচার করতে সুযোগ পেত যে,– 'মুহাম্মদ ﷺ তার সাথীদেরকে হত্যা করেছেন।'
দ্বিতীয়ত এটা রাসূল ﷺ-এর উন্নত চরিত্রের কারণও হতে পারে, যেমন– قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ বাক্যে عُلِمَ টি ظَنَّ -এর অর্থে। অর্থাৎ সাহাবীগণ কখনো কাউকে কট্টর মুনাফিক বলতেন না; বরং কখনো ধারণা করতেন মাত্র। কেননা ঈমান থাকা সত্ত্বেও অলসতা বশত تَرْكِ جَمَاعَتْ হতে পারে। এ জন্য মুনাফিকদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন কিন্তু জ্বালাননি।

سُنَنُ الْهُدٰى -এর অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে **'সুনানে হুদা' শিক্ষা** দিয়েছেন। আল্লামা তীবী (র.) 'সুনানে হুদা'-র অর্থ বর্ণনায় বলেন– هُوَ طَرِيْقُ الْهُدٰى وَالصَّوَابِ অর্থ– সুনানে হুদা হলো সত্য ও সঠিক পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ গোটা জীবনেই মানুষদেরকে সরল সঠিক ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ জন্যই ধরার বুকে প্রেরণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাকে 'রাহমাতুল লিল আলামীন' তথা বিশ্ব জগতের 'রহমত' হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ কর তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এ বাক্যে সুন্নত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। মূলত এর দ্বারা একটি সামগ্রিক দিক নির্দেশনাই উদ্দেশ্য। শুধু রাসূল ﷺ-এর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বুঝানোই উদ্দেশ্য নয়। রাসূল ﷺ-এর তরিকা মানেই হলো আল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত পথ। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ পরিহার করা আল্লাহর নির্দেশিত পথ পরিহার করারই নামান্তর। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে।

১০০৬ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْلَا مَا فِى الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ اَقَمْتُ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَاَمَرْتُ فِتْيَانِىْ يُحَرِّقُوْنَ مَا فِى الْبُيُوْتِ بِالنَّارِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১০০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি ঘরসমূহে স্ত্রীলোকগণ এবং সন্তান-সন্ততিগণ না থাকত তবে আমি এশার নামাজের জামাত কায়েম করতাম। অতঃপর আমার যুবকদেরকে আদেশ দিতাম, যেন ঘরে যা আছে সবকিছু তারা আগুন দ্বারা জ্বালিয়ে দেয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীস থেকেও জামাতের অপরিহার্যতা বুঝা যায়।

১০০৭ وَعَنْهُ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ اِذَا كُنْتُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَلَا يَخْرُجْ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُصَلِّىَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১০০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যখন কেউ মসজিদে থাকবে, আর এমতাবস্থায় নামাজের জন্য আযান দেওয়া হবে তখন তোমাদের কেউ যেন মসজিদ হতে বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ না নামাজ শেষ করে। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ **আযানের পর মসজিদ হতে বের হওয়ার বিধান :** আযান দেওয়ার পর মসজিদ হতে বের হওয়ার বিষয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা নিম্নরূপ—

আবূ দাউদ হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব তাবেয়ী হতে একটি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ اِلَّا مُنَافِقٌ الخ অর্থাৎ আযানের পর মসজিদ হতে মুনাফিকই বের হয়ে থাকে। অবশ্য যদি কেউ কোনো প্রয়োজনে বের হয় এবং পুনরায় ফিরে আসার নিয়ত করে তখন তার কোনো দোষ হবে না এবং আলিমদের কাছে সাঈদ ইবনে মুসায়্যিবের মুরসাল গ্রহণীয়। কিছু সংখ্যক আলিম আরো বলেছেন, যদি সে ব্যক্তি অন্য কোনো মসজিদের ইমাম হয় কিংবা তার দ্বারা অন্য কোনো স্থানে জামাতের এন্তেজাম বা আয়োজন হয়ে থাকে, তখন আমাদের মাযহাব মতে এমন ব্যক্তির চলে যাওয়া মাকরূহ বা নিষেধ নয়। আর যদি সে ব্যক্তি আগে একবার নামাজ পড়ে থাকে এমন ব্যক্তিরও আযানের পর মসজিদ হতে চলে গেলে কোনো দোষ হবে না। কেননা ফজর আসরের পর নফল পড়া মাকরূহ, মাগরিবের পর তিন রাকাত নফল পড়া মাকরূহ। আর জোহর ও এশা একবার পড়ার দ্বারা দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ হয়ে গেছে। অবশ্য এ ধরনের লোককে একামত শুরু হওয়ার পূর্বেই চলে যেতে হবে। অন্যথা একামত শুরু হওয়ার পর বের হলে প্রকাশ্যে জামাত তরক করার হুকুম তার উপর বর্তাবে। এতে অন্যান্য মুসল্লিগণ তার প্রতি খারাপ ধারণা করবে।

١٠٠٨ - وَعَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ (رحـ) قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا اُذِّنَ فِيْهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ . (رواه مسلم)

১০০৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবুশ শা'ছা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আযান দেওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে গেল। এ দেখে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, এ লোকটি আবুল কাসেম হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে অমান্য করল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ **হাদীসের পটভূমি :** ইমাম বুখারী (র.) ব্যতীত অনেক মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসটি হযরত আবুশ শা'ছা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে, একদা কয়েকজন সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে আসর নামাজের আযান দেওয়া হলে তখন এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে গেল ফলে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসেম অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে অমান্য করল।

١٠٠٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَهُ الْاَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ . (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ)

১০০৯. অনুবাদ : হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে থেকে আযান পেয়েছে অর্থাৎ মসজিদে থাকতেই আযান দেওয়া হয়েছে, অতঃপর সে বের হয়ে পড়েছে কিন্তু অতীব প্রয়োজনীয় কোনো কাজে বের হয়নি, আর পুনরায় মাসজিদে ফিরে আসার ইচ্ছাও পোষণ করে না তবে সে ব্যক্তি মুনাফিক। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهُوَ مُنَافِقٌ **-এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আযানের পর নামাজ না পড়ে মসজিদ হতে বের হয়ে গেল কোনো প্রয়োজন ব্যতীত এবং মসজিদে ফিরে আসারও ইচ্ছা নেই সেই ব্যক্তি মুনাফিক। এখানে মুনাফিক বলতে প্রকৃত মুনাফিক বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সে যে গুনাহগার এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অথবা বলা যায় যে, সে ব্যক্তি জামাত তরক করার ক্ষেত্রে মুনাফিকের ন্যায় কাজ করেছে।

وَعَنْ ١٠١٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ . (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيْ)

১০১০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনেছে অথচ জামাতে হাজির হয়নি, তার নামাজ হয়নি। কিন্তু যদি তার কোনো গ্রহণীয় ওজর থাকে তা হলে তার একাকী নামাজ পড়া কবুল হবে। –[দারাকুতনী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِجَوَابِ الْاَذَانِ وَاَقْسَامِهٖ **আযানের জবাবের অর্থ ও তার প্রকারভেদ :** আযানের জবাব দু' প্রকারে হতে পারে। একটি قَوْلِيْ এবং অপরটি فِعْلِيْ কাওলী হলো, হাই'আলাতাইন ব্যতীত আযানের বাকি বাক্যগুলো মুয়াজ্জিন যা বলে শ্রোতা তার জবাবে অবিকল সেই বাক্যগুলোই মুখে উচ্চারণ করবে এবং হাই'আলাতাইনের জবাবে লা হাওলা বলবে। আর এটা বলা সুন্নত এবং ফে'লী জবাব হলো কোনো ওজর না থাকলে মসজিদে তথা জামাতে হাজির হওয়া। এটা ওয়াজিব। আর হাদীসের বাক্য 'যে জবাব দেয়নি' এর অর্থ– যে [নামাজে] মসজিদে উপস্থিত হয়নি তার নামাজ পরিপূর্ণ হয়নি।

وَعَنْ ١٠١١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ (رضـ) قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ وَاَنَا ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَهَلْ تَجِدُ لِيْ مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَيَّ هَلًا وَلَمْ يُرَخِّصْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১০১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনায় বহুল পরিমাণে সরীসৃপ ও হিংস্র জন্তু রয়েছে, অথচ আমি একজন অন্ধ। আপনি কি আমাকে [অপারগ মনে করে নিজ গৃহেই নামাজ পড়ার] অনুমতি প্রদান করবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি হাইয়্যা আলাস সালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ শুনতে পাও? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হলে তুমি উপস্থিত হও, তাকে তিনি অনুমতি দিলেন না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

وَعَنْ ١٠١٢ اُمِّ الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغْضَبَكَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا اِلَّا اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০১২. অনুবাদ : হযরত উম্মে দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার স্বামী আবুদ দারদা (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে আসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে আপনাকে এতটা রাগান্বিত করল? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের পরিচয় এটা ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে করি না যে, তারা সমবেতভাবে [জামাতে] নামাজ পড়ে। [কিন্তু আজ দেখছি তার কতেক উম্মত জামাত ত্যাগ করে চলে গেছে।]–[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاللّٰهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ الخ **-এর অর্থ :** আল্লামা তীবী বলেন, এ বাক্যটি مَا اَغْضَبَكَ -এর উত্তরে বলা হয়েছে। এখানে "مَا" শব্দটি اِسْتِفْهَامْ এবং وَاوْ কসমের জন্য এসেছে। হযরত একবার আবুদ দারদা (রা.) রাগত অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তাঁর রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, এমন একটি কাজের পরিপ্রেক্ষিতে রাগান্বিত হয়েছি

যা দীনে মুহাম্মদীর মৌলিক কোনো বিষয় না হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম এবং যার ছওয়াব অত্যধিক। তা হলো জামাতে নামাজ আদায় করা। আর এটা হলো উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ পরিচয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো উম্মতে মুহাম্মদীর কেউ কেউ এখন জামাত ত্যাগ করতে চলেছে। আর এ জন্যই আমি মনে মনে এত রাগান্বিত।

১০১৩ - وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ (رح) قَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) فَقَدَ سُلَيْمَانَ ابْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَاَنَّ عُمَرَ غَدَا اِلَى السُّوْقِ وَمَسْكَنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوْقِ فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ اُمِّ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهَا لَمْ اَرَ سُلَيْمَانَ فِى الصُّبْحِ فَقَالَتْ اِنَّهٗ بَاتَ يُصَلِّىْ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَقَالَ عُمَرُ لَاَنْ اَشْهَدَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فِىْ جَمَاعَةٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَقُوْمَ لَيْلَةً ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০১৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবূ বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আবী হাছমাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) [আমার পিতা] সুলায়মান ইবনে আবূ হাছমাকে ফজরের নামাজে দেখতে পেলেন না। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) সাত সকালে বাজারের অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সুলায়মানের ঘর মাসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। যখন তিনি সুলায়মানের মাতা বিবি শাফার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি তাকে [বিবি শাফাকে] জিজ্ঞেস করলেন, ফজরের নামাজে সুলায়মানকে তো দেখলাম না? তিনি বললেন, সে তো সারারাত নামাজ পড়েছে, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, অবশ্যই ফজরের জামাতে আমার উপস্থিত হওয়া আমার নিকট সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ [নফল] পড়ার চেয়ে অধিক প্রিয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায় যে, রাত জেগে নফল নামাজ বা তাহাজ্জুদ পড়া যদি ফজরের নামাজ কাজা বা জামাত হারানোর কারণ হয় তা হলে নফল বা তাহাজ্জুদ ত্যাগ করাই উত্তম।

১০১৪ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১০১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আল-আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন দুই বা তদূর্ধ্ব লোক হলেই জামাত পূর্ণ হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমামের সাথে কমপক্ষে একজন মুক্তাদি হলেও জামাত হয়ে যায়।

১০১৫ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوْظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ اِذَا اسْتَاْذَنَكُمْ فَقَالَ بِلَالٌ وَاللّٰهِ

১০১৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত বেলাল ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন মহিলাগণ তোমার নিকট মসজিদে যেতে অনুমতি চায় তখন তাদেরকে যেতে নিষেধ করো না। যেন তারা মসজিদে নিজ অংশ লাভ করতে পারে। তখন বেলাল বললেন, আল্লাহর

لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ اَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ وَفِىْ رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ اُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

কসম! আমি তাদেরকে অবশ্যই নিষেধ করব। এটা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ [রাগান্বিত হয়ে] বললেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [তাদেরকে নিষেধ করো না] আর তুমি বলছ, "আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই নিষেধ করব"।

সালেমের বর্ণনায় আছে যে, তিনি বললেন, বেলালের কথা শুনে আমার পিতা আবদুল্লাহ তার উপরে রেগে গেলেন এবং তাকে খুব মন্দ বললেন। এমন ভর্ৎসনা করলেন, যা আমি আর কখনও শুনিনি। আর বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী শুনাচ্ছি; আর তুমি কি না বলছ "আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে নিশ্চয় নিষেধ করব"। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَ مَنَعَ بِلَالٌ اَنْ تَحْضُرَ النِّسَاءُ فِى الْجَمَاعَةِ **বেলাল মহিলাদেরকে মসজিদে গমন করতে বাধা দিলেন কেন?** হযরত বেলালের দৃঢ়তার সাথে স্ত্রীলোকদের মসজিদে গমনে বাধা দেওয়ার কথা প্রকাশ করাটা [নাউযুবিল্লাহ] রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মোকাবিলায় ধৃষ্টতা পোষণ করা নয়; বরং যখন মানুষের চরিত্রের অবক্ষয় এবং নানা ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদের জামানা পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন আর মহিলাদের ঘরের বাইরে গমনাগমন নিরাপদ নয়। অন্যথা হযরত আব্দুল্লাহ যে রাসূলের হাদীস বর্ণনা করেছেন, বেলালও তা স্বীকার করেন। তবে স্থান কাল বিশেষে মহিলাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত। আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, স্ত্রীলোকদের নামাজের উদ্দেশ্যে বর্তমান যুগে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ, ওলামাগণও এ মতই ব্যক্ত করেছেন।

اَلتَّعَارُضُ وَ دَفْعُهَا **দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে মাসজিদে যেতে বারণ করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তাবেয়ী বেলাল (র.) ব্যক্তিগত অভিমত অনুযায়ী মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এখন বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের সাথে রাসূল ﷺ-এর হাদীসের বিরোধ হয়ে যায়। এর সমাধান হলো, তাবেয়ী বেলাল (র.) মানুষের চারিত্রিক অধঃপতন, সামাজিক অবক্ষয় এবং নারীঘটিত বিভিন্ন ফিতনা-ফ্যাসাদের পরিপ্রেক্ষিতে এ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত আয়েশা (রা.)-এর অভিব্যক্তির মধ্যে প্রতিভাত হয়ে উঠে। তিনি বলেন, لَوْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا فِىْ مُسْلِمٍ অর্থাৎ, রাসূল ﷺ যদি রমণীদের দ্বারা সংঘটিত ফিতনা-ফ্যাসাদ প্রত্যক্ষ করতেন তা হলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করতেন। অতএব যুগ সন্ধিক্ষণের বিবেচনায় রাসূল ﷺ-এর হাদীস তাবেয়ী বেলালের অভিমতের পরিপন্থি নয়। এর দ্বারা রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতা বুঝায় না।

وَعَنْ ١٠١٦ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلٌ اَهْلَهُ اَنْ يَّاْتُوا الْمَسَاجِدَ فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَاِنَّا نَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ هٰذَا قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبْدُ اللّٰهِ حَتّٰى مَاتَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১০১৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি যেন তার পরিবারকে মসজিদে আসতে বাধা না দেয়।' এটা শুনে হযরত আব্দুল্লাহর এক পুত্র [বেলাল] বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে বাধা দেব'। তখন হযরত আব্দুল্লাহ রাগান্বিত হয়ে বললেন, আমি তোমাকে শুনাচ্ছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, আর তুমি বল এটা? বর্ণনাকারী মুজাহিদ বলেন, তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে কথা বলেননি। -[আহমদ]

بَابُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ

পরিচ্ছেদ : কাতার সোজা করা

জামাতে নামাজ পড়ার জন্য কাতার সোজা করার গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্ব যুগের উম্মতের ইবাদতের কাতার ছিল গোলাকার, উম্মতে মুহাম্মদীর নামাজের কাতার হলো লম্বালম্বি। ইসলাম একটি শৃঙ্খলার নাম। বিশৃঙ্খলতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতা ইসলাম সমর্থন করে না। নামাজের কাতার সোজা করার মধ্যে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। যেমন হাদীসে এসেছে– فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ কাতার সোজা করা নামাজেরই সৌন্দর্য।

নামাজের কাতার সোজা করার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, কারো মতে এটা সুন্নত। তাঁরা উপরোক্ত হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন। অপর একদলের মতে ওয়াজিব, তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন যে,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلٰوةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

আরেক দলের মতে এটা মোস্তাহাব। তবে জামাতের সারিকে সোজা করা যে, ইমামের উপর ওয়াজিব এটা দুররে মুখতার গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, আর এটা পরিত্যাগ করা মাকরূহে তাহরীমী, চাই ইমাম নিজে করুন বা অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নিন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠١٧ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُّكَبِّرَ فَرَاٰى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০১৭. **অনুবাদ :** হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সারিসমূহ সোজা করতেন এমনভাবে, যেন তার সাথে তিনি তীর সোজা করছেন। তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ না তিনি বুঝতে পারতেন যে আমরা বিষয়টি তার নিকট হতে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। একদা তিনি ঘর হতে বের হয়ে আসলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন, এমনকি তাকবীরে তাহরীমা বলতে উদ্যত হলেন, এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি হতে সম্মুখে সিনা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা তোমাদের সারি সোজা করে দাঁড়াবে, নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنٰى تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ **কাতার সোজা করার অর্থ :** প্রকাশ থাকে যে, تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ বা কাতার সোজা করার দু'টি অর্থ হতে পারে– প্রথমতঃ এটা দ্বারা হয়তো সফে যারা আছে তাদেরকে সোজাভাবে একমুখী হয়ে দাঁড়ানোর কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাতারের মধ্যে যেই দোষত্রুটি আছে যেমন ফাঁক থাকা অথবা কাতার আকাবাঁকা হওয়া ইত্যাদি দোষত্রুটি মুক্ত করার কথা বুঝানো হয়েছে। আর এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ এ হাদীংশের মধ্যে।

كَأَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ **-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যটিকে তাশবীহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এ বাক্যটি তৎকালীন আরবের একটি প্রচলিত বাগধারা। اَلْقِدَاحُ অর্থ তীর। অর্থাৎ একেবারে তীরের মতো কাতার সোজা করা। কেননা তীর দ্বারা

উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে লক্ষ্যবস্তু স্থির করে তা সোজা করে নিক্ষেপ করা অপরিহার্য। তদ্রূপভাবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে হলে কাতার সোজা করে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা উচিত।

لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ-এর ব্যাখ্যা : মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের নামাজের সারিসমূহ সোজা করে দাঁড়াবে নতুবা আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। মুখমণ্ডলে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

প্রথমত বাক্যটি হয়তো তার হাকীকী অর্থ প্রদান করবে। অর্থাৎ তাদের মুখমণ্ডল যেখানে রয়েছে তথা হতে পরিবর্তন করে গর্দানের উপর স্থাপন করা হবে।

দ্বিতীয়ত এর দ্বারা মাজাযী বা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। ইমাম নববী বলেন, এর অর্থ হলো যারা কাতার সোজা করবে না তাদের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অন্তরের মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে–

لِاَنَّ مُخَالَفَتَهُمْ فِى الصُّفُوْفِ مُخَالَفَةٌ فِىْ ظَوَاهِرِهِمْ وَاخْتِلَافُ الظَّوَاهِرِ سَبَبٌ لِاخْتِلَافِ الْبَوَاطِنِ -

অর্থাৎ তাদের কাতারের পার্থক্য তাদের প্রকাশ্য পার্থক্যেরই পরিচায়ক আর প্রকাশ্য পার্থক্য হলো আভ্যন্তরীণ পার্থক্যের কারণস্বরূপ।

তৃতীয়ত এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তাদের মুখমণ্ডলের আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া হবে।

وَعَنْ ١٠١٨ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهٖ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ) وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ اَتِمُّوا الصُّفُوْفَ فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ .

১০১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাজের একামত বলা হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পিছনের দিকেও দেখতে পাই। –[বুখারী]

বুখারী ও মুসলিম উভয়টির সম্মিলিত বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের সফসমূহকে পূর্ণ কর। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখতে পাই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ–এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ পিছনেও সম্মুখের ন্যায়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পেতেন। এ কথার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

১. রাসূল ﷺ বলেছেন فَاِنِّىْ اَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ এটা প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই দর্শন স্বাভাবিকতার পরিপন্থি, নিয়ম বহির্ভূত প্রকৃত অনুভূতি ছিল। আর এ জন্যই ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীসটিকে আলামতে নবুয়ত অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম আহমদ (র.) এবং অন্যান্যরা এ একই মত ব্যক্ত করেছেন।

২. হয়তো বা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখের চক্ষু দ্বারা পিছনেও সমভাবে দেখতেন, যা ছিল তাঁর মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ। এ অর্থে হাদীসটি এর হাকীকী অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। আল্লামা ইবনুল মুনায়্যির বলেন, এর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই।

৩. অথবা বলা যেতে পারে যে, হাদীসটি মাজাযী অর্থে প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ এলহামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনে দেখতে পেতেন।

৪. অথবা বলা যেতে পারে যে, নবী করীম ﷺ-এর পিছনেও সম্মুখের ন্যায় চক্ষু ছিল যার দ্বারা তিনি দর্শন করতে পারতেন।

كَمَا ذَكَرَ مُخْتَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بَيْنَ كَتِفِهٖ عَيْنَانِ مِثْلَ سَمِّ الْخِيَاطِ فَكَانَ يَبْصُرُ بِهِمَا وَلَا يَحْتَجِبُ لَهُمَا الثِّيَابُ . (كَمَا فِى الْعَيْنِىْ)

وَعَنْهُ ١٠١٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) اِلاَّ اَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ .

১০১৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা নামাজের সারিসমূহকে সোজা কর। কেননা সারি সোজা করা নামাজ প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত। –(বুখারী ও মুসলিম) আর মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, সফ সোজা করা নামাজ পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ **-এর ব্যাখ্যা :** মিরকাত গ্রন্থে مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ -এর ব্যাখ্যা বলা হয়েছে مِنْ اِتْمَامِهَا وَاِكْمَالِهَا অর্থাৎ নামাজের কাতার সোজা করা তা পরিপূর্ণ হওয়ারই পূর্বশর্ত। অর্থাৎ নামাজ শুদ্ধ ও সহীহ হওয়ার জন্য কাতার সোজা করা অপরিহার্য।

অথবা নামাজ শুদ্ধ ও সুন্দর হওয়ার যে সমস্ত বিধি-বিধান রয়েছে নামাজের কাতার সোজা করাও তর অন্তর্ভুক্ত, যেমনিভাবে اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ আল্লাহর এ বাণীর মধ্যে নামাজের যাবতীয় আরকান, আহকাম, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ١٠٢٠ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلٰوةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُولُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ اِخْتِلَافًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২০. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে [দাঁড়ালে] আমাদের বাহুমূলসমূহ স্পর্শ করে পরস্পর মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, তাহলে তোমাদের অন্তরসমূহও প্রভেদ হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা প্রবীণ ও বিজ্ঞ তারাই যেন আমার কাছাকাছি অর্থাৎ প্রথম সারিতে দাঁড়ায়। অতঃপর যারা বয়স ও বিজ্ঞতায় তাদের কাছাকাছি তারা দাঁড়ায়, তারপর বয়স ও জ্ঞান কম অনুসারে তৎপরবর্তীগণ দাঁড়ায়। আবূ মাসউদ দুঃখ করে বলেন, আজ তোমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিভিন্নমুখী। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ **-এর অর্থ :** আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্তর অঙ্গসমূহের অধীন। যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা হবে, তখন অন্তরেরও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। অন্তরে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, আর এ বিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও দেখা দেবে। কারণ অন্তর হলো বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালক। প্রকৃতপক্ষে অন্তর হলো নেতা এবং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর অধীন। আর অন্তর যা করতে চায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাই করে। অন্তর বিশুদ্ধ হলে বাহ্যিক অঙ্গের কার্যাবলি বিশুদ্ধ হতে বাধ্য। যেন শাসক স্থিতিশীল হলে প্রজাগণের মধ্যেও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখযোগ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন–

اَلَا اِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

সাবধান! তোমাদের দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে যখন তা শুদ্ধ হয়ে যায় তখন সর্বাঙ্গই সঠিকভাবে কাজ করে, আর তাতে যখন বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তখন সর্বাঙ্গে বিপর্যয় দেখা দেয়। সেই মাংসপিণ্ডটি হলো কলব বা হৃদপিণ্ড। সুতরাং বাহ্যত এ

হাদীসের সাথে উপরোল্লিখিত আবূ মাসউদ আনসারী বর্ণিত হাদীসের বিরোধ দেখা যাচ্ছে। অতএব এর সমাধান হলো, প্রকৃতপক্ষে অন্তরই আধিপত্যকারী, অন্তরই সকল কাজের উৎস। তবে অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে এক অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম সম্পর্ক রয়েছে। যার ফলে একে অপরের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়। যেমন– প্রজাগণ অকারণে বিদ্রোহ করলে শাসকের মন কিছুটা প্রভাবিত হয়, কখনও শাসক দুর্বল হন বা ক্ষিপ্ত হন। অনুরূপভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দ্বারা অন্তরও প্রভাবিত হয়। যেমন কোনো দৃশ্য যদিও চোখ দর্শন করে, কোনো সুমিষ্ট স্বর যদিও কান শ্রবণ করে তবু এটা অন্তরের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। যদিও কার্যাবলির উপরে অন্তরেরই একক আধিপত্য থাকে।

أُولُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهٰى-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে 'উলুল আহলাম ওয়ান নুহা' শব্দ এসেছে। 'আহলাম' ও 'নুহা'-এর একই অর্থ, অর্থাৎ জ্ঞানবান। ইবনে সায়্যেদুন্নাস (র.) বলেন, সমার্থক শব্দ দু'টি পাশাপাশি আসাতে এর অর্থ হবে বিভিন্ন। যথা– প্রবীণ ও জ্ঞানবান। প্রবীণ, যারা পরিপক্ক বয়সের কারণে জ্ঞানলাভ করেছেন; আর জ্ঞানবান, যারা প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে জ্ঞানলাভ করেছেন।

ইমাম নববী বলেন, প্রবীণ ও জ্ঞানবানদেরকে প্রথম সারিতে এবং প্রবীণত্ব ও জ্ঞানক্রম অনুসারে পরবর্তী সারিগুলোতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে; এ জন্য যে, ইসলামের মূল বৈশিষ্ট্য শৃঙ্খলা বজায় থাকে। মর্যাদাক্রম অনুসারে নেতৃত্বের ধারা চলতে থাকে। এটা ছাড়াও কখনো কখনো ইমাম তাঁর নিকটবর্তী সারির উপরে নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। ইমামের ভুল হলে সম্মুখের সারির মুসল্লিগণই প্রথম লোকমা দিয়ে থাকেন। ইমামের অপ্রত্যাশিতভাবে অজু বিনষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট পিছনের সারি হতেই ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে ইত্যাদি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবীণ ও জ্ঞানবান লোকদেরকে সম্মুখের সারিতে এবং তৎপরবর্তী সারিগুলোতেও বয়ঃ ও জ্ঞানক্রম অনুসারে দাঁড়াতে বলেছেন।

حُكْمُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ কাতার সোজা করার বিধান : নামাজের কাতার সোজা করার হুকুমের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

আল্লামা ইবনে হাযম বলেন, কাতার সোজা করা ফরজ। তিনি দলিল হিসাবে فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلٰوةِ এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, নামাজ কায়েম করা যেমনিভাবে ফরজ, তদ্রূপভাবে নামাজ কায়েম করতে যা কিছুর প্রয়োজন, সবই ফরজ। অবশ্য এ যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাতার সোজা করা সুন্নত। কেননা এটা নামাজ পরিপূর্ণ ও সুন্দর হওয়ার জন্য অপরিহার্য।

١٠٢١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلٰثًا وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃবৃদ্ধ প্রবীণ ও জ্ঞানবান তারাই যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়, অতঃপর যারা বয়সে ও জ্ঞানে তাদের কাছাকাছি তাঁরা দাঁড়ায়। এরূপে তিনি কথাটি তিন বার বলেছেন তারপর বললেন, সাবধান! মসজিদে বাজারের ন্যায় হৈ চৈ করা হতে বেঁচে থাকবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ-এর ব্যাখ্যা : إِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ এটা تَحْذِيْر-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ اِتَّقُوْا عَنْ هَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ আলোচ্য হাদীসটি দ্বারা آدَابُ عُبُوْدِيَّتْ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা অর্থ হলো বাজারে যেমন ছোট-বড়, ধনী-গরিবের কোনো তারতম্য থাকে না, ঠিক তেমনি নামাজে তোমরা এমন হয়ো না; বরং বড় বড়দের সাথে আর ছোট ছোটদের সাথে দাঁড়াবে।

১০২২. وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ رَأى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَصْحَابِهٖ تَاَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا وَأْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে নামাজে পিছনে থাকার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করলেন তখন তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও এবং আমার অনুসরণ কর, যাতে পশ্চাতের লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। একদল লোক সর্বদাই পিছনে থাকার মনোভাব পোষণ করে, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে [আপন রহমত ও বরকত হতে] পিছনে রাখেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَاَخُّرًا **-এর অর্থ :** تَاَخُّرًا পদ দ্বারা تَاَخَّرَ فِىْ صُفُوْفِ الصَّلٰوةِ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রথম সফে যোগদান না করা। অথবা تَاَخُّرًا দ্বারা تَاَخَّرَ عَنِ الْعِلْمِ উদ্দেশ্য। প্রথম অর্থানুযায়ী মর্মার্থ হবে– ওলামায়ে কেরাম যেন প্রথম কাতারে দাঁড়ায় যাতে তাঁরা যাহেরী আহকামের অনুসরণ করতে পারে। আর تَاَخُّرًا দ্বারা تَاَخَّرَ عَنِ الْعِلْمِ উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে, তোমাদের সকলেই যেন শরয়ী আহকাম শিখতে পারে। মোদ্দাকথা, ওলামায়ে কেরাম যেন প্রথম কাতারে দাঁড়ায়। কেননা তাঁরা রাসূল ﷺ -এর আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আর এতে অন্যদের জন্য সুবিধা হবে।

حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ **-এর ব্যাখ্যা :** যে সমস্ত লোক সর্বদা নামাজের পিছনের কাতারে দাঁড়াবার মনোভাব পোষণ করে, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত হতে দূরে সরিয়ে রাখবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য তারা অর্জন করতে পারবে না। আল্লামা নববী এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা আল্লাহর রহমত, বরকত, সুমহান মর্যাদা প্রভৃতি বস্তু হতে বঞ্চিত হবে।

১০২৩. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰنَا حَلْقًا فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عِزِيْنَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلٰى وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২৩. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং দেখলেন আমরা বৃত্তাকারে [গোল হয়ে] দলে দলে বসে আছি। তখন তিনি বললেন, তোমাদেরকে কেন পৃথক পৃথকভাবে দেখছি? এ ঘটনার পর আর একদিন তিনি আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, তোমরা কেন এমনভাবে সারিবদ্ধ হও না যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের নিকটে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তখন আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা প্রথমে আগের সারিগুলোকে পূর্ণ করে [এবং তারপর পরবর্তী সারিগুলো]। আর সারিতে একে অপরের সাথে মিশে দাঁড়ায়। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٠٢٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا شَرُّهَا اَوَّلُهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– পুরুষ লোকের [নামাজের] সারিসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সারি হলো প্রথম সারি, আর সর্বনিকৃষ্ট সারি হলো শেষ সারি। আর মহিলাদের সর্বোৎকৃষ্ট সারি হলো তাদের শেষ [পিছনের] সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট সারি হলো তাদের প্রথম সারি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** পুরুষদের প্রথম সারি উত্তম হওয়ার কারণ হলো, এতে ইমামের কেরাত শোনা এবং তার যাবতীয় কার্যক্রম নিকট হতে সরাসরি দেখার সুযোগ লাভ হয়। আর মহিলাদের সর্বশেষ সারি উত্তম হওয়ার কারণ হলো, এতে ফিতনা বিপর্যয় হতে বেঁচে থাকা এবং পর্দা রক্ষা করার মধ্যে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। সুতরাং নামাজের কাতারে মহিলাদের পিছনে হটানোর চেষ্টা করা উচিত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٢٥ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خِلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সারিসমূহে পরস্পর মিশে দাঁড়াও। সারিগুলোকে কাছাকাছি রাখ এবং তোমাদের ঘাড়গুলোকে সমভাবে সোজা রাখ। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে সারির ফাঁকে প্রবেশ করে, যেন কালো ভেড়ার বাচ্চা। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ **-এর অর্থ :** অর্থাৎ অহঙ্কার প্রকাশপূর্বক কেউ যেন উপরে না দাঁড়াও বরং সমানভাবে একীভূত হয়ে দাঁড়াও। কেননা اَعْنَاقِ শব্দটি এখানে এ অর্থেই প্রযোজ্য, কারণ মানুষ লম্বা এবং বেঁটে হয়, কাজেই উভয় কাঁধ বরাবর হতে পারে না।

كَاَنَّهَا الْحَذَفُ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাজের কাতারে ফাঁক থাকলে শয়তান কালো ভেড়ার বাচ্চার আকার ধারণ করে তাতে প্রবেশ করে। হেজাযে এক ধরনের ছোট ছাগলকে اَلْحَذَفُ বলা হয়। অথবা اَلْحَذَفُ এক ধরনের টিড্ডিকে বলে যার শরীরে রক্ত এবং দেহে কান নেই। উল্লেখ্য, اَلْحَذَفُ যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ সে হিসাবে كَاَنَّهَا -এর যমীর স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে। অথবা اَلْحَذَفُ -এর মধ্যে اَلِفْ وَلَامْ টি জিনসী, যা বহুবচনের হুকুম রাখে। সে হিসাবে এর যমীর স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়া হয়েছে (كَمَا فِى الْمِرْقَاتِ)

وَعَنْهُ ١٠٢٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০২৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা প্রথমে সম্মুখের সারি পূর্ণ করবে। অতঃপর তার সংলগ্ন পিছনের সারিকে পূর্ণ করবে। যদি কম্‌তি-ঘাট্‌তি কিছু থাকে, তা থাকবে সর্বশেষ সারিতে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٠٢٧ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوْلٰى وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০২৭. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ 'সালাত' প্রেরণ করেন ঐ সমস্ত লোকের প্রতি যারা প্রথম সারিগুলোর কাছাকাছি, আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সে পদক্ষেপের মতো এত বেশি প্রিয় আর কোনো পদক্ষেপই নেই, যে পদক্ষেপ নেওয়া হয় সারি মিলানোর জন্য বা পূর্ণ করার জন্য। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٠٢٨ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০২৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহু তা'আলা ও ফেরেশ্তাগণ সারির ডান দিকের প্রতি 'সালাত' পেশ করেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানোর মধ্যে অধিক ফজিলত রয়েছে। কিন্তু বাম দিকে লোক কম থাকলে সেদিকেই দাঁড়াবে।

وَعَنْ ١٠٢٩ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ . (رواه ابوداود)

১০২৯. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সারি সোজা করতেন। আর যখন আমরা সোজা হয়ে যেতাম তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٠٣٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَنْ يَمِيْنِهِ اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَعَنْ يَسَارِهِ اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০৩০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকের নামাজিদেরকে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা তোমাদের সারি সোজা কর" এবং বামদিকের নামাজিদেরকে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমাদের সারি ঠিক কর"। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٠٣١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিরাই, যারা নামাজের মধ্যে বাহুসমূহকে নরম রাখে। [অর্থাৎ বাহুতে ধরে কেউ মিলাতে চাইলে সহজেই মিলে যায়]। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِلِيْنِ الْمَنَاكِبِ বাহু নরম করার অর্থ : অর্থাৎ তাদের বাহুমূলকে ধরে যদি কেউ পরস্পরকে মিলাতে চায় তখন তারা যেন মিলে যায়। যেমন– সম্মুখে অগ্রসর থাকলে পিছনে হটানো বা পিছনে দাঁড়ালে সামনে টেনে সফ্ সোজা করতে চাইলে তারা সেই মতো কাজ করে। অথবা কাতারের কোথাও জায়গা খালি থাকলে তাকে সেখানে নিয়ে দাঁড় করাতে চাইলে সে তার আনুগত্য করে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১٠٣٢- عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا اِسْتَوُوْا فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِيْ كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১০৩২. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, তোমরা সফ্ সোজা করে দাঁড়াও, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখতে পাই; যেমন আমি তোমাদেরকে দেখে থাকি সম্মুখের দিক হতে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْتَوُوْا শব্দটি তিনবার বলার কারণ : রাসূল ﷺ নামাজে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদেরকে কাতার সোজা করার নির্দেশ দিতেন। বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি এ নির্দেশ একই সময়ে তিনবার দিয়েছেন। এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, তাঁর প্রথম اِسْتَوُوْا আদেশটি ছিল সকলের জন্য সাধারণভাবে, আর দ্বিতীয়টি ডান পার্শ্বের মুসল্লিদের জন্য এবং তৃতীয়টি বাম পার্শ্বের মুসল্লিদের জন্য। অথবা রাসূল ﷺ-এর এই নির্দেশ তাকিদ স্বরূপ ছিল। অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি কাতার সোজা করার গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

١٠٣٣- وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَى الثَّانِيْ قَالَ وَعَلَى الثَّانِيْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِيْنُوْا فِيْ اَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوْا

১০৩৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ [নামাজের] প্রথম সারির উপরে সালাত প্রেরণ করেন অর্থাৎ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় সারির উপরেও? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ [নামাজের] প্রথম সারির উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সাহাবীগণ পুনরায় বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাজের দ্বিতীয় সারির উপরেও? রাসূল ﷺ আবারও বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ [নামাজের] প্রথম সারির উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। সাহাবীগণ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্বিতীয় সারির উপরেও? রাসূল বললেন, হ্যাঁ, দ্বিতীয় সারির উপরেও [অনুগ্রহ বর্ষণ করেন]। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তোমাদের সারি সোজা করবে, তোমাদের বাহুমূলসমূহকে পরস্পরের সমান রাখবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে বাহুমূলকে নরম

الْخَلَلَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيْمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذْفِ يَعْنِىْ اَوْلَادَ الضَّانِ الصِّغَارِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

রাখবে [অর্থাৎ কেউ ধরে সোজা করতে চাইলে তার আনুগত্য করবে] এবং তোমাদের মধ্যকার ফাঁকসমূহকে ভরে ফেলবে। কেননা শয়তান তোমাদের মধ্যে হায্ফের মতো ঢুকে পড়ে। হায্ফ হলো ছোট কালো ভেড়ার বাচ্চা। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّفُّ الْاَوَّلُ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা : اَلصَّفُّ الْاَوَّلُ বা প্রথম সারি মূলত কোনটি সে ব্যাপারে ওলামাগণ কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন, যা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেন, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মসজিদে আসবে সে যে কোনো কাতারেই দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করুক না কেন তার জন্য তাই হলো প্রথম সারি। চাই তা সর্বশেষ কাতার হোক না কেন। আল্লামা আইনী একে ভিত্তিহীন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করে উক্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। হাদীসটি হলো– وَاِنَّ خَيْرَ الصُّفُوْفِ صُفُوْفُ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمِ وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ অর্থাৎ পুরুষের জন্য উত্তম সারি হলো প্রথম সারি এবং নিকৃষ্ট সারি হলো সর্বশেষ সারি।

২. কারো মতে যে কাতারটি পরিপূর্ণ হবে এবং তার মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে না সেই কাতারটিই হলো প্রথম কাতার।

৩. আবার কেউ বলেন, ইমাম সংলগ্ন পিছনের কাতারটিই হলো প্রথম কাতার। ইমাম নববী বলেন, এ অভিমতটিই অধিক যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ। ওলামায়ে কেরাম এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। আল্লাম আইনীও এ একই অভিমত পেশ করেছেন।

١٠٣٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَهُ قَطَعَهُ اللّٰهُ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ رَوَى النَّسَائِىُّ مِنْهُ قَوْلَهُ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا اِلٰى اٰخِرِهٖ)

১০৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা নামাজের সারিসমূহকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের বাহুমূলসমূহ এবং পরস্পরকে সমান কর। সারির মধ্যে ফাঁকসমূহ ভরে ফেল। তোমাদের ভাইদের হাতে নিজেদের বাহুকে নরম রাখ। [অর্থাৎ সারি সোজা করার জন্য তোমাকে সম্মুখে কিংবা পিছনের দিকে টানলে তার আনুগত্য কর।] এবং শয়তানের জন্য সারির মাঝখানে ফাঁক রেখো না। যে ব্যক্তি সারিকে মিলায় আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন রহমতের সাথে মিলান। আর যে ব্যক্তি সারিকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলাও তাকে আপন রহমত হতে বিচ্ছিন্ন রাখেন। –[আবূ দাউদ। এ হাদীসটি নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি 'যেই ব্যক্তি সারিকে মিলান' হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ-এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, কেউ হাত ধরে অগ্রপশ্চাৎ করতে চাইলে তার আনুগত্য করবে, অথবা পিছন হতে কেউ টানলে তার সাথে হেঁটে দাঁড়াবে। এতে নম্রতা অবলম্বন করাতে তাতে নামাজ বিনষ্ট হবে না।

وَعَنْ ١٠٣٥ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ - (رواه ابوداود)

১০৩৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা ইমামকে মধ্যস্থলে রাখবে এবং পরস্পরের মধ্যকার ফাঁক পূর্ণ করবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٠٣٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُد)

১০৩৬. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একদল লোক সর্বদা প্রথম সারি হতে পিছনে থাকবে, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে জাহান্নামে পিছিয়ে দেবেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা প্রথম সারি হতে সর্বদা পিছনে থাকবে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে জাহান্নামে পিছিয়ে দেবেন। এই বাক্যের কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. এর অর্থ হলো, যারা সর্বদা নামাজের পিছনের কাতারে থাকবে তাদেরকে শাস্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

২. অথবা এর ব্যাখ্যা হলো যাদেরকে সর্বপ্রথম জাহান্নামের শাস্তি হতে উত্তোলন করা হবে তাদের সাথে এদেরকে উত্তোলন করা হবে না।

৩. অথবা এর অর্থ হলো, জান্নাতে প্রবেশকারীদের নিকট হতে তাদেরকে দূরে রাখা হবে এবং তাদেরকে প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

৪. অথবা يُؤَخِّرُهُمْ فِى النَّارِ-এর অর্থ হলো, জাহান্নামে মু'মিনদের জন্য যে স্থান নির্ধরিত করে রাখা হয়েছে এর সর্বনিকৃষ্ট স্থানে এদের স্থান হবে।

وَعَنْ ١٠٣٧ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ (رض) قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ الصَّلٰوةَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

১০৩৭. **অনুবাদ** : হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সারির পিছনে একাকী নামাজ পড়তে দেখলেন। সুতরাং তিনি তাকে পুনরায় নামাজ পড়তে আদেশ দিলেন।–[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الصَّلٰوةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهٗ কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়ার বিধান : কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে কি না, সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে–

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمَا :

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক, হাম্মাদ, ইবনে আবী লায়লা, ওয়াকেদী, নাখয়ী (র.) প্রমুখের মতে কাতারের পিছনে একাকী নামাজ শুদ্ধ হবে না। তাঁরা নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে উপরে বর্ণিত হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) -এর হাদীসহ নিম্নের হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেন।

عَنْ عَلِيِّ ابْنِ شَيْبَانَ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتّٰى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهٗ اِسْتَقْبِلْ صَلٰوتَكَ فَلَا صَلٰوةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . (اَخْرَجَهٗ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

২. পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, হাসান বসরী, আওযায়ী (র.) এককথায় জমহুর ওলামার মত হলো, কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে মাকরূহ সহকারে আদায় হবে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ–

(١) حَدِيْثُ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهٗ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ زَادَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاَحْمَدُ)

উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত আবূ বাকরা (রা.) কাতারের পিছনে একাকী তাকবীরে তাহরীমার পর রুকূ করেছেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে পুনরায় নামাজ পড়তে আদেশ করেননি। অতএব এর দ্বারা বুঝা যায়, কাতারের পিছনে একাকী নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

(٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهٗ كَانَ يَرْكَعُ عَلٰى عَتَبَةِ الْمَسْجِدِ وَوَجْهُهٗ اِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِىْ مُعْتَرِضًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ يَعْتَدُّ بِهَا اَىْ بِهٰذِهِ الرَّكْعَةِ اَنْ وَصَلَ اِلَى الصَّفِّ اَوْ لَمْ يَصِلْ . (رَوَاهُ الطَّحَاوِىْ)

বিরুদ্ধবাদীদের দলিলের জবাব : ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) হযরত ওয়াবিসা ইবনে মা'বাদ (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে, এতে পুনরায় পড়ার যে নির্দেশ রয়েছে এটা ছিল শাসনমূলক, তাম্বীহস্বরূপ এবং মাকরূহ হতে পরিত্রাণের নিমিত্তেই। নামাজ বাতিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

আর হযরত ইবনে শায়বান (রা.) বর্ণিত হাদীসে যে لَا صَلٰوةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ বলা হয়েছে, তার উত্তরে বলা যায় যে, এতে নামাজ পরিপূর্ণ না হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ وَلَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে, বরং এর উদ্দেশ্য হলো আরকান ও সুন্নতের বিবেচনায় উক্ত নামাজ পরিপূর্ণ হবে না।

بَابُ الْمَوْقِفِ

পরিচ্ছেদ : ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থান

اَلْمَوْقِفُ এটি اِسْمُ ظَرْف একবচন, বহুবচনে مَوَاقِفُ শাব্দিক অর্থ– অবস্থানের স্থল বা দাঁড়ানোর স্থান। এখানে موقف দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজের মধ্যে ইমাম ও মুসল্লিদের দাঁড়ানোর স্থান। আলোচ্য অধ্যায়ে ইমাম ও মুসল্লিদের নামাজে দাঁড়ানোর স্থান বিষয়ে হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَعَدَلَنِىْ كَذٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার গৃহে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠলেন এবং নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আমিও তাঁর বাম পাশে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন রাসূল ﷺ তাঁর পিছনের দিকে হাত বের করে আমার হাত ধরলেন এবং ঐভাবে পিছন দিক দিয়েই টেনে ডান পাশে নিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ نِيَّةِ الْاِمَامِ ইমামের নিয়ত করার হুকুম : ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা আবশ্যক কি না সে ব্যাপারে ইমামদের বিভিন্ন অভিমত পরিলক্ষিত হয়–

১. ইমাম ছাওরীর মতে এবং আহমদ ও ইসহাকের এক বর্ণনা মতে ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত। ইমাম যদি এ নিয়ত না করেন তা হলে মুক্তাদির জন্য পুনরায় নামাজ আদায় করা অপরিহার্য। কেননা নিয়ত ব্যতীত ইমামের ইমামতি এবং মুক্তাদির একতেদা জায়েজ হবে না।

২. ইমাম আহমদের অপর এক বর্ণনা মতে কেবলমাত্র ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে ইমামতির নিয়ত শর্ত, নাওয়াফিলের জন্য নয়।

৩. ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং যুফার (র.)-এর মতে মুক্তাদি নারী হোক অথবা পুরুষ কোনো অবস্থাতেই ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত করা শর্ত নয়।

৪. ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইবনুল কাসিমের মতে মুক্তাদি পুরুষ হলে ইমামের জন্য ইমামতির নিয়ত শর্ত নয় কিন্তু যদি মহিলা হয় তা হলে নিয়ত করা শর্ত।

اَلْمَسْئَلَةُ فِىْ قِيَامِ الْمَامُوْمِ الْوَاحِدِ مَعَ الْاِمَامِ ইমামের সাথে শুধুমাত্র একজন মুক্তাদির দাঁড়ানোর মাসআলা : মুক্তাদি একজন হলে সে ইমামের কোন পার্শ্বে দাঁড়াবে এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে মুক্তাদি ইমামের বাম পার্শ্বে দাঁড়ালে তার নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

২. ইমাম নাখয়ী (র.) বলেন, মুক্তাদি যদি একজন হয় তা হলে সে ইমামের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে। ইতোমধ্যে অন্য কোনো মুক্তাদি আসলে সকলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে নতুবা সে ইমামের রুকুর সময় তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে একজন মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

৪. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আওযায়ী, ইসহাক, উরওয়া, শা'বী, মাকহুল, ইব্রাহীম, সাওরী, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আনাস, ওমর (রা.) প্রমুখের মতে একজন মুক্তাদি হলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে তার সোজাসোজি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে।

৫. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুক্তাদি ইমামের বরাবর দাঁড়ালে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা নামাজ ফাসেদ হওয়ার কারণ। অতএব মুক্তাদিকে ইমামের একটু পিছনে দাঁড়াতে হবে যাতে মুক্তাদির পায়ের আঙ্গুল ইমামের পায়ের গিরা বরাবর থাকে।

اَلْمَسْئَلَةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ **উক্ত হাদীস হতে নির্গত মাসআলা :** আলোচ্য হাদীস হতে নিম্নলিখিত পাঁচটি মাসআলা বের হয়েছে–

১. মুক্তাদি একজন হলে ইমামের ডানদিকে দাঁড়াতে হবে।
২. নফল নামাজেও জামাত করা জায়েজ।
৩. ইমাম ইমামতির নিয়ত না করলেও তার পিছনে একতেদা করা জায়েজ।
৪. ক্ষণিকের জন্যও মুক্তাদি ইমামের আগে যাওয়া জায়েজ নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিছন দিয়ে টেনে নিয়েছিলেন।
৫. নামাজের মধ্যে সংশোধনমূলক কিছু কাজ নামাজকে নষ্ট করে না। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বাম পাশ হতে ডান পাশে টেনে নিয়েছেন। এতটুকু কাজ 'আমলে কাসীর' নয়, বিশেষভাবে নফল নামাজে।

١٠٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَدَارَنِيْ حَتّٰى اَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهٗ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৩৯. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিত ওয়া সাল্লাম নামাজের জন্য দাঁড়ালেন, আর আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন হুজুর ﷺ আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং আমাকে তাঁর ডান পার্শ্বে নিয়ে দাঁড় করালেন। অতঃপর জাব্বার ইবনে সাখর আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাম পার্শ্বে দাঁড়াল। তখন হুযূর ﷺ আমাদের দু'জনেরই হাত ধরলেন এবং আমাদের উভয়কে পিছনে সরিয়ে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ وُقُوْفِ الْاِمَامِ مَعَ الْاِثْنَيْنِ **দু'জন মুক্তাদির সাথে ইমামের দাঁড়ার বিধান :** দু'জন মুক্তাদি হলে ইমাম কোন স্থানে দাঁড়াবে এ বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মুক্তাদি দু'জন হলে ইমাম উভয়ের মধ্যখানে দাঁড়াবে। তিনি স্বীয় অভিমতের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীসমূহ হাদীসমূহ দলিল হিসাবে পেশ করেন–

(١) عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا اَتَيْنَا اِبْنَ مَسْعُوْدٍ (رضـ) فِيْ دَارِهٖ وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَ ذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ خَلْفَهٗ فَاَخَذَ بِاَيْدِيْنَا فَجَعَلَ اَحَدَنَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَالْاٰخَرَ عَنْ شِمَالِهِ الْحَدِيْثَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢) وَفِى النَّسَائِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) نِصْفَ النَّهَارِ وَفِيْهِ ثُمَّ قَالَ فَصَلّٰى بَيْنِيْ وَ بَيْنَهٗ اَيْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ صَلّٰى بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ فَقَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে এসেছে যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এটা কোনো সাহাবী, তাবেয়ী, সলফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন– এমনকি আজ পর্যন্ত কেউই এটা সমর্থন করেনি; বরং তাঁদের মতে মুক্তাদি দু'জন হলে তারা ইমামের পিছনে দাঁড়াবে এবং ইমাম তাদের সামনে দাঁড়াবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসসহ নিম্নের হাদীস–

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فِيْ مَكَانِهِ لِلصَّلٰوةِ) وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ বিরোধীদের দলিলের উত্তর : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রথমত হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস দ্বারা যে দলিল উপস্থাপন করেছেন এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়–

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) যে দু'জন মুক্তাদির মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন– তা জায়গার সংকীর্ণতার কারণেই হয়েছিল।

২. অথবা সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকাবস্থায় কোনো সাহাবীর কর্ম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কর্ম পরিত্যাজ্য হবে।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণিত। দ্বিতীয় দলিলের উত্তরে আবূ ওমর বলেন, এটা মারফূ' হাদীস নয়, বরং উহা মওকূফ হাদীস; যা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) সহ একদল ইমাম বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটি মনসূখ হয়ে গেছে।

١٠٤٠ وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِيْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৪০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং এক অনাথ আমাদের ঘরে নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়েছি, আর [আমার মাতা] উম্মে সুলাইমও আমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَتِيْم দ্বারা উদ্দেশ্য : يَتِيْم-এর শাব্দিক অর্থ হলো– অনাথ, পিতৃহীন তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক পিতৃহীনকে এতিম বলা হয়, তবে এখানে يَتِيْم দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রয়েছে, যথা–

কেউ কেউ বলেন, এতিম এক ব্যক্তির নাম। যিনি ছিলেন হযরত আনাস (রা.)-এর ভাই। আল্লামা মীরক বলেন, তাঁর নাম হলো ضُمَيْرَة [যুমাইরা]। আল্লামা ইবনুল হায্যা এতিমের নাম আব্দুল মালেক ইবনে হুবাইব উল্লেখ করেছেন। এর চেয়ে তিনি আর কিছু বেশি বলেননি। আল্লামা ইবনে হুমাম বলেন, এতিমের নাম হলো যুমাইরা ইবনে সা'দ আল-হিমইয়ারী। ইমাম নববীও এ একই কথা বলেছেন।

١٠٤١ وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِهٖ وَبِاُمِّهٖ اَوْ خَالَتِهٖ قَالَ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৪১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে, তাঁর মাকে এবং তাঁর খালাকে নামাজ পড়ালেন। হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং মহিলাদেরকে আমাদের পিছনের সারিতে দাঁড় করালেন। –[মুসলিম]

١٠٤٢ وَعَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌছলেন, তখন রাসূল ﷺ রুকুতে ছিলেন। তখন [নামাজের সারিতে] মিলিত হওয়ার পূর্বেই [শুধু তাক্বীরে তাহরীমা] বলে রুকুতে গেলেন অতঃপর একটু হেঁটে সফে মিলিত হলেন। এ ঘটনা নবী করীম ﷺ-এর নিকট বলা হলো। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমার [নামাজের প্রতি] আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। পুনরায় এমনটি করো না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تَعُدْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসের সর্বশেষ শব্দ لَا تَعُدْ -এর হরকতের বিভিন্নতার ফলে অর্থের মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

১. لَا تَعُدْ -এর ت বর্ণে যবর এবং عَيْن বর্ণে পেশ। এ অবস্থায় এর উৎপত্তি হবে اَلْعَوْدُ মাসদার হতে; তখন এর অর্থ হবে– لَا تَفْعَلْهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتَهُ ثَانِيًا অর্থাৎ তুমি যা করলে এরূপ দ্বিতীয়বার আর করো না।

২. لَا تَعْدُ -এর عين বর্ণ সাকিন এবং د বর্ণে পেশ। তখন এটা اَلْعَدْوُ হতে নির্গত হবে। আর এর অর্থ হবে– لَا تُسْرِعْ فِى الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاصْبِرْ حَتّٰى تَصِلَ اِلَى الصَّفِّ ثُمَّ اَشْرِعْ فِى الصَّلٰوةِ অর্থাৎ তাড়াহুড়া করে নামাজের দিকে দৌড়ে এসো না ; বরং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে ধীর কদমে এসে নামাজের কাতারে মিলিত হও এবং নামাজ আদায় করো।

৩. لَا تُعِدْ -এর ت বর্ণে পেশ এবং عَيْن বর্ণে যের। তখন এটা اَلْاِعَادَةُ হতে নির্গত হবে। আর এর অর্থ হবে لَا تُعِدِ الصَّلٰوةَ الَّتِىْ صَلَّيْتَهَا অর্থাৎ তুমি যে নামাজ পড়েছ তা আর পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।

ইমাম নববী (র.) এর তিনটি অর্থ করেছেন– (১) নামাজে শরিক হওয়ার জন্য দৌড়ে এসো না। (২) দ্বিতীয়ত لَا تَعُدْ اِلَى التَّاَخُّرِ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى تَفُوْتَكَ الرَّكْعَةُ مَعَ الْاِمَامِ অর্থাৎ নামাজে আসতে বিলম্ব করো না, যাতে ইমামের সাথে কোনো রাকাত ছুটে যায়। (৩) لَا تُعِدْ اِلَى التَّحْرِيْمَةِ خَلْفَ الصَّفِّ অর্থাৎ কাতারের পিছনে থাকতেই নামাজের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বাঁধবে না। আল্লামা মীরক বলেন, এ তৃতীয় অর্থটিই হাদীসের সাথে সঙ্গতিশীল এবং যথার্থ। এটা ব্যতীতও এ সম্পর্কে অনেক মতামত রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٤٣ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً اَنْ يَتَقَدَّمَنَا اَحَدُنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১০৪৩. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন নামাজে তিনজন হই তখন আমাদের মধ্য হতে যেন একজন সম্মুখে অগ্রগামী হয়ে যায়। –[তিরমিযী]

١٠٤٤ - وَعَنْ عَمَّارٍ (رض) اَنَّهُ اَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَايِنِ وَقَامَ عَلٰى دُكَّانٍ يُصَلِّىْ وَالنَّاسُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَاَخَذَ عَلٰى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰى اَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلٰوتِهٖ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ لِقَوْمٍ فَلَا يَقُمْ فِىْ مَقَامٍ اَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ

১০৪৪. অনুবাদ : হযরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি মাদায়েনে মানুষের ইমামতি করলেন। তিনি উঁচু একটি জয়গায় একা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াচ্ছিলেন, অথচ মানুষ তাঁর চেয়ে নিচে দাঁড়িয়েছিল। হযরত হুযাইফা (রা.) আগে অগ্রসর হয়ে তাঁর হাত ধরলেন, আম্মার তার অনুসরণ করলেন। হযরত হুযাইফা (রা.) তাঁকে নিচে নামিয়ে আনলেন। হযরত আম্মার যখন নামাজ হতে অবসর হলেন, হযরত হুযাইফা (রা.) তাকে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কোনো ব্যক্তি জনতার ইমামতি করে, সে যেন মুক্তাদিদের দাঁড়াবার স্থানের

أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ فَقَالَ عَمَّارٌ لِذٰلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِيْنَ اَخَذْتَ عَلٰى يَدَىَّ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

তুলনায় উঁচু স্থানে নাদাঁড়ায়" অথবা এ কথার অনুরূপ কথা বলেছেন। তখন হযরত আম্মার (রা.) বললেন, এ জন্যই তো আমি আপনার অনুসরণ করেছি, আপনি যখন আমার হাত ধরে নামিয়েছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ قِيَامِ الْاِمَامِ مَكَانًا اَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمُقْتَدِىْ **মুক্তাদি অপেক্ষা ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর বিধান :** ইমাম ও মুক্তাদির দাঁড়ানোর স্থানে পার্থক্য হলে সাধারণত নামাজ মাক্রূহ হয়। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান এক হাতের কম উঁচু হলে তাতে নামাজ মাকরূহ হবে না। অবশ্য বিনা ওজরে ইমাম উঁচু স্থানে দাঁড়ানো মাক্রূহ। কেননা এটা আহ্লে কিতাবের আচরণ। আর ইমামের সাথে কিছু মুক্তাদি দাঁড়ালে তখন মাক্রূহ হবে না। ইমাম ত্বাহাবী বলেন, জমিন সাধারণত কিছু না কিছু উঁচু-নিচু হয়েই থাকে, কাজেই এক হাতের কম পরিমাণ উচ্চতাকে উঁচু হিসাবে সাব্যস্ত করা হয় না। আর যদি স্থানের সংকীর্ণতা অথবা লোকদেরকে নামাজের নিয়ম-কানুন বাস্তবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেখানোর উদ্দেশ্যে ইমাম উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় তখন মাক্রূহ হবে না। দুর্‌রে মোখ্তার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ইমামের একাকী উচ্চ স্থানে দাঁড়ানো মাক্রূহ বা নিষেধ।

١٠٤٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُ سُئِلَ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلٰى فُلَانَةٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عَمِلَ وَ وَضَعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَ رَكَعَ وَ رَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ - (هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا بِىْ وَلِتَعَلَّمُوْا صَلٰوتِىْ -

১০৪৫. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর মিম্বার কিসের তৈরি ছিল? তিনি বললেন, তা জঙ্গলের ঝাউ গাছের তৈরি ছিল, যা অমুক মহিলার মুক্ত করা কৃতদাস অমুক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তৈরি করেছিল। যখন তা তৈরি করা হয়েছিল এবং মসজিদে স্থাপন করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বললেন, জনতা তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। তখন রাসূল ﷺ কেরাত পাঠ করলেন এবং রুকু করলেন, আর জনতা তাঁর পিছনে রুকু করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ মাথা উঠালেন এবং পিছনে হেঁটে আসলেন [অর্থাৎ জমিনে নেমে আসলেন] এবং জমিনের উপরে সিজদা করলেন, অতঃপর মিম্বারের উপরে পুনরায় উঠলেন। অতঃপর কেরাত পাঠ করলেন, তারপর আবার রুকু কলেন; অতঃপর মাথা উঠালেন, তারপর পিছনের দিকে নেমে আসলেন এবং জমিনের উপরে সিজদা করলেন। –[বুখারী]

বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থের বর্ণনায়ও প্রায় এরূপই রয়েছে। তবে শেষের দিকে রয়েছে, যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন, জনতার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, "হে লোক সকল! আমি এজন্য এরূপ করলাম, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং নামাজ পড়া সম্পর্কে জানতে পার"।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ قِيَامِ الْاِمَامِ فِىْ مَكَانٍ اَرْفَعَ **ইমামের উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর বিধান :** আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, যদি অধিক লোককে প্রশিক্ষণ দান উদ্দেশ্য হয় তখন ইমাম একাকী উঁচু স্থানে দাঁড়ালেও নামাজ মাক্রূহ হবে না। মোটকথা কোনো প্রয়োজন বা ওজর ব্যতিরেকে ইমাম একাকী উঁচু স্থানে দাঁড়ালে এবং মুক্তাদিগণ নিচে দাঁড়ালে নামাজ মাকরূহ হবে। আর হুযূর ﷺ যে প্রশিক্ষণের জন্য উঁচু স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন তা সুস্পষ্ট।

اِسْمُ فُلَانَةٍ وَفُلَانٍ **অমুক স্ত্রীলোক ও অমুক ব্যক্তির পরিচিতি :** উক্ত মহিলাটি ছিল আনসারী নারী। তার নাম কারো মতে 'আদাসা' আবার কেউ বলেছেন আয়েশা, আবার কেউ বলেন, তার নাম অজ্ঞাত। আর এর নির্মাতা মিস্ত্রীর নাম সম্পর্কেও বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কারো মতে তার নাম ছিল কাবীছা। কেউ বলেন, মায়মুন। আবার কিছু সংখ্যক বলেন, বাকুম রোমী। এটা ছাড়া অন্যান্য অভিমতও রয়েছে।

مَامَعْنَى الْاَثْلِ وَالْغَابَةِ **আসাল ও গাবার অর্থ :** 'আসাল' শব্দের পরিবর্তে মুসলিম শরীফে 'তারফা' বলা হয়েছে। মূলত শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। এক প্রকার চিরচির পাতা বিশিষ্ট বৃক্ষ। একে ভারত উপমহাদেশে ঝাউ-গাছ বলা হয়। 'গাবা' মদীনা হতে নয় মাইল দূরে একটি বনাঞ্চলের নাম। যেখানে মহানবী ﷺ তথা মুসলমানদের যাকাত ও সদ্কার উট ও গবাদি পশু ইত্যাদি বিচরণ করত। উরাইনাদের প্রসিদ্ধ ঘটনা সেখানেই সংঘটিত হয়েছিল। ইমাম নববী বলেছেন, এটা মদীনারই একটি জায়গার নাম। জামে গ্রন্থে আছে, প্রত্যেক ঘন বৃক্ষরাজি বিশিষ্ট বাগান বা জঙ্গলকে 'গাবা' বলা হয়। কিন্তু বিশিষ্ট অভিধান বিদ আবূ হানীফা (র.) বলেন, বাঁশের ঝাড়কে গাবা বলে।

كَمْ طَبَقَةً كَانَتْ فِىْ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ **রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারে কতগুলো স্তর ছিল :** মহানবী ﷺ-এর জন্য যখন উক্ত মিম্বার তৈরি করা হয়েছিল, তখন এতে তিনটি ধাপ ছিল। হুজুর ﷺ সর্বোচ্চ তৃতীয় ধাপে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) দ্বিতীয় ধাপে এবং ফারূকে আযম সর্বনিম্ন প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করেছেন। আর হযরত উসমান (রা.) বলেছেন, এর যে কোনো একটিতে দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়াই সুন্নত। তাই তিনি আর কোনো ধাপ বর্ধিত করেননি। অদ্যাবধি সেই তিন ধাপের মিম্বারই মুসলিম জাহানে বিদ্যমান রয়েছে, এর থেকে কমানো বাড়ানো ঠিক নয়।

وَعَنْ ١٠٤٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حُجْرَةٍ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১০৪৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ কক্ষে নামাজ পড়লেন, আর লোকজন কক্ষের বাইরে থেকে তাঁর একতেদা করলেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالْحُجْرَةِ؟ **হুজরা দ্বারা উদ্দেশ্য :** আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত 'হুজরা' দ্বারা কোন্ কক্ষটি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়–প্রথমত এর দ্বারা সেই কক্ষটি উদ্দেশ্য, যা মসজিদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। এতে বসে রাসূল ﷺ রাতের বেলায় নফল নামাজ পড়তেন এবং ইবাদত-বন্দেগি করতেন। দ্বিতীয়ত কারো মতে এটা ছিল হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরা; কিন্তু এ অভিমত সঠিক নয়। কেননা এটা যদি হযরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরাই হতো তা হলে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনার সময় حُجْرَةٌ না বলে حُجْرَتِىْ বলতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٤٧ - عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلٰوتَهٗ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى لَا اَحْسِبُهٗ اِلَّا قَالَ اُمَّتِىْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১০৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ কিরূপ ছিল, তা বলব না? পরবর্তী রাবী বলেন, তিনি [আবূ মালেক আশআরী] নামাজ কায়েম করলেন, [প্রথমে] পুরুষ লোকদেরকে সারিবদ্ধ করলেন এবং তারপর তাদের পিছনে বালকদেরকে সারিবদ্ধ করলেন, অতঃপর তিনি তাদের নামাজ পড়ালেন এবং এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের বর্ণনা দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এরূপই ছিল তার নামাজ। পরবর্তী রাবী আব্দুল আ'লা বলেন, তিনি এটা ছাড়া আর কিছু বলেছেন বলে আমি মনে করি না যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, এরূপই আমার উম্মতের নামাজ। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ বাক্যাংশে قَالَ-এর فَاعِلْ রাসূল ﷺ অর্থাৎ রাবী আবূ মালেক রাসূল ﷺ-এর কর্তৃক কাতার তারতীব-সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন- هٰكَذَا صَلٰوةُ

قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ রাবী আব্দুল আ'লা [যিনি আবূ মালেক হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।] বলেন যে, আবূ মালেক সম্ভবত রাসূল ﷺ হতে هٰكَذَا صَلٰوةُ اُمَّتِىْ রেওয়ায়েত করেছেন।

١٠٤٨ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ (رحـ) قَالَ بَيْنَا اَنَا فِى الْمَسْجِدِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِىْ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِىْ جَبْذَةً فَنَحَّانِىْ وَقَامَ مَقَامِىْ فَوَ اللّٰهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِىْ فَلَمَّا انْصَرَفَ اِذَا هُوَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ يَا فَتٰى لَا يَسُوْئُكَ اللّٰهُ اِنَّ هٰذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْنَا اَنْ نَلِيَهٗ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

১০৪৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কায়স ইবনে উবাদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদে নামাজের প্রথম সারিতে ছিলাম, হঠাৎ আমার পিছন হতে এক ব্যক্তি আমাকে সজোরে টেনে আমাকে আমার স্থান হতে সরিয়ে দিল। অতঃপর সে আমার স্থানে দাঁড়াল। খোদার কসম! রাগে আমি আমার নামাজ পর্যন্ত ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না। যখন সে [আমাদের সাথে] নামাজ শেষ করল, তখন দেখি, তিনি সম্মানিত সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আল্লাহ তোমাকে দুঃখিত না করুন। [অর্থাৎ আমার এ কাজ বা আচরণের দরুন তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হয়ো না।] অবশ্য এটা আমাদের প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপদেশ, "আমরা যেন তাঁর অর্থাৎ, ইমামের নিকটবর্তী

فَقَالَ هَلَكَ اَهْلُ الْعَقْدِ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ وَاللّٰهِ مَا عَلَيْهِمْ اٰسٰى وَلٰكِنْ اٰسٰى عَلٰى مَنْ اَضَلُّوْا قُلْتُ يَا اَبَا يَعْقُوْبَ مَا تَعْنِىْ بِاَهْلِ الْعَقْدِ قَالَ الْاُمَرَاءُ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

হয়ে দাঁড়াই।" অতঃপর তিনি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনবার বললেন, খানায়ে কা'বার রবের কসম! আহ্‌লে আক্‌দ ধ্বংস হয়েছে। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাদের [অর্থাৎ জনসাধারণের] উপর দুঃখিত নই, বরং দুঃখিত সে সমস্ত লোকদের উপর যারা জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ ইয়াকুব! আহলে আকদ বলতে আপনি কাদেরকে বুঝিয়েছেন? তিনি বললেন, আমীর তথা শাসকমণ্ডলীকে। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا عَقَلْتُ صَلَاتِىْ **-এর অর্থ :** একদা তাবেয়ী কায়স ইবনে উবাদা (র.) ইমামের পিছনে সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব (রা.) পিছন হতে তাঁকে টেনে সেই স্থানে তিনি দাঁড়ালেন। এতে কায়স মনে মনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এমনকি তিনি বলেন, আমার রাগ এত প্রবল হয়েছিল যে, আমি কিভাবে নামাজ শেষ করেছি এবং কয় রাকাত পড়েছি তা কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনি; কিন্তু নামাজ শেষে যখন তিনি সাহাবীর পরিচয় লাভ করলেন এবং তাকে পিছনে নেওয়ার কারণ বুঝতে পারলেন তখন তাঁর আর রাগ থাকল না।

هَلَكَ اَهْلُ الْعَقْدِ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) পবিত্র কা'বার প্রতিপালকের শপথ করে বলেন, 'আহলে আকদ ধ্বংস হয়েছে।' কথাটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যারা রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদায় সমাসীন তাদেরকেই আহলে আকদ বলা হয়। রাষ্ট্র ও জনগণের সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু তদানীন্তন সময়ের কোনো কোনো শাসক বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নামাজের সঠিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উদাসীন ও অমনোযোগী ছিলেন। তাদের প্রতি আক্ষেপ করেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) هَلَكَ اَهْلُ الْعَقْدِ এ বাক্যটি বলেছেন।

অথবা 'আহলে আকদ' দ্বারা হযরত উবাই (রা.) ইমামদেরকে বুঝিয়েছেন। কেননা শ্রেণী মতো সারিবদ্ধভাবে লোকদেরকে দাঁড় করানো ইমামেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। বস্তুত হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) একজন প্রবীণ সাহাবী। তাঁর অভিমত অনুযায়ী এখানে নামাজের প্রতি অমনোযোগী শাসকগণই উদ্দেশ্য।

بَابُ الْاِمَامَةِ

পরিচ্ছেদ : ইমামতি করা

একাধিক মুসল্লি একত্রিত হলেই জামাতে নামাজ পড়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আর জামাতের জন্য ইমাম একান্ত অপরিহার্য। উল্লেখ যে, খোদাভীরু, পরহেজগার, আলেমে দীন এবং নামাজের যাবতীয় মাসআলা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিই ইমাম হওয়ার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। কেননা ইমামের উপরই মুসল্লিদের দায়-দায়িত্ব বর্তায়, আর এ জন্যই ইমামের দায়িত্ব অপরিসীম। ইমাম হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম এবং কার পরে কে ইমাম হওয়ার যোগ্য সে সম্পর্কে আলোচ্য অধ্যায়ে হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٤٩ - عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَلَا يَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهٖ عَلٰى تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ اَهْلِهٖ)

১০৪৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষের ইমামতি করবে সেই, যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তাহলে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নায়ও সমান হয়, তা হলে যে প্রথমে হিজরত করেছে সে। যদি হিজরতেও সমান হয়, তাহলে যে বয়সে বেশি। কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের আসনে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত। –[মুসলিম, তার অপর বর্ণনায় আছে, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পরিবারে যেন ইমামতি না করে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ هُوَ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ؟ **ইমামতির জন্য সর্বোত্তম কে? :** ইমাম হওয়ার জন্য সবচেয়ে কোন্ ব্যক্তি যোগ্য এবং উত্তম সে ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

১. ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবূ ইউসুফ, সওরী, ইবনে সীরীন ও আহনাফ ইবনে কায়সের মতে ইমামতির জন্য ফিকহবিদের তুলনায় কারী বেশি উত্তম। তাঁরা বর্ণিত আবূ মাসউদের হাদীসসহ নিম্নের হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেন–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَأُهُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

২. ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, মুহাম্মদ এককথায় জমহুর ওলামার মতে ইমামতির জন্য কারীর চেয়ে বিদ্বান ফকীহ অগ্রগণ্য। তারা নিম্নোক্ত হাদীস ও যুক্তি দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন–

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّهٗ مَرِضَ النَّبِيُّ فَاشْتَدَّ مَرَضُهٗ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. اَلْحَدِيْثَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

হাদীসটি একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ অন্তিম রোগের সময় হযরত আবূ বকর (রা.)-কে ইমামতি করতে বলেছিলেন, অথচ সেখানে বহু হাফেজে কুরআন ও কারী উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ করে হযরত উবাই ইবনে কা'ব যাকে নবী করীম ﷺ সাহাবীদের কারী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন; কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে বিদ্বান ব্যক্তি। সুতরাং এর দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, ইমামতির বেলায় কারীর চেয়ে বিদ্বান ব্যক্তিই অগ্রগণ্য।

এ ছাড়া তাদের পক্ষে যুক্তি হিসাবে ইমাম নববী এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, কেরাত শুধুমাত্র নামাজের একটি অংশ কিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইলমের সম্পর্ক নামাজের সকল অংশের সাথে জড়িত। কেননা কোনো একটি অংশের মধ্যে ত্রুটি দেখা দিলে গোটা নামাজই নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় কেরাতের অভিজ্ঞতা থাকলেই একজন বিদ্বান ব্যক্তি ইমামতির ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবে।

তাঁদের দলিলের উত্তর : যে সব হাদীসে কারীদেরকে ইমামতির জন্য অগ্রগণ্য বলা হয়েছে এর উত্তরে বলা যায় যে, তাতে اَقْرَأُ দ্বারা মূলত اَعْلَمُ অর্থাৎ বিদ্বান বুঝানো হয়েছে। কেননা সে সময় যারা কুরআনের কারী ছিলেন তারা শরিয়তের আহকামের আলেম এবং ফকীহও ছিলেন। সুতরাং এখানে শুধু তাজবীদ জানা ব্যক্তি উদ্দেশ্য নয়।

اَلْمَسْئَلَةُ الضَّرُوْرِيَّةُ فِى الْاِمَامَةِ ইমামতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসআলা : এ কথা সর্বস্বীকৃত যে বেদুইন, গোলাম, ফাসেক, বিদ'আতী, অন্ধ এবং জারজ ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে তান্যীহী। এদের থেকে ভালো লোক থাকলে তাকে ইমাম বানানো উচিত। অন্যথা এদের পিছনে এক্তেদা করার চেয়ে একাকী নামাজ পড়া উত্তম। আর এমন লোককে ইমাম বানানো মাকরূহ, যাকে মুক্তাদিগণ বিভিন্ন ত্রুটির দরুন অপছন্দ করে। আর মুক্তাদিদের উপর যে ইমাম অসন্তুষ্ট তার ইমামতিও মাকরূহ হবে। অথবা যাকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তার চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত রয়েছে এমন ব্যক্তির ইমামতিও মাকরূহ। নাবালেগ ছেলের নামাজ নফল হয়ে থাকে। কাজেই এমন ছেলের পিছনে বয়স্কদের এক্তেদা করা জায়েজ নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী বলেন, জায়েজ হবে। বলখের মাশায়েখগণ বলেন, তারাবীহ বা সুন্নতের মর্যাদা সম্পন্ন নামাজে নাবালেগ ছেলেকে ইমাম বানানো জায়েজ আছে। কিন্তু হানাফী মাশায়েখদের মতে জায়েজ নেই। ইমাম আবূ ইউসুফের মতে নফল নামাজে নাবালেগ ছেলের ইমামতি জায়েজ আছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদের মতে নফলেও জায়েজ নেই। ফতোয়ায়ে শামী কিতাবে বর্ণিত আছে যে, নাবালেগের পিছনে কোনো প্রকারের নামাজই জায়েজ নেই।

لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ-এর তাৎপর্য : আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, কোনো ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে। অর্থাৎ যেখানে যার অধিকার রয়েছে এবং যার হুকুম যেখানে প্রয়োগ হয়ে থাকে সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর মাঝে মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হওয়ার জন্যই ইসলামে জামাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি অন্য কারো স্থানে গিয়ে অনুমতি ব্যতীতই ইমামতি করে তবে তাকে অসম্মান করা হবে। যার ফলে সম্পর্ক বৃদ্ধির পরিবর্তে অবনতিই ঘটবে এবং শত্রুতা ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে, যা জামাত কায়েম করার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

١٠٥٠ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَأُهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ ذُكِرَ حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِىْ بَابٍ بَعْدَ بَابِ فَضْلِ الْاَذَانِ)

১০৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমাম হয়। ইমামতির সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে অধিক বিদ্বান অথবা কুরআন অধিক ভাল পড়ে। –[মুসলিম]

এ প্রসঙ্গে মালেক ইবনে হুওয়াইরিছের হাদীস আযানের মাহাত্ম্য অধ্যায়ের পরে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٥١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاءُكُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১০৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে উত্তম সে আযান দেবে, আর যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পাঠ করে সে ইমামতি করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে সে আযান দেবে। রাসূল ﷺ-এর এই বাণীর মধ্যে বিশেষ একটা হিকমত নিহিত রয়েছে। যে ব্যক্তি আযান দেবে, সে যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হয়, তার মধ্যে যদি বেহায়াপনা, অশ্লীলতা এবং চরিত্রহীনতা বিদ্যমান থাকে তা হলে সে ব্যক্তির উপর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকতে পারে না, এ ব্যক্তির আহবানেও মানুষ সাড়া দেবে না, তার ঘোষণার প্রতি মানুষের আকর্ষণও থাকবে না। আর উত্তম গুণের মধ্যে মিষ্টি-মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়াও অন্তর্ভুক্ত। কেননা সুরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অতএব রাসূল ﷺ-এর উপরোল্লিখিত বাণীর মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

١٠٥٢ - وَعَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَاْتِيْنَا اِلٰى مُصَلَّانَا وَيَتَحَدَّثُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ يَوْمًا قَالَ اَبُوْ عَطِيَّةَ فَقُلْنَا لَهٗ تَقَدَّمْ فَصَلِّ قَالَ لَنَا قَدِّمُوْا رَجُلًا مِنْكُمْ يُصَلِّىْ بِكُمْ وَسَاُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا اُصَلِّىْ بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ اِلَّا اَنَّهٗ اقْتَصَرَ عَلٰى لَفْظِ النَّبِىِّ ﷺ)

১০৫২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবূ আতিয়্যা উকাইলী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবী হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা.) আমাদের মসজিদে আসতেন এবং আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসসমূহ বর্ণনা করতেন। একদা এমতাবস্থায় নামাজের সময় হয়ে গেল। আবূ আতিয়্যা বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম, হুজুর! আগে যান এবং নামাজ পড়িয়ে দিন, তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য হতেই আগে একজনকে বাড়িয়ে দাও, সে তোমাদের নামাজ পড়াবে। তবে আমি তোমাদেরকে এখনই বলব, কেন আমি তোমাদের নামাজ পড়াব না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের [সম্প্রদায়ের] মধ্য হতেই যেন কেউ ইমামতি করে। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী কেবল নবী করীম ﷺ-এর বাণী টুকুই উল্লেখ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ اِمَامَةِ الزَّائِرِ **আগন্তুক ব্যক্তির ইমামতি সম্পর্কে মতপার্থক্য :** কেউ কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করলে সে তাদের ইমামতি করতে পারবে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে–

مَذْهَبُ اِسْحَاقَ : ইমাম ইসহাক (র.)-এর মতে আগন্তুক ব্যক্তির ইমামতি করা বৈধ নয়, যদিও তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না কেন? তিনি দলিল হিসাবে আবূ আতিয়্যার এ হাদীসটি পেশ করেন–

عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا اِلىٰ مُصَلَّانَا ... .. سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ জমহুর ওলামার মতে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য অনুমতি সাপেক্ষে ইমামতি করা বৈধ। তবে নির্ধারিত ব্যক্তিই উত্তম। তাঁরা দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীসটি পেশ করেন–

عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَلَا يَقْعُدُ فِىْ بَيْتِهٖ عَلىٰ تَكْرِمَتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইমাম ইসহাক (র.) আবূ আতিয়্যা উকাইলীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল প্রদান করেছেন এর জবাব হলো, সাহাবী হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রা.) অনুমতি পাওয়ার পরেও ইমামতি না করার কারণ হলো, তিনি সতর্কতা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রকাশ্য হাদীসের উপর আমল করেছেন– নাজায়েজের পরিপ্রেক্ষিতে নয়। কেননা অনুমতি সাপেক্ষে ইমামতি করা যে বৈধ, তা হাদীসের ভাষ্যেই সুস্পষ্টভাবে অনুমেয়। অতএব মালেক ইবনে হুয়াইরিছের আমল শুধুমাত্র সতর্কতার উপরই সীমাবদ্ধ।

অতএব বলা যায় যে, সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকার পর হযরত আবূ আতিয়্যাহ উকাইলীর হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (كَمَا فِىْ بَذْلِ الْمَجْهُوْدِ وَمُقَدَّمَةِ اِعْلَاءِ السُّنَنِ)

وَعَنْ ١٠٥٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ اِسْتَخْلَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ اَعْمٰى ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১০৫৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাবুক যুদ্ধে গমনকালে] সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের ইমামতি করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন অন্ধ।–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ اِمَامَةِ الْاَعْمٰى **অন্ধ ব্যক্তির ইমামতির ব্যাপারে মতপার্থক্য :** আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা অন্ধের ইমামতি বৈধ হিসাবে গণ্য হয়। এ ব্যাপারে সকল আলিমের একই মত। তবে অন্ধের ইমামতি মাকরূহ কি না, সে ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে।

- একদল ওলামা বলেন, অন্ধের ইমামতি মাকরূহ নয়। তাঁরা হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত উপরোল্লিখিত উম্মে মাকতূমের ঘটনাটি বর্ণনা করেন।
- অন্য একদল ইমামের মতে অন্ধের ইমামতি সাধারণত মাকরূহ। কেননা তারা অন্ধত্বের কারণে অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে পারে না।
- অপর আর একদল ওলামা বলেন, অন্ধের চেয়ে সুস্থ ও অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কোনো সম্প্রদায়ে না থাকে তা হলে অন্ধের জন্য ইমামতি করা মাকরূহ হবে না। আর যদি তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তা হলে অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরূহ হবে।

وَعَنْ ١٠٥٤ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ اٰذَانَهُمْ اَلْعَبْدُ الْاٰبِقُ حَتّٰى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১০৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না। (অর্থাৎ কবুল হয় না) (১) পলাতক দাস যতক্ষণ না সে [তার মালিকের নিকট] ফিরে আসে। (২) সেই রমণী, যে রাত যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর [ন্যায়সঙ্গতভাবে] অসন্তুষ্ট এবং (৩) কোনো সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকেরা [সঙ্গত কারণে] পছন্দ করে না।– [তিরমিযী। কিন্তু তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا تُجَاوِزُ صَلٰوتُهَا اٰذَانَهُمْ -এর বিশ্লেষণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির নামাজ তার কানের সীমা অতিক্রম করে না। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তুরেপেশতী বলেন, উত্তম আমল যেমন আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করা হয়, কিন্তু এ সমস্ত ব্যক্তিদের নেক আমলসমূহ সেভাবে পেশ করা হয় না। অর্থাৎ তাদের আমল কবুল না হওয়াকে কানের সীমা অতিক্রম করবে না দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসে কানকে উল্লেখ করার কারণ হলো দোয়া প্রার্থনার শব্দ সর্বপ্রথম কানেই গিয়ে পৌছে।

পলাতক গোলামের নামাজ : মালিকের অনুমতি ব্যতীত পলাতক গোলামের নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় না। অবশ্য ফরযিয়্যাতের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যায়। এর সাদৃশ্য আরো বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন– মসজিদের প্রতিবেশীর নামাজ মসজিদ ব্যতীত হয় না। সাবালেগা নারীর নামাজ তার গৃহের প্রকোষ্ঠ ব্যতীত হয় না ইত্যাদি।

যে স্ত্রী স্বামীর অসন্তুষ্টি অবস্থায় রাত কাটায় এর অর্থ : স্ত্রীর অশুভ আচরণ কিংবা স্বামীর প্রতি উদাসীন, এসব কারণের কোনো একটির ফলে যদি স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তখন তার নামাজ কবুল হবে না। কেননা ক্রটি তার নিজেরই। আল্লামা ইবনুল মালিক এ ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এটা ব্যতীত অবাঞ্ছিতভাবে যদি স্বামী অসন্তুষ্ট হয় তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। অবশ্য আল্লামা মুযহির এই শর্ত শুধুমাত্র চরিত্রহীনতার সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। স্ত্রীর চরিত্র ভাল থাকলে অহেতুক স্বামীর অসন্তুষ্টিতে কিছু আসে যায় না। (كَمَا فِى الْمِرْقَاتِ)

حُكْمُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ মুসল্লিরা যে ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট তার ইমামতি সম্পর্কে অভিমত : ইমাম শাওকানী (র.) নায়লুল আওতার গ্রন্থে বলেন, মুক্তাদিরা যে ইমামের উপর অসন্তুষ্ট তার ইমামতি করা যে হারাম এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি। এটা ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করা যায়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلٰوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ . اَلْحَدِيْثُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

এ ছাড়াও হযরত আলী (রা.), আসওয়াদ ইবনে হেলাল এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস (র.) একে মাকরূহ বলেছেন।

একদল ওলামায়ে কেরাম বলেন, শরিয়তের কোনো ব্যাপারে যদি মানুষেরা ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তবে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ বা কোনো ঘটনা এর সাথে জড়িত থাকলে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা আরো বলেন, এ খারাপ ধারণা অধিকাংশ মুক্তাদিদের থাকতে হবে, দুই এক জনের থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, ইমাম যদি খোদাভীরু দীনদার হয়, তা হলে লোকদের খারাপ ধারণা গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং এতে মুক্তাদিরাই গুনাহগার হবে।

وَعَنْ ١٠٥٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلٰوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّاْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১০৫৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তিন ব্যক্তি এমন, যাদের নামাজ কবুল হয় না। (১) যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের ইমামতি করে, অথচ তারা তাকে [ন্যায়সঙ্গত কারণেই] পছন্দ করে না। (২) যে ব্যক্তি 'দেবারে' নামাজ পড়তে আসে, 'দেবার' হলো, উত্তম সময় চলে যাওয়ার পর নামাজ পড়তে আসা। (৩) যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীনা নারী [বা স্বাধীন পুরুষ] কে দাসী [বা দাসে] পরিণত করে। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : دِبَارٌ পদটি মাসদার অর্থাৎ اَتَى الصَّلٰوةَ اِتْيَانَ دِبَارٍ যে বিনা কারণে জামাত শেষ হলে মসজিদে আসে এবং এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। অথবা সময় অতিবাহিত হলে নামাজ পড়ে থাকে।

اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً অর্থাৎ যে অন্যকে জবরদস্তিমূলক গোলাম বানিয়েছে। عَبْدٌ مُحَرَّرٌ -ও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত মেয়েলোক দুর্বল হয় বলে مُحَرَّرَةً পদটি স্ত্রীলিঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٠٥٦ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُوْنَ اِمَامًا يُصَلِّىْ بِهِمْ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১০৫৬. অনুবাদ : হযরত সালামা বিনতে হুর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে এটাও অন্যতম যে, মসজিদে সমবেত নামাজিগণ একে অপরকে ঠেলবে অর্থাৎ ইমামত করার জন্য আহ্বান করবে; কিন্তু তাদের নামাজ পড়তে পারে এমন কোনো ইমাম পাবে না। –[আহমদ, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنْ يَتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূল ﷺ-এর আলোচ্য বাণীর অর্থ হলো, মসজিদে সমবেত নামাজিগণ একে অপরকে ইমামতি করার জন্য আহ্বান করবে। রাসূলে কারীম ﷺ একে কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। অবশ্য হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন–

প্রথমত تَدَافُعْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মসজিদে সমবেত নামাজীগণ প্রত্যেকেই নিজেকে ইমামতির অযোগ্য মনে করে বলবে, নামাজ শুদ্ধ হওয়ার যথার্থ ইলম আমার নেই।

দ্বিতীয়ত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একে অপরকে ইমাম হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে ধাক্কা দেবে অথবা মিহরাবের দিকে ঠেলে দেবে; কিন্তু স্বল্প ইলমের কারণে সে তা প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটাই হবে মূর্খতার চরম ঠিকানা এবং কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন।

তৃতীয়ত تَدَافُعْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো ইমাম পাওয়া যাবে না যিনি পারিশ্রমিক ব্যতীত নামাজ পড়াতে সম্মত হবেন। এর উপর ভিত্তি করে ওলামায়ে মুতায়াখ্খিরীন ইমামতি করে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

وَعَنْ ١٠٥٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১০৫৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ প্রত্যেক নেতার সহযোগে, চাই সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক; যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। নামাজ তোমাদের উপর ফরজ যে কোনো মুসলমানের পিছনে, চাই সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে এবং প্রত্যেক মুসলমান মৃতের জানাযা পড়া ফরজ, চাই সে পুণ্যবান হোক বা পাপাচারী হোক, যদিও সে কবীরা গুনাহ করে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইমামতি করার মতো যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া না গেলে কে ইমামতি করবে? আলোচ্য হাদীস অনুসারে অধিকাংশ ওলামা বলেন, ভালো লোক পাওয়া না গেলে বা তাকে ইমাম করা সম্ভবপর না হলে ফাসেক লোকের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ আছে, তবুও জামাত তরক করা যাবে না। অবশ্য তার পাপাচার কুফরি সীমায় যেন না পৌঁছে। আমাদের বুজুর্গানে দীনের কার্যকলাপ হতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা জালিম শাসকের পিছনে নামাজ পড়তেন। শায়খাইন বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে নামাজ পড়তেন। হযরত আনাস (রা.)-ও তার পিছনে নামাজ পড়তেন।

উক্ত হাদীস হতে এটাও বুঝা যায় যে, কোনো মু'মিন কবীরা গুনাহ করলে সে ইসলামের গণ্ডির বহির্ভূত হয়ে যায় না। আর কোনো মুসলমান আত্মহত্যা করলে সমাজের ইমাম বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য লোকেরা তার জানাযা পড়তে হবে। কেননা এমন ব্যক্তিকে কাফির বলা যায় না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১০৫৮ - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ (رض) قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرِّ النَّاسِ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ نَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُوْنَ يَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَهُ اَوْحٰى اِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ اَحْفَظُ ذٰلِكَ الْكَلَامَ. فَكَاَنَّمَا يَغْرٰى فِىْ صَدْرِىْ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُوْمُ بِاِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اُتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ فَاِنَّهُ اِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِىٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ اَبِىْ قَوْمِىْ بِاِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللّٰهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوْا صَلٰوةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا وَصَلٰوةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْثَرُكُمْ قُرْاٰنًا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَكْثَرَ قُرْاٰنًا مِنِّىْ لِمَا كُنْتُ اَتَلَقّٰى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِىْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَاَنَا ابْنُ سِتٍّ اَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ

১০৫৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে সালিমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লোক চলাচলের পার্শ্বে এক জলাধারের নিকটে বাস করতাম। আমাদের এখান দিয়ে আরোহী যাত্রীগণ যাতায়াত করত। আমরা পথচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের কি হলো? [লোকেরা কি বলে?] [আলোচিত] লোকটি কে? [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ নামে যে লোকটি নতুন দীন প্রচার করছেন তাঁর সম্পর্কে লোকেরা কি বলছে? আর তাঁর প্রচারিত দীন সম্পর্কে তাদের কি খেয়াল?] তখন তারা বলত, সে ব্যক্তি মনে করে, তাকে আল্লাহ নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতি এরূপ ওহী নাজিল করেছেন। তখন [তাদের কাছে শুনা] ওহী বা বাণীটি আমি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম, যেন তা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত, কিন্তু আরবগণ তাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে [মুসলমানদের মক্কা] বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। আর তারা বলছিল যে, তাকে [মুহাম্মদ ﷺ-কে] তাঁর গোত্রের সাথে লড়তে দাও। যদি সে তার গোত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে তা হলে বুঝব যে, সে সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয় সংঘটিত হলো, তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করল, [কাদের আগে কারা ইসলাম গ্রহণ করবে] আমার পিতা আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের আগেই তাড়াতাড়ি ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন নিজ গোত্রে ফিরে আসলেন, বললেন– আল্লাহর কসম! আমি এক সত্য নবীর কাছ হতে তোমাদের কাছে আসলাম। তিনি বলে থাকেন, এই নামাজ এই সময় পড়বে, ঐ নামাজ ঐ সময় পড়বে। যখন নামাজের সময় হবে, তোমাদের মধ্য হতে যেন একজন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে ভাল কুরআন পাঠ করে, সে যেন ইমামতি করে। তখন আমাদের গোত্রের লোকরা চিন্তা- ভাবনা করল এবং দেখল, আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানা আর কেউ নেই। কেননা আমি আরোহী পথিকদের কাছ হতে তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম।

وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ اَلَا تُغَطُّوْنَ عَنَّا اِسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِيْ قَمِيْصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرْحِيْ بِذٰلِكَ الْقَمِيْصِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

তখন লোকেরা আমাকে ইমাম বানিয়ে সম্মুখে দিল, অথচ তখন আমি ছয় সাত বৎসরের বালক মাত্র। তখন আমার গায়ে শুধু একটি চাদর ছিল। যখন আমি সিজদা করতাম তা শরীর হতে উপরের দিকে উঠে যেত। এটা দেখে গোত্রের এক মহিলা লোকজনকে বলল, তোমরা কি তোমাদের ইমামের নিতম্ব আমাদের দৃষ্টি থেকে ঢাকবে না? তখন তারা কাপড় ক্রয় করল এবং আমার জন্য একটি জামা বানিয়ে দিল। এই জামা পেয়ে আমি যতটা আনন্দিত হয়েছি ইতঃপূর্বে আর কোনো কিছুতে এত আনন্দিত হইনি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ اِمَامَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ الْبُلُوْغِ فِى النَّفْلِ **নফল নামাজে নাবালেগের ইমামতির হুকুম** : নফল নামাজে নাবালেগের ইমামতি জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

নাবালেগের ইমামতি জায়েজ বা নাজায়েজ হওয়ার ব্যাপারে উভয় অভিমত রয়েছে। হেদায়া কিতাবে বলখের প্রবীণ ও বিজ্ঞ মাশায়েখগণ তারাবীহ, সাধারণ নফল ও সুন্নত নামাজে নাবালেগের ইমামতি জায়েজ বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদও এ মত সমর্থন করেন। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, কোনো প্রকারের নামাজেই বালকের ইমামতি জায়েজ নেই। হানাফী মাযহাবে এ অভিমতই গ্রহণযোগ্য। কেননা কোনো বয়স্ক লোক নফলের নিয়ত করলেই তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোনো কারণে সে নফল নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় তা কাজা করা ওয়াজিব হয়, কিন্তু কোনো বালকের নামাজ কোনো অবস্থাতেই ওয়াজিব হয় না। সুতরাং কোনো অবস্থায়ই বালক ইমামতের যোগ্য নয়। অতএব তার পিছনে এক্তেদা করা জায়েজ নেই।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْبُخَارِيِّ ইমাম শাফেয়ী ও বুখারী (র.) আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, নাবালেগের ইমামতি জায়েজ। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নাবালেগ হলেও ভাল-মন্দের তারতম্য-জ্ঞান হওয়া আবশ্যক।

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আহমদ, ইসহাক, আওযায়ী ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামতি জায়েজ নেই। তাঁরা দলিল পেশ করেন যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ ইমাম হলেন জামিনদার। বালকের নামাজ হলো নফল। অতএব সে ফরজ নামাজের জামিনদার হতে পারে না। কেননা জামিনদার যার জামিন হবে সে অন্যদের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য হতে হবে। বালকের বেলায় তা পাওয়া যায় না।

এ ছাড়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتّٰى يَحْتَلِمَ কোনো বালক প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ইমামত করবে না। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে, لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِيْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ এমন বালক ইমামতি করবে না যার উপরে 'হদ' ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ শরিয়তের অনুশাসন প্রযোজ্য নয়।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِهِمْ **তাদের দলিলের উত্তর** : হাসান বসরী (র.) বলেছেন, আমর ইবনে সালামার হাদীসটি যঈফ। সুতরাং এর দ্বারা কোনো দলিল কায়েম হতে পারে না। অবশেষে আমাদের মূল কথা হলো, একটি বালকের কথা হতে দলিল গ্রহণ করা ঠিক হবে না, যে বলেছেন, নামাজের সময় তার সতর প্রকাশ পেত। অথচ সকলের মতে সতর ঢাকা ফরজ। এটা ছাড়াও আমর ইবনে সালামাকে তার গোত্রের লোকেরা ইমাম বানিয়েছিল। এতে হুজুর ﷺ-এর কথা বা কাজ কিংবা সম্মতি কিছুই ছিল না। গোত্রের লোকদের মনোনীত ও নির্বাচিত ইমাম। অথচ এ নির্বাচন সম্পর্কে হুজুর ﷺ অবগত ছিলেন না। বড় জোর এটা গোত্রের লোকদের চিন্তা-ভাবনা বা ইজ্‌তেহাদ। কিন্তু ওহী নাজিল হওয়ার যুগে এই ধরনের ইজ্‌তেহাদ দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ١٠٥٩ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَفِيْهِمْ عُمَرُ وَاَبُوْسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْاَسَدِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১০৫৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [নবী করীম ﷺ-এর হিজরতের প্রাক্কালে] মুহাজিরদের প্রথম দল যখন মদীনায় পৌছল, তখন আবূ হুযাইফার গোলাম হযরত সালেম (রা.) তাদের নামাজের ইমামতি করতেন, অথচ তাদের মধ্যে হযরত ওমর ও আবূ সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ [-এর ন্যায় বিজ্ঞ লোক]-ও বিদ্যমান ছিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে ইসলামের সাম্য নীতির জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন, বংশ-মর্যাদা বা আভিজাত্য নয়; বরং তোমাদের মধ্যে খোদাভীরুতায় যে শ্রেষ্ঠ, সে প্রকৃত সম্মানিত ব্যক্তি। হযরত সালেম একজন ক্রীতদাস হওয়া সত্ত্বেও তিনি হযরত ওমর ও আবূ সালামা প্রমুখ সম্মানিত সাহাবীদের ইমামত করেছেন। তারা সালেমের ইমামতিকে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে বরণ করেছেন। হযরত সালেম এক দিকে যেমন অত্যধিক কুরআন সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অপর দিকে তেমনি বড় কারীও ছিলেন। মহানবী ﷺ যে চার ব্যক্তির নিকট হতে জনগণকে কুরআন শিক্ষা করতে বলেছেন, হযরত সালেম তাদের অন্যতম।

وَعَنْ ١٠٦٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلٰوتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১০৬০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তিন ব্যক্তি আছে যাদের নামাজ তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠানো হয় না [অর্থাৎ আল্লাহ কবুল করেন না] (১) যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতি করেন অথচ তারা [ন্যায়সঙ্গত কারণে] তার উপর নাখোশ। (২) যে স্ত্রীলোক রাত যাপন করল অথচ তার স্বামী [ন্যায়সঙ্গত কারণেই] তার উপর অসন্তুষ্ট থাকল এবং (৩) সেই দুই ভাই, যারা [পরস্পর কলহের কারণে] পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالْاَخِ وَحُكْمِ الْهِجْرَانِ **ভাই দ্বারা উদ্দেশ্য এবং পরস্পর বিরাগ হওয়ার বিধান** : এখানে 'ভাই' অর্থ– মুসলমান ভাই। যারা সর্বদা পরস্পর একত্রিত হতো এবং কথাবার্তা বলত, এরূপ দুই মুসলমানের স্বেচ্ছায় রাগ করে তিন দিনের অধিক কাল কথাবার্তা বন্ধ করা বা সালাম-কালাম না করা হারাম। সালাম-কালাম করলে তখন সে হারাম তথা কবীরা গুনাহ্ হতে রেহাই পাওয়া যায়। তদ্রূপভাবে জেদ করে কোনো মুসলমানের সাথে কথা বলবে না বলে কসম করাও হারাম। এরূপ কসম ভঙ্গ করে তার কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব।

بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ
পরিচ্ছেদ : ইমামের কর্তব্য

ইমাম হলেন মুসলিম মিল্লাতের নেতা, এই নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যধিক, বিশেষ করে নামাজে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর মুসল্লিদের সকল দায়-দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয় তখন মুক্তাদিদের উপর লক্ষ্য রাখা তাঁর উপর একান্ত কর্তব্য, তাদের অবস্থা ও সময়ের দিকে লক্ষ্য করে নামাজ সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘায়িত করা ইমামের উচিত। অনেক সময়ে জামাতে অনেক দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক উপস্থিত হয়, এ সময়ে কেরাআত, রুকু, সেজদা প্রভৃতি দীর্ঘায়িত করলে মানুষ জামাতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কাজেই এ সব দিকে লক্ষ্য রেখেই ইমামকে নামাজ পড়াতে হবে, মহানবী ﷺ-ও প্রয়োজনে এরূপ করতেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٦١ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلٰوةً وَلَا اَتَمَّ صَلٰوةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنْ تُفْتَنَ اُمُّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬১. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ অপেক্ষা কোনো ইমামের পিছনে এত সংক্ষেপ অথচ এত পরিপূর্ণ নামাজ কখনও পড়িনি [তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে,] যখন তিনি [নামাজের মধ্যে থেকে] কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনতেন, তখন তার মা উদ্বিগ্ন হবে এ আশঙ্কায় নামাজ সংক্ষিপ্ত করে ফেলতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ يَجُوْزُ تَطْوِيْلُ الرُّكُوْعِ لِقَادِمٍ কোনো আগন্তুকের জন্য রুকু দীর্ঘায়িত করা জায়েজ আছে কি না? কোনো আগন্তুক মুসল্লির জন্য রুকু দীর্ঘ জায়েজ আছে কি না? এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা নিম্নরূপ–

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, কোনো কোনো শাফেয়ী আলিম বলেন, রুকু অবস্থায় ইমাম যদি মনে করে যে কেউ নামাজে শরিক হতে চায় তা হলে ইমাম রুকু কিছুটা দীর্ঘায়িত করবেন, যাতে আগত ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং ঐ রাকাতটিও জামাতের সাথে পড়ার ফজিলত লাভ করতে পারে। কেননা যদি দুনিয়াবী ব্যাপারে মানবীয় কারণে নামাজকে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, তবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের ব্যাপারে নামাজকে দীর্ঘায়িত করা তো জায়েজ হবেই।

ইমাম শা'বী, হাসান বসরী ও ইবনে আবূ লায়লা এ মতের অনুসারী।

ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আবূ সাওর বলেন, এতটুকু অপেক্ষা করা যাবে যেন অন্যান্য নামাজিদের অসুবিধা না হয়।

ইমাম আযম, মালেক, শাফেয়ী ও আওযায়ী প্রমুখ বলেন যে, আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। কারণ, এতে অপরাপর মুসল্লিদের কষ্ট হবে। তারা এরূপ অপেক্ষা করাকে মাকরূহ মনে করেন। ইমাম আযম (র.) বলেন যে, ইমাম আগন্তুক ব্যক্তির সুবিধার্থে রুকু দীর্ঘায়িত করলে তার উপরে একটা বড় পাপ অর্থাৎ শিরক বর্তানোর আশঙ্কা করছি। তবে আগত মুক্তাদি ব্যক্তিটি যদি অত্যন্ত বদমেজাজী হয় তা হলে কিছুটা বিলম্ব করা জায়েজ আছে, তবে সর্বদা এরূপ করা জায়েজ হবে না।

وَعَنْ ١٠٦٢ - أَبِي قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلٰوةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلٰوتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১০৬২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি অনেক সময় নামাজে প্রবেশ করি এবং ইচ্ছা করি যে, তাকে দীর্ঘায়িত করব। আর যখনই কোনো শিশুর ক্রন্দন শুনি, তখন আমি আমার নামাজকে সংক্ষেপ করি। কেননা, আমি জানি যে, শিশুর ক্রন্দনে তার মাতার মনের উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। –[বুখারী]

وَعَنْ ١٠٦٣ - أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬৩. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ মানুষের নামাজ পড়ায়, সে যেন নামাজকে সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রুগ্ণ, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকেরাও থাকে। আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নামাজ পড়ে তখন সে যে পরিমাণ ইচ্ছা দীর্ঘায়িত করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে সংক্ষিপ্ত করার দ্বারা কোনো অঙ্গকে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তকরণ নয়, বরং কেরাত, রুকু সেজদাকে সংক্ষেপকরণ, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়।

وَعَنْ ١٠٦٤ - قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَا تَأَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجَلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬৪. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত কায়েস ইবনে আবূ হাযেম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ মাসউদ আনসারী [সাহাবী] আমাকে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি অমুকের কারণে ফজরের নামাজে খুব বিলম্ব করে ফেলি। কারণ, সে আমাদেরকে খুব দীর্ঘ নামাজ পড়ায়। [রাবী বলেন, এই নালিশের পরে] সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওয়াজে এত রাগান্বিত দেখেছি যে, এরূপ আর কখনও দেখিনি। অতঃপর রাসূল ﷺ উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নামাজকে দীর্ঘায়িত করে মানুষকে [জামাতের প্রতি] বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। অতঃপর তোমাদের যে কেউ কোনো মানুষকে যে কোনো নামাজই পড়াক না কেন, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مِنْ اَجْلِ فُلَانٍ **দ্বারা উদ্দেশ্য** : একদা এক সাহাবী কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিট অভিযোগ করেছিলেন। যার সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছিল তিনি ছিলেন সেই গোত্রের বা সে গ্রামের মসজিদের ইমাম। তিনি খুব দীর্ঘ করে নামাজ পড়াতেন। যা অন্যের জন্য কষ্টকর ছিল।

سَبَبُ اَشَدِّ الْغَضَبِ **অধিক রাগ হওয়ার কারণ** : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَصْلِ لَا لِلْفَصْلِ অর্থাৎ রাসূল ﷺ-কে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বাসীকে একত্রিত করার জন্য, তাদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য নয়। সুতরাং নামাজে দীর্ঘ কেরাতের ফলে মানুষ ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এ জন্যই নবী করীম ﷺ অধিক রাগান্বিত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি শুধুমাত্র ইমামকে না বলে ওয়াজের মজলিসে জনসমক্ষে বলার কারণ হলো তাঁর রাগান্বিত হওয়াটা ছিল দীনের ক্ষতির কারণে, স্বীয় স্বার্থের জন্য নয়, তাই জনসমক্ষে তা প্রকাশ করে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

١٠٦٥ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَاِنْ اَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১০৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তোমাদেরকে তারা [পরবর্তী ইমাম ও আমীরগণ] নামাজ পড়াবে, যদি নামাজকে যথাযথভাবে ঠিকমত পড়ায় তাহলে এর লাভ তোমাদের সকলের জন্যই। আর যদি তারা ভুল বা বে-ঠিক পড়ায় তা হলেও তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। আর তাদের উপরে এর দায়িত্ব বর্তাবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : সরল বিশ্বাসে যে মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করে, ইমাম বে-ঠিক নামাজ পড়ালেও সঠিক নিয়ত ও একাগ্রতার কারণে মুক্তাদির নামাজ আদায় হবে এবং তার ফজিলত লাভ করবে। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ইমাম দায়ী হবে। অতএব ইমামকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِىْ

এ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٦٦ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ (رض) قَالَ اٰخِرُ مَاعَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَمْتَ قَوْمًا فَاَخِفَّ لَهُمُ الصَّلٰوةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اُمَّ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئًا قَالَ اُدْنُهْ فَاَجْلَسَنِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِىْ صَدْرِىْ بَيْنَ ثَدْيَىَّ ثُمَّ قَالَ تَحَوَّلْ فَوَضَعَهَا فِىْ ظَهْرِىْ بَيْنَ كَتِفَىَّ ثُمَّ قَالَ اُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرُ وَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَاِنَّ فِيْهِمْ ذَا الْحَاجَةِ فَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ .

১০৬৬. অনুবাদ : হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ আমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল এই যে, যখন তুমি কোনো জনতার ইমামতি করবে তখন নামাজকে সংক্ষেপ করে পড়াবে। −[মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তোমার গোত্রের ইমামতি করো। উসমান ইবনে আবুল আস (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মনে একটু ভীতি উপলব্ধি করি [ইমামতের দায়িত্বের ব্যাপারে অন্তরে ভয় অনুভব করি]। রাসূল ﷺ বললেন, আমার কাছে আস। তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন। অতঃপর তাঁর হাত আমার বক্ষের মধ্যখানে রাখলেন। তারপর বললেন, পিঠ ফিরাও। অতঃপর তিনি আমার পিঠের মধ্যখানে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, তুমি তোমার গোত্রের ইমামতি করো। আর যে ব্যক্তিই কোনো জনতার ইমামতি করে, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক থাকে, তাদের মধ্যে রুগ্‌ণ লোক থাকে, তাদের মধ্যে দুর্বল লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কর্মব্যস্ত লোকও থাকে। আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নামাজ পড়ে, তখন সে যেরূপ ইচ্ছা পড়বে। [অর্থাৎ ইচ্ছা করলে নামাজকে দীর্ঘায়িত করতে পারে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحِكْمَةُ فِىْ وَضْعِ كَفِّ النَّبِىِّ ﷺ فِى الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ বক্ষ ও পিঠে রাসূল ﷺ-এর হাত রাখার তাৎপর্য : মহানবী ﷺ হযরত উসমান ইবনে আবিল আস (রা.)-কে নিজ সম্প্রদায়ের নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি ইমামতির দায়িত্বের ব্যাপারে অন্তরের ভীতির কথা রাসূল ﷺ-কে জানালেন। তখন রাসূল ﷺ প্রথমে তাঁর বক্ষে এবং পরে পিঠে হাত রেখে তাকে সাহস প্রদান করেন। এর তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বিভিন্ন প্রকার সংশয়-সন্দেহ এবং কুরআন, মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে গভীর ধারণা না থাকায় উসমান ইবনে আবিল আস (রা.) ইমামতির যাবতীয় শর্ত আদায়ের ব্যাপারে অন্তরে একটা ভয় অনুভব করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বরকতময় হাত হযরত উসমান (রা.)-এর বক্ষে ও পিঠে রেখেছিলেন যাতে তার অন্তর হতে এসব দূরীভূত হয়ে যায়।

ইমাম নববী (র.) এর তাৎপর্য বর্ণনায় বলেন, হযরত উস্মান ইবনে আবিল আস (রা.)-এর অন্তরের অহঙ্কার সৃষ্টির সম্ভাবনা দূরীভূত করার জন্যই রাসূল ﷺ তার বক্ষে ও পিঠে হাত রেখেছিলেন। (كَمَا فِى التَّعْلِيْقِ الصَّبِيْحِ)

أَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئًا -এর ব্যাখ্যা : شَيْئًا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমামতির পূর্ণ দায়িত্ব ও শর্তাবলি পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে না পারা। হতে পারে এর কারণ ওয়াসওয়াসা বা সংশয় ; কুরআন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্পর্কে অবহিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَعَنْ ١٠٦٧ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالتَّخْفِيْفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

১০৬৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাজ সংক্ষেপ করতে আদেশ করতেন, আর তিনি নিজে সূরা সাফফাত দ্বারা আমাদের ইমামতি করতেন।-[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি تَعَارُضٌ **এবং তার সমাধান** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নামাজ সংক্ষেপ করার নির্দেশ দিতেন। অথচ তিনি নিজে সূরায়ে সাফ্ফাত দ্বারা নামাজ পড়াতেন। এ সূরাটি দীর্ঘ বিধায় নামাজও দীর্ঘ হতো। এখন রাসূল ﷺ-এর কথা এবং কাজের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে হাদীস বিশারদগণ বলেন, নবীয়ে কারীম ﷺ-এর কেরাত শ্রোতাদের কাছে এত মধুর লাগত যে, দীর্ঘ কেরাতও সংক্ষিপ্ত মনে হতো। আরও কিছুক্ষণ নামাজে দাঁড়িয়ে কেরাত শোনার জন্য সাহাবীগণের মন ব্যাকুল হয়ে থাকত। রাসূলে কারীম ﷺ-এর কণ্ঠস্বরও ছিল আকর্ষণীয়। তিনি কথার মতো করে তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করতেন। রাসূল ﷺ সূরা সাফ্ফাত-এর মতো সূরা পড়লেও লোকের কাছে সংক্ষিপ্ত মনে হতো, অথচ অন্য লোকে সেই সূরা পড়লে ক্লান্তি-বিরক্তি বোধ করত। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর কথা ও কাজে কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন যে, মুক্তাদিদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে নামাজ সংক্ষেপ বা দীর্ঘায়িত করাই বর্ণিত হাদীসের মূল অর্থ।

بَابُ مَا عَلَى الْمَامُوْمِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وَحُكْمُ الْمَسْبُوْقِ

পরিচ্ছেদ : মুক্তাদির আনুগত্যের অপরিহার্যতা ও মাসবুকের বিধান

ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদির একান্ত কর্তব্য। তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত যাবতীয় কর্মে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদির জন্য ফরজ, এটা নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত, এর ব্যতিক্রম হলে মুক্তাদির নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে। ইমামের অনুসরণ তিন প্রকারে হতে পারে, যথা–

১. اَلْمُقَارَنَةُ لِفِعْلِ الْاِمَامِ তথা ইমামের সাথে সাথেই মুক্তাদির কাজ করা।

২. اَلْمُعَاقَبَةُ بَعْدَ فِعْلِ اِمَامِهِ অর্থাৎ ইমামের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দেরি না করে কাজ শুরু করা।

৩. اَلْمُتَرَاخِيَةُ عَنْهُ অর্থাৎ ইমামের কাজ শেষ হওয়ার পরে কাজ শুরু করা। সকলের ঐকমত্যে এর মধ্যে তৃতীয়টি জায়েজ নেই। সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ীর মতে দ্বিতীয় প্রকারের অনুসরণ উত্তম, আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে প্রথম প্রকারের অনুসরণ উত্তম, তবে এ অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা ও সালাম ফিরানোর সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

مسبوق **মাসবুক** : যে মুক্তাদি ইমামের সাথে প্রথম হতেই শরিক হতে পারেনি, তথা নামাজের প্রথম দিকে কিছু ছুটে যায় তাকে মাসবুক বলে। এরূপ ব্যক্তি ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর বাম দিকে সালাম ফিরানো শুরু করলে তখন দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট নামাজ আদায় করবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে মুক্তাদির কর্তব্য এবং মাসবুকের করণীয় সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٦٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৬৮. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর পিছনে নামাজ পড়তাম। রাসূল ﷺ যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখন আমাদের কেউই [সিজদার জন্য] পিঠ ঝুঁকাত না যতক্ষণ না, নবী করীম ﷺ তাঁর কপাল [সিজদায়] জমিনে রাখতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুক্তাদিদের ইমামের অনুসরণের উত্তমতার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমামের অনুসরণের বেলায় মুয়াকাবা অর্থাৎ ইমামের কার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেরি না করে কাজ শুরু করা এবং মুকারানা অর্থাৎ ইমামের কাজের সাথে সাথে মুক্তাদিরও কাজ করা– এই দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالصَّاحِبَيْنِ : ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং সাহেবাইন (র.)-এর মতে মুয়াকাবা পদ্ধতি উত্তম। তাঁরা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে বর্ণিত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর হাদীসসহ নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন–

(١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ لَاتُبَادِرُوْا الْاِمَامَ اِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢) عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) بِلَفْظِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلَا تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ - (اَلْحَدِيْثُ)

তাঁরা আকলী যুক্তিস্বরূপ বলেন, মুক্তাদিরা হলো ইমামের তাবে বা অনুসারী। একটি কাজ শেষ হলেই তাঁর অনুসরণ হয়ে থাকে। এখানে মুকারানা পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হলে ইমামের বাস্তব অনুসরণ করা হবে না। সুতরাং মুয়াকাবা পদ্ধতিই উত্তম।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মুকারানা পদ্ধতি উত্তম। তিনি দলিল হিসাবে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি উল্লেখ করেন–

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ

হাদীসটির বিশ্লেষণে বলা যায় যে, ইতমাম বা পরিপূর্ণ করার মৌলিক অর্থ হলো মুয়াফিকাত বা অনুসরণ। যথার্থ অনুসরণ তখনই হবে যখন মুক্তাদিরা সাথে সাথে ইমামের অনুসরণ করবে। নতুবা দেরি করলে ইমামের কাজ হতে মুক্তাদির কাজে ব্যবধান হয়ে পড়তে পারে। এতদ্ব্যতীত মুকারানা অনুসরণে মুক্তাদির কষ্ট এবং সতর্কতা উভয়টি বেশি। অতএব এটাই উত্তম। মুকারানা অনুসরণে নামাজকে ভাল দেখায়। ইসলামের অন্যতম রোকন নামাজের শৃঙ্খলাবোধ অন্য জাতিকেও আকৃষ্ট করে। কিন্তু মুয়াকাবা অনুসরণে ইমামের কাজ শেষ হলে মুক্তাদিগণ কাজ আরম্ভ করে, ফলে ততটা সমতার সাথে কাজ সম্পন্ন হয় না। হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, সম্ভবত সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর সিজদার নিয়ম জানার জন্যই প্রথম যুগে তারা এত দেরি করে সিজদা করতেন। একটু বিলম্ব করে সিজদার নিয়ম পদ্ধতি দেখে নিতেন।

١٠٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ أَمَامِيْ وَمِنْ خَلْفِيْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৬৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন, তখন আমাদের প্রতি মুখ ফিরালেন এবং বললেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব তোমরা রুকু, সিজদা, কিয়াম বা সালাম ফিরানো [অর্থাৎ কোনো কাজই] আমার আগে আগে করো না। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার সম্মুখ হতে এবং পশ্চাত হতে দেখে থাকি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইমামের পূর্বে কোনো কাজ করাই মুক্তাদির জন্য জায়েজ নয়, এরূপ করলে মুক্তাদির নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

١٠٧٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّيْنَ)

১০৭০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা ইমামের আগে কোনো কাজ করো না। ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলেন, তখন তোমরাও [সাথে সাথে] আল্লাহু আকবার বলবে। ইমাম যখন 'وَلَا الضَّالِّيْنَ' বলবেন, তোমরা [মনে মনে] 'আমীন' বলবে। ইমাম যখন রুকূ করবেন, তোমরা সাথে সাথে রুকূ করবে। আর ইমাম যখন বলবেন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ' তখন [সাথে সাথে] তোমরা বলবে, 'اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' –[বুখারী ও মুসলিম। কিন্তু ইমাম বুখারী "যখন ইমাম وَلَا الضَّالِّيْنَ বলেন [তখন তোমরা اٰمِيْنَ বলবে]" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى التَّامِيْنِ **আমীন বলার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ** : ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ বলেন, তখন মুক্তাদিদের ও ইমামের 'আমীন' বলতে হবে কি না? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–ফিরকায়ে ইমামিয়া এবং একদল বিদ'আতীদের মতে ইমামের وَلَا الضَّالِّيْنَ -এর পর 'আমীন' বললে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। তাদের যুক্তি হলো, 'আমীন' শব্দটি কুরআনের কোনো আয়াত বা তার অংশও নয়, এমনকি এটা বিশেষ কোনো জিকরও নয়। অতএব, এটা বললে নামাজ ফাসেদই হয়ে যাবে।

مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ وَاَهْلِ الظَّوَاهِرِ আল্লামা ইবনে হাযম এবং আহলে যাহেরের মতে ইমাম মুক্তাদি সকলের উপর 'আমীন' বলা ওয়াজিব। তারা মুসলিম শরীফে বর্ণিত فَاَمِّنُوْا হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ ইমাম মালেক এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এক অভিমত অনুযায়ী শুধুমাত্র মুক্তাদিদের 'আমীন' বলতে হবে, ইমামের 'আমীন' বলার প্রয়োজন নেই। তাঁদের দলিল হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীস–

اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْن - كَمَا فِىْ اَبِىْ دَاؤُدَ وَغَيْرِهٖ

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, সাহেবাইন এবং ইমাম আবূ হানীফার প্রকৃত অভিমত এই যে, ইমাম মুক্তাদি সকলেরই 'আমীন' বলা আবশ্যক। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, اِذَا اَمَّنَ الْقَارِىْ فَاَمِّنُوْا - .

اَلْاِخْتِلَافُ فِى التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ **তাসমী' এবং তাহমীদের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ** : তাসমী' অর্থাৎ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং তাহমীদ অর্থাৎ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এ বাক্য দু'টি ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়ের বলতে হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে–

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.) -এর মতে শুধুমাত্র ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং মুক্তাদিরা কেবল رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে, তাঁরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এ হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করে তার বিশ্লেষণে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– وَاِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এখানে ইমাম এবং মুক্তাদিদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ পালনের নির্দেশ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَالصَّاحِبَيْنِ وَغَيْرِهِمْ পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, সাহেবাইন, আল্লামা হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইবনে ফযল বলেন– سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ এবং اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ উভয় বাক্যই ইমাম বলবে; কিন্তু মুক্তাদিরা শুধুমাত্র اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে, এর অন্যথা করবে না।

وَعَنْ ١٠٧١ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهٗ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ

১০৭১. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তথা হতে পড়ে গেলেন। যার ফলে তার ডান পার্শ্ব আহত হলো। অতঃপর তিনি [ফরজ] নামাজসমূহের এক ওয়াক্ত নামাজ বসে পড়লেন, আর আমারাও তাঁর পিছনে বসে নামাজ পড়লাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বললেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয়, তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়বে এবং ইমাম যখন রুকু করেন তখন তোমরাও সাথে সাথে রুকু করবে, ইমাম যখন

فَارْكَعُوْا فَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهٗ إِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا هُوَ فِيْ مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهٗ قِيَامٌ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ - (هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلٰى اَجْمَعُوْنَ وَ زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا)

মাথা উঠান তখন তোমরাও সাথে সাথে মাথা উঠাবে। আর ইমাম যখন 'سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ' বলেন তখন তোমরা বলবে, 'رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ' এবং ইমাম যখন বসে নামাজ পড়েন তোমরাও সকলে বসেই পড়বে।

[ইমাম বুখারী বলেন, আমার শায়খ] হুমাইদী বলেছেন, রাসূল ﷺ-এর বাণী 'ইমাম যখন বসে নামাজ পড়েন, তোমরাও বসেই নামাজ পড়বে', এটা তাঁর পূর্ব রোগকালীন বাণী। অতঃপর নবী করীম ﷺ [কোনো কোনো সময়] বসে নামাজ পড়েছেন আর লোক তার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, অথচ তিনি তাদেরকে বসে পড়ার নির্দেশ দেননি। নিয়ম হলো এই যে, নবী করীম ﷺ-এর পর পর কার্যসমূহের শেষটিরই অনুসরণ করতে হয়। এটা ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য। ইমাম মুসলিম 'সকলে বসে পড়বে' শব্দ পর্যন্ত তাঁর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু অপর এক বর্ণনা অনুসারে তিনি শেষের দিকে এই বাক্যটি বাড়িয়ে বলেছেন [অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন] "আর ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করবে না এবং যখন ইমাম সিজদা করেন তোমরাও সিজদা করবে"।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দাঁড়াতে সক্ষম ব্যক্তির বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে একতেদা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম ব্যক্তি বসে নামাজ আদায়কারীর পিছনে একতেদা করা জায়েজ আছে কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ جُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও অধিকাংশ ওলামার মাযহাব হলো, যদি ইমাম দাঁড়াতে অক্ষম হন এবং বসে ইমামতি করেন, তবে মুক্তাদিদের মধ্যে যারা দাঁড়াতে সক্ষম তারা দাঁড়িয়ে পড়বে। ইমাম মালেক (র.)-ও এক বর্ণনায় এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ : ইমাম মালেক দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, যারা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম তাদের দাঁড়িয়ে বা বসে কোনো ভাবেই মাজুর ইমামের পিছনে এক্তেদা করা জায়েয নেই।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ اَحْمَدَ وَالْاَوْزَاعِيِّ : ইমাম আহ্মদ ও আওযায়ী (র.) বলেন, বসে নামাজ আদায়কারী ইমামের পিছনে বসে বসেই এক্তেদা করতে হবে, যদিও মুক্তাদি দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে এক্তেদা করলে নামাজ সহীহ হবে না। তারা আলোচ্য হাদীসের বাক্য وَإِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ দ্বারাই দলিল গ্রহণ করেন।

প্রথমোক্ত দলের প্রমাণ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) শাফেয়ী ও জমহুর ওলামা নবী করীম ﷺ-এর অন্তিম অবস্থায় রোগকালীন কার্যাবলি দ্বারা দলিল পেশ করেন।

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ فِيْ حَدِيْثِ مَرَضِ مَوْتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَبَابَكْرٍ اَنْ يُّصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهٖ خِفَّةً فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِيْ بَكْرٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ বেড়ে গেল তখন হযরত বেলাল তাকে নামাজের সংবাদ দিতে এলো। রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, আবূ বকরকে বল [মানুষদের নামাজ পড়িয়ে দিতে] সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা.) সে কয়দিনের নামাজ পড়ালেন। অতঃপর একদিন রাসূল ﷺ কিছু সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর পদধ্বনি শুনতে পেয়ে নিজে পিছনে আসতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে না সরতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবূ বকরের বাম দিকে বসে গেলেন। তখন হযরত আবূ বকর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন। আর রাসূল ﷺ বসে [ইমামরূপে] নামাজ পড়তে থাকলেন। [অর্থাৎ হযরত আবূ বকর রাসূল ﷺ-এর নামাজের এক্তেদা করলেন এবং লোকজন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নামাজের অনুসরণ করল।]

বিরোধীদের উত্তর : "যখন ইমাম বসে নামাজ পড়েন তোমরাও বসে নামাজ পড়" এ হাদীসের জবাবে জমহুর ইমামগণ বলেন যে, উক্ত হাদীস হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কারণ রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ কার্যই গৃহীত হবে, প্রথম দিককার আমল নয়।

١٠٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ فِىْ نَفْسِهٖ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ رِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهٗ ذَهَبَ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا يَتَاَخَّرْ فَجَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ قَاعِدًا يَقْتَدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِىْ بَكْرٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَسْمَعُ اَبُوْ بَكْرٍ اَلنَّاسَ اَلتَّكْبِيْرَ)

১০৭২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [ইন্তেকালের পূর্বে] যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ খুব কঠিন হয়ে পড়ল, একদা হযরত বেলাল এসে হুজুর ﷺ-কে খবর দিল নামাজের সময় হয়েছে। তখন মহানবী ﷺ বললেন, আবূ বকরকে লোকদের নামাজ পড়িয়ে দিতে বল। সে মতে হযরত আবূ বকর (রা.) সে কয়দিনের নামাজ পড়ালেন। অতঃপর হুজুর ﷺ একদিন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা হেঁচড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন হযরত আবূ বকর মহানবী ﷺ-এর আগমন অনুভব করলেন, তখন নিজে পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে পিছনে সরে না যেতে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর হুজুর ﷺ এসে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাম পার্শ্বে বসলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন এবং হুজুর ﷺ বসে [ইমাম রূপে] নামাজ পড়তে থাকলেন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজের এক্তেদা করলেন, আর লোকেরা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একতেদা করল। অর্থাৎ তাঁর নামাজের অনুসরণ করল। −[বুখারী ও মুসলিম। উভয়ের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) লোকদেরকে তাকবীর শুনাতেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূল ﷺ অন্তিম অসুস্থতার সময় ইমাম ছিলেন নাকি মুক্তাদি? রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অন্তিম রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন তখন তিনি লোকদেরকে ইমামরূপে নামাজ পড়িয়েছেন নাকি অন্য কারো পিছনে মুক্তাদিরূপে নামাজ আদায় করেছেন, এই ব্যাপারে দু' ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। উল্লিখিত হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস এবং নিম্নোক্ত হযরত ইবনে আব্বাস

(রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগ অবস্থায় ইমাম হিসাবে নামাজ পড়িয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসটি হলো–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ انْتَهٰى اَبُوْ بَكْرٍ (رض) وَلَمْ يَقْرَأْ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) بَعْدَ ذٰلِكَ وَكَانَ الصَّلٰوةُ فِيْمَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ .

পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগ অবস্থায় মুক্তাদি হিসাবে নামাজ আদায় করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস দু'টি পেশ করা যেতে পারে–

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) قَاعِدًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

(٢) عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ اٰخِرُ صَلٰوةٍ صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

এখানে উভয় প্রকার হাদীসে দু' ধরনের তথ্য পাওয়া যায়, ফলে প্রকাশ্যত হাদীস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।
এই দ্বন্দ্বের সমাধান কল্পে কেউ কেউ এক প্রকার হাদীসকে অন্য হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করেছেন।
আবার কেউ কেউ এই দু' ধরনের হাদীসের অনুকূলে পৃথক পৃথক দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী বলেন, যে নামাজে রাসূল ﷺ ইমাম হয়ে নামাজ পড়েছেন, তা ছিল শনিবার অথবা রবিবারের জোহরের নামাজ। এ নামাজে তিনি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাঁধে ভর করে মসজিদে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে যে নামাজে রাসূল ﷺ মুক্তাদি হিসাবে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পিছনে নামাজ আদায় করেছিলেন তা ছিল সোমবারের ফজরের নামাজ। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ নামাজ। এই আলোচনা দ্বারা উভয়ের মধ্যে কোনো تَعَارُضْ অবশিষ্ট থাকে না।

اِقْتِدَاءُ الْمُقْتَدِىْ بِالْمُقْتَدِىْ এক মুক্তাদির পেছনে অন্য মুক্তাদির এক্তেদা করা : আলোচ্য হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, মুক্তাদিগণ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর একতেদা করেছেন, আর হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল ﷺ-এর একতেদা করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মুক্তাদিগণের আর এক মুক্তাদির একতেদা কিভাবে জায়েজ হতে পারে? এর দু'টি জবাব হতে পারে–
প্রথমত যে সময় রাসূল ﷺ মসজিদে গমন করেছেন, ঐ সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নামাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। কাজেই সকল মুক্তাদি তার পিছনে একতেদা করেছেন। ইতোমধ্যে রাসূল ﷺ যখন মসজিদে আগমন করলেন, তখন তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইমামে পরিণত হলেন।
ইবনে আব্দুল বার বলেন, এটা নবী করীম ﷺ-এর বিশেষত্ব ছিল। শাফেয়ী মাযহাবের মতে এভাবে ইমাম বদল করা জায়েজ আছে। আলোচ্য হাদীস হতে তাঁরা দলিল গ্রহণ করেন।
দ্বিতীয়ত রাসূলে কারীম ﷺ যখন মসজিদে আগমন করলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা.) নামাজ শুরু করেননি। রাসূলে কারীম ﷺ ইমাম হয়েছেন, হযরত আবূ বকর মুকাব্বির হয়েছেন মাত্র। তখন রাসূল ﷺ বসা ছিলেন, আর অসুস্থতা ও শরীরিক দুর্বলতার কারণে তার গলার স্বর নিচু ছিল। এ জন্য হযরত আবূ বকর (রা.) মুকাব্বির হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাক্বীর অনুযায়ী তিনি উচ্চৈঃস্বরে তাক্বীর বলেছেন। আর মুক্তাদিগণ তার আওয়াজ অনুযায়ী আমল করেছেন।
দ্বিতীয় জবাবের অনুকূলে বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় স্পষ্ট উক্তি রয়েছে।
উল্লেখ্য যে, হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূলে কারীম ﷺ-এর অসুস্থ অবস্থায় সতেরো ওয়াক্ত নামাজে ইমামতি করেছেন।

١٠٧٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَاْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حِمَارٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে [রুকু বা সিজদায়] মাথা উঠায়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দেবেন? –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهٗ رَأْسَ حِمَارٍ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রুকু বা সিজদা হতে ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন। এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'আলা কি সত্যি সত্যিই তা করবেন? না হাদীসের অন্য কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে, অর্থাৎ হাদীসটি কি হাকীকী অর্থের উপর প্রযোজ্য, নাকি মাজাযী অর্থে প্রযোজ্য; সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম গাযালী (র.), কাজী আবূ বকর, ইবনুল আরাবী এবং আল্লামা তীবী প্রমুখ বলেন- اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهٗ رَأْسَ حِمَارٍ বাক্যটি মাজাযী বা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা গাধা হলো বোকার প্রতীক। বোকা লোক উপহাসের পাত্র। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে মুক্তাদিদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, সে বোকার মধ্যেই শামিল। পরকালে সে এই বোকামির জন্য অসম্মানিত হবে এবং উপহাসের পাত্র হবে।

তবে ইমাম খাত্তাবী সহ অনেক আলিমের মতে উক্ত বাক্যটি حَقِيْقِيْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তথা প্রকৃতপক্ষে তার মুখমণ্ডলকে গাধার মুখের মতো করে দিবেন এবং এই পরিবর্তন বাস্তবে দুনিয়াতে হতে পারে। কথিত আছে যে, এক সময় এক ব্যক্তি দামেশ্কের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন তার কাছে হাদীস অধ্যয়ন করলেন বটে, কিন্তু তাঁর ও শিক্ষকের মধ্যখানে আড়াল থাকত। অথচ শাগ্রেদ কোনো দিনই উস্তাদের চেহারা দেখতে পেত না। উস্তাদ যখন দেখলেন, হাদীস শিক্ষা গ্রহণের প্রতি শাগরেদটির একান্তই জোঁক হঠাৎ একদিন উস্তাদ নিজেই পর্দাটি সরিয়ে শাগরেদের সামনে উপস্থিত হলেন। শাগরেদ দেখলেন উস্তাদের চেহারাটি গাধার আকৃতিতে পরিবর্তিত। তখন উস্তাদ শাগ্রেদকে লক্ষ্য করে বললেন, বৎস! নামাজের রুকু সেজদায় ইমামের আগে গমন করো না। আর আমার ঘটনা হলো এই যে, এ হাদীস অধ্যয়নকালে আমি এই হাদীসটিকে অবান্তর ও অসম্ভব মনে করে পরীক্ষামূলকভাবে এক সময় স্বেচ্ছায় নামাজের মধ্যে রুকু সিজদায় ইমামের আগে গিয়েছিলাম। পরিণামে তখন হতে আমার চেহারাখানা গাধার চেহারায় পরিণত হয়ে গেছে, যা তুমি এখন প্রত্যক্ষ করছ। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা চেহারা বিকৃত করে দিতে পারেন। সুতরাং আমাদের সকলকে এই ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং কখনো ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো উচিত নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٧٤ - عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ وَالْاِمَامُ عَلٰى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْاِمَامُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১০৭৪. **অনুবাদ** : হযরত আলী ও মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ নামাজে হাজির হয়, আর ইমাম যে কোনো অবস্থায় থাকেন, তখন সে যেন তাই করে ইমাম যা করেন।-[তিরমিযী। তবে তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : জামাতে হাজির হতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সেখানেই শরিক হতে হবে, এর অন্যথা করা ঠিক হবে না।

١٠٧٥ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهُ شَيْئًا وَمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১০৭৫. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন তোমরা নামাজে আসবে, আর আমরা যদি সিজদায় থাকি, তোমরাও সিজদা করবে; কিন্তু একে রাকাত হিসাবে গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এক রাকাত পেল, সে পুরা নামাজের ছওয়াবই পেল।-[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ-এর ব্যাখ্যা : "যে জামাতে এক রাকাত পেল সে পূর্ণ নামাজ পেল" এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে, প্রথমত রাকাত অর্থে রুকু এবং নামাজ অর্থে রাকাত। তা হলে বাক্যটি হবে "যে ব্যক্তি ইমামকে রুকুতে পেল, সে ব্যক্তি সে রাকাতটি পেল"। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি এক রাকাত ইমামের সাথে পেল সে জামাত পেল, সুতরাং পুরা জামাতের ছওয়াব সে পাবে।

হিদায়া গ্রন্থে আছে যে, যে ব্যক্তি জোহর নামাজে এক রাকাত ইমামের সাথে পেল, আর তিন রাকাত পেল না, তবে সে জোহরকে জামাতের সাথে আদায় করল না। অর্থাৎ সে একথা বলতে পারবে না যে, আমি জোহরকে জামাতের সাথে আদায় করেছি, বরং সে শুধু জামাতের ছওয়াব পাবে। তবে জুমার নামাজের ব্যাপার স্বতন্ত্র। কেননা জুমার ব্যাপারে হানাফী মাযহাব এই যে, যে ব্যক্তি ইমামকে জুমার নামাজে পেল তা হলে সে পূর্ণ জুমার নামাজই পেল। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, জুমার নামাজের ভিত্তিতে সে জোহর নামাজেরও শেষ রাকাত পেলে সে জামাত পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

١٠٧٦ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১০৭৬. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন যাবৎ জামাতে নামাজ পড়ে, প্রথম তাকবীর অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরীমায় শামিল হয়ে তার জন্য দু'টি মুক্তি লিপিবদ্ধ হয়- (এক) জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি। (দুই) নিফাক বা কপটতা হতে মুক্তি। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُتِبَ لَهٗ بَرَاءَتَانِ-এর বিশ্লেষণ : যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমায় শরিক হয়ে জামাতে নামাজ আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তি রয়েছে। এর প্রথমটি হলো, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ করে, জাহান্নামের আগুনে সে প্রবেশ করবে না। আর দ্বিতীয়টি হলো, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে কপটতার কলুষতা হতে মুক্তি লাভ করবে। আল্লামা তীবী (র.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে ব্যক্তি মুনাফেকদের কার্যাবলির ন্যায় খারাপ কার্য হতে নিরাপদ থাকবে এবং তার কাজ ভাল লোকদের কাজের ন্যায় হবে। আর পরকালে মুনাফিকদেরকে যে জন্য শাস্তি দেওয়া হবে তা হতে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করবে।

اَثَرُ الْاَرْبَعِيْنَ فِى الْاِنْسَانِ মানুষের মধ্যে চল্লিশ দিনের প্রতিক্রিয়া : মানব জীবনে চল্লিশ দিনের একটি গুরুত্ব রয়েছে, যেমন- মাতৃগর্ভে শুক্রবিন্দুর প্রত্যেক চল্লিশ দিন পর পর এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। যেমন- প্রথম ৪০ দিন শুক্রবিন্দু, পরের ৪০ দিন জমাট রক্ত এবং পরের ৪০ দিন মাংসপিণ্ড। এভবে ছয়টি স্তর অতিক্রম হওয়ার পর সপ্তম স্তরে জীবন্ত ও পরিপূর্ণ একটি মানব আকৃতি পৃথিবীতে আসে। বস্তুত মানুষের মৌলিক সৃষ্টির মধ্যেই প্রত্যেক চল্লিশ দিনের ব্যবধানে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ কুরআনেও রয়েছে, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ (اَلْاٰيَةَ) কাজেই এ দুনিয়াতেও কোনো মানুষ একাধারে যখন কোনো একটি কাজ নিয়ম মাফিক করে, তখন সে কাজটি তার সাধারণ স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। এখানেই চল্লিশের একটা বিশেষত্ব রয়েছে। এ আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাজ যার মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়, সে দুনিয়াতে মানুষের কাছে কপট-মুনাফিক বলে চিহ্নিত হয় না, বরং মু'মিন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারে জাহান্নামের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

وَعَنْ ١٠٧٧ - أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

১০৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি অজু করল এবং ভালভাবেই অজু সম্পন্ন করল, অতঃপর মসজিদের দিকে গেল, আর দেখল যে, জনগণ নামাজ শেষ করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে তার সমতুল্য ছওয়াব দান করবেন, যে জামাতে উপস্থিত হয়েছে এবং জামাতের সাথে নামাজ পড়েছে। অথচ এতে তাদের ছওয়াব হতে কিছু অংশ কমানো হবে না। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করল আর যে জামাতে শরিক হওয়ার জন্য বের হলো অথচ জামাত পেল না, উভয়ে সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হতে পারে, যে ব্যক্তি জামাত পেল আর যে জামাত পেল না উভয়ের ছওয়াব কি করে সমান হতে পারে? আল্লামা তীবী বলেন, দু'টি কারণে এটা হতে পারে।

প্রথমত: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ কোনো কাজের জন্য মু'মিন ব্যক্তিদের নিয়ত তা পালন করার চাইতে উত্তম। অবশ্য একথা দ্বারা মু'মিনদের মর্যাদা বর্ণনা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত : বলা যায়, সে জামাত না পাওয়ার কারণে অন্তরে যে ব্যথা অনুভব করেছে এবং আফসোস করেছে, এর জন্যও তাকে ছওয়াব প্রদান করা হবে। তবে অলসতার দরুন যদি কেউ জামাত পরিত্যাগ করে তবে সে ছওয়াব তো দূরের কথা গুনাহের অধিকারী হবে। বরং চেষ্টা করে না পেলেই ছওয়াবের অংশীদার হবে।

وَعَنْ ١٠٧٨ - أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّىْ مَعَهٗ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১০৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; একদা এক ব্যক্তি [জামাতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে] মসজিদে আসল, অথচ তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি নেই, যে এই লোকটিকে [জামাতের] ছওয়াব দান করে? অর্থাৎ তার সাথে নামাজ পড়ে? অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে নামাজ পড়ল। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَىُّ صَلٰوةٍ كَانَتْ هِىَ এটা কোন ওয়াক্তের নামাজ ছিল : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এটা ছিল আসরের নামাজ। অবশ্য এটা আমাদের বিবেচনায় সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা আসরের পরে নফল নামাজ পড়া আমাদের মাযহাব মতে মাকরূহ। আগন্তুক ব্যক্তির সাথে যিনি নামাজ পড়েছিলেন তা তার জন্য ছিল নফল। তাই এটা আসরের নামাজ হতে পারে না। এরূপভাবে ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং মাগরিবের ওয়াক্ত হওয়ার পর ফরজ নামাজ আদায় না করে সকল ধরনের নফল নামাজ পড়া মাকরূহ। তা ছাড়া মাগরিবের নামাজ পড়ার পর আবার কোনো মাগরিবের ফরজ পালনকারীর পেছনে নফলের নিয়তে তিন রাকাতের নিয়ত করাও সঠিক নয়। কেননা তিন রাকাত নফল শরিয়তে অনুমদিত নয়। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত নামাজ এই তিন ওয়াক্ত ব্যতীত অন্য কোনো ওয়াক্তের নামাজ হবে।

فَقَامَ رَجُلٌ– এর মধ্যে رَجُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য : ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসের মধ্যে رَجُلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত আবূ বকর (রা.)। বায়হাকীর বর্ণনায় তাই রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٧٩- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ (رضـ) فَقُلْتُ اَلَا تُحَدِّثِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ فَقَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَتْ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا، هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ بِاَنْ يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ

১০৭৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আসলাম এবং আরজ করলাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর [ইহধাম ত্যাগকালীন] রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করবেন না? তিনি বললেন– হ্যাঁ, [নিশ্চয় বর্ণনা করব]। যখন নবী করীম ﷺ-এর রোগ কঠিন আকার ধারণ করল, তিনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম– না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি ঢাল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম [গামলায় পানি ঢাললাম]। তখন রাসূল ﷺ গোসল করলেন, যখন রাসূল ﷺ উঠতে চেষ্টা করলেন, বেহুঁশ হয়ে গেলেন, অতঃপর কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরল; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ উঠে বসলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর উঠতে চেষ্টা করলেন; আবারও তিনি বেঁহুশ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন জ্ঞান ফিরল তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাসূল ﷺ আবারও বললেন, আমার জন্য গামলায় পানি রাখ। রাসূল ﷺ উঠে বসলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর উঠতে চাইলেন এবারও তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অতঃপর যখন তার সম্বিৎ ফিরল তখনও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামাজ পড়েছে? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। অথচ তখনও লোক মসজিদে অবস্থান করছিল এবং নবী করীম ﷺ-এর সাথে শেষ এশার নামাজ পড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট লোক পাঠালেন যেন তিনি মানুষের নামাজ পড়িয়ে দেন। যখন বার্তাবাহক হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট আসল এবং বলল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে মানুষকে নামাজ পড়িয়ে দিতে আদেশ করেছেন তখন হযরত আবূ বকর হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর ! আপনিই মানুষের

تُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيْقًا - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ فِىْ نَفْسِهٖ خِفَّةً وَخَرَجَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلٰوةِ الظُّهْرِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِاَنْ لَّا يَتَاَخَّرَ قَالَ اَجْلِسَانِىْ اِلٰى جَنْبِهٖ فَاَجْلَسَاهُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهٗ اَلَا اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهٗ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِىْ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِىٌّ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

নামাজ পড়িয়ে দিন। হযরত আবূ বকর (রা.) ছিলেন খুব কোমল হৃদয় ব্যক্তি। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বললেন, এই [দায়িত্বের] জন্য আপনিই অধিকতর যোগ্য। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) সেই কয়দিনের নামাজ পড়ালেন। অতঃপর [একদিন] নবী করীম ﷺ নিজ শরীরে কিছুটা সুস্থতাবোধ করলেন এবং দু' ব্যক্তির সহায়তায় জোহরের নামাজের জন্য বের হলেন, তাদের একজন হলেন হযরত আব্বাস (রা.)। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) মানুষের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। যখন হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল ﷺ-এর আগমন উপলব্ধি করলেন, তখন পিছনে সরে যেতে চাইলেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি পিছনে সরে না যান। রাসূল ﷺ [সাথীদ্বয়কে] বললেন, আমাকে তার [আবূ বকরের] পার্শ্বে বসিয়ে দাও। তখন তারা উভয়ে রাসূল ﷺ-কে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পার্শ্বে বসিয়ে দিলেন। আর নবী করীম ﷺ বসেছিলেন [অর্থাৎ বসে বসেই নামাজ আদায় করলেন]।

রাবী উবায়দুল্লাহ বলেন, [হযরত আয়েশা (রা.) হতে এ ঘটনা শোনার পর একদিন] আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট আসলাম। তাঁকে বললাম, আমি কি আপনাকে সে হাদীস বর্ণনা করব না যা হযরত আয়েশা (রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তিম রোগ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি বললেন– বর্ণনা করুন। আমি তার সমীপে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবৃত হাদীস বর্ণনা করলাম। এটা শুনে তিনি এর কোনো অংশই অস্বীকার করলেন না। তিনি শুধু এটা জিজ্ঞাসা করলেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) কি আপনাকে সেই ব্যক্তির নাম বলেছেন, যিনি হযরত আব্বাস (রা.)-এর সাথে ছিলেন? আমি বললাম, না, বলেননি। আব্দুল্লাহ বললেন, তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা.)। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে জামাতে শরিক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন এর মধ্যেও একটি হিকমত রয়েছে। এটা হলো নবী রাসূলগণের উপরও যে বেহুঁশী আসতে পারে এর বাস্তব প্রমাণ। আর এর মধ্যে সাধারণ মানুষদের প্রবোধও রয়েছে। কেননা অসুস্থতা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের বেলায় নয়; বরং এটা নবী রাসূলদেরও হতে পারে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর হযরত আলীর (রা.) নাম উল্লেখ না করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ রোগাক্রান্ত অবস্থায় দু' ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেছিলেন। তাদের একজন হলেন হযরত আব্বাস (রা.) এবং অপরজন ছিলেন হযরত আলী (রা.)। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন, কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর নাম উল্লেখ করলেন না কেন? হাদীস বিশারদগণ এর দু'টি উত্তর প্রদান করেছেন–

প্রথমত কারো মতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে হযরত আলী (রা.)-এর কিছুটা মনোমালিন্য ছিল। আর এর কারণ হলো, ইফকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর যেই অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, এর বিরোধিতায় অন্যান্য সাহাবীরা যে চরমভাব প্রকাশ করেছিলেন, হযরত আলী (রা.) ততটা করেননি। হয়তো এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু এ অভিমত সত্য নয়। কেননা ইফকের ঘটনার পরও হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নাম সম্মানের সাথে বহু স্থানে স্মরণ করেছিলেন।

দ্বিতীয়তে বলা যায়, আলোচ্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) এ জন্য হযরত আব্বাসের সাথে অপর ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি যে, অপর পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে লোক বদল হয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমে হযরত আলী (রা.) তারপর হযরত ফজল ইবনে আব্বাস অতঃপর হযরত উসামা ইবনে যায়দ প্রমুখ সাহাবীগণ ছিলেন। আর এক পার্শ্বে শুধু হযরত আব্বাস (রা.)-ই ছিলেন। বর্ণনা সংক্ষেপের জন্য তিনি শুধু এক পার্শ্বে থাকা হযরত আব্বাস (রা.)-এর কথাই বলেছেন।

اَلْعِشَاءُ اَلْاٰخِرَةُ-এর অর্থ : তখনকার আরবের লোকেরা মাগরিবের নামাজকে প্রথম এশা এবং এশার নামাজকে اَلْعِشَاءُ الْاٰخِرَةُ অর্থাৎ দ্বিতীয় এশা বলত। এ হাদীসটি উপরে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত ১০৭২ নং হাদীসেরই বিস্তারিত বিবরণ। এ হাদীস থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর খেলাফতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা.)-ই ছিলেন। কেননা, হুজুর ﷺ ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাঁকে নিজের খলিফা নিযুক্ত করেছেন।

وَعَنْ ١٠٨٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি [নামাজের জামাতে] রুকু পেয়েছে, সে সিজদা অর্থাৎ পূর্ণ রাকাত পেয়েছে। আর যে ব্যক্তির সূরায়ে ফাতিহা ছুটে গেছে তার বহু ভাল জিনিসই [অর্থাৎ ছওয়াব] ছুটে গেছে। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কোনো ব্যক্তি জামাতে কোনো রাকাতের রুকু পায় তা হলে সে উক্ত রাকাত পেয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। আর এখানে সূরা ফাতিহা দ্বারা অনেকের মতে উদ্দেশ্য হলো প্রথম তাকবীরে শামিল হওয়া। কেননা ইমামের প্রথম তাকবীরে শরিক হতে পারলে সূরা ফাতিহাও পাবে, সূরা ফতেহার পর যোগ দিলে সূরা ফাতিহার সে বিরাট কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবে।

وَعَنْ ١٠٨١ أَنَّهُ قَالَ الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে [নামাজের মধ্যে] মাথা উঠায় কিংবা মাথা নামায় নিশ্চয়ই তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে। [অর্থাৎ শয়তানই তাকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করছে, ফলে সে শয়তানের ক্রীড়নক]। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ-এর ব্যাখ্যা : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের মধ্যে রুকু এবং সিজদায় ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় বা নামায় তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি শয়তানের ক্রীড়নক হয়ে এরূপ করছে। 'শয়তানের হাতে থাকে'–এ কথাটি হাকীকী এবং মাজাযী উভয় অর্থেই প্রয়োগ হতে পারে। তথা সে শয়তানের ইচ্ছানুযায়ীই রুকু সিজদা করছে।

بَابُ مَنْ صَلَّى صَلٰوةً مَرَّتَيْنِ
পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি এক নামাজ দু'বার পড়ল

কোনো ব্যক্তি একই নামাজ দু'বার পড়লে তথা কেউ নিজ গৃহে বা কোথাও ফরজ নামাজ আদায় করার পর মসজিদে গমন করে যদি দেখে যে, ঐ ওয়াক্তের জামাত চলছে এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য জামাতে শরিক হতে হবে কি না? আর শরিক হলে তার এই নামাজ কোন পর্যায়ের হবে, এ বিষয়ে অধ্যায়ের হাদীসসমূহ উপস্থাপিত হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٠٨٢ - عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَاْتِىْ قَوْمَهٗ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৮২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) প্রথমে নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়তেন, অতঃপর নিজ গোত্রের নিকট গমন করতেন এবং তাদেরকে নামাজ পড়াতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ اِقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদার হুকুম : নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা বৈধ কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১. رَأْىُ الْاِمَامِ الشَّافِعِيِّ (رح) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে مُتَنَفِّلْ -এর পেছনে مُفْتَرِضْ -এর একতেদা জায়েজ আছে। তাঁর দলিল হচ্ছে এই-

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَاْتِىْ قَوْمَهٗ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ
قَالَ جَابِرٌ (رض) هِىَ لَهٗ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ .
قَالَ الرَّسُوْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ .

এ কথা সর্ব স্বীকৃত যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর উপর নামাজ ফরজ ছিল না, তিনি مُتَنَفِّلْ হয়ে ইমামতি করেছেন আর রাসূল مُفْتَرِضْ ছিলেন।

২. رَأْىُ الْاِمَامِ مَالِكٍ وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) : ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (র.)-এর মতে مُتَنَفِّلْ -এর পিছনে مُفْتَرِضْ -এর একতেদা সহীহ হয় না। কেননা- (ক) রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَلَاتَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ -

অতএব মুক্তাদি কর্তৃক বাহ্যিক আমল ও নিয়ত উভয় ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। مُفْتَرِضْ ও مُتَنَفِّلْ -এর একতেদা এক রকম নয়। (খ) হুজূর ﷺ এরশাদ করেছেন- اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ একথা পরিষ্কার যে, নফল পাঠকারী ফরজ পাঠকারীর জামিন হতে পারে না। (গ) এমনকি, এটা কিয়াস বিরোধী। কেননা দুর্বলের উপর সবলের ভিত্তি হয় না। (ঘ) যদি এটা জায়েজ হতো, তা হলে হুজূর ﷺ صَلٰوةُ الْخَوْفِ কে দু'ভাগ করতেন না; বরং প্রথম দলের সাথে পুরা নামাজ পড়ে নিতেন এবং مُتَنَفِّلْ হয়ে দ্বিতীয় দলের ইমামতি করতেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الشَّافِعِيِّ :

১. হযরত মুয়ায (রা.) বরকত হাসিলের জন্য রাসূলের পিছনে এশার নামাজ نَفْل হিসেবে পড়েছেন, পরে আপন গোত্রীয় লোকদেরকে নিয়ে ফরজ হিসেবে এশার ইমামতি করেছেন। এটা জীবনে মাত্র একবার হয়েছে।

২. অথবা বলা যায় যে, হযরত মুয়ায (রা.) রাসূল ﷺ-এর পেছনে صَلٰوةُ النَّهَارِ পড়তেন আর আপন গোত্রীয় লোকদের সাথে صَلٰوةُ اللَّيْلِ পড়তেন। যেমন, বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে– "عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ" এখানে এমন কথা উল্লেখ নেই যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর পিছনে এশার নামাজ পড়তেন।

৩. অথবা হযরত মুয়ায (রা.) রাসূল ﷺ-এর পিছনে মাগরিবের নামাজ আর নিজ গোত্রের গিয়ে এশার নামাজ পড়েছেন।

৪. অথবা বলা যায় যে, হযরত মুয়ায (রা.)-এর এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাসূল ﷺ-এর জানা ছিল না। জানার পর রাসূল ﷺ তাকে নিষেধ করেছেন। যেমন– يَا مُعَاذُ اِمَّا اَنْ تُصَلِّىَ مَعِىْ وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ (طَحَاوِىْ)

৫. وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَخْشٰى اَنْ لَاتَكُوْنَ مَحْفُوْظَةً– "هِىَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيْضَةٌ" এটা হযরত জাবের (রা.)-এর উক্তি–

৬. "اَمَّنِىْ جِبْرَائِيْلُ" এর উত্তরে বলা যায় যে, সে সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আ.)-কে مُكَلَّفٌ بِالصَّلٰوةِ বানানো হয়েছে।

উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর একতেদা বৈধ নয়।

وَعَنْ ١٠٨٣ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى قَوْمِهِ فَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِىَ لَهُ نَافِلَةٌ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَالْبُخَارِىُّ)

১০৮৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.) মহানবী ﷺ-এর সাথে এশার নামাজ পড়তেন। অতঃপর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং তাদেরকে এশার নামাজ পড়াতেন। অথচ এটা ছিল তাঁর নফল নামাজ। –[বায়হাকী ও বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَهِىَ لَهُ نَافِلَةٌ-এর ব্যাখ্যা : وَهِىَ لَهُ نَافِلَةٌ অর্থাৎ, অথচ তাঁর নামাজ ছিল নফল'-এ বাক্যটি হযরত জাবের (রা.)-এর বাক্য বলে মাহ্‌ফুজ বা রক্ষিত নয়। কারো মতে এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরই বাক্য। তিনিও এ হাদীসের একজন রাবী। পরবর্তী রাবী তার বাক্যকে হযরত জাবের (রা.)-এর বাক্য বলে ভুল করেছেন। আর এ হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান পেলেও বুখারী বা মুসলিমে নেই। শায়খ দেহলবী (র.) এ হাদীসকে বায়হাকী ও দারাকুতনীর বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٠٨٤ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ (رض) قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهُ وَانْحَرَفَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِىْ اٰخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَىَّ بِهِمَا فَجِئَ

১০৮৪. অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে আস্‌ওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের সাথে তাঁর বিদায় হজে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর সাথে (মিনার) 'মসজিদে খায়ফে' ফজরের নামাজ পড়লাম। যখন তিনি নামাজ শেষ করে পিছনে ফিরলেন, তখন দেখলেন, দু'জন লোক জনতার শেষ প্রান্তে রয়েছে যারা তাঁর সাথে নামাজ আদায় করেনি। তখন হুযূর ﷺ বললেন, তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে

بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَلاَ تَفْعَلاَ اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

আস। তখন তাদেরকে আনা হলো অথচ তাদের কাঁধের মাংস [ভয়ে] কাঁপছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের সাথে নামাজ পড়তে তোমাদের কিসে বাঁধা দিল? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের বাড়িতে নামাজ পড়ে এসেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, [দ্বিতীয় বার] এরূপ করবে না। তোমরা যখন তোমাদের বাড়িতে নামাজ পড়, অতঃপর জামাত হচ্ছে এরূপ মসজিদে উপস্থিত হও তখন তোমরা তাদের সাথে পুনঃ নামাজ পড়বে। এটা [অর্থাৎ দ্বিতীয় নামাজটি] তোমাদের জন্য নফল হবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَحْثُ اِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَذَاهِبِ الْاَئِمَّةِ فِيْهِ জামাতের সাথে ফজরের নামাজ পুনরায় পড়া সম্পর্কে আলোচনা এবং এতে ইমামদের মাযহাবসমূহ : যদি কোনো ব্যক্তি একাকী ফজরের নামাজ পড়ে ফেলে, পরে আবার যদি কোথাও জামাতে পড়ার সুযোগ পায় তবে জামাতের শরিক হয়ে নামাজ পুনরায় পড়বে কি না, এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে জামাতে অংশগ্রহণ করবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জামাতের সাথে পুনরায় নামাজ পড়বে। তিনি প্রশ্নে উল্লিখিত ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদের হাদীসকে দলিল হিসাবে পেশ করেন। কেননা এ হাদীসে ফজরের নামাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় নামাজ পড়তে আদেশ করেছেন।

আবূ হানীফা ও মালেক (র)-এর দলিল :

১। নবী করীম ﷺ এর হাদীস–

لَاصَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

"ফজরের পরে নামাজ পড়ো না! যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়, আসরের পরেও নামাজ পড়বে না যতক্ষণ না সূর্যাস্ত হয়"

২। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

اِذَا صَلَّيْتَ فِىْ اَهْلِكَ ثُمَّ اَدْرَكْتَ فَصَلِّهَا اِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ

"যখন তোমরা নিজ গৃহে নামাজ পড়ে ফেল পরে জামাতে পড়ার সুযোগ পাও, তবে ফজর ও মাগরিব ছাড়া অন্য নামাজ পুনরায় জামাত সহকারে পড়বে"।

তাঁরা ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদের হাদীসের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন–

১. হযরত ইয়াযীদের হাদীস ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। যখন একই ফরজ নামাজ দু'বার পড়ার অনুমতি ছিল। পরে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে।

২. আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, নিষেধাজ্ঞার হাদীস হযরত ইয়াযীদ (রা.)-এর হাদীসের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীসটিই প্রাধান্য পাবে।

৩. উসূলের সাধারণ নিয়ম এই যে, হারাম হওয়া ও হালাল হওয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে হারাম হওয়াই প্রাধান্য পায়। সুতরাং আমাদের দলিলই প্রাধান্য পাবে।

একই নামাজ দু'বার পড়লে কোনটি ফরজ হিসাবে গণ্য হবে সে ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : নায়লুল আওতার গ্রন্থে ইমাম শাওকানী লেখেন, যে নামাজ দু'বার পড়া হয়েছে তার কোনটিকে ফরজ এবং কোনটিকে নফল হিসাবে গণ্য করতে হবে সে ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে–

হাদী, আওযায়ী এবং কতক শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বলেন, দ্বিতীয়বারের নামাজ যদি জামাত সহকারে আদায় করা হয়, তবে তা ফরজ হিসাবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয়বারের নামাজ যদি একাকী আদায় করা হয় তা হলে প্রথমটি ফরজ হিসাবে গণ্য করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমের বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি–

فَإِذَا جِئْتَ الصَّلٰوةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّوْنَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهٖ مَكْتُوْبَةٌ . (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ)

শাফেয়ী মাযহাবের অন্যান্য কিছু ওলামায়ে কেরাম বলেন, উভয় নামাজের মধ্যে যেটি অধিক পরিপূর্ণ হবে তাই ফরজ হিসাবে পরিগণিত হবে।

ইমাম গাযালী (র.) এবং অন্য একদল শাফেয়ীর মতে উভয় নামাজের মধ্যে যে নামাজটি অধিক পরিপূর্ণ হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকেই ফরজ হিসাবে গণ্য করবেন। যেমন হাদীস এসেছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ اَيَّتَهُمَا اَجْعَلُ صَلَاتِىْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) ذٰلِكَ اِلَيْكَ وَاِنَّمَا ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ اَيَّتَهُمَا شَاءَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

আর একদল শাফেয়ী আলিম বলেন, উভয় নামাজই ফরজ হিসাবে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে উভয় নামাজের মধ্যে প্রথমটিই ফরজ হিসাবে গণ্য হবে। চাই তা জামাতে আদায় করা হোক অথবা একাকী আদায় করা হোক। তাঁরা উল্লিখিত হযরত ইবনে আসওয়াদ (রা.)-এর হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১০৮৫ عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ (رض) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ فِىْ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُذِّنَ بِالصَّلٰوةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى وَرَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِىْ مَجْلِسِهٖ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ مَعَ النَّاسِ اَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ اَهْلِىْ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالنَّسَائِىُّ)

১০৮৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত বুস্‌র ইবনে মিহজান তাঁর পিতা মিহজান (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক মসলিসে ছিলেন। তখন নামাজের আযান হলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন, যখন তিনি নামাজ সম্পন্ন করলেন এবং বৈঠকে ফিরে আসলেন তখন দেখলেন, বর্ণনাকারী মিহ্‌জান তার পূর্ব স্থানেই বসে রয়েছেন। এবার হুজুর ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকদের সাথে জামাতে নামাজ পড়তে তোমাকে কিসে বারণ করল? তুমি কি মুসলমান নও?' মেহজান বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু আমি যে নিজ ঘরে নামাজ পড়ে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যখন তুমি ঘরে নামাজ পড়ার পর মসজিদে আস আর তখন মসজিদে নামাজ শুরু হয় তখন তুমি [পুনরায়] লোকদের সাথে [জামাতে] নামাজ পড়বে, যদিও তুমি [ঘরে] নামাজ পড়ে থাক। –[মালেক ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَتٰى يُصَلِّىْ ثَانِيًا وَمَتٰى لَا কখন দ্বিতীয়বার নামাজ পড়া যাবে, আর কখন পড়া যাবে না? একই নামাজ কোন ওয়াক্তে দু'বার পড়া যাবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যে কোনো ওয়াক্তের নামাজই হোক না কেন জামাতের সাথে তা দ্বিতীয়বার আদায় করা জায়েয। তাঁর দলিল হলো উল্লিখিত হাদীসগুলো।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, একাকী নামাজ আদায়কারী একমাত্র জোহর এবং এশা দ্বিতীয়বার জামাতে আদায় করতে পারবে। অন্য তিন ওয়াক্ত যথা– ফজর, আসর এবং মাগরিব দ্বিতীয়বার পড়া যাবে না। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ফজর এবং আসরের পরে কোনো নফল নামাজ নেই। অনুরূপভাবে তিন রাকাত বিশিষ্টও কোনো নফল নামাজ নেই। সুতরাং উক্ত তিন ওয়াক্তে কোনো ওয়াক্তই দ্বিতীয়বার পড়া জায়েজ হবে না। কেননা দ্বিতীয়বার নামাজ আদায়কারীর দ্বিতীয় নামাজটি নফল হিসাবে পরিগণিত হবে।

مَذْهَبُ مَالِكٍ ইমাম মালেক (র.) বলেন, প্রথমবার জামাতে নামাজ আদায় করলে পুনরায় আদায় করার আর প্রয়োজন নেই; কিন্তু যদি প্রথমে একাকী নামাজ পড়ে তবে দ্বিতীয়বার মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য সকল নামাজ জামাতে আদায় করতে পারবে। ইমাম নাখয়ী এবং আওযায়ী বলেন, মাগরিব এবং ফজর ব্যতীত সকল নামাজ দ্বিতীয়বার জামাতে আদায় করা যাবে।

جَوَابًا لَهٗ : ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে আমরা বলি যে, উল্লিখিত হাদীসগুলো ইসলামের প্রথম যুগের, পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। আর কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট নামাজের উল্লেখ নেই বিধায় জোহর ও এশার নামাজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

وَعَنْ ١٠٨٦ رَجُلٍ مِنْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّهٗ سَاَلَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ يُصَلِّىْ اَحَدُنَا فِىْ مَنْزِلِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَاْتِى الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَاُصَلِّىْ مَعَهُمْ فَاَجِدُ فِىْ نَفْسِىْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فَذٰلِكَ لَهٗ سَهْمُ جَمْعٍ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوٗدَ)

১০৮৬. অনুবাদ : আসাদ ইবনে খুযাইমা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত আছে যে, সে হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আমাদের মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি নিজ ঘরে নামাজ পড়ে অতঃপর মসজিদে আসে তখন মসজিদে নামাজের জামাত দাঁড়িয়ে যায়। শুরু হওয়ায় তাদের সাথে সে আবার নামাজ পড়ে [অর্থাৎ আমি নামাজ পড়ি।] কিন্তু এ বিষয়ে অন্তরে সন্দেহ-সংশয় অনুভব করি। তখন হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) বলেন, এ বিষয়ে আমরা নবী করীম ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন, এটা [দ্বিতীয়বার জামাতের সাথে নামাজ পড়া] তার জামাতের [ছওয়াবের] অংশ বিশেষ। [অর্থাৎ সন্দেহ সংশয়ের কোনো কারণ নেই। এতে সে জামাতের ছওয়াব পাবে। –[মালেক ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٠٨٧ يَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ اَدْخُلْ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاٰنِىْ جَالِسًا فَقَالَ اَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيْدُ

১০৮৭. অনুবাদ : হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসলাম, তখন তিনি নামাজে ছিলেন। আমি বসে থাকলাম, তার সাথে নামাজে শামিল হলাম না। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করে আমাদের দিকে ফিরলেন, আমাকে বসা দেখলেন এবং বললেন, হে ইয়াযীদ! তুমি কি মুসলমান হওনি? আমি বললাম, হ্যাঁ ইয়া

قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ مَنْزِلِىْ اَحْسِبُ اَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ اِذَا جِئْتَ الصَّلٰوةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهٖ مَكْتُوْبَةٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন, তা হলে তুমি লোকদের সাথে নামাজে শামিল হলে না কেন? আমি বললাম, হুযূর আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ে নিয়েছি। আর আমি ধারণা করেছি আপনারা নামাজ পড়ে ফেলেছেন। তখন হুযূর ﷺ বললেন, যখন তুমি কোনো নামাজের স্থানে পৌছবে আর লোকদেরকে নামাজ পড়তে দেখবে, তখন তাদের সাথে নামাজে শামিল হয়ে যাবে। যদিও তুমি ইতঃপূর্বে নামাজ পড়ে ফেলেছ। তোমার এ নামাজ 'নফল' হবে এবং ঐ নামাজ 'ফরজ' হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ-**হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসের বাক্যাংশ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهٖ مَكْتُوْبَةٌ-এর অনুবাদে "তোমার এ নামাজ নফল হবে এবং ঐ নামাজ ফরজ হবে" এ তরজমা করা হয়েছে এজন্য যে, এটা অন্যান্য হাদীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কেননা, প্রথম নামাজ ফরজ পালন করার উদ্দেশ্যেই পড়া হয়েছিল কিন্তু "ঐ নামাজ নফল এবং এ নামাজ ফরজ হবে।" এরূপ অর্থ করাই আরবি ব্যাকরণে দৃষ্টিতে অধিক সমীচীন। এরূপ অর্থ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে এই যে, প্রথম নামাজ ঘরে একা পড়ার কারণে তার কোনো মূল্য নেই। কেননা, নামাজ জামাতে পড়াই নিয়ম। সুতরাং তার দ্বারা ফরজ আদায় হয়নি। এই শেষ নামাজের দ্বারাই ফরজ আদায় হল। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ফরজ নামাজ জামাতে পড়াই ফরজ। সুতরাং তাঁদের মতে আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপই।

١٠٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ اُدْرِكُ الصَّلٰوةَ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الْاِمَامِ اَفَاُصَلِّىْ مَعَهُ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ اَيَّتَهُمَا اَجْعَلُ صَلٰوتِىْ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ ذٰلِكَ اِلَيْكَ؟ اِنَّمَا ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ اَيَّتَهُمَا شَاءَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হযরত ! আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ি, অতঃপর মসজিদে এসে ইমামের সাথেও জামাতে নামাজ পাই। সুতরাং এখন আমি কি পুনরায় ইমামের সাথে নামাজ পড়ব? উত্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ পড়। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, এমতাবস্থায় এই দুই নামাজের মধ্যে আমি কোনটিকে ফরজ মনে করব? উত্তরে হযরত ইবনে উমর বললেন, এটা কি তোমার কাজ? বরং এটাতো একমাত্র আল্লাহর কাজ, তিনি এ দুই নামাজের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরজ রূপে গণ্য করবেন। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَجْعَلُ اَيَّتَهُمَا شَاءَ-**এর ব্যাখ্যা** : "তিনি উভয়ের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরজরূপে গণ্য করবেন" এ বাক্যটির ব্যাখ্যা হলো, কোনো জিনিস কবুল হওয়া না হওয়া তা আল্লাহর মেহেরবানীর উপর নির্ভর করে, বান্দা তা হতে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ও অসহায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম যদিও বলেন যে, প্রথম নামাজটিই ফরজ হবে। তবে এরও সম্ভাবনা আছে যে, কোনো কারণে প্রথম নামাজটি নষ্ট হয়ে গেলে দ্বিতীয় নামাজটি আল্লাহ তা'আলা উক্ত ফরজের স্থলে কবুল করে নেবেন।

আল্লামা ইবনে হাজার বলেন, উল্লিখিত কথাটির হযরত ইমাম গাজালী (র.) -এর ফতোয়া হতেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, উভয় নামাজের কোনো একটিকে ফরজ কিংবা নফল হিসাবে নির্দিষ্ট না করাই শ্রেয়। অবশ্য ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِى الْاَئِمَّةِ الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ صَلُّوا الصَّلَاةَ فِيْهَا وَاجْعَلُوْا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً

অর্থাৎ "যদি তোমাদের শাসকগণ নামাজ দেরি করে পড়তে থাকে তখন তোমরা ওয়াক্তের মধ্যে নিজেদের নামাজ পড়ে নিও এবং পরে তাদের সাথে নফল হিসেবে পড়ো।" এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পরের নামাজটি নফলই হবে।

وَعَنْ ١٠٨٩ سُلَيْمَانَ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ (رض) قَالَ اَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ اَلَا تُصَلِّيْ مَعَهُمْ قَالَ قَدْصَلَّيْتُ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১০৮৯. অনুবাদ : হযরত মাইমুনা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম [তাবেয়ী] হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বালাত নামক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট আসলাম, তখন তাঁরা নামাজ পড়ছিলেন। [কিন্তু তিনি তাতে শামিল ছিলেন না] আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তাদের সাথে নামাজ পড়ছেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেন– আমি নামাজ পড়েছি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন– কোনো নামাজ একদিনে দু'বার পড়বে না। –[আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْبَلَاطُ কি এবং কোথায় অবস্থিত : اَلْبَلَاطُ –শব্দে 'বা' বর্ণ যবর বিশিষ্ট। 'বালাত' এক প্রকার পাথরকে বলা হয়, যা দ্বারা জমিন সমতল করা হয়। অতঃপর একটি স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে 'বালাত'। এটা মসজিদে নববীর নিকটে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম। হযরত ওমর (রা.) এটা নির্মাণ করেছিলেন। মুসল্লিরা এ স্থানে বসে নামাজের আগে ও পরে আলাপ-আলোচনা করত।

একটি تَعَارُضْ এবং তার সমাধান : উপরে হযরত সুলাইমান (তাবেয়ী)-এর বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, لَاتُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ তোমরা কোনো নামাজ একদিনে দু'বার পড়বে না। অথচ ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একই নামাজ দু'বার পড়া বৈধ। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এর সমাধানে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

১. প্রথমত বলা যেতে পারে, যে হাদীসে لَاتُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ রয়েছে, এটা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি প্রথমবার জামাতে নামাজ আদায় করেছে। আর অন্যান্য যে সমস্ত হাদীসে একই নামাজ দু'বার পড়ার হুকুম এসেছে, এটা সেই সকল ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য হবে, যারা প্রথমবার একাকী নামাজ আদায় করেছে। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে আর কোনো تَعَارُضْ অবশিষ্ট থাকে না।

২. অথবা সুলাইমানের হাদীসটি একাকী পড়ার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যদি কেউ প্রথমবার জামাতে নামাজ আদায় করে পরে একাকী তার পুনরায় নামাজ পড়তে হবে না।

৩. অথবা যে সমস্ত হাদীসে দু'বার নামাজ পড়ার হুকুম এসেছে তা জোহর ও এশার নামাজের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে হাদীসে لَاتُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ রয়েছে তা বাকি তিন ওয়াক্ত অর্থাৎ ফজর, আসর ও মাগরিবের সাথে সম্পৃক্ত।

وَعَنْ ١٠٩٠ نَافِعٍ (رض) قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ اَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ اَدْرَكَهُمَا مَعَ الْاِمَامِ فَلَا يُعِدْ لَهُمَا . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১০৯০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, যে ব্যক্তি মাগরিব কিংবা ফজরের নামাজ [একবার] পড়েছে, অতঃপর উক্ত দু' নামাজকে ইমামের সাথে পেয়েছে সে যেন [সেই দিন] ঐ দু' নামাজ [পুনরায়] না পড়ে। –[মালিক]

بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلِهَا
পরিচ্ছেদ : সুন্নত নামাজ ও তার ফজিলত

تَعْرِيْفُ السُّنَنِ **সুন্নতের সংজ্ঞা :** اَلسُّنَنُ শব্দটি اَلسُّنَّةُ -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো– নিয়ম-পদ্ধতি, পথ, তরিকা ইত্যাদি। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, সুন্নত, নফল, মানদূব এবং মোস্তাহাব এ সব সবগুলো সমার্থবোধক।

আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতারে লেখেন যে, শরিয়তের বিধান সর্বমোট চার শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা– (১) ফরজ, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নত এবং (৪) নফল। যা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো ফরজ, আর যা দলিলে যন্নী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে তা ওয়াজিব, আর সুন্নত হলো যার উপর শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি এবং যার উপর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ অটল ছিলেন। আর কোনো আমলের মধ্যে স্থায়িত্ব পাওয়া না গেলে তাকে নফল বলা হয়।

اَقْسَامُ السُّنَّةِ **সুন্নতের প্রকারভেদ :** উল্লেখ্য যে, ইমামগণ সুন্নতকে দু' ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত সুন্নাতুল হুদা অর্থাৎ, এমন সুন্নত যা পরিত্যাগ করা মাকরূহ। এটাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাও বলা হয়। যেমন– জামাত, আযান, ইকামত ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত সুন্নতে যায়েদা অর্থাৎ, অতিরিক্ত সুন্নত। যেমন– নফল বা মানদূব নামাজ এবং রাসূল ﷺ -এর লেবাস-পোশাক ও উঠা-বসার সুন্নতসমূহ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১০৯১. عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ اِلَّا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَّا بُنِىَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ

১০৯১. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাকাত নামাজ পড়ে, তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরি করা হয়। চার রাকাত জোহরের [ফরজের] পূর্বে, দু' রাকাত তার পরে, দু' রাকাত মাগরিবের [ফরজের] পরে, দু' রাকাত এশার [ফরজের] পরে এবং দু' রাকাত ফজরের [ফরজের] পূর্বে। –[তিরমিযী]

কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি [উম্মে হাবীবা] বলেছেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান বান্দা প্রত্যেক দিন একমাত্র আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য ফরজ ব্যতীত বারো রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর তৈরি করেন অথবা [রাবীর সন্দেহ, তিনি বলেছেন] তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর তৈরি করা হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সুন্নতের ফজিলত : আল্লামা ইবনু দাকীকিল ঈদ (র.) বলেন, ফরজ নামাজের পূর্বে ও পরে সুন্নত নামাজ চালু করার মধ্যে বিরাট তাৎপর্য বিদ্যমান রয়েছে, আর তা হলো স্বাভাবিকভাবে মানুষ সর্বদা বিভিন্ন কর্মে ব্যস্ত থাকার ফলে তাদের অন্তরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে সে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ পড়তে সক্ষম হয় না, অথচ নামাজের জন্য একাগ্রচিত্ততা একান্ত অপরিহার্য,

তাই সুন্নত নামাজের মাধ্যমেই একাগ্রতা সৃষ্টি হয় এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে ফরজ নামাজ সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আদায় করা সম্ভব হয়। এ ছাড়া ফরজ নামাজে ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দিলে তা নফল দ্বারাই পূর্ণ করে দেওয়া হয়। যেমন, হাদীসে এসেছে–

فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ تَعَالٰى اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ .

১০৯২. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ وَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তার গৃহে জোহরের [ফরজের] পূর্বে দু' রাকাত, এর পরে দু' রাকাত এবং মাগরিবের [ফরজের] পরে দু' রাকাত নামাজ পড়েছি এবং তার গৃহে এশার [ফরজের] পরেও দু' রাকাত নামাজ পড়েছি। তিনি আরও বলেন, হযরত হাফসা (রা.) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্ত দু' রাকাত নামাজ পড়তেন যখন ফজরের আলোক উদ্ভাসিত হতো [অর্থাৎ সুবহে সাদেক হলে ফজরের ফরজের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সুন্নতে রাওয়াতিব কত রাকাত ও কি কি? : উল্লেখ্য যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগে ও পরের সুন্নতে মুয়াক্কাদাকে সুন্নতে রাওয়াতিব বলে। এটা মোট কয় রাকাত সে বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র.)-এর মতে সুন্নাতে রাওয়াতিব মোট দশ রাকাত। তাঁরা জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নতের পরিবর্তে দুই রাকাত ধরেন। তাঁদের দলিল ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

مَذْهَبُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَصْحَابِهِ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর সাথীদের মতে সুন্নতে রাওয়াতিব মোট বারো রাকাত। তাঁরা জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত ধরেছেন। ইমাম তিরমিযী, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম ইসহাক, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অভিমত এই একই ধরনের। তারা হযরত উম্মে হাবীবা বর্ণিত হাদীসসহ নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন–

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ . (كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيْ وَالتِّرْمِذِيْ)

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ)

তাঁদের দলিলের জওয়াব : ইমাম শাফেয়ী (র.) তথা দু' রাকাতের সমর্থকদের দলিলের নিম্নোক্ত জবাব দেওয়া হয়েছে। ফলে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না—

১. আল্লামা দাউদী বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে জোহরের পূর্বে দু' রাকাতের কথা রয়েছে অথবা হযরত আয়েশা ও উম্মে হাবীবাহ (রা.)-এর হাদীসে চার রাকাতের কথা বলা হয়েছে। বর্ণনার বিভিন্নতা এ জন্য হয়েছে যে, প্রত্যেকেই যেভাবে দেখেছেন ঐ ভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। আসল ব্যাপার এই যে, রাসূল ﷺ কখনও দু' রাকাত কখনও চার রাকাত পড়েছেন।

২. অথবা এ দু' রকম বর্ণনা দু' সময়ের। রাসূল ﷺ কখনো মসজিদে সংক্ষেপে দু' রাকাত পড়তেন এবং ঘরে চার রাকাত পড়তেন।

৩. অথবা রাসূল ﷺ ঘরে দু' রাকাত পড়ে মসজিদে গেছেন এবং মসজিদে গিয়ে আবার দু' রাকাত পড়েছেন। ইবনে ওমর মসজিদে দেখা দু' রাকাতের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হযরত আয়েশা উভয় নামাজকে যোগ করে মোট চার রাকাতের কথা বলেছেন।

৪. জোহরের পূর্বে চার রাকাত হওয়ার আরও সুস্পষ্ট দলিল ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন, অতঃপর মসজিদের দিকে বের হতেন। সম্ভবত তিনি ঘরে সুন্নত চার রাকাত পড়েছেন, তার বর্ণনা রাসূল ﷺ -এর স্ত্রীগণ দিয়েছেন। আর সম্ভবত তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু' রাকাত মাসজিদে পড়েছেন তা হযরত ইবনে ওমর (রা.) দেখে বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের উম্মতের নিকট শরিয়তের আহকামগুলো চার রকমের হয়। যথা- (১) ফরজ, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নত ও (৪) নফল, কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর শানে তা তিন প্রকার- ফরজ, ওয়াজিব ও নফল। তিনি নফল হিসাবে যে আমলগুলো সচরাচর বা নিয়মিত করেছেন, তাই আমাদের নিকট সুন্নত। এ জন্যই কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানে কোনো কোনো নামাজ تَطَوُّع বা মানদূব ইত্যাদি বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐগুলোই আমাদের মতে সুন্নত।

اَلتَّعَارُضُ وَ دَفْعُهُ একটি দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : হযরত ইবনে ওমর এবং পূর্বোল্লিখিত হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, জোহরের পর দু' রাকাত সুন্নত। অথচ আবূ দাউদ শরীফে উম্মে হাবীবা হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে,

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رض.) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ اَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জোহরের পর চার রাকাত সুন্নত। এখন উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধানকল্পে মুহাদ্দিসগণ বলেন, জোহরের পর দু' রাকাত অথবা চার রাকাত পড়া যে বৈধ, এটা সাব্যস্ত করার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' ধরনের আমল করেছেন।

অথবা বলা যায় যে অধিকাংশ সহীহ হাদীসে জোহরের পর দু' রাকাত সুন্নতের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং দুই রাকাত বিশিষ্ট হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

অথবা এর সমাধান হলো, যে সমস্ত রেওয়ায়েতে জোহরের পর চার রাকাত সুন্নতের উল্লেখ রয়েছে এর মধ্যে দু' রাকাতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং বাকি দু' রাকাতকে গায়রে মুয়াক্কাদা ধরতে হবে। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো تعارض বা দ্বন্দ্ব থাকে না।

١٠٩٣ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৯৩. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার পরে ঘরে ফিরে আসা পর্যন্ত কোনো নামাজ পড়তেন না। অতঃপর ঘরে এসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِيْ عَدَدِ السُّنَنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَطَرِيْقَةِ اَدَائِهَا জুমার পরে সুন্নতের রাকাত ও তা আদায় করার ব্যাপারে মতভেদ : জুমার নামাজের পর কত রাকাত সুন্নত পড়তে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَالنَّخْعِيْ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইব্রাহীম নাখয়ীসহ কিছুসংখ্যক আলিমের মতে জুমার পর সুন্নত দু' রাকাত আর তা গৃহে পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো-

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهٖ ـ

(٢) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অন্য অপর বর্ণনানুযায়ী জুমার পরে যত বেশি নামাজ পড়বে ততই উত্তম।

مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ : আতা, সাওরী ও ইবনুল মুবারকের মতে জুমার পরে ছয় রাকাত নামাজ পড়তে হবে। তবে প্রথমে দু' রাকাত এবং পরে এক সালামে চার রাকাত পড়তে হবে। তারা নিম্নের হাদীসগুলো দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন-

(١) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهٗ اَمَرَ اَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَرْبَعًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(٢) رَوٰى اِسْحٰقُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) الْجُمُعَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفَ ـ

ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে ছয় রাকাত। তবে তাঁরা বলেন যে, প্রথমে চার রাকাত এবং পরে দু' রাকাত পড়তে হবে। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে। কেননা, তাঁর বাণী এভাবে বর্ণিত হয়েছে عَنِ ابْنِ عُمَرَ-اِنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ بِالْاَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعِ এবং তাঁর আমর সম্পর্কে বলা হয়েছে- اَنَّهٗ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ তবে চার রাকাত আগে পড়ার দলিল এই যে,

عَنْ خِرْشَةَ بْنِ مَخْرَانَ اَنَّ عُمَرَ رضـ كَرِهَ اَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلٰوةٍ مِثْلَهَا

অর্থাৎ, কোনো নামাজের পরে তার সমপরিমাণ অন্য নামাজ পড়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন। তাই জুমার ফরজ দু'রাকাতের পরে প্রথমে সুন্নত দু'রাকাত না পড়ে বরং সুন্নত চার রাকাত আগে পড়বে।

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاِسْحَاقَ وَعَلْقَمَةَ وَالنَّخْعِيْ ইমাম আজম, ইসহাক, আলকামা ও নাখয়ীর মতে জুমার পর এক সালামে চার রাকাত পড়বে। তার দলিল-

(١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) مَرْفُوْعًا مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

اَدَاءُ السُّنَّةِ لِلْجُمُعَةِ فِى الْمَسْجِدِ اَمْ فِى الْبَيْتِ **জুমার সুন্নত মাসজিদে পড়তে হবে, না ঘরে** : অধিকাংশ ইমামদের মতে জুমার পরের সুন্নত মাসজিদে না পড়ে নিজ গৃহে পড়াই উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক এবং আহমদ (র.) প্রমুখ এ মতই ব্যক্ত করেছেন। তাদের দলিল হলো নিম্নের হাদীসটি-

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْضَلُ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার পরের সুন্নত নিজ গৃহে পড়তেন।

وَعَنْ ١٠٩٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهٖ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ

১০৯৪. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নফল নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, তিনি আমার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর মসজিদের দিকে বের হয়ে গিয়ে লোকদেরকে নামাজ পড়াতেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। রাসূল ﷺ লোকদেরকে মাগরিবের নামাজ পড়াতেন, অতঃপর ঘরে এসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর

يُصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ زَادَ اَبُوْدَاوُدَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ)

লোকদেরকে এশার নামাজ পড়াতেন। তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। আর তিনি রাতে নয় রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে বিতর নামাজও থাকত। তিনি কোনো কোনো সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন। আবার মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় বসেও নামাজ পড়তেন। কিন্তু যখন দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করতেন তখন রুকু সিজদাও দাঁড়িয়ে করতেন এবং যখন বসে বসে কেরাত পাঠ করতেন তখন রুকু সিজদাও বসেই করতেন। আর যখন সুবহে সাদেক অর্থাৎ আকাশে উষার আবির্ভাব হতো, তখন তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। –[মুসলিম। কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ এ কথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হতেন এবং লোকদেরকে ফজরের নামাজ পড়াতেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ وَالتَّطْبِيْقُ بَيْنَهُمَا **দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সমাধান :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ যখন যে অবস্থায় কেরাত পাঠ করতেন তখন ঐ অবস্থা হতেই রুকু ও সিজদা করতেন। অপর দিকে হযরত উরওয়ার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উরওয়া একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে হুজূরের নামাজের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, "মহানবী ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর কখনো কখনো বসে বসে কেরাত পাঠ করতেন। যখন সূরার ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তিনি তখন দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট অংশগুলো পাঠ করতেন, তারপর রুকু সিজদা করতেন।" এটা হতে উভয় হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর জবাবে বলা যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীকের হাদীসে কেরাত বলতে পূর্ণ কেরাত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ কেরাত দাঁড়ানো অবস্থায় পাঠ করে শুধু রুকু বা সিজদার সময় বসতেন না। আবার সম্পূর্ণ কেরাত বসা অবস্থায় পাঠ করে শুধু রুকু ও সিজদার জন্য দাঁড়াতেন না। মূলত নামাজ দাঁড়িয়ে শুরু করে কেরাতের কিছু অংশ পাঠ করে অতঃপর বাকি অংশ পাঠের জন্য বসে যাওয়া এবং সে বসা অবস্থায় রুকু-সিজদা করা জায়েজ আছে। অনুরূপভাবে বসা অবস্থায় নামাজ ও কেরাত শুরু করে পরে দাঁড়িয়ে বাকি অংশ পাঠ করে সে অবস্থা হতে রুকু সিজদা করাও জায়েয আছে। মোটকথা, মহানবী ﷺ সাধারণত তিন অবস্থায় নামাজ আদায় করতেন। যথা–

১. অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন এবং দাঁড়ানো অবস্থা হতেই রুকু-সিজদা করতেন।

২. বসে বসে নামাজ আদায় করতেন এবং সেই অবস্থা হতেই রুকু সিজদা করতেন।

৩. বসে নামাজ আরম্ভ করতেন এবং কেরাত শেষে দাঁড়িয়ে কিছু পাঠ করে রুকু সিজদা করতেন। আবার দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করতেন এবং শেষলগ্নে বসে যেতেন এবং কেরাতের কিছু অংশ পাঠ করে রুকু সিজদা করতেন। বলা যায় অত্র আলোচনার ফলে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসে রাতের নামাজ বলতে তাহাজ্জুদের নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ বিষয় পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

وَعَنْ ١٠٩٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১০৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ নফল নামাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতেন ফজরের পূর্বের দু' রাকাত নামাজের প্রতি। অর্থাৎ ঐ নামাজ তিনি সর্বদাই পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কেননা এ দু' রাকাত কষ্টকর সময়ে পড়া হয়। তাই এ দু' রাকাত নামাজ অন্যান্য সকল সুন্নত ও নফল হতে গুরুত্ববহ। সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুয়াক্কাদা সুন্নত হলো ফজরের পূর্বের দু রাকাত সুন্নত। তারপর দু' রাকাত এবং জোহরের পূর্বে চার রাকাত।

وَعَنْهَا ١٠٩٦ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১০৯৬. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ফজরের পূর্বের দু' রাকাত নামাজ দুনিয়া ও উহার সমস্ত জিনিস হতে উত্তম। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٠٩٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

১০৯৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়ো, তোমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকাত নামাজ পড়ো, কিন্তু তৃতীয়বার বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে এটা তিনি এজন্য বলেছেন, যাতে মানুষ সেই দুই রাকাত নামাজকে সুন্নত [মুয়াক্কাদা] না বানিয়ে ফেলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ **মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** মাগরিবের ফরজের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়া জায়েজ আছে কিনা? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

مَذْهَبُ بَعْضِ الصَّحَابِيِ وَالتَّابِعِيِّ وَالْفُقَهَاءِ একদল সাহাবী, তাবেয়ী ও ফকীহের মতে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ মোস্তাহাব। ইবনে বাত্তাল বলেন, ইমাম আহমদ ও ইসহাকেরও এটাই অভিমত। ইবনে হাযম বলেন, সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, আনাস, উবাই ইবনে কা'ব ও জাবের (রা.) প্রমুখও এটাই বলতেন। আলোচ্য হাদীসকেই তাঁরা আমলযোগ্য মনে করতেন।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর মতে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত সুন্নত নেই। তাঁরা নিজেদের অনুকূলে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ পেশ করেন–

১. আবূ দাউদে হযরত তাউস হতে বর্ণিত আছে যে, سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ (رضـ) عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا একবার হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মহানবী ﷺ-এর যুগে আমি কাউকে এ দু' রাকাত পড়তে দেখিনি।

২. আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, اِخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيْهِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ اَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ উল্লিখিত নামাজের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ পড়েছেন, আবার কেউ পড়েননি। কিন্তু তাবেয়ীদের কেউই পড়েননি।

৩. ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন, কূফার শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ যথা– হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, আম্মার, আবূ মাসউদ প্রমুখ কাউকে মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত পড়তে দেখেনি। মোটকথা, খোলাফায়ে রাশেদাহসহ সাহাবীদের এক বিরাট জামাত এ নামাজ পড়েননি। অপরদিকে এটা পড়তে গেলে একদিকে মাগরিবের ফরজ নামাজের দেরি হবে, অথচ এ নামাজের সময় খুবই সংকীর্ণ। অথবা ইমামের সাথে তাকবীরে উলায় শরিক হওয়াই সম্ভব হবে না। এমনকি অনেক সময় ইমামের সাথে ফরজ নামাজের অধিকাংশ পড়া হতে বঞ্চিত হতে হবে। কাজেই ইবনে মুগাফ্ফালের হাদীসের জবাবে বলা হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ নামাজ পড়া হতো। কেউ কেউ পড়তেন, পরে তা রহিত হয়ে গেছে। যেমন উবাইদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা তাঁর পিতা বুরাইদা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আযান ও একামতের মধ্যখানে নামাজ আছে, কিন্তু মাগরিবে নেই।

* ইবনুল আরাবীও হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসকে রহিত হওয়ার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আর আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে سُنَّةً কথাটির অর্থ হলো– شَرِيْعَةٌ وَطَرِيْقَةٌ لَازِمَةٌ তা এমন আমল বা কাজ, যা ফরজের সমপর্যায়ে পড়ে। তথা মানুষ যাতে একে অত্যাবশ্যকীয় মনে না করে।

وَعَنْ ١٠٩٨ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ أُخْرٰى لَهُ قَالَ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا .

১০৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে যে কেউ জুমার নামাজের পরে নামাজ পড়ে সে যেন চার রাকাত নামাজ পড়ে। –[মুসলিম]

তার অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাজ আদায় করে, সে যেন তারপর চার রাকাত নামাজ পড়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইবনুল মালিক বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি জুমার ফরজের পর চার রাকাত সুন্নতের প্রমাণ বহন করেছে। এর অনুকূলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এরও একটি মত রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (রা.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ছয় রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, প্রথমত চার রাকাত এবং পরে দু' রাকাত পড়বে। কেননা জুমার পর এর সম রাকাত বিশিষ্ট কোনো নামাজ পড়া উচিত নয়; এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইতঃপূর্বে করা হয়েছে। এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী বলেন, জুমার ফরজের পূর্বে কোনো সুন্নত নামাজ নেই। তাঁরা বলেন, এটা বিদ'আত। মূলত এই অভিমত ঠিক নয়। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَهَا أَرْبَعًا -

অপর এক হাদীসে এসেছে যে, عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَهَا أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

এ সমস্ত হাদীস বিদ্যমান থাকায় কতক শাফেয়ী মতাবলম্বীদের অভিমত সঠিক হতে পারে না। –[মিরকাত]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٠٩٩ - عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ اَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১০৯৯. অনুবাদ : হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি জোহরের [ফরজের] পূর্বের চার রাকাত ও পরে চার রাকাত নামাজ [অর্থাৎ দু' রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আর দু' রাকাত মোস্তাহাব] নামাজের হেফাজত করে [অর্থাৎ খুব যত্ন সহকারে নিয়মিত আদায় করে] তাকে [স্পর্শ করা] আল্লাহ তা'আলা দোজখের আগুনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।-[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাতের কথা বলা হয়েছে; মূলত জোহরের পর দু' রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আর অবশিষ্ট দু' রাকাত মোস্তাহাব।

١١٠٠ - وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১০০. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জোহরের [ফরজের] পূর্বে চার রাকাত নামাজ যার মধ্যখানে কোনো সালাম নেই [অর্থাৎ এক সালামে চার রাকাত নামাজ] এ নামাজের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

١١٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِىْ فِيْهِ عَمَلٌ صَالِحٌ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১১০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর জোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন এবং বলতেন, এটা এমন একটি সময় যাতে [রহমত নাজিলের জন্য] আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। সুতরাং আমি ভালো মনে করি যে, এ সময় আমার একটি ভাল কাজ তথায় উঠিয়ে নেওয়া হোক। -[তিরমিযী]

١١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا -

১১০২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আসরের [ফরজের] পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়ে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে যে চার রাকাতের কথা বলা হয়েছে তা সুন্নত হিসাবে গণ্য করতে হবে।

وَعَنْ ١١٠٣ - عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের [ফরজের] পূর্বে চার রাকাত নামাজ পড়তেন। এ চার রাকাতের মধ্যখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তাদের ও তাঁর অনুসারী বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে বিভক্ত করতেন। [অর্থাৎ দুই সালামে চার রাকাত পড়তেন।] –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন এবং প্রত্যেক দু' রাকাতের মধ্যখানে নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তাদের ও বিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে বিভক্ত করতেন। ইমাম বাগাবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত 'তাসলীম' শব্দ দ্বারা সালাম উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা তাশাহ্‌হুদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাঁর মতে রাসূল ﷺ এক সালামেই চার রাকাত শেষ করতেন। আর দু' দু' রাকাত করে পড়তেন এ কথা গ্রহণ করলেও কোনো সমস্যা নেই। কেননা রাসূল ﷺ এ নিয়মেই নামাজ পড়তেন।

وَعَنْهُ ١١٠٤ - قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

১১০৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পূর্বে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : মহানবী ﷺ আসরের পূর্বে কখনো দু' রাকাত আবার কখনোও চার রাকাত নফল নামাজ পড়েছেন। অথবা চার রাকাতকে সুন্নতে যায়েদা এবং দু' রাকাতকে তাহিয়্যাতুল মসজিদও বলা যায়।

وَعَنْ ١١٠٥ - اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهٗ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهٗ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ خَثْعَمٍ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ وَضَعَّفَهٗ جِدًّا)

১১০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নামাজ পড়েছে এ নামাজগুলোর মধ্যখানে কোনো মন্দ কথা বলেনি তার সেই নামাজগুলো বারো বছরের [নফল] ইবাদতের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে। –[তিরমিযী]

তিরমিযী আরও বলেন যে, এ হাদীসটি গরীব। এ হাদীসটি আমি ওমর ইবনে আবূ খাসয়াম রাবী ব্যতীত অন্য কোনো বর্ণনা সূত্র হতে জানতে পারিনি এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, হাদীস গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এ রাবী মুনকার অর্থাৎ, অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি এ রাবীকে নেহায়েত যয়ীফ অভিহিত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এ নামাজকেই 'আওয়াবীন' নামাজ বলা হয়ে থাকে। হাদীসে কোথাও এ নামাজকে এ নামে উল্লেখ করা হয়নি; বরং চাশ্তের নামাজকেই 'সালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়েছে। তবে বুজুর্গানে দীন এ নামাজ সব সময় পড়েন। মিরকাত প্রণেতা বলেন, مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মাগরিবের দু' রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাও এ ছয় রাকাতের অন্তর্ভুক্ত।

عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ سَنَةً **-এর মর্মার্থ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের ফরজের পর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্তে ছয় রাকাত নামাজ পড়ল, তার সে নামাজ বারো বছরের নফল ইবাদতের সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা মূলত নফল ইবাদত পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য। কারো মতে এ হাদীসের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, অল্প ছওয়াবকে অধিক ছওয়াবে পরিণত করা হবে। এটা ছাড়াও অনেক অভিমত পাওয়া যায়।

وَعَنْ ١١٠٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পর বিশ রাকাত [নফল] নামাজ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করেন। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটিতে মাগরিবের পরে বিশ রাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়ে, তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে একখানা গৃহ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য এ সমস্ত হাদীস দ্বারা নফল নামাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করাই উদ্দেশ্য, তবে হাদীস বিশারদদের মতে উল্লিখিত হাদীসটি যঈফ পর্যায়ের।

وَعَنْهَا ١١٠٧ قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ اِلَّا صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১০৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এশার নামাজ পড়ে আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তিনি চার রাকাত কিংবা ছয় রাকাত নামাজ পড়তেন। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** প্রসিদ্ধ রেওয়ায়তসমূহে এশার নামাজের পর হযরত আয়েশার ঘরে হুজুর ﷺ দু' রাকাত নামাজ পড়তেন এটাই বর্ণিত আছে, ছয় বা চার রাকাতের কথা উল্লেখ নেই। সুতরাং এ হাদীসে 'এশা' অর্থ মাগরিব হবে। কেননা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা মাগরিবকে 'প্রথম এশা' এবং এশাকে 'দ্বিতীয় এশা' বলতো। এ হিসাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস এ কথার সমর্থন করে যে, হুজুর ﷺ মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়ার জন্য লোকদেরকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অথবা এটা এশার পরে হুজুরের কোনো কোনো সময়ের আমল হতে পারে। নিত্যকার আমল ছিল দু' রাকাত।

وَعَنْ ١١٠٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْبَارَ النُّجُوْمِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ اِدْبَارَ السُّجُوْدِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১১০৮. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [কুরআনে পাকের সূরা তূরে] তারকারাজির অস্ত যাওয়ার কালে যেই اِدْبَارَ النُّجُوْمِ নামাজ আদায় করার কথা বলা হয়েছে, তা হলো ফজরের [ফরজের] পূর্বের দু' রাকাত এবং اِدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থাৎ সূরায়ে কাফে নামাজের পর যে নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো মাগরিবের ফরজের পর দু' রাকাত সুন্নত। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِدْبَارَ النُّجُوْمِ-এর **মর্মার্থ** : اِدْبَارٌ শব্দটি বাবে اِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর অর্থ হলো– প্রস্থান করা, গমন করা। اَلنُّجُوْمُ অর্থ– তারকাসমূহ। শাব্দিক অর্থ– তারকারাজির প্রস্থান। اِدْبَارَ النُّجُوْمِ শব্দটি কুরআন মাজীদের আয়াত হতে আনয়ন করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ . وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ . (الطور) অর্থাৎ "আর আপনি [নিদ্রা হতে] উঠার সময় নিজ রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করুন এবং রাতেও তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন, আর নক্ষত্ররাজির অস্তের পরও।" –[তূর]

রাতের শেষভাগে তারকারাজির আলো ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। মনে হয় যেন গগন থেকে তারকারাজি বিদায় নিচ্ছে। অতএব اِدْبَارَ النُّجُوْمِ দ্বারা এখানে ফজরের সুন্নতকে বুঝানো হয়েছে।

اِدْبَارَ السُّجُوْدِ-এর **অর্থ** : اِدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থ– সিজদার পর। আর এখানে اَلسُّجُوْدُ দ্বারা মাগরিবের নামাজ উদ্দেশ্য। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ السُّجُوْدِ

উপরে বর্ণিত হাদীসে اِدْبَارَ السُّجُوْدِ দ্বারা মাগরিবের সুন্নত নামাজকে বুঝানো হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٠٩ عُمَرَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِيْ صَلٰوةِ السَّحَرِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللّٰهَ تِلْكَ السَّاعَةِ ثُمَّ قَرَأَ يَتَفَيَّؤُ ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১১০৯. **অনুবাদ** : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– [জোহরের নামাজের পূর্বে] সূর্য হেলে যাওয়ার পরে চার রাকাত নামাজ ছওয়াবের বেলায় শেষ রাতের চার রাকাত [তাহাজ্জুদ] নামাজের সমান। ঐ সময় কোনো বস্তুই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ব্যতীত থাকে না। অতঃপর রাসূল ﷺ আয়াত পাঠ করলেন, অর্থাৎ "তারা কি আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করে না? যার ছায়াসমূহ ডানে ও বামে ঢলে থাকে আল্লাহর সিজদায়, আর তারাই বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে।" –[তিরমিযী। বায়হাকী এ হাদীস শু'আবুল ঈমানে উল্লেখ করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِصَلٰوةِ السَّحَرِ **সাহরের নামাজ দ্বারা উদ্দেশ্য** : 'সালাতুস্ সাহ্র' দ্বারা অধিকাংশ ওলামার মতে তাহাজ্জুদ নামাজকেই বুঝানো হয়েছে। আর এটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা এ শব্দটি [সাহ্র]-এর অর্থ বুঝানোর জন্য বেশি উপযোগী। সিফরুস সা'আদাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আট রাকাত নামাজ পড়তেন এবং তিনি বলতেন এ নামাজ রাতে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়ার ছওয়াবের সমতুল্য। এর দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'সালাতুস সাহ্র' অর্থ তাহাজ্জুদের নামাজই। কেননা 'কিয়ামুল লাইল' দ্বারা তাহাজ্জুদ বা 'সালাতুল লাইল' বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং হাদীসের অর্থ হবে 'সূর্য হেলে পড়ার পর আদায়কৃত চার রাকাত নামাজ ছওয়াবের দিক থেকে তাহাজ্জুদ নামাজের সমান।'

কোনো কোনো ইমাম এর অন্তর্নিহিত এ রহস্য বর্ণনা করেছেন যে, দিবসের অর্ধেকের পর এবং রাতের অর্ধেকের পর [শেষ রাত্র পর্যন্ত] এ দুই সময়ে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়ে থাকে, কাজেই এ দুই সময় নামাজ পড়লে ছওয়াবও উভয় নামাজের সমান হবে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কারো মতে [সালাতুস্-সাহ্র] অর্থ–ফজরের দু' রাকাত সুন্নত ও দু' রাকাত ফরজ। তখন হাদীসটির অর্থ হবে, দ্বি-প্রহরের সূর্য ঢলে পড়লে তখনকার চার রাকাত নামাজ ফজরের সুন্নত ও ফরজের সমান ছওয়াবের মর্যাদা রাখে। তবে আমরা পূর্বেই বলেছি, 'তাহাজ্জুদ' হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

وَعَنْ ١١١٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِيْ قَطُّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ وَالَّذِيْ ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ .

১১১০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পর আমার ঘরে দু' রাকাত নামাজ পড়া কখনো ত্যাগ করেননি। –[বুখারী ও মুসলিম] বুখারীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি তাকে নিয়ে গেছেন, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ وَ دَفْعُهٗ **হাদীসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান** : অনেক হাদীসে এ কথা রয়েছে যে, নবী ﷺ তাঁর উম্মতকে আসরের পর নফল নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন। অথচ উক্ত হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুযূর ﷺ নিত্যই আসরের পরে দু' রাকাত নফল পড়তেন। এর সমাধানে হযরত উম্মে সালামার হাদীসের আলোকে কেউ কেউ বলেন, একবার হুযূর ﷺ-কে উক্ত দু' রাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের কয়জন প্রতিনিধি আমার নিকট এসেছিল, তাদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলাম বিধায় জোহ্রের পরে দু' রাকাত মুয়াক্কাদা তখন পড়তে পারিনি। সুতরাং আসরের পরে তা আদায় করে নিলাম। আবার কারো মতে জোহরের পরে হুজুর ﷺ গনিমতের মাল বিতরণ করতে বসে গেলেন ফলে দু' রাকাত সুন্নত পড়তে পারেননি আসরের পরে তা আদায় করেছেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের ওলামাদের কথা হলো, উল্লিখিত কারণে জোহরের সুন্নতকে আসরের পরে পড়ে থাকলেও বহু হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি সর্বদাই তা পড়তেন। এটা ছিল তাঁর নিত্যকার অভ্যাস। কাজেই বলতে হবে যে, আসরের পরে দু' রাকাত পড়া শুধু তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়েছে।

وَعَنْ ١١١١ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ (رحـ) قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رضـ) عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِيْ عَلٰى صَلٰوةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكُنَّا نُصَلِّيْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১১১. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত মুখতার ইবনে ফুলফুল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-কে আসরের পরে নফল নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, হযরত ওমর (রা.) যারা আসরের পরে নামাজে দাঁড়াতেন, তাদের হাতে আঘাত করতেন [অর্থাৎ তিনি আসরের পরে নামাজ পড়তে নিষেধ করতেন]। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পরে মাগরিব নামাজের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়তাম। [রাবী বলেন,] অতঃপর আমি হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ দু' রাকাত নামাজ পড়তেন? তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে ঐ দু' রাকাত নামাজ পড়তে দেখতেন অথচ তিনি আমাদেরকে আদেশ করতেন না, নিষেধও করতেন না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে দু'টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের পর দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। যে কারণেই হোক এটা একমাত্র তাঁর জন্যই খাস ছিল। উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সম্ভবত হযরত ওমর (রা.) এ কারণেই আসরের পরে নামাজ আদায়কারীদেরকে নিষেধ করতেন। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কেরাম সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের ফরজের পূর্বে দু' রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। এ বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١١١٢ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ اِبْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى أَنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلٰوةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১১২. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তখন মদীনাতে ছিলাম, যখন মুয়াজ্জিন মাগরিবের নামাজের আযান দিত, তখন লোকেরা তাড়াহুড়া করে মসজিদের খুঁটিসমূহের দিকে যেতেন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। এমনকি কোনো নবাগত আগন্তুক ব্যক্তি এসে মসজিদে প্রবেশ করলে সে নামাজরতদের সংখ্যাধিক্য দেখে মনে করত যে, সম্ভবত জামাত শেষ হয়ে গেছে।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মাগরিবের পূর্বে যে দু' রাকাত নামাজ পড়া হতো তা ইসলামের প্রথম যুগের ঘটনা। পরবর্তীকালে তা ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١١١٣ - مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رح) قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ الْجُهَنِيَّ (رض) فَقُلْتُ اَلَا اُعَجِّبُكَ مِنْ اَبِىْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الْاٰنَ قَالَ الشُّغْلُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১১৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মারসাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সাহাবী হযরত উকবা আল-জুহানী (রা.) -এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম, আমি কি আপনাকে [তাবেয়ী] আবূ তামীম সম্পর্কে [একটি আজব ঘটনা শুনিয়ে] বিস্ময়ে ফেলব না? তিনি মাগরিবের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়ে থাকেন। তখন হযরত উকবা (রা.) বললেন, আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে এ রকম করতাম। আমি বললাম, তা হলে এখন তা করতে আপনাকে কিসে বারণ করল? তিনি বললেন দুনিয়াদারীর কর্মব্যস্ততা। –[বুখারী]

وَعَنْ ١١١٤ - كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتٰى مَسْجِدَ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلّٰى فِيْهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلٰوتَهُمْ رَاٰهُمْ يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا فَقَالَ هٰذِهٖ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ)

১১১৪. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ বনি আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে আগমন করলেন এবং সেখানে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। লোকেরা যখন নামাজ শেষ করল, তখন রাসূল ﷺ দেখলেন যে, তারা সকলেই নামাজের পরে নফল নামাজ পড়তে শুরু করেছে, তখন রাসূল ﷺ বললেন, এটা তো ঘরের নামাজ। –[আবূ দাউদ। তিরমিযী ও নাসায়ীর এক বর্ণনায় এসেছে যে, কিছু লোক নফল নামাজ পড়তে দাঁড়াল তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এই নামাজ ঘরে পড়া উচিত।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ ঘরে নামাজ পড়ার হুকুম : ঘর বেশি দূরে না হলে কিংবা ঘরে কোনো প্রকার অসুবিধা না থাকলে সুন্নত, নফল ইত্যাদি নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম। অপর এক হাদীসে এসেছে যে, মহানবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থান বানায়ো না। অর্থাৎ কবরস্থানে যেরূপ নামাজ পড়া হয় না, অনুরূপভাবে তোমাদের ঘর সমূহকেও নামাজ হতে খালি রেখ না। এ হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, ফরজ ছাড়া অন্যান্য নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম।

فَقَالَ هٰذِهٖ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ -এর ব্যাখ্যা : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে আগমন করে মাগরিবের নামাজ পড়লেন। ফরজ শেষে নফল নামাজ পড়তে দেখে রাসূল ﷺ লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এটা তো ঘরের নামাজ। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চাইলেন যে, কোনো অসুবিধা না থাকলে নফল নামাজ ঘরে পড়াই শ্রেয়। কেননা ঘরে বসে একাকী নফল নামাজ পড়লে রিয়া বা অহঙ্কার জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ থাকে না; বরং বেশি একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মসজিদে বসে বহু লোকের মধ্যে নফল নামাজ আদায় করলে স্বভাবত আত্মগর্ব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ তাৎপর্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই রাসূল ﷺ বলেছেন, هٰذِهٖ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ অর্থাৎ এটাতো ঘরের নামাজ।

وَعَنْ ١١١٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১১৫. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [কখনও কখনও] মাগরিবের পর দু' রাকাত নামাজে কেরাত এত দীর্ঘ করতেন যে, ততক্ষণে মসজিদের লোকজন চলে যেত। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুন্নত ও নফল নামাজ মসজিদে পড়াও জায়েজ আছে।

وَعَنْ ١١١٦ مَكْحُوْلٍ يَبْلُغُ بِهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رُفِعَتْ صَلٰوتُهٗ فِيْ عِلِّيِّيْنَ مُرْسَلًا .

১১১৬. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত মাক্‌হুল (র.) নিম্নোক্ত বর্ণনাকে মুরসাল হিসাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের [ফরজের] পরে কোনো কথাবার্তা বলার পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়ে, অন্য বর্ণনায় আছে, চার রাকাত নামাজ পড়ে তার এ নামাজ 'ইল্লিয়্যীনে' উঠানো হয়। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رُفِعَتْ صَلٰوتُهٗ فِيْ عِلِّيِّيْنَ **-এর ব্যাখ্যা** : عِلِّيِّيْنَ মু'মিনদের আত্মা ও আমলনামা রাখার জায়গার নাম। عِلِّيِّيْنَ শব্দটি عِلْوٌ শব্দ হতে বের করা হয়েছে। عِلِّيٌّ -এর বহুবচন। হযরত বাররা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস হতে জানা যায় যে, এটা সপ্তম আসমানে আরশের নিচের একটি জায়গা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এটা সবুজ যবরজদ পাথর নির্মিত একখানা তক্তি, যা আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে এবং এতে নেককারদের আমলনামা লিখিত আছে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, এর দ্বারা সিদরাতুল মুনতাহাকে বুঝানো হয়েছে। আর একদলের মতে, এর দ্বারা মু'মিন লোকদের আমলনামার উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের মহাসম্মানের কথা বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١١١٧ حُذَيْفَةَ نَحْوَهٗ وَ زَادَ فَكَانَ يَقُوْلُ عَجِّلُوا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوْبَةِ . (رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ وَ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الزِّيَادَةَ عَنْهُ نَحْوَهَا فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১১১৭. **অনুবাদ** : হযরত হুযাইফা (রা.)ও পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এটা বর্ধিত করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলতেন, তোমরা মাগরিবের পরের দু' রাকাত শীঘ্রই পড়বে। কেননা এ দু' রাকাতও ফরজের সাথে উপরে উঠানো হয়। –[এই দু'টি হাদীসকে রাযীন বর্ণনা করেছেন। বায়হাকীও বর্ধিত অংশটুকু উক্ত রাবী হতে তদ্রূপভাবে শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ١١١٨ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ اِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قُمْتُ فِىْ مَقَامِىْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَىَّ فَقَالَ لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَنَا بِذٰلِكَ اَنْ لَّا نُوْصِلَ بِصَلٰوةٍ حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْ نَخْرُجَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১১৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] আমর ইবনে আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা [তাবেয়ী] হযরত নাফে' ইবনে জুবাইর (র.) তাকে [অর্থাৎ আমরকে] সাহাবী হযরত সায়েব (রা.) -এর নিকট পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, তাঁর [সায়েবের] নামাজ সম্পর্কে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) যা দেখেছিলেন বলে জনশ্রুতি বা কথিত আছে, তা সত্য কি না? জবাবে হযরত সায়েব বললেন, হ্যাঁ। একবার আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে 'মাকসূরায়' জুমার নামাজ পড়লাম। যখন ইমাম সালাম ফিরালেন আমি আমার ফরজ পড়ার স্থানেই দাঁড়িয়ে সুন্নত নামাজ আদায় করলাম। যখন তিনি [মুয়াবিয়া] ঘরে চলে গেলেন, তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আপনি যা করলেন তা আর পুনরায় করবেন না। যখন আপনি জুমার নামাজ পড়বেন এর সাথে অন্য কোনো সুন্নত বা নফল নামাজ মিলিয়ে পড়বেন না, যতক্ষণ না কোনো কথাবার্তা বলেন অথবা তথা হতে অন্য স্থানে চলে না যান। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এ আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন এক নামাজকে অপর নামাজের সাথে মিলিয়ে না পড়ি, যতক্ষণ না মধ্যখানে কিছু কথাবার্তা বলি অথবা সেই স্থান হতে অন্যত্র চলে যাই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : মাকসূরাহ হলো মসজিদের ভিতরে নিরাপদ প্রকোষ্ঠ। আমিরদের জন্য মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান। খোলাফায়ে রাশেদার পরে হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-ই সর্বপ্রথম এই প্রথা চালু করেন, যাতে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। আলোচ্য হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো ফরজ, সুন্নত ও নফলের মধ্যখানে কিছুটা বিরতি দেওয়া। যেন ফরজের সমান গুরুত্ব সুন্নত নফলে দেওয়া না হয়।

وَعَنْ ١١١٩ عَطَاءٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّىْ اَرْبَعًا وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهٖ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ

১১১৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর যখন মক্কাতে জুমার [ফরজ] নামাজ পড়া শেষ করতেন [নিজের স্থান হতে] তখন কিছুটা সামনে অগ্রসর হতেন এবং দুই রাকাত নামাজ পড়তেন। অতঃপর আরও কিছু আগে বাড়তেন এবং চার রাকাত নামাজ পড়তেন। আর যখন তিনি [নিজ স্থায়ী আবাস] মদীনায় থাকতেন, তখন তিনি জুমার [ফরজ] নামাজ পড়ে নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন

فِى الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَفِى رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ اَرْبَعًا)

করতেন। অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়তেন, মসজিদে তিনি নামাজ পড়তেন না। তাঁর নিকট এর কারণ জানতে চাওয়া হলে [তিনি সুন্নত মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়তেন কেন?] জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। -[আবূ দাউদ। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় এ শব্দগুলো রয়েছে যে, রাবী হযরত আতা (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে জুমার [ফরজের] পরে প্রথমে দু' রাকাত, তারপর চার রাকাত নামাজ পড়তে দেখেছি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার নামাজের পরে সুন্নত কত রাকাত : আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমার পরে সুন্নত ছয় রাকাত। প্রথমে দুই ও পরে চার রাকাত। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর এক বর্ণনায় আছে, জুমার পর সুন্নত ছয় রাকাত। এ বর্ণনা অনুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, জুমা'র পরে সুন্নত ছয় রাকাত, তবে অন্যান্য হাদীসে দেখা যায় যে, হুজূর ﷺ প্রথমে চার রাকাত ও পরে দু' রাকাত পড়তেন। আমরা হানাফীরা এভাবে আমল করে থাকি। বস্তুত এটাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা অন্য হাদীসে আছে, ফরজের পরে অদ্রূপ রাকাত বিশিষ্ট নামাজ নেই, সুতরাং জুমার ফরজ দু' রাকাত শেষ করে সুন্নত চার রাকাতই আগে পড়তে হবে। অন্যথা 'ফরজ ও সুন্নত' একই রকম হয়ে যাবে। অথচ এরূপ হওয়া মাকরূহ। উল্লেখ্য যে, জুমার পরের সুন্নতসমূহ ঘরে পড়াই উত্তম।

بَابُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ
পরিচ্ছেদ : রাতের নামাজ

صَلٰوةُ اللَّيْلِ দ্বারা তাহাজ্জুদ ও বিতরের নামাজ বুঝানো হয়, তবে এখানে সালাতুল লাইল বলতে তাহাজ্জুদের নামাজ উদ্দেশ্য। কেননা রাতের শেষভাগে নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে এ নামাজ পড়া হয়।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল। মহানবী ﷺ এ নামাজ সর্বদাই পড়তেন, কিন্তু উম্মতের উপর কষ্টকর হবে বিধায় পরবর্তীতে এর ফরযিয়্যাত রহিত করা হয়। তথাপি এর গুরুত্ব ও ফজিলত আদৌ কমেনি। যেমন– আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ অর্থাৎ, আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ুন! এটা হবে আপনার জন্য অতিরিক্ত। যারা সর্বদা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ـ وَبِالْاَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُوْنَ অর্থাৎ, তারা রাতে খুব কমই ঘুমাতো এবং তারা রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। অপর আয়াতে এসেছে যে, تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তথা খোদাভীরুদের পার্শ্বদেশ বিছানা হতে পৃথক থাকে।

এ ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهٗ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ فَيَخْرُجُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১২০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এশার নামাজ সম্পন্ন করার পর হতে ফজর নামাজ পড়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন। প্রত্যেক দু' রাকাতের পরে সালাম ফিরাতেন। [এর মধ্যে কোনো এক নামাজের সাথে] এক রাকাত মিলিয়ে তাকে বেজোড় [বা বিত্র] করতেন। ঐ নামাজের সিজদা তিনি এ পরিমাণ দীর্ঘ করতেন, যাতে তোমাদের যে কেউ তাঁর মাথা তোলার পূর্বে পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে। যখন মুয়াজ্জিন ফজরের আযান শেষ করে থামতেন উষার আলো উদ্ভাসিত হতো তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়তেন। অতঃপর তিনি ডান পাঁজরের উপর কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম করতেন যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন নামাজের একামত বলার অনুমতি গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে আসতো। অতঃপর তিনি ফরজ পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যেতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ عَدَدِ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ اللَّيْلِ **তাহাজ্জুদ নামাজের রাকাতের সংখ্যা সম্পর্কে মতপার্থক্য** : তাহাজ্জুদ নামাজ মোট কত রাকাত অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কয় রাকাত পড়েছেন এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত সা'দ ইবনে হিশাম

বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাকাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছেন। হযরত উরওয়া বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল ﷺ এগারো রাকাত পড়েছেন। এর মধ্যে বিত্‌রের নামাজও ছিল। অপর এক বর্ণনায় তেরো রাকাতের উল্লেখ রয়েছে যার মধ্যে ফজরের দু' রাকাত সুন্নতও অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায়ও তেরো রাকাতের উল্লেখ রয়েছে। উপরোক্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত সম্পর্কে কাজী ইয়ায (র.) বলেন, এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো, রেওয়ায়েতের এ বিভিন্নতা হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ হতে হয়েছে নতুবা রাবীদের পক্ষ হতে। এ ছাড়া এর সামঞ্জস্য বিধানে বহু উত্তর দেওয়া হয়েছে। স্বল্প পরিসরের কারণে তা সন্নিবেশিত করা গেল না।

লম্বা সিজদা দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজের শেষে সেজ্‌দা এত দীর্ঘ করতেন, রাবী আয়েশা (রা.) বলেন যে, সে সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করা যেত। হাদীস বিশারদগণ বলেন, এর দ্বারা কোন সিজদা উদ্দেশ্য তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

শাফেয়ী মতাবলম্বী কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর দ্বারা সিজদায়ে শোকর উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ যে صَلٰوةُ اللَّيْلِ বা তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পেরেছেন এর শুকরানা স্বরূপ তিনি একটি দীর্ঘ সিজদা করতেন।

অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ তাহাজ্জুদের সকল সিজদা এতটুকু দীর্ঘ করতেন, যে সময়ের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করা যেতো।

অথবা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ বিতরের সিজদাসমূহের মধ্যে একটি সিজদা এত দীর্ঘ করতেন যে, এর মাঝে পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করা যেতো। (كَمَا فِي الْبَذْلِ)

ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ-এর বিশ্লেষণ : রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নতের পর ডান কাতে শুয়ে সামান্য বিশ্রাম নিতেন। এ বিশ্রামের হুকুম সম্পর্কে সামান্য মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে হাযম বলেছেন, ফজরের সুন্নতের পরে ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করা ওয়াজিব। তিনি দলিল হিসাবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন যে,

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

ইমাম মালিক, সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব ও সাঈদ ইবনে জুবাইর প্রমুখের মতে এভাবে শুয়ে বিশ্রাম করা মাকরূহ ও বিদ'আত। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ–

(١) قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رض) مَا بَالُ الرَّجُلِ اِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا يَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ اِذَا سَلَّمَ فَقَدْ فَصَلَ ـ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, মানুষের কি হলো যে, যখনই ফজরের দু' রাকাত সুন্নত পড়ে তারপরই জীবজন্তু ও গাধার মতো শুয়ে পড়ে? অথচ যখন সে সালাম ফিরায় তখনই দু' নামাজের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়ে যায়।

(٢) رَوَى ابْنُ الْاَثِيْرِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) رَاٰى رَجُلًا يُصَلِّىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ قَالَ الرَّجُلُ اِنَّهَا (اَىِ الضَّجْعَةَ) سُنَّةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) بَلْ بِدْعَةٌ ـ (كَمَا فِي الْفَتْحِ)

* কিন্তু ইমাম শফেয়ী ও তাঁর মতাবলম্বীগণ বলেন, এটা সুন্নত। সাহাবী ও তাবেয়ীদের একদল একে মোস্তাহাব বলেছেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশয়'আরী, রাফে ইবনে খাদীজ, আনাস ইবনে মালিক, আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ এবং তাবেয়ীদের মধ্যে ইবনে সীরীন, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও ওরওয়া ইবনে যুবাইর প্রমুখ রয়েছেন।

তিরমিযী শরীফের হাশিয়ায় আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, খানিকটা আরামের জন্য ও রাত জাগরণ জনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য ফজরের সুন্নতের পর কিছুটা শুয়ে বিশ্রাম করা উত্তম। রাসূল ﷺ-ও এ কারণেই এটা করতেন। তাঁরা উপরে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারাই দলিল গ্রহণ করেন। আর রাসূল ﷺ সব সময় এরূপ করতেন না, বরং মাঝে-মধ্যে করতেন।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ইবনে হাযমের জবাবে বলা যায় যে, আবূ দাউদ বর্ণিত হাদীসে যে সীগায়ে আমর বা আদেশসূচক শব্দ রয়েছে ইমামগণ বলেন, এ আদেশ দ্বারা উত্তমতা বুঝাবে। কারণ এর দ্বারা ওয়াজিব এ জন্য বুঝাবে না যে, রাসূল ﷺ নিজেও সব সময় এরূপ করতেন না।

ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমামগণ যারা এরূপ কাজকে মাকরূহ বা বিদ'আত মনে করেন, তাঁদের জবাবে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ইবনে মাসউদ ও ইবনে ওমর (রা.)-এর কথাকে দলিল হিসাবে পেশ করেছেন। সম্ভবত ফজরের সুন্নতের পরে শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর কাজ বা আদেশ সম্পর্কে কখনও তাদের জানা ছিল না। নতুবা সহীহ ও মারফূ' হাদীসের উপস্থিতিতে তাঁরা কেমন করে এটাকে বিদ'আত বলতে পারেন?

وَعَنْهَا ۱۱۲۱ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَإِلَّا اضْطَجَعَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ফজরের দু' রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন [আমার দিকে মনোযোগ দিতেন] আমি যদি সজাগ থাকতাম, তবে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, নতুবা তিনি [খানিকটা] শুয়ে বিশ্রাম করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ التَّكَلُّمِ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ **ফজরের সুন্নত নামাজের পর কথা বলার হুকুম.** : ফজরের সুন্নত নামাজের পর কথাবার্তা বলা বৈধ কি না? সে ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

আইনী ও ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে এসেছে যে, কাজী ইয়ায বলেন, কূফাবাসীদের মতে ফজরের সুন্নতের পর উত্তম কথা ব্যতীত অযথা কথা বলা মাকরূহ। কেননা সুন্নতের পর ফরজের পূর্ব পর্যন্ত সময়টুকু হলো দোয়া ও ইস্তিগফারের সময়। সাহাবীদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা.)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও জমহুর ওলামার মতে ফজরের সুন্নতের পর কথা বলা মুবাহ। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ হাদীসটি দলিল হিসাবে পেশ করেন।

وَعَنْهَا ۱۱۲۲ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১২২. অনুবাদ : উক্ত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ফজরের দু' রাকাত সুন্নত নামাজ পড়তেন, তখন ডান পাঁজরের উপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهَا ۱۱۲۳ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ রাতে তেরো রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে বিত্‌র ও ফজরের দু' রাকাত সুন্নতও থাকত।–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ডান পাঁজরের উপর শোয়ার তাৎপর্য : রাসূল ﷺ ফজরের সুন্নতের পরে ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন। এর কারণ বা হিকমত সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, মানুষের কলব বা আত্মা বক্ষের বাম পার্শ্বে থাকে। বাম কাতে শুইলে খুব বেশি ঘুম এসে পড়বে এবং আরাম পূর্ণ হবে বটে, তবে ফজরের ফরজ কাজা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর ডান পার্শ্বের উপর শুইলে

কলব ঝুলন্ত থাকে। এতে গভীর নিদ্রা আসার সম্ভাবনা থাকে না এবং ফরজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে না। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

অথবা রাসূল ﷺ সর্বদা اَلتَّيَامُنُ বা ডানকে পছন্দ করতেন বিধায় তিনি ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। অবশ্য কেউ যদি ওজরের কারণে ডান পার্শ্বের উপর শুইতে সক্ষম না হয়, তা হলে সে বাম পার্শ্বের উপরই শুইবে। এতে ক্ষতির কিছুই নেই। –[আইনী, ফতহুল মুলহিম]

وَعَنْ ١١٢٤ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১২৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মাস্‌রূক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত্রিকালীন নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ফজরের দু' রাকাত ব্যতীত তা সাত, নয় ও এগারো রাকাত ছিল। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : নবী করীম ﷺ রাতের বেলায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণে নামাজ পড়তেন এটা তাঁর সময় ও স্বভাবগত রুচির উপর নির্ভর করতো। তবে বিতরসহ তেরো রাকাতের বেশি পড়েছেন কি না? তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এখানে বিতরসহ সাত, নয়, এগারো রাকাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

وَعَنْ ١١٢٥ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ اِفْتَتَحَ صَلٰوتَهٗ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ যখন রাতে নামাজ পড়তে উঠতেন তখন দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা তা শুরু করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ **-এর বিশ্লেষণ** : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলায় যখন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠতেন তখন তিনি প্রথমে দু' রাকাত নামাজ আদায় করতেন এবং তা খুব সংক্ষেপ করতেন। ওলামায়ে কেরাম এ দু' রাকাত নামাজকে তাহিয়্যাতুল অজু হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মূলত এটা তাহাজ্জুদের মধ্যেই শামিল, যা তাহিয়্যাতুল অজুর স্থলাভিষিক্ত। কেননা অজুর জন্য ভিন্ন কোনো নামাজ নেই। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ দু' রাকাত নামাজকে সংক্ষিপ্ত করার তাৎপর্য হলো, এর মাধ্যমে প্রথমে নামাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আর প্রথমে আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেলে পরে নামাজকে দীর্ঘায়িত করতে সমস্যা হয় না। –[মিরকাত]

وَعَنْ ١١٢٦ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلٰوةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন– যখন তোমাদের কেউ রাতে নামাজ পড়তে উঠে তখন সে যেন দু' রাকাত সংক্ষিপ্ত নামাজ দ্বারা শুরু করে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١١٢٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ......" حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الْقِرْبَةِ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوْئَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ فَقَامَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ وَتَوَضَّأْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِاُذُنِي فَاَدَارَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلٰوتُهُ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ فَاٰذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا وَفِي بَصَرِي نُوْرًا وَفِي سَمْعِي نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا وَعَنْ يَسَارِي نُوْرًا

১১২৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার আমার খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনার ঘরে রাত যাপন করলাম। আর নবী করীম ﷺ তাঁর [মায়মূনার] ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সাথে অর্থাৎ মায়মূনার সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়লেন যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকল অথবা এর কিছু কম রাত বাকি থাকল, তখন রাসূল ﷺ উঠে বসলেন, অতঃপর আকাশের দিকে তাকিয়ে এ আয়াত পাঠ করলেন– إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ....অর্থাৎ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে, এমনকি তিনি পড়তে পড়তে সূরা [আলে ইমরান] শেষ করে ফেললেন। অতঃপর পানির মশকের উদ্দেশ্যে গেলেন এবং এর মুখের ঢাকনা খুললেন, অতঃপর পিয়ালায় পানি ঢেলে উত্তমরূপে অজু করলেন, পানি কম বা বেশি ব্যয় করলেন না [অর্থাৎ পানি স্বাভাবিক ব্যয় করলেন] কিন্তু অজুর অঙ্গসমূহে ঠিকমতো পানি পৌঁছালেন। অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়তে লাগলেন। এটা দেখে আমিও উঠলাম এবং অজু করে তাঁর বাম পার্শ্বে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ আমার কানে ধরলেন এবং বাম দিক হতে ডান দিকে নিয়ে গেলেন। তারপর রাসূল ﷺ তাঁর তেরো রাকাত নামাজ পড়া সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি [ডান কাতে] শুয়ে আরাম করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি তাঁর নাক ডাকতে লাগল। রাসূল ﷺ যখনই ঘুমাতেন, তাঁর নাক ডাকত। অতঃপর বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাজের সংবাদ দিল। তখন রাসূল ﷺ উঠে নামাজ পড়ালেন কিন্তু [নতুন করে] অজু করলেন না। তিনি [সুন্নত ফরজসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে] যে দোয়া পাঠ করতেন তা ছিল নিম্নরূপ, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا .... অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে আলো দান কর, আমার চোখে আলো দাও, আমার কানে আলো দাও, আমার ডান দিকে, আমার বাম দিকে, আমার উপরে,

وَفَوْقِي نُوْرًا وَتَحْتِي نُوْرًا وَأَمَامِي نُوْرًا وَخَلْفِي نُوْرًا وَاجْعَلْ لِي نُوْرًا وَ زَادَ بَعْضُهُمْ وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَذَكَرَ وَعَصَبِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَشَعْرِيْ وَبَشَرِيْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَأَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَفِيْ أُخْرٰى لِمُسْلِمٍ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا)

আমার নিচে, আমার সম্মুখে ও আমার পিছনে আলো দান কর এবং আমার জন্য আলো সৃষ্টি কর।' কোনো কোনো রাবী এ দোয়াতে এবাক্যও বর্ধিত করেছেন, وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا অর্থাৎ আমার রসনায় নূর দান কর। আবার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন ... وَعَصَبِيْ وَلَحْمِيْ অর্থাৎ আমার ধমনীতে, আমার মাংসে, আমার রক্তে, আমার পশমে ও আমার চর্মে [নূর তৈরি করে দাও]।-[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রাণে নূর সৃষ্টি কর এবং আমার জন্য নূরকে মহান কর। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ-এর বিশ্লেষণ : আলোচ্য হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ঘুম হতে জেগে অজু না করে নামাজ পড়েছেন। বাহ্যত ব্যাপারটা কেমন মনে হলেও মূলত কথা হলো, নিদ্রার কারণে অজু ভঙ্গ না হওয়া নবী করীম ﷺ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ অর্থাৎ আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত এই দোয়াটিকে দোয়ায়ে তবীল বা দীর্ঘ দোয়া বলা হয়। এ দোয়ার দ্বারা যে কেউই দোয়া করেছে সে-ই অন্তরে নূর লাভ করেছে। অবশ্য আলোচ্য দোয়ায় বর্ণিত নূর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? সে ব্যাপারে কিছু মতামত পাওয়া যায়-

※ আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, হাদীসে যে নূরের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে সম্ভবত এর দ্বারা প্রকাশ্য নূর বা আলোই উদ্দেশ্য। আর এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট এই নিবেদন জানানো হয়েছে যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন নূরে নূরান্বিত হোক যা দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহ অন্ধকারে আলো পাওয়া যায়।

※ আল্লামা কুরতুবী (র.) পরিশেষে বলেন, এখানে নূর দ্বারা রূপকভাবে ইলম ও হিদায়েতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ অর্থাৎ 'আর আমি তাকে এমন এক নূর (ঈমান) দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে।' তা'লীক প্রণেতা বলেন, নূর দ্বারা উপরে বর্ণিত উভয় প্রকার নূর উদ্দেশ্য হতে পারে।

※ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে নূর বা আলোর প্রার্থনা করার অর্থ হলো, যেন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্য ও মারেফাতের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে মূর্খতা ও গোমরাহীর অন্ধকার হতে মুক্ত থাকা যায়। -[মিরকাত]

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ :

عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ বাক্যাংশে مَيْمُوْنَةَ শব্দটি خَالَتِيْ হতে বদল। ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ-এর رَاء টি পেশ বিশিষ্ট। اَلْاٰخِرُ ثُلُثُ-এর সিফাত, অর্থাৎ الثُّلُثُ الْاٰخِرُ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ بَعْضَ الثُّلُثِ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ الخ আর اِسْم اِنَّ বাক্যাংশ لَاٰيَاتٍ لِاُولِي الْاَلْبَابِ খবর।

وَعَنْ ١١٢٨ - أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১২৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ঘুমালেন। [তিনি দেখলেন,] রাসূল ﷺ ঘুম হতে জাগলেন এবং মেসওয়াক ও অজু করলেন। আর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন- إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এমনকি সূরাটি শেষ করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়লেন। এই দু' রাকাতের মধ্যে কিয়াম, রুকু ও সেজদা খুব দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন, যাতে মোট ছয় রাকাত হলো। প্রত্যেক বারই তিনি মেসওয়াক করেন, অজু করেন এবং সে আয়াতগুলো পাঠ করেন। অতঃপর তিনি তিন রাকাত নামাজের মাধ্যমে বিতর নামাজ সম্পন্ন করেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١١٢٩ - زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللَّيْلَةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ هٰكَذَا فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَاَفْرَادِهِ مِنْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَمُوَطَّأِ مَالِكٍ وَسُنَنِ اَبِيْ دَاوُدَ وَجَامِعِ الْاُصُوْلِ)

১১২৯. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আজ রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখব। তিনি [প্রথমে] সংক্ষিপ্ত দু' রাকাত নামাজ পড়লেন। অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়লেন- লম্বা করে। দীর্ঘায়িত হতেও দীর্ঘায়িত। তারপর আরও দু' রাকাত পড়লেন পূর্বের দু' রাকাতের চেয়ে কিছুটা সংক্ষিপ্ত। অতঃপর আরও দু' রাকাত পড়লেন, এ দু' রাকাত ছিল ইতঃপূর্বের দু' রাকাতের চেয়েও সংক্ষিপ্ত। অতঃপর আরও দু' রাকাত পড়লেন এটা ছিল ইতঃপূর্বের দু' রাকাতের চেয়ে আরও সংক্ষিপ্ত। অতঃপর বিতর নামাজ পড়লেন। এই নিয়ে মোট তেরো রাকাত হলো। -[মুসলিম]

মুসলিম তাঁর বর্ণনায় "অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়লেন- যা ছিল ইতঃপূর্বের পড়া দু' রাকাতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত" কথাটি মোট চারবার বর্ণনা করেছেন। এভাবেই মুসলিম শরীফে, হুমাইদীর কিতাবে উল্লেখিত ইমাম মুসলিমের এককভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে, মুয়াত্তায়ে মালেকে, সুনানে আবূ দাউদে ও জামেউল উসূল গ্রন্থে এরূপ চারবারের উল্লেখ রয়েছে। [যাতে নামাজ মোট পনেরো রাকাত হয়]।

وَعَنْ ١١٣٠ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَقُلَ كَانَ اَكْثَرُ صَلٰوتِهٖ جَالِسًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়স বার্ধক্যে পৌছল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর অধিকাংশ নফল নামাজ বসেই পড়তেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** بَدَّنَ শব্দটি دال -এর উপর তাশদীদযুক্ত যবর অথবা শুধু যবর দ্বারা পড়া যায়। তাশদীদ যোগে হলে অর্থ হবে বয়স বেশি হওয়া ও বয়স বৃদ্ধির কারণে শরীর ভারী হওয়া, আর শুধু যবর যোগে হলে অর্থ হবে শরীরে গোশত বেশি হওয়া। এখানে প্রথমটিই হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা শরীরে গোশত জনিত কারণে রাসূল ﷺ -এর শরীর ভারী হয়নি।

وَعَنْ ١١٣١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنْ اَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَالِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ اٰخِرُهُنَّ حٰمٓ الدُّخَانِ وَعَمَّ يَتَسَاۤءَلُوْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআন মজীদের ঐ সূরাগুলো সম্বন্ধে অবগত, যেগুলো একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐগুলোকে একসঙ্গে [তাহাজ্জুদে] পাঠ করতেন। পরবর্তী রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নিজের সংকলিত কুরআন হতে মুফাসসাল সূরাসমূহের প্রথম হতে শুরু করে বিশটি সূরার কথা বর্ণনা করেন, যাদের দু'টি করে রাসূল ﷺ একসঙ্গে প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করতেন সেই বিশটি সূরার শেষ দু' সূরা হলো 'হা-মীম আদ-দুখান' ও 'আম্মা ইয়াতাসায়ালূন' সূরাদ্বয়। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ سُوْرَةِ الْمُفَصَّلِ **মুফাস্‌সাল সূরার বর্ণনা :** সূরায়ে হুজরাত হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত সকল সূরাকে 'মুফাস্‌সাল সূরা' বলা হয়। আবার এই মুফাস্‌সাল সূরাসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন (এক) সূরায়ে 'হুজুরাত' হতে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত طِوَال مُفَصَّلْ 'তেওয়ালে মুফাস্‌সাল'। (দুই) 'বুরূজ' হতে সূরা 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত اَوْسَط مُفَصَّلْ 'আওসাতে মুফাস্‌সাল'। (তিন) 'লাম-ইয়াকুন' হতে সূরা 'নাস' পর্যন্ত قِصَار مُفَصَّلْ 'কিসারে-মুফাস্‌সাল'।

تَرْتِيْبُ الْاٰيَاتِ وَالسُّوَرِ فِي الْقُرْاٰنِ **কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাসক্রম :** কুরআন মাজীদের আয়াত ও সূরাসমূহের তারতীব বা বিন্যাসক্রম ওহির দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়েছে। কুরআনের যে আয়াত যখন নাজিল হয়েছে তখনই হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) তা কোন্ সূরার কোন্ আয়াতের আগে বা পরে বসবে তা বলে দিয়েছেন। তদনুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নির্ধারিত ওহী লেখক বা লিপিকারদেরকে বলে দিয়েছেন। তারা একে সেভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। সকল উম্মতে মুহাম্মদী এ ব্যাপারে একমত যে, সে বিন্যাসক্রম অনুসারেই এখনও কুরআন পাক আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে ও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্। একে তারতীবে উসমানী বলা হয়।

اَلنَّظَائِرُ الْمَنْقُوْلَةُ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ **ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত সামঞ্জস্যশীল সূরাসমূহ :** হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সংকলিত হাদীসে সাদৃশ্যপূর্ণ যে বিশটি সূরার কথা বলা হয়েছে, যা এক রাকাতে দুই দুই সূরা করে পড়া হতো তা হলো (১-২) 'আর-রাহমান' ও 'আন-নজম' (৩-৪) 'ইকতিরাব' ও 'আল-হাক্কাহ' (৫-৬) 'আত-তূর' ও 'আয-যারিয়াত' (৭-৮) 'ইযা ওয়াকা'আত' ও 'নূন' (৯-১০) 'সাআলা সায়েলুন' ও 'নাযি'আত' (১১-১২) 'মুতাফ্‌ফেফীন' ও 'আবাসা' (১৩-১২) 'মুদ্দাসসির' ও 'মুয্‌যাম্মিল' (১৫-১৬) 'হাল আতা' ও 'লা-উকসিমু বি ইয়াওমিল কিয়ামাহ' (১৭-১৮) সূরা 'নাবা' ও 'মুরসলাত' (১৯-২০) সূরা 'তাকবীর' ও 'দুখান'।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٣٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلٰثًا ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّنْ رُكُوْعِهِ يَقُوْلُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهِ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الْاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১৩২. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম ﷺ-কে রাতে নামাজ পড়তে দেখলেন। তিনি তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, অতঃপর বলতেন "যুল মালাকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল আযমাতি" অর্থাৎ "সার্বভৌমত্বের মালিক, প্রতাপের অধিকারী, মহামহিম ও সম্মানের অধিকারী"। অতঃপর [তাকবীরে তাহরীমা বলে ও সুবহানাকা ইত্যাদি প্রারম্ভিক দোয়া পাঠ করে] নামাজ শুরু করতেন এবং সূরা বাকারা পাঠ করতেন। অতঃপর রুকু করতেন, তাঁর রুকু তাঁর কেয়ামের মতো [দীর্ঘ] হতো। তিনি রুকুতে সুবহানা রাব্বিয়াল 'আযীম বলতেন। অতঃপর রুকু হতে মাথা উঠাতেন [এবং দাঁড়াতেন]। তার এক কেয়াম [দৈর্ঘ্যে] রুকুর সমান হতো। এ সময় বলতেন, 'লিরাব্বিয়াল হামদু' অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন তাঁর এই সেজদা তার কিয়ামের সমপরিমাণ [দীর্ঘ] ছিল। তিনি সেজদায় বলতেন– সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা অর্থাৎ "আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের"। অতঃপর তিনি সিজদা হতে মাথা তুলতেন। তিনি উভয় সিজদার মাঝখানে তাঁর এক সিজদার সমপরিমাণ সময় বসতেন এবং বলতে থাকতেন, 'রাব্বিগফিরলী', 'রাব্বিগফিরলী'। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। হে প্রভু! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এভাবে তিনি চার রাকাত নামাজ পড়তেন। এ রাকাত গুলোতে তিনি যথাক্রমে সূরা বাকারাহ্, আলে-ইমরান, আন-নিসা ও মায়েদা অথবা আল-আন্'আম পাঠ করলেন শো'বা সন্দেহ পোষণ করেছেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** 'রুকুর' মধ্যে 'কেয়ামের' সমপরিমাণ সময় অপেক্ষা করে দীর্ঘায়িত করার অর্থ হলো, স্বাভাবিক নিয়মে যেভাবে রুকু সিজদা ইত্যাদিতে সময় ব্যয় করতেন, সেই রাতের নামাজে হুজুর ﷺ -এর চেয়ে দীর্ঘ করেছেন। এভাবে নামাজের প্রত্যেক অঙ্গকে দীর্ঘায়িত করেছেন। অন্যথা কেয়াম, রুকু, সেজদা ইত্যাদিতে সমপরিমাণ লম্বা করা চন্দ্র সূর্য গ্রহণের নামাজের মধ্যে করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ আছে। মোটকথা, হুজুর ﷺ মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদের নামাজেও যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন তা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

وَعَنْ ١١٣٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে নামাজে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে গাফেলীন বা অলসদের মধ্যে গণ্য করা হবে না, আর যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে একশত আয়াত পাঠ করে তাকে [আল্লাহর প্রতি] অনুগতদের মধ্যে গণ্য করা হয় এবং যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত পাঠ করে তাকে পুণ্যের দিক দিয়ে সফল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। – [আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ **-এর মর্মার্থ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাতে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে غافلين অর্থাৎ অলস ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। এখানে مَنْ قَامَ -এর অর্থ হতে পার– যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে দশটি আয়াত পাঠ করে অথবা নামাজ ছাড়াই তা পাঠ করে, এ দশ আয়াত দু' রাকাত অথবা ততোধিক রাকাতে পাঠ করে। উক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই দশ আয়াত সূরা ফাতিহা ব্যতীত হতে হবে। অবশ্য সুস্পষ্ট কথা হলো, এটা দ্বারা নামাজের সর্বনিম্ন মরতবা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য, যা সূরা ফাতিহার সাত আয়াত এবং বাকি অন্য তিন আয়াতের দ্বারাই আদায় হয়ে যায়।

كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ**-এর মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে একশত আয়াত পাঠ করে তাকে আল্লাহর প্রতি অনুগতদের মধ্যে গণ্য করা হয়। اَلْقَانِتِيْنَ এটা اَلْقَانِتُ-এর বহুবচন, যা اَلْقُنُوْتُ হতে উদ্ভূত, اَلْقُنُوْتُ অর্থ– اَلطَّاعَةُ বা আনুগত্য। আলোচ্য হাদীসাংশের দু'টি অর্থ করা হয়েছে। প্রথমত كُتِبَ مِنَ الْمُوَاظِبِيْنَ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ চিরস্থায়ী অনুগতদের মধ্যে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত كُتِبَ مِنَ الْمُطَوِّلِيْنَ الْقِيَامَ فِى الْعِبَادَةِ অর্থাৎ ইবাদতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ কেয়ামকারীদের মধ্যে পরিগণিত করা হয়।

كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে আরো বলেন, যে ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত পাঠ করে তাকে পুণ্যের দিক দিয়ে সফল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ এ ব্যক্তি অধিক ছওয়াবের অধিকারী হয়। اَلْمُقَنْطِرِيْنَ শব্দটি اَلْمُقَنْطِرُ-এর বহুবচন যা اَلْقِنْطَارُ হতে নির্গত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, প্রচুর মাল-সম্পদকে قِنْطَارٌ বলা হয়। আবূ উবায়দা (রা.) বলেন, আরবরা 'কেনতার' - এর সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করেনি এবং এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণও বর্ণনা করেনি। অবশ্য কারো মতে চার হাজার দিনারকে 'কেনতার' বলা হয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, গরুর চামড়ার পরিপূর্ণ স্বর্ণকে 'কেনতার' বলা হয়।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজ্ঞাত পরিমাণ প্রচুর মালকে 'কেনতার' বলা হয়।

আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, 'কেনতার' হলো সত্তর হাজার দিনার।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বারো আওকিয়ায় হলো এক কেনতার। আর আওকিয়া হলো, আসমান ও জমিনের মধ্যে উত্তম বস্তু। [হাদীসটি ইব্নে হিব্বান বর্ণনা করেছেন।] হযরত মু'আয ইব্নে জাবাল (রা.)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক হাজার দু'শত আওকিয়ায় হলো এক কেনতার। আর আওকিয়া হলো আসমান ও জমিনের মধ্যে উত্তম বস্তু। এটা ব্যতীতও আরো অনেক অভিমত পাওয়া যায়।

وَعَنْ ١١٣٤ - أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর রাতের নামাজের কেরাআত ছিল, [ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ] কখনো উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন, আবার কখনো নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। -[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١١٣٥ - ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كَانَ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِى الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১৩৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর রাতের নামাজের কেরাতের স্বর এই পরিমাণ উঁচু ছিল যে, যখন তিনি ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তেন তখন বারান্দায় যারা থাকতেন তারা তাঁর আওয়াজ শুনতে পেতেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** তাহাজ্জুদ নামাজে রাসূলে কারীম ﷺ যখন যে পরিমাণ আওয়াজ উঁচু করার প্রয়োজন হতো তখন ঠিক সেই পরিমাণই উঁচু-নিচু করতেন। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত [১১৩৪ নং] হাদীসটিই মূল। অর্থাৎ হুজুর ﷺ কখনও স্বর কিছুটা উঁচু করতেন, আবার কখনোও নিচু করতেন।

وَعَنْ ١١٣٦ - أَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ يُخَفِّفُ مِنْ صَوْتِهٖ وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَهٗ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تُخَفِّفُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ

১১৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে ঘর হতে বের হলেন। যখন তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রা.) নামাজ পড়ছেন এবং খুব নিম্নস্বরে কেরাত পাঠ করছেন। তারপর তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট দিয়ে গমন করলেন [দেখলেন] তিনিও নামাজ পড়ছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করছেন। [রাবী আবূ কাতাদা] বলেন, যখন তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে একত্র হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [হযরত আবূ বকরকে লক্ষ্য করে] বললেন, হে আবূ বকর! আমি আপনার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, দেখলাম আপনি নামাজ পড়ছেন, আর নিম্নস্বরে কেরাত পাঠ করছেন [এর কারণ কি?]। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন তাঁকে শুনিয়েছি যাঁর সাথে আমি সংগোপনে কথা বলেছি [তিনি তো চুপে বললেও শুনেন, তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে বলার প্রয়োজন নেই]। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ওমর! আমি আপনার নিকট দিয়ে গমন করেছিলাম, [দেখলাম] আপনি নামাজ পড়ছেন আর উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করছেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [এভাবে] আমি অলস

صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اِخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ বকর! আপনার স্বরকে আপনি কিছুটা উঁচু করুন। হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনি আপনার স্বরকে কিছুটা নিচু করুন। –[আবূ দাউদ। তিরমিযীও এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ **-এর মর্মার্থ :** হযরত ওমর (রা.)-কে তাহাজ্জুদ নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আমি অলস ঘুমন্তদেরকে জাগ্রত করার এবং শয়তানকে বিতাড়িত করার জন্য এরূপ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা আওয়াজ কমানোর জন্য হযরত ওমর (রা.)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন। এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে, কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তির নিকট বসে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা বা কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা ঠিক নয়, তবে হযরত ওমর (রা.) কিভাবে এটা করলেন, এই প্রশ্নের বিভিন্ন রকম জবাব দেওয়া হয়েছে–

১. কেউ যদি অসুস্থতার কারণে নিদ্রা যায় তবে তার নিকট বসে উচ্চৈঃস্বরে জিকির করা বা কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েজ নেই। কিন্তু সুস্থ সবল ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।
২. অথবা হাদীসে উল্লিখিত وَسْنَان দ্বারা ঘুমে বিভোর নয় এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন নয়; বরং সামান্য তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেছে এমন ব্যক্তিকে জাগানো দূষণীয় নয়। হাদীসে এ ধরনের ব্যক্তির কথাই বলা হয়েছে।
৩. অথবা এমন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা উদ্দেশ্য, যিনি ইবাদতের সময় অসতর্কতাবশত নিদ্রায় বিভোর রয়েছেন অথচ তার জাগ্রত হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল।
৪. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, আমি কোনো কোনো শায়খের নিকট শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সর্বদা তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে সে যদি কোনো কারণবশত জাগ্রত না হতে পারে তবে তাকে জাগিয়ে দেওয়া দূষণীয় নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে না তাকে জাগানো সমীচীন নয়। তদানীন্তন সময় প্রায় সকল লোকই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। আর এ জন্যই সকল মানুষকে জাগানোর উদ্দেশ্যেই হযরত ওমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করতেন, যা আদৌ দূষণীয় ছিল না।

আর রজনীর শেষভাগে হযরত বেলাল আযান সম্পর্কে বুখারী শরীফে এসেছে যে, لِيُوْقِظَ نَائِمَكُمْ وَلْيَرْجِعْ قَائِمَكُمْ এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শেষ রজনীতে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করার আয়োজন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই করতেন। বস্তুত রাতের শেষভাগ ঘুমানোর সময় নয়; বরং তা হলো ইবাদতের সময়। সুতরাং এ আলোচনার দ্বারা হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মের সাথে শরিয়তের বিধানের কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ١١٣٧ اَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَصْبَحَ بِاٰيَةٍ وَالْاٰيَةُ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে দাঁড়ালেন এবং একটি মাত্র আয়াত [বারবার] পাঠ করতে করতে সকাল করে ফেললেন। আয়াতটি হলো– اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ...... [অর্থাৎ, হে আল্লাহ!] যদি তাদেরকে শাস্তি দাও [দিতে পার] তারা তোমারই বান্দা; আর যদি ক্ষমা করো [করতে পার] কেননা তুমি পরাক্রমশালী ও বিধানদাতা। –[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, নফল নামাজে ভাবে তন্ময়তার কারণে একই আয়াতকে বারবার পড়া জায়েজ আছে। হাদীসে উক্ত আয়াতের মূলকথাটি ছিল হযরত ঈসা (আ.)-এর। তিনি একথা বলে আল্লাহর নিকট তাঁর উম্মতদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এটাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে। সম্ভবত আমাদের নবী করীম ﷺ-ও এই আয়াত পাঠকালে নিজ উম্মতের কথা স্মরণ করে তন্ময়তায় একই আয়াত বারংবার পাঠ করেছেন।

وَعَنْ ١١٣٨ - أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

১১৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ফজরের সুন্নত দু' রাকাত নামাজ পড়ে, তখন সে যেন ডান কাতে শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে। -[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْاِسْتِرَاحَةِ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ **ফজরের সুন্নতের পর বিশ্রামের বিধান :** রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল। রাতে জাগ্রত থাকার দরুন যে ক্লান্তি অনুভব করতেন তা দূর করার জন্য তিনি ফজরের সুন্নতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। ইবনুল মালিক বলেন, তাহাজ্জুদে জাগ্রত ব্যক্তিদের জন্য এভাবে খানিকটা বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। কিন্তু ইবনে হায্ম ও জাহেরিয়াগণ বলেন, এভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করা ওয়াজিব। তবে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, তাহাজ্জুদ নামাজ মসজিদে বা লোক সম্মুখে পড়ার চেয়ে ঘরের মধ্যে চুপে চুপে আদায় করাই উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٣٩ - مَسْرُوْقٍ (رحـ) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) أَىُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلدَّائِمُ قُلْتُ فَأَىَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْمُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৩৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত মাসরূক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, যে কাজ সর্বদা করা হয়। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, রাতের ইবাদতের [তাহাজ্জুদের] জন্য তিনি কখন উঠতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগ ডাকার শব্দ শুনতেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, যে ইবাদত সর্বদা করা হয় তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিকতর পছন্দনীয়, যদিও তা পরিমাণে সামান্যই হয়। আর সাধারণত মোরগ মধ্য রাতের পরই ডাকতে থাকে। কিন্তু আমাদের ইমামদের অভিমত হলো সর্বস্থানের মোরগের ডাক একই সময় হয় না; বরং দেখা যায় যে, কোনো কোনো স্থানের মোরগ রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা আরো অনেক পরেই ডাকতে থাকে। কাজেই এখানে এ কথাই বুঝতে হবে যে সম্ভবত হুযূর ﷺ-এর সেই যুগে আরবের মোরগ মধ্য রাতের পরেই ডাকতো। আর হযরত আয়েশা (রা.) হুজুর ﷺ-এর রাত জাগরণের সময়টা মধ্য রাতের পরেই হতো বলে প্রশ্নকারীকে জানালেন।

وَعَنْ ١١٤٠ - أَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ - (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

১১৪০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই আমরা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজে রত দেখতে চাইতাম, তখনই তাঁকে নামাজে দেখতে পেতাম। আর যখনই আমরা তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতাম; তখন তাঁকে ঘুমন্তই দেখতে পেতাম। অর্থাৎ তিনি ঘুমাতেনও এবং রাত জেগে নামাজও পড়তেন। -[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত আনাস (রা.) রাসূল ﷺ-এর রাতের বেলার ইবাদতের ধরন উল্লেখ করে বলেন, যখনই আমরা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজে রত দেখতে ইচ্ছা করতাম, তখনই তাঁকে নামাজে দেখতে পেতাম। আর যখনই আমরা তাঁকে ঘুমন্ত দেখতে চাইতাম, তখনই তাঁকে ঘুমন্ত দেখতাম। হযরত আনাস (রা.)-এর এ কথার উদ্দেশ্য হলো, রাসূল ﷺ অত্যন্ত ইবাদত-গুজার হলেও তিনি কখনই সীমাতিরিক্ত করতেন না; বরং সর্বদা তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষভাগে জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়তেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ -এর নিদ্রা এবং নামাজ রাতের বিভিন্ন সময়ে হতো। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত ছিল না; বরং রাতের উপযোগী সময়ই রাসূল ﷺ উঠে নামাজ পড়তেন। –[মিরকাত]

وَعَنْ ١١٤١ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رح) قَالَ اِنَّ رَجُلًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ وَاَنَا فِيْ سَفَرٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَاَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِلصَّلٰوةِ حَتّٰى اَرٰى فِعْلَهٗ فَلَمَّا صَلّٰى صَلٰوةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الْعَتَمَةُ اِضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْاُفُقِ فَقَالَ "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا" حَتّٰى بَلَغَ اِلٰى "اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ" ثُمَّ اَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ اَفْرَغَ فِيْ قَدَحٍ مِنْ اِدَاوَةٍ عِنْدَهٗ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى حَتّٰى قُلْتُ قَدْ صَلّٰى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى قُلْتُ قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

১১৪১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্য হতে একজন বললেন, আমি [আমার বন্ধুদেরকে অথবা মনে মনে] বললাম, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম– আল্লাহর কসম! আজ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর [রাতের] নামাজ পর্যবেক্ষণ করব। [যাতে আমি তাঁর কার্যক্রম দেখতে পারি। [এবং সেই মতে আমল করতে পারি।] [দেখলাম,] তিনি যখন এশার নামাজ যাকে 'আতামা'ও বলা হয় পড়লেন, তখন তিনি রাতের একটা দীর্ঘ অংশ শুয়ে ঘুমালেন। অতঃপর সজাগ হলেন এবং দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কুরআনের এ আয়াত– "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا", অর্থাৎ "হে আমার প্রভু! তুমি এই সমস্ত বৃথা সৃষ্টি করোনি" – হতে اَنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ অর্থাৎ "নিশ্চয়, তুমি কোনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না" পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন বিছানার দিকে গেলেন এবং সেখান হতে মেসওয়াক বের করলেন। এরপর তাঁর কাছে থাকা একটি পাত্র হতে পেয়ালায় পানি ঢাললেন এবং মেসওয়াক করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়ালেন এবং নামাজ পড়লেন। এতে আমি মনে করলাম যে, তিনি যতটা সময় ঘুমিয়েছেন ততটুকু সময় ধরে নামাজ পড়েছেন। তারপর তিনি আবার শুয়ে ঘুমালেন এতক্ষণ সময় ঘুমালেন যে, আমি মনে করলাম, তিনি যত সময় ধরে নামাজ পড়েছেন সেই পরিমাণ সময়ই ঘুমিয়েছেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সজাগ হলেন এবং প্রথবার যেরূপ করেছিলেন এবারও সেরূপই করলেন এবং প্রথমবারে যা পাঠ করেছিলেন এবারও সেরূপ আয়াত পাঠ করলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পূর্বে তিনবার করলেন। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অব্যাহতভাবে রাতে নামাজ পড়তেন না; বরং কিছুক্ষণ নামাজ পড়তেন, আবার কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নিতেন। এ ভাবেই তিনি রাত শেষ করে দিতেন।

١١٤٢ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ (رحـ) اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلٰوتِهِ فَقَالَتْ وَمَالَكُمْ وَصَلٰوتَهُ كَانَ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدْرَمَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَمَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

১১৪২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি মহানবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নামাজের কেরাত ও নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা তাঁর নামাজ দিয়ে কি করবে? [অর্থাৎ তোমরা কি তাঁর ন্যায় আমল করতে পারবে?] তিনি রাতে নামাজ পড়তেন, তারপর ঘুমাতেন। যতক্ষণ ঘুমাতেন সেই পরিমাণ সময় নামাজ পড়তেন। আবার পুনরায় ঘুমাতেন এবং যতক্ষণ পরিমাণ ঘুমাতেন ততক্ষণ সময় পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। আবার পুনরায় ঘুমাতেন এবং যতক্ষণ পরিমাণ ঘুমাতেন ততক্ষণ সময় পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। এভাবে সুব্হে সাদেক হয়ে যেত। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে নামাজ পড়া ও ঘুমানো রাতভর চলতে থাকতো। অতঃপর রাবী ইয়া'লা বলেন, হযরত উম্মে সালামা (রা.) কেরাতের বর্ণনা দিলেন। দেখলাম, তিনি পৃথক পৃথক এক-এক অক্ষর করে হুযূরের পড়ার বর্ণনা দিলেন।-[আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ [বাক্যসমূহের বিশ্লেষণ] : زَوْجَ পদটি بَدَلْ অথবা আতফে বয়ান اُمَّ سَلَمَةَ হতে। مَالَكُمْ وَصَلَاتَهُ বাক্যে مَعْطُوْف عَلَيْه উহ্য, অর্থাৎ مَا لَكُمْ وَقِرَاءَتَهُ وَمَا لَكُمْ وَصَلٰوتَهُ আর وَاوْ টি مَعَ-এর অর্থে। অর্থাৎ مَاتَصْنَعُوْنَ مَعَ قِرَاءَتِهٖ وَمَعَ صَلٰوتِهٖ প্রশ্নটি আক্ষেপমূলক, ইনকার বা অসম্মতিসূলক নয়। অথবা اِسْتِفْهَامْ টি تَعَجُّبْ স্বরূপ : অর্থাৎ اَىُّ شَىْءٍ يَحْصُلُ لَكُمْ مَعَ وَصْفِ قِرَاءَتِهٖ وَصَلٰوتِهٖ وَاَنْتُمْ لَا تَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ تَفْعَلُوْا مِثْلَهُ এ জাতীয় تَعَجُّبْ হযরত আয়েশা (রা.)-ও ব্যক্ত করে বলেছেন اَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُهُ

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : নবী করীম ﷺ রাতে উঠলে যে দোয়া পাঠ করতেন

হুজুর ﷺ-এর জন্য তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ ছিল, তাই তিনি সর্বদা এ নামাজ আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য যখনই রাসূল ﷺ জাগ্রত হতেন তখনই নামাজের ভিতরে ও বাইরে রাসূলে কারীম ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১١٤٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৪৩. অনুবাদ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে উঠতেন তখন এই দোয়া পাঠ করতেন– اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ..... [অর্থ] "হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই। তুমি আসমানসমূহ ও জমিন এবং তাদের মধ্যখানে যা কিছু আছে তার প্রতিষ্ঠাকারী ও রক্ষাকারী। তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমিই আসমানসমূহ ও জমিন এবং সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, তার নূর বা আলো। তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তুমি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার একমাত্র সার্বভৌম মালিক এবং যাবতীয় প্রশংসা তোমার জন্য। তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য, তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে তাও সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, [আমি] মুহাম্মদও সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই উপর নির্ভর করলাম, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, তোমারই সাহায্যে [শত্রুর সাথে] লড়াই করি, আর তোমারই কাছে ফয়সালা প্রার্থনা করি। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর, যে সমস্ত পাপ আমি আগে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা সম্পর্কে তুমি আমার থেকে বেশি জান। তুমি কাউকে অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী করো, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الخ-এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ গভীর রজনীতে তাহাজ্জুদ নামাজান্তে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করতেন যে, হে আল্লাহ! তুমিই তো আসমানসমূহ ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যখানে যা কিছু আছে তার প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকারী। اَلْقَيِّمُ অর্থ– اَلْقَائِمُ অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকুলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, চিন্তা-চেতনা এবং সর্বাবস্থায় সমগ্র জাহান পরিচালনা করতে সক্ষম তাকেই কায়্যিম বলা হয়। আর এ গুণের অধিকারী মহাপরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহই।

اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহ আসমান জমিনের নূর বা আলো। কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন– পবিত্র কুরআনে এসেছে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের নূর। বস্তুত আল্লাহর মৌলিক সত্তাই নূর বা আলো। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) اَنَّهُ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ

অর্থাৎ একদা হযরত আবূ যার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করেছিলেন যে, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ নূর। আমি তাঁকে দেখেছি অথবা কি করে আমি তাঁকে দেখব। তবে 'নূর' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

※ হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত نُوْرٌ অর্থ مُنَوِّرٌ বা আলো প্রদানকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের আলো প্রদান করেছেন এবং এর মধ্যে যারা আছে তারা সেই আলো দ্বারাই পথের নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

※ আবার কারো মতে اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-এর অর্থ হলো اَنْتَ الْمُنَزَّهُ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ অর্থাৎ আপনি (আল্লাহ) দোষক্রটি হতে পূত-পবিত্র। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ مُنَوَّرٌ এর অর্থ مُبَرَّأٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি দোষ হতে মুক্ত।

※ কারো মতে হাদীসে বর্ণিত 'নূর' অর্থ مُوْجِدٌ বা প্রতিষ্ঠাতা। যেমন বলা হয় اَللّٰهُ مُوْجِدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিষ্ঠাতা। মানতেকীদের পরিভাষায় এটা 'মাজাযে মুরসাল' হিসাবে হয়েছে।

※ রূহুল মা'আনীতে نُوْرٌ-এর তাফসীর করা হয়েছে اَلظَّاهِرُ بِذَاتِهٖ مُظْهِرٌ لِغَيْرِهٖ অর্থাৎ, যিনি সত্তাগতভাবে বিকাশমান ও অন্যের বিকাশকারী। এটা কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই আল্লাহর জন্য বলা যেতে পারে। দার্শনিক আল্লামা ইমাম গাযালী (র.)-ও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

※ আল্লামা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রা.) 'ফাওয়ায়েদে কুরআনে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ এ আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে نُوْرٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহর অন্যান্য সিফাত বা গুণাবলির বাস্তব আকৃতির যেমন ধারণা করা বৈধ নয় তদ্রূপভাবে 'নূর' বা আলোরও অনুরূপ আকৃতির কল্পনা করা বিশুদ্ধ নয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ এ কথার মধ্যেই সকল নবী-রাসূলগণের উল্লেখ এসেছে, তদুপরি ভিন্নভাবে وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ -এর পুনরাবৃত্তি কেন করা হলো, এর সমাধান কল্পে আল্লামা মীরাক বলেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে বিশেষভাবে উল্লেখপূর্বক وَالنَّبِيُّوْنَ-এর উপর আতফ করে এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সকল নবী-রাসূলদের চেয়ে ভিন্ন ধরনের। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন বিশেষ গুণাবলিতে সকল নবী-রাসূলের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। গুণের প্রাধান্য মূলত সত্তার প্রাধান্যেরই নামান্তর। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

١١٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اِفْتَتَحَ صَلٰوتَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

১১৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন রাতে নামাজ পড়তে উঠতেন তখন নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে নামাজ শুরু করতেন– اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ .... অর্থ–"হে আল্লাহ! জিব্রাঈল, মীকাঈল

وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ও ইসরাফীলের প্রতিপালক! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়সমূহের পরিজ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করবে; যে বিষয় নিয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করছে। তুমিই আমাকে তোমার অনুগ্রহে সঠিক পথ দেখাও। যা নিয়ে মতভেদ করা হচ্ছে। নিশ্চয় যাকে ইচ্ছা তুমিই সোজা পথ প্রদর্শন কর"। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّرْتِيْبِ بَيْنَهُمْ **তিন ফেরেশতার উল্লেখের কারণ ও তাদের মাঝে তারতীব :** আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুর রব ও প্রতিপালক, এতে কারো দ্বিমত নেই। তবু আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 'তিন ফেরেশ্তার প্রভু' বলার কারণ হলো, এ তিনজনের মর্যাদা সমস্ত ফেরেশ্তাকুলের উপরে। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) হলেন আসমানের সমস্ত কিতাবসমূহের আমীন বা তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং দীনের যাবতীয় কার্যসমূহ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে, তাই তার মর্যাদা সকলের উপরে। এ তিন জনের মধ্যে ইসরাফীল (আ.)-কে সর্বশেষ উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি লাওহে মাহফূযের তত্ত্বাবধায়ক, 'শিঙ্গা' তাঁর আয়ত্তে। ইহ ও পারলৌকিক সব কিছু রক্ষা বা ধ্বংস করা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। আর হযরত মীকাঈল (আ.) -এর মর্যাদা উভয়ের মধ্যখানে। কেননা তিনি বৃষ্টি বর্ষণ ও ফসলাদি জন্মানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের কার্যকলাপ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য যেই রিজিক ও খাদ্যসমূহের প্রয়োজন এর তত্ত্বাবধায়ক হলেন তিনি। অবশ্য এ মর্যাদা বিন্যাসের মধ্যেও মতভেদ আছে।

١١٤٥ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ اَوْ قَالَ ثُمَّ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ فَاِنْ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى قُبِلَتْ صَلٰوتُهٗ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১১৪৫. অনুবাদ : হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে সজাগ হয় এবং এ দোয়া পাঠ করে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ ..... অর্থ– আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁরই সার্বভৌমত্ব, তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমার কোনো শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই। বা অতঃপর বলে, رَبِّ اغْفِرْلِىْ। অর্থ– হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি আমায় ক্ষমা করো, অথবা [রাবীর সন্দেহ] তিনি বলেছেন, তারপর যে কোনো দোয়া করে, আল্লাহ তা'আলা তার সেই প্রার্থনা কবুল করেন এবং সে যদি অজু করে নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তার সেই নামাজ কবুল করেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ **বাক্যে** تَعَارَّ **শব্দের অর্থ :** হাদীসে উল্লিখিত مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ -এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হয়। تَعَارَّ শব্দের ر বর্ণটি তাশদীদযুক্ত। তার বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। কেউ বলেন, এর অর্থ اِنْتِبَاهٌ مِنَ النَّوْمِ অর্থাৎ নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া। আবার কারো মতে এর অর্থ تَقَلَّبَ فِىْ فِرَاشِهٖ অর্থাৎ বিছানায় উলট পালট খাওয়া। আল্লামা

ইবনুল মালিক বলেন, আওয়াজ সহকারে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়াকে تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ বলে। যেমন– বলা হয় تَعَارَّ الرَّجُلُ আর এটা তখনই বলা হয় যখন কোনো ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম হতে চিৎকার দিয়ে জাগ্রত হয়। অথবা تَعَارَّ শব্দটি عَرَارُ الظَّلِيْمِ হতে উৎকলিত। উটপাখির আওয়াজকে عَرَارُ الظَّلِيْمِ বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১১৪৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতের বেলায় ঘুম হতে জাগতেন, তখন বলতেন– لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ..... অর্থাৎ তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমারই প্রশংসা সহকারে। আমি তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার গুনাহের জন্য এবং তোমারই কাছে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। তুমি আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শনের পরে আমার অন্তরকে বক্র পথে পরিচালিত করো না এবং তোমার পক্ষ হতে আমাকে রহমত প্রদান করো। কেননা তুমিই সর্বাধিক দাতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ-এর বিশ্লেষণ : রাসূললুল্লাহ ﷺ মুনাজাতে বলতেন, হে আল্লাহ আমি আমার কৃত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ প্রার্থনার মধ্যে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, তা হলো রাসূল ﷺ তো জন্মলগ্ন হতেই মাসুম বা নিষ্পাপ, কোনো গুনাহ বা অপরাধ তাঁর ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি নিজের কৃত অপরাধের জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন—

প্রথমত হতে পারে, এটা তিনি উম্মতকে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে করেছেন। যেন তারা কৃত অপরাধের জন্য এভাবে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানায়।

দ্বিতীয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ হয়তোবা এই প্রার্থনা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যে করেছেন। অর্থাৎ তিনি যে সর্বশক্তিমান সকল ক্ষমতার উৎস, তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই— এটা বুঝানোর জন্যই রাসূল ﷺ উপরোক্ত প্রার্থনা করেছেন।

তৃতীয়ত প্রকৃতপক্ষে রাসূল ﷺ-এর কোনো অপরাধ ছিল না; বরং তিনি মাঝে মধ্যে উত্তম কর্ম পরিত্যাগ করতেন, এটা পূর্ণ আনুগত্যের পরিপন্থী ছিল বিধায় একেই ذَنْب বা অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

চতুর্থত রাসূল ﷺ নিজেকে খুব অনুগত বান্দা হিসাবে উপস্থাপনের জন্য এরূপ প্রার্থনা করতেন।

١١٤٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلٰى ذِكْرٍ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ)

১১৪৭. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান পাক-পবিত্র অবস্থায় [অর্থাৎ অজু সহকারে] আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে রাতে শয্যা গ্রহণ করে এবং রাতে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো ভালো জিনিস প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে সে জিনিস দান করেন। –[আহমদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পবিত্র হয়ে ঘুমানো সুন্নত, আর কেউ আল্লাহর জিকির করতে করতে ঘুমালে সেটি তার সারা রাত ব্যাপী বন্দেগি হিসাবে লিখিত হয়, অধিক রাতে জেগে উঠে আল্লাহর দরবারে কাতর মিনতি করে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

وَعَنْ ١١٤٨ شَرِيْقِ الْهَوْزَنِيِّ (رح) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ مَاسَأَلَنِيْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلُ كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللّٰهَ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ عَشْرًا وَقَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ عَشْرًا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَشْرًا وَهَلَّلَ اللّٰهَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ)

১১৪৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত শারীক হাওযানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে জাগতেন, তখন কি কাজের মাধ্যমে [ইবাদত-বন্দেগি] শুরু করতেন? হযরত আয়েশা (রা.) জবাবে বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, যা তোমার পূর্বে [আজ পর্যন্ত] আর কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। রাসূল ﷺ যখন রাতে ঘুম হতে জাগতেন -দশবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতেন, দশবার বলতেন, 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' [অর্থাৎ "আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে"], দশবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস" [অর্থাৎ "পবিত্র বাদশাহের পবিত্রতা ঘোষণা করছি"] বাক্য বলতেন, দশবার বলতেন– আস্‌তাগফিরুল্লাহ [অর্থাৎ "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি"] এবং দশবার বলতেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই"।] অতঃপর তিনি দশবার বলতেন–'আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন যাইকিদ্‌দুনইয়া ওয়া যাইকি ইয়াওমিল কিয়ামাহ' [অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা হতে"।] অতঃপর তিনি নামাজ [তাহাজ্জুদ] পড়তে আরম্ভ করতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا الخ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক রাতে জেগে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজের পূর্বে দশ-দশবার করে সাতটি দোয়া পড়তেন। এর সর্বশেষ দোয়াটিতে তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার সংকীর্ণতা হতে এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতা হতে। ضَيْقِ الدُّنْيَا বা পার্থিব জগতের সংকীর্ণতার অর্থ হলো, কষ্ট-মসিবত, দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথা-বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা প্রভৃতি। কেননা মানুষ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, অথবা কারো মাথায় ঋণের বোঝা চাপানো থাকে, অথবা কেউ যদি চরম নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও অত্যাচারের শিকার হয় তবে সে ব্যক্তির কাছে বাস্তবিক পক্ষেই দুনিয়া সংকীর্ণ বা সংকোচিত মনে হবে। মনে হবে এই স্বার্থপর পার্থিব জগতে তার কোনো সাহায্যকারী নেই; নেই কোনো আশ্রয়দানকারী অথবা সমবেদনা প্রকাশকারী। আর ضَيْقِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বা কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণতার অর্থ হলো, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা। দুনিয়ার অশান্তি আর পরকালের শাস্তি উভয়টিই মানুষের জন্য দুর্বিসহ যন্ত্রণা। এটা হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। মূলত এর দ্বারা তিনি উম্মতদেরকেই প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছেন।

وَعَنْ ١١٤٩٠ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ نَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ) وَ زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهٖ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلٰثًا وَفِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ ثُمَّ يَقْرَأُ .

১১৪৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে উঠতেন তখন প্রথমে আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর বলতেন, سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ .... অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে, তোমার নাম বরকতময়, সুউচ্চ তোমার মহত্ত্ব, তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই"। অতঃপর বলতেন, আল্লাহু আকবার কাবীরান [আল্লাহ অতি বড় মহান] তারপর বলতেন, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ, আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হতে; তার কু-পরামর্শ, তার অহমিকা প্রদান এবং তার অকল্যাণকর ফুঁক হতে। -[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। কিন্তু আবূ দাউদ, 'গাইরুকা' শব্দের পরে এ বাক্যটি বর্ধিত করেছেন, অতঃপর রাসূল ﷺ তিনবার বলতেন, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" এবং হাদীসের শেষ অংশ বর্ধিত করেছেন, অতঃপর রাসূল ﷺ কেরাত পাঠ শুরু করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٥٠٠ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَكُنْتُ اَسْمَعُهٗ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الْهَوِىَّ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِىَّ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَلِلتِّرْمِذِىِّ نَحْوُهٗ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

১১৫০. অনুবাদ : হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব আল্-আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ -এর হুজরা মুবারকের নিকটেই রাত যাপন করতাম। অতএব তিনি যখন রাতে [নামাজের জন্য] উঠতেন তখন তাঁকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বলতে শুনতাম 'সুবহানা রাব্বিল 'আলামীন'। অর্থ- আমি দো জাহানের প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অতঃপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বলতে শুনতাম 'সুব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'। অর্থ- আমি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি তাঁর প্রশংসা সহকারে। [নাসায়ী] তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলে কারীম ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দোয়া পাঠ করতেন। হযরত রাবীয়া ছিলেন আহলে সুফ্ফার অন্যতম সদস্য। তাই তিনি রাসূলের রাত জাগরণের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করতেন। সাহাবীদের মধ্যে যিনি যা অবগত হয়েছেন, তিনি তাই বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীসে একটি শব্দ اَلْهَوِىْ উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দটির هَا হরফে যবর ও وَاوْ হরফে যের এবং يَا . তাশদীদযুক্ত এবং নসব বিশিষ্ট। ইবনুল আছীর তাঁর 'নিহায়া' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, اَلْهَوِىْ-এর অর্থ- اَلْحِيْنُ الطَّوِيْلُ مِنَ الزَّمَانِ অর্থাৎ দীর্ঘ সময় কারো কারো মতে, এটা কেবল রাত্রিকালের জন্য প্রযোজ্য।

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ : রাতের বেলায় ইবাদতের জন্য উৎসাহ প্রদান

اَلتَّحْرِيْضُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার, حَرَضٌ মূলধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো– উৎসাহ প্রদান করা, উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, আগ্রহ তৈরি করা। পরিভাষায় উত্তম ও কল্যাণকর কর্ম সম্পাদনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করাকে تَحْرِيْض করা বলা হয়। আর قِيَامُ اللَّيْلِ বলতে রাতের বেলার ইবাদত তথা তাহাজ্জুদ নামাজকেই বুঝানো হয়। অতএব উক্ত অধ্যায়ের অর্থ হলো তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল, উম্মতের উপর কষ্টকর বিধায় পরবর্তীতে এর ফরযিয়্যাত রহিত হয়ে যায়, তথাপিও এর গুরুত্ব ও ফজিলত যথাযথই থেকে যায়। এমনিভাবে রাসূলের জন্যও এ নামাজ ফরজ ছিল। রাসূল ﷺ সাহাবীদেরকে এটা আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٥١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَاْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلَّا اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপরে মোহর মারে, [ঘুমন্ত ব্যক্তির মনে একথা ছড়ায় যে,] এখনও অনেক রাত বাকি আছে, তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে থাক। যদি সে সজাগ হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তার একটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে অজু করে, তখন আর একটি গিরা খুলে যায়। আর যখন সে নামাজ পড়ে, তখন তার শেষ গিরাটিও খুলে যায় এবং সকালে খুশি মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে উঠে নতুবা সে কলুষিত অন্তর ও অলস দুর্বল চিন্তা নিয়ে সকালে উঠে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ-এর ব্যাখ্যা : গিরা বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এটা প্রকৃতিগত গিরা। যেমন– কোনো যাদুকর যাদুটোনায় গিরা দিলে তা যাদুকৃত ব্যক্তির উপর প্রতিফলিত হয়। যে ধরনের গিরা সম্পর্কে কুরআন মাজীদে সূরা ফালাকেও বলা হয়েছে– وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ

কেউ বলেন, গিরা শব্দটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শয়তানের কাজগুলো যেন যাদুকরের কার্যাবলির মতো। যাদুকর যেমন যাদুটোনার সময় মন্ত্র পড়ে ও গিরা লাগায়, তদ্রূপ শয়তানও মানুষের জন্য স্থানে স্থানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার কু-প্ররোচণায় মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো হয়ে পড়ে। এক একটি বাধার স্থানকেই রূপক হিসাবে একটি গিরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপর একদল বলেন, হতে পারে এটা বাস্তব গিরা, শয়তান মাথার পশ্চাৎ দিকে বাস্তবিকপক্ষেই গিরা দিয়ে থাকে। এর তত্ত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.) অবগত ছিলেন– আমরা অবগত নই।

অথবা 'ওকদাহ' (গিরা) বলতে যদি জড়তা বা প্রতিবন্ধকতা অর্থ হয়, তা হলে এর অর্থ হবে– শয়তান তিনটি স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন– হযরত মূসা (আ.) বলেছেন, وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ [হে আল্লাহ!] তুমি আমার বাক-প্রতিবন্ধকতা দূর করে দাও।

ثَلٰثُ عُقَدٍ-এর তাৎপর্য : গিরাকে তিনের মধ্যে কেন সীমাবদ্ধ করা হলো, এ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (রা.) বলেন, তিন সংখ্যাটিকে শুধুমাত্র তাকিদের জন্যই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা তিন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার হেকমত হলো, তিনটি গিরা দ্বারা তিনটি বস্তু হতে ফিরিয়ে রাখাকে বুঝান হয়েছে। এটা হলো– (১) জিকির, (২) অজু এবং (৩) নামাজ। শয়তান তিনটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘাড়ে তিনটি গিরা দিয়েছে। প্রথমটি দিয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, সে যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করতে না পারে। দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টির উদ্দেশ্য হলো, যথাক্রমে অজু ও নামাজ হতে বিরত রাখা।

وَعَنْ ١١٥٢ الْمُغِيْرَةِ (رض) قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهٗ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫২. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মহানবী ﷺ তাহাজ্জুদ নামাজে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন যে, তাঁর দুই পা ফুলে গেল। সাহাবীদের কেউ জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি কেন এরূপ করেন? অথচ আপনার তো বিগত ও ভবিষ্যত তথা গোটা জীবনের সমস্ত গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হয়েছে? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, তা হলে আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-এর বিশ্লেষণ : রাসূলুল্লাহ (সা.) তাহাজ্জুদ নামাজে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার কদম মোবারক ফুলে উঠত। এটা দেখে কতক সাহাবী সবিনয় আরজ করলেন, হুযূর! আল্লাহতো আপনার পূর্বাপর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তদুপরি আপনি কেন এত কষ্ট স্বীকার করে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا অর্থাৎ, আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে পরিগণিত হবো না? অর্থাৎ আমার অপরাধ ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ যে নিয়ামত আমাকে প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য নিয়ামতাবলি যা কিছু আমাকে দিয়েছেন এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই আমি এত অধিক ইবাদত করে থাকি। অবশ্য হাদীস বিশারদগণ এ বাক্যটির আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

※ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রা.) শরহুশ শামায়িল গ্রন্থে এর ব্যাখ্যায় লেখেন اَاَتْرُكُ تِلْكَ الْكُلْفَةَ نَظْرًا اِلَى الْمَغْفِرَةِ فَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا لَا بَلْ اَلْزَمُهَا وَاِنْ غُفِرَلِىْ لِاَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا . অর্থাৎ ক্ষমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে কি এ কষ্টকে পরিহার করব? আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? এটা হতে পারে না; বরং আমি তা অপরিহার্য করে নেব, যদিও আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। আর এর মাধ্যমে অবশ্যই আমি (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ বান্দা হবো।

※ আল্লামা মীরাক এর অর্থ বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেন আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না, অথচ তিনি আমাকে কল্যাণ দান করেছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে আমাকে উত্তমরূপে নির্বাচন করেছেন। –[মিরকাত]

وَعَنْ ١١٥٣ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهٗ مَا زَالَ نَائِمًا حَتّٰى اَصْبَحَ مَاقَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ ذٰلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهٖ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম ﷺ-এর সমীপে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো এবং তার ব্যাপারে বলা হলো যে, সে সর্বদা সারারাত ঘুমিয়ে থাকে, নামাজের জন্য উঠে না, এমনকি প্রভাত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ ব্যক্তির কানে শয়তান প্রস্রাব করেছে অথবা [রাবীর সন্দেহ] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তার দু' কানে [শয়তান প্রস্রাব করেছে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِبَوْلِ الشَّيْطَانِ فِى الْاُذُنِ শয়তান কানে প্রস্রাব করার দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, 'শয়তান প্রস্রাব করে'– এ কথাটির অর্থ নির্ধারণে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী ও কাজী ইয়ায (র.) বলেন, শয়তান প্রকৃতই প্রস্রাব করে। এটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা শয়তানের খাওয়া, পান করা, পশ্চাৎবায়ু নির্গত করা ইত্যাদি হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং সে 'প্রকৃতই' পেশাব করে, এ কথা মেনে নিতে কোনো বাধা নেই।

আল্লামা ত্বাহাবী (র.) বলেন, এভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি শয়তানের অনুগত হয়ে পড়েছে, শয়তান তার উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে শয়তানের গোলামে পরিণত হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন যে, শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে। এখানে 'প্রস্রাব করা' কথাটি একটি রূপক উদাহরণ মাত্র। ফলে তার কান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্‌র কোনো ডাক, মুয়াজ্জিনের আযান তার কানে পৌঁছে না। আর যখন সে পরে ঘুম হতে জেগে উঠে তখন অশ্লীল কথাবার্তা ও শয়তানী আলোচনা তার কানে খুব ভালভাবে শুনতে পায়, যেন সত্যের আহবান হতে তার কান বধির হয়ে গেছে।

আল্লামা তূরেবেশ্‌তী বলেন, শয়তানের প্রস্রাব করা দ্বারা তার কানকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা যে জিনিসকে লোকে তুচ্ছ মনে করে সেটির উপরে প্রস্রাব করে।

* আল্লামা তীবী (র.) বলেন, ঘুমের সাথে আপাত দৃষ্টিতে চোখের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও হুজুর ﷺ কানের কথা উল্লেখ করেছেন এ জন্য যে, নিদ্রার গভীরতা মূলত কানের সাথেই বেশি সম্পর্কিত।

وَعَنْ ١١٥٤ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يُرِيْدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةً فِى الْاٰخِرَةِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১১৫৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ত্রস্ত ও বিব্রত অবস্থায় ঘুম হতে জাগ্রত হলেন এবং বলতে লাগলেন, সুব্‌হানাল্লাহ! এই রাতে কত যে রহমত নাজিল হলো এবং কত বিপদও সাথে নাজিল হলো! কে আছে এমন যে, এই অন্তঃপুরবাসিনীদেরকে জাগাবে? 'অন্তঃপুরবাসিনী' দ্বারা তাঁর বিবিগণকে বুঝিয়েছেন, যাতে তারা উঠে নামাজ পড়তে পারে। হায়! দুনিয়াতে পোশাক-পরিচ্ছদে শুশোভিতা কত রমণী আখেরাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَاذَا أُنْزِلَ اَلْفِتَنُ ও اَلْخَزَائِنُ দ্বারা উদ্দেশ্য : একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাড়াহুড়া করে জেগে উঠে বললেন اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ অর্থাৎ এই রাতে কত যে রহমত অবতীর্ণ করা হলো, আর কত যে বিপর্যয় আপতিত হলো। এখানে اَلْخَزَائِنُ দ্বারা রহমত এবং اَلْفِتَنُ দ্বারা ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ যে রাতের কথা বলেছেন, সে রাতে একদিকে যেমন অগণিত রহমত ও কল্যাণ এই ধরার বুকে অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে বহু ফিতনাও নাজিল হয়েছে। এ অফুরন্ত রহমত অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং বিপর্যয় হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় বিবিগণকে রাতের নামাজ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আল্লামা তীবী (র.) উপরোক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে যথার্থ ও সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةً فِى الْاٰخِرَةِ-এর ব্যাখ্যা : এর মর্মার্থ হলো দুনিয়াতে পোশাকে সুশোভিতা অনেক রমণী আখেরাতে উলঙ্গিনী হবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন বহু স্ত্রীলোক রয়েছে যারা আকর্ষণীয় বিভিন্ন রং-এর পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে এবং বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহার করে সুশোভিত হয়ে থাকে, আর নিজের সৌন্দর্যকে লোক সম্মুখে প্রকাশ করে। অথচ

পরকালের চিন্তা-ভাবনা তাদের অন্তরে আদৌ নেই এবং এর জন্য কোনো নেক আমলও করে না। এ সমস্ত রমণীগণই আখেরাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে উঠবে। তাদের দেহে কোনো বস্ত্র বা অলঙ্কার থাকবে না।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে رُبَّ দ্বারা অধিক সংখ্যক বুঝানো উদ্দেশ্য। কারো মতে رُبَّ كَاسِيَةٍ দ্বারা রাসূল ﷺ-এর أَزْوَاج مُطَهَّرَات-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলতে চেয়েছেন যে, তাদের জন্য ইবাদত হতে উদাসীন থাকা সঙ্গত নয়। রাসূলের পরিবার বলে আল্লাহর ভীতি পরিহার করা তাদের জন্য অনুচিত। মূলত أَزْوَاج مُطَهَّرَات-কে বলা মানেই পৃথিবীর সকল নারীসমাজকে সতর্ক করে দেওয়া। তাই সবার সতর্ক হওয়া উচিত।

١١٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهٗ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَاُعْطِيَهٗ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَاَغْفِرَ لَهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

১১৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের পরওয়ারদিগার তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে এবং বলতে থাকেন, কে আছ যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছ যে আমার নিকট কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দান করব? এবং কে আছ যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব? –[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দু' হাত পেতে দেন এবং বলতে থাকেন, 'কে আছ যে ঋণ দেবে এমন মহান সত্তাকে যে দরিদ্র নয় এবং অত্যাচারীও নয়।' উষার আলো তথা সুবহে সাদেক পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَنْزِلُ رَبُّنَا .... إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন, কে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দান করব। কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। "আমার প্রভু দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন"– হাদীস বিশারদগণ এ বাক্যটির নিম্নরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

※ ইমাম মালেক এবং অন্যান্যরা বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর রহমত অথবা ফেরেশতাগণ দুনিয়ার প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবতীর্ণ হন না। এর অনুকূলে বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে– إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْهِلُ حَتّٰى يَمْضِيَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَأْمُرُ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهٗ. (اَلْحَدِيْثُ) অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেন, অতঃপর কোনো আহবানকারীকে আহবান করার জন্য আদেশ প্রদান করেন এবং সে আহবানকারী এই বলে আহবান করতে থাকে যে, কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি না? কেননা তার প্রার্থনার মঞ্জুরি প্রদান করা হবে।

এর দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা হলো, উক্ত বাক্যটি রূপক হিসাবে আনা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা রহমতের মাধ্যমে কবুল করে নেবেন। যেমনিভাবে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি অথবা রাজন্যবর্গ কোনো দুর্বল অসহায়-অনাথের প্রার্থনাকে কবুল করে থাকে। –[মিরকাত]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর হাত বলতে আল্লাহর করুণা-অনুগ্রহের কুদরতী হাত। দরিদ্র নয় এবং অত্যাচারীও নয় অর্থাৎ আল্লাহ দরিদ্র নন যে, ঋণ শোধ করতে পারবেন না এবং অত্যাচারী নন যে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণ শোধ করবেন না। আর ঋণ দেওয়ার অর্থ হলো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পাওনাদার হওয়া।

وَعَنْ ١١٥٦ - جَابِرٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৫৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি তা লাভ করে এবং ঐ সময়ে আল্লাহর নিকট ইহ ও পরকালের কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেন। আর এ বিশেষ মুহূর্তটি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক রাতে এমন একটা বরকতময় সময় রয়েছে, ভাগ্যক্রমে যদি কেউ সেই মুহূর্তে আল্লাহর নিকট ভাল কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ সেই প্রার্থনা অবশ্যই মঞ্জুর করেন। এ সময়টি কোনো রাতের সাথে অথবা রাতের কোনো বিশেষ মুহূর্তের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং যে কোনো রাতের যে কোনো সময় এটা হতে পারে। শবে কদর বা শবে মি'রাজ বা অন্য কোনো বিশেষ রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আর একে অস্পষ্ট রাখার কারণ হলো, মানুষ যেন এর অন্বেষণে সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকে এবং কোনো সময়কে যেন নির্দিষ্ট করে না নেয়। উল্লেখ্য, যারা দিনের চাইতে রাতকে মর্যাদাশীল বলে ধারণা করেন, তারা এই হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং বলেন, রাতের বেলায় যেহেতু একটি বিশেষ বরকতময় সময় রয়েছে যা দিনের বেলায় নেই, তাই রাতই উত্তম।

وَعَنْ ١١٥٧ - عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় নামাজ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ এবং সবচেয়ে প্রিয় রোজাও ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি [দাউদ (আ.)] অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, তারপর রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামাজে কাটাতেন, পুনরায় রাতের এক-ষষ্ঠাংশ আরাম করতেন। এমনিভাবে তিনি একদিন রোজা রাখতেন এবং একদিন রোজা রাখতেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُوَازَنَةُ عَمَلِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَمَلِ دَاوُدَ (ع) নবী করীম ﷺ -এর আমলের সাথে হযরত দাউদ (আ.) -এর আমলের তুলনা : উক্ত হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়ে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক নফল নামাজ ও রোজা আদায় করাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। অথচ আমাদের নবী ﷺ সর্বদা এই মোতাবেক আমল করেননি। এর জবাবে বলা হয় যে, হুজুর ﷺ তাই আমল করেছেন যা তার জন্য প্রযোজ্য ছিল। অবশ্য উম্মতের জন্য হযরত দাউদ (আ.)-এর আমল মোতাবেক অনুসরণ করার জন্য উপদেশ প্রদান করেছেন। যেন উম্মতের সবল ও দুর্বল সর্বস্তরের লোক সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে তা অনুসরণ করতে পারে। আর রাত জাগরণের ক্লান্তি দূর করার জন্য রাতের শেষ এক-ষষ্ঠমাংশ বিশ্রাম বা নিদ্রা যেতেন।

١١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ تَعْنِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِى اٰخِرَهٗ ثُمَّ اِنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ قَضٰى حَاجَتَهٗ ثُمَّ يَنَامُ فَاِنْ كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْاَوَّلِ جُنُبًا وَثَبَ فَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّاَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৫৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে সাধারণত ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে জাগ্রত থাকতেন। অতঃপর [কিছু ইবাদতের পরে] নিজের পরিবারের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকলে তা পূর্ণ করতেন, অতঃপর [কিছুক্ষণ] ঘুমাতেন। আযানের প্রাক্কালে নাপাক অবস্থায় থাকলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠতেন এবং গোসল করতেন। আর নাপাক অবস্থায় না থাকলে নামাজের জন্য অজু করতেন এবং দু' রাকাত নামাজ পড়তেন।-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِالنِّدَاءِ الْاَوَّلِ 'প্রথম আহ্বান'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসবিশারদদের কেউ কেউ বলেন, اَلنِّدَاءُ الْاَوَّلُ দ্বারা হযরত বেলাল (রা.)-এর আযান উদ্দেশ্য। রাতের দ্বি-প্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত বেলাল (রা.) এ আযান দিতেন। আর اَلنِّدَاءُ الثَّانِىْ দ্বারা অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান উদ্দেশ্য। তিনি সুবহে সাদেকের সময় আযান দিতেন। অবশ্য প্রকৃত কথা হলো, اَلنِّدَاءُ الْاَوَّلُ দ্বারা আযান এবং اَلنِّدَاءُ الثَّانِىْ দ্বারা একামত উদ্দেশ্য।

حُكْمُ النَّوْمِ بَعْدَ الْمُجَامَعَةِ সহবাসের পর ঘুমানোর হুকুম : স্ত্রী সহবাসের পর কখনো কখনো নবী করীম ﷺ 'বিশেষ অঙ্গ' ধৌত করত অজু করে ঘুমাতেন। এমনকি গোসলের পূর্বে তিনি কিছু খাওয়া-দাওয়াও করতেন। এর ফলে ফকীহগণ বলেছেন, নাপাক বা জুনূবী হওয়ার পর সাথে সাথেই গোসল করা ওয়াজিব বা ফরজ নয়। ' বিশেষ অঙ্গ' ধৌত করে এবং ভালভাবে অজু করে ঘুমানো কিংবা কিছু খাওয়া-দাওয়া করার মধ্যে কোনো গুনাহ নেই। তবে অকারণে দেরি করে গোসল করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কোনো জুনূবী একটি ফরজ নামাজ ও তার ওয়াক্ত অতিক্রান্ত হওয়ার পরও গোসলবিহীন অবস্থায় থাকে, তখন ফেরেশ্‌তা ও জমিন প্রভৃতি তাকে লানত করতে থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٥٩ - عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاِنَّهٗ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১১৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা রাতে জেগে [তাহাজ্জুদ] নামাজ পড়াকে বাধ্যতামূলক করে নিও। কারণ, এটা তোমাদের পূর্বকালের নেক লোকদের নিয়ম। আর এটা [রাত জেগে নামাজ পড়া] তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা এবং অপরাধ হতে প্রতিরোধকারী। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَاِنَّهٗ دَاْبُ الصَّالِحِيْنَ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী তথা উম্মতগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তোমরা রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়াকে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেবে। কেননা এটা তোমাদের পূর্বকালের নেক লোকদের নিয়ম।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَلدَّأْبُ অর্থ- اَلْعَادَةُ [অভ্যাস] ও اَلشَّأْنُ [মর্যাদা]। আর اَلصَّالِحِيْنَ বলতে সেই সমস্ত নেক আমলকারীদেরকে বুঝায় যারা অধিকাংশ সময় নেক কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে। এখানে এর দ্বারা নবীগণ এবং ওলি-আল্লাহগণ উদ্দেশ্য। যেমন বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ اٰلَ دَاوٗدَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ بِاللَّيْلِ অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ.)-এর অনুসারীরা রাতে [তাহাজ্জুদ] নামাজ পড়তেন। হযরত আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসাংশে সূক্ষ্ম একটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তা হলো এতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা তো হলে অতীত সকল উম্মতের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং এই উত্তম কাজ হতে দূরে থাকা তোমাদের সমীচীন নয়। এতে আরো বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে না সে পরিপূর্ণ নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

مَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْاِثْمِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশে তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ দু'টি মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তাহাজ্জুদ নামাজ হলো অন্যান্য নফল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। প্রথমত এটা সমস্ত অপরাধকে ঢেকে দেয় এবং পাপকে দূরীভূত করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ ভাল কর্মসমূহ অপরাধকে দূরীভূত করে। দ্বিতীয়ত তাহাজ্জুদ নামাজ হলো যাবতীয় অপরাধের প্রতিরোধকারী। এ নামাজ মানুষকে অপরাধ করা হতে দূরে সরিয়ে রাখে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ, নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কর্ম হতে বিরত রাখে।

١١٦٠ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلَيْهِمُ الرَّجُلُ اِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّىْ وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوْا فِى الصَّلٰوةِ وَالْقَوْمِ اِذَا صَفُّوْا فِىْ قِتَالِ الْعَدُوِّ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

১১৬০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার লোক রয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ খুশি হন। (এক) কোনো ব্যক্তি যখন রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করেন। (দুই) জনসমষ্টি যখন তারা নামাজের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং (তিন) আল্লাহর পথের যোদ্ধা সম্প্রদায়, যখন তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সারিবদ্ধ হয়। -[শরহে সুন্নাহ্]

١١٦١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللّٰهَ فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

১১৬১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ আপন বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষার্ধের মধবর্তী সময়ে। অতএব সে বিশেষ সময় যারা আল্লাহ্র ইবাদত করে, তুমি যদি তাদের দলভুক্ত হতে পার, হতে চেষ্টা কর। [তিরমিযী। তবে তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি সনদের বিবেচনায় হাসান সহীহ্ গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে দুনিয়ার সব মানব- দানব ঘুমে বিভোর থাকে, তাই এ সময়ে একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর নিকট প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ **তারকীবে কি হয়েছে?** এ অংশটি اَقْرَبُ হতে خَبَر হবে অথবা رَبُّ হতে حَال হয়েছে, তখন বাক্যটি হবে قَائِلًا جَوْفَ اللَّيْلِ مَنْ يَدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبُ لَهٗ অথবা এটি اَلْعَبْدِ হতে حَال হয়েছে।

১১৬২. وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهٗ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَاَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّٰى فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِىُّ)

১১৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে ব্যক্তি রাতে উঠে নামাজ পড়ে অতঃপর নিজের স্ত্রীকেও জাগিয়ে এবং সেও নামাজ পড়ে। আর যদি সে (স্ত্রী) উঠতে অস্বীকার করে তবে তার চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন সেই মহিলার প্রতি, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়। ফলে সেও নামাজ পড়ে। আর যদি সে [স্বামী] উঠতে অস্বীকার করে তার চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসে দু' ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন। প্রথমত এমন পুরুষ যে, রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং সাথে সাথে স্বীয় স্ত্রীকেও নামাজের জন্য সজাগ করে। দ্বিতীয়ত এমন রমণী যে, রাতে জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও নামাজের জন্য উঠায়। রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, দু'জনের কেউ যদি গভীর নিদ্রার কারণে অথবা অলসতাবশত উঠতে না চায়, তবে যেন একে অপরের শরীরে পানি ছিটিয়ে দেয়। এটা হবে উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। উত্তম কাজে একে অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى অর্থাৎ তোমরা নেকী ও পরহেজগারিতে একে অন্যের সাহায্য করতে থাক। আল্লামা ইবনুল মালিক বলেন, উত্তম কর্মপালনের জন্য অন্যকে কষ্ট দেওয়া শুধু জায়েজই নয়; বরং মোস্তাহাব। এ হাদীসটিই এর বাস্তব প্রমাণ।

১১৬৩. وَعَنْ أَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَ دُبُرَ الصَّلَوٰتِ الْمَكْتُوْبَاتِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১১৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সময়ের দোয়া দ্রুত কবুল হয়? হুজুর ﷺ বললেন, রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া এবং প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরবর্তী দোয়া। –[তিরিমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, দু' সময়ের দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হয়, প্রথমত রাতের শেষার্ধের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরের দোয়া। উক্ত সময়দ্বয়ে দোয়া কবুল হওয়ার কারণ হলো তখন মানুষের অন্তরে একাগ্রতা থাকে, আর একাগ্রতার সাথে প্রার্থনা করলে তা কবুল হবেই।

১১৬৪. وَعَنْ أَبِىْ مَالِكِ الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرٰى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا

১১৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মালেক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন সব স্বচ্ছ প্রকোষ্ঠ বা বালাখানা রয়েছে, যার বাইরের বস্তুসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের বস্তুসমূহ বাইরে থেকে দেখা যায়। এ সমস্ত বালাখানা

وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِمَنْ اَلَانَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَ رَوَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلَامَ)

আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষের জন্য নির্মাণ করেছেন, যে [লোকের সাথে] বিনম্র ভাষায় কথা বলে, [ক্ষুধার্তকে] খাদ্য দান করে, উপর্যুপরি রোজা রাখে এবং রাত জেগে নামাজ পড়ে অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে।-[বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান]। তিরমিযী হযরত আলী (রা.) হতে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্ণনায় 'বিনম্র ভাষায় কথা বলে'-এর স্থলে 'সুমিষ্টভাষায় কথা বলে' কথাটি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত কয়েক প্রকার মানুষের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে তাদের জন্য এমন সুন্দর ও নয়নাভিরাম অট্টালিকা তৈরি করে রেখেছেন, যার বাইরের বস্তুসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের বস্তুসমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সে সকল লোকেরা হলো-

১. যারা মানুষের সাথে বিনম্র ভাষায় কথা বলে, মিষ্টি স্বরে কথা বলা রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর বহিঃপ্রকাশ মু'মিনদের মধ্যেও ঘটেছিল। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (اَلْفُرْقَانُ) অর্থাৎ আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা শান্তি বজায় রেখে কথা বলে। [সূরা ফুরকান]

২. যারা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে।

৩. যারা উপর্যুপরি রোজা রাখে। বাহ্যত এর দ্বারা صَوْمِ وِصَالْ বা ধারাবাহিক রোজার কথা বুঝার অবকাশ থকালেও মূলত এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ অব্যাহতভাবে রোজা রাখা হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এটা দ্বারা বেশি বেশি রোজা রাখার কথা বুঝানো হয়েছে।

৪. আর যারা নিথর-নিস্তব্ধ রজনীতে যখন মানুষ গভীর ঘুমে বিভোর থাকে, তখন জাগ্রত হয়ে নামাজে মশগুল থাকে। মূলত হাদীসের এ অংশের সাথেই শিরোনামের সম্পর্ক রয়েছে। যারা রাতের নামাজে নিমগ্ন থাকে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (اَلْفُرْقَانُ) অর্থাৎ যারা রাতের বেলায় নিজেদের প্রভুর সম্মুখে সিজদা ও কিয়াম অবস্থায় [নামাজে] মাশগুল থাকে তারাই হলো আল্লাহর প্রকৃত বান্দা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মতো হয়ো না, যে ব্যক্তি আগে রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠত, এখন রাতে উঠা ত্যাগ করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মূলত সর্বোত্তম ইবাদত হলো যা সর্বদা করা হয়, এ বিষয়ে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন- اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ অর্থাৎ সর্বোত্তম আমল হচ্ছে যা ধারাবাহিকতার সাথে করা হয় যদিও তা সামান্যই হয় না কেন। কাজেই আমল যা করা হয় তা নিয়মিত করা উচিত। উক্ত হাদীসের ভাষ্যেও তা বুঝা যায়।

وَعَنْ ١١٦٦ - عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَانَ لِدَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً يُوْقِظُ فِيْهَا اَهْلَهٗ يَقُوْلُ يَا اٰلَ دَاوٗدَ قُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَاِنَّ هٰذِهٖ سَاعَةٌ يَسْتَجِيْبُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا الدُّعَاءَ اِلَّا لِسَاحِرٍ اَوْ عَشَّارٍ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১১৬৬. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, হযরত দাউদ (আ.)-এর রাতে একটি নির্দিষ্ট সময় ছিল, সে সময় তিনি নিজ পরিবারের লোকদেরকে জাগিয়ে দিতেন এবং বলতেন, হে দাউদ পরিবারের লোক সকল! তোমরা উঠ এবং নামাজ পড়। কেননা এটা [এখন] এমন একটি সময় যে সময়ে আল্লাহ [আয্‌যা ওয়াজাল্লা] যাদুকর ও অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী ব্যতীত সকলের প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَرْكِيْبُ الْجُمَلِ **বাক্য বিশ্লেষণ :** يُوْقِظُ فِيْهَا বাক্যটি سَاعَةً-এর صِفَة আর يَسْتَجِيْبُ اللّٰهُ বাক্যটি পরবর্তী سَاعَةٌ-এর صِفَة আর আগের سَاعَةً টি اِسْم كَانَ আর مِنَ اللَّيْلِ তার বয়ান।

وَعَنْ ١١٦٧ - اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلٰوةٌ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১১৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ اَفْضَلِ السُّنَّةِ **উত্তম সুন্নতের বর্ণনা :** শাফেয়ী মাযহাব মতাবলম্বী ইমাম আবূ ইসহাক মারওয়াযী বলেন, 'তাহাজ্জুদ' নামাজ 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা' হতেও উত্তম। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাগণ বলেন, সুন্নতে মুয়াক্কাদাই উত্তম। প্রকৃতপক্ষে উভয় মতামতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা দু' দৃষ্টিকোণ হতে দু'টি উত্তম। যেমন– শরীরের উপর অধিক কষ্ট বা রিয়া বা লৌকিকতা হতে অনেকটা মুক্ত, এই হিসাবে 'তাহাজ্জুদ নামাজ' উত্তম। আর ফরজ নামাজসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিপূরক হিসাবে 'সুন্নতে রাওয়াতেবই' উত্তম। তবে প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত এই যে, 'তাহাজ্জুদ' নামাজই উত্তম। কেননা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এর উত্তমতার দলিল বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া তাহাজ্জুদের নামাজ অধিক কষ্টকর ইবাদত। কেননা চরম শান্তির ঘুম পরিত্যাগ করে রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই اُجُوْرُكُمْ عَلٰى قَدْرِ نُصْبِكُمْ নীতির ভিত্তিতে তাহাজ্জুদ নামাজ উত্তম।

وَعَنْهُ ١١٦٨ - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ فُلَانًا يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ فَاِذَا اَصْبَحَ سَرَقَ فَقَالَ اِنَّهٗ سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

১১৬৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর সমীপে হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, অথচ যখন প্রভাত হয় সে চুরি করে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, অদূর ভবিষ্যতে নামাজই তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখবে, যার কথা তুমি বললে। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** পবিত্র কুরআনেও এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে যে, إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। কাজেই কোনো ব্যক্তি অন্যায় কাজ করে বলে নামাজ হতে বিরত থাকা উচিত হবে না। অচিরেই নামাজ তাকে গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখবে।

١١٦٩ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ পরিবারকে অর্থাৎ স্ত্রীকে রাতে নামাজের জন্য জাগায় এবং উভয়ে নামাজ পড়ে অথবা [রাবীর সন্দেহ রাসূল ﷺ বলেছেন] উভয়ে একত্রে দু' রাকাত নামাজ পড়ে, তারা দু'জনেই আল্লাহর স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হন। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদ নামাজ স্বস্ত্রীক পড়াই উত্তম। আর এটাও বুঝা যায় যে, ঘুমের ব্যাঘাতে আপন সঙ্গী বা স্ত্রীর যদি কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তা হলে তাকে জাগিয়ে দেওয়াই উত্তম। অন্য হাদীসে বর্ণিত এসেছে যে, أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ অর্থাৎ 'নিজের জন্য যা ভাল মনে করা অন্যের জন্য তা ভাল মনে করা' ঈমানদারের পরিচয়।

١١٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشْرَافُ أُمَّتِيْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

১১৭০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে তারাই সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত [অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী] যারা কুরআন বহনকারী [কুরআন শিখেছে এবং তদনুযায়ী আমল করেছে] এবং রাতে জাগরণকারী [তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারী]। –[বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِحَمَلَةِ الْقُرْاٰنِ **কুরআন বহনকারী দ্বারা উদ্দেশ্য :** 'হামালাতুল কুরআন' অর্থাৎ কুরআন বহন করা বা কুরআন বহনকারী এ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। কাকে কুরআনের যথার্থ ও সঠিক ধারক ও বাহক বলা যাবে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ব্যাপার। কুরআন হলো মানুষের সার্বিক জীবনব্যবস্থা। অতএব অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, যারা কুরআন মুখস্থ করল, এর অর্থ অনুধাবন করল, তার নির্দেশাবলিকে মান্য করল, নিষেধাবলিকে পরিহার করল এবং গোটা জীবন কুরআন অনুযায়ী পরিচালিত করল, তাদেরকেই প্রকৃত অর্থে কুরআন বহনকারী হিসাবে বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য হাদীসে তাদেরকেই বলেছেন।

مَنْ حَفِظَ الْقُرْاٰنَ فَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُوْحٰى إِلَيْهِ وَحْيًا جَلِيًّا فَإِنَّهُ قَدْ يُوْحٰى إِلَيْهِ وَحْيًا خَفِيًّا .

আর যারা কুরআন পড়ল, মুখস্থও করল কিন্তু তা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করল না, তাদের পরিচয় কুরআনের ভাষায় এভাবে দেওয়া হয়েছে। مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا অর্থাৎ তাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই গাধার ন্যায় যে গাধা শুধুমাত্র বোঝাই বহন করে চলে।

مَعْنٰى "اَصْحَابُ اللَّيْلِ" **আসহাবুল লাইল-এর অর্থ** : اَصْحَابُ اللَّيْلِ বা রাতে জাগরণকারী বলে সেই ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা গভীর রজনীতে নিথর-নিস্তব্ধ পরিবেশে একাগ্রচিত্তে তাহাজ্জুদ নামাজে মশগুল থাকে। একাকী সকলের অগোচরে নামাজ আদায়ের কারণে তাদের অন্তরে কোনো রিয়ার সৃষ্টি হয় না। আর এ জন্যই রাসূল (সা.) তাদেরকে আশরাফুল উম্মত হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, اَصْحَابٌ শব্দটিকে اَللَّيْلُ-এর দিকে সম্বন্ধ করে অধিক নামাজ আদায় করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন অধিক পথ অতিক্রমকারীকে اِبْنُ السَّبِيْلِ এবং সময়ের সঠিক অনুসারী ও এর প্রতি যথার্থ গুরুত্বারোপকারীকে اِبْنُ الْوَقْتِ বলা হয়ে থাকে।

وَعَنْ ١١٧١ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّ اَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ اَيْقَظَ اَهْلَهٗ لِلصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لَهُمُ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَتْلُوْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১১৭১. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) রাতে উঠে নামাজ পড়তেন, আল্লাহ তাঁকে যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য দিতেন। যখন রাত শেষ হয়ে আসত, তিনি নিজ পরিবারকে নামাজের জন্য জাগিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে বলতেন, নামাজ পড়। অতঃপর কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করতেন وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ নিজ পরিবার-পরিজনকে নামাজের জন্য নির্দেশ দিন এবং নামাজ পাঠে খুব ধৈর্যধারণ করুন। আমি আপনার নিকট রিজিক প্রার্থনা করছি না; বরং আমিই আপনাকে রিজিক দান করে থাকি এবং (উত্তম) পরিণাম তো পরহেজগারদের জন্যই অবধারিত। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : যিনি পরিবারের কর্তা বা অভিভাবক, তার কর্তব্য যে, নিজের অধীন সকলকে নেক আমলে উৎসাহী করে তোলা। আল্লাহর কালামেও এ নির্দেশ রয়েছে যে, قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا জাহান্নামের আগুন হতে নিজেও বাঁচ এবং পরিবারের সবাইকে বাঁচাও। আবার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ وَالرَّجُلُ فِىْ اَهْلِهٖ رَاعٍ অর্থ– তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল [শাসক] এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। ব্যক্তি [স্বামী] তার পরিবারের রাখাল।

بَابُ الْقَصْدِ فِى الْعَمَلِ

পরিচ্ছেদ : কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٧٢ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى يَظُنَّ اَنْ لَّا يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى يَظُنَّ اَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لَا تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلَّا رَاَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا اِلَّا رَاَيْتَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১১৭২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসের কিছু অংশে রোজা ছেড়ে দিতেন। যাতে মনে করা হতো যে, তিনি এ মাসে আর রোজা রাখবেন না। আবার রোজা রাখা শুরু করে দিতেন, যাতে মনে করা হতো যে, তিনি এ মাসে আর রোজা ছাড়বেন না। এরূপভাবে তুমি যদি তাঁকে রাতের বেলায় নামাজে রত দেখতে চাইতে, অবশ্য তাঁকে নামাজ রত দেখতে, আর যদি তাঁকে নিদ্রিত দেখতে চাইতে অবশ্যই নিদ্রিত অবস্থায় দেখতে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ পুরো মাস রোজা রাখতেন না, আবার সারা মাস রোজা ছেড়েও থাকতেন না। এমনিভাবে তিনি সারা রাত জেগে নামাজ পড়তেন না, আবার নামাজ ছাড়া সারারাত ঘুমিয়েও থাকতেন না। সর্বাবস্থায় রাসূল ﷺ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন।

আলোচ্য হাদীসে لَا تَشَاءُ শব্দ বাহ্যত নফী হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, তারকীবে (বাক্য গঠনে) এটা 'বদল' এর 'ইসতিছনা' হয়েছে। ইসবাতে অর্থাৎ হাঁ বাচকে বাক্যটি হবে এরূপ, وَاِنْ تَشَاءُ رُؤْيَتَهُ مُتَهَجِّدًا رَاَيْتَهُ এবং تَشَاءُ رُؤْيَتَهُ نَائِمًا رَاَيْتَهُ نَائِمًا বাক্যে তুমি বলে সম্বোধন করা এটা একটি আরবি বাকরীতি। এর প্রকৃত মর্মার্থ এই যে, যদি আমরা তাঁকে নামাজরত দেখতে চাইতাম, অবশ্য নামাজরত দেখতাম। আর যদি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম তবে তাঁকে ঘুমন্ত দেখতাম। উল্লেখ্য যে, এরূপ বাকরীতি বাংলা ভাষায়ও চালু আছে।

١١٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সব চেয়ে প্রিয় আমল তা-ই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কোনো নেক আমল অধিক পরিমাণে এক দু' বার করার চেয়ে স্বল্প পরিমাণে নিয়মিত করাই উত্তম, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয়।

وَعَنْهَا ١١٧٤ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوْا الْاَعْمَالَ مَاتُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমরা সে পরিমাণ কাজ গ্রহণ কর, যা তোমরা [সর্বদা] করতে সক্ষম হও। কেননা আল্লাহ তা'আলা কখনো ছওয়াব দানে বিরক্ত হন না, যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ করা উচিত নয়। কেননা এতে সে বিরক্ত হয়ে এক সময় তা ছেড়ে দেবে, ফলে সে ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর বিরক্ত হওয়ার অর্থ হলো ছওয়াব না দেওয়া।

وَعَنْ ١١٧٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ وَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ [যখন নামাজ পড়ে] যেন ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়ে, যতক্ষণ তার মনে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা থাকে। যখন সে ক্লান্তিবোধ করে, তখন সে যেন বসে পড়ে [অর্থাৎ মনের বিরুদ্ধে আরও নামাজে প্রবৃত্ত না হয়]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নফল ইবাদত করার নিয়ম হলো, মনে যতক্ষণ প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা থাকে এবং বিরক্তি বোধ জাগ্রত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদতে মশগুল থাকা উচিত। কিন্তু যখন এর প্রতি সামান্যতম অনীহা বা বিরক্তির সৃষ্টি হয় তখন সাথে সাথে নফল ইবাদত ত্যাগ করা উচিত। আর ক্লান্তিবোধ দূরীভূত করার জন্য কিছু কথাবার্তা বলা যেতে পারে অথবা ঘুমানো যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও নফল ইবাদতের মাঝে বিশ্রাম নিতেন এবং তাঁর বিবিদের সাথে কথা বলতেন। যেমন তিনি একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন كَلِّمِيْنِىْ يَاحُمَيْرَاءُ অর্থাৎ হে হুমাইরা [হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপাধী] তুমি আমার সাথে কথা বলো।

وَعَنْ ١١٧٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কারো নামাজ পড়া অবস্থায় তন্দ্রা আসে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে যতক্ষণ না তার ঘুম দূরীভূত হয়। কারণ তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়ে, তখন সে জানতে পারে না যে, সে কি বলছে। সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়া ঠিক নয়। কেননা এ অবস্থায় নামাজি কি পড়ল সে অনুধাবন করতে পারে না। উদাহরণত, যদি সে তন্দ্রাবস্থায় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ-এর স্থানে اَللّٰهُمَّ اعْفِرْلِىْ পড়ে তথা غ-এর স্থলে ع পড়ে তখন এর অর্থ হবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধ্বংস করো। এতে নামাজি নিজে নিজের বিরুদ্ধে বদদোয়া করল, এ জন্য রাসূলে করীম ﷺ তন্দ্রাবস্থায় নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ١١٧٧ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهٗ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَئٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১১৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নিশ্চয়ই দীন সহজ। যে কেউই দীনকে কঠোর করবে, দীন তার উপরে বিজয়ী হবে। অর্থাৎ তার জন্য কঠোর হয়ে পড়বে। সুতরাং [তোমরা বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে] মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করবে। সকাল, বিকাল এবং রাতের কিয়দংশ [ইবাদত দ্বারা] আল্লাহ তা'আলার সাহায্য চাবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের জন্য যে সমস্ত বিধানাবলি নির্ধারণ করেছেন এক কথায় একেই দীন বলা হয়। আল্লাহ প্রদত্ত দীনের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। সকলের পালনের উপযোগী করে আল্লাহ তা প্রণয়ন করেছেন। কুরআনের বহু আয়াতে এবং অনেক হাদীসে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সাথে সহজতার ইচ্ছা করেন এবং তোমাদের সাথে কঠোরতার ইচ্ছা করেন না।

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলেছেন– وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ, আর [আল্লাহ] তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সংকট রাখেননি। –[সূরা হজ]

অন্য হাদীসে এসেছে যে, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتٰى رُخْصَةً لِمَا يُحِبُّ اَنْ تُؤْتٰى عَزَائِمَهٗ এ সব দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্মের মধ্যে কোনো বাড়াবাড়ি নেই।

اَلْغُدْوَةُ وَالرَّوْحَةُ وَالدُّلْجَةُ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য : غُدْوَةٌ অর্থ– প্রাতঃভ্রমণ رَوْحَةٌ অর্থ– সন্ধ্যাভ্রমণ এবং اَلدُّلْجَةُ অর্থ– শেষ রাতে ভ্রমণ। আলোচ্য হাদীসে এ তিনটি শব্দ দ্বারা উক্ত তিন সময়ের ইবাদতকে বুঝানো হয়েছে। কারো ধারণা মতে এ শব্দ তিনটি হাদীসের প্রথমাংশের সাথে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে; প্রকৃতপক্ষে বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ প্রচণ্ড গরমের সময় আরবরা দিনের বেলায় চলাচল করত না; বরং সন্ধ্যা, সকালে ও শেষ রাতে ঠাণ্ডার সময় আরামে পথ অতিক্রম করত। সুতরাং ইবাদতের ব্যাপারেও এরূপ পন্থা অবলম্বন করে নিজের সুবিধা ও রুচি মতো নফল ইবাদত করতে বলা হয়েছে। অহেতুক কঠোর পন্থা অবলম্বন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, সকাল, সন্ধ্যা ও রাতের কিছু সময় ইবাদত করবে এবং বাকি অংশ ঘুম ও বিশ্রামে কাটাবে।

وَعَنْ ١١٧٨ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهٖ اَوْعَنْ شَئٍ مِنْهُ فَقَرَأَهٗ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهٗ كَاَنَّمَا قَرَأَهٗ مِنَ اللَّيْلِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৭৮. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি রাতে নিদ্রামগ্ন থাকার কারণে তার নিয়মিত কাজ [ইবাদত] অথবা তার কিছু অংশ সম্পন্ন করতে পারেনি, অতঃপর তা ফজর ও জোহর নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করেছে, সেটি তার আমলনামায় এভাবে লেখা, যেন সে তা রাতেই আদায় করেছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَاَنَّمَا قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ -এর ব্যাখ্যা : রাত ও দিন একটি অপরটির পরিপূরক। কারো যদি গভীর নিদ্রার কারণে নিয়মিত ইবাদত যেমন নামাজ অথবা কুরআন মজীদ তেলাওয়াত অথবা কোনো দোয়া অথবা জিকির-আয্কার বাদ পড়ে যায়, তবে এটা জোহরের পূর্বে আদায় করলে সে ব্যক্তি রাতের মতোই সমান ছওয়াবের অধিকারী হবে। এতে কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে কোনো সীমালঙ্ঘন নেই। আর রাত যে দিনের পরিপূরক, এর বাস্তব প্রমাণ আমরা পাই আগত আয়াতের মধ্যে। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا . (اَلْفُرْقَانُ) অর্থাৎ "আর তিনি এমন সত্তা যিনি রাত এবং দিবসকে একে অন্যের পশ্চাতে গমনাগমনকারী করে বানিয়েছেন সে ব্যক্তির জন্য যে অনুধাবন করতে চায়, অথবা শোকর করতে ইচ্ছা করে"। [সূরা-ফুরকান]

* আল্লামা কাজী ইয়ায (র.) বলেন, রাত এবং দিন যেহেতু একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত সেহেতু রাতের ছুটে যাওয়া ইবাদত দিনে এবং দিনের বাদপড়া ইবাদত রাতে সম্পাদন করা যাবে। এ অভিমত হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান ও সালমানসহ অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।
* এখানে উল্লেখ্য যে, রাতের ছুটে যাওয়া ইবাদত ফজর হতে জোহরের পূর্ববর্তী সময়ে আদায়ের সাথে কেন নির্দিষ্ট করা হলো। এর সমাধানে বলা যায় যে, জোহরের পূর্ববর্তী সময়কে সাধারণত রাতের মধ্যেই পরিগণিত করা হয়। আর এ কারণেই সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রোজার নিয়ত করা বৈধ।
* অথবা বলা যায় যে, কোনো বস্তুর নিকটবর্তী বস্তু এর হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং ফজরের পরবর্তী সময় যেহেতু এর পূর্বের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত উভয়টিই একই হুকুমের পর্যায়ভুক্ত।

١١٧٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১১৭৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নামাজ দাঁড়িয়ে পড়, যদি তাতে অপারগ হও তবে বসে বসে পড়। আর যদি তাতেও অপারগ হও, তবে কাত হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় কর। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো অবস্থাতেই নামাজ পরিত্যাগ করা যাবে না। অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন অবস্থাতেই নামাজ পড়া জায়েজ আছে।

١١٨٠ - وَعَنْهُ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا قَالَ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهٗ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১১৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূল ﷺ বললেন, যদি সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে, তবে তাই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে নামাজ পড়ে সে দাঁড়িয়ে যে নামাজ পড়ে তার অর্ধেক ছওয়াব পাবে, আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামাজ পড়ে সে বসে যে নামাজ পড়ে, তার অর্ধেক ছওয়াব পাবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বসে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, বসে নামাজ পড়লে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অর্ধেক ছওয়াব হবে এবং শুয়ে নামাজ পড়লে বসে নামাজ পড়ার অর্ধেক ছওয়াব হবে। এ হাদীসের উদ্দেশ্য নির্ধারণে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। এ হাদীসটি কি ফরজ নামাজ আদায়কারী সম্পর্কে, না নফল আদায়কারী সম্পর্কে? যদি ফরজ আদায়কারী সম্পর্কে হয়ে থাকে তবে এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তার জন্য তো ওজর ব্যতীত বসে পড়া বৈধ নয়। আর যদি ফরজ আদায়কারী ওজরের কারণে বসে নামাজ পড়ে তবে তার তো অর্ধেক নয়; বরং পুরা ছওয়াবই মিলবে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে যদি এ হাদীস নফল আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তবে বিশ্লেষণ করতে হবে যে, বিনা ওজরে নফল নামাজ শুয়ে পড়া বৈধ কিনা। এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম হাসান বসরী (রা.) বলেন, দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও নফল নামাজ শুয়ে পড়া জায়েজ রয়েছে। তাঁর দলিল হলো ইমরান ইবনে হুসাইনের উক্ত হাদীস।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) সহ অন্য তিন ইমামের মতে বিনা ওজরে নফল নামাজ শুয়ে পড়া জায়েজ নেই।

ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসের জবাব : আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সেই অসুস্থ ফরজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কষ্টের সাথে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারেন। এ ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া বৈধ হলেও দাঁড়ানোর প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে বলা হয়েছে যে, বসে নামাজ পড়া দাঁড়ানোর অর্ধেক ছওয়াব।

※ হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র.) বলেন, হাদীসটি মূলত অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে যে ছওয়াব পাওয়া যেত, এ অবস্থায় বসে পড়লে এর অর্ধেক মিলবে। সুস্থ অবস্থার অর্ধেক নয়; বরং সুস্থ অবস্থার সমান ছওয়াব পাবে।

※ আল্লামা সিন্ধী (র.) বলেন, হযরত ইমরান (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা নামাজ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা একটির উপর অপরটির ফজিলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব হাদীসের মর্মার্থ হবে, নামাজ ফরজ হোক বা নফল সুস্থ অবস্থায় বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার চাইতে অর্ধেক ছওয়াব পাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١١٨١ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ طَاهِرًا وَ ذَكَرَ اللّٰهَ حَتّٰى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ ذَكَرَهُ النَّوَوِىُّ فِىْ كِتَابِ الْاَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّىْ.

১১৮১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় [অর্থাৎ অজু সহকারে] শয্যা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র নাম-কালাম পড়তে থাকে, যে পর্যন্ত না তাকে তন্দ্রা অভিভূত করবে এবং রাতে যে কোনো সময় ডানে-বামে পাশ ফিরাতে আল্লাহর নিকট ইহ ও পরকালের কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন। [কিতাবুল আয্‌কার-নববী ইবনুস সুন্নী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ঘুমানোর সময় পবিত্র হয়ে আল্লাহর জিকির সহকারে ঘুমানো একান্ত আবশ্যক। কেননা এতে সে ব্যক্তি সারা রাত ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হয়।

وَعَنْ ١١٨٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثَارَ عَنْ وِطَائِهٖ

১১৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের প্রভু দু' প্রকার লোকেরা ব্যাপারে খুব সন্তুষ্ট হন- (১) এমন ব্যক্তি যে, তার নরম বিছানা ও গরম লেপ ত্যাগ

وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حُبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلَى صَلٰوةٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَ وِطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حُبِّهِ وَاَهْلِهِ اِلٰى صَلٰوةٍ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِىْ وَ رَجُلٌ غَزَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ مَعَ اَصْحَابِهِ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِى الْاِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِى الرُّجُوْعِ فَرَجَعَ حَتّٰى هُرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِمَلٰئِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِىْ وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِىْ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

করে নিজের প্রিয়তমা স্ত্রী ও আপন পরিবারের নিকট হতে নামাজের জন্য সাগ্রহে উঠে গেল, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে দেখিয়ে নিজের ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দার দিকে দেখ। সে তার নরম শয্যা ও গরম লেপ ত্যাগ করে তার প্রিয়তমা স্ত্রীলোকের ও তার পরিবারের নিকট হতে নামাজের জন্য উঠে এসেছে, আমার নিকট যে জিনিস আছে তার আগ্রহে [অর্থাৎ ছওয়াবের আগ্রহে] এবং আমার নিকট যে জিনিস আছে [অর্থাৎ শাস্তি] তার ভয়ে। আর (২) যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পরাজিত হয়ে নিজের সঙ্গীদের ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করেছে, অতঃপর সে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শনে কি অপরাধ রয়েছে এবং জিহাদে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের মধ্যে কি ছওয়াব রয়েছে, অতঃপর জিহাদের দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছে এবং শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তাতে তার রক্তপাত হয়েছে [শহীদ হয়েছে], তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে দেখ, আমার নিকট যে জিনিস [পুরস্কার] আছে, তার আগ্রহে এবং আমার নিকট যে জিনিস [শাস্তি বা তিরস্কার] আছে, তার ভয়ে সে জিহাদের দিকে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেছে [শেষ পর্যন্ত তার রক্তপাত হয়েছে অর্থাৎ সে শহীদ হয়েছে।] -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে দু'টি জিহাদের ফজিলত ও মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো আত্মা বা প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ। অন্য হাদীসে একে কঠোরতম জিহাদ বলা হয়েছে; যেমন- اَشَدُّ الْجِهَادِ جِهَادُ الْهَوٰى হাদীসে বর্ণিত প্রথমটি হলো এটাই। আর দ্বিতীয়টি হলো শরয়ী জিহাদ যা জান মাল সহকারে কাফিরের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। সার কথা কাজ উভয়টিই কষ্টসাধ্য। কেমন দৃঢ় প্রত্যয়ের ঈমানের অধিকারী হলে এ দু'টি কাজ করা সম্ভব হয় তা সহজেই অনুমেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এদের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١١٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ قَالَ فَاَتَيْتُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَأْسِهِ فَقَالَ مَالَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ

১১৮৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বলা হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়া [ছওয়াবের বেলায়] দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলাম, দেখলাম তিনি বসে বসে নামাজ পড়ছেন। এটা দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং তাঁর মাথার উপর হাত রাখলাম। তখন হুজুর ﷺ বললেন, কি

عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلٰى نِصْفِ الصَّلٰوةِ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِنْكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

হে! আমরের পুত্র আব্দুল্লাহ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি না কি বলেছেন, কোনো ব্যক্তির বসে নামাজ পড়ায় তার দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার অর্ধেক ছওয়াব, অথচ আপনি নিজেই বসে বসে নামাজ পড়ছেন। হুজুর ﷺ বললেন, অবশ্যই [তুমি যা বলেছ তা সত্য] তবে [আমার ব্যাপারটা স্বতন্ত্র।] আমি তোমাদের কারো মতো নই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কথা বলার সময় হাতে হাত দেওয়া, কাঁধে বা মাথায় হাত রাখার নির্দোষ ও নিঃসংকোচ রীতি-নীতির প্রচলন আরব দেশে আবহমান কাল হতেই চলে এসেছে। এমনকি আজকালও এটা প্রচলিত আছে। তবে আল্লাহর রাসূলের মাথার উপর হাত রাখা বেয়াদবির অন্তর্গত নিশ্চয়ই এবং এটাও সত্য যে, যে কোনো সাহাবীই হুজুর ﷺ -কে সম্ভ্রম করতেন। কোনো সময় কেউই হুজুর ﷺ-এর কাঁধে বা মাথায় হাত রাখতেন না। তবে এখানে আব্দুল্লাহর এই আচরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সম্ভবত আব্দুল্লাহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, আশ্চর্যে অভিভূত হয়েই হুযূরের পবিত্র মাথার উপরে হাত রেখেছিলেন। যেহেতু তখনকার দিনে বিস্ময় প্রকাশের প্রতীকই ছিল মাথায় হাত রাখা। এ কারণে হুজুর ﷺ একে স্বাভাবিক আচরণ হিসাবেই ধরে নিয়েছেন এবং সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করেছেন। হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায়, হুজুর ﷺ-এর নামাজ পড়া শেষ হওয়ার পরই আব্দুল্লাহ হুযূরের মাথার উপরে হাত রেখেছিলেন।

আর আমি তোমাদের কারো মতো নই এ কথার মর্মার্থ হলো, আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ হলেও আমি একজন নবী। তাই আমি বসে পড়লেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে দাঁড়িয়ে পড়ার ছওয়াব দান করবেন।

وَعَنْ ١١٨٤ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ لَيْتَنِىْ صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ فَكَاَنَّهُمْ عَابُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ يَابِلَالُ اَرِحْنَا بِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১৮৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সালেম ইবনে আবুল জা'দ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খোযা'আ গোত্রের এক ব্যক্তি একদা বলল, 'যদি আমি নামাজ পড়তে পারতাম, তবে আরাম পেতাম।' উপস্থিত লোকেরা যেন তার এ কথার মধ্যে দোষের সন্ধান পেল। এটা উপলব্ধি করে সে তাদের ভুল ধারণা নিরসনের জন্য বলল, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলালকে বলতেন, হে বেলাল! নামাজের একামত বা আযান দাও এবং এটা দ্বারা আমাকে শান্তি দান কর। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নামাজ আদায়ের মাধ্যমে দু' ধরনের শান্তি বা আরাম পাওয়া যায়, প্রথমত ফরজ নামাজ আদায়ের ফলে কর্তব্য সম্পাদনের ফলে মনে আরাম ও শান্তি অনুভূত হয়। দ্বিতীয়ত নামাজে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হলে দুনিয়ার সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে মনে শান্তির সৃষ্টি হয়।

بَابُ الْوِتْرِ

পরিচ্ছেদ : বিতর নামাজ

اَلْوِتْرُ শব্দটি وَاوْ বর্ণের উপর যবর অথবা নিচে যের দিয়ে উভয়ভাবে পড়া জায়েজ। এটি একবচন, বহুবচনে اَوْتَارٌ শাব্দিক অর্থ– বেজোড়। এর বিপরীত শব্দ হলো شَفْعَةٌ এখানে বিতর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিতর নামাজ। বিতর নামাজ সম্পর্কে অনেকগুলো মাসআলা রয়েছে, যা আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١١٨٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهٗ مَا قَدْ صَلّٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৮৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের নামাজ দু' দু' রাকাত করে জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা করে সে এক রাকাত নামাজ [শেষের দিকে] পড়বে। এটা তার পূর্বে আদায়কৃত জোড় নামাজকে বিতর অর্থাৎ বেজোড় করে দেবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতর নামাজ সম্পর্কে মতভেদ : বিতর নামাজ মোট কয় রাকাত এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, আইম্মায়ে সালাসা অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও মালেকের অভিমত হলো, বিতর নামাজ এক হতে সাত রাকাত পর্যন্ত পড়া জায়েজ, এর অতিরিক্ত নয়। এ ইমামদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। এমনকি ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একারই কয়েকটি মত রয়েছে। যেমন– (১) বিতর নামাজ এক রাকাত। (২) বিতর নামাজ দু' সালামের সাথে তিন রাকাত। (৩) বিতর নামাজ তিন রাকাত, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুযায়ী। (৪) ইমাম শাফেয়ীর চতুর্থ অভিমত হলো, নামাজি ইচ্ছানুযায়ী এক রাকাত, তিন রাকাত, পাঁচ রাকাত, সাত রাকাত, নয় রাকাত বা এগারো রাকাত পড়তে পারবে।

※ উল্লেখ্য ইমাম মালেক (র.)-কে বিতর নামাজ এক রাকাত প্রবক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও মুয়াত্তায়ে মালেকে দেখা যায় যে, বিতর নামাজ এক রাকাত পড়া তাঁর নিকট জায়েজ নয়। মুয়াত্তায় হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে كَانَ يُوْتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ এর পরেই ইমাম মালেকের কথা এভাবে এসেছে যে,

وَلَيْسَ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ وَلٰكِنْ اَدْنَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ

※ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর অভিমত ইমাম শাফেয়ীর মতের অনুকূলে হলেও মাআরেফুস্ সুনানের (৪র্থ খণ্ড– ২২০ পৃ.) মধ্যে ইমাম নববী উল্লেখ করেন যে, ইমাম আহমদ (রা.)-এর এক অভিমত ইমাম আবূ হানীফার অনুকূলে। অতএব ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত আর কেউই জোরালোভাবে এক রাকাতের প্রবক্তা নন।

ইমাম আবূ হানীফা, সুফয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক প্রমুখের মতে বিতর নামাজ এক সালামে তিন রাকাত। এটা নির্ধারিত। এক রাকাত পড়লে তা আদায় হবে না। সাহাবী, তাবেয়ী ও ফোকাহাদের মধ্যে যারা এ মতে ছিলেন তাঁরা হলেন আমর (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), হুযায়ফা (রা.), উবাই ইবনে কা'ব (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আনাস (রা.), আবূ উমামা (রা.), ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.), সাতজন ফোকাহা (اَلْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ) ও কূফাবাসীগণ।

প্রথম পক্ষের দলিল : ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং তাঁর সমর্থকগণ সে সমস্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেছেন যাতে أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ হতে يُسَبِّحُ শব্দ রয়েছে। নিম্নে এ ধরনের কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى إِذَا خَشِىَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ . (رَوَاهُ دَارَقُطْنِى)

(٤) عَنْ عَائِشَةَ (رض) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ وَّيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ أَىْ بِرَكْعَةٍ وَيَسْجُدُ بِسَجْدَتَىِ الْفَجْرِ فَذٰلِكَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা নিজেদের অভিমতের পক্ষে দলিল পেশ করেন–

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَا يُسَلِّمُ فِىْ رَكْعَتَىِ الْوِتْرِ .

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ أَىْ كَصَلٰوةِ الْمَغْرِبِ .

(٤) عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

(٥) عَنْ عَلِىٍّ (رض) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

(٦) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ دَفَنَّا أَبَابَكْرٍ لَيْلًا فَقَالَ عُمَرُ (رض) إِنِّىْ لَمْ أُوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَائَهُ فَصَلّٰى بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ .

(٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رض) بِكَمْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَّثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

(٩) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) بِأَىِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

উল্লেখ্য যে, বিতর নামাজ যে তিন রাকাত উপরোক্ত হাদীসমূহ দ্বারা তা সাব্যস্ত হয়। এছাড়াও তিন রাকাতের অনুকূলে অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে পরিত্যাগ করা হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে জবাব : ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্য ইমামগণ যে দলিল প্রদান করেছেন, তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের উত্তরে বলা যায় যে, তাতে يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ কথা রয়েছে, এর দ্বারা একথা বুঝান উদ্দেশ্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র এক রাকাত পড়ে বিতর আদায় করতেন; বরং এর উদ্দেশ্য হলো তিনি দু' দু' রাকাত করে পড়তেন এবং শেষের দু' রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর বা বেজোড় করতেন। আর এ জন্যই বলা হয়েছে تُوْتِرُ لَهُ مَاقَدْ صَلّٰى

৪. চতুর্থ দলিলে 'দারাকুতনী'তে বর্ণিত أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ হাদীস নেওয়া হয়েছে। এর উত্তর হলো, দু' রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিত করে বিতর বা বেজোড় করতে হবে।

وَعَنْهُ ١١٨٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, বিতর হলো এক রাকাত নামাজ রাতের শেষাংশে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١١٨٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِىْ شَيْءٍ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৮৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে [কখনো কখনো] তেরো রাকাত নামাজ পড়তেন। তন্মধ্যে পাঁচ রাকাত বিতর পড়তেন, যার শেষ রাকাত ছাড়া তিনি আর কোথাও বসতেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَا يَجْلِسُ فِىْ شَيْءٍ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهَا -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তেরো রাকাত নামাজ পড়তেন এবং এর শেষ পাঁচ রাকাত এক সালামে সমাপ্ত করতেন। রাসূল ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। আর অন্যান্য হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক দু' দু' রাকাতের পর সালাম ফিরাতেন। অথচ এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি পাঁচ রাকাতের মধ্যে কোথাও বসতেন না। অতএব স্বভাবতই হাদীসগুলোর মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। হাদীস বিশারদগণ এর সমাধান নিম্নরূপ প্রদান করেছেন–

প্রথমত বলা যায় যে, لَا يَجْلِسُ فِىْ شَيْءٍ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهَا -এর দ্বারা সে সমস্ত হাদীসের ভাষ্য রহিত করা উদ্দেশ্য, যাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এগারো রাকাত নামাজ পড়তেন এবং প্রত্যেক রাকাতে সালাম ফিরাতেন।

দ্বিতীয়ত আলোচ্য হাদীস দ্বারা এক বৈঠকে এবং এক সালামে পাঁচ রাকাত নামাজ সমাপ্ত করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত পাঁচ রাকাতের প্রথম তিন রাকাত হলো বিতরের এবং বাকি দু' রাকাত বিতর-পরবর্তী নফল। আর এ দু' রাকাত বিতরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে রাসূল ﷺ তিন রাকাতের পর না বসেই পাঁচ রাকাত আদায় করে ফেলতেন।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা আরফুশ শাযীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত পাঁচ রাকাতের প্রথম তিন রাকাত ছিল বিতরের এবং দু' রাকাত বিতরের পরের নফল নামাজ, যা তিনি একই সালামে সমাপ্ত করতেন।

وَعَنْ ١١٨٨ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ (رحـ) قَالَ اِنْطَلَقْتُ اِلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قُلْتُ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ الْقُرْاٰنُ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْبِئِيْنِىْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهٗ سِوَاكَهٗ وَطُهُوْرَهٗ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَاشَاءَ

১১৮৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সা'দ ইবনে হিশাম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আখ্লাক-চরিত্র সম্পর্কে কিছু অবহিত করুন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি কি কুরআন পড় না? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ-নিশ্চয়ই পড়ি। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ -এর আখ্লাক-চরিত্র ছিল কুরআন। [অর্থাৎ কুরআনে যে উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, এর সবই তাঁর চরিত্রে ছিল।] অতঃপর আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এবার আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর

أَنْ يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ فِي الْأُوْلٰى فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى صَلٰوةً أَحَبَّ أَنْ يُّدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ كُلَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ وَلَا صَلّٰى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বিতর নামাজ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তার মেস্ওয়াক এবং অজুর পানি প্রস্তুত রাখতাম এবং আল্লাহ তা'আলা রাতে যখন চাইতেন তাঁকে উঠিয়ে দিতেন এবং তিনি মেস্ওয়াক করতেন এবং অজু করতেন। তারপর নয় রাকাত নামাজ পড়তেন, যার অষ্টম রাকাত ব্যতীত আর কোথাও বসতেন না। অষ্টম রাকাতে বসে তিনি আল্লাহ্‌র জিকির, হাম্‌দ ও ছানা এবং দোয়া করতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে যেতেন-সালাম ফিরাতেন না। তারপর নবম রাকাত পড়তেন এবং বসতেন আর আল্লাহর জিকির, হাম্‌দ, ছানা ও দোয়া করতেন অতঃপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর [অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পর] বসে বসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। এই মিলিয়ে মোট এগারো রাকাত হতো। হে বৎস! যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বয়োবৃদ্ধ হলেন এবং শরীর ভারি হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদ সহ সাত রাকাতে বিতর নামাজ পড়তেন এবং দু' রাকাত পূর্বের ন্যায় বসে বসে আদায় করতেন, এই সহ মোট নয় রাকাত হতো। হে প্রিয় বৎস! নবী ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন কোনো নফল নামাজ পড়তেন তা নিয়মিত পড়তে ভালবাসতেন এবং যখন নিদ্রার প্রভাবের কারণে অথবা কোনো রোগের দরুন রাতের নামাজ হতে বিরত থাকতেন, তখন দিনের বেলায় বারো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন। এটা ছাড়া আমি অবগত নই যে, মহানবী ﷺ কখনও এক রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেছেন অথবা ভোর পর্যন্ত সমস্ত রাত নামাজে কাটিয়েছেন; না রমজান মাস ব্যতীত কোনো পূর্ণমাস রোজা রেখেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَانَ الْقُرْاٰنُ خُلُقُ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ -এর ব্যাখ্যা : "নবী করীম ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন"– মুহাদ্দিসগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ কথার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—

১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা কুরআনের সেই সমস্ত আয়াতাবলিকে বুঝানো হয়েছে, যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-কে উত্তম চরিত্র গ্রহণের এবং খারাপ চরিত্র হতে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ অর্থাৎ বাহ্যিক [দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে] আচরণ [সমীচীন মনে হয় তা] গ্রহণ করুন আর ভাল কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খদের হতে একদিকে সরে থাকুন। [আ'রাফ ঃ ১৯৯] এ ধরনের আরো অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যথা–

١ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ [লোকমান : ১৭]
٢ . قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ (الاية) [নাহল : ৯০]
٣ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ [মায়েদা : ১৩]
٤ . وَادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ [হা-মীম-আস সাজদা : ৩৪]
٥ . وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ [আলে ইমরান : ১৩৪]

২. অথবা হযরত আয়েশা (রা.) كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, রাসূল ﷺ ছিলেন আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত পথই ছিল রাসূলের চরিত্র।

৩. যে সমস্ত উত্তম চরিত্র, শিষ্টাচার উল্লিখিত হয়েছে এর আলোকে এক কথায় বলা যায়, কুরআনে বিবৃত যাবতীয় উত্তম চরিত্রের সমন্বয় ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে। যার সুস্পষ্ট ইশারা পাওয়া যায় রাসূল ﷺ-এর নিম্নোক্ত উক্তির মাঝে। রাসূল ﷺ বলেন, بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

৪. কারো মতে এর অর্থ হলো, কুরআনেই তাঁর চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আপনি মহৎ চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।

৫. আল্লামা যুরকানী (র.) বলেন, কুরআনের হুকুম-আহকাম পালনের ক্ষেত্রে, এর শিষ্টাচারে শিষ্টাচারী হওয়ার বেলায় এবং এতে বর্ণিত দৃষ্টান্ত ও ঘটনাসমূহ অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারে কুরআন হলো রাসূল ﷺ-এর চরিত্র।

৬. আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র.) كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ-এর অর্থ বর্ণনায় বলেন, কুরআনের আহকাম ও তার শিক্ষা রাসূল ﷺ-এর সেই স্বভাবগত চরিত্রের ন্যায়, যার উপর রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সংক্ষেপে বলা চলে, কুরআন হলো জ্ঞানভাণ্ডার, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন, সেই ভাণ্ডারের যথার্থ ও বাস্তব অনুসারী।

لَا يَجْلِسُ فِيْهَا اِلَّا فِي الثَّامِنَةِ -এর ব্যাখ্যা : 'অষ্টম রাকাত ছাড়া তাশাহহুদের জন্য বসতেন না' বাক্যটি 'সিয়াকে কালাম' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ এর অর্থ বলেন যে, তাশাহহুদের জন্য বসার অর্থই হলো সালাম ফিরিয়ে নামাজ সমাপ্ত করা। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি মোটেই বসতেন না। বরং অর্থ এই যে, তিনি বসতেন, কিন্তু সালাম ফিরিয়ে নামাজ সমাপ্ত করতেন না। নতুবা এ হাদীসটি সহীহ হাদীস সমূহের বিপরীত হয়ে পড়ে। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক দু' রাকাতের পরে বৈঠক আছে। দু' রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হোক, বা তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজই হোক, আট রাকাত নামাজ একসাথে পরলেও প্রতি দু' রাকাতে বৈঠক হবে।

'অতঃপর দু' রাকাত বসে পড়তেন' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিতরকে রাতের শেষ নামাজ বলা হলেও এরপর নফল পড়া যে জায়েজ তা আমাদেরকে বুঝাবার জন্যই কখনো কখনো উক্ত দু' রাকাত বিতরের পর পড়েছেন।

বিতরের পর দু' রাকাত নামাজের হুকুম : বিতরের পর দু' রাকাত নামাজ পড়া জায়েজ কিনা এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে বিতরের পরের দু' রাকাত নামাজ পড়তে হবে না। তিনি রাসূলের হাদীস اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا উল্লেখ করে বলেন, রাসূল ﷺ এ হাদীস দ্বারা রাতের শেষ নামাজ বিতর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, বিতরের পর কোনো নামাজ নেই।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, বিতরের পরের দু' রাকাত নামাজ আমি পড়ি না, অবশ্য কেউ পড়লে তা আমি নিষেধ করি না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (র.) হতে এ সম্পর্কে কোনো অভিমত পাওয়া যায়নি। কিন্তু মূল কথা হলো, বিতরের পরে দু' রাকাত নামাজ বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। জমহুর ওলামা এ কথাই বলেছেন। এ কথার সমর্থনের হাদীসগুলো নিম্নরূপ–

(١) عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ .

(٢) عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتْ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ . (طَحَاوِيْ . بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْوِتْرِ)

(٣) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوْتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ . (مُسْلِمْ . بَابُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ)

(٤) عَنْ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ (سُنَنُ دَارِ قُطْنِيْ . بَابٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ)

(٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ وَإِذَا زُلْزِلَتْ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَاۤأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ .

তাঁদের জবাব : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীসে বিতর দ্বারা রাতের নামাজ শেষ করতে বলেছেন, পক্ষান্তরে অন্যান্য অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতরের পরে দু' রাকাত নামাজ রয়েছে। উভয় হাদীসের সমাধান নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. সহীহ হাদীস দ্বারা বিতরের পর দু' রাকাত নামাজ সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষাপটে اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا -এর সমাধান এভাবে দেওয়া যায় যে, উক্ত হাদীসের নির্দেশ দ্বারা মোস্তাহাব বুঝানো হয়েছে, ওয়াজিব বুঝানো হয়নি। অর্থাৎ রাতে সর্বশেষে বিতর নামাজ পড়া মোস্তাহাব।

২. অথবা এর উত্তরে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, শেষের দু' রাকাত পড়া হয় বিতরের পরিপূর্ণতার জন্য। সুতরাং এ দু' রাকাত বিতরেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ দু' রাকাতের মাধ্যমে নামাজ শেষ করলে মূলত বিতর দ্বারাই শেষ করা হয়েছে বলা যাবে। আল্লামা ইবনুল কায়্যিমও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩. আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে শেষে দু' রাকাত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু জায়েজের ভিত্তিতেই হয়েছে। রাসূল ﷺ মাঝে মধ্যে তা পড়তেন, সর্বদা তিনি এটা আদায় করতেন না।

وَعَنْ ١١٨٩ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৮৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের রাতের শেষ নামাজকে বিতর বা বেজোড় করবে। –[মুসলিম]

وَعَنْهُ ١١٩٠ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৯০. অনুবাদ : উক্ত হযরত ইবনে ওমর (রা.), রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তোমরা সুবহে সাদেকের পূর্বেই তাড়াতাড়ি বিতর পড়ে নেবে।

وَعَنْ ١١٩١ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَنْ لَّا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَّقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلٰوةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ أَفْضَلُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১১৯১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির এ আশঙ্কা রয়েছে যে, শেষ রাতে উঠতে পারবে কি-না, সে যেন প্রথম রাতেই বিতর নামাজ পড়ে নেয়। যার শেষ রাতে উঠার নিশ্চয়তা আছে সে যেন শেষ রাতেই বিতর পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামাজে [আল্লাহর রহমত নিয়ে] রহমতের ফেরেশতাগণ হাজির থাকেন। এটাই [অর্থাৎ বিতর শেষ রাত্রে পড়াই] হলো উত্তম কাজ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতরের সময় নিয়ে মতপার্থক্য : বিতরের নামাজের সময় সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–

ইমাম শাফেয়ী, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) সহ যারা বলেন, বিতর নামাজ সুন্নত, তাঁদের মতে বিতরের ওয়াক্ত হলো এশার পর। এশার সাথে সাথে নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এশার যে সময় বিতরেরও ঠিক একই সময়। উভয় মাযহাব মতে এশার পূর্বে বিতর নামাজ আদায় করা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে, বিতরের মূল ওয়াক্ত যখনই হোক না কেন এর মোস্তাহাব সময় হলো শেষ রাত। কেননা এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ تَارَةً يُوْتِرُ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَتَارَةً فِيْ اَوْسَطِ اللَّيْلِ وَتَارَةً فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَارَ وِتْرُهٗ فِيْ اٰخِرِ عُمْرِهٖ فِيْ اٰخِرِ اللَّيْلِ.

শেষ রাতের বিতর সে ব্যক্তির জন্য মোস্তাহাব, যার ঘুমের কারণে বিতর ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, আর যদি ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে এশার পর পরই পড়া ওয়াজিব।

اِنَّ صَلٰوةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ-এর ব্যাখ্যা : শেষ রজনীতে নামাজে লিপ্ত থাকা অতি উত্তম আমল। এ সময় আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ নামাজির নিকট উপস্থিত থাকেন এবং এ ব্যক্তির জন্য তাঁরা আল্লাহর নিকট রহমত ও মাগফিরাতের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজকে শেষ রজনীতে পড়ার কথা আলোচ্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ١١٩٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَاَوْسَطِهٖ وَاٰخِرِهٖ، اِنْتَهٰى وِتْرُهٗ اِلَى السَّحَرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৯২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের প্রত্যেক অংশেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ পড়েছেন। রাতের প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে এবং এর শেষ ভাগে; তাঁর বিতরের শেষ সময় ছিল রাতের শেষ অর্থাৎ সাহরীর সময় পর্যন্ত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : এশার নামাজের পর হতে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত বিতর নামাজের ওয়াক্ত বিদ্যমান সুতরাং এর মধ্যে যে কোনো সময়ে পড়লেই তা আদায় হয়ে যাবে।

وَعَنْ ١١٩٣ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلٰثٍ صِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১১৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন– (১) প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখতে। (২) দু' রাকাত চাশ্‌তের নামাজ পড়তে এবং (৩) ঘুমাবার পূর্বে বিতর নামাজ আদায় করতে। [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে তিনটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন– প্রথমত প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোজা রাখা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোজা. এই তিন দিনকে আইয়্যামে বীজ বলা হয়।

কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাসের প্রথম মধ্যম ও শেষ তারিখের রোজা।
কারো মতে প্রথম দশ দিনের মধ্যে পালিত রোজা।
কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সাধারণভাবে মাসের যে কোনো তিন দিনের রোজাকে বুঝানো হয়েছে।
দ্বিতীয়ত সর্বনিম্ন দু' রাকাত চাশতের নামাজ পড়া।
তৃতীয়ত ঘুমাবার পূর্বে বিতরের নামাজ পড়ে নেওয়া।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١١٩٤ - عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ (رحـ) قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ (رضـ) اَرَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَمْ فِيْ اٰخِرِهٖ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِيْ اٰخِرِهٖ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَمْ فِيْ اٰخِرِهٖ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِيْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِيْ اٰخِرِهٖ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَخْفِتُ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهٖ وَ رُبَّمَا خَفَتَ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْاَمْرِ سَعَةً . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلَ الْاَخِيْرَ)

১১৯৪. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত গুদাইফ ইবনে হারেছ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি দেখেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাকির গোসল [তাড়াতাড়ি] প্রথম রাতেই করতেন, নাকি শেষ রাতে করতেন। তিনি জবাবে বললেন, অনেক সময় তিনি প্রথম রাতে গোসল করতেন এবং অনেক সময় তিনি শেষ রাতে গোসল করতেন। আমি বললাম অর্থাৎ 'আল্লাহ অতি মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন'। আমি পুনরায় আরজ করলাম, রাসূল ﷺ কি প্রথম রাতে বিতর পড়তেন, না শেষ রাতে পড়তেন? তিনি [আয়েশা (রা.)] বললেন, 'তিনি অনেক সময় প্রথম রাতে বিতর পড়তেন, আবার অনেক সময় শেষ রাতে বিতর পড়তেন'। আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার ; যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।' আমি আবারও আরজ করলাম, রাসূল ﷺ কি [তাহাজ্জুদ] নামাজের কেরাত সশব্দে পাঠ করতেন, নাকি নিঃশব্দে পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি অনেক সময় সশব্দে কেরাত পাঠ করতেন। আবার অনেক সময় নিঃশব্দে কেরাত পাঠ করতেন। আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার; যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।' –[আবূ দাউদ। ইবনে মাজাহ্ হাদীসটির শেষাংশ বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাবী গুজাইফ ইবনে হারেছ হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূল ﷺ -এর তিনটি আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আর তা হলো– (১) রাসূল ﷺ ফরজ গোসল কখন করেন, (২) বিতর নামাজ কখন পড়েন এবং (৩) রাতের [তাহাজ্জুদ] নামাজে তিনি কোন ধরনের কেরাত পাঠ করেন। উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরজ গোসল কখনও রাতের প্রথমভাগে করতেন, আবার কখনো শেষ রাতে করতেন। বিতর নামাজ তিনি

রাতের প্রথম এবং শেষ উভয় সময়ই পড়তেন। আর তাহাজ্জুদ নামাজে মাঝে মধ্যে কেরাত সজোরে পাঠ করতেন, আবার নীরবেও পড়তেন। এটা শুনে রাবী প্রত্যেক বারই বলেছেন, "আল্লাহু আকবার, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি শরিয়তের আদেশকে প্রশস্ত করেছেন।" মূলত শরিয়তের যাবতীয় আহকামই আল্লাহ তা'আলা মানুষের সহজে পালনীয় করে প্রণয়ন করেছেন। যেমন– অন্য হাদীসে এসেছে যে, اَلدِّيْنُ يُسْرٌ অর্থাৎ, দীন ও শরিয়ত সহজ ও সরল। আর এরই জ্বলন্ত প্রমাণ হলো এ অধ্যায়ের বর্ণিত হাদীসটি।

وَعَنْ ١١٩٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ (رضـ) بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَّثَلٰثٍ وَسِتٍّ وَثَلٰثٍ وَثَمَانٍ وَثَلٰثٍ وَعَشْرٍ وَثَلٰثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلٰثَ عَشَرَةَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১১৯৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কায়েস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট আরজ করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কত রাকাত বিতর নামাজ পড়তেন? জবাবে তিনি বললেন, কখনো তিনি চার রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে বেজোড় করতেন, কখনো ছয় রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে, কখনো আট রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে, আবার কখনো দশ রাকাতের সাথে তিন রাকাত পড়ে বেজোড় করতেন। কিন্তু কখনো [তাহাজ্জুদসহ] সাত রাকাতের কম বিতর পড়তেন না এবং তেরো রাকাতের অধিকও পড়তেন না। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামাজ তিন রাকাত আর বাকিগুলো হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। তবে এখানে রূপকভাবে বিতরকে তাহাজ্জুদ নামাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

وَعَنْ ١١٩٦ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِثَلٰثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১১৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিতর প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে জরুরি। অবশ্য যে পাঁচ রাকাত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে। আর যে তিন রাকাত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে এবং যে এক রাকাত বিতর পড়তে পছন্দ করে সে তা করতে পারে। [আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَلٰوةُ الْوِتْرِ وَاجِبٌ اَمْ سُنَّةٌ **বিত্‌রের নামাজ ওয়াজিব না সুন্নত :** বিত্‌রের নামাজের হুকুমের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত হলো, বিত্‌র নামাজ ওয়াজিব। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, আবূ ওবায়দা, যাহ্‌হাক, মুজাহিদ প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, বিত্‌র নামাজ সুন্নত। সাহেবাইন (র.)-ও এ মত সমর্থন করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের অনুকূলে দলিল হিসেবে বহু হাদীস উপস্থাপন করা যায়, যার কিছু নিম্নরূপ–

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

আলোচ্য হাদীসে বিতর অনাদায়কারীকে فليس منا বলে বারবার উল্লেখ করেছেন, কাজেই বিতর ওয়াজিব, এটা এর দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

(٢) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا اَصْبَحَ اَوْ ذَكَرَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ)

এতে বিতরের কাজা পড়ার নির্দেশ রয়েছে। অথচ ওয়াজিব ব্যতীত সুন্নতের কোনো কাজা নেই।

(٣) عَنْ عَلِيٍّ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

(٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ . (رَوَاهُ الْبَزَّارُ)

(٥) عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ الخ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মালেক ও সাহেবাইনের দলিল ঃ

(١) رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ ثَلٰثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ اَلْوِتْرُ وَالضُّحٰى وَالْاَضْحٰى .

(٢) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

(٤) وَفِيْ حَدِيْثِ الْاَعْرَابِيِّ اَنَّهُ سَئَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ)

(٤) قَالَ عَلِيٌّ (رض) اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

এ সকল হাদীস-দ্বারা বিতির নামাজ সুন্নত প্রমাণিত হয়।

হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলসমূহের জবাব–

১. তাঁদের প্রথম দলিল كُتِبَتْ عَلَيَّ -এর জবাবে বলা যায় যে, এর দ্বারা বিতরের ফরযিয়্যাতকে অস্বীকার করা হয়েছে; ওয়াজিবকে নয়। কেননা كُتِبَ শব্দটি ফরজকে বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়, যেমন কুরআনে এসেছে–
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

২-৩. তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলিলের জবাবে বলা যায় যে, এগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত আর কোনো ফরজ নামাজ নেই, যা আমাদেরও অভিমত, কিন্তু এর দ্বারা বিতর নামাজ যে ওয়াজিব নয় তা সাব্যস্ত করে না।

৪. চতুর্থ দলিলের জবাবে বলা যায় যে, এখানে لَيْسَ بِحَتْمٍ অর্থ لَيْسَ بِفَرْضٍ পরবর্তী বাক্য كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ -এর সুস্পষ্ট প্রমাণ, অর্থাৎ বিতর অন্যান্য ফরজ নামাজের মতো নয়।

١١٩٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১১৯৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ স্বয়ং বেজোড়, তিনি ভালবাসেন বেজোড়কে। সুতরাং হে কুরআনের অনুসারী সম্প্রদায় [মুসলমানগণ]! তোমরা বেজোড় [বিতর] নামাজ পড়ো। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ -এর মর্মার্থ : 'আহলুল কুরআন' দ্বারা সাধারণভাবে সে সকল মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা কুরআনের উপর পূর্ণ ঈমান এনেছে। চাই তা পড়তে সক্ষম হোক আর নাই হোক। অথবা যে ব্যক্তি এটা সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেছে অথবা মুখস্থ করেছে, এর মর্মার্থ উপলব্ধি করেছে, এর হুকুম-আহকাম যথারীতি পালন করেছে এবং এর সীমারেখার অনুসরণ করেছে, সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ١١٩٨ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَمَدَّكُمْ بِصَلٰوةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ اَلْوِتْرِ جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّطْلُعَ الْفَجْرُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১১৯৮. অনুবাদ : হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে একটি নামাজের দ্বারা সাহায্য করেছেন [অর্থাৎ পাঁচ নামাজ হতেও আরও অতিরিক্ত একটি নামাজ দান করেছেন] এটা তোমাদের জন্য লাল উট হতেও শ্রেয়। তা হলো বিতর নামাজ। আল্লাহ তা'আলা এটা তোমাদের জন্য এশার নামাজ এবং সুবহে সাদেক উদিত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, লাল উট আরবদের কাছে অতি প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ। তাই তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ١١٩٩ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رحـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

১১৯৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [কোনো কারণবশত] বিত্র না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে যেন সকাল বেলায় তা কাযা আদায় করে। -[তিরমিযী মুরসাল হিসাবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতর নামাজ কাযা করার হুকুম : কারো বিতর নামাজ ছুটে গেলে তা যে কাযা পড়তে হবে, এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী এবং আইম্মায়ে মুজতাহেদীনগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে আদায়ের সময় ও পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কাযার পক্ষে যাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারা হলেন সাহাবীদের মধ্যে- হযরত আলী (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), ইবনে ওমর (রা.), উবাদা ইবনে সামেত (রা.), আমের ইবনে রাবীয়া (রা.), আবুদ দারদা (রা.) মু'আয ইবনে জাবাল (রা.), ফুজালা ইবনে উবাইদ (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)। তাবেয়ীদের মধ্যে- আমার ইবনে শুরাহ্বীল, উবাইদাতুস্ সালমানী, ইবরাহীম নাখয়ী, মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির, আবুল আলিয়া ও হাম্মাদ ইব্নে আবী সুলাইমান (র.)। ইমামদের মধ্যে- ইমাম আবূ হানীফা, সুফয়ান সাওরী, আওযায়ী, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসাহক (র.) প্রমুখ।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِيْ وَقْتِ الْقَضَاءِ কাযা আদায়ের সময় সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : বিতর নামাজ কাজা হয়ে গেলে তা কখন আদায় করতে হবে এই বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আতা ইবনে আবী রাবাহ, মাসরূক, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, মাকহুল, কাতাদা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে ফজর নামাজ আদায়ের পূর্বে বিতর নামাজ কাজা করতে হবে।

২. ইমাম নাখয়ীর অপর আর একটি অভিমত হলো, সূর্য উদয়ের পূর্বে বিতর কাজা করতে হবে, চাই তা ফজর নামাজের পরে হোকনা কেন।

৩. শা'বী, আতা, হাসান, তাউস, মুজাহিদ প্রমুখের মতে সুবহে সাদেকের পরে এবং সূর্য উদয়ের পর তা পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিতর নামাজের কাযা আদায় করা যায়। এটা হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও অভিমত।

৪. আল্লামা আওযায়ী (র.) বলেন, সুবহে সাদেকের পর সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে বিতর কাযা করা যাবে না। এটা দিনে সূর্যোদয়ের পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কাযা করতে হবে। আসরের পর কাযা করা যাবে না। আবার মাগরিবের পর এশার পূর্বে কাযা করতে হবে, যাতে একই রাতে দু'টি বিত্‌র একত্র না হয়।

৫. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ফতোয়া হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ন্যায়। তাঁদের মতে রাত দিনে যে কোনো সময়ই বিতর নামাজের কাযা আদায় করা যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) আরো বলেন, রাতে যদি বিতর নামাজ না পড়ে এবং ফজর পড়ার পূর্বে তার স্মরণ হয় তবে তা আদায় না করে ফজর নামাজ পড়লে ফজর নামাজ হবে না।

وَعَنْ ١٢٠٠ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ (رحـ) قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ (رضـ) بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَالدَّارِمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرَا وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ) .

১২০০. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সূরা দ্বারা বিতর নামাজ পড়তেন? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, রাসূল ﷺ প্রথম রাকআতে সূরা 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকাতে সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ও কুল আউযুদ্বয় পাঠ করতেন। -[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

নাসায়ী উক্ত হাদীস আবদুর রহমান ইবনে আবযা হতে, আহমদ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে এবং দারেমী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে আহমদ ও দারেমী 'কুল আউযু' সূরা দু'টির কথা উল্লেখ করেননি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيَانُ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْوِتْرِ **বিতর নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেরাত :** কোনো নামাজ নির্দিষ্ট কোনো সূরা দ্বারা পড়া জরুরি নয়। হুজুর ﷺ ও কোনো নামাজের জন্য কোনো সূরা নির্দিষ্ট করে পড়তেন না। অবশ্য অধিকাংশ সময় যা পড়তেন, হযরত আয়েশা (রা.) তাই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আমাদের জন্য সেই সেই সূরা দ্বারা বিতর পড়া মোস্তাহাব। তবে কোনো কোনো সময় এর ব্যতিক্রম করা উচিত, যেন তা জরুরি বলে বুঝা না যায়। হযরত ইবনে আব্বাস, উবাই ইবনে কা'ব ও ইমাম আবূ হানীফা (র.) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

وَعَنْ ١٢٠١ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ

১২০১. **অনুবাদ :** হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছেন, যা আমি বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনূতে পাঠ করে থাকি। বাক্যগুলো এই اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ .... অর্থাৎ হে আল্লাহ!

عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

তুমি আমাকে পথপ্রদর্শন কর এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি পথপ্রদর্শন করেছ। আমাকে শান্তি দান কর, তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদেরকে তুমি শান্তি দান করেছ। তুমি আমার অভিভাবক হও, তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ। তুমি যা কিছু আমাকে দান করেছ তাকে আমার জন্য কল্যাণকর কর। যাতে তুমি অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছে তার অকল্যাণ হতে আমাকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই আদেশ করতে পার, তোমার উপরে আদেশ করা যেতে পারে না। নিশ্চয় যাকে তুমি বন্ধু করেছ সে কখনও অপমানিত হয় না। হে আমার প্রতিপালক তুমি বরকতময় ও মহীয়ান। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَسْئَلَةُ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ **বিতরের নামাজে কুনূতের মাসআলা :** বিতরের নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়ার কয়েকটি মাসআলা রয়েছে, যা নিম্নরূপ– (১) পুরা বছর বিতরের নামাজে কুনূত পড়তে হবে কি না? (২) কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে? (৩) দোয়ায়ে কুনূত মূলত কোনটি। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

সব সময় বিতরের নামাজে কুনূত পড়তে হবে কিনা? ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিতর নামাজের কুনূত সব সময় পড়তে হবে। এর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। ইমাম সাওরী, ইবনুল মুবারক ও ইসহাক এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার দলিল হলো নিম্নের হাদীসটি—

رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّهُمْ قَالُوْا رَأَيْنَا صَلٰوةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে শুধুমাত্র রমজানের বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়তে হয়।

ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে এবং ইমাম আহমদের মতে বিতরের কুনূত সারা বৎসর পড়তে হবে না; বরং রমজানের শেষ অর্ধেকে বিতর নামাজে কুনূত পড়তে হবে। তিনি নিম্নের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন—

(١) رَوَى اَبُوْ دَاوُدَ اَنَّ عُمَرَ (رض) اَجْمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) فَكَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً مِنَ الشَّهْرِ يَعْنِيْ رَمَضَانَ وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ اِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْ .

(٢) رُوِيَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اَمَّهُمْ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিতর নামাজের কুনূত রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। ইমাম মালেক, সুফইয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম ইসহাক প্রমুখ এই অভিমত পেশ করেছেন।

তাঁদে দলিল হলো– (١) عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

(٢) وَعَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ (رض) وَاَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ .

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ইবনে সীরীন প্রমুখের মতে রুকুর পরে কুনূত পড়া সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো, হযরত আলী (রা.)-এর নিম্নোক্ত আমলটি। اِنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ اِلَّا فِي النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ .

বিতর নামাজে যে দোয়ায়ে কুনূত পড়া হয় মূলত তা কোনটি : ইমাম শাফেয়ী(র.)-এর মতে দোয়ায়ে কুনূত হলো—

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দোয়ায়ে কুনূত হলো–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

---

وَعَنْ ١٢٠٢ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) وَ زَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلٰثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

১২০২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই বিতরের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন, সুব্‌হানাল মালিকিল্ কুদ্দূস। অর্থ– আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সার্বভৌম মহাসম্রাটের যিনি অতি পবিত্র। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী] কিন্তু নাসায়ী একথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, হুজুর ﷺ এটা তিন বার দীর্ঘ ভাবে বলেছেন। নাসায়ীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্‌যা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা আব্‌যা বলেছেন, হুজুর ﷺ যখন বিত্‌র নামাজের সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেন, 'সুব্‌হানাল মালিকিল কুদ্দূস'। তৃতীয় বারে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।

وَعَنْ ١٢٠٣ عَلِيٍّ (رض) قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১২০৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বিত্‌র নামাজের শেষে বলতেন– اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ الخ অর্থ– হে আল্লাহ! আমি পানাহ্ চাই তোমার সন্তুষ্টি দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে, তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি হতে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার [অভিসম্পাত] হতে। আমি তোমার প্রশংসার হিসাব-নিকাশ করার ক্ষমতা রাখি না। তুমি তদ্রূপই যেরূপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ। –[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ -এর মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য হাদীসাংশে মহান রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন গুণাবলির বর্ণনা করে বলেন, "আমি তোমার প্রশংসার হিসাব-নিকাশ করার ক্ষমতা রাখি না। তুমি তদ্রূপই, যেরূপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।" এ কথার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কত মহান, কতই না মর্যাদার আসীনে সমাসীন। তিনি অতুলনীয়, তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ ﷺ-ও এ ব্যাপারে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা মীরাক বলেন, কারো মতে كَمَا -এর মধ্যের كَافْ বর্ণটি অতিরিক্ত। তখন এর অর্থ হবে اَنْتَ الَّذِىْ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ অর্থাৎ তুমি এমন যে, তুমি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছ।

আবার কেউ বলেন, كَمَا -এর মধ্যে مَا অব্যয়টি মাওসূফা অথবা মাওসূলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর كَافْ অর্থ مِثْل বা উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত। তখন এর অর্থ হবে, তুমি এমন সত্তা যার রয়েছে সুমহান মর্যাদা ও মহা সম্মান। পরিপূর্ণ জ্ঞান ও কুদরত তারই রয়েছে। তুমিই তোমার প্রশংসা নির্ধারণ করেছ। উল্লেখ্য এ প্রশংসা قَوْلِىْ হতে পারে এবং فِعْلِىْ -ও হতে পারে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٠٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قِيْلَ لَهٗ هَلْ لَكَ فِىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ مَا اَوْتَرَ اِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اَنَّهٗ فَقِيْهٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهٗ مَوْلٰى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهٗ قَدْ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১২০৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো, আমীরুল মু'মিনীন হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি যে বিতরের নামাজ শুধু এক রাকাত পড়েন? জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তিনি ঠিকই করেন। কারণ তিনি একজন ফিকহবিদ্ [যারা শরিয়তের বিধান সম্পর্কে ভাল জানেন]।

অপর এক বর্ণনায় আছে, [তাবেয়ী] ইবনে আবূ মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এশার নামাজের পরে এক রাকাত বিতর পড়লেন, তখন তাঁর কাছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মুক্ত করা গোলামও উপস্থিত ছিল। সে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে এসে এ খবর জানাল। এটা শুনে তিনি [ইবনে আব্বাস] বললেন, তার ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। তিনি নিজেই নবী করীম ﷺ -এর একজন সম্মানিত সাহাবী। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْمُ مَوْلٰى لِابْنِ عَبَّاسٍ **হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর আজাদকৃত গোলামের নাম :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যে গোলামটি আজাদ করেছিলেন এবং যার উল্লেখ উক্ত হাদীসে রয়েছে তাঁর নাম হলো কুরাইব।

١٢٠٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১২০৫. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– বিত্‌র নামাজ অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি বিত্‌র পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। বিত্‌র অপরিহার্য, যে বিত্‌র পড়ে না সে আমাদের দলের অন্তর্গত নয়। বিত্‌র নামাজ অপরিহার্য, যে বিত্‌র পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূল ﷺ বলেছেন, যে বিতর নামাজ পড়ে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং আমাদের পথ ও সত্যের উপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। এর দ্বারা বিত্‌র নামাজ পরিহারকারীকে ইসলামের গণ্ডি হতে বের করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং তার দ্বারা বিতরের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। বিতর নামাজ শরিয়ত কর্তৃক স্বীকৃত। বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায়,

রাসূল ﷺ ওয়াজিব ছাড়াও فَلَيْسَ مِنَّا -এর বাক্য ব্যবহার করেছেন। যেমন–সুন্নত বর্জনকারী সম্পর্কে তিনি বলেন– اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ আল্লামা তীবী (র.) বলেন فَلَيْسَ مِنَّا -এর মধ্যে مِنْ হলো সম্পর্ক জ্ঞাপক অব্যয়। যেমন আল্লাহ বলেন– اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন فَاِنِّىْ لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّىْ -এর মধ্যের مِنْ হলো সম্পর্ক জ্ঞাপক অব্যয়।

১২০৬. وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا ذَكَرَ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১২০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতর নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা পড়তে ভুলে যায়, যখনই তার স্মরণ পড়ে অথবা যখনই সজাগ হয় তখনই যেন সে তা পড়ে নেয়। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

১২০৭. وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ اَوَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ اَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ ـ (رَوَاهُ الْمُوَطَّأُ)

১২০৭. অনুবাদ : ইমাম মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর নিকট এ হাদীস পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, এটা কি ওয়াজিব? তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ পড়েছেন, আর মুসলমানগণও বিতির নামাজ পড়েছেন। লোকটি বারবার এ কথাই জিজ্ঞাসা করতে থাকল, হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বারবার বলতে থাকলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ পড়েছেন এবং মুসলমানগণও বিতর নামাজ পড়েছেন –[মুয়াত্তা ইমাম মালেক]

১২০৮. وَعَنْ عَلِىٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ يَقْرَاُ فِيْهِنَّ بِتِسْعِ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ يَقْرَاُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِثَلٰثِ سُوَرٍ اٰخِرُهُنَّ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১২০৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজ তিন রাকআত পড়তেন। এতে তিনি কিসারে মুফাস্সাল সূরাসমূহের নয়টি সূরা পাঠ করতেন, প্রত্যেক রাকাতে তিনটি করে সূরা পাঠ করতেন, যার সর্বশেষ সূরাটি হতো 'ইখলাস' বা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য যে, রাসূলে করীম ﷺ বিতরের নামাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূরা পড়েছেন। যেমন– অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি প্রথম রাকাতে সূরা কদর, তাকাছুর ও যুলযিলাত, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আসর, নসর ও কাওছার এবং তৃতীয় রাকআতে কাফেরূন, লাহাব ও ইখলাস পড়তেন।

وَعَنْ ١٢٠٩ نَافِعٍ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ وَالسَّمَاءُ مُغَيِّمَةٌ فَخَشِيَ الصُّبْحَ فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ انْكَشَفَ فَرَاى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২০৯. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত (রা.) নাফে' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি মক্কায় হযরত [আব্দুল্লাহ] ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে ছিলাম। আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তিনি ভোর হয়ে গেছে আশঙ্কায় এক রাকাত বিতর পড়ে নিলেন। যখন আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে গেল, তিনি দেখলেন রাতের এখনও বাকি আছে। তখন তিনি এক রাকাত পড়ে বেজোড়কে জোড় করে নিলেন। অতঃপর দু' দু' রাকাত করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়লেন। আবার যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করলেন এক রাকাত বিতর পড়ে নিলেন। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিতরের নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : হযরত ইবনে ওমরের কার্যাবলি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বিতর এক রাকআত পড়েছিলেন। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম ইসহাক বলেন, যদি কেউ প্রথম রাতে বিতর নামাজ পড়ে থাকে। অতঃপর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠে। তখন তাহাজ্জুদের শুরুতে এক রাকাত নামাজ পড়ে প্রথম রাতের বিতর বা বেজোড় নামাজকে জোড়া করে নেবে এবং সন্ধ্যা রাতের বিতরকে বাতিল করে দেবে। অতঃপর তাহাজ্জুদ নামাজ পড়বে এবং তাহাজ্জুদের শেষ যথারীতি বিতর নামাজ পড়বে।

ইবনে মুনযির বলেন, হযরত উস্মান, আলী, সা'দ, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকের মাযহাব এটাই ছিল। তারাও এভাবে এক রাকাত মিলিয়ে সন্ধ্যা রাতের বিতরকে বাতিল করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত এই হাদীস তাদের প্রমাণ। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হতো বিতর সম্পর্কে তিনি বলতেন, আমরা যখন সন্ধ্যা রাতে ঘুমানোর আগে বিতর পড়তাম এবং পরে শেষ রাতে যদি তাহাজ্জুদ পড়তে মনস্থ করি তখন এক রাকাত নামাজ পড়ে শুরুতেই সন্ধ্যা রাতের তিন রাকাত বিতরকে জোড়া পূর্ণ করে নেই। তারপর দু' দু রাকাত করে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ি। পরে তাহাজ্জুদ শেষ করে উক্ত দু' রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতর বা বেজোড় করে নেই। কেননা হুজুর ﷺ আমাদেরকে তাহাজ্জুদের পরে বিতর পড়তে আদেশ করেছেন যে, যেন আমরা আমাদের রাতের নামাজ [তাহাজ্জুদের] শেষে বিতর পড়ি।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে মুবারক এমনকি জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতে প্রথম রাতে যে বিতর পড়া হলো, তাহাজ্জুদের সময় তাকে বাতিল করতে হবে না; বরং দু' রাকাত করে সুবহে সাদেক পর্যন্ত তাহাজ্জুদ পড়বে। কাজী ইয়ায বলেন, নামাজ বাতিল করা বৈধ নয়। কারণ কুরআন মাজীদে আছে যে, وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ 'তোমরা তোমাদের কৃত ইবাদতকে বাতিল করো না। এ ছাড়া প্রথম রাতের বিতরের পরে নিদ্রা, হদস, কথাবার্তা ও অন্যান্য নামাজ ভঙ্গ হওয়ার মতো কার্যাবলি পাওয়া যাওয়ার পরেও এটা কোনোমতেই সম্ভবপর নয় যে, শেষ রাতের এক রাকাতকে প্রথম রাতের বিতরের সাথে মিলানো বা সংযুক্ত করা যায়। কারণ উভয়টি পৃথক দু' নামাজ।

وَعَنْ ١٢١٠ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلٰثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২১০. **অনুবাদ** : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [নফল নামাজ] বসে পড়তেন, আর এতে কেরাতও বসেই পাঠ করতেন। যখন তাঁর কেরাত পাঠ ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকত, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় [অবশিষ্ট] কেরাত পাঠ করতেন। অতঃপর রুকু করতেন তারপর সেজদায় যেতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতেও তিনি এর [প্রথম রাকাতের] অনুরূপ কাজ করতেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٢١١ - أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)

১২১১. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বিতরের নামাজের পর দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। –[তিরমিযী]

কিন্তু ইবনে মাজাহ্ এ কথাটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত দু' রাকাত ছিল সংক্ষিপ্ত তিনি এবং বসে পড়তেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহানবী ﷺ জীবনের শেষ দিকে শারীরিক দুর্বলতার কারণে বসে নফল নামাজ পড়তেন এবং একই নামাজ প্রথমাংশ বসে এবং শেষাংশ দাঁড়িয়ে আদায় করতেন। নফল নামাজে এরূপ করা সর্বসম্মাতিক্রমে বৈধ, তবে এর বিপরীতও করা জায়েজ আছে।

وَعَنْ ١٢١٢ - عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا هُوَ جَالِسٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২১২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর পড়তেন এক রাকাত। অতঃপর দু' রাকাত [নফল] নামাজ বসে বসে পড়তেন। এই দু' রাকাতে কেরাতও পড়তেন। যখন তিনি রুকু করতে ইচ্ছা করতেন তখন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কেরাত পাঠ করে রুকু করতেন। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইমাম মালেক ও আহমদ ছাড়া অন্যান্য ইমাম ও ফিকহবিদগণ বিতরের পরে বসে দু' রাকাত নামাজ পড়া জায়েজ মনে করেন। ইমাম মালেক এটা সহীহ মনে করেন না। ইমাম আহমদ এতে আদেশও করেন না এবং নিষেধও করেন না। আল্লামা শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন যে, উক্ত দু' রাকাত বিতরের পরিপূর্ণতার জন্য পড়া হয়, তাই পড়া জায়েজ।

وَعَنْ ١٢١٣ - ثَوْبَانَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ فَاِذَا اَوْتَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَاِلَّا كَانَتَا لَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

১২১৩. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় এই রাত্রি-জাগরণ] খুব কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যখন তোমাদের কেউ বিতর নামাজ পড়ে, সে যেন দু' রাকাত নফল নামাজ পড়ে। অতঃপর যদি সে রাতে উঠে নামাজ পড়তে পারল, ভাল কথা– অন্যথা তার দু' রাকাত নামাজই রাতের নামাজ হিসেবে যথেষ্ট হবে। –[তিরমিযী ও দারেমী]

وَعَنْ ١٢١٤ - اَبِيْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَءُ فِيْهِمَا اِذَا زُلْزِلَتِ وَقُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১২১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজের পরে বসে বসে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। এ রাকাতদ্বয়ে তিনি যথাক্রমে সূরা 'ইযা যুলযিলাতিল আরদু ও সূরা কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' পাঠ করতেন। –[আহমদ]

بَابُ الْقُنُوْتِ

পরিচ্ছেদ : দোয়ায়ে কুনূত

اَلْقُنُوْتُ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার, যার মূল অক্ষর হলো (ق ـ ن ـ ت) এর অনেক গুলো শাব্দিক অর্থ রয়েছে– যথা, আনুগত্য করা, নীরব থাকা, দোয়া করা, একাগ্রচিত্ততা অবলম্বন করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায় বিতর নামাজের শেষ রাকাতে যে বিশেষ দোয়া পাঠ করা হয় তাকে دُعَاء قُنُوْت বলা হয়।

মূলত কুনূত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. قُنُوْتٌ فِى الْفَجْرِ একে قُنُوْت نَازِلَة -ও বলা হয়। এটি মসিবত বা বিপদের সময় ফজরের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পরে পড়া হয়। মহানবী ﷺ বীরে মাউনার ঘটনার পর দীর্ঘ একমাস যাবৎ কাফিরদেরকে বদদোয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা পাঠ করেছেন।

২. قُنُوْتٌ فِى الْوِتْرِ এটা প্রত্যেক বিতরের নামাজের শেষ রাকাতে রুকুর পূর্বে পড়া হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে কুনূত সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢١٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوتِهٖ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِاَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ (اَلْاٰيَةَ) . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কারো বিপক্ষে বা পক্ষে দোয়া করার ইচ্ছা করতেন তখন রুকুর পরে দোয়া কুনূত পড়তেন। অনেক সময় যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন, [তৎপর] বলতেন– হে আল্লাহ! মুক্তি দান কর ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে, সালামা ইবনে হিশামকে ও আইয়্যাশ ইবনে আবূ রবীয়াকে। হে আল্লাহ, কঠোর কর তোমার শাস্তি 'মুযার' গোত্রের প্রতি, একে তাদের জন্য ইউসুফ (আ.)-এর দুর্ভিক্ষের অনুরূপ কর। এটা তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতেন। এ ছাড়াও তিনি তাঁর কোনো কোনো নামাজে আরবের কোনো কোনো গোত্রের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি অভিসম্পাত কর অমুক অমুককে! যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজেল করলেন, [হে নবী]! এ ব্যাপারে আপনার কোনো অধিকার নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاقِعَةُ الدُّعَاءِ **দোয়ার ঘটনা :** আলোচ্য হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন ব্যক্তির জন্য কাফেরদের প্রতি বদদোয়া করেছেন, যার ঘটনা নিম্নরূপ–

'ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ' ইনি ইসলামের বীর সেনানী, আল্লাহ্র তলোয়ার হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদের সহোদর ভাই। কাফের অবস্থায় বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। ভাইগণ যুদ্ধপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করেন এবং মক্কায় গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, যুদ্ধপণ পরিশোধ করার পূর্বে আপনি ইসলাম গ্রহণ করেননি কেন? উত্তরে বললেন, যদি আমি তখন ইসলাম গ্রহণ করতাম তাহলে লোকেরা ধারণা করত যে, আমি কয়েদী জীবন হতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার প্রতি লোকের এরূপ ধারণা জন্মানোকে আমি পছন্দ করিনি। ফলে তিনি মক্কার কাফেরদের হাতে বন্দী হন।

'সালামা ইবনে হিশাম' আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন আবূ জাহলের সহোদর ভাই। আবূ 'আইয়্যাশ ইবনে আবূ রাবীয়া' আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভাই। এরা উভয়ই মক্কার অধিবাসী এবং ইসলামের প্রথম যুগ হতেই মুসলমান ছিলেন। তাঁরা প্রথমে হাবশায় পরে মদীনায় হিজরত করেন, মদীনায় হিজরত করার পূর্বে কাফেরদের হাতে বন্দী হয়ে কঠোর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। হুজুর ﷺ এ সমস্ত অসহায় নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দোয়া করেছিলেন। ফলে হুজুরের ﷺ দোয়ায় তাঁর তিন জনই মক্কা হতে পলায়ন করে মদীনায় হুজুর ﷺ-এর নিকট হিজরত করতে সক্ষম হন।

١٢١٦ - وَعَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ (رضـ) قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلٰوةِ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اَنَّهُ كَانَ بَعَثَ اُنَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُوْنَ رَجُلًا فَاُصِيْبُوْا فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْا عَلَيْهِمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২১৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আসেম আহ্ওয়াল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, একদা আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে নামাজের কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেন, কুনূত রুকুর আগে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু এক মাসকাল রুকুর পরে কুনূত পাঠ করেছিলেন সুনির্দিষ্টভাবে। এর কারণ এই ছিল যে, একবার তিনি 'বীরে-মা'উনার' দিকে ৭০ [সত্তর] জন লোক পাঠিয়ে ছিলেন– যাঁদেরকে ক্বারী বলা হতো। তাদেরকে তথায় শহীদ করে দেওয়া হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মাস যাবৎ রুকুর পরে কুনূত [কুনূতে-নাযিলা] পাঠ করেছিলেন। যাতে তিনি তাদের [হত্যাকারীদের] জন্য বদদোয়া করতে থাকেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْقُنُوْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَمْ بَعْدَهُ দোয়ায়ে কুনূত রুকুর পূর্বে না পরে : হানাফী মাজহাব মতে ফজর নামাজে যে কুনূত পাঠ করা হয়, তাকে কুনূতে নাযেলা বলে। এটা সর্ব সম্মতিক্রমে রুকুর পরে পাঠ করতে হয়। এটা শুধু মুসলমানদের বিপদ-বিপর্যয়ের সময় পড়তে হয়। আর বিতরের নামাজে যে কুনূত পাঠ করা হয়, এটা রুকুর পূর্বে না পরে এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর অভিমত : তাঁদের মতে এ কুনূত রুকুর পর পাঠ করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো হযরত আনাস ও হাসান ইবনে আলীর হাদীস।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ ইমাম আবূ হানীফা ও মালেক (র.)-এর অভিমত : তাঁদের মতে কেরাত শেষে রুকুর পূর্বে এ কুনূত পড়তে হবে। তাদের দলিল হলো–

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজে রুকুর আগেই দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করতেন।

২. এরূপভাবে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুর পূর্বেই বিতর নামাজের কুনূত পাঠ করতেন। এরূপ বর্ণনা হযরত ইবনে ওমরের হাদীসেও রয়েছে।

প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : জবাবে বলা হয় যে, হাসান ইবনে আলীর হাদীসে যে কুনূতের কথা উল্লেখ রয়েছে তা 'কুনূতে নাযিলা'। কাজেই তা বিতরের কুনূত নয়। তদ্রূপ হযরত আনাসের হাদীসেও কুনূতে নাযিলার কথা বলা হয়েছে, যা হুজুর ﷺ এক মাস যাবৎ 'বীরে মা'উনার ঘটনাকে লক্ষ্য করে পড়েছিলেন। ত্বাহাবী শরীফ, কাওকাবে দুররী, ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াত হেদায়া কিতাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রুকুর পরের কুনূত হলো নাযিলা, বিতরের কুনূত নয়।

فِىْ اَيَّةِ صَلٰوةٍ يَقْرَأُ الْقُنُوْتَ কোন নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়তে হবে : এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মতে ফজর নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর পরে, সেজদায় যাওয়ার আগে সর্বদা দোয়া কুনূত পাঠ করা মোস্তাহাব। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, শুধু রমজান মাসের শেষার্ধে বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করবে। আর কোনো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে প্রত্যেক নামাজেই 'কুনূতে নাযেলা' পড়া জায়েজ আছে।

হানাফীদের মতে বিতর নামাজের তৃতীয় রাকাতে কেরাআত সমাপ্ত করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে সর্বদা দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করবে। আর ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোনো এলাকায় যে কোনো বিপদ-বিপর্যয় দেখা দিলে– শুধু ফজরের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর পরে দাঁড়িয়ে 'কুনূতে নাযিলা' পাঠ করবে।

دَلَائِلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর দলিল :

১. عَنْ اَنَسٍ (رضـ) مَا زَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْنُتُ فِى الصُّبْحِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا - (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ وَغَيْرُهُ)
হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ ইন্তেকাল পর্যন্ত ফজর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করতেন।

২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৩. হযরত বার্‌রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ফজর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করতেন।
ইমাম শাফেয়ী (র.) শুধু রমজানের শেষার্ধে দোয়াত কুনূত পড়ার অনুকূলে দলিল পেশ করেন যে, হযরত হাসান বস্‌রী (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) [রমজানের তারাবীর জন্য] লোকজনকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে সমবেত করেন। আর তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ তাদের নামাজ পড়াতেন; কিন্তু [রমজানের] শেষার্ধ ছাড়া কোনোদিন কুনূত পাঠ করতেন না।

دَلَائِلُ الْاَحْنَافِ হানাফীদের দলিল :

১. হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর নামাজের শেষে বলতেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু ....।

২. হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুনূতের বাক্য শিখিয়েছেন, যা আমি বিতরের কুনূতে পাঠ করতাম 'আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফী মান হাদাইতা....' ইত্যাদি। এ দু'টি বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণত বিতর নামাজেই দোয়ায়ে কুনূত পড়তে হবে। সুতরাং এটা সারা বৎসরই পড়তে হবে।

৩. হযরত আলকামা (রা.) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ বিতর নামাজে রুকূর পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন। বিতর নামাজে দোয়ায়ে কুনূত পড়া সম্পর্কে আরও অনেক দলিল রয়েছে।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ প্রতিপক্ষের দলিলের জবাব : তাঁদের দলিলের জবাবে বলা যায় যে,

১. হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী। তিনি এক হাদীসে বলেন, হুজুর ﷺ সারা বছর ফজরের নামাজে কুনূত পাঠ করেছেন। আবার আরেক হাদীসে বলেন, হুজুর ﷺ মাত্র একমাস কুনূত পাঠ করেছেন, পরে তা ত্যাগ করেছেন। এমতাবস্থায় اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا উভয় হাদীসই পরিহারযোগ্য বিবেচিত হবে।

২. আবূ মালেক আশ্‌জায়ীর হাদীস যা সামনে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর পিতাকে ফজরের নামাজে কুনূত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর পিতা একে 'নতুন আবিষ্কৃত' তথা বিদ্'আত বলেছেন।

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) শুধু ফজর নামাজে কুনূত পাঠ করাকে বিদআত বলেছেন। আর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) শুধু রমজানের শেষার্ধে যে কুনূত পাঠ করেছেন তা তার ব্যক্তিগত আমল। মারফূ' হাদীসের মোকাবিলায় তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উপরের বিস্তারিত আলোচনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সারা বছর বিতর নামাজে দোয়ায়ে

কুনূত পাঠ করতে হবে। আর ফজরের নামাজে হুজুর ﷺ যে এক মাস দোয়ায়ে কুনূত পাঠ করেছিলেন, তা সাধারণ কুনূত নয়, বরং 'কুনূতে নাযিলা' যা মুসলমানদের বিপর্যয়ের সময় পড়া মোস্তাহাব। আর হুজুর ﷺ এটা বীরে মাউনার কারীদের উদ্দেশ্যে পড়েছিলেন।

تَعْرِيْفُ الْقُرَّاءِ السَّبْعِيْنَ সত্তরজন কারীর পরিচয় : আলোচ্য হাদীসে যে সত্তরজন লোকের কথা বলা হয়েছে তাঁরা সকলেই আহলে সুফ্ফার অন্তর্গত ছিলেন। দিনে কাঠ বিক্রয় করে নিজেদের ও সুফ্ফাবাসীদের খাদ্য সংগ্রহ করতেন এবং রাতে কুরআন আলোচনা করতেন। রাসূল ﷺ তাঁদেরকে চিঠি দিয়ে বীরে মাউনা নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানকার রেয়াল, যাকওয়ান ও উমাইয়্যা গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করে। রাসূল ﷺ এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। এ সত্তরজনের মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি মৃতপ্রায় অবস্থায় আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়, আর এক ব্যক্তি নরপিশাচদের হাতে বন্দী থাকে। রাসূল ﷺ এ সকল গোত্রের জন্য কুনূতে নাযেলায় বদদোয়া করেন।

وَاقِعَةُ بِئْرِ مَعُوْنَةَ বীরে মাউনার ঘটনা : প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে চতুর্থ হিজরির সফর মাসে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয়। আবূ বারায়া আমের রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলে রাসূল ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন; কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত না হলেও ইসলামের প্রতি কোনোরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষও ব্যক্ত করেনি; বরং সে বলল, হে রাসূল! আপনি যদি কিছু লোক নজদে প্রেরণ করেন তবে সম্ভবত তারা ঈমান গ্রহণ করতে পারে। রাসূল ﷺ এতে সন্দেহ প্রকাশ করলে সে বলল, আমি নিজ দায়িত্বে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করব। অতঃপর রাসূল ﷺ তার সাথে ৭০ জনের একটি জামাত পাঠিয়ে দেন। তারা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছলে তারা নিজেদের একজনকে রাসূল ﷺ-এর পত্রসহ আমের ইবনে তুফাইল-এর নিকট প্রেরণ করলে সে রাসূল ﷺ-এর পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা, তাঁর পত্রবাহককে হত্যা করতে একজনকে ইঙ্গিত প্রদান করে। অতঃপর সাহাবীদেরকে আক্রমণের জন্য বনী আমেরকে পরামর্শ দিলে তারা বলল, আমরা আবুল বারায়া-এর অঙ্গীকারকে মিথ্যা হতে দিতে পারি না। অতঃপর তারা বনূ সালীমের গোত্রে রেয়াল, যাকওয়ান ও বনূ লাহ্ইয়ানকে উৎসাহিত করলে তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত চতুরতার সাথে তারা সাহাবীদেরকে ঘেরাও করলে সাহাবীগণ বলেন, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি; বরং আমরা রাসূল ﷺ-এর একটি পত্র নিয়ে এসেছি, নজদ যাচ্ছি; কিন্তু তারা সে কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বর্বরোচিত হামলা চালায়, যা ইতিহাসের পাতায় এক মর্মান্তিক অধ্যায় হিসেবে পরিচিত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ عَلٰى رَعْلٍ وَ ذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১২১৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস যাবৎ এক নাগাড়ে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর নামাজের শেষ রাকাতে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলার পরে কুনূত [নাযেলা] পাঠ করতেন। এতে তিনি বনী সুলাইম গোত্রের রেয়াল, যাক্ওয়ান ও উসাইয়া শাখার প্রতি বদদোয়া করতেন। আর যারা রাসূল ﷺ-এর পিছনে থাকতেন সকলেই আমীন আমীন বলতেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ قُنُوْتُ الْفَجْرِ دَائِمًا كَانَ اَمْ لَا ফজরের কুনূত সর্বদা পড়তে হবে কি না? : ফজরের নামাজে সর্বদা কুনূত পড়তে হবে কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ফজর নামাজে দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পরে সর্বদাই দোয়া কুনূত পড়তে হবে। তাঁরা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসাবে পেশ করেন–

(١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَيْنَ الْوَلِيْدِ الخ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢) رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَكَانَ يَدْعُوْ عَلٰى قَبَائِلَ .

(٣) عَنْ أَنَسٍ (رضـ) مَازَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيْ وَغَيْرُهُ)

(٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَأَنَا أَقْرَبُكُمْ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَكَانَ أَبُوْهُرَيْرَةَ (رضـ) يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْأٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَيَدْعُوْا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

مَذْهَبُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ফজর নামাজে কুনূতে নাযিলা পড়া সকল সময়ের জন্য সাব্যস্ত নয়; বরং যখন মুসলমানদের উপর বিপদাপদ এসে পড়বে কেবল তখনই তা পড়বে। ইমাম আহমদ এবং ইসহাক এ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ إِلَّا شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ وَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ .

(٢) رُوِيَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قُلْنَا لِأَنَسٍ (رضـ) إِنَّ قَوْمًا يَزْعَمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ بِالْفَجْرِ فَقَالَ أَنَسٌ (رضـ) كَذَبُوْا إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُوْ عَلٰى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ .

(٣) رَوَى ابْنُ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَنَتَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ شَهْرًا كَانَ يَدْعُوْ فِيْ قُنُوْتِهِ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ الخ

(٤) عَنْ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَايَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا الْقَوْمَ أَوْ دَعَا عَلٰى قَوْمٍ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : **বিরোধীদের দলিলের জবাব ঃ** ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.) যে দলিল পেশ করেছেন তার জবাবে বলা যায় যে, এগুলো দ্বারা বিপদাপদের সময়কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যখন বিপদ বা মসিবত অবতীর্ণ হয় তখন কুনূত পড়া যাবে।

২. অথবা তাদের হাদীসসমূহ হযরত ইবনে মাসউদ ও আনাস (রা.) এর হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١٢١٨ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১২১৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ শুধু একমাস যাবৎ কুনূত পড়েছেন, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শুধু একমাস কুনূত পড়েছেন। এরপর তা পরিত্যাগ করেছেন, কাজেই বিপদ মসিবত ব্যতীত সব সময় তা পড়া যাবে না।

وَعَنْ ١٢١٩ أَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ اَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১২১৯. **অনুবাদ** : [তাবেয়ী] হযরত আবূ মালেক আশ্‌জায়ী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আব্বা! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আবূ বকর, ওমর, উসমান এবং এখানে কূফায় প্রায় পাঁচ বছর যাবত হযরত আলী (রা.) -এর পিছনে নামাজ পড়েছেন। তাঁরা কি কুনূত পড়েছেন ? তিনি বললেন, হে বৎস! এটা নতুন আবিষ্কৃত। –[তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর যুগ হতে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত একমাত্র বিতিরের নামাজেই কুনূত পড়া হতো, অন্য কোনো নামাজে কুনূত পড়া হতো না। সম্ভবত তখনকার কোনো কোনো লোক সব সময় সব নামাজে কুনূত পড়তে শুরু করেছিল। তাই তিনি সেটাকে বিদআত বলেছেন। অন্যথা অন্যান্য হাদীসে বিতর নামাজে কুনূত পড়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٢٠ الْحَسَنِ (رحـ) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ اِلَّا فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ يَتَخَلَّفُ فَصَلّٰى فِىْ بَيْتِهٖ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَبَقَ اُبَىٌّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَسُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهٗ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২২০. **অনুবাদ** : হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) লোকজনকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে [তারাবীহ নামাজের জন্য] জমায়েত করেন। তিনি তাদেরকে বিশদিন যাবৎ নামাজ পড়াতেন, কিন্তু [রমজানের] শেষার্ধ ব্যতীত কোনোদিন কুনূত পাঠ করতেন না। রমজানের শেষ দশদিন তিনি [মসজিদে উপস্থিত হওয়া থেকে] বিরত থাকতেন; বরং নিজের ঘরেই নামাজ পড়তেন। এতে লোকেরা বলাবলি করত, উবাই পালিয়েছে। –[আবূ দাউদ] একদা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-কে দোয়ায়ে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুর পরে কুনূত পাঠ করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, রুকুর পূর্বে ও রুকুর পরে [অর্থাৎ উভয় প্রকারেই পড়েছেন]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَبَقَ أُبَيٌّ-এর ব্যাখ্যা : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) রমজানের শেষ দশদিন মসজিদে নামাজ পড়াতেন না; বরং তিনি একাকী ঘরে নামাজ পড়তেন। আর এ জন্য লোকেরা তাকে أَبَقَ أُبَيٌّ [অর্থাৎ, উবাই পালিয়েছে] বলে আলোচনা করত।

১. আল্লামা (র.) তীবী (র.) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সম্পর্কে أَبَقَ -শব্দ ব্যবহার করা অপছন্দনীয় ও অসৌজন্যমূলক বিধায় একে عَبْدٌ أَبِقٌ (পলাতক গোলাম)-এর সাথে তাশবীহ বা সামঞ্জস্য বিধান করে أَبَقَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– হযরত ইউনুস (আ.) স্বীয় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত স্বদেশ পরিত্যাগ করলে তাঁকে সম্বোধন করে মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, যা কুরআনের ভাষায় إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ এখানে মাজাযী বা রূপক হিসাবে أَبَقَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. অথবা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর সম্পর্কে أَبَقَ শব্দটি কৌতুকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত উবাই (রা.) কেন রমজানের শেষ দশদিন মসজিদ ত্যাগ করতেন? এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যেতে পারে– (১) হযরত উবাই (রা.) এটা রাসূল ﷺ-এর অনুসরণার্থে করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ মাঝে মধ্যে তারাবীহের নামাজ একাকীও পড়তেন। আর এর কারণ ছিল, সর্বদা তাঁর জামাতের সাথে পড়ার কারণে এটা যেন ফরজ হয়ে না যায়। জামাত পরিহারের উদ্দেশ্য উভয়ের এক ও অভিন্ন না হলেও হযরত উবাই (রা.) রাসূল ﷺ-এর অনুসরণার্থেই এটা করেছেন। (২) অথবা হযরত উবাই (রা.)-এর রমজানের শেষ দশদিন জামাতে উপস্থিত না থাকা ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধার জন্য হতে পারে। (৩) হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, শেষ দশদিন একাকী নিভৃত পরিবেশে নামাজ আদায়ের জন্য হযরত উবাই (রা.) হয়ত জামাত পরিত্যাগ করেছেন।

কুনূতে নাযিলা : নিম্নোক্ত দোয়াটি কুনূতে নাযেলা হিসাবে পরিচিত–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ . وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ . وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ . وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ . فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ . وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ . وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ .

ভারতীয় উপমহাদেশের কেউ কেউ উল্লিখিত দোয়ার সাথে কিছু বর্ধিত করে এ দোয়াটিকে قُنُوْت نَازِلَة হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ . اَللّٰهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ . اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُلْحِدِيْنَ وَالشُّيُوْعِيِّيْنَ وَالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسَ وَالْهَنُوْدَسَ وَالرَّوَافِضَ وَالْقَادِيَانِيِّيْنَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَاءَكَ . اَللّٰهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ جَمْعَهُمْ وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ زَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ .

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

পরিচ্ছেদ : রমজান মাসে তারাবীহের নামাজ আদায়

আলোচ্য অধ্যায়ে قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ দ্বারা তারাবীহের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। تَرَاوِيْحُ শব্দটি تَرْوِيْحَةٌ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো– আরাম বা বিশ্রাম করা, রমজানের এ নামাজে প্রতি চার রাকাত পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা হয় বিধায় একে تَرَاوِيْح নামে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে তারাবীহের নামাজ সম্পর্কে তিনটি আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। যথা– (১) তারাবীহের নামাজের বিধান, (২) তা কত রাকত এবং (৩) এটা জামাতে পড়ার বিধান।

১. **তারাবীহের নামাজের বিধান :** ইমাম আযম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও আহ্‌মদ (র.) বলেন, তারাবীহের নামাজ 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'। একদা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে মূল তারাবীহের নামাজ এবং হযরত ওমর (রা.) যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর পিছনে সকলকে জামাতবন্দী করার ব্যবস্থা করেছিলেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, তারাবীহের নামাজ 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'। হযরত ওমর (রা.) যা করেছেন তা তার মনগড়া নয় বা নিজে একাকী করেন নি; বরং বহু সংখ্যক সাহাবীদেরকে নিয়ে তাঁদের উপস্থিতিতেই করেছিলেন। এ হিসেবে একে 'ইজমায়ে উম্মত'-ও বলা যায়। এ ছাড়া হাদীসেও এসেছে যে,

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِفْتَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ ـ (فَتْحُ الْقَدِيْرِ)

২. **তারাবীহের নামাজ কয় রাকাত :** তারাবীহ -এর নামাজ কয় রাকাত এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ ইমাম মলেক (রা.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ ৩৬ রাকাত, এর মধ্যে বিতর শামিল নয়। তিনি মদীনাবাসীদের আমল দ্বারা দলিল পেশ করেন। ইসহাক (র.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ ৪১ রাকআত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রা.)-এর মতে তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত। কাজী ইয়ায (র.) বলেন, বিশ রাকাত হওয়াই জামহুর ইমামদের অভিমত। তাঁরা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন–

(١) رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الصَّحَابِيِّ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ (رض) مِثْلَهُ ـ

(٢) وَفِي الْمُوَطَّا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ (رض) يَقُوْمُوْنَ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالثَّلَاثُ هُوَ الْوِتْرُ ـ

(٣) عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) اَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ـ (رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ فِيْ مُصَنَّفِهِ، وَاِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ)

(٤) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ قَالَ كَانَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ ـ (رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَه فِيْ مُصَنَّفِهِ وَاِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ)

(٥) وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ثَلٰثًا وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ شَيْبَه وَاِسْنَادُهُ حَسَنٌ)

(٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ـ

جَوَابًا لَهُ : ইমাম মালেক (র.) যে দলিল পেশ করেন তার জবাবে বলা যায় যে, সাহাবা ও তাবেয়ীনের শেষ আমল সব সময় বিশ রাকাতের উপরই ছিল, কাজেই সেটাই হবে অগ্রগাহ্য।

৩. **তারাবীহের নামাজ জামাআতে পড়ার বিধান :** তারাবীহের নামাজ একাকী পড়াও জায়েজ আছে, তবে জামাতে পড়াই উত্তম। মহানবী ﷺ সর্বদা এটা জামাতে না পড়লেও হযরত আবূ যার গিফারীর হাদীসে [যা সামনে বর্ণিত হবে] দেখা যায় যে, তিনি কিছুদিন এটা জামাতে পড়েছিলেন এবং ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পরে জামাত ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে তাঁর ওফাতের পর যখন আর ফরজ হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হয়ে গেল তখন হযরত ওমর (রা.) এটার জন্য নিয়মিত জামাতের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং এটা কখনও সুন্নতের খেলাফ নয়। অবশ্য কেউ কেউ তারাবীহের জামাআতকে 'সুন্নতে উমরী'-ও বলে থাকেন। তবে রাজেহ অভিমত হলো, তারাবীহের জামাআতও সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং রাসূলের সুন্নত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

১২২১ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِتَّخَذَ حُجْرَةً فِى الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِىَ حَتّٰى اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهٗ لَيْلَةً وَظَنُّوْا اَنَّهٗ قَدْ نَامَ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِىْ رَاَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهٖ فَصَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২২১. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। একবার রমজানে মহানবী ﷺ মাদুর দ্বারা মসজিদে একটি প্রকোষ্ঠ বানালেন এবং এর মধ্যে কয়েক রাত [নফল] নামাজ পড়লেন– এতে লোকজন তাঁর কাছে জমায়েত হতে লাগল। অতঃপর এক রাতে সাহাবীগণ তাঁর কোনো সাড়া শব্দ পেলেন না, এতে তাঁরা ধারণা করলেন যে, সম্ভবত তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন তাদের কেউ কেউ জোরে জোরে গলা খাক্‌রাতে লাগলেন যেন তিনি জাগ্রত হয়ে [জামাতের জন্য] তাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি তোমাদের সব সময়কার [আগ্রহের আধিক্যতা] লক্ষ্য করেছি। এতে আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা তোমাদের উপরে ফরজ হয়ে যায় না কি? আর যদি তা তোমাদের উপর ফরজই হয়ে যায়, তখন তোমরা তা পালন করতে পারবে না। সুতরাং হে লোক সকল! তোমরা নফল নামাজ তোমাদের নিজ নিজ ঘরেই পড়। কেননা কোনো ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো তার ঘরের নামাজ, তবে ফরজ নামাজ ব্যতীত। [অর্থাৎ ফরজ নামাজ মসজিদেই পড়বে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ-এর সার্বক্ষণিক আমলের দ্বারা কিভাবে রাতের নামাজ ফরজ হতে পারে : সাধারণত কোনো কাজ ফরজ হয় কুরআনের অকাট্য দলিল দ্বারা, তবে কিভাবে রাসূল ﷺ-এর সার্বক্ষণিক আমলের দ্বারা তারাবীহের নামাজ জামাতের সাথে ফরজ হতে পারে, এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া যেতে পারে, যা নিম্নরূপ–

১. আল্লামা মুহিববুদ্দীন আত্‌তাবারী এর উত্তরে বলেন, সম্ভবত আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ওহী এসেছিল যে, আপনি যদি রাতের নামাজ (তারাবীহ) সকল সময় জামাতের সাথে আদায় করেন তবে আমি তা মানুষদের উপর ফরজ করে দেব। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের আসানির প্রতি লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি সর্বদা এটা জামাতে পড়া ত্যাগ করেছেন।

২. অথবা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে এ ধারণার উদ্রেক হয়েছিল যে, সার্বক্ষণিকতার কারণে হয়তো তা ফরজ হয়ে যেতে পারে। আর এ জন্যই তিনি মুয়াজাবাত পরিহার করেছেন।

দ্বন্দ্বের সমাধান : দَفْعُ التَّعَارُضِ মি'রাজের হাদীসে এসেছে هُنَّ خَمْسٌ وَهُنَّ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নামাজের এ বিধানে কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হবে না, কিন্তু রাসূল ﷺ কি করে তারাবীহের নামাজ ফরজ হওয়ার আশঙ্কা করেছেন, এর সমাধান নিম্নরূপ−

১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ الخ এ হাদীস দ্বারা শুধু এ কথার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্তের কম আর করা হবে না; কিন্তু এর চেয়ে যে বেশি করা হবে না সে কথা বলা হয়নি। অতএব বেশি হওয়ার যখন সম্ভাবনা রয়েছে, এ জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভীতির কারণ বিদ্যমান ছিল।

২. অথবা মি'রাজের রাতে বলা হয়েছে لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনকাল ছিল বিধানাবলির নাসেখ ও মনসূখের সময়। আর এ জন্য তারাবীহের নামাজ ফরজ করার সম্ভাবনাকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি বলেন, خَشِيْتُ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الخ

৩. অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র রমজান মাসের রাতের নামাজ ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অন্তরে পোষণ করেছিলেন। যেমন− সুফইয়ান ইবনে হুসাইনের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন−

خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ قِيَامُ هٰذَا الشَّهْرِ اَىْ شَهْرِ رَمَضَانَ

তারাবীহের নামাজ ঘরে না মসজিদে পড়া উত্তম, এ ব্যাপারে মতানৈক্য : তারাবীহের নামাজ ঘরে একাকী পড়া উত্তম না মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা উত্তম সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاَبِىْ يُوْسُفَ وَغَيْرِهٖ : ইমাম মালেক (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম বলেন, তারাবীহের নামাজ একাকী ঘরে পড়া উত্তম। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন−

(١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَفْضَلُ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং কিছুসংখ্যক মালেকী মাযহাবভুক্ত আলেম বলেন, তারাবীহের নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করাই উত্তম। তাঁরা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে যুক্তিপ্রদর্শন করতে গিয়ে বলেন, হযরত ওমর (রা.) ও সাহাবায়ে কেরাম জামাতের সাথেই তারাবীহের নামাজ আদায় করেছেন এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের আমল এর উপরই অব্যাহত রয়েছে।

তাঁরা আরো বলেন, তারাবীহের নামাজ شَعَائِرُ الدِّيْنِ বা দীনের প্রতীক হওয়ার কারণে তা ঈদের নামাজের মতো। আর এ জন্যই তা জামাতে আদায় করা শ্রেয়।

তাদের দলিলের উত্তর : যদিও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল নামাজ ঘরে বসে পড়াই উত্তম; কিন্তু তারাবীহের নামাজ জামাতে পড়া সকল সাহাবী এবং তাবেয়ীদের আমল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং এটা দীনের প্রতীক হওয়ার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য নফলের নিয়মের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। তারাবীহের নামাজ ঘরেও যে পড়া বৈধ সেটা বর্ণনা করাও হাদীসের উদ্দেশ্য।

١٢٢٢ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১২২২ অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকজনকে রমজান মাসে তারাবীহের নামাজ কায়েম করার জন্য উৎসাহিত করতেন, তবে তিনি [সরাসরি] তাকিদ সহকারে আদেশ করতেন না; বরং তিনি এভাবে বলতেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের সাথে ও ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে রমজান মাসে নামাজ কায়েম করে [অর্থাৎ তারাবীহ পড়ে] তার বিগত যত [সগীরা] গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন, অবস্থা

وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلٰى ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ঐভাবেই চলল [অর্থাৎ যার ইচ্ছা তারাবীহ একা একা পড়ল] অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকালেও অবস্থা এভাবেই চলছিল এবং হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলের প্রথম ভাগেও অবস্থা ঐভাবেই চলছিল [কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত ওমর তারাবীহের জন্য জামাত কায়েম করেন]। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُفِرَلَهٗ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, সগীরা-কবীরা সব ধরনের গুনাহই এ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত, এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. ইবনুল মুনযির অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, নেক আমল দ্বারা সগীরা ও কবীরা সব ধরনের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।
২. ইমাম নববী (র.) বলেন, প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, নেক আমল দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। ইমামুল হারামাইনও এ মতকেই সমর্থন করেছেন। কাজী ইয়াজ (র.) বলেন, এটা আহলে সুন্নতের মাযহাব।
৩. কারো মতে যদি তার সগীরা গুনাহ না থাকে তবে কবীরা গুনাহ কমিয়ে দেওয়া হয়।

١٢٢٣- وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمُ الصَّلٰوةَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهٖ نَصِيْبًا مِنْ صَلٰوتِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِىْ بَيْتِهٖ مِنْ صَلٰوتِهٖ خَيْرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২২৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ [ফরজ] নামাজ মসজিদে আদায় করে, সে যেন তার নামাজ হতে একটা অংশ ঘরের জন্য রেখে দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তার ঘরে তার এই নামাজের কারণে কল্যাণ প্রদান করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে কিছু নামাজ ঘরে পড়ার কথা বলা হয়েছে, আর তা হলো সুন্নত ও নফলসমূহ। বস্তুত এ সব নামাজ ঘরে পড়ে গৃহকে আবাদ করা একান্ত আবশ্যক। কেননা অন্যস্থানে রাসূল ﷺ বলেছেন– لَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٢٤- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ

১২২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রমজান মাসে] আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রোজা রাখলাম; কিন্তু তিনি মাসের অধিকাংশ সময়ই আমাদের সাথে [নফল] নামাজ জামাতে পড়েননি, মাসের যখন মাত্র সাত রাত অবশিষ্ট থাকল অর্থাৎ মাসের তেইশ তারিখে তিনি আমাদের নিয়ে রাতের নামাজ পড়তে থাকলেন, যাতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। সমাপ্তির ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ রমজানের চব্বিশ তারিখে তিনি আমাদের সাথে জামাতে নামাজ পড়লেন না। [শেষ হওয়ার পূর্বে] পঞ্চম

الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السَّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ اِلَّا اَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ .

দিনে অর্থাৎ রমজানের পঁচিশ তারিখে আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন, যাতে অর্ধ রাত অতিবাহিত হয়ে গেল। [রাবী বলেন,] তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহু ! এ রাতে যদি আপনি আমাদেরসহ আরও অধিক নামাজ পড়তেন। [কত ভাল হতো]! তখন রাসূল ﷺ বললেন, মানুষ যখন ইমামের সাথে জামাতে [ফরজ] নামাজ পড়ে ইমামের নামাজ শেষ করা পর্যন্ত, তার জন্য সারা রাত নামাজ পড়ার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। [রমজান শেষ হওয়ার] চতুর্থ রাতে অর্থাৎ ছাব্বিশে রমজানে রাসূল ﷺ আমাদের সহকারে নামাজ পড়লেন না, এমনকি তখন মাত্র এক-তৃতীয়াংশ রাত বাকি থাকল। যখন [রমজান শেষ হওয়ার] তৃতীয় দিন হলো [অর্থাৎ ২৭ শে রমজান হলো] রাসূল ﷺ নিজ পরিবার-পরিজন, নিজ বিবিদেরকে এবং লোকজনকে জমায়েত করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তে থাকলেন, এত রাত পর্যন্ত যে, আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে, আমাদের কল্যাণ হারিয়ে ফেলি নাকি। [রাবী বলেন,] আমি হযরত আবূ যার (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কল্যাণ [ফালাহ] কি জিনিস? তিনি বললেন, কল্যাণ বা ফালাহ হচ্ছে সাহরী খাওয়া। অতঃপর রাসূল ﷺ মাসের বাকি রাত কয়টি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না।-[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী। ইবনে মাজাহও এরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিরমিযী "অতঃপর রাসূল ﷺ মাসের বাকি রাত কয়টি আমাদের নিয়ে নামাজ পড়লেন না" বাক্যটি উল্লেখ করেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তারাবীহের নামাজ রাসূল ﷺ মাঝে মধ্যে জামাতে পড়েছেন, ফরজ বা ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে সর্বদা পড়েননি, এ জন্য তারাবীহের নামাজ সুন্নত হিসাবে পরিগণিত।

١٢٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَ رَسُوْلُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ

১২২৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [বিছানা হতে] হারিয়ে ফেললাম। খুঁজে তাঁকে দেখলাম, তিনি 'বাকী' নামক গোরস্থানে আছেন। তখন তিনি [সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে] বললেন, তুমি কি আশঙ্কা করেছিলে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? [অর্থাৎ তোমার হক নষ্ট করবেন?] হযরত আয়েশা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! [সত্যি] আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার অন্য কোনো বিবির নিকট গমন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِاَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَ زَادَ رَزِيْنٌ مِمَّنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِى الْبُخَارِيَّ يُضَعِّفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ)

আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বনী কালবের মেষ পালের পশমের সংখ্যারও অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন [অর্থাৎ অগণিত-অসংখ্য পাপীকে ক্ষমা করেন; আজ সেই রাত]। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। রাযীন এ কথাটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, "[আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোকদের পাপ মাফ করেন] যারা জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে।" ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীসটি যয়ীফ বলে আখ্যায়িত করতে শুনেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ رَسُوْلُهٗ **-এর ব্যাখ্যা ঃ** আলোচ্য হাদীসাংশটি মহানবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, অর্থাৎ তুমি কি এ আশঙ্কা করছ যে, আমি তোমার হক নষ্ট করব, তা কখনো সম্ভব নয়। আর এখানে আল্লাহ কথাটি উল্লেখ করার কারণ হলো যে, আল্লাহর নিকট রাসূল ﷺ -এর মর্যাদা অপরিসীম, যেমন পবিত্র কুরআনেও এরূপ উল্লিখিত হয়েছে– اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ .

অথবা বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

অথবা এর দ্বারা নিম্নে বর্ণিত আয়াতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে– يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ رَسُوْلُهٗ অর্থাৎ, তারা কি এ আশঙ্কা করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন। [সূরা নূর] এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আনুগত্য এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ও অভিন্ন।

اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অর্ধ শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আগমন করেন। আল্লাহর এ আগমন সওগাত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নূর বা জ্যোতি, তাঁর অপরিসীম রহমত, অনুগ্রহ, অনুকম্পা।

سَبَبُ ذِكْرِ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ **কালব গোত্রের মেষের পশম সংখ্যার উল্লেখের কারণ :** তৎকালীন আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে 'কালব গোত্রের' লোকেরা অধিক সংখ্যক মেষ দুম্বা লালন-পালন করতো। তাই সে গোত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য লোকের গুনাহ্ মাফ করে থাকেন। তবে শর্ত হলো, বান্দা তওবা ও ইস্তিগফারের সাথে আল্লাহ্র কাছে কায়মনে প্রার্থনা করতে হবে।

١٢٢٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১২২৬. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তির নিজের ঘরে নামাজ পড়া আমার এই মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষা শ্রেয়, অবশ্য ফরজ নামাজ ব্যতীত। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উপরিউক্ত বিষয়ের হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করে ইমাম মালেক, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) প্রমুখ ইমামগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, তারাবীহের নামাজ একা একা ঘরে পড়াই উত্তম। জামাতে পড়া জায়েজ। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী প্রমুখ ইমামগণ জামাতে পড়াকেই উত্তম বলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ ও তাই বুঝেছিলেন। এ জন্য তারা তারাবীহের নামাজ জামাতে পড়াকেই উত্তম বলেন। হযরত ওমর ফরুক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ ও তাই বুঝেছিলেন। এজন্য তারা তারাবীহের জামাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে অলসতার কারণে তারাবীহ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১২২৭ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيْ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلٰوتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِيْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ تَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ الْآخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২২৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত কারী আব্দুর রহমান ইবনে আব্দ (র.) বলেন, [রমজান মাসের] এক রাতে আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের সাথে মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একা নিজের নামাজ পড়ছে, আর কারো পিছনে ক্ষুদ্র এক দল নামাজ পড়ছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি এদেরকে আমি একজন ইমামের পিছনে একত্র করে দেই তবে অনেক ভালো হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি সংকল্প গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব সাহাবীর পিছনে নামাজ পড়ার জন্য একত্র করে দেন। আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর আমি আরেক দিন তাঁর সাথে মসজিদে গিয়ে দেখলাম, সকল লোক তাদের ইমামের পিছনে নামাজ পড়ছে। এটা দেখে হযরত ওমর (রা.) বলেন, এটা কি উত্তম বিদআত [নতুন আবিষ্কার]! তৎপর তিনি বললেন, লোক সকল! তোমরা যে সময় ঘুমিয়ে থাক সে সময়টি হচ্ছে ঐ সময় হতে উত্তম, যাতে তোমরা নামাজ পড়ে থাক। [আব্দুর রহমান বলেন,] 'উত্তম সময়' অর্থে তিনি শেষ রাতকে বুঝিয়েছেন। তখন লোকেরা প্রথম রাতেই তারাবীহ পড়ত। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْبِدْعَةِ وَاَقْسَامِهَا বিদ'আতের পরিচয় ও তার প্রকারভেদ : بِدْعَة শব্দের শাব্দিক অর্থ– নতুন সৃষ্টি তথা যা ইতঃপূর্বে কখনো ছিল না এমন কাজ। যেমন কুরআনে এসেছে– بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আল্লামা নববী বলেন, اَلْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلٰى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ অর্থাৎ বিদ'আত হলো এমন এক নতুন উদ্ভাবিত কার্য, যা ইতঃপূর্বে আর কখনও করা হয়নি। শরিয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলতে এমন সব কার্যকে বুঝানো হয়, যা মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন -এর যুগে ছিল না এবং যা শরিয়তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইসলামের মধ্যে এমন নতুন কাজের উদ্ভাবন করা, যা কুরআন কিংবা হাদীসে নেই। এমনকি হাদীসের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সনদেও নেই, তাই হলো বিদ'আত।

اَقْسَامُ الْبِدْعَةِ বিদ'আতের প্রকারভেদ : বিদ'আত দু' প্রকার। যথা– بِدْعَة سَيِّئَة "বিদ্আতে সায়্যেআ" এবং بِدْعَة حَسَنَة "বিদ্আতে-হাসানা"। যে সব কাজের ভিত্তি শরিয়তের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা বিদ্আতে 'সাইয়্যিআ' এবং যে সব কাজের ভিত্তি শরিয়তের মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা বিদ্আতে 'হাসানা'। বস্তুত হযরত ওমর ফারুকের نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هٰذِهٖ বাক্য হতেই প্রমাণিত হয় যে, বিদ্ আত দু' প্রকার– بِدْعَة سَيِّئَه ও بِدْعَة حَسَنَة

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুরআন, হাদীস ও ইজমা বিরোধী যা কিছুই নতুন উদ্ভাবন করা হয় তাই গোমরাহী। আর যা এ সমস্তের বিরোধী নয়, এরূপ ভালো জিনিস উদ্ভাবন নিন্দিত নয়। বরং উত্তম ও প্রশংসিত। আর كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এ বাক্যের মধ্যে كُلّ এই عَام শব্দটি عَامٌ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ অর্থাৎ "যে ব্যাপকতার মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রমতা স্বীকৃত" উপরন্তু

কিছু নতুন আবিষ্কৃত জিনিস ওয়াজিবের মর্যাদায় পৌঁছেছে। যেমন– আরবি ইসলামি আইনের মূলনীতিশাস্ত্র শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, বাতিল পন্থিদের ভ্রান্ত যুক্তিকে খণ্ডন করা ইত্যাদি।

এরূপভাবে কিছু কিছু বিদ্‌আতে হাসানা বিরাট ছওয়াবের কাজও বটে। যেমন– দীনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, তারাবীহের জামাত কায়েম করা, মুসাফিরদের জন্য সরাইখানা নির্মাণ করা ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু বিদ'আত আছে মুবাহ্ অর্থাৎ এতে না পাপ না পুণ্য। যেমন– মসজিদকে সুন্দর করে সাজানো, খাদ্য ও পানীয় বস্তুর স্বাদ বৃদ্ধি করা, বাসস্থান প্রশস্ত করা ইত্যাদি।

আর বিদ্‌আতে 'সায়্যেআ'-এর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কিছু সরাসরি হারাম, যেমন– জাব্‌রিয়া, কাদ্‌রিয়া, মুরজিয়া এবং মুজাস্‌সিমাহ্ ইত্যাদি বাতিল ফেরকাহ্‌সমূহের আকীদা পোষণ করা। আবার কিছু কিছু মাকরূহ, যেমন–শাফেয়ীদের মতে মসজিদকে খুব সুন্দর করে সাজানো। হানাফীদের মতে ফজর ও আসরের নামাজের পর পারস্পরিক মুসাফাহা অর্থাৎ করমর্দন করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত নতুন উদ্ভাবিত কার্যাবলি শরিয়তের মূল শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঐগুলোকে যদি বিদ'আত বলা হয়, তখনই বিদ্‌আত দু' প্রকার হয় حَسَنَةٌ ও سَيِّئَةٌ আর যে সবগুলো শরিয়তের উৎস হতে গবেষণা করে উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার ভিত্তি শরিয়তের মূলনীতিশাস্ত্র, সেগুলো মূলত বিদ্'আত নয়; বরং সেগুলোকে শরিয়তের প্রতিষ্ঠাতা হতে প্রমাণিত বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় বিদ্'আত দু' প্রকার হবে না, বরং সবগুলো বিদ'আতই 'সায়্যেআ' হবে এবং كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ হাদীসটির ব্যাপকতা আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। তখন একে عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ বলা যাবে না।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ قَوْلِ عُمَرَ وَالنَّبِيِّ ﷺ **হযরত ওমর ও মহানবী ﷺ-এর কথার মধ্যে পরস্পর বিরোধ :** মহানবী ﷺ বলেছেন, "সমস্ত বিদ্‌আতই গোমরাহী"। অথচ হযরত ওমর (রা.) একটি বিদ্'আত সম্পর্কে বললেন, "এটা কি উত্তম বিদ্‌আত"। এর জবাব হলো, হযরত ওমর (রা.) বিদ্'আত দু' প্রকার মনে করতেন, বিদ্‌আতে সায়্যেআহ ও বিদ্‌আতে হাসানা এবং كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ এ হাদীসকে عَامٌّ مَخْصُوْصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ বলে মনে করেছেন, আর হুজুর ﷺ كُلُّ بِدْعَةٍ দ্বারা "প্রত্যেক বিদ্‌আতে সায়্যেআহ" কে উদ্দেশ্য করেছেন। অর্থাৎ হাদীসের বাক্যের মধ্যে سَيِّئَةٌ শব্দটি উহ্য আছে মনে করতে হবে। তখন বাক্যটি হবে كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ এমতাবস্থায় হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর কথায় কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকে না এবং হুজুর ﷺ-এর বাক্যের সাথেও কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ١٢٢٨ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَ اَمَرَ عُمَرُ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ اَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِاِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِيْنَ حَتّٰى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ اِلَّا فِيْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২২৮. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) হযরত উবাই ইবনে কা'ব ও তামীম দারী (রা.)-কে রমজান মাসে লোকদেরকে এগারো রাকাত নামাজ পড়াতে আদেশ করেছেন। ঐ সময় কারী [ইমাম] নামাজে ঐ সকল সূরা পড়তেন যাতে একশত আয়াতেরও বেশি আয়াত রয়েছে। যাতে আমরা দীর্ঘ সময় নামাজে দাঁড়ানোর কারণে লাঠিতে ভর দিতে বাধ্য হতাম। তখন আমরা ফজরের কাছাকাছি সময় ব্যতীত সেই নামাজ হতে অবসর হতাম না। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে তারাবীহের নামাজ এগারো রাকাতের কথা এসেছে। অবশ্য এর মধ্যে বিতর তিন রাকাতও অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিতর বাদে তারাবীহের নামাজ হয় আট রাকাত। অন্যান্য রেওয়ায়াতে বিশ রাকাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর সমাধানে বলা যায়, সম্ভবত হযরত ওমর (রা.) প্রথমে বিতরসহ তারাবীহের নমাজ এগারো রাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীতে তাঁরই সময় তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত নির্ধারিত হয়। অথবা বলা যেতে পারে তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাতই ছিল; কিন্তু মাঝে মধ্যে আট রাকাত পড়া হতো। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ যে মোট কত রাকাত এটা নিয়ে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٢٢٩ الْاَعْرَجِ (رحـ) قَالَ مَا اَدْرَكْنَا النَّاسَ اِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُوْنَ الْكَفَرَةَ فِىْ رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِىْ ثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ وَاِذَا قَامَ بِهَا فِىْ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً رَاَى النَّاسُ اَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২২৯. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত আবদুর রহমান আ'রাজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা লোকদেরকে [অর্থাৎ সাহাবীদেরকে] এরূপ পেয়েছি যে, তারা রমজান মাসে দোয়ায়ে কুনূতে কাফিরদেরকে অভিসম্পাত করতেন এবং আরও দেখেছি যে, ইমাম আট রাকাতে সূরা বাকারা পাঠ করতেন। যখন বারো রাকাতে তা পড়তেন, তখন লোকেরা মনে করত যে, তিনি খুব হাল্‌কা তথা সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَلْعَنُوْنَ الْكَفَرَةَ فِىْ رَمَضَانَ **-এর ব্যাখ্যা :** ইসলামের প্রাথমিক যুগে তখনকার কাফির মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা পোষণ করত, এমনকি বিভিন্ন বাহানায় মুসলমানদেরকে নিয়ে শহীদ করে দিত, ফলে সাহাবীগণ রমজান মাসে বিতরের নামাজে ইসলাম ও মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে দোয়া এবং কাফিরদের ধ্বংসের নিমিত্তে বদদোয়া করতেন। আল্লামা জাযারী দোয়ায়ে কুনূত সম্পর্কে লিখেন যে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রমজানের অর্ধেক হলে কাফিরদের জন্য বদদোয়া করা হতো।

وَعَنْ ١٢٣٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ (رحـ) قَالَ سَمِعْتُ اُبَيًّا يَقُوْلُ كُنَّا نَنْصَرِفُ فِىْ رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ فَوْتِ السَّحُوْرِ وَفِىْ اُخْرٰى مَخَافَةَ الْفَجْرِ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২৩০. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ বকর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমরা রমজান মাসে তারাবীহের নামাজ হতে অবসর হয়ে আসতাম এবং সাহ্‌রী খানার সময় ফউত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় খাদেমদেরকে তাড়াতাড়ি খানা প্রস্তুতের জন্য তাকিদ করতাম। অপর এক বর্ণনায় আছে, ফজর বা ভোর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়। –[মালেক]

وَعَنْ ١٢٣١ عَائِشَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِىْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَافِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ فِيْهَا اَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُوْدِ بَنِىْ اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا اَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ

১২৩১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, [আয়েশা] তুমি কি জান এই রাতে অর্থাৎ শাবানের অর্ধ রাতে [বা পনেরো তারিখের রাতে] কি কি ঘটে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাতে কি ঘটে তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ রাতে লিপিবদ্ধ হয় এ বছর যত আদম সন্তান জন্মলাভ করবে। এ রাতেই লিপিবদ্ধ করা হয় এ বছর যত আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করবে। এ রাতেই মানুষের

بَنِى آدَمَ فِى هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَقَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثًا قُلْتُ وَلَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى هَامَتِهِ فَقَالَ وَلَا اَنَا إِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ يَقُوْلُهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

আমলসমূহ [আসমানে] উঠানো হয় এবং এ রাতেই মানুষের রিজিকসমূহ অবতীর্ণ করা হয়।

তারপর হযরত আয়েশা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত [নিজের আমলের জোরে] কোনো ব্যক্তি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার করে বললেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত ছাড়া কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনিও না? [এটা শুনে] রাসূলে কারীম ﷺ নিজ হাত আপন পবিত্র মাথায় স্থাপন করলেন এবং বললেন, আমিও আল্লাহর রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না, তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের ছায়ায় আমাকে ঢেকে নেন। এই বাক্য তিনি তিনবার বললেন।- [বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি জান এই রাতে অর্থাৎ শাবানের অর্ধ রাতে কি কি বৃহত্তর কার্যাবলি সংগঠিত হয়ে থাকে? উল্লিখিত বাক্যের মধ্যে مَا অব্যয়টি إِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِى বা সাব্যস্তমূলক প্রশ্নবোধক অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ইসতিফহামে তাকরীরী দ্বারা এ রাতের সীমাহীন গুরুত্ব এবং এ রজনীতে যা কিছু সংগঠিত হয় তার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

اَنْ يَكْتُبَ كُلَّ هَالِكٍ مِنْ بَنِىْ آدَمَ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সাবানের মধ্যবর্তী রজনীতে আগামী এক বছরের জীবন মৃত্যুর হিসাব লেখা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয়বার লেখা হয়। কেননা প্রথমবার লাওহে মাহফূযে লেখা হয়েছে। আর এখানে বিশেষভাবে বনী আদমের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, মানবজাতি যে, اَشْرَفُ الْمَخْلُوْقَاتِ এ বিশেষত্ব বুঝাবার জন্যই তাদেরকে উল্লেখ করেছেন, অন্যথা সব সৃষ্টির বিষয়ও তো এ রাতে লেখা হয়।

دَفْعُ التَّعَارُضِ দ্বন্দ্বের সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাতে পরবর্তী এক বছরের জীবন-মৃত্যুর হিসাব করা হয়, আমলনামা আসমানে উত্তোলন করা হয় এবং রিজিক অবতীর্ণ করা হয়। এক কথায় সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মের পুরোপুরি সিদ্ধান্ত করা হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ এটা কদরের রাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যা রমজান মাসের শেষ দশকের কোনো এক বেজোড় রজনীতে বিদ্যমান। এখন বাহ্যত কুরআন এবং হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

এর সমাধান হলো, কদরের রাত্রিতে যা কিছুর প্রকাশ ঘটে অর্ধ শাবানের রাতেই এর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ হয়ে থাকে।

অথবা তা দুই রজনীর এক রজনীতে মৌলিকভাবে এবং অপর রজনীতে বিস্তারিতভাবে প্রত্যেক কর্মের মাঝে পার্থক্য করা হয়।

অথবা উভয় রজনীর এক রজনীতে পার্থিব জগতের ক্রিয়াকর্মের এবং অপর রজনীতে পরজগতের ক্রিয়াকর্মের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কুরআনের সাথে আলোচ্য হাদীসের বিরোধ ও তার সমাধান ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না। অথচ আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ যে [নেক] আমল তোমরা করেছ এর দ্বারাই তোমরা জান্নাতের অধিকারী হবে। এ আয়াতে দেখা যায় যে, আল্লাহর রহমতের কোনো উল্লেখ নেই। বাহ্যত হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। এর সমাধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন—

১. আমল হলো জান্নাতে অনুপ্রবেশের বাহ্যিক অবলম্বন মাত্র। বস্তুতপক্ষে প্রকৃত অবলম্বন হলো আল্লাহর অনুগ্রহ-অনুকম্পা ও তাঁর মেহেরবানী। আমল যতই ভাল থাকুক না কেন আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত কেউই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

২. কারো মতে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহেই প্রবেশ করবে। তবে আমলের তারতম্যের কারণে তাদের মর্যাদার তারতম্য হবে।

وَعَنْ ١٢٣٢ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ اِلَّا لِمُشْرِكٍ اَوْ مُشَاحِنٍ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَفِىْ رِوَايَتِهٖ اِلَّا اثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ)

১২৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের রাতে [অর্থাৎ শবে বরাতে] সকল সৃষ্টিকুলের প্রতি মনোযোগ দেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তি ছাড়া সকল সৃষ্টিকুলকে মাফ করে দেন। [ইবনে মাজাহ্] কিন্তু ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, উক্ত বর্ণনায় রয়েছে, 'তবে দু' ব্যক্তি ব্যতীত– বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ও প্রাণহত্যাকারী'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** "শাবানের মধ্যবর্তী রজনীতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি মনোযোগ দেন বা স্বয়ং অবতীর্ণ হন" এর অর্থ হলো, বান্দার প্রতি বিশেষ রহমত নাজিল করেন। আর এ হাদীসে যদিও দুই শ্রেণীর লোককে ক্ষমা হতে বহির্ভূত রাখা হয়েছে; কিন্তু এ প্রসঙ্গে অন্যান্য সহীহ্ হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ-সূরা পানকারী, জুলুম-নির্যাতনকারী, যাদুকর, গণক-ঠাকুর ও বাজনা-বাদক প্রভৃতিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে একটি অপরটির বিপরীত নয়। কারণ পরিস্থিতি ও উপস্থিত শ্রোতার অবস্থা অনুসারে হুজুর ﷺ পর্যায়ক্রমে কোথাও কয়েক শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আবার কোথাও সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে এ ধরনের নজির অনেক রয়েছে।

وَعَنْ ١٢٣٣ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَنْزِلُ فِيْهَا لِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرُ لَهٗ اَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهٗ اَلَا مُبْتَلًى فَاُعَافِيْهِ اَلَا كَذَا اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২৩৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন অর্ধ শা'বানের রাত বা শবে বরাতের রজনী আসে সে রজনীতে তোমরা অবশ্যই নফল নামাজ পড়ো এবং দিনে রোজা রেখো। কেননা সে রাতে সূর্যাস্তের পর পরই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, কোনো ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি ক্ষমা করে দেব! কোনো রিজিক প্রার্থনাকারী আছে কি যাকে আমি রিজিক প্রদান করব এবং কোনো বিপন্ন-বিপদগ্রস্ত আছে কি যাকে আমি বিপদমুক্ত করব এবং এভাবে আরো অরো ব্যক্তিকে ফজর হওয়া পর্যন্ত ডাকতে থাকেন। –[ইবনে মাজাহ্]

بَابُ صَلٰوةِ الضُّحٰى

পরিচ্ছেদ : সালাতুয যোহা

সূর্যোদয়ের পর হতে বেলা বাড়তে থাকাকে اَلضُّحٰى বলা হয়। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, দিনের প্রথম ভাগে যখন সূর্য উদিত হয় এবং তার কিরণ পূর্ণ বিকশিত হয় সে সময়কে যোহা বলা হয়, যেমন– পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا অর্থাৎ সূর্যের শপথ যখন তা আলোকিত হয়।

কারো মতে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব সময়ের চার ভাগের এক ভাগ অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময়কে اَلضُّحٰى বলা হয়। আর এ সময়ে যে নামাজ পড়া হয় তাকে صَلٰوةُ الضُّحٰى বলা হয়। একে এশরাক ও চাশতের নামাজও বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, صَلٰوة-এর পূর্বে وَقْت শব্দটি مَحْذُوْف রয়েছে, তাই পূর্ণ বাক্যটি হলো– صَلٰوةُ وَقْتِ الضُّحٰى

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٣٤- عَنْ اُمِّ هَانِىٍ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ فَلَمْ اَرَ صَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهٗ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ وَقَالَتْ فِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى وَ ذٰلِكَ ضُحًى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৩৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর [উম্মে হানীর] ঘরে আসলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর আট রাকাত নামাজ পড়লেন। উম্মে হানী বলেন, এ নামাজ হতে সংক্ষিপ্ত নামাজ আমি আর কখনও দেখিনি। তবে তিনি রুকু ও সেজদা পুরোপুরিভাবে আদায় করেছেন। উম্মে হানী অপর এক বর্ণনায় বলেছেন তা যোহার সময় ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَقْتُ صَلٰوةِ الضُّحٰى সালাতুয যোহার সময় : صَلٰوةُ الضُّحٰى-এর সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ– বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আইনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, দিনের প্রথম ভাগে সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই صَلٰوةُ الضُّحٰى-এর সময় আরম্ভ হয়– لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تُعْجِزُنِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ

ইমাম নববী (র.) الروضة গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যোহার নামাজ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আরম্ভ হয়, তবে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত বিলম্ব করা মোস্তাহাব।

شَرْحُ الْمُهَذَّبِ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, দিবসের চারভাগের একভাগ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরই হলো صَلٰوةُ الضُّحٰى-এর উত্তম সময়।

মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ اَلتَّعْلِيْقُ الصَّبِيْحُ গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ এ নামাজ দু' সময় পড়তেন। প্রথমত যখন সূর্য উপরে উঠে যেত তখন তিনি দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। একেই মাশায়েখে কেরাম এশরাকের নামাজ নামে অভিহিত করেছেন। দ্বিতীয়ত সূর্য যখন পূর্বাকাশের চারিভাগের একভাগ উপরে উঠে যেত তখন রাসূল ﷺ চার রাকাত নামাজ পড়তেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ عَلِىٍّ (رضـ) كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا قَيْدَ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَمْهَلَ حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الضُّحٰى صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ . (اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

যোহার নামাজের হুকুম حُكْمُ صَلٰوةِ الضُّحٰى : যোহার নামাজের হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কিছু সংখ্যকের মতে صَلٰوةُ الضُّحٰى রাসূল ﷺ-এর উপর ওয়াজিব ছিল। এ অভিমত সঠিক নয়। কেননা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা উক্ত অভিমত অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحٰى অবশ্য রাসূল ﷺ যে যোহার নামাজ পড়েছেন এটা প্রমাণিত হয়। তবে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা ওয়াজিব না হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

কারো মতে صَلٰوةُ الضُّحٰى -রাসূল ﷺ-এর বিশেষত্ব অবশ্য ছিল– এ অভিমতও যথার্থ নয়। কেননা তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

কেউ কেউ صَلٰوةُ الضُّحٰى বলে যে কোনো নামাজ আছে এটাই অস্বীকার করেছেন। এমনকি একে কতক লোক বিদ'আত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা নিজেদের সপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেছেন–

(١) إِنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) قَالَ إِنَّهَا بِدْعَةٌ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (رض) مَرَّةً نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ وَقَالَ مَرَّةً إِسْتَبْدَعَ الْمُسْلِمُوْنَ بِدْعَةً اَفْضَلَ .

(٢) رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كُنْتُ اَذْهَبُ إِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) السَّنَةَ كُلَّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا الضُّحٰى .

(٣) قَالَ اَنَسٌ (رض) صَلٰوةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ كَانَتْ سُنَّةَ الْفَتْحِ لَا سُنَّةَ الضُّحٰى .

বজলুল মাজহুদ, ফাতহুল বারী এবং আশয়াতুল লুময়াত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে যে, হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীসহ অধিকাংশ আলেমদের মতে صَلٰوةُ الضُّحٰى মোস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের অভিমতের অনুকূলে নিম্নোক্ত হাদীসসহ বহু দলিল উপস্থাপন করেছেন–

عَنْ عَائِشَةَ (رض) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ صَلٰوةَ الضُّحٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَزِيْدُ مَاشَاءَ اللّٰهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

উপরিউক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম صلوة الضحى সম্পর্কে কয়েকটি বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করেছেন–

১. صَلٰوةُ الضُّحٰى বা চাশ্তের নামাজ মোস্তাহাব।
২. কোনো কারণ ব্যতীত এর সূচনা হয়নি। অর্থাৎ এটা বিশেষ কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
৩. মূলত এটা মোস্তাহাব নয়।
৪. কখনও কখনও এটা পড়া মোস্তাহাব এবং কখনও কখনও তা পরিহার করাও মোস্তাহাব। অথাৎ এটা সদাসর্বদা আদায় করা যাবে না। ইমাম আহমদ (র.)-এর এ ধরনের একটি অভিমত রয়েছে।
৫. এটা বিদ'আত বা নতুন উদ্ভাবিত। যা হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অভিমত।
৬. এটা ঘরে পড়া মোস্তাহাব। (هٰذَا كُلُّهُ فِىْ فَتْحِ الْمُلْهِمِ وَالْبَذْلِ وَالْعَيْنِىْ وَالتَّعْلِيْقِ وَاَشْعَةِ اللُّمْعَاتِ)

جَوَابًا لَهُمْ যারা صَلٰوةُ الضُّحٰى-কে বিদ'আত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং ইবনে ওমরের উক্তি উল্লেখ করেছেন এর বিভিন্ন উত্তর প্রদান করা হয়েছে–

১. صَلٰوةُ الضُّحٰى বা চাশ্তের নামাজ প্রকাশ্যে মসজিদে পড়া বিদ'আত, ঘরে বসে পড়া বিদআত নয়। এটা হলো হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উক্তির ব্যাখ্যা।
২. অথবা এর উত্তর হলো ওয়াজিব নামাজের ন্যায় তা সদাসর্বদা আদায় করা বিদ'আত।

١٢٣٥ - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رض) كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ صَلٰوةَ الضُّحٰى قَالَتْ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৩৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] বিবি হযরত মুয়াযা (র.) বলেন। আমি একদা হযরত আয়েশা (রা.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহা বা চাশ্তের নামাজ কত রাকাত পড়তেন? তিনি বললেন, চার রাকাত। তবে যখন আল্লাহ তৌফিক দিতেন তখন আরও কিছু বেশি পড়তেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ رَكَعَاتِ الضُّحٰى **চাশতের রাকাত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** صَلٰوةُ الضُّحٰى বা চাশতের নামাজ মোট কত রাকাত এ বিষয়ে ইমাদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যা নিম্নরূপ–

※ কিছু সংখ্যকের মতে চাশতের নামাজ দু' রাকাত, যেমন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে এসেছে যে,

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ بِثَلَاثٍ صِيَامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ .

※ কারো মতে চার রাকাত, যথা– كَمَا فِىْ حَدِيْثِ نُعَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَا تُعْجِزْنِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ .

※ কারো মতে ছয় রাকাত যেমন– كَمَا فِىْ حَدِيْثِ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ

※ অন্য একদলের মতে আট রাকাত, যথা–

كَمَا فِىْ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى حُرَّةٍ فَصَلَّى الضُّحٰى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ .

※ আরেক বর্ণনায় বারো রাকাতের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত সকল রাকাতের কথা একই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি হলো–

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رضـ) يَقُوْلُ لِاَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) اَوْصِيْنِىْ قَالَ سَاَلْتَنِىْ عَمَّا سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى سِتًّا لَمْ يَلْحَقْهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ وَمَنْ صَلّٰى ثَمَانِيًا كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلّٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ . (كَمَا فِى الْعَيْنِىِّ)

তবে অধিকাংশ ওলামার পছন্দনীয় অভিমত হলো, সালাতুয যোহা চার রাকাত। ইমাম হাকিম বলেন, আমি বহু সংখ্যক হাদীসের হাফিজ ও ইমামের সাথে ছিলাম, তারা চার রাকাতের অভিমতটি অবলম্বন করতেন। কেননা, চার রাকাত সম্পর্কে সহীহ হাদীসমূহ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলার বাণী وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى -এর ব্যাখ্যায় নবীকরীম ﷺ বলেন, তোমরা কি জান এখানে وَفّٰى -এর ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তিনি নিয়মিত চার রাকাত সালাতুয যোহা পড়তেন। [আইনী, ফাতহুল মুসলহিম, আশিয়্যাতুল লুমআত]

১২৩৬ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সকাল হতেই তোমাদের প্রত্যেকটি হাড়ের জন্য একটি সদ্কা করা আবশ্যক হয়। তবে [জেনে রাখবে] প্রত্যেকবার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা এক একটি সদ্কা, প্রত্যেকবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা এক একটি সদকা, প্রত্যেকবার 'আল্লাহু আকবার' বলা এক একটি সদ্কা, ভাল কাজের জন্য আদেশ করা একটি সদ্কা এবং খারাপ কাজ হতে নিষেধ করাও একটি সদ্কা বিশেষ এবং এ সমস্ত কিছুর পরিবর্তে যোহর দু' রাকাত নামাজ পড়াই যথেষ্ট হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُلَامٰى-এর অর্থ : سُلَامٰى 'সুলামা' অর্থ– অঙ্গুলির হাড়। তবে এখানে গোটা শরীরের হাড় বা গ্রন্থি উদ্দেশ্য। এটা বহুবচন, একবচনে سُلَامَةٌ 'সালামাতুন'। আবার কারো মতে এর একবচন ও বহুবচন উভয়টির মধ্যেই سُلَامٰى ব্যবহৃত হয়। عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى বাক্য দ্বারা যদিও ওয়াজিবের অর্থ বুঝায় প্রকৃতপক্ষে এখানে মোস্তাহাব অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

اَلصَّدَقَةُ لِكُلِّ سُلَامٰى **গ্রন্থির সাদ্কা আদায় করার তাৎপর্য :** আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুস্বাস্থ্য দান করেছেন। আমরা একে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করতে পারি। অনেক লোক এমনও আছে যে, পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা সত্ত্বেও তা কাজে লাগাতে পারে না। এটাও আল্লাহর মেহেরবানি যে, তিনি আমাদের তাসবীহ-তাহলীলকে সদ্কা হিসাবে কবুল করে থাকেন। তাই আমাদের তা আদায় করা উচিত।

وَعَنْ ١٢٣٧ - زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) اَنَّهُ رَاٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلٰوةَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمُضُ الْفِصَالُ .

১২৩৭. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা কিছু লোককে যোহর নামাজ পড়তে দেখে বললেন, এরা জানে যে, এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে যোহর নামাজ পড়া আরও বেশি উত্তম কাজ [অর্থাৎ এরা যোহর নামাজ প্রথম ওয়াক্তে পড়ছে। এর চেয়ে সূর্যের উত্তাপ বৃদ্ধি পেলে যোহর নামাজ পড়া উত্তম]। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আউয়াবীনের নামাজ তখনই [পড়তে হয়] যখন উটের বাচ্চাগুলো রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلٰوةَ فِىْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ এ লোকগুলো ধৈর্যধারণ করেনি এবং এ নামাজের উত্তম ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই তাড়াহুড়া করে প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করছে। বস্তুত বর্ণনাকারী তাদের এ কাজটিকে অপছন্দ করেছেন। কেননা দিনের প্রত্যেক এক-চতুর্থাংশে যে কোনো একটি নামাজ বাস্তবায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এটা সূর্য বেশ কিছুদূর উপরে উঠে গেলে পড়লেই সাব্যস্ত হতে পারে। কাজেই প্রথম ওয়াক্তের চেয়ে শেষ ওয়াক্তে পড়াই উত্তম। অথচ তারা জানে যে, এটা জায়েজ ওয়াক্ত বটে, তবে উত্তম ওয়াক্ত নয়।

مَعْنَى الْاَوَّابِيْنَ **আউয়াবীনের অর্থ :** উল্লেখ্য যে, اَلْاَوَّابِيْنَ শব্দটি اَلْاَوْبُ হতে গঠিত। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো, তওবা বা অনুশোচনার মাধ্যমে অপরাধ হতে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

কারো মতে এর অর্থ হলো আনুগত্যকারী।

আবার কেউ বলেন, এর অর্থ হলো তাসবীহ পাঠকারী।

কোনো কোনো সুফীবিদগণ বলেন, اَلتَّوَّابُ অর্থ– তওবার মাধ্যমে অপরাধ হতে ফিরে আসা। আর اَلْاَوَّابُ অর্থ– তওবার মাধ্যমে গাফলাত বা অমনোযোগী হতে প্রত্যাবর্তন করা। উল্লেখ্য, হাদীসে বর্ণিত صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْنَ দ্বারা صَلٰوةُ الضُّحٰى বা চাশ্তের নামাজকে বুঝানো হয়েছে। মাগরিবের নামাজের পরবর্তী নফল নামাজের সালাতুল আউয়াবীন নামকরণ কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

تَرْمُضُ الْفِصَالُ **-এর অর্থ :** اَلْفِصَالُ শব্দটি اَلْفَصِيْلُ-এর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ– উষ্ট্রীর বাচ্চা। যে বাচ্চা তার মা হতে দুধ ছেড়ে পৃথক হয়ে গেছে তাকে فَصِيْل বলা হয়। تَرْمُضُ এটা رَمْض ধাতু হতে নির্গত, অর্থ– উত্তপ্ত হওয়া। সূর্যের তাপ বালুর উপর পতিত হওয়ায় যে গরম হয় তাকে اَلرَّمْضَاءُ বলা হয়। এখানে অর্থ রৌদ্রের উত্তাপে উটের বাচ্চার পা পুড়তে থাকা। এ হাদীসাংশের উদ্দেশ্য হলো, যখন সূর্য একটু উপরে উঠবে এবং রৌদ্র কিছুটা প্রখর হবে তখনই صَلٰوةُ الضُّحٰى বা চাশতের নামাজ পড়তে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٣٨ - اَبِى الدَّرْدَاءِ وَاَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِرْكَعْ لِىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ . (رَوَاهُ

১২৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা ও আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাবারক ও তা'আলার পক্ষ হতে বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার উদ্দেশ্যে চার রাকাত নামাজ পড়, দিনের শেষাংশে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব। অর্থাৎ দিনের দ্বিতীয়ার্ধেই আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব। –[তিরমিযী। কিন্তু

التِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَمَّارِ الْغَطْفَانِيِّ وَاَحْمَدُ عَنْهُمْ)

আবূ দাউদ ও দারেমী উক্ত হাদীস নোয়াইম ইবনে আম্মার গাত্ফানী হতে এবং ইমাম আহমদ তাদের সকলের নিকট হতে [অর্থাৎ তিনজন : আবুদ দারদা, আবূ যার ও নোয়াইম ইবনে আম্মার গাত্ফানী হতে] বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُ بِصَلٰوةِ اَوَّلِ النَّهَارِ দিবসের প্রথমাংশের নামাজ দ্বারা উদ্দেশ্য : দিবসের প্রথমভাগের নামাজ দ্বারা কোন নামাজ উদ্দেশ্য এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. অধিকাংশের মতে এর দ্বারা صَلٰوةُ الضُّحٰى বা চাশতের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. কারো মতে এর দ্বারা এশরাকের নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

৩. অন্য একদল বলেন, এর দ্বারা ফজরের সুন্নত ও ফরজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

وَعَنْ ١٢٣٩ بُرَيْدَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْاِنْسَانِ ثَلٰثُ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ مَفْصَلًا فَعَلَيْهِ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوْا وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحٰى تُجْزِئُكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১২৩৯. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষের শরীরে মধ্যে তিনশত ষাটটি জোড়া বা গ্রন্থি রয়েছে, মানুষের উচিত প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য এক একটি সদ্কা করা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! এরূপ [সদ্কা করার] সামর্থ্য কার আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মসজিদে পড়ে থাকা থুথু মাটিতে পুঁতে রাখা সদ্কা সমতুল্য এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলাও সদকা সমতুল্য। যদি এর কোনোটিই করার সুযোগ না পাও, তবে যোহর দু' রাকাত নামাজই তোমার জন্য যথেষ্ট। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَضِيْلَةُ صَلٰوةِ الضُّحٰى وَخِدْمَةُ الْعَامَّةِ যোহর নামাজ ও জনকল্যাণমূলক কাজের ফজিলত : উক্ত হাদীস হতে দু'টি বিষয় স্পষ্টভাবে জানা যায়। একটি হলো যোহা বা চাশ্তের নামাজ ন্যূনতম পক্ষে দু' রাকাতও পড়া যায়, তবে চার রাকাত পড়াই উত্তম। আর দ্বিতীয়টি হলো, নফল নামাজ হতে জনকল্যাণমূলক কার্য উত্তম। মসজিদের থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলা, রাস্তার ক্ষতিকারক বস্তু সরিয়ে ফেলা, এগুলো কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্গত। এ ধরনের কাজ আর্থিক সদ্কার সমতুল্য। কোথাও দু' দলের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হতে দেখলে তা মীমাংসা করে দেওয়া, রাস্তায় পুল বা সাঁকো নির্মাণ বা মেরামত করে দেওয়া, ময়লা পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশন ও পরিষ্কার করা ইত্যাদি হাজারো রকমের সমাজকল্যাণমূলক কাজ রয়েছে যা নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম কাজ। তবে শর্ত হলো এ সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করতে হবে। এ সমস্ত কাজের কোনো সামর্থ্য না থাকলে হুজুর ﷺ যোহার দু' রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে বলেছেন। মোটকথা, হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, নফল ইবাদতের চেয়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

وَعَنْ ١٢٤٠ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحٰى ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللّٰهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ)

১২৪০. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি যোহার বারো রাকাত নামাজ পড়বে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত স্বর্ণ দ্বারা একটি ইমারত নির্মাণ করেন। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজা। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা এ বর্ণনা সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্র আমার জানা নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, চাশতের নামাজ বারো রাকাত, আর এটাই হলো সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা, এর থেকে কমও পড়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٢٤١ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى لَا يَقُوْلُ اِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১২৪১. **অনুবাদ** : হযরত মুয়ায ইবনে আনাস জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ শেষ করে অবসর হয় এবং নিজের নামাজের স্থানে [সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত] বসে থাকে এবং দু' রাকাত যোহার নামাজ পড়ে এবং ইত্যবসরে উত্তম কথাবার্তা ছাড়া অন্য কোনো কথা না বলে, তার যাবতীয় [ছোটখাট] গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়েও অধিক হয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : ফজর নামাজের পর সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত সময়টি হলো একটি উত্তম সময়। এ সময় কেউ পার্থিব কথাবার্তা না বলে যদি জায়নামাজে বসে থাকে এবং চাশতের দু' রাকাত নামাজ আদায় করে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। এর দ্বারা অবশ্য সগীরা গুনাহ উদ্দেশ্য। আর زَبَدُ الْبَحْرِ বা সমুদ্রের ফেনা দ্বারা অধিক বুঝানো উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٤٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلٰى شُفْعَةِ الضُّحٰى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১২৪২. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি যোহার দু' রাকাত নামাজের প্রতি যত্নবান হয়, তার যাবতীয় [সগীরা] গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও [আধিক্যের দিক দিয়ে] তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ١٢٤٣ - عَائِشَةَ (رض) اَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَقُوْلُ لَوْ نُشِرَ لِىْ اَبَوَاىَ مَا تَرَكْتُهَا . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যোহার নামাজ আট রাকাত পড়তেন এবং বলতেন আমার পিতামাতাকেও যদি এই সময় জীবিত করে দেওয়া হয়, তবু [তাঁদের একবার দেখার জন্যও] আমি এ নামাজ ত্যাগ করব না। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এ নামাজ আমার নিকট এত প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার পিতামাতাকে জীবিত করে আমার কাছে নিয়ে আসা হয় তবে তাদের এক নজর দেখার চেয়ে এটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। হযরত আয়েশা (রা.)-এর উক্তি হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ নামাজ ফরজ নামাজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও মানগতভাবে এটা ফরজ নয়। কারণ ফরজ নামাজ ফউত হলে তার জন্য কাযা আদায়ের ব্যবস্থা আছে, অথচ এর কাজা নেই। আর ফরজ হলো আল্লাহ্র হুকুম এবং এটা হলো ফরজের ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিপূরক এবং পিতামাতাকে পরেও দেখা যাবে।

وَعَنْ ١٢٤٤ - اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتّٰى نَقُوْلَ لَا يُصَلِّيْهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১২৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যোহার নামাজ [এমনভাবে] পড়তে থাকতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি বুঝি আর এ নামাজ ত্যাগ করবেন না। যখন তিনি এ নামাজ ছেড়ে দিতেন, যাতে আমরা মনে করতাম যে, তিনি আর তা পড়বেন না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** যোহার নামাজ রাসূল ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বে মাঝে মাঝে তা ছেড়ে দিতেন, এটা ফরজ হয়ে যাবার আশঙ্কায় ছেড়ে দিতেন, যাতে করে উম্মতের উপর কোনো বিষয় কষ্টকর হয়ে না দাঁড়ায়।

وَعَنْ ١٢٤٥ - مُوَرِّقٍ الْعِجْلِىِّ (رحـ) قَالَ قُلْتُ لِاِبْنِ عُمَرَ تُصَلِّى الضُّحٰى قَالَ لَا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لَا قُلْتَ فَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَالنَّبِىُّ ﷺ قَالَ لَا اِخَالُهُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১২৪৫. **অনুবাদ :** [তাবেয়ী] হযরত মুয়াররিক ইজ্লী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি যোহার নামাজ পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তবে হযরত ওমর (রা.) [পড়তেন কি?] উত্তরে বললেন, তিনিও না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) পড়তেন কি? তিনি বললেন, তাও না। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে মহানবী ﷺ পড়তেন কি? উত্তরে বললেন, আমার মনে হয় তিনিও পড়তেন না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা কেউই এ নামাজ নিয়মিত পড়েননি। বস্তুত নবী করীম ﷺ যে এ নামাজ পড়েছেন তা উপরে উল্লিখিত হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّطَوُّعِ

পরিচ্ছেদ : নফল নামাজ

اَلتَّطَوُّعُ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ -এর মাসদার طَوْعٌ মূলধাতু হতে নিগর্ত। শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْاِنْقِيَادُ বা আনুগত্য প্রকাশ করা। শরিয়তের পরিভাষায় যাবতীয় নফল বা অতিরিক্ত ইবাদত পালন করাকে تَطَوُّعٌ বলা হয়। যেমন– তাহিয়্যাতুল অজু, তাহিয়াতুল মসজিদ, সালাতুত তাসবীহ ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে সে সব নামাজ ও দোয়ার হাদীসসমূহ সংকলিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٤٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَا بِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلَامِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ مَاعَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجٰى عِنْدِىْ اِنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِىْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَانَهَارٍ اِلَّا صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফজরের নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত বেলাল (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে বেলাল! বল দেখি, তুমি ইসলাম গ্রহণের পর এমন আশাব্যঞ্জক কি আমল করেছ, যার বিরাট ছওয়ারের আশা তুমি করতে পার? কেননা আমি জান্নাতে আমার সম্মুখে তোমার পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। উত্তরে হযরত বেলাল (রা.) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এটা ছাড়া এমন কোনো কাজ করিনি, যার বিরাট ছওয়াবের আশা করা যেতে পারে। তা হলো আমি রাত বা দিনে যখনই পবিত্র হয়েছি অর্থাৎ অজু করেছি তখনই সে অজু দ্বারা আমি নামাজ পড়েছি, যে পরিমাণ নামাজের [আল্লাহ কর্তৃক] আমাকে তৌফিক দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ **-এর মর্মার্থ :** মহানবী ﷺ কিভাবে এবং কখন হযরত বেলালের জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. কারো মতে তিনি মি'রাজ রজনীতে জান্নাত ও জাহান্নাম ভ্রমণের সময় শুনতে পেয়েছেন।

২. অথবা রাসূল ﷺ নিদ্রাবস্থায় শুনতে পেয়েছেন।

৩. কেউ বলেন যে, তিনি সজাগ অবস্থায় তা অনুধাবন করেছিলেন।

৪. অথবা অন্য কোনো সময় রূহানী মি'রাজে তিনি তা শুনেছেন।

١٢٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ قَالَ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهٗ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১২৪৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সকল কাজে [আল্লাহ তা'আলার নিকট] ইস্তিখারা করার নিয়ম ও দোয়া শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআন মজীদের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন সে যেন ফরজ নামাজ ব্যতীত দু' রাকাত নামাজ পড়ে, অতঃপর বলে, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ .... অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে ভাল দিক [জ্ঞাত হওয়া] প্রার্থনা করছি। তোমারই কুদরতের দ্বারা তোমারই নিকট [এর অর্জনের] ক্ষমতা চাচ্ছি; আমি তোমার মহান অনুগ্রহ হতে ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান; অথচ আমি কোনো কিছুতে ক্ষমতা রাখি না। তুমি [আমার ইঙ্গিত বস্তুর] জ্ঞান রাখ; অথচ আমি এর কিছুই জানি না। তুমি [অদৃশ্য বস্তু] গায়েবসমূহ সম্পর্কে সম্যক অবগত। হে আল্লাহ! আমি যে কাজ করতে চাই এই কাজটি যদি আমার জন্য ভাল হবে জান– আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবনধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে, অথবা তিনি বলেছেন [রাবী সন্দেহ] 'আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে' তবে তুমি তা আমার জন্য ব্যবস্থা কর এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য এতে কল্যাণ দান কর। আর যদি এই কাজ আমার জন্য খারাপ বা অকল্যাণকর জান–আমার দীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে এবং আমার কাজের শেষ ফলের ব্যাপারে অথবা রাসূল ﷺ বলেছেন– 'আমার ইহ ও পরকালের ব্যাপারে' তাহলে তুমি একে আমার নিকট হতে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও তা হতে ফিরিয়ে রাখ। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর, তা যেখানেই আছে। অতঃপর তুমি আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখ। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, সে [প্রার্থনাকারী] যেন নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ের নাম করে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা شَرْحُ الْحَدِيْثِ : 'ইস্তিখারা' একটি উত্তম কাজ। মুসলমানের কোনো কাজ যার ভাল কিংবা মন্দ স্পষ্ট নয় তার জন্য ইস্তিখারা করা মোস্তাহাব। নামাজের পর খুব বিনয়ের সাথে দোয়া করবে। অতঃপর আর কোনো কথাবার্তা না বলে পাক-পবিত্র বিছানায় ডান কাতে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে থাকবে এবং যে কাজের জন্য ইস্তিখারা করছে তা মনে মনে কল্পনা করতে থাকবে। আশা করা যায় তিন দিনের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা দেখতে পাবে। ইস্তিখারায় কোনো স্বপ্ন দেখা যাওয়া আবশ্যক নয়; বরং ইস্তিখারা করার পর যেদিকে মন ধাবিত হয় সেটাকেই কল্যাণকর মনে করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٤٨ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ قَرَأَ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْاۤ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ اِلَّا اَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمْ يَذْكُرِ الْاٰيَةَ)

১২৪৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) আমাকে বলেছেন। আর হযরত আবূ বকর সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি কোনো গুনাহ্ করে, অতঃপর উঠে [অজু-গোসল দ্বারা] আবশ্যক পবিত্রতা লাভ করে এবং কিছু নফল নামাজ পড়ে তারপর আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে [অনুতপ্ত হৃদয়ে] মাগফিরাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ অবশ্যই তার অপরাধ মাফ করে দেন। অতঃপর হুজুর ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করেন– وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْاۤ اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ – অর্থাৎ আর যারা কোনো পাপের কাজ করে অথবা নিজের প্রতি অবিচার করে [অনুতপ্ত হৃদয়ে] আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপ কাজের জন্য মাগফিরাত কামনা করে ...। [সূরা আলে ইমরান]–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। কিন্তু ইবনে মাজাহ্ কুরআনের আয়াতটি উল্লেখ করেননি।]

وَعَنْ ١٢٤٩ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا حَزَبَهٗ اَمْرٌ صَلّٰى – (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১২৪৯. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -কে যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট বিপদ চিন্তিত করে তুলত, তখন তিনি [কিছু নফল] নামাজ পড়তেন। [নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতেন]।–[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٢٥٠ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ بِمَا سَبَقْتَنِيْ اِلَى الْجَنَّةِ مَادَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ اِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ اَمَامِيْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَذَّنْتُ قَطُّ اِلَّا صَلَّيْتُ

১২৫০. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে উঠলেন [নামাজ শেষে] বেলালকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজের বদৌলতে তুমি আমার আগে জান্নাতে পৌছলে? কেননা, আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করেছি তখনই তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি। তখন হযরত বেলাল (রা.) আরজ করলেন, ইয়া

رَكْعَتَيْنِ وَمَا اَصَابَنِى حَدَثٌ قَطُّ اِلَّا تَوَضَّاْتُ عِنْدَهُ وَ رَاَيْتُ اَنَّ لِلّٰهِ عَلَىَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

রাসূলাল্লাহ! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু' রাকাত নামাজ পড়েছি। আর যখনই আমার অজু ভঙ্গ হয়েছে, তখনই আমি অজু করেছি এবং নিজের উপরে এটা আবশ্যক ভেবেছি যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার দু' রাকাত নামাজ পড়তে হবে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ দু' কাজের বদৌলতেই অথবা এ দু' রাকাতের বদৌলতেই [তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে ছিলে]।

وَعَنْ ١٢٥١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ اِلَى اللّٰهِ اَوْ اِلٰى اَحَدٍ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ فَلْيَتَوَضَّاْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَاتَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَاهَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১২৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট অথবা কোনো আদম সন্তানের নিকট কোনো প্রয়োজন রয়েছে [অর্থাৎ দীনি বা দুনিয়াবী কোনো হাজত থাকে] সে যেন অজু করে এবং উত্তমভাবে অজু সম্পন্ন করে, অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়ে। তারপর আল্লাহ তা'আলার কিছু প্রশংসা করে এবং নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং এ দোয়া পাঠ করে, لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .... (অর্থাৎ) আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি ধৈর্যশীল ও দয়ালু। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর– যিনি মহান আরশের প্রভু। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। [হে আল্লাহ!] আমি তোমার নিকট এমন কাজ প্রার্থনা করি, যার বদৌলতে তোমার রহমত আমার উপরে অবধারিত হবে এবং এমন কাজের সংকল্প করতে প্রার্থনা করি– যার বদৌলতে তোমার ক্ষমা অবধারিত হবে, প্রতিটি সৎকাজের উৎকৃষ্ট সুযোগ এবং প্রত্যেকটি গুনাহের কাজ হতে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে সকল অনুগ্রহকারীর বড় অনুগ্রহকারী আল্লাহ! তুমি আমার কোনো গুনাহকেই ক্ষমা ব্যতীত ছেড়ে দিও না। আমার কোনো বিপদকেই দূর করা ব্যতীত বাকি রেখো না। আমার যে কোনো প্রয়োজন– যা তোমার পছন্দনীয় তা পূর্ণ করা ব্যতীত বাকি রেখো না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। তবে ইমাম তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসটি গরীব]।

بَابُ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ

পরিচ্ছেদ : সালাতুত তাসবীহ

١٢٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اِلاَّ اَمْنَحُكَ اَلاَ اُخْبِرُكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَاْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَّسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً

১২৫২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ [আমার পিতা] হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-কে বললেন, হে আব্বাস, হে চাচাজান! আমি কি আপনাকে দেব না, আমি কি আপনাকে দান করব না, আমি কি আপনাকে সংবাদ দিব না, আমি কি আপনার সাথে দশটি সৎকাজ করব না; [অর্থাৎ দশটি উত্তম তাসবীহ শিক্ষা দিব না] যখন আপনি তার আমল করবেন তখন আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের, পুরাতন, নতুন, সকল প্রকার গুনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, সগীরা গুনাহ, কবীরা গুনাহ, গুপ্ত ও প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দেবেন? আপনি চার রাকাত নামাজ পড়বেন এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করবেন এবং যে কোনো একটি সূরা মিলাবেন। প্রথম রাকাতে যখন কেরাাত পাঠ সম্পন্ন করবেন, তখন আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" পনেরো বার, অতঃপর রুকু করবেন এবং রুকু অবস্থায় [উক্ত তাসবীহ] দশবার পাঠ করবেন। তারপর রুকু হতে মাথা উঠবেন, [দাঁড়ানো অবস্থায়] উক্ত তাসবীহ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজদায় মাথা নত করবেন এবং সিজ্‌দা অবস্থায় দশবার তা পাঠ করবেন। তারপর সিজদা হতে মাথা উঠাবেন এবং [বসা অবস্থায়] উক্ত তাসবীহ দশবার পাঠ করবেন, তারপর পুনরায় সিজদা করবেন এবং সিজদায় দশবার তা পাঠ করবেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে ও দশবার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবেন। এ তাসবীহ প্রত্যেক রাকাতে পঁচাত্তরবার হলো। চার রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে এভাবে করবেন। এভাবে যদি প্রত্যেক দিন একবার এই নামাজ পড়তে সক্ষম হন,

فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِىْ عُمْرِكَ مَرَّةً ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ وَ رَوَى التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ نَحْوَهُ)

তবে পড়বেন। আর যদি সক্ষম না হন, তবে প্রত্যেক জুমার দিনে একবার পড়বেন। তাও যদি না পারেন তবে প্রত্যেক মাসে একবার পড়বেন। তাও যদি না পারেন তবে প্রত্যেক বছরে একবার পড়বেন, আর যদি তাও না পারেন তবে আপনার জীবনে অন্তত একবার পড়বেন।–[আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্। বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হযরত আবূ রাফে' হতে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : যে নামাজে বারবার سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ পড়া হয় তাকে صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ বলা হয়। এ নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও কিছু সংখ্যক হাদীস বিশারদ উক্ত হাদীসকে দুর্বল বলেছেন, তথাপি অধিকাংশ ইমাম এ হাদীসের উপর আমল করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। জীবনে অন্তত একবার صَلٰوةُ التَّسْبِيْحِ। পড়া আবশ্যক। তিরমিযীর অপর একটি হাদীসে এ নামাজের আর একটি নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। তবে উপরিউক্ত হাদীসের নিয়মটিই প্রসিদ্ধ।

وَعَنْ ١٢٥٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلٰوتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلٰى ذٰلِكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ ثُمَّ الزَّكٰوةُ مِثْلُ ذٰلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسْبِ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ)

১২৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার যে সমস্ত কার্যাবলির হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে, তন্মধ্যে প্রথম হবে তার নামাজের হিসাব। নামাজ শুদ্ধ হলে সে কৃতকার্য হবে এবং রেহাই পাবে। নামাজে বিপর্যয় হলে সে নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরজ নামাজের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তবে প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোনো সুন্নত-নফল ইবাদত আছে কি না; [যদি থাকে] তা দ্বারা ফরজের ঘাটতিগুলো পূরণ করা হবে। অতঃপর এ পদ্ধতিতে তাঁর সকল কার্যাবলির হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তারপর যাকাতের ব্যাপারেও এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর সকল কার্যাবলির এ নিয়ম অনুসারে হিসাব গ্রহণ করা হবে। –[আবূ দাঊদ আর আহমদ জনৈক [অজ্ঞাতনামা] ব্যক্তির সূত্রে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। অথচ অন্য হাদীসে এসেছে যে قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَوَّلُ مَا يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম খুন বা কিসাসের হিসাব নেওয়া হবে। বাহ্যত উভয় বর্ণনায় বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে আল্লামা আবহারী বলেন, হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হকের মধ্যে যে সমস্ত বস্তুর হিসাব নেওয়া হবে তার মধ্যে নামাজ হলো প্রথম। এটাই প্রথম হাদীসের মর্মার্থ। আর حقوق العباد বা বান্দার হকের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তার মধ্যে খুন বা কিসাস হলো প্রথম।

অথবা বলা যেতে পারে, ইবাদত পরিহার করার কারণে যে হিসাব দিতে হবে তার মধ্যে নামাজের হিসাব আগে দিতে হবে এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে যে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে, তন্মধ্যে কিসাসের হিসাব হবে প্রথমে।

وَعَنْ ١٢٥٤ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِىْ شَئٍ اَفْضَلُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا وَاِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلٰى رَاْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِىْ صَلٰوتِهٖ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ اِلَى اللّٰهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِىْ الْقُرْاٰنَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

১২৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা [বাহেলী] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বান্দার কোনো কাজে এতটা কর্ণপাত করেন না [অর্থাৎ অনুগ্রহ করেন না] যতটা কর্ণপাত করেন বান্দার দু' রাকআত নামাজের প্রতি যা সে পড়ে। [অর্থাৎ আল্লাহ নামাজ পাঠকারীর প্রতি বেশি আগ্রহী হন এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করেন]। বান্দা যতক্ষণ তার নামাজে রত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার ওপরে নেকী [আল্লাহর অনুগ্রহ] ঝরতে থাকে। [নামাজে] বান্দার মুখ থেকে যা বের হয় [অর্থাৎ, কুরআন] তার মত আর কোনো কিছু দ্বারা আল্লাহর বান্দাগণ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ **-এর ব্যাখ্যা :** 'আল্লাহর কর্ণপাত করা' অর্থ– আল্লাহর অনুগ্রহ করা। সুতরাং 'নামাজীর প্রতি অধিক কর্ণপাত করেন' অর্থ– আল্লাহ্ নামাজ আদায়কারীর প্রতি বেশি আগ্রহী হন এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। কারণ নামাজের বেশি অংশেই কুরআন পাঠ করা হয়। আর আল্লাহ্ কুরআন পাঠকে খুব বেশি পছন্দ করেন। বেশি কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়। সুতরাং এ নৈকট্য লাভের জন্য নামাজই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। এর মতো এত ফলপ্রসু পদ্ধতি বা পন্থা আর একটিও নেই।

بَابُ صَلٰوةِ السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ : সফরের নামাজ

اَلسَّفَرُ শব্দটি মাসদার। যার শাব্দিক অর্থ হলো অতিক্রম করা, পর্যটন করা, ভ্রমণে বের হওয়া, শরিয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পথ অতিক্রমকারীকে মুসাফির বলা হয়।

এ সময়ের হুকুম স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। নিম্নে মুসাফিরের বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কিত হাদীস পেশ করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٥٥ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ মদীনায় জোহরের নামাজ চার রাকাত পড়েছেন এবং যুল হুলাইফায় আসরের নামাজ দু' রাকাত পড়েছেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الْمَسَافَةِ لِاَدَاءِ الْقَصْرِ **নামাজ কসর করার জন্য সফরের দূরত্ব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, শরিয়তের দৃষ্টিতে তিন দিনের দূরত্বের সফরে নামাজ কসর করতে হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দু' দিনের পথ এবং ইমাম আহমদ ও মালেক বলেন, আটচল্লিশ মাইল। বস্তুত ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী যে তিন দিন ও দুই দিনের দূরত্বের কথা বলেছেন, এতে মাইলের হিসাবে সে আটচল্লিশ মাইল হয়। উক্ত তিন দিন বা দুই দিনের পথ বলতে সমভূমিতে উট সওয়ারী যোগে এবং পাহাড় ও টিলাময় এলাকায় পদব্রজে অতিক্রম করা যায় তাকে বুঝায়। আর পানি পথে মধ্যম বাতাসে তিন দিনে নৌকা যোগে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। কিন্তু জাহেরী সম্প্রদায়ের মতে সফর দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক কসর পড়া জায়েজ আছে। হুজুর ﷺ যুল হুলাইফায় আসরের নামাজ দু'রাকাত পড়েছেন, এ হাদীসই তাদের দলিল। যুল হুলাইফা মদীনা থেকে মক্কার পথে ৫/৬ মাইল দূরে অবস্থিত। মদীনায় জোহরের নামাজ চার রাকাত পড়ায় বুঝা গেল যে, সফর আরম্ভ করা কালে বাসস্থান থেকে কিছু দূরে না যাওয়া পর্যন্ত মুসাফিরের পক্ষে কসর পড়া জায়েজ নয়। এটা ছিল হুজুরের হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় সফর।

١٢٥٦ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ (رضـ) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ اَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَاٰمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৬. অনুবাদ : হযরত হারেছা ইবনে ওয়াহাব খুযায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় আমাদেরকে দু' দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন, অথচ তখন আমরা ইতঃপূর্বেকার সমস্ত জনসংখ্যার তুলনায় অধিক ছিলাম এবং অধিক নিরাপদে ছিলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٢٥٧ـ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (رض) قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) إِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ قَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৫৭. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলবে, তবে তোমরা তোমাদের নামাজ কসর করতে পার"। কিন্তু এখন মানুষ নিরাপদ হয়েছে [ভয় দূরীভূত হয়েছে। অতএব নামাজে কসর করার কি প্রয়োজন আছে?]। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি যেরূপ এতে বিস্ময়বোধ করছেন, আমিও এরূপ বিস্ময়বোধ করেছিলাম। আমি এ বিষয়ে একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন, এটা একটি দান বিশেষ, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা আল্লাহ তা'আলার এ [দয়ার] দানকে গ্রহণ কর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْقَصْرِ ـ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَا কসরের বিধান : কসর ওয়াজিব, না ঐচ্ছিক? ফরজ নামাজ চার রাকাতের স্থানে দু' রাকাত পড়াকে 'কসর' (قَصْر) বলে। মুসাফিরের জন্য নামাজ কসর পড়া ওয়াজিব, না ইচ্ছাধীন– এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ আছে।

※ ইমাম আবূ হানীফা (র.) নামাজে কসর করা ওয়াজিব মনে করেন, যদিও সে সফর গুনাহের উদ্দেশ্যে হয়। পথিমধ্যে তার কোনো ভীতি থাকুক বা নির্ভয়ে চলতে সমর্থ হোক, তাকে কসর পড়তেই হবে। পূর্ণ নামাজ পড়া মাকরূহ হবে, তবে নামাজ আদায় হবে। তিনি উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। এতে 'কসর' করাকে সদকা বলা হয়েছে। فَاقْبَلُوْا নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা সদকা কবুল করতে বলা হয়েছে যা ওয়াজিব হওয়ার দলিল। এ ছাড়া হযরত হাফসা (রা.)-এর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, মহানবী ﷺ হযরত আবূ বকর, ওমর ও উসমান কখনও সফরে দু' রাকাতের বেশি ফরজ পড়তেন না। মিরকাতে উল্লেখ আছে যে, হুজুর ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদার এই আমল হানাফীদের মায্হাবকে সমর্থন করে। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসের হাদীসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী ﷺ সফর অবস্থায় কখনও দু' রাকাতের বেশি পড়তেন না। সুতরাং আমাদের কথা হলো যদি তা ওয়াজিব না হতো তবে জায়েজ প্রমাণ করার জন্য হলেও তিনি মাঝে মধ্যে কখনো পুরা চার রাকতই আদায় করতেন।

ফতোয়ার কিতাবে হানাফীদের মাযহাব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় কসর না করে পুরা নামাজ পড়ল সে সুন্নতের বরখেলাফ করায় গুনাহগার হবে এবং যদি দু' রাকতের পর না বসে এবং প্রথম দু' রাকতে কেরাত পাঠ না করে, তবে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

※ ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, সফর অবস্থায় নামাজ কসর করা رُخْصَتْ অর্থাৎ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। অর্থাৎ– 'কসর' করা না করা উভয়টি জায়েয আছে। তাঁরা আরও বলেন, কোনো পাপ কাজের উদ্দেশ্যে সফর করলে তখন আর এই رُخْصَتْ অর্থাৎ কসরের সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। তাঁরা বলেন, হাদীসে কসরকে 'সদকা' বলা হয়েছে। অথচ 'সদকা' বস্তুত নফল বা ইচ্ছাধীন হয়ে থাকে।

আল্লামা ইবনে হাজার আস্কালানী 'সদকার' অর্থ রোখসত বা এখতিয়ার বলেছেন। এতদ্ভিন্ন হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, মহানবী ﷺ মক্কা সফর কালে কসর ও পূর্ণ উভয়ভাবেই নামাজ পড়েছেন। হযরত উসমান (রা.) সম্বন্ধে এ কথা

প্রসিদ্ধ যে, তিনি মক্কায়, মিনায় নামাজ পূর্ণ চার রাকাতই পড়তেন। অবশেষে তাদের কথা কুরআনের আয়াত– فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ হতে বুঝা যায় যে, কসর করলে গুনাহ্ হবে না। অর্থাৎ করলে করতে পারে। এটাই এখতিয়ার, কিন্তু ওয়াজিব নয়।

اَلْجَوَابُ عَنِ الْاَحْنَافِ **হানাফীদের পক্ষ হতে জবাব :** হযরত ইয়া'লা (রা.) বর্ণিত হাদীসে صَدَقَةٌ 'সদ্কা' দ্বারা সর্বস্থানে শুধুমাত্র এখ্তিয়ার বা ইচ্ছাধীন নেওয়া ঠিক হবে না। কেননা স্থান বিশেষে এটা ওয়াজিব বা ফরজ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– আল্লাহ্র কালাম (اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (الْاٰيَةَ এখানে সদ্কা শব্দ দ্বারা ওয়াজিব সদ্কা তথা 'যাকাতকেই' বুঝানো হয়েছে। আর মহানবী ﷺ মক্কা সফরে 'মুকিম' হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'কসর' পড়েছেন এবং মুকিম হওয়ার পর 'পূর্ণ' নামাজ পড়েছেন।

অথবা প্রথমে তিনি উভয়ভাবে পড়েছেন এবং পরে 'কসর' পড়াই নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। অথবা তিনি চার রাকাত বিশিষ্ট যেমন– 'জোহ্র, আসর ও এশা' এই তিন নামাজের কসর করেছেন এবং ফজর ও মাগরিবে পূর্ণ আদায় করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) পরিবার-পরিজন সহ মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন, তাই তিনি সেখানের মুকিম হওয়ার দরুন কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত পড়তেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) মিনাতে নামাজ 'কসর' না করার দরুন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ কাজের প্রতিবাদ করলেন। তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন যে, হে লোক সকল! আমি এখন মক্কাতে স্বপরিবারে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো শহরে [জনপদে] স্বপরিবারে বসতি স্থাপন করে সে যেন মুকিমের মতো পূর্ণ নামাজ পড়ে"। এখানে আমাদের কথা হলো সাহাবায়ে কেরামের প্রতিবাদ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, 'কসর' করা বা না করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়; বরং ওয়াজিব।

আয়াতে لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ দ্বারা লোকদের অমূলক ধারণাকে দূর করাই উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু তারা ভয়-ভীতির সময় কসর নামাজ পড়াকে গুনাহ্ মনে করত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য বলা হয়েছে, এতে কোনো গুনাহ বা দোষ নেই, অথচ তা ওয়াজিব। যেমন– জাহেলিয়াতের যুগে 'সাফা' ও মারওয়া' পাহাড়ে اِسَافٌ এসাফ্ ও نَائِلَةٌ নায়েলা নামক দু'টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। তৎকালীন হজের সময় তারা সেই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে গিয়ে ঐ মূর্তি দু'টিকে তওয়াফ করত। ইসলাম গ্রহণের পর উম্রার সময় উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে হাজীদের সায়ী করার হুকুম নাজিল হওয়ার পর মুসলমানরা জাহিলিয়া যুগের কাজের অনুকরণ হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত সায়ী করাকে গুনাহ্ মনে করতে লাগল। তখন সেই ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার উদ্দেশ্যে আয়াত নাজিল করলেন, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . (البقرة) অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ কিংবা ওম্রা করবে তার জন্য উক্ত সাফা এবং মারওয়া (পাহাড়ে) তাওয়াফ করার মধ্যে কোনো গুনাহ্ বা দোষ নেই। এখানেও جُنَاحٌ শব্দ বলা হয়েছে। অথচ ওমরাকারীর জন্য সায়ী করা ওমরার রোকন হিসাবে ওয়াজিব, এখ্তিয়ার বা ইচ্ছাধীন কাজ নয়। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিধানও তদ্রূপ।

هَلِ الْقَصْرُ مُقَيَّدٌ بِالْخَوْفِ اَمْ لَا **কসর নামাজ ভীতির সাথে সম্পৃক্ত কিনা ?** আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কসর নামাজ ভয়-ভীতির সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ ভয়ের কারণ থাকলেই শুধু কসর পড়া যাবে। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

※ কিছু সংখ্যকের মতে কসর নামাজ ভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত, যেখানে ভয়ের কারণ আছে সেখানেই কসর নামাজ পড়তে হবে। তাদের দলিল হলো–

(١) قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

(٢) ذَكَرَ اَبُوْ جَعْفَرٍ فِىْ تَفْسِيْرِهٖ عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَ اَتِمُّوْا صَلٰوتَكُمْ فِى السَّفَرِ فَقَالُوْا اِنَّ النَّبِىَّ كَانَ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ (رضـ) اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ حَرْبٍ وَكَانَ يَخَافُ فَهَلْ تَخَافُوْنَ اَنْتُمْ .

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইমামদের মতে ভীতি ছাড়াও কসর করা বৈধ। তারা হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া বর্ণিত হাদীসসহ নিম্নোক্ত হাদীসটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন–

(١) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ اَكْثَرُ مَاكُنَّا قَطُّ وَاٰمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তাঁদের জবাব : যারা বলেন কসর ভীতির সাথে সংযুক্ত তাদের দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত তাঁরা যে আয়াত উল্লেখ করেছেন, তাতে বর্ণিত وَاِنْ خِفْتُمْ দ্বারা যে শর্ত করা হয়েছে তা قَيْد اِحْتِرَازِىْ নয়; বরং উহা قَيْد اِتِّفَاقِىْ অর্থাৎ তা দ্বারা শুধু এটাই বুঝা যাবে না যে, কেবলমাত্র ভয়ের অবস্থায়ই কসর করতে হবে– অন্য অবস্থায় কসর করা যাবে না। বস্তুতপক্ষে এ শর্ত এজন্য করা হয়েছিল যে, তদানীন্তন সময় মুসাফিরগণ প্রায়শ ভীতিজনক অবস্থায় পতিত হতেন।

দ্বিতীয়ত এটা সে সমস্ত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ব্যাপারে কোনো কারণবশত শরিয়তের হুকুম অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু সে কারণ দূরীভূত হওয়ার পরও হুকুম বাকি রয়ে গেছে। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কাফেরদের সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশের জন্যই তওয়াফের মধ্যে রমল বা বীরত্বপূর্ণ দৌড়ানোর হুকুম প্রবর্তিত হয়েছিল; কিন্তু সে কারণ বর্তমানে অবশিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও রমলের হুকুম বলবৎ রয়েছে। আর এরূপই সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানোর বিধান।

١٢٥٨ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৫৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা হতে মক্কা অভিমুখে বের হলাম, রাসূল ﷺ এ সফরে মদীনায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত (ফরজ) নামাজ দু' দু' রাকাত করে পড়তেন। হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনারা মক্কাতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন কি? তিনি বললেন, তথায় আমরা দশদিন অবস্থান করেছিলাম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ مُدَّةِ اِقَامَةِ الْمُسَافِرِ **মুসাফিরের মুকীম হওয়ার সময়ের ব্যাপারে মতভেদ :** মুসাফির যে সময় পর্যন্ত কোথাও অবস্থান করার নিয়ত করলে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে হয় সে সময় সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আইনীতে এ সম্পর্কে বাইশটি অভিমত পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ তিনটি মত নিম্নরূপ–

১. ইমাম আহমদ ও দাউদ যাহেরীর মতে, মুসাফির যদি চার দিনের অতিরিক্ত সময় কোথাও অবস্থান করার নিয়ত করে তবে তাকে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো রাসূল ﷺ হজের সময় চারদিন পর্যন্ত কসর নামাজ পড়েছেন। সুতরাং বুঝা গেল চার দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে। এর অতিরিক্ত হলে পুরা নামাজ আদায় করতে হবে।

২. ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদের এক মতানুযায়ী মুসাফির চার দিন পর্যন্ত কোথাও অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে নামাজ পূর্ণ পড়তে হবে। চার দিনের কম হলে কসর পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো–

مَارُوِىَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا يَقْصُرُ فِىْ عُمْرَتِهِ

৩. ইমাম আবূ হানীফা, সুফইয়ান সাওরী, লাইস, ইবনে সাদ প্রমুখের মতে মুসাফির যদি কোথাও ন্যূনতম পনেরো দিন অবস্থান করার নিয়ত করে তবে তাকে পুরা নামাজ আদায় করতে হবে। নতুবা তাকে কসর পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো–

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) وَابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَا اِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً وَاَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِىْ نَفْسِكَ اَنْ تُقِيْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَاَكْمِلِ الصَّلٰوةَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِىْ مَتٰى تظعن فَاقْصُرْهَا .(رَوَاهُ الطَّحَاوِىُّ)

(٢) رَوَى ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ فِىْ مُصَنَّفِهٖ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) كَانَ اِذَا اَجْمَعَ عَلٰى اِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اَتَمَّ الصَّلٰوةَ .

(٣) عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ (رض) اَنَّهٗ قَالَ اِذَا اَقَامَ الْمُسَافِرُ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً اَتَمَّ الصَّلٰوةَ .

١٢٥٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ سَافَرَ النَّبِىُّ ﷺ سَفَرًا فَاَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا اَقَمْنَا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا اَرْبَعًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১২৫৯. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক সফরে বের হলেন এবং তথায় উনিশ দিন যাবৎ অবস্থান করলেন, এ সময়ের মধ্যে তিনি (ফরজ) নামাজ দু' দু' রাকাত করে পড়তে থাকলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমরা আমাদের এখানে অর্থাৎ মদীনা ও মক্কার মধ্যে কোনো স্থানে উনিশ দিন যাবৎ অবস্থান করতাম, নামাজ দু' দু' রাকাত পড়তাম। এর বেশি যখনই অবস্থান করতাম, চার রাকআতই পড়তাম। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ এ হাদীসের ব্যাখ্যা : মক্কা ও মদীনার মধ্যে তখনকার সময় যাতায়াতের দুটি পথ ছিল। একটি পাহাড়ী পথ, যাতে সময় কম লাগত, অপরটি মরুভূমির পথ, যাতে ১৯ দিন সময় লাগত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোথাও ১৯ দিনের অধিক অবস্থানের নিয়ত করলে মুসাফির মুকিম হয় না। কিন্তু ইমাম তাহবী (র.) কর্তৃক বর্ণিত তার অপর হাদীসে ১৫ দিনের নিয়ত করলে মুকিম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত এটাই।

١٢٦٠ - وَعَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ (رح) قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهٗ وَجَلَسَ فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلٰوتِىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَذٰلِكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬০. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হাফ্স ইবনে আসেম [ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব] (র.) বলেন, একবার আমি মক্কার পথে [আমার চাচা] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সহচর ছিলাম। একদা পথের মধ্যে তিনি আমাদেরকে জোহরের নামাজ দু' রাকাত পড়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর অবস্থান স্থলে এসে বসলেন। তিনি দেখলেন, লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, এই সমস্ত লোকেরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামাজ পড়ছে? তখন তিনি বললেন, যদি [সফরে] নফলই পড়তে পারতাম তা হলে ফরজকেই পূর্ণ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য পেয়েছি। দেখেছি তিনি সফরে দু' রাকাতের অধিক কিছু পড়তেন না। হযরত আবূ বকর, ওমর, এবং উসমান (রা.) -এর ও আমি সহচর ছিলাম। দেখেছি তারাও এরূপ করতেন। –[বুখারী, মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ সফরে ফরজ ছাড়াও কিছু নফল নামাজ পড়েছেন বলে অপর হাদীসে এসেছে। সুতরাং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার অর্থ নিম্নরূপ হতে পারে–

১. অধিকাংশ সফরেই ফরজের অধিক কোনো নামাজ পড়েননি। যদি পড়ে থাকেন তা কদাচিৎ, যা হিসাবে গণ্য হয় না।

২. ফরজ নামাজ পড়তে কোথাও জমিনে অবস্থান করতে হয়, কিন্তু নফল ইত্যাদির জন্য তা করতে হয় না, বরং সওয়ারীর উপর থেকে চলা অবস্থায়ও পড়া যায়। সুতরাং হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কথার অর্থ হলো জমিনে অবস্থান করে হুজুর ﷺ দু' রাকাতের অধিক পড়েনি। তবে সওয়ারী অবস্থায় নফল পড়েছেন কি না, এ হাদীসে তার উল্লেখ বা নিষেধ কোনটিই নেই।

৩. হযরত ইবনে ওমর (রা.) যে সফরে হুজুর ﷺ সহচর ছিলেন, সম্ভবত তিনি সেই সফরে নফল-সুন্নত পড়েননি। তাই তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ফলে যে সফরে সাথে ছিলেন না সম্ভবত সেই সফরে নফল ইত্যাদি পড়েছেন, আর ইবনে ওমর (রা.) অবগত ছিলেন না বিধায় অস্বীকার করেছেন। এ পর্যায়ে হুজুর ﷺ -এর কাজের বা হাদীসের মধ্যেও বিরোধ থাকে না।

١٢٦١ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১২৬১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর অবস্থায় থাকতেন তখন জোহর ও আসর নামাজকে একসাথে পড়তেন এবং এরূপভাবে মাগরিব ও এশাকেও একত্রে পড়তেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আলোচনা পরবর্তী ১২৬৬ নং হাদীস প্রসঙ্গে আসছে।

١٢٦٢ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهٖ يُوْمِيْ اِيْمَاءً صَلٰوةَ اللَّيْلِ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬২. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় ফরজ ব্যতীত রাতের [নফল] নামাজ নিজের সওয়ারীর উপরেই ইশারায় পড়তেন, তাকে নিয়ে সওয়ারী যেদিকেই চলত না কেন। এরূপ বিতর নামাজও তিনি আপন সওয়ারীর উপরে পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِيْ كَيْفِيَّةِ التَّحْرِيْمَةِ عَلٰى ظَهْرِ الدَّابَّةِ সওয়ারীর পিঠে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা সম্পর্কে মতভেদ : সফর অবস্থায় সওয়ারীর উপর বসে নফল নামাজ পড়া চার ইমামের মতেই জায়েজ। যদিও বাহন জন্তুটি কেবলার দিকে মুখ না করে। উপরিউক্ত হাদীসই এর দলিল। এতদ্ব্যতীত আবূ দাউদে বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর অপর হাদীসেও রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ সওয়ারীর ওপর নফল নামাজ পড়তেন, সওয়ারী যে দিকেই মুখ করে চলত না কেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রথম তাকবীরে তাহরীমার সময় কেবলার দিকে মুখ করা ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ ও আবূ ছাওর (র.)-এর মতে, তাকবীরে তাহরীমার সময় কেবলামুখী হওয়া মোস্তাহাব। তাঁরা আবূ দাউদ, আহমদ ও দারাকুতনী বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, "রাসূল ﷺ যখনই সফর অবস্থায় নফল পড়তে মনস্থ করতেন, নিজের উটকে কেবলামুখী করতেন এবং নিয়ত বাঁধতেন। অতঃপর

নামাজ পড়তে থাকতেন, সওয়ারী যেদিকেই চলুক না কেন। কিন্তু হানাফী মতে কেবলামুখী হওয়া কোনো সময়ই ওয়াজিব নয়। নামাজের প্রথমে হোক বা নামাজ পাঠরত অবস্থায় হোক। কেননা, তাঁদের মতে যদি কেবলামুখী ছাড়া নামাজই পড়া যায়, তবে কেবলামুখী ছাড়া তাকবীরে তাহরীমাও করা যাবে।

مَذْهَبُ اَبِىْ يُوْسُفَ وَاَهْلِ الظَّوَاهِرِ : ইমাম আবূ ইউসুফ ও আহলে যাহেরের মতে, নফল নামাজ সওয়ারীর উপরে শুধু সফরে নয়, মুকিম অবস্থায়ও জায়েজ। তাঁরা বলেন, এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসগুলোতে সফরের শর্তারোপ করা হয়নি; বরং সাধারণভাবে সফরের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَجُمْهُوْرِ الْاَئِمَّةِ : পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, মুহাম্মদ ও জমহুর আলেমদের মতে নিজের বাসস্থানে থাকা অবস্থায় জায়েজ নেই, তবে সফর অবস্থায় জায়েজ আছে। কেননা কোনো কোনো হাদীসে সফর অবস্থার শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন প্রসঙ্গক্রমে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের হাদীস পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সফরে সওয়ারীর উপরে নামাজ পড়তেন, সওয়ারি যেদিকেই মুখ করত না কেন।

ফরজ নামাজ সওয়ারীর পিঠে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই। ভীত ব্যক্তির জন্য জায়েজ আছে, তবে ভয়ের কারণ ব্যতীত কারো জন্য জায়েয নেই। নৌযানে আরোহীদের হুকুম কোনো পশুর পৃষ্ঠে আরোহণের হুকুমের অনুরূপ নয়। চাই সফর অবস্থায় হোক বা মুকিম অবস্থায় হোক। নৌযান দিক পরিবর্তনে সাথে সাথে মুসল্লিকে কেবলার দিকে মুখ করতে হবে।

صَلٰوةُ الْوِتْرِ عَلٰى ظَهْرِ الدَّابَّةِ সওয়ারীর উপরে 'বিতর' নামাজ : ইমাম শাফেয়ী, আহ্মদ, আ'তা, হাসান বসরী, ইবনে আবূ রাবাহ্, ইসহাক প্রমুখের মতে সওয়ারীর পিঠের উপর বিতর নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। আলোচ্য হাদীসই তাঁদের দলিল।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন, উরওয়া ইব্রাহীম নাখয়ী প্রমুখের মতে ফরজ নামাজের ন্যায় বিতরও সওয়ারী জানোয়ারের পিঠে পড়া জায়েজ নেই। তাঁরা বলেন, মহানবী ﷺ সফরে দিনের সুন্নত-নফল নামাজও সওয়ারীর উপরে পড়তেন বলে কতিপয় হাদীসে বর্ণিত আছে এবং বিতর নামাজ সওয়ারী হতে নিচে নেমে পড়তেন বলেও হাদীসে উল্লেখ আছে। কাজেই হানাফীগণ বলেন, 'বিতর' নামাজ নিচে নেমে পড়তে হবে। আসলে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীগণ 'বিতর'-কে নফল তথা সুন্নত মনে করেন। তাই অন্যান্য নফলের মতো বিতরকেও সওয়ারীর পিঠে পড়া জায়েজ বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) হানাফীদের মতো বিতরকে ওয়াজিবই বলেন। তবে সওয়ারীর পিঠে আদায় করা জায়েজ বলেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَصَرَ الصَّلٰوةَ وَاَتَمَّ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

১২৬৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [সফর অবস্থায়] সব রকমের আমলই করেছেন কসরও করেছেন এবং পূর্ণ নামাজও আদায় করেছেন। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : কোনো কোনো হাদীসবিদের মতে এ হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তবে আল্লামা দারাকুত্নী হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু মহানবী ﷺ সফরে সর্বদা 'কসর' করেছেন বলে ওলামাগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য হলেও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য হাদীসের সাথে এর বিরোধ হবে না। কারণ, তিনি বলেন, হযরত আয়েশার কথার অর্থ হলো নবী ﷺ জোহর, আসর ও এশা'র নামাজে 'কসর' করেছেন এবং মাগরিব ও ফজর নামাজ পূর্ণ আদায় করেছেন।

অথবা প্রথম প্রথম উভয়ভাবে পড়েছেন এবং পরে 'কসর'কে নির্দিষ্ট করেছেন।

অথবা জায়েজ প্রমাণের জন্য পূর্ণও পড়েছেন। এ ব্যাখ্যার পরে অন্যান্য সফর সংক্রান্ত হাদীসের সাথে কোনো সমস্যা থাকে না।

وَعَنْ ١٢٦٤ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدْتُّ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّىْ اِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُوْلُ يَآ اَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنَّا سَفْرٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১২৬৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি এবং মক্কা বিজয়ের সময়েও তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মক্কায় আঠারো রাত [দিন] অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি ফরজ নামাজ দু' রাকাত ছাড়া পড়েননি। তিনি শহরবাসী [মুকিম]-দেরকে বলতেন, হে শহরবাসীগণ! তোমরা [উঠে] চার রাকাত পূর্ণ কর। আমরা মুসাফির। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুক্তাদি যদি মুকিম হয় এবং ইমাম মুসাফির, তা হলে মুক্তাদি সে ইমামের অনুসরণ করে নামাজ কসর করবে না; বরং সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে। আর এ ক্ষেত্রে ইমামের উচিত সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদিদেরকে তাদের বাকি নামাজ পূর্ণ করার জন্য বলে দেওয়া। পক্ষান্তরে মুক্তাদি যদি মুসাফির হয় এবং ইমাম মুকিম, এমতাবস্থায় মুক্তাদির উচিত হবে ইমামের সাথে নামাজ পরিপূর্ণ করা।

وَعَنْ ١٢٦٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى الْحَضَرِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَ الْمَغْرِبَ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاۤءً ثَلٰثَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِىْ حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِىَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১২৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে সফর অবস্থায় জোহর নামাজ (ফরজ) দু' রাকাত পড়েছি এবং তারপর দু' রাকাত (সুন্নত) পড়েছি। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে মুকিমাবস্থায় ও সফর উভয় অবস্থায়ই নামাজ পড়েছি। অতএব আমি তাঁর সাথে মুকিম অবস্থায় পড়েছি জোহর নামাজ চার রাকাত এবং তার পরে [সুন্নত] দু' রাকাত। সফর অবস্থায় তাঁর সাথে জোহর পড়েছি দু' রাকাত এবং তারপর [সুন্নত] দু' রাকাত। আর আসর পড়েছি দু' রাকাত। তারপর আর কোনো নামাজ রাসূল ﷺ পড়েননি এবং মাগরিব নামাজে মুকিমাবস্থা কি সফর উভয় অবস্থায় একইরূপ অর্থাৎ তিন রাকাত পড়েছেন। মুকিম অবস্থায় হোক বা সফর অবস্থায় হোক, রাসূল ﷺ তিন রাকাত হতে কিছু কমাতেন না। এটা হলো দিনের বিতর। এর পরে দু' রাকাত [সুন্নত] পড়েছেন। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** حَضَرٌ 'হযর' অর্থ– সফরের বিপরীত ঘর বাড়িতে থাকা। এ হাদীস হতে বুঝা যায় সফরে সুন্নত-নফল পড়ার অনুমতি আছে। তবে পূর্বে হাফ্স ইবনে আসেম -এর হাদীসে ইবনে ওমর হতে যে নিষেধ বর্ণিত হয়েছে। তার কারণ হলো, সম্ভবত তিনি দেখছেন যে, লোকেরা তা অতি গুরুত্বের সাথে পড়েছেন। অথচ হুজুর ﷺ কখনও পড়েছেন, আবার কোনো কোনো সফরে পড়েননি। তবে না পড়ার ঘটনাই ছিল অধিক।

وَعَنْ ١٢٦٦ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَرَ الظُّهْرِ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِى الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذٰلِكَ اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَرَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

১২৬৬. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ তাবুকের যুদ্ধের সময় এরূপ করতেন, তার মঞ্জিল ত্যাগের পূর্বে যদি সূর্য হেলে পড়ত, তখন জোহর ও আসর নামাজকে একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি তিনি সূর্য হেলে পড়ার পূর্বেই রওয়ানা করতেন, তা হলে জোহরকে দেরি করতেন, যতক্ষণ না আসর নামাজের জন্য অবতরণ করতেন। অনুরূপভাবে তিনি মাগরিব নামাজেও করতেন। মনজিল তাগের পূর্বে যদি সূর্য অস্ত যেত তখন তিনি মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করতেন, যতক্ষণ না তিনি এশার নামাজের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন। অতঃপর তিনি মাগ্‌রিব ও এশা একত্রে পড়তেন। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَيْفِيَّةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ **দু'নামাজের মধ্যে একত্রিকরণের প্রক্রিয়া :** 'দুই নামাজকে একত্রিকরণ' ব্যাপারটি দু' ধরনের হতে পারে, (১) একটি হলো جَمْع حَقِيْقِىْ অর্থাৎ প্রকৃত একত্রিকরণ। (২) দ্বিতীয়টি جَمْع صُوْرِىْ অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে একত্রিকরণ। যথাক্রমে– জোহর ও আসরকে একত্র করে আসর ওয়াক্তে উভয় নামাজকে এবং মাগরিব ও এশাকে এশার ওয়াক্তে উভয় নামাজকে একসাথে পড়া। এটা হলো 'জময়ে হাকীকী' বা প্রকৃত একত্রিকরণ। আর দ্বিতীয়টি হলো জোহরকে বিলম্ব করে একেবারে তার শেষ ওয়াক্তে এবং আসরকে শীঘ্র করে একদম প্রথম ওয়াক্তে পড়া, একে বলা হয় (جَمْع صُوْرِىْ) 'জময়ে সূরী' বা আপাত দৃষ্টিতে একত্রিকরণ। এ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একতিকরণের মধ্যে কারো মতভেদ নেই। কেননা প্রত্যেকটি নামাজ আপন আপন ওয়াক্তের মধ্যেই পড়া হয়েছে। আর বিশেষ কোনো কারণে এ পদ্ধতিতে দু' নামাজকে একত্রিকরণ জায়েজ আছে। মূলত এটা জায়েজ হওয়ার কারণ হলো এই যে, জোহর ও আসরের ওয়াক্তের মধ্যখানে, তদ্রূপভাবে মাগ্‌রিব ও এশার ওয়াক্তের মধ্যখানে কোনো একটি ওয়াক্ত বা সময় فَاصِلَةْ বা পৃথকিকরণ নেই। কাজেই একটি শেষ করে অপরটি আপন ওয়াক্তে শুরু করা যেতে পারে।

আর প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রকৃত একত্রিকরণের মধ্যেও কিছু কিছু একত্রিকরণ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ আছে। যেমন– ৯ ই জিলহজ তারিখ আরাফাতের ময়দানে জোহর ও আসর এবং সে দিনকার মাগ্‌রিব ও এশার নামাজ মুযদালিফায়। মহানবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত আমল ও আদেশ ঐ তারিখে উক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে প্রকৃত একসাথকরণ প্রমাণিত। এটা ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে, কোনো অবস্থায় দু' ওয়াক্তের নামাজকে একই ওয়াক্তে একত্রিকরণ জায়েজ আছে কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে।

اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالْاِخْتِلَافُ فِيْهِ **দু' নামাজ একত্রিকরণ ও ইমামদের মতভেদ :** দু' ওয়াক্তের নামাজকে 'প্রকৃত একত্রিকরণ' সম্পর্কে ফকীহ্‌দের তিনটি অভিমত রয়েছে–

১. مَذْهَبُ الْاِمَامِ مَالِكٍ ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, যদি সফর দ্রুততর হয়, বার বার স্থানে স্থানে অবতরণ ও অবস্থানের দরুন পথ অতিক্রমের মধ্যে বিঘ্ন ঘটে, এ অবস্থায় দু' নামাজকে প্রকৃত একত্রিকরণ জায়েজ আছে। তাঁর দলিল–

(١) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"হযরত নাফে' হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, মহানবী ﷺ যখন সফরে তাড়াহুড়া করতেন অর্থাৎ– কোথায়ও তড়িৎ গতিতে যাওয়ার প্রয়োজন হতো তখন মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়তেন"। –[মুসলিম]

(٢) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

" উবাইদুল্লাহ হযরত নাফে হতে এবং তিনি ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী ﷺ যখন তড়িৎ গতিতে ভ্রমণ করতেন তখন মাগ্‌রিব ও এশাকে ['শফক' অস্তমিত হওয়ার পরে] একত্র করে পড়তেন।" –[মুসলিম]

এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যয় যে, হুজুর ﷺ দু' নামাজকে প্রকৃত একত্রিকরণ করতেন। 'শফ্‌ক অর্থ– রক্তিম আভা। আর মাগরিবকে 'শফক' অস্তমিত হওয়ার পরে পড়া মানে এশার ওয়াক্তে পড়া।

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) اَنَّهُ اسْتَغِيْثَ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ فَجَدَّ بِهِ السَّيْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرَ هُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ اِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

২. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবূ সওর, ইবনে মুনযির, আতা, মুজাহিদ, তাউস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রা.) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মতে সাধারণ সফরে ও সাধারণ প্রয়োজনে দু' নামাজকে একত্রিকরণ জায়েজ আছে। চাই সেই ভ্রমণ দ্রুত গতির হোক কিংবা ধীরগতির হোক। ইমাম আহ্‌মদ (র.) বলেন, রোগী বা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু' নামাজ একত্রিকরণ জায়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (রা.) বলেন, রোগীর জন্য জায়েজ নেই, তবে বান-বাতাস, ঝড়-তুফান এবং বৃষ্টি-বাদলের দরুন দুই নামাজ একত্রিকরণ জায়েজ আছে। এটা ইমাম আহ্‌মদ ও ইসহাকেরও অভিমত। তারা একদিকে যেমন উক্ত মুয়ায ইবনে জাবালের হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। অপর দিকে তাঁরা বলেন, এমন অনেক হাদীস আছে, যেখানে দ্রুত গতিতে সফর করার কোনো শর্ত পাওয়া যায় না, তবু রাসূল ﷺ নামাজকে একত্রিত করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবাইন, সুফিয়ান সাওরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও ইবনে মাসউদ (রা.) সহ সাহাবী ও তাবেয়ীদের এক বিরাট জামাত বলেন, আরাফাত ও মুযদালিফায় ৯ই জিলহজ তারিখ ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে, কোনো কারণে, কোনো সময়ই দুই নামাজকে একত্রে পড়া জায়েজ নেই। 'জায়েজ নেই' বলতে 'প্রকৃত একত্রিকরণ' (جَمْع حَقِيْقِيْ) বুঝানো হয়েছে। আবশ্য জময়ে সূরী বা আপাত দৃষ্টিতে একত্রিকরণ জায়েজ আছে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا অর্থাৎ নামাজ বিশ্বাসীদের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরজ। [এই সময়ের] আগে পড়া বা দেরি করা জায়েজ হবে না।

(খ) আল্লাহ বলেছেন– حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوةِ اَىْ اَدُّوْهَا فِىْ اَوْقَاتِهَا "তোমরা নামাজের উপরে যত্নবান হও অর্থাৎ একে সঠিক সময়ে আদায় কর।" অতএব কোনো নামাজকে ওয়াক্ত হতে বের করা জায়েজ হবে না।

(গ) আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ কেননা পূর্বেকার কিছু লোক নামাজকে তার সুনির্দিষ্ট সময় হতে বিলম্ব করে পড়ত, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। এরূপ লোকদের জন্য ওয়াইল দোজখের ভয় দেখানো হয়েছে। সুতরাং নামাজ বিলম্ব করা জায়েজ হবে না।

(ঘ) মুসান্নাফে ইবনে আবূ শাইবা হতে উদ্ধৃত হয়েছে–

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ فَلَايُبَاحُ بِعُذْرِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ كَسَائِرِ الْكَبَائِرِ لَايُبَاحُ بِهٰذَيْنِ الْعُذْرَيْنِ

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত দু' নামাজকে একত্র করা বড় গুনাহসমূহের অন্যতম। সুতরাং সফর জনিত এবং বর্ষা-বাদল ঘটিত কারণ অত বড় গুনাহের মোকাবিলায় শরিয়তসম্মত কারণ বলে গণ্য হবে না।

(ঙ) হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَتَبَ إِلَى الْأَفَاقِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلوٰتَيْنِ أَوْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلوٰتَيْنِ كَبِيْرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ (تَعْلِيْق) নবী করীম ﷺ প্রদেশসমূহের কর্মকর্তাদের দু' নামাজ একত্র করতে নিষেধ করে পত্র লেখেছেন এবং তাদেরকে এ সংবাদও জানিয়েছেন যে, দু' নামাজকে একত্র করা বড় গোনাহসমূহের অন্যতম।

(চ) বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلوٰةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ أَيْ بِمُزْدَلِفَةَ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى صَلوٰةَ الصُّبْحِ فِي الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি কখনও নবী করীম ﷺ-কে ওয়াক্ত ছাড়া নামাজ পড়তে দেখিনি– আরাফাত ও মুযদালিফা ব্যতীত। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ঐ দুই একত্রীকরণ ছাড়া কখনও নামাজকে ওয়াক্তের বাইরে নিয়ে পড়েননি।

হানাফীদের পক্ষ হতে ইমাম মালেকের পেশকৃত দলিল হযরত ইবনে ওমরের হাদীসের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, দ্রুততার সফরের সময় রাসূল ﷺ যে একত্রীকরণ করেছেন তা প্রকৃত একত্রীকরণ ছিল না; বরং আপাত দৃষ্টিতে একত্রীকরণ ছিল। আপাত দৃষ্টিতে একত্রীকরণ সকলের মতেই জায়েজ।

ইমাম মালেকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে 'শফক [রক্তিম আভা] অস্তমিত হওয়ার পরে মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়া হয়েছে' বলে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শফক দু' প্রকার– লাল ও সাদা। সম্ভবত লাল শফক অস্তমিত হওয়ার পরে রাসূল ﷺ দু' নামাজ একের পর এক পড়েছেন। যারা সাদা শফককে শফক বলেন, তাঁদের মতে রাসূল ﷺ মাগরিবকে মাগরিবের ওয়াক্তেই পড়েছেন; যদিও শেষ সময় পড়েছেন। এরূপভাবে এশাকে এশার ওয়াক্তেই পড়েছেন। এটা তাঁদের মতে, যারা শুধু লাল শফক (شَفَقٌ)-কেই শফক মনে করেন। পরবর্তী সাদা শফককে শফক-এর মধ্যে গণ্য করেন না। এমতাবস্থায় যদিও মাগরিব ও এশাকে একই ওয়াক্তে একত্র করা হয়েছে বুঝা যায়; প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি নামাজই নিজ নিজ ওয়াক্তেই সম্পন্ন হয়েছে– শফক সম্পর্কে মতভেদ অনুসারে। সুতরাং এটা আপাত দৃষ্টিতে একত্রীকরণ; প্রকৃত একত্রীকরণ নয়। এটা ছাড়াও তাদের দলিলগুলোর একাধিক অকাট্য জবাব দেওয়া হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ , ইসহাক প্রমুখ যে শর্তহীনভাবে দু' নামাজ একত্রীকরণ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন, এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত হাদীসে একত্রীকরণ অর্থে আপাতদৃষ্টিতে একত্রীকরণ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ প্রথম নামাজকে তার শেষ ওয়াক্তে পড়েছেন এবং দ্বিতীয় নামাজকে প্রথম ওয়াক্তে পড়েছেন। তিনি একই ওয়াক্তে দু' নামাজকে পড়েননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস এ অর্থের সহায়তা করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, নবী করীম ﷺ জোহর ও আসরকে একত্রে এবং মাগরিব ও এশাকে একত্রে পড়েছেন, ভয়-ভীতি ব্যতিরেকে এবং সফর ব্যতিরেকে। –[মুসলিম]। অন্য শব্দ প্রয়োগে বলেছেন, "নবী করীম ﷺ মদীনাতে অবস্থানকালে ভয়-ভীতি ও বর্ষা-বাদল ছাড়াই জোহর, আসর এবং মাগরিব, এশা একত্রে পড়েছেন"। তাই ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, হানাফী বা গায়রে হানাফী কোনো ইমামই মুকীম অবস্থায় দু' নামাজ একত্রীকরণের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন না। এতে বুঝা যায় যে, যে সব হাদীসে একত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, তাতে جَمْعٌ صُوْرِيٌّ আপাতদৃষ্টিতে একত্রীকরণের কথাই বলা হয়েছে।

وَعَنْ ١٢٦٧ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلّٰى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

১২৬৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন সফরে বের হতেন এবং নফল নামাজ পড়তে ইচ্ছা করতেন তখন তার উটনীকে কেবলামুখী করতেন, অতঃপর তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তারপর নামাজ পড়তে থাকতেন, সওয়ারী তাঁকে যেদিকেই ফিরিয়ে নিক না কেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উপরি উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ীর মতে সওয়ারীর উপর নফল নামাজ পড়তে হলে তাকবীরে তাহরীমার সময় কিবলার দিকে মুখ করা ওয়াজিব। হানাফীগণ এর জওয়াবে বলেন, এ হাদীস দ্বারা তাহরীমার সময় কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব বলে। প্রমাণিত হয় না। বরং হাদীসটির বিশুদ্ধতা সাব্যস্ত হলে বলতে হবে যে, হয়তো রাসূল ﷺ উত্তমতা বা মোস্তাহাবের উপর আমল করার জন্য এরূপ করেছেন। অথবা এমনিতেই তিনি কিবলামুখী ছিলেন।

١٢٦٨ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَاجَتِهٖ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১২৬৮. **অনুবাদ** : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কোনো কাজে পাঠালেন। আমি কাজ সেরে এসে দেখি তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপরে পূর্ব দিকে ফিরে নামাজ পড়ছেন এবং সিজ্‌দাকে রুকু অপেক্ষা বেশি নিচু করছেন। −[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٢٦٩ - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهٗ وَعُمَرُ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهٖ ثُمَّ اَنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى بَعْدَ اَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهٗ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৬৯. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় [ফরজ] নামাজ দু' রাকাত পড়েছেন। তাঁরপর হযরত আবূ বকর, তাঁর পর হযরত ওমর এবং তাঁর পর হযরত উসমান (রা.)-ও তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দু' দু' রাকাতই পড়েছেন। অতঃপর হযরত উসমান (রা.) চার রাকাত পড়েন। [পরবর্তী রাবী বলেন,] হযরত ইবনে ওমর (রা.) যখন ইমামের সাথে [অর্থাৎ, ওসমানের সাথে] নামাজ পড়তেন, তখন চার রাকাতই পড়তেন এবং যখন তিনি একা একা পড়তেন তখন দু' রাকাতই পড়তেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِعْتِرَاضُ عَلٰى عُثْمَانَ (رض) وَحُكْمُ الْقَصْرِ فِى الصَّلٰوةِ হযরত ওসমান (রা.)-এর ব্যাপারে আপত্তি ও কসরের হুকুম : মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত উসমান (রা.) পরে চার রাকাত পড়তে থাকলে তখন লোকেরা আপত্তি তুললেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি মক্কায় এসে বিবাহ করেছি। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো শহরে [জনপদে] শাদী করে, সে যেন মুকিমের ন্যায় নামাজ পড়ে। তাই আমি নামাজ পূর্ণ চার রাকাত পড়ছি। এ ঘটনা হতে এটাও স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মুসাফিরের জন্য 'কসর' করা ওয়াজিব (যা হানাফীদের মায্হাব)। কেননা যদি তা সুন্নত বা নফল হতো [যা শাফেয়ীদের মাযহাব] তা হলে হযরত উসমানের কালে লোকেরা আপত্তি তুলত না এবং তাঁকেও এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হতো না।

এ ছাড়া হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল থেকে এ মাসআলা প্রমাণিত হয় যে, কোনো মুসাফির যদি মুকিমের পেছনে একতেদা করে তবে সে ইমামের খাতিরে মুকিমের ন্যায় নামাজ পূর্ণ আদায় করবে।

وَعَنْ ١٢٧٠ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْأُوْلٰى قَالَ الزُّهْرِيُّ قُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ قَالَ تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১২৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে দু' রাকাত নামাজই ফরজ করা হয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [মদীনায়] হিজরত করলেন তখন নামাজও চার রাকাত ফরজ করা হলো। শুধু সফরের নামাজকেই প্রথম ফরজের অবস্থায় রেখে দেওয়া হলো। [তাবেয়ী] ইবনে শিহাব যুহরী (র.) বলেন, আমি [আমার উস্তাদ] ওরওয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত আয়েশা (রা.)-এর কি ব্যাপার যে, তিনি সফরে পূর্ণ নামাজ পড়তেন? ওরওয়া (রা.) বললেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি তাবীল করতেন যেমন হযরত উসমান (রা.) তাবীল করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ (رضـ)-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) সফর অবস্থায় পূর্ণ নামাজ পড়তেন। এ ব্যাপারটি তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী তাঁর উস্তাদ ওরওয়া (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এ ব্যাপারে সেই ব্যাখ্যাই করেছেন, যা হযরত উসমান (রা.) করেছিলেন। হাদীসবিশারদগণ বলেন, উভয়ের অভিমতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

১. প্রথমত উভয়ের মতে সফর অবস্থায় কসর করা এবং পুরা নামাজ পড়া দু'টোই জায়েজ। অতএব উভয় জায়েযের মধ্যে তাঁরা একটি জায়েজ গ্রহণ করে নিয়েছেন যা হলো পূর্ণ নামাজ পড়া। বিশেষজ্ঞগণ একেই সঠিক মনে করেছেন।

২. দ্বিতীয়ত আল্লামা ইবনে বাত্তাল বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের সহজতার কারণে সফরে কসর নামাজ পড়তেন। পক্ষান্তরে তাঁরা উভয়ে এ পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিজেদের উপর কাঠিন্য অর্থাৎ সফরে চার রাকাত পড়ার পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

৩. তৃতীয়ত হযরত উসমান (রা.) বলতেন, কসর মুসাফিরের জন্য। আর মুসাফির সে ব্যক্তি যিনি স্বীয় আবাসভূমি হতে কোথাও ভ্রমণে বের হন। পক্ষান্তরে আমিতো মুসাফির নই। কেননা গোটা ইসলামি রাষ্ট্র আমার দেশ। কাজেই নিজ দেশে কেউ মুসাফির হয় না। সুতরাং আমি কসর না পড়ে পুরো নামাজই পড়ি। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, আমি হলাম "উম্মুল মু'মিনীন"। সকলে আমার পুত্র সমতুল্য। অতএব মা পুত্রের আবাসস্থলে গেলে সে মুসাফির নয়, সুতরাং আমিও মুসাফির নই। আর এ কারণেই সম্ভবত তিনি সফর অবস্থায়ও পুরো নামাজ পড়তেন। বস্তুত এটা হলো تَأَوَّلَتْ عَائِشَةُ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ-এর ব্যাখ্যা।

৪. অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কসরের ব্যাপারে একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দান করতেন। তিনি মনে করতেন, কারো সফরে কষ্ট না হলে তার জন্য নামাজ কসর করতে হয় না। বায়হাকী ও দারাকুতনীর একটি সহীহ হাদীস থেকে এটা বুঝা যায়। এক সফরে হযরত আয়েশা (রা.) -কে চার রাকাত ফরজ পড়তে দেখে ওরওয়া প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এতে আমার কষ্ট হয় না।

وَعَنْ ١٢٧١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী করীম ﷺ-এর কথার মাধ্যমে মুকিম অবস্থায় চার রাকাত, সফর অবস্থায় দু' রাকাত এবং ভীতি অবস্থায় মাত্র এক রাকাত নামাজ ফরজ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষিতে অতীতের কোনো কোনো ইমাম বলেছেন ভয় তথা خَوْف -এর সময় মাত্র এক রাকাত পড়তে হবে। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেন, কোনো অবস্থায়ই নামাজ এক রাকাত শরিয়ত সম্মত নয়। সুতরাং এখানে এক রাকাত অর্থ– প্রত্যেক মুক্তাদির ইমামের পিছনে এক এক রাকাত করে আদায় করা। বিস্তারিত বিবরণ সামনে صَلٰوةُ الْخَوْف -এর অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

وَعَنْ ١٢٧٢ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِى السَّفَرِ سُنَّةٌ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২৭২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সফর অবস্থায় দু' রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম চালু করেছেন। এ দু' রাকাতই [ছওয়াবের দিক দিয়ে] পূর্ণ নামাজ, অপূর্ণ নয়। এটা ছাড়াও সফরে বিতর নামাজ পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত। –[ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীস থেকেও সফরে কসর পড়া ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয়। আর এটাই হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত।

وَعَنْ ١٢٧٣ مَالِكٍ (رضـ) بَلَغَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ (رضـ) كَانَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ فِىْ مِثْلِ مَا يَكُوْنُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِىْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعَسْفَانَ وَفِىْ مِثْلِ مَابَيْنَ مَكَّةَ وَجِدَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ ـ (رَوَاهُ فِى الْمُوَطَّا)

১২৭৩. অনুবাদ : ইমাম মালেক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নিকট এ হাদীস পৌছেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মক্কা শরীফ ও তায়েফের মতো দূরত্বের পথে নামাজ কসর করতেন, এরূপভাবে মক্কা ও উসফানের মতো দূরত্বের পথে এবং মক্কা ও জেদ্দার মতো দূরত্বের পথেও নামাজ কসর করতেন। ইমাম মালেক (র.) বলেন, এটা চার ডাক পরিমাণ। –[মুয়াত্তা]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মক্কা হতে তায়েফের দূরত্ব তিন 'মারহালা', মক্কা হতে উসফানের দূরত্ব দুই মারহালা এবং মক্কা হতে জেদ্দার দূরত্বও দুই মারহালা। উল্লেখ্য মুসাফিরের একদিনের ভ্রমণের পথকে এক 'মারহালা' বলা হয়। بَرْد শব্দটি بَرِيْد-এর বহুবচন, অর্থ– ডাক। পোস্ট অফিস বা ডাকঘরকে مَكْتَبُ الْبَرِيْد বলা হয়। ইমাম মালেক বলেন, মক্কা হতে জেদ্দার দূরত্ব চার বারীদ বা চার ডাক। এক বারীদ সমান দুই ফারসাখ অথবা ১২ মাইল। এ হিসেবে চার বারীদ সমান ১২ × ৪ = ৪৮ মাইল।

আল্লামা ইবনু আছীর জাযারী নেহায়া গ্রন্থে লেখেন, তার মধ্যে ১৬ ফারসাখ দূরত্ব ছিল। আর এক ফারসাখ তিন মাইলের সমান। সুতরাং ১৬ ফারসাখ সমান (১৬ × ৩) ৪৮ মাইল। উল্লেখ্য আরবি হিসাবে চার হাজার হাত বা দু'হাজার গজে এক মাইল। আমাদের দেশীয় মাপে ১৭৬০ গজে এক মাইল। অতএব আরবি মাইল আমাদের প্রচলিত মাইলের চাইতে ২৪০ গজ বেশি।

وَعَنْ ١٢٧٤ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১২৭৪. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারো বার সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফর সঙ্গী ছিলাম। কোনো সফরেই আমি তাঁকে সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর জোহরের [ফরজের] পূর্বে দু' রাকাত [নফল] নামাজ তরক করতে দেখিনি।-[আবূ দাউদ ও তিরমিযী। তবে তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)-এর বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর অবস্থায় যোহর নামাজের ফরজের পূর্বে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। সম্ভবত তিনি এ নামাজ তাহিয়্যাতুল অজু হিসাবে পড়েছেন। অথবা হতে পারে, এটা জোহরের সুন্নতের সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল।

وَعَنْ ١٢٧٥ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ (رضـ) كَانَ يَرٰى اِبْنَهُ عُبَيْدَ اللّٰهِ يَتَنَفَّلُ فِى السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১২৭৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সফরে তাঁর পুত্র উবাইদুল্লাহ্‌কে নফল নামাজ পড়তে দেখতেন অথচ তাকে নিষেধ করতেন না। -[মুয়াত্তায়ে মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সফর অবস্থায় সুন্নত-নফল ইত্যাদি নামাজ পড়া সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের হাদীস রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীদের অধিকাংশের মতে এটা পড়া জায়েজ। যেমন- রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন 'সালাতুয্ যোহা' অর্থাৎ চাশতের নামাজ আট রাকাত পড়েছেন, অথচ তখন তিনি সফর অবস্থায় ছিলেন। আর নামাজটি ছিল নফল। তবে তাঁরা সফরে এ নামাজের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন না। যেমন- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) তাই করতেন, যারা নফলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিত তিনি তাদেরকে নিষেধ করতেন। যেমন- পূর্বে হাফস ইবনে আসেমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যথা তিনিও নিষেধ করতেন না। তবে মাঝে মধ্যে কেউ পড়ার ইচ্ছা করলে তিনি নিষেধ করতেন না। যেমন- এখানে তাঁর পুত্রকে নিষেধ করেননি।

بَابُ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ : জুমার ফজিলত

اَلْجُمُعَةُ **শব্দটি** مِيْم ও جِيْم অক্ষরে পেশ, অথবা جِيْم -এর ওপর পেশ এবং مِيْم এ সাকিন উভয় অবস্থায়ই পড়া যায়, তবে প্রথম কেরাতই অধিক বিশুদ্ধ। اَلْجُمُعَةُ শব্দের "ة" টি مُبَالَغَةْ -এর জন্য এসেছে, শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْيَوْمُ الْمَجْمُوْعُ। অর্থাৎ সপ্তাহের সমষ্টি দিন। তবে اَلْمَجْمُوْعُ টি اِسْمُ مَفْعُوْل হলেও اَلْجَامِعُ অর্থে ব্যবহৃত। সপ্তাহে একদিন তথা শুক্রবার দিন সকল মুসলমান একত্র হয়ে জামাতের সাথে যে নামাজ পড়ে তাকে صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ বলা হয়।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً :

জুমআকে জুমা নামে নামকরণের কারণ : জুমার দিনকে জুমা নামে নামকরণের কয়েকটি কারণ বর্ণিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. বুখারী শরীফের শরাহগ্রন্থ আইনীতে উল্লিখিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّمَا سُمِّىَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَمَعَ فِيْهِ خَلْقَ اٰدَمَ (ع)

আল্লাহ তা'আলা এই দিনে হযরত আদম (আ.)-এর যাবতীয় উপাদান একত্র করেছেন বিধায় এ দিনকে জুমার দিন বলা হয়।

২. দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে ইবনে খুযাইমা হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

يَا سَلْمَانُ مَا تَدْرِىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بِهٖ جُمِعَ اَبُوْكَ وَاَبُوْكُمْ (اَىْ لِاِجْتِمَاعِ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَوَاءَ عَلَيْهَا السَّلَامُ)

অর্থাৎ, হে সালমান! তুমি জুমার দিন সম্পর্কে কি জান? [সালমান (রা.) বলেন,] উত্তরে আমি বলেছিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই দিন তোমাদের পিতামাতা [আদম ও হাওয়া] দুনিয়াতে একত্র হন। বেহেশ্‌ত হতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর এই দিনেই আরাফাতের ময়দানে আদম ও হাওয়ার মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সম্ভবত এ কারণেই উক্ত দিবসটিকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩. অথবা হুজুর ﷺ -এর আগমনের পূর্বে كَعْبُ بْنُ لُوَئِّى -এর নিকট জনগণ একত্র হতো, এ দিন সে তাদেরকে উপদেশ দিত এবং এও বলত যে, অনতি বিলম্বে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। এ জন্য একে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলা হয়। জাহিলিয়া যুগে এদিনকে يَوْمُ الْعَرُوْبَةِ বলা হতো। সর্ব প্রথম কাব ইবনে লুওয়াই এ দিনটির يَوْمُ الْعَرُوْبَةِ নাম পরিবর্তন করে يَوْمُ الْجُمُعَةِ নামকরণ করে।

৪. কারো মতে– سُمِّىَ جُمُعَةً لِاَنَّ خَلْقَ الْعَالَمِ قَدْ تَمَّ وَجُمِعَ فِيْهِ

৫. ইবনে হাযমের মতে, ইসলামের আর্বিভাবের পরে এ দিনটিকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলার কারণ এই যে, এদিন মানুষ সমবেত হয়ে জুমার নামাজ আদায় করে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٧٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ اَلْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ اَوَّلُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ اَنَّهُمْ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ اِلٰى اٰخِرِهِ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ الْحَدِيْثِ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْاَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِىُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ .

১২৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আগমনকারীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী থাকব। পার্থক্য হলো এই যে, তাদেরকে আমাদের পূর্বে [আল্লাহর] কিতাব দান করা হয়েছে, আর আমাদেরকে তা দান করা হয়েছে তাদের পরে। অতঃপর তাদের উপরে এ দিনটি অর্থাৎ জুমার দিনটি [ইবাদতের জন্য] ফরজ করা হয়েছিল অর্থাৎ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা [ইহুদি-নাসারাগণ] এ দিনটির ব্যাপারে মতভেদ করল। আর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন, ফলে এ ব্যাপারে অন্যান্য লোকেরা আমাদের পিছনে থাকল। ইহুদিগণ পরের দিন [শনিবার]-কে এবং নাসারাগণ তার পরের দিন অর্থাৎ [রবিবার]-কে গ্রহণ করল। -[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, হুজুর ﷺ বলেছেন- আমরা পরবর্তী আগমনকারীরাই কিয়ামতের দিন অগ্রবর্তী হবো। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মধ্যে আমরাই হবো প্রথম। অতঃপর বর্ণনাকারী [আবূ হুরায়রা] 'তবে পার্থক্য এই যে, বাক্য হতে শেষ পর্যন্ত পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আবূ হুরায়রা ও হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসের শেষাংশে বলেছেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমরাই সর্বশেষ আগমনকারী এবং কিয়ামতের দিনে আমরাই প্রথম। যাদের জন্য [হিসাব-কিতাব ও জান্নাতে প্রবেশের] আদেশ সমস্ত সৃষ্টির পূর্বে দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَيْدَ اَنَّهُمْ -এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের بَيْدَ শব্দটির ওজন ও অর্থ غَيْرَ -এর মতোই, নাহুবীদ খলীল ও কিসায়ী এই মতামতই পেশ করেন। এমতাবস্থায় হাদীসের ইবারত হবে-

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ غَيْرَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا

আল্লামা তুরেপেশ্‌তী (র.) বলেন, بَيْدَ اَنَّهُمْ -এর অর্থ হলো عَلٰى اَنَّهُمْ

ইমাম শাফেয়ী(র.) হতে বর্ণিত আছে بَيْدَ اَنَّهُمْ অর্থ হলো مِنْ اَجَلِ اَنَّهُمْ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) একে যথার্থ মনে করেছেন।

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ **-এর মর্মার্থ** : এর মর্মার্থ হলো, দুনিয়াতে আমাদের আগমন সর্বশেষে ঘটলেও এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়ে থাকলেও আমরা মর্যাদার প্রেক্ষিতে অগ্রগণ্য। কেননা কুরআন হলো দীনে মুহাম্মদীর সংবিধান, যা অন্যান্য ধর্মের নাসেখ বা রহিতকারী।

وَالنَّاسِخُ هُوَ السَّابِقُ فِى الْفَضْلِ وَاِنْ كَانَ مُتَاَخِّرًا فِى الْوُجُوْدِ

আর নাসেখ বা রহিতকারীই হলো মর্যাদার দিক দিয়ে অগ্রগামী, যদিও তার অস্তিত্ব পরে ঘটুক না কেন। মূলত এ অগ্রগামীতার হিসাবে উম্মতে মুহাম্মদী আখেরাতেও অগ্রগামী হবে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, বিভিন্ন মর্যাদায় পরিপূর্ণতার কারণে উম্মতে মুহাম্মদী অগ্রগামী। সর্বশেষ আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হওয়া পরিপূর্ণতার পরিপন্থী নয়; বরং এটা পরিপূর্ণতার পরিচায়ক।

فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ" **-এর ব্যাখ্যা** : পূর্ব যুগের উম্মতের ওপর জুমআ ফরজ ছিল; কিন্তু তারা তা সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি করে। ফরজ তো পালন করা অপরিহার্য, কিন্তু কি করে তারা মতবিরোধ করেছিল এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগ্রত হয়। তাই হাদীস বিশারদগণ এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন–

অতীত উম্মতের উপর বর্তমান পদ্ধতির ন্যায় জুমার নামাজ ফরজ ছিল না; বরং হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, ইবাদত-বন্দেগি করার জন্য তাদের উপর জুমার দিনকে ফরজ করে তাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈক্য সৃষ্টি করে। মূলত জুমার দিন কোনটি তা তারা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেনি। যেমন– উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইহুদিরা শনিবার দিনকে নির্ধারণ করেছিল। কেননা তাদের যুক্তি হলো, এই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমান-জমিনের সৃষ্টি সমাপ্ত করে অবসর নিয়েছিলেন। সুতরাং সব কাজকর্ম পরিহার করে মানুষের জন্য এই দিনই ইবাদত-বন্দেগিতে ব্যাপৃত থাকা শ্রেয়। পক্ষান্তরে নাসারারা রবিবার দিনকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছিল। তাদের যুক্তি হলো, কেননা এ দিনই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সূচনা করেন। এটাই হলো তাদের পার্থক্যের ধরন।

অথবা فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকৃতিগতভাবে তাদের উপর জুমা ফরজ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মতানৈক্যের মাধ্যমে তা অস্বীকার করেছিল।

فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهُ **-এর মর্মার্থ হলো** : জুমার দিন সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মাদীকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। জুমার দিন সম্পর্কে যুক্তি হলো, এই দিন আল্লাহ তা'আলা আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এই মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই উম্মতে মুহাম্মাদী জুমার দিনটিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, হিদায়েত প্রদানের অর্থ হলো উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য তা সুস্পষ্ট করে দেওয়া। অথবা এর মর্মার্থ হলো, উম্মতে মুহাম্মাদী ইজতেহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করেছে।

১২৭৭ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিনই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁকে তা [জান্নাত] হতে বের করা হয়েছে এবং জুমার দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَضَائِلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ **জুমার দিনের বৈশিষ্ট্যসমূহ** : জুমার দিনের অনেক ফজিলত রয়েছে। যার কিছু নিম্নরূপ- (১) এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) এ দিনে আদম (আ.)-কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। (৩) এ দিনে হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাত হতে বের করা হয়েছে। (৪) এ দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে। (৫) এ দিনে জমিনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নেমেছে। (৬) এ দিনে দোয়া কবুলের একটি সময় আছে, যা অন্যদিনে নেই। (৭) এ দিনে ইউসুফ (আ.) কারাগার হতে মুক্তি পেয়েছেন। (৮) এ দিনে হযরত আইউব (আ.) রোগ হতে মুক্তি পেয়েছেন। (৯) এ দিন হচ্ছে গরিবের হজের দিন। যেমন- হাদীসে এসেছে قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِيْنِ (১০) এই দিনে মুহাম্মদ ﷺ-কে নিষ্পাপ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْاَحَادِيْثِ وَالتَّطْبِيْقُ بَيْنَهُمَا **হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান** : আলোচ্য হাদীস দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যায় যে, জুমার দিন হলো সর্বোত্তম। অথচ অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الْاَيَّامِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمُ النَّحْرِ অপর এক হাদীসে এসেছে- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ يَوْمٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ
এ হাদীসদ্বয়ে যথাক্রমে কুরবানির এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিনকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানকল্পে হাদীসবিশারদগণ বলেন—

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে জুমার দিনকে সপ্তাহের মধ্যে উত্তম বলা হয়েছে। আর অন্য দু'টি হাদীসে পুরা বৎসরের ভিত্তিতে কুরবানির ও আরাফার দিনকে উত্তম বলা হয়েছে।

অথবা হাদীসে বর্ণিত তিনটি দিনের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রত্যেকটিকে উত্তম বলা হয়েছে। এ সমাধানের পর উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে কোনো রকম দ্বন্দ্ব থাকে না।

١٢٧٨ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَ زَادَ مُسْلِمٌ قَالَ وَهِىَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ .

১২৭৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি মুসলমান বান্দা ঐ সময়টি লাভ করে এবং ঐ সময়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে নিশ্চয় তা দান করেন।-[বুখারী ও মুসলিম]

কিন্তু মুসলিম এ কথাটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এটা একটি স্বল্প মুহূর্ত"। বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জুমার দিনে একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান নামাজ অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে [দীন ও দুনিয়ার] কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা দান করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً **-এর ব্যাখ্যা** : জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীন ও ইমামদের মধ্যে বহু মতপার্থক্য আছে। কারো মতে ঐ মুহূর্তটি আল্লাহ তা'আলা তুলে নিয়েছেন। আর যারা বলেন, সে মুহূর্তটি আল্লাহ তা'আলা উঠিয়ে নেননি, বরং কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে তাদের বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতামত রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. বৎসরের কোনো এক জুমআর দিনে ঐ মুহূর্তটি রয়েছে। ২. ইমাম যখন খোতবা দেন, ৩. সূরা ফাতিহার পর 'আমিন' বলার সময়, ৪. আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে, ৫. মুয়াজ্জিনের আযানের সময়, ৬. সূর্য ঢলে পড়ার সময়, ৭. ইমাম মিম্বারে উঠার সময়, ৮. উভয় খোতবার মধ্যবর্তী বসার সময়, ৯. জুমার দিন ফজরের আযানের সময়, ১০. বিভিন্ন জুমার বিভিন্ন সময়। এভাবে ৪৩টি অভিমত রয়েছে। তবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিসঙ্গত মত এই যে, দোয়া কবুলের সে মুহূর্তটি পূর্ণ দিনের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। যেমন 'লাইলাতুল কদর' রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যে গোপন রাখা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, যাতে বান্দা এর অনুসন্ধানে সর্বদা ইবাদতে ও দোয়া ইস্তিগফারে মশগুল থাকে। বান্দার এই অবস্থাকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন।

وعن ١٢٧٩ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوْسٰى (رض) قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ فِى شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ هِىَ مَابَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى أَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ বুরদা ইবনে আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি জুমার দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে বলেছেন, এটা ইমামের মিম্বারে বসার সময় হতে নামাজ শেষ করা পর্যন্ত সময়টাই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সম্ভবত হুজুর ﷺ-এর এ সময়টি নির্দিষ্ট করে বলা, কোনো এক জুমার দিন সম্পর্কে ছিল। অন্যথা হুজুর ﷺ হতে ঐ মুহূর্ত সম্পর্কে বহু রকমের রেওয়ায়াত বর্ণিত আছে, যা আমরা পূর্বের হাদীসে বর্ণনা করেছি।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عن ١٢٨٠ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ خَرَجْتُ اِلَى الطُّوْرِ فَلَقِيْتُ كَعْبَ الْاَحْبَارِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَحَدَّثَنِىْ عَنِ التَّوْرٰةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثْتُهُ اَنْ قُلْتُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا وَهِىَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ اِلَّا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَفِيْهِ

১২৮০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি [সিরিয়ার] সিনাই পর্বতের দিকে সফরে বের হলাম এবং [তাওরাত বিশেষজ্ঞ তাবেয়ী] কা'ব আহবারের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তাঁর সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। তিনি আমাকে তাওরাত গ্রন্থ হতে কিছু বললেন, আমিও তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু হাদীস শুনালাম। আমি যা বর্ণনা করেছি তন্মধ্যে এটাও ছিল যে, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমার দিন, এতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে [জান্নাত হতে] বের করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এ দিনেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন, এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এমন কোনো প্রাণী নেই যে জুমাবারের উষার উদয় হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামতের বিভীষিকার আশঙ্কায় চিৎকার করতে না থাকে, মানুষ ও জিন ব্যতীত।

سَاعَةً لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِى كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرٰةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِىْ مَعَ كَعْبِ الْاَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبَ كَعْبٌ فَقُلْتُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرٰةَ فَقَالَ بَلْ هِىَ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ صَدَقَ كَعْبٌ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِهَا وَلَا تَضِنَّ عَلَىَّ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ تَكُوْنُ اٰخِرَ سَاعَةٍ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِىْ صَلٰوةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهُوَ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَ رَوٰى اَحْمَدُ اِلٰى قَوْلِهِ صَدَقَ كَعْبٌ)

জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মুসলমান বান্দা নামাজ পড়া অবস্থায় একে [মুহূর্তটিকে] পায় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট [দীন ও দুনিয়ার] কোনো বস্তু প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করেন। কা'ব আহবার এটা শুনে বললেন, এ জুমা বৎসরে একবার আসে মাত্র। আমি বললাম, না; বরং প্রত্যেক জুমাবারেই আসে। তখন কা'ব তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্য বলেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, [এর পর] আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং কা'ব আহবারের সাথে আমার বৈঠকের ঘটনা এবং জুমাবার সম্পর্কে তার সাথে যা আলোচনা করেছি তা তাঁর নিকট ব্যক্ত করলাম এবং বললাম, কা'ব বলেছিলেন, ঐ মুহূর্তটি প্রত্যেক বৎসরে এক জুমায় মাত্র আসে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, কা'ব মিথ্যা বলেছে। তখন আমি তাঁকে বললাম, অতঃপর কা'ব তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, না! তা প্রত্যেক জুমাবারেই আসে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, কা'ব সত্য কথা বলেছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, সে মুহূর্তটি কি তা আমি জানতে পেরেছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন, তখন আমি বললাম, দয়া করে আমাকে তা জানিয়ে দিন! আমার প্রতি কার্পণ্য করবেন না। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তা জুমার দিনের শেষ সময়টি। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তখন আমি বললাম, জুমার দিনের শেষ ক্ষণটি কিভাবে হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো মুসলমান বান্দা একে নামাজে রত অবস্থায় পায়" [অথচ আসরের পর কোনো নামাজ পড়া মাকরূহ)। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এ কথা বলেননি যে, "যে ব্যক্তি নামাজের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজেই থাকে, যতক্ষণ না সে ঐ নামাজ সম্পন্ন করে?" হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন– আমি বললাম, জি-হ্যাঁ, বলেছেন। তিনি [আব্দুল্লাহ] বললেন, এটাও তাই অর্থাৎ নামাজের অপেক্ষায় থাকাকেই নামাজ অর্থে বুঝানো হয়েছে। –[মালেক, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]। ইমাম আর আহমদ "কা'ব সত্য বলেছেন" বাক্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার উভয়ই তাওরাত বিশেষজ্ঞ ইহুদি আলেম ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম স্বয়ং মহানবী (সা.) -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর কা'ব আহ্বারও খ্যাতনামা ইহুদি পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হযরত ওমর ফারূকের জমানায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হযরত উসমান (রা.) -এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন।

আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমাবারের দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে মহানবী ﷺ যা বর্ণনা করেছেন তার সমর্থন পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতে উল্লেখ আছে। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর হাদীসে উক্ত মুহূর্তটি 'ইমামের মিম্বারে বসা হতে নামাজ শেষ করার মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত বলা হয়েছে' এবং হাদীসটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত। এতদসত্ত্বেও মুহাদ্দেসীনে কেরাম হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীসটিকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন এবং অনেকের মতে ঐ মুহূর্তটি আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।

وَعَنْ ١٢٨١ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِىْ تُرْجٰى فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১২৮১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমাবারের সেই সময়টি, যাতে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায় তা আসর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তালাশ কর। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٢٨٢ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلٰوتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

১২৮২. অনুবাদ : হযরত আওস ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুমার দিনটিই হলো শ্রেষ্ঠ। এতে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং এতেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং এ দিনেই পুনর্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এ দিন তোমরা আমার প্রতি বেশি করে দরূদ পাঠ করো। তোমাদের দরূদ নিশ্চয় আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাদের দরূদ আপনার নিকট কেমন করে উপস্থিত করা হবে অথচ আপনি তখন মাটি হয়ে যাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর করলেন, নবীদের শরীর আল্লাহ তা'আলা জমিনের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌, দারেমী এবং বায়হাকী দাওয়াতুল কবীরে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ-এর ব্যাখ্যা : দরূদ শোনা, তাঁর নিকট তা পেশ হওয়া ইত্যাদি মৃত্যুর কারণে অন্তরায় হয়। নবীদেরও সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তাঁদের কিছু শোনা বা তাঁদের নিকট কোনো কিছু উপস্থিত হওয়া একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং মহানবী ﷺ-এর কথার প্রেক্ষিতে সাহাবীগণ এ সংশয়ে পড়েছিলেন এটা কিভাবে সম্ভব? অতএব এটা নিরসনের জন্য তাঁরা এ প্রশ্ন করেছিলেন এবং এর জবাবেই তিনি উপরোক্ত কথাটি বলেছেন যে, নবীরা সাধারণ মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে মাটিতে কবরস্থ হলেও তাঁদের ব্যাপারটি অন্য রকম। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে মাটির উপর নির্দেশ। মৃত্যুর পরে দেহ-শরীর বিনষ্ট হওয়া চিরা-চরিত ও প্রকৃতগত ব্যাপার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম নবী-রাসূলদের শরীর বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা কোনো অবস্থাতেই বিনষ্ট হবে না। তাই হুজুরের প্রতি দরূদ পেশ হওয়া এবং তাঁর তা শোনা ইত্যাদি কিছুই অসম্ভব নয়। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাস। অন্যান্য বহু হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে।

وَعَنْ ١٢٨٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَوْمُ الْمَوْعُوْدُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُوْدُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلٰى يَوْمٍ اَفْضَلُ مِنْهُ فِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللّٰهَ بِخَيْرٍ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِيْذُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَعَاذَهُ مِنْهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَا يُعْرَفُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُوْسٰى مِنْ عُبَيْدَةَ وَهُوَ يُضَعَّفُ) .

১২৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [কুরআন মাজীদে উল্লিখিত] 'আল-ইয়াউমুল মাওউদ' বা প্রতিশ্রুত দিবস হলো কিয়ামতের দিন, 'মাশহুদ' বা মাশহুদ দিবস হলো আরাফাতের দিন এবং 'শাহেদ' দিবস হলো জুমার দিন। এমন কোনো দিনে সূর্য উদয়াস্ত হয় না, যে দিন জুমার দিন হতে উত্তম। জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোনো মু'মিন বান্দা একে পায় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা মঞ্জুর করেন। আর যদি কোনো অকল্যাণ হতে রেহাই প্রার্থনা করে আল্লাহ রেহাই দান করেন। –[আহমদ ও তিরমিযী]

কিন্তু তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব। কেননা এটা মূসা ইবনে উবায়দা ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে বর্ণিত নয়। আর ইবনে উবায়দা দুর্বল রাবী বলে অভিযোগ আছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : 'মাওউদ' অর্থ– প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুত দিবস বলতে কিয়ামতের দিনকে বুঝায়। কারণ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ কুরআনে প্রদান করেছেন। 'মাশহুদ' অর্থ– যাকে হাজির করা হয়েছে। আরাফাতের দিনে দুনিয়ার বিভিন্ন দিক হতেই মুসলমানদেরকে হাজির করা হয়। আর 'শাহেদ' অর্থ– যে হাজির হয়। জুমার দিন নিজেই প্রতি সাতদিনে একবার মানুষের নিকট উপস্থিত হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

১২৮৪ - عَنْ اَبِىْ لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْاَضْحٰى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ وَاَهْبَطَ اللّٰهُ فِيْهِ اٰدَمَ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ تَوَفَّى اللّٰهُ اٰدَمَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يَسْاَلُ الْعَبْدُ فِيْهَا شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ مَالَمْ يَسْاَلْ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَاسَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَاجِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ اِلَّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

وَ رَوٰى اَحْمَدُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنَا عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَاذَا فِيْهِ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِيْهِ خَمْسُ خِلَالٍ وَسَاقَ اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ -

১২৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিন সপ্তাহের সকল দিনের সর্দার এবং তা আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্যান্য দিন হতে সম্মানিত। এ দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে ঈদুল আয্হা ও ইদুল ফিতরের দিন হতেও সম্মানিত। এ দিনে পাঁচটি [গুরুত্বপূর্ণ] বিষয় রয়েছে– (১) এতে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। (২) এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জমিনে প্রেরণ করেছেন। (৩) এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.)-কে ওফাত দান করেছেন। (৪) এ দিনেই এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, যাতে আল্লাহর কোনো বান্দা কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দান করেন এবং (৫) এ দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। প্রত্যেক সম্মানিত ফেরেশতা, আকাশসমূহ, জমিন, বাতাস, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সব কিছুই জুমার দিন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। [কি জানি কোন জুমায় কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়?] –[ইবনে মাজাহ্]

ইমাম আহমদ হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, একদা আনসারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হুযূর ! আমাদেরকে জুমার দিন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাত করুন, এতে কি কি কল্যাণ রয়েছে? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, এতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রয়েছে এবং হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

১২৮৫ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ لِاَىِّ شَىْءٍ سُمِّىَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَالَ لِاَنَّ فِيْهَا طُبِعَتْ طِيْنَةُ اَبِيْكَ اٰدَمَ وَفِيْهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثُ وَفِيْهَا الْبَطْشَةُ وَفِىْ اٰخِرِ ثَلٰثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللّٰهَ فِيْهَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১২৮৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি জন্য জুমার দিনকে জুমার দিন বলে নামকরণ করা হলো? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, কেননা এ দিনে তোমাদের পিতা হযরত আদম (আ.)-এর [সৃষ্টির উদ্দেশ্যে] কাদামাটি একসাথে করা হয়েছিল [অর্থাৎ একে ঘোলা হয়েছিল]। এ দিনেই বিশ্বের প্রলয় ঘটবে, সকল সৃষ্টজীবের পুনরুত্থান ঘটবে। এ দিনে কাফিরদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে, যাতে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট যা প্রার্থনা করে আল্লাহ তা মঞ্জুর করেন। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জুমার দিনকে জুমা হিসাবে নামকরণের কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে আলোচ্য হাদীসে তিনি এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন– (১) এ দিনে আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাদামাটি একত্র করে খামির বানানো হয়। (২) হযরত ইসরাফীল (আ.)-এর প্রথম শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মাধ্যমে এ দিনেই বিশ্বের প্রলয় ঘটবে। (৩) এ দিনেই দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারের দ্বারা মৃত্যুপ্রাপ্ত সকল সৃষ্টিজীবের পুনরুত্থান ঘটবে। (৪) কেয়ামতের ময়দানে এ দিনেই কাফিরদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে। (৫) وَفِىْ اٰخِرِ ثَلٰثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا অর্থাৎ وَفِىْ اٰخِرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَلٰثُ سَاعَاتٍ এ ثَلٰثُ سَاعَاتٌ-টি অপ্রকাশ্য রাখা হয়েছে দোয়ার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য। আর ঐ উপযুক্ত সময়গুলো হলো (এক) ইমাম যখন খোতবা দিতে বসেন; (দুই) দিবসের শেষ সময়টি এবং (তিন) আসরের পরে।

١٢٨٦ - وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثِرُوا الصَّلٰوةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ يَشْهَدُهُ الْمَلٰئِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ اِلَّا عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلٰوتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِىُّ اللّٰهِ حَىٌّ يُرْزَقُ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১২৮৬. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিনে তোমরা আমার উপরে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো। কেননা এটা উপস্থিতির দিন। এ দিনে ফেরেশতাকুল [আল্লাহর বিশেষ রহমত নিয়ে] উপস্থিত হয়ে থাকেন। তোমাদের যে কেউই আমার প্রতি দরুদ পাঠ করে নিশ্চয় তার দরুদ আমার নিকট পেশ করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দরুদ হতে অবসর না হয়। রাবী বলেন, আমি বললাম, মৃত্যুর পরেও [কি দরুদ আপনার সমীপে পেশ করা হবে]? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, [মৃত্যুর পরেও। কেননা] আল্লাহ তা'আলা নবীদের দেহ ভক্ষণ করা মাটির প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী সর্বদাই জীবিত, তাঁকে রিজিক দেওয়া হয়ে থাকে।

١٢٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ)

১২৮৭. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলমান জুমার দিনে কিংবা জুমার রাতে মৃত্যুবরণ করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখেন। –[আহমদ ও তিরমিযী। তবে তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনা সূত্র ধারাবাহিকভাবে গ্রথিত [মুত্তাসিল] নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসটিকে ইমাম আহমদ, বায়হাকী এবং শীরাযী ও বর্ণনা করেছেন। এখানে ফিতনা অর্থ মুনকার নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ অথবা কবরের আজাবকে বুঝানো হয়েছে। আবূ নুআইম তার হিলয়া নামক গ্রন্থে হযরত জাবের (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে কবরের আজাবের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

وَعَنْ ١٢٨٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ قَرَاَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (اَلْاٰيَةَ) وَعِنْدَهٗ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاِنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ يَوْمِ عِيْدَيْنِ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

১২৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতটি পাঠ করলেন, তখন তাঁর নিকটে এক ইহুদি ছিল। সে বলে উঠল যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাজিল হতো তবে আমরা নাজিলের দিনকে ঈদের দিন বানিয়ে নিতাম। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, এটা নাজিলই হয়েছে এমন একদিনে, যেদিন একসঙ্গে দু' ঈদ ছিল। [অর্থাৎ একদিকে ছিল] জুমার দিন এবং [অপরদিকে ছিল] আরাফার দিন। –[তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন যে, এ হাদীসটি হাসান গরীব।

وَعَنْ ١٢٨٩ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَجَبَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ اَغَرُّ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ اَزْهَرُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

১২৮৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রজব মাস আসত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান কর এবং আমাদেরকে রমজান মাস পর্যন্ত পৌছাও [অর্থাৎ বাঁচিয়ে রাখ]। রাবী বলেন, হুজুর আরও বলতেন, জুমার রাতটি সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত এবং জুমার দিনটি সবচেয়ে জ্যোতির্ময় দিন। –[বায়হাকী। দাওয়াতুল কাবীর গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

بَابُ وُجُوْبِهَا

পরিচ্ছেদ : জুমার নামাজ ফরজ হওয়া

জুমার নামাজ ফরজ কি না? এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

※ কিছু সংখ্যকের মতে এটা জানাযার নামাজের ন্যায় ফরজে কেফায়া। আল্লামা তীবী (র.) কোনো কোনো আলিমের অভিমত হিসাবে উল্লেখ করেছেন, তবে এ মত বিশুদ্ধ নয়।

※ জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত পোষণ করেছেন যে, জুমার নামাজ ফরজে আইন। এমনকি এটাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, সমস্ত উম্মত এর ফরযিয়্যাতের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এর অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে পরিগণিত হবে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

(١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ الخ ـ

এ আয়াতে ذِكْر দ্বারা জুমার নামাজ ও তার খোতবাকে বুঝানো হয়েছে, এতে সকলেই একমত।

(٢) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَا خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَلٰوةَ الْجُمُعَةِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ)

(ب) وَعَنْ حَفْصَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

※ ইজমা দ্বারাও জুমার ফরযিয়্যত সাব্যস্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকলেই এর ফরযিয়্যতের উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

※ কিয়াস দ্বারাও এর ফরযিয়্যত সাব্যস্ত হয়। জোহরের পরিবর্তে জুমার নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জোহর হলো ফরজ, আর এক ফরজ ব্যতীত অন্য ফরজ ত্যাগ করা বৈধ হতে পারে না। কাজেই জুমার নামাজ ফরজই হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٩٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُمَا قَالَا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৯০. অনুবাদ : হযরত ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের কাঠের উপরে [দাঁড়িয়ে] বলছেন, মানুষ জুমার নামাজকে পরিত্যাগ করা হতে ফিরবে, নতুবা আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দেবেন, অতঃপর তারা নিশ্চয় গাফিল বা অমনোযোগীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ-এর ব্যাখ্যা : জুমার নামাজ পরিত্যাগকারীর অন্তরকে আল্লাহ মোহরাঙ্কিত করে দেবেন এই خَتْم বা মোহর দ্বারা কি উদ্দেশ্য, এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে– (১) কারো মতে এর দ্বারা আল্লাহর রহমত উদ্দেশ্য অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমা পরিত্যাগ করবে সে আল্লাহর অনুকম্পা হতে দূরে সরে যাবে। (২) আরেক দলের মতে আল্লাহ তাদের অন্তরে কুফরি সৃষ্টি করে দেবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

১২৯১. عَنْ اَبِى الْجَعْدِ الضَّمْيرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَاَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ)

১২৯১. অনুবাদ : হযরত আবুল জা'দ জুমাইরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছে, যে ব্যক্তি অবহেলা বশত পর পর তিন জুমা ত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর অঙ্কিত করে দেন। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী]

ইমাম মালেক এটা হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম হতে এবং ইমাম আহমদ [তাবেয়ী] হযরত আবূ কাতাদা (র.) হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ -এর ব্যাখ্যা : আল্লামা তূরেপেশতী (র.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত طَبْعٌ অর্থ- خَتْمٌ বা পর্দা আরবণ। অর্থাৎ জুমার নামাজ অনাদায়ী ব্যক্তির অন্তর এমন একটি আবরণে আচ্ছাদিত করা হয় যার ফলশ্রুতিতে সে সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

অথবা বলা যেতে পারে, طَبْعٌ অর্থ- دَنَسٌ বা অপবিত্রতা। অর্থাৎ জুমার নামাজ পরিত্যাগকারী এটা পরিত্যাগ করার কারণে তার অন্তর অপবিত্র করে দেওয়াই আলোচ্য হাদীসাংশের উদ্দেশ্য।

১২৯২. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১২৯২. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমার নামাজ ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি সে এতটুকু না পারে তবে সে যেন অর্ধ দীনার দান করে। -[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّصَدُّقُ مُكَفِّرَةٌ اَمْ لَا وَالْاِخْتِلَافُ فِيْهِ সদকা গুনাহের কাফ্ফারা হওয়ার মধ্যে মতভেদ : কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমার নামাজ ত্যাগ করে, কেয়ামতের দিন ছাড়া তার কোনো কাফ্ফরা হবে না। অথচ উপরে বর্ণিত সামুরার হাদীসে সদকা করার নির্দেশ রয়েছে। এর সমাধানে মোল্লা আলী কারী (র.) ইবনে হাজার আসকালানী (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, তার কোনো কাফ্ফারাই হবে না। এ কথাটির সঠিক অর্থ হলো, তার উপর জুমা তরক করার পাপ থেকেই যাবে, যার ফয়সালা কেয়ামতের দিনই হবে। আর যে হাদীসে সদ্কার নির্দেশ রয়েছে তার অর্থ এই যে; গুনাহ কিছুটা লঘু হতে পারে। সমস্ত গুনাহ হতে অব্যাহতি পাবে এমন কিছু নয়। মোটকথা, সদকা দ্বারা শাস্তি কিছুটা লঘু হবে বলে আশা করা যায়।

وَعَنْ ١٢٩٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১২৯৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জুমার নামাজ তার উপর ফরজ যে জুমার আযান শুনে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া কার জন্য ওয়াজিব : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আযান শুনে একমাত্র তার ওপরই জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে মতানৈক্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও মালেক (র.)-এর মতে যারা আযান শুনে তাদের জন্যই জুমায় উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। তাঁরা উপরে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন।

হানাফীদের অভিমত যা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), আনাস (রা.), ইবনে ওমর (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত এবং নাফে, হাসান বসরী, ইকরামা, হাকাম, ইমাম নাখয়ী, আতা, আওযায়ীরও অভিমত; তাঁদের মতে সেই ব্যক্তির উপর জুমার নামাজে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পর রাত হওয়ার পূর্বে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হবে, আযান শ্রবণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। দলিল হলো নিম্নের হাদীস–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তাঁদের জবাব : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখ ইমামগণ اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন এর উত্তর হলো, এ হাদীস সম্পর্কে আবূ দাউদ (র.) বলেন, হাদীসটি সুফইয়ান সাওরী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে মাওকূফ হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। আর মাওকূফ হাদীস সর্বক্ষেত্রে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অথবা যারা শহরে মসজিদের কাছাকাছি থাকেন অনেক সময় দেখা যায়, তারাও আযান শুনতে পান না। আর আযান না শোনার কারণে তাদের উপর কি জুমার নামাজ ফরজ নয়? সুতরাং আযান শ্রবণের সাথে জামাতে উপস্থিত হওয়াকে সম্পৃক্ত করা কোনো ক্রমেই সমীচীন হতে পারে না।

وَعَنْ ١٢٩٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْجُمُعَةُ عَلٰى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ)

১২৯৪. অনুবাদ : আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, জুমার নামাজ সে ব্যক্তির উপর ফরজ, যে ব্যক্তি রাতে নিজ পরিবারে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ মুকিম। –[তিরমিযী। তবে তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র দুর্বল।

وَعَنْ ١٢٩٥ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ اِلَّا عَلٰى اَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوْكٍ اَوْ اِمْرَأَةٍ اَوْ صَبِيٍّ اَوْ مَرِيْضٍ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ وَائِلٍ) ـ

১২৯৫. অনুবাদ : হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার নামাজ যথার্থভাবেই প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামাতের সাথে ফরজ। কিন্তু চার ব্যক্তি ব্যতীত– ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও রুগণব্যক্তি।–[আবূ দাউদ। কিন্তু শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে মাসাবীহের অনুরূপ বাক্য বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রাবী তারেক ইবনে শিহাবের স্থলে 'বনী ওয়াইলের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত' কথাটি রয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلشَّرَائِطُ لِلْجُمُعَةِ **জুমার নামাজের জন্য শর্তাবলি** : জুমার নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য বারোটি শর্ত রয়েছে, তন্মধ্যে ছয়টি হলো মুসল্লির জন্য; আর আনুষঙ্গিক হলো ছয়টি। মুসল্লির জন্য ছয়টি হলো– (১) স্বাধীন হওয়া। (২) পুরুষ হওয়া। (৩) মুকিম হওয়া। (৪) সুস্থ হওয়া। (৫) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। (৬) জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া।আরবি পদ্যে এগুলো এভাবে ব্যক্ত হয়েছে–

حُرٌّ صَحِيْحٌ بِالْبُلُوْغِ مُذَكَّرٌ * مُقِيْمٌ ذُوْ عَقْلٍ لِشَرْطِ وُجُوْبِهَا

شَرْطُ اَدَاءِ الْجُمُعَةِ **জুমার নামাজ আদায় করার জন্য নিম্নোক্ত ছয়টি শর্ত আবশ্যক** : (১) وَقْت তথা জোহরের সময় হওয়া। (২) خُطْبَةٌ নামাজের পূর্বে দু'টি খোতবা প্রদান করা। (৩) জামাতের সাথে আদায় করা।لِاَنَّ الْجُمُعَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ. (৪) শহর বা শহরতলী হওয়া। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا اَضْحٰى اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ (৫) বাদশাহ বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত হওয়া। (৬) اِذْنٌ عَامٌّ বা সকল মানুষের জন্য নামাজ পড়ার অনুমতি থাকা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٢٩٦ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اُحْرِقُ عَلٰى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১২৯৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ এক সম্প্রদায় লোক সম্পর্কে বলেছেন, যারা জুমার নামাজ হতে পিছনে সরে থাকত, আমি দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা পোষণ করেছি যে, আমি কোনো ব্যক্তিকে আদশে করব, সে আমার পরিবর্তে লোকদেরকে নামাজ পড়াবে। অতঃপর আমি গিয়ে ঐ সব লোকদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব– যারা জুমার নামাজ হতে সরে থাকে অর্থাৎ নামাজে আসে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ স্বেচ্ছায় জুমা পরিত্যাগকারীদের উপর কঠোরতা প্রদর্শনের জন্যই উল্লিখিত উক্তি করেছেন তথা জুমা পরিত্যাগ করা যে, অত্যন্ত মন্দ কর্ম এটাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ١٢٩٧ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِىْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ وَفِىْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلٰثًا . (رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ)

১২৯৭. **অনুবাদ** : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে জুমার নামাজ ছেড়ে দেয় তাকে [আল্লাহ তা'আলার দরবারে] এমন লিপিতে মুনাফিক হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হবে, যার লেখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তনও করা যায় না। কোনো কোনো বর্ণনায় 'তিনবার' কথাটি রয়েছে [অর্থাৎ জুমার নামাজ বিনা ওজরে তিনবার তরক করেছে]। –[শাফেয়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুমার নামাজ পরিত্যাগ করে তাকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং মুনাফিকদের তালিকা হতে তাকে কখনো বাদ দেওয়া হবে না। মূলত এ কথা দ্বারা জুমা পরিত্যাগকারীর প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ١٢٩٨ - جَابِرٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلَّا مَرِيْضٌ اَوْ مُسَافِرٌ اَوْ اِمْرَأَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَمْلُوْكٌ فَمَنِ اسْتَغْنٰى بِلَهْوٍ اَوْتِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ـ (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيْ)

১২৯৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর ঈমান আনয়ন করেছে তার উপর জুমার নামাজ ফরজ। তবে রুগ্‌ণ ব্যক্তি, মুসাফির, মহিলা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, পাগল কিংবা ক্রীতদাস ব্যতীত। এদের উপর জুমার নামাজ ফরজ নয়। যে ব্যক্তি জুমার নামাজ হতে বিমুখ থাকে এবং খেলাধুলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বিমুখ থাকেন। আল্লাহ স্বয়ং সমৃদ্ধ ও অধিক প্রশংসিত। –[দারাকুত্‌নী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْتَغْنَى اللّٰهُ عَنْهُ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা পার্থিব কোনো কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রেখে জুমার নামাজ হতে বিমুখ থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তার থেকে বিমুখ থাকেন, অর্থাৎ সে ব্যক্তির কোনো ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। আলোচ্য হাদীসটি সূরায়ে জুমার নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইঙ্গিতবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ـ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ـ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ আর যখন তারা কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিভিন্ন কর্মে মগ্ন হওয়ার মতো (বস্তু) দেখতে পায়, তখন তার প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য ছাড়িয়ে পড়ে, আর আপনাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় রেখে যায়। আপনি বলে দিন, যে বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে, [অর্থাৎ, ছওয়াব ও নৈকট্য লাভ] তা এরূপ মগ্নতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। কেননা মহান আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবিকা প্রদানকারী।

بَابُ التَّنْظِيْفِ وَالتَّبْكِيْرِ

পরিচ্ছেদ : পবিত্রতা অর্জন ও সকাল সকাল মসজিদে গমন

اَلتَّنْظِيْفُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل-এর মাসদার, نَظْف মূলধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো– পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নামাজির পোশাক-পরিচ্ছদ, শরীর ময়লা ও অপবিত্রতা হতে পরিষ্কার করা, এমনিভাবে শরীরে তেল, আতর লাগানো, বিশেষভাবে জুমার দিনে এটা ব্যবহার সুন্নত।

আর اَلتَّبْكِيْرُ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل -এর মাসদার, অর্থ হলো اِتْيَانُ الصَّلٰوةِ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا প্রথম ওয়াক্তে নামাজের জন্য গমন করা। এ কথাটির দিকে পবিত্র কুরআনেও فَاسْعَوْا দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٢٩٩ - عَنْ سَلْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهٖ وَيَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهٖ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَا كُتِبَ لَهٗ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلَّا غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

১২৯৯. অনুবাদ : হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিচ্ছন্নতা লাভ করে। অতঃপর নিজের সঞ্চিত তেল হতে নিজের শরীরে কিছু তেল মাখে, তারপর ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর মসজিদের দিকে রওয়ানা করে এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক করে না, তারপর যা তার পক্ষে সম্ভব নফল-সুন্নত নামাজ পড়ে। অতঃপর ইমাম যখন খোতবা দিতে থাকেন তখন সে চুপ করে শুনে। নিশ্চয়ই তার এই জুমা ও পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত [সগীরা] গুনাহ মাফ করা হয়।– [বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمَسَائِلُ الْمُتَعَلِّقَةُ **প্রাসঙ্গিক মাসআলা** : আলোচ্য হাদীস হতে যে সমস্ত শরয়ী মাসআলা অনুসৃত হয় তা হলো– (১) জুমার দিন গোসল করা, (২) পাক-পবিত্র হওয়া, (৩) জামা-কাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার করা, (৪) গোঁফ কাটা, (৫) গুপ্তস্থানের অবাঞ্ছিত পশম দূর করা, (৬) বগলের নিচের পশম দূর করা, (৭) নখ কাটা ইত্যাদি সুন্নতে যায়েদা। আর (১) গায়ে তেল মাখা, (২) সুগন্ধি জিনিস ব্যবহার করা, (৩) সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, (৪) সারির মধ্যে যেখানেই স্থান খালি পাওয়া যায় সেখানে বসা মোস্তাহাব। দু' ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে মধ্যখানে বসা মাকরূহ। খোতবা ও ফরজ নামাজের পূর্বে নফল-সুন্নত পড়া সুন্নত। খোতবার সময় চুপ করে বসে থাকা এবং মনোযোগ সহকারে খোতবা শোনা ওয়াজিব।

لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ **দু' ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক না করা** : যথা– পিতা ও পুত্রের মধ্যে অথবা দু' বন্ধুর মাঝে ফাঁক করে বসা। এমনও হতে পারে এতে তাদের মধ্যে অন্তত মানসিক দুঃখও ঘটতে পারে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দ্বারা সকাল সকাল মসজিদে যাওয়াই বুঝানো হয়েছে। যেন পরে এসে মানুষের ঘাড়ের উপর পা দিয়ে সামনে যেতে না হয়। এ পর্যায়ে আলোচ্য অধ্যায়ের শিরোনামে উল্লিখিত শব্দ 'তানযীফ ও তাব্‌কীর' উভয়টির সাথে হাদীসটির সামঞ্জস্য হয়ে যায়।

حُكْمُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ **খোতবার সময় কথা বলার হুকুম :** জুমার দিনে ইমাম যখন খোতবার জন্য মিম্বারে দাঁড়ান এবং খোতবা দেন, তখন কথা বলা এবং নামাজ পড়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে হারাম। সাহেবাইন (আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতেও হারাম; কিন্তু তাঁদের মতে খোতবার পরে তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে কথা বলায় কোনো দোষ নেই, যদি তা নামাজ-সংক্রান্তই হয় এবং পার্থিব কোনো কথা না হয়। পার্থিব কোনো কথা বলা সকলের মতেই মাকরূহ।

খোতবার সময় যে কোনো প্রকার কথাবার্তাই হারাম। যদি তা দীনি কথাবার্তা– যেমন ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে নিষেধ ইত্যাদি জাতীয়ও হয়। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, যদি তুমি তোমার পার্শ্বের নামাজিকে বল 'চুপ করুন' অথচ ইমাম খোতবা পাঠ করছেন এটাও তোমার বেদরকারি কথা হলো। ফতোয়ায়ে শামীতে লিখিত হয়েছে যে, খোতবার সময় কোনো কথা বলা মাকরূহে তাহরীমী। তবে ইমাম যখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا পড়েন তখন দরূদ শরীফ মনে মনে পাঠ করা যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও অধিকাংশ আলেমদের মতে খোতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব। সালাম, কথাবার্তা ও নামাজ পড়া সবকিছুই হারাম। ইমাম শাফেয়ীর মতে চুপ থাকা মোস্তাহাব।

١٣٠٠ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلّٰى مَا قُدِّرَ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ ثُمَّ يُصَلِّىْ مَعَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَفَضْلَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩০০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে] গোসল করে অতঃপর জুমার নামাজের জন্য মসজিদে এবং তার পক্ষে যা সম্ভব নফল নামাজ পড়ে এবং চুপচাপ বসে থাকে, যতক্ষণ না ইমাম খোতবা পড়া শেষ করেন। অতঃপর ইমামের সাথে নামাজ পড়ে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় যা সে এক জুমা হতে অপর জুমার মধ্যবর্তী করেছে; বরং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহও [মাফ করে দেওয়া হয়]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ইমামের খোতবা দেওয়ার সময় উত্তম কাজের আদেশ, তাসবীহ পাঠ, পানাহার এবং কিছু লেখা ইত্যাদি নিষেধ। হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা, সালামের জবাব দেওয়া ইত্যাদি মাকরূহ। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইমাম হতে দূরে বসার দরুন খোতবা শুনতে পায় না, সে মনে মনে জিকির করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক ও আবূ হানীফা (র.) বলেন, নিকটের ও দূরের খোতবা শুনতে পাক বা না পাক, সকলের হুকুম একই প্রকারের। অর্থাৎ চুপ থাকতে হবে।

١٣٠١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَلَهٗ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩০১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি অজু করবে এবং উত্তমরূপে অজু সম্পন্ন করে, অতঃপর জুমার নামাজের জন্য মসজিদে আসে এবং মনযোগের সাথে খোতবা শুনে ও চুপচাপ বসে থাকে তার এই জুমা হতে পরবর্তী জুমার মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়; বরং আরও অতিরিক্ত তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি খোতবার সময় অথবা নামাজের মধ্যে কঙ্কর বালি নাড়াচাড়া করল সেও অযথা কাজ করল। অর্থাৎ চুপ থাকার যে সুফল তা সে পেল না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٠٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يَهْدِيْ بُدْنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يَهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩০২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন জুমার দিন হয়, ফেরেশ্‌তাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ান (এবং) যার পূর্বে যে আসে তা লিপিবদ্ধ করেন। [অর্থাৎ মসজিদে আগমনকারীদের হাজিরা গ্রহণ করেন যারা প্রথমে আসেন তাদের নাম প্রথমে লিপিবদ্ধ করেন [আর যারা পরে আসেন তাদের নাম পরে লিপিবদ্ধ করেন]। যে ব্যক্তি জুমার নামাজে আগেভাগে আসে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে [মক্কা শরীফে] কুরবানির জন্য বুদনা [কুরবানির চিহ্ন দেওয়া উট] প্রেরণ করে। অতঃপর [দ্বিতীয় নম্বরে] যে আসে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তি, যে [মক্কা শরীফে] কুরবানির জন্য গাভী প্রেরণ করে। অতঃপর যে আসে সে যেন একটি দুম্বা, তার পরবর্তী জন একটি মুরগি এবং তারপরে আগমনকারী একটি ডিম প্রেরণ করল। যখন ইমাম খোতবার জন্য বের হন, ফেরেশতাগণ তাদের কাগজসমূহ ভাঁজ করে নেন এবং খোতবা শ্রবণ করতে থাকেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** উক্ত হাদীসে জুমার দিনে মসজিদে গমনকারীদের পর্যায়ক্রমিক মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে আগে মসজিদে যাবে সে বেশি ছওয়াব পাবে তারপর প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে ছওয়াবের অধিকারী হবে। কোন্ সময় হতে আগমনকারীদের পূর্বাপরের হিসাব ধরা হবে সে ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম মালেক (র.) এবং তাঁর অনুসারীদের মতে এ উত্তম সময়ের সূচনা দ্বি-প্রহরের পর হতে শুরু হয়। অর্থাৎ দ্বি-প্রহরের পরপর সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে সে সবচেয়ে বেশি ছওয়াবের অধিকারী হবে। তাঁরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করে বলেন, হাদীসে اَلْمُهَجِّرُ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। 'মুহাজ্জির' ঐ ব্যক্তিকে বলে, যিনি সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর মসজিদে গমন করেন। কেননা দ্বি-প্রহরের পরবর্তী সময়কে 'তাহজীর' বলা হয়। কাজী হোসাইন এবং ইমামুল হারামাইন এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

পক্ষান্তরে জমহুর ওলামার মতে দিবসের প্রথমাংশে ফজর উদয়ের সময় হতে এ উত্তম সময়ের সূচনা হয়। অর্থাৎ জুমার দিনে এই সময় সর্বপ্রথম যে মসজিদে প্রবেশ করবে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ছওয়াবের আধিকারী হবে।

وَعَنْ ١٣٠٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنْصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩০৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমার দিনে যখন ইমাম খোতবা দান করতে থাকেন তখন যদি তুমি তোমার সঙ্গীকে বল 'চুপ কর' তবে তুমি অযথা কথা বললে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَهَمِّيَّةُ سَمَاعِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ **জুমার খোতবা শ্রবণের গুরুত্ব :** ইমাম আবূ হানীফার মতে খুতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব এবং কথা বলা হারাম, যদিও তা উত্তম কথা হোক না কেন? এমনকি সংক্ষেপে 'চুপ কর' এটুকু কথা বলাও গুনাহ। আল্লামা তাবারানী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ বলেছেন, ইমাম মিম্বারে বসার পর যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসে সে যেন কোনো নামাজ না পড়ে এবং কোনো কথা না বলে যতক্ষণ না ইমাম খুতবা দান সমাপ্ত করেন। মুয়াত্তা ইমাম মালেকেও এরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে।

ইমামের খুতবা দান কালে 'কাজা নামাজ' ব্যতীত সুন্নত নফল পড়াও জায়েজ নেই। অবশ্য খোতবা আরম্ভ করার পূর্বে সুন্নত-নফলের নিয়ত করে থাকলে তখন রাকাতের জোড় পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।

وَعَنْ ١٣٠٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ اِلٰى مَقْعَدِهٖ فَيَقْعُدُ فِيْهِ وَلٰكِنْ يَقُوْلُ اِفْسَحُوْا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩০৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জুমার দিনে তোমাদের কেউ যেন তাঁর কোনো মুসলমান ভাইকে নিজ স্থান হতে উঠিয়ে না দেয়, অতঃপর তার স্থলে গিয়ে নিজে বসে; বরং সে যেন [ভদ্রভাবে] বলে, একটু সরে বসুন। –[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٠٥ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهٖ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهٗ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلّٰى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهٗ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ صَلٰوتِهٖ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهٖ اِلٰى قَبْلِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৩০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমার দিনে গোসল করে, ভালো পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধি লাগায়, যদি তার নিকট সুগন্ধি দ্রব্য থাকে, অতঃপর মসজিদে জুমার নামাজে আসে। আর [সম্মুখে যাওয়ার জন্য] মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে না টপকায়, অতঃপর তাকে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দেন নফল নামাজ পড়ে, অতঃপর ইমাম খোতবার জন্য বের হলে চুপচাপ বসে থাকে [এবং খোতবা শুনে] যতক্ষণ না ইমাম [খোতবা দান শেষে] নামাজ সম্পন্ন করেন, তবে এটা তার এই জুমা পূর্ববর্তী জুমার মধ্যবর্তী পাপসমূহের জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٣٠٦ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَ دَنٰى مِنَ الْاِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩০৬. **অনুবাদ :** হযরত আওস ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি জুমার দিনে [নিজ স্ত্রীকে সঙ্গমান্তে] গোসল করা এবং নিজেও গোসল করে তারপর তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয় এবং আগেভাগে মসজিদে যায় এবং কোনো কিছুতে আরোহণ না করে পদব্রজে গমন করে এবং ইমামের কাছাকাছি বসে, ইমামের খোতবা [মনোযোগের সাথে] শ্রবণ করে এবং কোনো অযথা কাজ করে না, সে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসর দিনের রোজা ও রাতের [নফল] নামাজের ছওয়াব পাবে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ **-এর মর্মার্থ :** আলোচ্য হাদীসে গাস্‌সালা (غَسَّلَ) **শব্দটি** এসেছে। এটা তাশ্‌দীদ ও **তাখফীফ উভয়** অবস্থাতে ইমামগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। সংক্ষেপে তা নিম্নে বর্ণিত হলো–

ইমাম তূরেপেশ্তী (র.) বলেন যে, অধিকাংশ হাদীসবিদই তাশ্দীদসহ 'গাস্সালা' বলে উল্লেখ করেছেন। তাশ্দীদ অবস্থায় কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেন—

(১) উত্তমরূপে গোসল করার তাকিদের জন্য শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (২) কারো মতে এর অর্থ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা। প্রকৃত বাক্যটি হবে غَسَّلَ اِمْرَأَتَهٗ 'নিজ স্ত্রীকে গোসল করাল' অর্থাৎ সহবাসের মাধ্যমে গোসল করতে বাধ্য করল। কারণ জুমার দিনে বহু নর-নারীর সাথে মিলিত হতে হয়, এমতাবস্থায় নিজের দৃষ্টি সংযত করার উদ্দেশ্যে এবং মনকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে পূর্বেই নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা প্রয়োজন। (৩) অথবা এর অর্থ প্রথমে সহবাসের কারণে গোসল করা, অতঃপর জুমার নামাজের জন্য দ্বিতীয়বার গোসল করা।

আরেক দল তাখফীফ করে 'গাসালা' ব্যবহার করেছেন। ইমাম নববী (র.) বলেন, এটাই হাদীসবিশারদদের মতে বেশি শুদ্ধ। তাখফীফের অবস্থায়ও এর একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে– (১) শব্দটিকে দু'বার ব্যবহার করে গোসলের প্রতি তাকিদ বুঝানো হয়েছে। (২) অথবা অর্থ হবে "মাথা ধুইবে এবং জুমার জন্য গোসল করবে"। কেননা আবূ দাউদের অন্য বর্ণনায় এ অর্থের সমর্থন রয়েছে। তাতে মাথা ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। সবকিছুর পূর্বে মাথা ধোয়ার কথা এ জন্য বলা হয়েছে যে, আরবগণ সাধারণত মাথায় তেল ও খেতমী ইত্যাদি লাগাত। অনেক কিছুতে উৎকট গন্ধ থাকত, অথবা মাথায় ব্যবহারের কোনো কোনো দ্রব্য শরিয়ত নিষিদ্ধ নানাবিধ দ্রব্য কিংবা হারাম প্রাণীর চর্বি হতেও প্রস্তুত হতো। এ জন্য প্রথমে মাথা ধোয়া প্রয়োজন ছিল। (৩) কারো মতে প্রথমে অঙ্গ ধোয়া অতঃপর গোসল করা। (৪) আল্লামা ইরাকী বলেন, প্রথমত কাপড়-চোপড় ধোয়া অতঃপর নিজের শরীর ধোওয়া। (৫) অথবা নামাজে বের হওয়ার পূর্বে নিজ স্ত্রীর সাথে দৈহিক মেলা-মেশা করে তাকে গোসল করাবে। এতে অনভিপ্রেত দৃষ্টি হতে নিজেকে সংযত করা যায়।

وَعَنْ ١٣٠٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَجَدَ اَنْ يَّتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَىْ مِهْنَتِهٖ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ)

১৩০৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো উপরে কোনো দোষ বর্তাবে না, যদি সে নিজের কাজের কাপড় ব্যতীত সামর্থ্য থাকলে আরও দুটি পৃথক কাপড় জুমার নামাজের জন্য বানিয়ে নেয়। –[ইবনে মাজাহ্। কিন্তু ইমাম মালেক এটা [তাবেয়ী] ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** সামর্থ্য থাকলে ইবাদতের জন্য অতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করাকে ইসরাফ বা অপচয় মনে করা ঠিক হবে না। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়েই রাসূলে করীম ﷺ ইঙ্গিত করেছেন।

وَعَنْ ١٣٠٨ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الْاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتّٰى يُؤَخَّرَ فِى الْجَنَّةِ وَاِنْ دَخَلَهَا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৩০৮. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রথম হতেই খোতবায় উপস্থিত থাকবে এবং ইমামের কাছাকাছি গিয়ে বসবে। কেননা, মানুষ বরাবরই উত্তম বাক্য হতে দূরে সরতে থাকে, ফলে তাকে জান্নাত দানেও বিলম্ব করা হয়। যদিও সে পরে জান্নাতে প্রবেশ করে বটে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ উত্তম কাজ প্রতিযোগিতামূলক আগে-ভাগে করতে থাক। এ হাদীসও এর সমর্থন করে, অর্থাৎ নেকী অর্জনে বিলম্ব করা উচিত নয়। বিশেষ করে জুমআর দিন। কেননা যতই আগে-ভাগে যাবে, ততই অধিক ছওয়াব অর্জন করবে। এ হাদীস হতে এটাও বুঝা যায় যে, খোতবা পূর্ণভাবে না শুনতে পারলেও তার জুমা পড়া আদায় হয়ে যায় এবং এমন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে বটে, তবে অনেক পরে।

وَعَنْ ١٣٠٩ - مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِتَّخَذَ جِسْرًا اِلٰى جَهَنَّمَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৩০৯. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে আনাস আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা হযরত আনাস (রা.) বলেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জুমার দিনে যে ব্যক্তি মানুষের কাঁধে পা রেখে সামনে যায় [হাশরের দিন] তাকে জাহান্নামে যাওয়ার পুল বানানো হবে। –[তিরমিযী। তবে তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসে বর্ণিত اِتَّخَذَ শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায় এবং তখন অর্থও ভিন্ন হবে। প্রথমত اِتَّخَذَ-কে মারূফ বা কর্তৃবাচ্য হিসাবে। এ অবস্থায় হাদীসাংশের অর্থ হবে, জুমার দিনে কোনো ব্যক্তির মানুষের কাঁধ টপকিয়ে সামনে যাওয়া– এ গর্হিত কাজটিই তাকে জাহান্নামে পৌঁছাবে। কেননা এ কাজে রয়েছে মানুষকে কষ্ট প্রদান এবং তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা। অর্থাৎ, এই ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য এ গর্হিত কাজটিকে পুলস্বরূপা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত اِتَّخَذَ মাজহুল বা কর্মবাচ্য হিসাবে পড়া যেতে পারে। তখন এর অর্থ হবে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন পুল বানানো হবে, যে পুল পার হয়ে জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যেমনিভাবে সে ব্যক্তি জুমার দিন মুসল্লিদের কাঁধ টপকিয়ে সম্মুখের কাতারে গমন করত।

وَعَنْ ١٣١٠ - مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৩১০. অনুবাদ : হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– জুমার দিন ইমাম যখন খোতবা দিতে থাকেন, তখন 'হাব্ওয়া' বৈঠকে বসতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** দুই হাঁটু উপরের দিকে খাড়া করে পেট ও বুকের সাথে মিলিয়ে নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে দু' হাত দ্বারা নালা জড়িয়ে বসাকে 'হাবওয়া' বসা বলে। জুমার দিন মসজিদে এরূপ বসাকে নিষেধ করা হলেও অন্য সময়ের জন্য নিষেধ নয়। কেননা হুজুর ﷺ বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মুখে এভাবে বসেছেন বলে অন্য হাদীসে প্রমাণ আছে। অতএব এখানে নিষেধ অর্থ মাকরূহে তান্যীহী অর্থাৎ, উত্তমতার খেলাফ, হারাম নয়। বস্তুত এটা মসজিদের শিষ্টাচারিতার বিপরীত।

وَعَنْ ١٣١١ - ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৩১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো জুমার দিন মসজিদে তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন নিজ বসার স্থান পরিবর্তন করে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** বস্তুত তন্দ্রা দ্বারা অজু নষ্ট হয় না, কিন্তু তন্দ্রা দূর করার জন্য স্থান পরিবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। আর অন্য স্থানে খালি জায়গা না পেলে যে কোনো উপায়ে তন্দ্রা দূর করার জন্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣١٢ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهٖ وَيَجْلِسَ فِيْهِ قِيْلَ لِنَافِعٍ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ فِى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩১২. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে বসা হতে উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে নিজে বসতে নিষেধ করেছেন। হযরত নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু জুমার দিনের জন্যই? জবাবে তিনি বললেন, জুমা বা বে-জুমা সব দিনের জন্যই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নামাজের সারিতে বসা অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে নিজে বসা অত্যন্ত বিবেক বর্জিত কাজ; এটা শরিয়ত সমর্থন করে না। এমনকি অন্য কোনো বৈঠক হতেও উঠিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়।

وَعَنْ ١٣١٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَذٰلِكَ حَظُّهٗ مِنْهَا وَ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهٗ وَ رَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَهِىَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا وَ زِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৩১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– জুমার নামাজে সাধারণত তিন প্রকারের লোক উপস্থিত হয়ে থাকে। এক প্রকারের লোক অনর্থক কাজ সহকারে উপস্থিত হয় [অর্থাৎ খোতবার সময় সে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে ও অযথা কাজ করে।] জুমা হতে সে তাই লাভ করে [অর্থাৎ তার জুমায় উপস্থিতি বৃথা যায়]। আর এক প্রকারের লোক আছে, যে দোয়া সহকারে উপস্থিত হয়। সে আল্লাহর নিকট কোনো অভিপ্রেত বস্তু প্রার্থনা করে, আল্লাহ চাইলে তাকে তা দান করেন, আর না চইলে বঞ্চিত রাখেন। আর এক প্রকারের লোক আছে, যে উপস্থিত হয় সন্তর্পণে নীরবতার সাথে [শুধু জুমার নামাজের উদ্দেশ্যে] এবং সম্মুখে যাওয়ার জন্য কোনো মুসলমানের ঘাড় টপকায় না, আর কাউকেও কোনো প্রকার কষ্ট দেয় না। তার এ কাজ তার এ জুমা হতে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত সময়ের সকল [সগীরা] গুনাহের কাফফারা হয় এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের জন্য। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করে, তার জন্য তার দশগুণ বিনিময় রয়েছে'। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٣١٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا وَ الَّذِىْ يَقُوْلُ لَهٗ اَنْصِتْ لَيْسَ لَهٗ جُمُعَةٌ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

১৩১৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে মসজিদে কথাবার্তা বলে, অথচ ইমাম খোতবা দান করছেন। সে ব্যক্তি গাধার মতো, যে শুধু বোঝা বহন করে [অথচ তা হতে উপকৃত হয় না] এবং যে লোক তাকে বলে 'চুপ করুন', তার জন্যও জুমা নেই [অর্থাৎ তারও জুমা হয়নি, অথবা জুমার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ সে নিজেও চুপ থাকল না]। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি জুমার দিনে মনোযোগ সহকারে ইমামের খোতবা শ্রবণ হতে বিরত থাকে, আলোচ্য হাদীসে তাকে সেই গাধার সাথে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে, যে গাধা শুধুমাত্র নিজ পৃষ্ঠদেশে কিতাবের বোঝাই বহন করে চলছে। গাধা যেমন তার পিঠে বহনকৃত বোঝা সম্পর্কে বেমালুম, তদ্রূপভাবে সে ব্যক্তির জুমার নামাজ অন্তঃসারশূন্য যে.ইমামের খোতবার সময় অহেতুক কথাবার্তা বলে তা শ্রবণ হতে নিজেকে বিরত রেখেছে। গাধার ন্যায় ঐ নামাজ তার বোঝাস্বরূপই হবে। এটা 'আমলহীন ইলমের' সাথেও তুলনীয়।

١٣١٥ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبٌ فَلَا يَضُرُّهُ اَنْ يَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُتَّصِلًا) .

১৩১৫. অনবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওবায়েদ ইবনে সাব্বাক (র.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক জুমার দিনে বলেছেন– হে মুসলিম সম্প্রদায়! এটা এমন একটি দিন, একে আল্লাহ তা'আলা [মুসলমানদের জন্য] খুশির দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা এ দিনে গোসল কর, যার সুগন্ধি আছে সে তা ব্যবহার করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না [অর্থাৎ সুগন্ধি ব্যবহার কর] এবং মেস্ওয়াক করাকে আবশ্যক মনে কর।–[মালেক আর ইবনে মাজাহ্। উবায়দ ইবনে সাব্বাকের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মুত্তাসিল রূপে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমার দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। কেননা, মানুষ বছরে যে রকম দু' দিনে একত্র হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করে এবং পরস্পরের মধ্যে কুশলাদি ও ভাব বিনিময় করে তেমনি সপ্তাহে একবার জুমার দিনেও মানুষ একত্র হয়ে জুমার নামাজ আদায় করে এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে, এ জন্য একে ঈদ বা আনন্দের দিন বলা হয়েছে।

١٣١٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يَغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلْيَمَسَّ اَحَدُهُمْ مِنْ طِيْبِ اَهْلِهِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ)

১৩১৬. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মুসলমানদের উপর কর্তব্য যে তারা জুমার দিন গোসল করবে এবং নিজ পরিবারে যদি সুগন্ধি থাকে তবে প্রত্যেকে সুগন্ধি লাগাবে, আর যদি তা [সুগন্ধি] না পায়, তবে [গোসলের] পানিই তার জন্য সুগন্ধি। –[আহমদ ও তিরমিযী।] আর তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জুমার দিন গোসল করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত, সুগন্ধি ব্যবহার করতে যারা সক্ষম শুধু তাদের জন্যই তা সুন্নত; কিন্তু যারা তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়; তাদের জন্য গোসলই সুন্নত।

بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلٰوةِ

পরিচ্ছেদ : খোতবা ও নামাজ

خُطْبَةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো خُطُبَاتٌ শাব্দিক অর্থ হলো– বক্তৃতা বা ভাষণ। শরিয়তের পরিভাষায় খোতবা হলো এমন বক্তৃতা যাতে আল্লাহর প্রশংসা, গুণ-কীর্তন, তাওহীদের ঘোষণা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরুদ এবং উপস্থিত মুসল্লিদের প্রতি কুরআন ও হাদীসের আলোকে নসিহত ও মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক কল্যাণের প্রার্থনা বিদ্যমান থাকে।

জুমার নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খোতবা পূর্বশর্ত। খোতবা ব্যতীত জুমার নামাজ আদায় হবে না। জুমার জন্য পরপর দু'টি খোতবা দিতে হবে, উভয় খোতবার মাঝখানে কিছু সময় বসা সুন্নত। ইমাম সাহেব মিম্বারে বা উঁচু কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে শ্রোতাবৃন্দের দিকে মুখ করে খোতবা প্রদান করবেন। অবশ্য লাঠি বা কিছুর উপর ভর করে দাঁড়ানোও প্রমাণিত।

খোতবা আরবি ভাষায় প্রদান করা সুন্নত। নিজ মাতৃভাষায় খোতবা প্রদান করা শুদ্ধ নয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মিশরের কিবতীভাষী এবং ইরানের ফারসীভাষীদের মধ্যে আরবিতেই খোতবা প্রদান করা হতো। সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছে। সুতরাং খুতবা আরবিতে হওয়াই উচিত। কেননা, ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম। বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠন করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে এক কেন্দ্রিক রাখা ইসলামের কাম্য। এজন্য ভাষার ন্যায় একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় বন্ধন আবশ্যক। এ ছাড়া ইসলাম পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধী। ইসলাম চায় মুসলমানরা ইসলামকে তার মূল উৎস কুরআন ও হাদীস থেকে সরাসরিভাবে গ্রহণ করুক। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আরবি জানা একান্ত আবশ্যক। আর কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সোনালী যুগে আরবে যে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠেছিল তা সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারিত হওয়া ইসলামের উদ্দেশ্য। আর এটা একমাত্র আরবির মাধ্যমেই সম্ভব। মোটকথা, প্রত্যেক মুসলমানই আরবি জানুক, তা ইসলামের কাম্য। এতেই তাদের জাতীয় ও ব্যক্তিগত কল্যাণ নিহিত। সত্য তথা এই যে, আরবি খোতবা, মুসলমানদের আরবি নাম এবং মুসলমানদের আরবি অভিবাদন তথা সালাম-একয়টি বিষয় সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পারস্পরিক ঘনিষ্টতা সৃষ্টি করেছে।

তবুও খতীবের উচিত তিনি যেন মুসল্লিদের বোধগম্যের জন্য খোতবা দানের পূর্বে বা পরে এমনকি খোতবার মধ্যে হলেও খোতবার উপদেশমূলক অংশটি উপস্থিত মুসল্লিদের মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣١٧ - عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩১৭. অনুবাদ : হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ জুমার নামাজ পড়তেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ **জুমার নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে মতভেদ :** জুমার নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ اَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ : ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আতা (র.)-এর মতে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বেই জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করেন–

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سِيْدَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ (رض) فَكَانَ خُطْبَتُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ . وَ ذَكَرَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ نَحْوَهُ . (رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِىْ)

(٢) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْئٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ)

(٤) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللّٰهُ عِيْدًا لِلْمُسْلِمِيْنَ .

এ হাদীসে জুমার দিনকে ঈদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব ঈদের নামাজ যেহেতু দ্বিপ্রহরের পূর্বে আদায় করতে হয় এ হিসেবে জুমার নামাজও দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়া জায়েজ হবে।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَمَالِكٍ (رحـ) وَالشَّافِعِيِّ (رحـ) وَغَيْرِهِمْ : ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), ইমাম শাফেয়ী (র.) এমনকি বিখ্যাত সাহাবী ও তাবেয়ীদের মতে জুমার নামাজ দ্বি-প্রহরের পূর্বে পড়া জায়েজ নয়। নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ তাঁরা দলিল হিসাবে পেশ করেন–

(١) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ)

(٢) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٣) رَوَى ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ مِنْ طَرِيْقِ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ (رضـ) وَعُمَرَ (رضـ) حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ . (اِسْنَادُهُ قَوِيٌّ)

(٤) وَاَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ الْوَلِيْدِ قَالَ مَا رَاَيْتُ اِمَامًا كَانَ اَحْسَنَ صَلٰوةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ (رضـ) فَكَانَ يُصَلِّيْهَا اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ . (اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ)

অপর পক্ষের দলিলের উত্তর : আহমদ (র.) ও ইসহাক (র.) দারাকুতনীতে বর্ণিত যে হাদীসটি প্রথম দলিল হিসাবে নিয়েছেন এর উত্তরে বলা হয়েছে, হাদীসটির রাবী আবদুল্লাহ ইবনে সীদান দুর্বল রাবী ছিলেন, আদালত বা ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কাজেই এ ধরনের রাবীর হাদীস দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় দলিলের উত্তর : দ্বিতীয় দলিলে জুমার নামাজের পরে খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রামের কথা বলা হয়েছে [উল্লেখ্য খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রাম সম্ভবত দ্বি-প্রহরের পূর্বেই হয়ে থাকে। এ হিসাবে নামাজও দ্বি-প্রহরের পূর্বে হবে।] এর জবাবে বলা যায়, এ ধরনের হাদীস দ্বারা জুমার নামাজ বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি আদায় করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ দ্বি-প্রহরের পরপরই নামাজ পড়ে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। এর ইঙ্গিত বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন– كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ অর্থাৎ, আমরা তাড়াতাড়ি জুমআর নামাজ পড়তাম এবং জুমার পরে বিশ্রাম করতাম। মূলত এর দ্বারা দ্বি-প্রহরের পূর্বে জুমার নামাজ পড়া সাব্যস্ত হয় না।

তৃতীয় দলিলের উত্তর : তৃতীয় দলিলে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) বর্ণিত لَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْئٌ ... হাদীসটি এনেছেন। এর উত্তরে ইমাম নববী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ জুমার নামাজ ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই পড়তেন। আর মদীনার দেয়াল খাটো ছিল বিধায় এর ছায়া বিকশিত হতো না; কিন্তু এ কথা ঠিক নয় যে, দ্বি-প্রহরের পূর্বে নামাজ পড়ার কারণে দেয়ালের ছায়া দৃষ্টিগোচর হতো না।

চতুর্থ দলিলের উত্তর : চতুর্থ দলিলের উত্তর হলো, জুমার দিনকে ইদের দিন হিসাবে আখ্যায়িত করায় এটা অপরিহার্য নয় যে, ঈদের সমস্ত আহকাম জুমার নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ঈদের দিনে রোজা রাখা হারাম; কিন্তু জুমার দিনে রোজা রাখা হারাম নয়।

١٣١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدَّى اِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩১৮. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [জুমার দিন] আমরা কাইলুলা [খাওয়া-দাওয়ার পরে সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম] এবং দুপুর পূর্ব খাবার জুমার পরেই সম্পন্ন করতাম।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আল্লামা তীবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীস দ্বারা সকাল সকাল করা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম জুমার দিন জুমার নামাজ আদায় ব্যতীত খাদ্য ভক্ষণ ও বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না, এমনকি অন্য কোনো কাজকেও গুরুত্ব দিতেন না। এ সব কাজ তারা জুমার নামাজের পরে করতেন।

উল্লেখ্য যে, তখনকার আরবের লোকেরা পুরা দিনে ও রাতে মোট দুবেলা খাবার খেত। দুপুরের পূর্বে আনুমানিক ১০ টা/ ১১ টার সময় একবার এবং বিকালে আসরের পরে বা মাগরিবের পরে আর একবার। সকালের খাবাকে غَدَاء এবং বিকালের বা সন্ধ্যার খাবারকে عَشَاء বলা হতো। সাহাবায়ে কেরাম জুমার নামাজের প্রস্তুতি এবং যত্ন ও গুরত্ব রক্ষার খাতিরে জুমার দিন দুপুর পূর্ব খাবারের আয়োজন ও গ্রহণের পেছনে লিপ্ত না হয়ে জুমার নামাজের পড়ে তা সমাধা করতেন। এটাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ١٣١٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِى الْجُمُعَةَ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩১৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন শীতের প্রকোপ বাড়ত, নবী করীম ﷺ জুমার নামাজ আগেভাগে পড়তেন, আর যখন গরমের প্রকোপ বাড়ত, তখন নামাজ ঠাণ্ডা সময়ে পড়তেন অর্থাৎ কিছুটা বিলম্ব করে পড়তেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ শীত মৌসুমে জুমার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়তেন এবং গরমের সময় কিছুটা বিলম্ব করে পড়তেন। এর কারণ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ বলেন, সাহাবায়ে কেরাম অনেক দূর-দূরান্ত হতে জুমার নামাজে আসতেন। শীত মৌসুমে দিন ছোট বিধায় বিলম্বে নামাজ পড়লে তাদের নিজ নিজ গৃহে পৌছতে অনেকের রাত হয়ে যেত। তাই রাসূল ﷺ শীতের সময় জুমার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়তেন। পক্ষান্তরে গরমের মৌসুমে জুমার নামাজ দেরি করে পড়ার কারণ রাসূল ﷺ-এর অন্য হাদীসে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ অর্থাৎ যখন গরমের উত্তাপ বাড়ে তখন তোমরা নামাজকে শীতল করো। কেননা, গরমের আধিক্য জাহান্নামের উত্তাপ হতে আসে।

وَعَنْ ١٣٢٠ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ (رض) قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩২০. অনুবাদ : হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) -এর যুগে জুমার দিনে প্রথম আযান তখনই দেওয়া হতো যখন ইমাম খোতবা দানের জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন। আর যখন হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতের যুগ এলো এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি যাওরার উপর তৃতীয় আযান দেওয়া বৃদ্ধি করলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سَبَبُ الْأَذَانِ الثَّالِثِ **তৃতীয় আযান দেওয়ার কারণ :** মহানবী ﷺ ও প্রথম দু' খলিফার আমলে ইমাম যখন খোতবা পাঠ দানের জন্য মিম্বারে উঠে বসতেন তখনই প্রথম আযান দেওয়া হতো এবং খোতবা সমাপ্তির পর নামাজের জন্য একামত বলা হতো। বর্ণনাকারী উক্ত একামতকে দ্বিতীয় আযান বুঝাতে চেয়েছেন। তখন সংখ্যায় মুসলমান ছিলেন কম, আগেভাগেই

লোকেরা মসজিদে উপস্থিত হয়ে যেত। এ জন্য খোতবার সংলগ্ন আযান ছাড়া আরও আগে আযান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, যা আমাদের এই যুগে বাইরে কোনো মিনারা হতে দেওয়া হয়। পরে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং লোকেরা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকল তখন খোতবার সময়কার আযান নগরীর আনাচে-কানাচে পৌঁছত না। আর যদিও পৌঁছত বিভিন্ন স্থান হতে তাড়াহুড়া করে এসেও খোতবার প্রথম হতে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। এ উদ্দেশ্যে খোতবা দানের কিছুক্ষণ পূর্বে [অন্তত আধা ঘণ্টা পূর্বে] মসজিদের বাইরে যাওরা নামক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে এক আযান দেওয়ার জন্য হযরত উসমান (রা.) আদেশ করলেন। সময়ের হিসাবে এ আযানটিই প্রথম আযান। কেননা এরপর খোতবার সংলগ্ন ইমামের সম্মুখের আযান হলো দ্বিতীয় আযান এবং তৃতীয়টি হলো 'একামত'। শেষোক্ত দু'টি হুজুর ﷺ-এর জমানা হতে চলে এসেছে এবং প্রথমটি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-ই নতুন করে চালু করেছেন, এ হিসাবে একে তৃতীয় আযান বলা হয়েছে। যদিও বাস্তবে এটা প্রথম আযান হয়েছে। তাঁর পরে চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-ও এর মধ্যে কোনো রদ-বদল করেননি। এক কথায় খোলাফায়ে রাশেদার যুগ হতে অদ্যাবধি নির্দ্বিধায় এটা পালিত হয়ে আসছে এ হিসেবে এই আযানকে 'সুন্নতে খোলাফায়ে রাশেদীন' বলা হয়।

اَلزَّوْرَاءُ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَلزَّوْرَاءُ হলো মদীনা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি উচ্চ স্থান অথবা ঐ স্থানটির নামই হলো 'যাওরা' যা মসজিদে নবীর সম্মুখে অবস্থিত।

১৩২১. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ فَكَانَتْ صَلٰوتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ [জুমার দিন] দু' খোতবা দান করতেন এবং উভয় খোতবার মধ্যখানে একবার বসতেন। তিনি খোতবায় কুরআন শরীফ [হতে কিছু অংশ পাঠ করতেন এবং লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। তাঁর নামাজ হতো মধ্যম ধরনের এবং খোতবাও হতো মধ্যম ধরনের। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার নামাজের জন্য খোতবা কি শর্ত? 'হেদায়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, জুমার নামাজের জন্য খোতবা প্রদান করা শর্ত। কেননা রাসূল ﷺ জীবনে কখনো খোতবা প্রদান ব্যতীত জুমার নামাজ পড়েননি। অবশ্য 'নেহায়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে খোতবা হলো জুমার নামাজের জন্য রোকন। গ্রন্থকারের যুক্তি হলো খোতবা জোহরের দু' রাকাত নামাজের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ জুমা হলো জোহরের চার রাকাতের দু' রাকাতের পরিবর্তে, আর খোতবা হলো বাকি দু' রাকাতের পরিবর্তে। অতএব এটা জুমার নামাজের জন্য রোকনই হবে। উল্লেখ্য নামাজের ভিতরগত অপরিহার্য কার্যাবলিকে রোকন এবং বাইরের অপরিহার্য কার্যাবলিকে শর্ত বলে।

'নেহায়া' গ্রন্থকারের অভিমতের উত্তর : 'নেহায়া' গ্রন্থকারের অভিমতের উত্তরে বলা যেতে পারে, খোতবা জুমার নামাজের জন্য 'রোকন' নয়। কেননা رُكْنُ الشَّيْءِ دَاخِلُ الشَّيْءِ অর্থাৎ 'রোকন' হলো কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ অপরিহার্য কাজ, যার উপর বস্তুটি নির্ভরশীল। বস্তুত খোতবা জুমার আভ্যন্তরীণ অপরিহার্য কোনো কাজ নয়। সুতরাং খোতবা শর্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ এখানে ذِكْر দ্বারা 'খোতবা'-কে বুঝানো হয়েছে। আর এটা নামাজের পূর্বে প্রদান করা হয়ে থাকে। কাজেই খোতবা জুমার জন্য রোকন না হয়ে শর্ত হবে।

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ وُجُوْبِ الْخُطْبَتَيْنِ দু'টি খোতবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ : জুমার নামাজের জন্য দু'টি খোতবা প্রদান করা ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, দু'টি খোতবাই ওয়াজিব। তাঁর যুক্তি হলো রাসূল ﷺ আজীবন জুমার নামাজে দুই খোতবাই প্রদান করতেন। অতএব এটা আমাদের জন্যও ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ অর্থাৎ, তোমরা নামাজ পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ।

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَاِسْحَاقَ وَ الْاَوْزَاعِىِّ وَ غَيْرِهِمْ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইসহাক, আওযায়ী, আবূ সওর ও ইবনুল মুনযির (র.) প্রমুখের অভিমত হলো জুমার নামাজের জন্য শুধুমাত্র একটি খোতবা প্রদান করা ওয়াজিব। এটাই অধিক সংখ্যক আলেমের অভিমত। এর অনুকূলে ইমাম আহমদেরও একটি অভিমত রয়েছে। তাঁদের যুক্তি হলো, খোতবার উদ্দেশ্য হলো উপদেশাবলি প্রদান করা, যা একটিমাত্র খোতবা দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে, দ্বিতীয় খোতবাটি উপসংহার মাত্র। এর অপরিহার্যতা প্রথম খোতবার অনুরূপ নয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তির জবাবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ -এর শুধু فِعْل বা কর্ম দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। কাজেই উক্ত দলিল দ্বারা দু'টি খোতবাকে ওয়াজিব প্রমাণিত করা যথার্থ নয়।

দুই খোতবার মধ্যে উপবেশন সম্পর্কে মতভেদ : আইনী, ফতহুল মুলহিম ও বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে রয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম ইয়াহ্ইয়া (র.)-এর মতে দু' খোতবার মধ্যে কিছুক্ষণ বসা ওয়াজিব। রাসূল ﷺ সব সময় দু' খোতবার মাঝখানে বসতেন, এটাই তাঁদের দলিল। এ ছাড়াও তিনি রাসূল ﷺ-এর উক্তি صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম মালেক (র.), এমনকি জমহুর আলিমদের মতে দু' খোতবার মাঝে বসা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নত। তাঁদের যুক্তি হলো এ বসাবস্থায় কিছু আলোচনা করা শরিয়তে নির্ধারিত নেই। অতএব তা ওয়াজিব হতে পারে না। এ ছাড়া তাঁরা তাবেয়ী আবূ ইসহাকের একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন। তিনি বলেন–

رَاَيْتُ عَلِيًّا (رضـ) يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى فَرَغَ

তাঁদের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের উত্তরে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর فعل বা কর্ম ওয়াজিব সাব্যস্ত করে না। তা ছাড়া তিনি صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ হাদীস নিয়েছেন; এর উত্তরে বলা যায়, খোতবার বিষয়টি আলোচ্য হাদীসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلْاِخْتِلَافُ فِى الْقِيَامِ لِلْخُطْبَةِ **দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ ঃ** দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

مَذْهَبُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করা ওয়াজিব। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন–

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا.

(٢) عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ قَائِمًا وَاَبُوْبَكْرٍ (رضـ) وَعُمَرُ (رضـ) وَعُثْمَانُ (رضـ) وَاَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ (رضـ) وَفِىْ رِوَايَةِ الشَّعْبِىِّ جَلَسَ مُعَاوِيَةُ (رضـ) لَمَّا كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ وَلَحْمُهُ.

(٣) رَوَى الْاِمَامُ مُسْلِمٌ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عَجْرَةَ دَخَلَ فِى الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا –

مَذْهَبُ الْاِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করা সুন্নত। তাঁর দলিল হলো–

رُوِىَ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا حِيْنَ كَبُرَ وَ اَسَنَّ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

কিন্তু যেহেতু দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই এটা সুন্নত।

ইমাম শাফেয়ীর দলিলের জবাবে বলা যায় যে, শুধুমাত্র فِعْل দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য দলিল দ্বারা ও ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না, বরং সুন্নত সাব্যস্ত হয়।

وَعَنْ ١٣٢٢ عَمَّارٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ طُوْلَ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَاَطِيْلُوا الصَّلٰوةَ وَاَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَاِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২২. অনুবাদ : হযরত আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– কোনো ব্যক্তির নামাজ দীর্ঘ করে পড়া এবং তার খোতবা সংক্ষেপ করা তার শরিয়ত সম্পর্কে সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার পরিচায়ক। সুতরাং তোমরা নামাজকে দীর্ঘ করো এবং খোতবা সংক্ষিপ্ত করো। নিশ্চয় কোনো কোনো বক্তৃতা জাদু স্বরূপ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নামাজকে দীর্ঘ করার অর্থ খোতবা হতে কিছুটা দীর্ঘ, প্রকৃত দীর্ঘ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই মধ্যমভাবে নামাজ পড়তেন। বক্তৃতা জাদুস্বরূপ মানে বক্তৃতা জাদুর মতো কাজ করে। সুতরাং খোতবা সংক্ষেপে এবং জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ কথায় দেবে।

وَعَنْ ١٣٢٣ - جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى - (رواه مسلم)

১৩২৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা দান করতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ চরমে পৌছত। যেন তিনি নিজ সৈন্যদেরকে শত্রুর আক্রমণ হতে এরূপ সতর্ককারী, যে বলে, এই ভোরেই তোমাদের উপর [শত্রুদল] আক্রমণ করবে, এই সন্ধ্যায়ই তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তিনি আর তিনি বলতেন, আমি কেয়ামতের অতি নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হয়েছি, যেমন এ দু'টি অঙ্গুলি রয়েছে। এ সময় তিনি নিজ তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্র করে দেখাতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ-**এর ব্যাখ্যা :** তার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়ে যেত ইত্যাদি, অর্থাৎ, তিনি অতিগুরুত্ব সহকারে লোকদের সম্বোধন করতেন এবং খোতবা দান করতেন। আজকাল যেমন কোনো কোনো ইমাম সূর করে খেতবা পাঠ করেন তার খোতবা সেরূপ হতো না।

وَعَنْ ١٣٢٤ - يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩২৪. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে মিম্বারে উঠে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি যে, জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামের প্রহরী মালিককে ডেকে বলবে, হে মালিক! তুমি তোমার প্রভুকে বল, যেন তিনি আমাদের মৃত্যু প্রদান করেন [নবী করীম ﷺ এভাবে জাহান্নামের ভয়াবহতা বর্ণনা করতেন]। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٢٥ - اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (رض) قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ اِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে হিশাম বিন্‌তে হারেসা ইবনে নো'মান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরায়ে 'ক্বাফ' ওয়াল কুরআনিল মাজীদ কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেই মুখস্থ করেছি। তিনি এ সূরাটি প্রত্যেক জুমায় মিম্বারে উঠে জনতার উদ্দেশ্যে খোতবা দান কালে পাঠ করতেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এখানে সূরা ক্বাফ দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে সূরার প্রথমাংশ। কেননা রাসূল ﷺ একই জুমার খোতবায় পুরা সূরা পাঠ করতেন না, অথবা বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন অংশ পাঠ করতেন, অথবা উম্মে হিশাম যে কয় জুমায় উপস্থিত ছিলেন সে কয় জুমায় রাসূল ﷺ সূরা ক্বাফ দ্বারা খোতবা প্রদান করেছেন, এটাই তিনি বর্ণনা করেছেন।

১৩২৬ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জুমার দিন খোতবা দান করতেন তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি থাকত। তার [পাগড়ির] দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের মধ্যখানে ঝুলে থাকত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসের আলোকে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, জুমার দিনে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা, মাথায় পাগড়ি বাঁধা এবং পাগড়ির দুই প্রান্ত দুই কাঁধে মধ্যখানে ঝুলিয়ে দেওয়া সুন্নত। কেননা, রাসূল ﷺ এরূপ করতেন।

১৩২৭ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩২৭. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা দানকালে বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমার দিনে মসজিদে আসে আর ইমাম খোতবা দান করছেন, তখন সে যেন দু' রাকাত নামাজ পড়ে এবং তাতে যেন সূরা কেরাত সংক্ষেপ করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

إِسْمُ الرَّجُلِ الْقَادِمِ **আগন্তুক ব্যক্তির নাম :** উক্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরত সুলাইক গিত্‌ফানী। নাসাঈর বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন একজন গরিব লোক, সাধারণ ধরনের জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থায় তিনি মহানবী ﷺ-এর কাছে এসেছিলেন এবং কিছুক্ষণ সদ্‌কা চাইলেন। অতঃপর হুজুর ﷺ তাকে মসজিদে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। হুজুর ﷺ মিম্বারে বসে তাকে দু' রাকাত নফল পড়তে আদেশ করেছেন, যেন লোকেরা তার দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে নেয় এবং পরে তার জন্য সদ্‌কা আদায় করতে অসুবিধা না হয়। অবশ্য হুজুর ﷺ তাই করেছেন।

اَلْكَلَامُ وَالصَّلٰوةُ عِنْدَ الْخُطْبَةِ **খোতবার সময় কথাবার্তা বলা ও নামাজ পড়ার বিধান :** ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, খোতবা শুরু হওয়ার পরে সুন্নত বা নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই, বরং হারাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, জুমার দিন 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দুই রাকাত নামাজ পড়া ওয়াজিব, তাই তা পড়তে হবে। যদিও খোতবা পড়া শুরু হয়ে যায়। তাঁরা হাদীসের শব্দ দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন, ইমাম আহমদও এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসের শব্দ ছাড়াও অন্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দু' রাকাত পড়ার নির্দেশও রয়েছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ বলেন, 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' দু' রাকাত নামাজ পড়া মোস্তাহাব এবং খোতবার সময় তা পড়া নিষিদ্ধ। তাঁরা বলেন, নবী ﷺ-এর বাণী إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ ইমাম খোতবা দেওয়ার জন্য বের হলে তখন কোনো নামাজ বা কথা বলার অনুমতি নেই। ফাতাওয়া শামীতে আছে খোতবা আরম্ভ হয়ে গেলে এ সময় কথাবার্তা বলা মাক্‌রূহে তাহ্‌রীমী। বলার অনুমতি নেই কারো মতে ইমামের মিম্বারে উঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জিকির ও তাসবীহ পড়া জায়েজ আছে। সাহেবাইনের মতে দীনি কথাবার্তা বলা জায়েজ আছে।

তাঁদের দলিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদের দলিলের জবাবে হানাফীগণ বলেন যে, হাদীসে বর্ণিত وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ বাক্যের অর্থ হলো اَلْإِمَامُ يَقْرُبُ اَنْ يَخْطُبَ বা وَالْإِمَامُ يُرِيْدُ اَنْ يَخْطُبَ অর্থাৎ ইমাম যখন খোতবা দানের ইচ্ছা করেন অথবা খুতবা শুরুর নিকটবর্তী হন তখন দু' রাকাত নামাজ সংক্ষিপ্তাকারে পড়বে।

অথবা يَخْطُبُ শব্দটিকে إِسْتِقْبَالْ ধরলে এর অর্থ হবে, "ইমাম খোতবা দান করবেন" ফলে এতে আর কোনো সমস্যা থাকে না। অথবা এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য হাদীসটি খোতবাস্থায় নামাজ হারাম হওয়ার পূর্বেকার, পরে এ হাদীসটি অপর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

١٣٢٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلٰوةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজের এক রাকাত পেল, সে পূর্ণ নামাজই পেল। [অর্থাৎ পূর্ণ জামাতের ছওয়াব পেল।] –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِيْمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً : **যে ব্যক্তি জুমার নামাজ এক রাকাত পেল তার সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** যে ব্যক্তি জুমার নামাজ এক রাকাতের কম পেয়েছে তার হুকুম কি? এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاللَّيْثِ : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও লাইছের মতে যে ব্যক্তি জুমার নামাজের এক রাকাতের কম পেয়েছে সে জোহরের চার রাকাত নামাজ আদায় করবে, সে জুমা পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে না। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

(١) مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلّٰى اِلَيْهَا اُخْرٰى فَاِنْ اَدْرَكَهُمْ جُلُوْسًا صَلَّى الظُّهْرَ اَرْبَعًا . (رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِىْ)

(٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا اَوْ قَالَ الظُّهْرَ . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ)

(٣) وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوْعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ اَرْبَعًا . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىْ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ : ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে যদি কেউ ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামাজে শরিক হতে পারে, তবে ধরে নিতে হবে সে জুমার নামাজ পেয়েছে এবং সে বাকি নামাজ আদায় করবে। ইব্রাহীম নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ এবং দাউদ যাহেরী এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন—

(١) اِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا . (رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا)

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ .

(٣) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) انه قَالَ اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَدْ اَدْرَكَ الْجُمُعَةَ .

(٤) عَنِ الضَّحَّاكِ (رضـ) اِذَا اَدْرَكَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جُلُوْسًا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ **তাঁদের জবাব :** ইমাম শাফেয়ী (র.) ও অন্যান্য ইমামগণ প্রথমত فَاِنْ اَدْرَكَهُمْ جُلُوْسًا صَلَّى الظُّهْرَ اَرْبَعًا দ্বারা যে দলিল উপস্থাপন করেছেন এর উত্তরে বলা যায় যে, সেই হাদীসে جُلُوْس বা বৈঠক দ্বারা জুমার নামাজের পরিসমাপ্তির পরের বৈঠক উদ্দেশ্য, তাশাহহুদের বৈঠক উদ্দেশ্য নয়। যেমন– অপর হাদীসের বলা হয়েছে,

وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا

※ দ্বিতীয় দলিলে যে বলা হয়েছে, وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا এর উত্তরে বলা যায় যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতের পরিপন্থি নয়। কেননা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'রাকাতের কিছুই না পাওয়া।

※ আর তৃতীয় দলিলে যে, مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ নেওয়া হয়েছে এর উত্তরে বলা যেতে পারে, এখানে রুকু না পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য উভয় রাকাত না পাওয়া। এছাড়া এ হাদীসের রাবী সুলায়মান ইবনে আবী দাউদ হাররানী-কে আবূ হাতিম যয়ীফ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, সে মুনকারুল হাদীস। ইবনে হিব্বান বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া যায় না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ أُرَاهُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৩২৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দু'টি খুতবা দান করতেন। তিনি মিম্বরে উঠে প্রথমে বসতেন। অতঃপর যখন –[রাবী বলেন, আমার ধারণা মতে,] মুয়াজ্জিন আযান হতে অবসর হতেন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং খোতবা দান করতেন, অতঃপর [এক খোতবার পরে] বসতেন এবং কোনো কথাবার্তা বলতেন না। অতঃপর আবার দাঁড়াতেন এবং [দ্বিতীয়] খোতবা দান করতেন। –[আবূ দাউদ]

١٣٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَوٰى عَلَى الْمِنْبَرِ اِسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ)

১৩৩০. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মিম্বারে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন তখন আমরা তাঁর দিকে মুখ করে বসতাম। –[তিরমিযী। তবে তিনি বলেন, আমরা এ হাদীসটি একমাত্র মুহাম্মদ ইবনে ফজলের মাধ্যমে জেনেছি, অথচ তিনি ছিলেন যয়ীফ, তাঁর হাদীস স্মরণ থাকত না।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٣١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَّاكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَيْ صَلٰوةٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৩১. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ দাঁড়িয়ে খোতবা দিতেন, অতঃপর [প্রথম খোতবা শেষ করে] বসতেন, তারপর পুনরায় দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়েই খোতবা দান করতেন। যে ব্যক্তি তোমাকে এই সংবাদ দেয় যে, হুজুর ﷺ বসে বসে খোতবা দান করতেন সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর কসম! আমি মহানবী ﷺ-এর সাথে দুই হাজার নামাজেরও বেশি পড়েছি। [কখনও তাঁকে বসে খোতবা দান করতে দেখিনি।] –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَىْ صَلٰوةٍ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পরে–

১. দু' হাজার নামাজ দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তসহ বুঝানো উদ্দেশ্য, জুমা উদ্দেশ্য নয়। কেননা জুমার নামাজ প্রবর্তন হয় হিজরতের পরে, আর রাসূলের মাদানী জীবনে পাঁচশতের বেশি জুমার নামাজ হবে না।

২. অথবা এর দ্বারা সংখ্যা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ ١٣٣٢ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رض) اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الْخَبِيْثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৩২. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন, [দেখলেন] আব্দুর রহমান ইবনে উম্মুল হাকাম [বনী উমাইয়ার গভর্নর] বসে বসে খোতবা দান করছেন। এটা দেখে কা'ব বললেন, এই কলুষ আত্মাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে দেখ, সে বসে খোতবা দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً ..... الاية অর্থাৎ, যখন তারা বাণিজ্য কাফেলা অথবা খেলাধুলা দেখে তখন সেই দিকে দৌড়ায় আর আপনাকে [খোতবা দানরত] দাঁড়ান অবস্থায় ফেলে যায়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** জুমা ফরজ হওয়ার প্রথম যুগে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ খোতবা দান করছিলেন। এমন সময় সিরিয়ার এক বাণিজ্য-কাফেলা মদীনায় উপস্থিত হয়। কাফেলার কথা শুনে খোত্বা শ্রবণেরত অনেকে সেদিকে দৌড়ে যায়। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করে তাদেরকে এরূপ কাজ থেকে সতর্ক করে দেন। উক্ত আয়াতে হুজুর ﷺ-এর খোতবার সময় দাঁড়ানো থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٣٣٣ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (رض) اَنَّهُ رَاَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلٰى اَنْ يَقُوْلَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৩৩. অনুবাদ : হযরত উমারাহ ইবনে রুওয়াইবা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একদা বিশর ইবনে মারওয়ানকে মিম্বারের উপরে দু' হাত উঠিয়ে [ও বক্তাদের মতো হাত নাড়িয়ে] খোতবা দান করতে দেখলেন। তখন বললেন, আল্লাহ তার এই দু' হাতকে বিশ্রী করুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি এ থেকে বেশি কিছু করতেন না, এই বলে উমারাহ (রা.) নিজের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন। [অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত নাড়াতেন না, প্রয়োজনে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন।]–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** খুতবার সময় সাধারণ বক্তৃতার ন্যায় হাত নেড়ে খোতবা প্রদান করা অনুচিত, এতে খোতবার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। রাসূল ﷺ এরূপ কখনো করেননি, তিনি প্রয়োজন বোধে শুধু অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন, এ জন্য উমারা ইবনে রুওয়াইবা বিশর ইবনে মারওয়ানের কাজের আপত্তি করেছেন।

وَعَنْ ١٣٣٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اِجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَعَالْ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৩৩৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মিম্বারে সোজা হয়ে বসলেন, [জনতাকে লক্ষ্য করে] বললেন, তোমরা বস। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এটা শুনলেন, আর মসজিদের দরজায় বসে পড়লেন [যেখানে তিনি তখন দাঁড়ানো ছিলেন]। রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা দেখে বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ! তুমি এদিকে আস [অর্থাৎ এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বসো।] –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, খোতবা বসে বসে শুনতে হয়। রাসূল ﷺ মিম্বারে বসে খোতবা প্রদান করার পূর্বে সবাইকে বসতে আদেশ করেন। এ ছাড়া উক্ত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর বিশেষ মর্যাদাও ফুটে উঠে।

وَعَنْ ١٣٣٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا وَ قَالَ الظُّهْرَ . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

১৩৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার নামাজ এক রাকাত পেয়েছে সে যেন এর সাথে আর এক রাকাত মিলিয়ে দু' রাকাত পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি দু' রাকাতই ফউত করেছে সে যেন চার রাকাত পড়ে নেয় অথবা [রাবীর সন্দেহ] হুজুর বলেছেন সে যেন জোহর নামাজ পড়ে নেয়। –[দারাকুত্নী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হানাফীদের মতে যদি কোনো ব্যক্তি ইমামকে তাশাহহুদ পড়া কিংবা সাহু সেজদায় পায় তবে সে যেন জামাতে শরিক হয়ে বাকি নামাজ আদায় করে। অর্থাৎ তার জন্য জুমার নামাজ পড়া আবশ্যক হয়ে যাবে, অন্যথা জোহরের নামাজ পড়তে হবে।

আর অন্যান্যদের মতে দ্বিতীয় রাকাতের রুকু পেলে জুমা পড়বে, অন্যথা জোহর পড়তে হবে।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

পরিচ্ছেদ : ভয়-ভীতিকালীন নামাজ

اَلْخَوْفُ শব্দটি মাসদার, শাব্দিক অর্থ হলো– ভয় করা বা ভয়-ভীতি, আর ভয়-ভীতিকালীন যে নামাজ পড়া হয় তাকে صَلٰوةُ الْخَوْفِ বলা হয়। এ সময় নামাজ পড়ার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا الخ অর্থাৎ যদি তোমরা শত্রু বা অন্য কিছুর ভয় কর তবে নামাজ পড়বে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা আরোহী অবস্থায়। –[সূরা বাকারা, আয়াত : ২৩৮, ২৩৯] অপর এক আয়াতে আছে যে, وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الخ অর্থাৎ, যদি তোমরা ভয় কর যে, শত্রুরা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে। –[সূরা নিসা, আয়াত; ১০১, ১০২] এসব আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, এরূপ অবস্থায়ও নামাজ পরিহার করা যবে না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٣٦ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رح) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهٗ وَاَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهٗ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهٖ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَرَوٰى نَافِعٌ نَحْوَهٗ وَزَادَ فَاِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلُّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلٰى اَقْدَامِهِمْ اَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ اَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ نَافِعٌ لَا اُرٰى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ اِلَّا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৩৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নজদের দিকে জিহাদে গমন করলাম। আমরা শত্রুর সম্মুখীন হলাম এবং যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামাজ পড়াতে দাঁড়ালেন। একদল লোক তাঁর সাথে জামাতে দাঁড়িয়ে গেল, আরেক দল শত্রুর সম্মুখীন থাকল। যারা তাঁর সাথে নামাজে দাঁড়াল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরসহ একবার রুকু করলেন এবং দুই সিজদা করলেন। অতঃপর এই দলের লোকেরা [যারা নামাজ পড়ল] তাদের স্থলে চলে গেল, যে দল [এখনও] নামাজ পড়েনি। তারপর সেই দল এসে নামাজে শারিক হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরসহ এক রুকু ও দু' সিজদা করলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ সালাম ফিরালেন। তখন তাদের প্রত্যেকেই উঠে দাঁড়িয়ে এক রুকু ও দু' সিজদা করল [অর্থাৎ, এভাবে সকলে নিজেদের নামাজ সম্পন্ন করল]।

হযরত নাফে'ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি এ কথাটুকু বেশি বর্ণনা করেছেন যে, ভয় যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তবে তারা আপন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে অথবা কেবলার দিকে মুখ করে সওয়ারীর উপর আরোহী অবস্থায় নামাজ পড়বে। অথবা কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে [যে দিকে সমর্থ] হয় নামাজ পড়বে। হযরত নাফে' বলেন, আমার ধারণা যে, নিশ্চয় ইবনে ওমর (রা.) এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতেই বর্ণনা করেছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَوَّلاً مَتٰى صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ কখন সর্বপ্রথম ভয়-ভীতির নামাজ পড়েন : রাসূল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম কখন صَلٰوةَ الْخَوْفِ পড়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ– রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম 'যাতুর রেকা' যুদ্ধে খাওফ বা ভীতির নামাজ আদায় করেন। বিভিন্ন বর্ণনা মতে এই যুদ্ধ ৪ অথবা ৫ অথবা ৬ অথবা ৭ হিজরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইবনুল কায়্যিম এবং হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম এই নামাজ উসফানে আদায় করেছিলেন। কারো মতে এ নামাজ সর্বপ্রথম পড়া হয়েছিল বনী নাজীর যুদ্ধের সময়।

هَلْ بَقِىَ حُكْمُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ভয়-ভীতির নামাজের বিধান অবশিষ্ট আছে কি না : রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর সালাতুল খাওফের বিধান বাকি আছে কি না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশিষ্ট সাগরেদ মুযানী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর এর বিধান আর অবশিষ্ট নেই। এটা মনসুখ হয়ে গেছে।

এরূপভাবে আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক এক অভিমত মুতাবিক এবং হাসান ইবনে যিয়াদ ও ইব্‌রাহীম ইবনে উলাইয়্যার মতে রাসূল ﷺ-এর পরে এর বৈধতার বিধান বাকি নেই। তাঁরা দলিল হিসাবে আল্লাহর বাণী وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ (الاية) উল্লেখ করে বলেন, সালাতুল খাওফের বিধান রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতির শর্তে প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর অনুপস্থিতিতে এর বিধান আর বাকি নেই।

অবশ্য ইমাম চতুষ্টয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতে রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পরও সালাতুল খাওফের বিধান বাকি রয়েছে। দলিল হলো قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ -এর হুকুমের ব্যাপকতার মধ্যে সালাতুল খাওফও অন্তর্ভুক্ত। এটা ছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহাবীগণ সালাতুল খাওফের নামাজ আদায় করতেন।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ كَيْفِيَّةِ صَلٰوةِ الْخَوْفِ সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা, আওযায়ী, মুহাম্মদ (র.) প্রমুখগণ বলেন, ভয়কালীন নামাজের পদ্ধতি হবে, ইমাম লোকদেরকে দু' ভাগে ভাগ করবেন। একদল শত্রুর সম্মুখীন থাকবে আর একদল ইমামের পিছনে। ইমাম তাঁর সঙ্গীয় মুক্তাদিদেরকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদায় এক রাকাত পড়বেন, ইমাম দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠালে যারা তাঁর সাথে এক রাকাত পড়ল তারা গিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়াবে এবং দ্বিতীয় দল যারা এতক্ষণ শত্রুর মোকাবেলায় ছিল, তারা এসে ইমামের পিছনে একতেদা করবে। ইমাম এ দ্বিতীয় দলকে নিয়ে এক রুকু ও দুই সিজদায় এক রাকাত পড়াবেন এবং তাশাহ্‌হুদ পড়ে একাকী সালাম ফিরাবেন। কিন্তু এ দ্বিতীয় দল সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে।

আর প্রথম দল যারা ইমামের সাথে প্রথম এক রাকাত পড়ে গিয়েছিল তারা নামাজের স্থানে এসে অবশিষ্ট এক রাকাত কেরাত ব্যতীত পৃথক পৃথকভাবে আদায় করবে। তারা কেরাত এ জন্য পড়বে না যে, এরা ছিল 'লাহেক'। তারপর একা একাই তাশহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। এভাবে তারা নিজ নিজ নামাজ সম্পন্ন করে পনুরায় শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াবে।

এবার দ্বিতীয় দল যারা ইমামের সাথে শেষ রাকাত পড়েছিল তারাও অনুরূপভাবে নামাজের স্থানে এসে নিজেদের এক রাকাত কেরাতসহ আদায় করবে। এরা কেরাঅত এ জন্য পড়তে হবে যে, তারা 'মাসবূক'। অতঃপর তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে। এ পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করার বর্ণনা কুরআনের নির্দেশের সাথে সর্বাধিক মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে বিধায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) একে উত্তম পদ্ধতি বলেন। এটাই উপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা হলো সালাতুল খাওফের প্রথম পদ্ধতি। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখগণ যে পদ্ধতিকে উত্তম বলেন, তা পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ١٣٣٧ - يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ (رحـ) عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَّاتٍ (رحـ) عَمَّنْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِىْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَ نْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ مِنْ صَلٰوتِهٖ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ بِطَرِيْقٍ اٰخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ)

১৩৩৭. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ইয়াযীদ ইবনে রূমান [অপর তাবেয়ী] সালেহ ইবনে খাওয়্যাত হতে বর্ণনা করেন, সালেহও এমন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, যিনি 'যাতুর রেকা' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়ভীতিকালীন নামাজ পড়েছেন। তিনি বলেন, একদল নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজে সারিবদ্ধ হলো দ্বিতীয় দল শত্রুর সম্মুখীন থাকল। রাসূল ﷺ সঙ্গীয় লোকদেরকে নিয়ে এক রাকাত নামাজ পড়লেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে থাকলেন। লোকেরা তাদের অবশিষ্ট এক রাকাত একা একা পড়ে নিজ নিজ নামাজ সম্পন্ন করল এবং ফিরে গিয়ে শত্রুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হলো। অতঃপর দ্বিতীয় দল আসল। রাসূল ﷺ তাদেরসহ নিজের অবশিষ্ট এক রাকাত পড়লেন, অতঃপর বসে থাকলেন। লোকেরা একা একা তাদের বাকি রাকাত নামাজ আদায় করল। অতঃপর রাসূল তাদেরসহ সালাম ফিরালেন। –[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু বুখারী অন্য এক সূত্রে হাদীসটি কাসেম ইবনে মুহাম্মদ হতে, তিনি সালেহ ইবনে খাওয়্যাত হতে, তিনি সাহল ইবনে আবূ হাসমা হতে এবং তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْكَيْفِيَّةُ الثَّانِيَّةُ لِصَلٰوةِ الْخَوْفِ ভয়-ভীতিকালীন নামাজের দ্বিতীয় পদ্ধতি : 'সালাতুল খাওফ' আদায়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবূ সওর প্রমুখগণ এ পদ্ধতিকে সবচেয়ে উত্তম বলে মনে করেন। এর কারণ, তাঁরা বলেন, এ পদ্ধতির বর্ণনাসূত্র বেশি শক্তিশালি, আর এতে নামাজের পরিপন্থি কার্যাবলিও কম। এই পদ্ধতিতে ইমাম একদলের সাথে এক রাকাত নামাজ পড়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর লোকেরা তাদের অবশিষ্ট নামাজ একা একা শেষ করে শত্রুর মোকাবেলায় গিয়ে দাঁড়াবে। তারপর দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পিছনে সারিবদ্ধ হবে। ইমাম এ দলের সাথে তাঁর অবশিষ্ট রাকাত শেষ করবেন এবং তাশাহহুদের বৈঠকে বসে তাদের নামাজ শেষ করার অপেক্ষা করতে থাকবেন। দ্বিতীয় দল তাদের বাকি এক রাকাত একা একা আদায় করবে। তাদের তাশাহহুদ পড়া শেষ হলে ইমাম তাদের সহ সালাম ফিরাবেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, এ পদ্ধতি জায়েজ আছে বটে, তবে উত্তম হতে পারে না। কারণ মুক্তাদির জন্য ইমামের নামাজের মধ্যে অপেক্ষা করা এক দিকে যেমন অযৌক্তিক, অপর দিকে ইমামতের বিপরীত কার্যক্রম, একে বলা হয় قَلْب مَوْضُوْع আর প্রথম পদ্ধতিতে লোকদের নামাজের পরিপন্থি কিছু কাজ হলেও অবস্থা বিশেষে তার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। একে বলা হয় رُخْصَتْ রুখসাত।

وَعَنْ ١٣٣٨ - جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُعَلَّقٌ بِشَجَرَةٍ فَاَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَتَخَافُنِيْ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اللّٰهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَغَمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَاَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْاُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৩৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হলাম। যখন 'যাতুর রেকা' নামক স্থানে পৌঁছলাম, রাবী বলেন, তথায় আমরা একটা ছায়াদার বৃক্ষের কাছে আসলাম, যথারীতি আমরা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিলাম। রাবী বলেন, [রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃক্ষের ছায়ায় আরাম করছিলেন] এমন সময় মুশরিকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি গাছের সাথে ঝুলানো ছিল। সে নবী করীম ﷺ-এর তরবারি হাতে নিল এবং তাড়াতাড়ি কোষমুক্ত করল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় কর? রাসূল ﷺ বললেন, না। লোকটি বলল, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলাই আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবে। রাবী জাবের বলেন– এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাকে ভয় দেখাল, ফলে সে তরবারি কোষবদ্ধ করে একে পূর্ববৎ ঝুলিয়ে রাখল। রাবী বলেন, অতঃপর নামাজের আযান দেওয়া হলো এবং রাসূল ﷺ একদল লোককে নিয়ে দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন। অতঃপর এদল পিছনে সরে গেল [অপর দল সম্মুখে এগিয়ে এলো] রাসূলুল্লাহ দ্বিতীয় দলকেও দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন। রাবী হযরত জাবের (রা.) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোট চার রাকাত হয়েছিল, আর লোকদের দু' রাকাত করে হয়েছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ذَاتُ الرِّقَاعِ নামে নামকরণের কারণ : উক্ত যুদ্ধকে ذَاتُ الرِّقَاعِ নামে নামকরণের কয়েকটি কারণ রয়েছে, যা নিম্নরূপ–

১. এ যুদ্ধে মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে খালি পায়ে ছিলেন তাদের পায়ে কোনো জুতা ছিল না, ফলে তাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং নখ পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল, সৈনিকগণ ক্ষতস্থানে কাপড়ের পট্টি বেঁধেছিল। উল্লেখ্য যে, 'রেকা' কাপড়ের টুকরাকে বলা হয়। এ কাপড়ের টুকরা দিয়ে পায়ে পট্টি বাঁধার কারণে এ যুদ্ধকে 'যাতুর-রেকা' বা পট্টি বিশিষ্ট যুদ্ধ বলা হয়।

২. যে স্থানে এ যুদ্ধ বা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল এ স্থানটির মাটি ছিল বিভিন্ন বর্ণের, এক স্থানের মাটির রং আরেক স্থানের রং -এর সাথে কোনো মিল ছিল না, কোনো অংশের বর্ণ ছিল সাদা, আবার কোনো অংশের বর্ণ ছিল লাল, আর কোনো অংশের বর্ণ ছিল কালো। এ বিচিত্র বর্ণের টুকরার জন্য একে যাতুর-রেকা নামকরণ করা হয়েছে।

৩. আবার কারো মতে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিচিত্র বর্ণের ঝাণ্ডা ছিল, এ জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে।

৪. ইমাম দাউদী বলেন, এ যুদ্ধে ভয়-ভীতির দরুন মুসলমানরা খণ্ড খণ্ড জামাতে 'সালাতুল খাওফ' আদায় করেছিলেন তাই 'যাতুর-রেকা' নামে নামকরণ করা হয়েছে ইত্যাদি। তবে প্রথম কারণটিকেই অনেকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন।

হাদীসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান:ঃ পূর্বোল্লিখিত দু'টি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, ভয়ভীতির নামাজ রাসূল ﷺ দু' রাকাত পড়েছেন এবং এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি চার রাকাত পড়েছেন। এর সমাধান নিম্নরূপ–

১. কিছু সংখ্যকের মতে এ সফরে মহানবী ﷺ ও সাহাবীগণ তাঁরা কেউই মুসাফির ছিলেন না। তাই সকলেই চার চার রাকাত নামাজ আদায় করেছেন।

২. আবার কারো মতে মহানবী ﷺ চার রাকাত পড়লেও সাহাবীগণ হুযূরের সাথে দু' রাকাত এবং নিজেরা একা একা আরও দু' রাকাত পড়েছেন। ফলে সকলের চার চার রাকাতই হয়েছে।

৩. কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তাঁরা সকলই মুসাফির ছিলেন। মহানবী ﷺ এক দলকে ফরজের নিয়তে দুই রাকাত এবং অপর দলকে নফলের নিয়তে দু' রাকাত পড়িয়েছেন। তাঁর মতে اِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ جَائِزٌ অর্থাৎ ফরজ নামাজ পাঠকারীর নফল নামাজ আদায়কারীর পিছনে একতেদা করা জায়েজ আছে। সুতরাং মহানবী ﷺ দ্বিতীয় দলের জন্য নফল আদায়কারী হলেও তাদের নামাজ জায়েজ হয়েছে।

৪. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে একই ফরজ নামাজ একাধিক বার পড়া জায়েজ ছিল। 'যাতুর-রেকা'-এর যুদ্ধ সেই সময়কার। এ প্রেক্ষিতে বলা হয় যে, মহানবী ﷺ দু'বার উভয় দলকে একই নামাজ পৃথক পৃথকভাবে ফরজের নিয়তেই পড়িয়েছেন। কাজেই ইমাম শাফেয়ী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

৫. আবার কেউ কেউ বলেন, মহানবী ﷺ -এর 'সালাতুল খাওফ' চার রাকাত পড়া তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যাতে প্রত্যেক দলই তাঁর সাথে পূর্ণ নামাজ আদায় করতে পারে, তজ্জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং মহানবী ﷺ-এর চার রাকাত পড়া অন্যান্য হাদীসের বিপরীত হলেও এ বিশেষ কারণে তা বৈপরীত্যের আওতায় পড়ে না। এটা সালাতুল খাওফের তৃতীয় পদ্ধতি।

وَعَنْهُ ١٣٣٩ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا خَلْفَهٗ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ ثُمَّ قَامُوْا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَاَخَّرَ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ رَفَعَ

১৩৩৯. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ভয়-ভীতিকালীন নামাজ পড়ালেন। আমরা তাঁর পিছনে দু' সারিতে সারিবদ্ধ হলাম। শত্রুরা তখন আমাদের ও কেবলার মধ্যখানে [অর্থাৎ কেবলার দিকে] ছিল। তখন নবী করীম ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বললেন, আমরাও সকলে তাকবীর বললাম [অর্থাৎ উভয় সারির লোকেরাই তাকবীর বললাম] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকু করলেন আমরাও সকলে [অর্থাৎ উভয় সারির লোক] রুকু করলাম। তারপর রাসূল ﷺ রুকু হতে মাথা উঠালেন, আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। অতঃপর তিনি এবং যে সারি তাঁর নিকটে ছিল তারা সেজদায় গেলেন আর দ্বিতীয় সারি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যখন নবী করীম ﷺ সিজদা সম্পন্ন করলেন, তাঁর নিকটবর্তী সারির লোকেরা উঠে দাঁড়াল, দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজদায় গেল এবং সিজদা সম্পন্ন করে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর দ্বিতীয় সারি সামনের দিকে অর্থাৎ সারিতে অগ্রসর হয়ে গেল এবং সামনের সারির লোকেরা পিছনের সারিতে সরে গেল, অতঃপর

رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَ رَفَعْنَا جَمِيْعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ الَّذِيْ كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِيْ نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُوْدَ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدُوْا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

[কেরাআত পাঠ শেষে] রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় রুকুতে গেলেন, আমরাও সকলে [উভয় সারি] রুকুতে গেলাম তারপর রাসূল ﷺ রুকু হতে মাথা উঠালেন, আমরাও সকলে মাথা উঠালাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ এবং যে সারি তাঁর নিকটে ছিল অর্থাৎ যে সারি প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় সারিতে ছিল সিজদাতে গেলেন আর দ্বিতীয় সারি [অর্থাৎ প্রথম রাকাতে প্রথম সারি] শত্রুর মুখোমুখি হয়ে রইল। নবী করীম ﷺ ও তাঁর নিকটের সারির লোকেরা যখন সিজদা সম্পন্ন করলেন তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা সিজদায় নত হলেন এবং সিজদা সম্পন্ন করলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ সালাম ফিরালেন। আমরাও সকলে [উভয় সারির লোক] একত্রে সালাম ফিরালাম। [এটা সালাতুল খাওফের চতুর্থ পদ্ধতি]–[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٤٠ - عَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الظُّهْرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطْنِ نَخْلٍ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ طَائِفَةٌ اُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

১৩৪০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ নাখ্‌ল নামক স্থানে ভয়ের অবস্থায় মানুষকে জোহরের নামাজ পড়াচ্ছিলেন। তিনি একদল লোকসহ দু' রাকাত নামাজ পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। অতঃপর আরেক দল আসল তিনি তাদের নিয়েও দু' রাকাত নামাজ পড়লেন অতঃপর সালাম ফিরালেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রাসূল ﷺ প্রত্যেক দলের সাথে পৃথক পৃথক সালাম ফিরিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এটা রাসূল ﷺ-এর জন্য সালাতুল খাওফের বৈশিষ্ট্য ছিল। কারো মতে শেষ দু' রাকাতও ফরজ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ফরজ পুনঃ পড়া জায়েজ ছিল বলেই রাসূল ﷺ এরূপ করেছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর শেষ দুই রাকাত ছিল নফল। তাঁর মতে নফল পাঠকারীর পিছনে ফরজ পাঠকারীর একতেদা করা জায়েজ। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এটা ভয়ভীতিকালীন নামাজের পঞ্চম পদ্ধতি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٤١ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعَسْفَانَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِهٰؤُلَاءِ صَلٰوةٌ هِىَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَبْنَائِهِمْ وَهِىَ الْعَصْرُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ فَتَمِيْلُوْا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَاَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يَّقْسِمَ اَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ اُخْرٰى وَرَاءَ هُمْ وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُوْنُ لَهُمْ رَكْعَةٌ وَلِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَانِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

১৩৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দাজনান ও উসফান নামক এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে হাজির হলেন। তখন মুশরিকগণ বলল, এদের [অর্থাৎ মুসলমানদের] এমন একটি নামাজ আছে যা তাদের পিতামাতা ও সন্তানাদি হতেও তাদের নিকটে অধিক প্রিয়। তা হলো তাদের আসরের নামাজ। সুতরাং তোমরা সংঘবদ্ধ হও এবং তোমাদের সিদ্ধান্তকে পাকাপোক্ত করে নাও এবং [তাদের নামাজরত অবস্থায়] তাদের উপরে হঠাৎ এক সাথে আক্রমণ কর। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দকে দু' দলে বিভক্ত করতে নির্দেশ দিলেন। আর তিনি যেন এক দলকে নামাজ পড়ান এবং অপর দল তাদের পিছনের শত্রুর মোকাবেলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত তারা যেন সদা সতর্ক থাকে এবং সশস্ত্র প্রস্তুত থাকে। এতে তাদের এক রাকাত হবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' রাকাত হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মুক্তাদিদের صَلٰوةُ الْخَوْفِ এক রাকাত হবে, এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে–

১. নবী করীম ﷺ-এর সাথে তাদের এক রাকাত করে হবে, আর অবশিষ্ট এক রাকাত তারা একা একা পড়ে নেবে।

২. অথবা তাদের সর্বসাকুল্যে এক রাকাতই হবে, মূলত এক রাকাত কোনো নামাজ নেই মোটকথা, সালাতুল খাওফ-এর এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য নামাজে নেই।

এতে ফরজ নামাজ যথাসময় আদায় করার এবং তা জামাত সহকারে পড়ার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। এ অবস্থায় ও জামাত বা নামাজ তরক করার অনুমতি নেই। তবে صَلٰوةُ الْخَوْفِ-এ এক রাকাত পড়াও এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হতে পারে, এ হলে তবে এটা صَلٰوةُ الْخَوْفِ-এর ষষ্ঠ পদ্ধতি হবে।

মোটকথা, সালাতুল খাওফ-এর এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য নামাজে নেই।

এতে ফরজ নামাজ যথা সময় আদয় করার এবং তা জামাতসহকারে পড়ার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়।এ অবস্থায় ও জামাত বা নামাজ তরক করার অনুমতি নেই।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

পরিচ্ছেদ : দুই ঈদের নামাজ

اَلْعِيْدُ-এর সংজ্ঞা : اَلْعِيْدُ শব্দটি اَلْعَوْدُ হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ– اَلرُّجُوْعُ তথা প্রত্যাবর্তন করা, وَاوْ-কে পূর্ববর্তী যেরের কারণে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে اَلْعِيْدُ করা হয়েছে? এর বহুবচন হলো اَعْيَادٌ-এর বহুবচন হওয়া উচিত ছিল اَعْوَادٌ কিন্তু اَلْعُوْدُ (কাঠ)-এর বহুবচন হতে পার্থক্য করার জন্য এর বহুবচন اَعْيَادٌ গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণত আনন্দ-উৎসবের দিনকে عِيْد বলা হয়। তবে শরিয়তের পরিভাষায় মুসলমানগণ বছরে যে দু'টি দিবসকে আনন্দ উৎসবের দিবস হিসাবে পালন করে থাকে তাকে ঈদ বলা হয়।

ঈদকে 'ঈদ' হিসাবে নামকরণ করার কারণ : বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে ঈদকে ঈদ হিসাবে নামকরণ করেছেন–

১. ঈদের দিন আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ অবতীর্ণ হতে থাকে এ জন্য এ দিবসকে 'ঈদ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২. কারো মতে এ দিনটিকে এজন্য ঈদ বলা হয়, কারণ লোকেরা এ দিনটিকে বারবার খুশির দিন হিসাবে ফিরে পায়।

৩. অথবা যারা ঈদ একবার পেল, পরবর্তী বছর পুনরায় তাদের জীবনে তা আবার আসবে এ আশায় একে ঈদ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।

৪. অথবা ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা প্রতি বছরই নতুন করে আগমন করে।

৫. অথবা ঈদের নামাজে বারবার তাকবীর বলতে হয় বিধায় একে ঈদ (عِيْد) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ঈদের নামাজ কখন প্রবর্তিত হয়? ঈদের নামাজ প্রবর্তিত হওয়ার সময় সম্পর্কে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়—

প্রথমত আদ-দুর্‌রুল মুখতার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম হিজরিতে ঈদের নামাজের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত অধিকাংশ আলেমদের মতে দ্বিতীয় হিজরিতে তার বিধান প্রবর্তিত হয়। এ অভিমতই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে রোজা ফরজ হয়। এ হিসাবে দ্বিতীয় হিজরিতেই ঈদের নামাজের বিধান প্রবর্তিত হয়।

اَلْحِكْمَةُ فِىْ مَشْرُوْعِيَّةِ الْعِيْدِ ঈদের নামাজ প্রবর্তনের তাৎপর্য : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বীয় কৃষ্টিকালচারকে উচ্চাসনে সমাসীন করার জন্য এমন কিছু নির্ধারিত দিন থাকে, যে দিনে তারা সম্মিলিতভাবে আনন্দ-উৎসব উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে একসাথ হয়ে থাকে। প্রাক ইসলামি যুগে 'নাইরাজ' (نَيْرُوْز) ও 'মেহেরজান' (مِهْرَجَانٌ) নামে সে ধরনের দু'টি দিবস নির্দিষ্ট ছিল। রাসূল ﷺ-এর মদীনা হিজরতের পর সাহাবীদের হৃদয়ে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তাই রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এর পরিবর্তে আরো উত্তম দিবস দান করবেন। এর অব্যাবহিত পরেই 'ঈদ' নামক দু'টি দিবস দান করা হয়। যে দিবসে মুসলমানগণ একই স্থানে সমবেত হয়ে পরস্পর কুশলাদি বিনিময় করে। সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে তার একত্ববাদের বার্তা ঘোষণা করা হয়। আর এ জন্যই ঈদের ময়দানে নারী শিশু আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٤٢ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلّٰى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَاْمُرُهُمْ وَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَاْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহার দিনে ইদগাহে যেতেন তারপর প্রথম কাজ তিনি যা করতেন তা হলো নামাজ [অর্থাৎ তিনি প্রথম নামাজ পড়াতেন]। অতঃপর নামাজ হতে অবসর হয়ে তিনি জনতার সম্মুখে দাঁড়াতেন, জনতা তখন নিজ নিজ সারিতে বসা থাকত। রাসূল ﷺ তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতেন। যদি কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন, তাদেরকে বাছাই করতেন অথবা যদি কাউকেও কোনো বিশেষ নির্দেশ দেওয়ার থাকত নির্দেশ দিতেন। [এটাই ছিল রাসূলের খোতবা] অতঃপর বাড়ি ফিরতেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ **ঈদের নামাজ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ :** ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মতে ঈদের নামাজ ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী মালেক ও জমহুর আলিমদের মতে উভয় ঈদের নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আহমদ (র.) বলেন, ফরজে কেফায়া। যারা ফরজ বা ওয়াজিব বলেন, তাদের দলিল আল্লাহ্‌র কালাম, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ উক্ত আয়াতে ঈদের নামাজ ও কুরবানির হুকুম আদেশমূলক শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কুরবানি যেমন ওয়াজিব, নামাজও তেমনি ওয়াজিব। এতদ্ভিন্ন হিজরতের পর মহানবী ﷺ-এর এটা নিয়মিত পড়া এবং কোনো সময়েও তা তরক না করাও এটা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। মিরকাত, হিদায়া ও ফতওয়ার কিতাবে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ঈদের নামাজ হিজরি দ্বিতীয় সনে হুজুর ﷺ পড়েছেন।

وَعَنْ ١٣٤٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৪৩. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুই ঈদের নামাজ একবার নয়, দু'বার নয়; বরং বহুবার পড়েছি আযান ও একামত ব্যতীত। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আযান ও একামত দেওয়া হয় যেন তা শুনে মানুষ জামাতে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে পারে। পক্ষান্তরে ঈদের নামাজের দিন তারিখ পূর্ব হতে নির্ধারিত থাকার কারণে আযান ও একামতের মাধ্যমে মানুষকে নতুন করে সতর্ক করার প্রয়োজন পড়ে না।

وَعَنْ ١٣٤٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ (رضـ) يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর ও ওমর (রা.) সকলেই দু' ঈদের নামাজ খোতবা দানের পূর্বেই পড়তেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

هَلْ خُطْبَةُ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ اَمْ بَعْدَهَا **দুই ঈদের খোতবা নামাজের পূর্বে** না পরে : আল্লামা ইবনুল মুনযির বলেন, সকল ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, দুই ঈদের খোতবা নামাজের পরেই দিতে হবে– নামাজের পূর্বে দেওয়া বৈধ নয়। অবশ্য যদি কেউ নামাজের পূর্বেই খোতবা প্রদান করে থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে হযরত উসমান (রা.) একবার ঈদের নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদান করেছিলেন এ তথ্য যদি সঠিক হয় তবে বলা যাবে, তিনি তা বৈধ জ্ঞান করে দিয়েছিলেন।

অথবা তিনি ভুলবশত জুমার নামাজের মত মনে করে তা প্রদান করেছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পক্ষ হতে নির্বাচিত তদানীন্তন মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকাম নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদানের প্রচলন স্থায়ীভাবে চালু করেন। এতে তখনকার জীবিত সাহাবীগণ ক্ষুব্ধ হন এবং চরম বিরোধিতা করতে থাকেন। সুতরাং এ আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ঈদের খোতবা নামাজের পরেই দিতে হবে।

وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدِ **জুমার এবং ঈদের খোতবার মধ্যে পার্থক্যের কারণ :** জুমার খোতবা প্রদান করা হয় নামাজের পূর্বে, আর ঈদের খোতবা প্রদান করা হয় নামাজের পরে। বিশেষজ্ঞগণ এর মধ্যকার কয়েকটি পার্থক্য বর্ণনা করেছেন—

১. জুমার নামাজ ফরজ, আর ঈদের নামাজ সুন্নত মতান্তরে ওয়াজিব। হুকুমের এই পার্থক্য নিরূপণের জন্যই উক্ত নিয়ম করা হয়েছে।

২. কারো মতে জুমার খোতবা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত, যা ঈদের জন্য নয়। আর এ কারণেই জুমার নামাজ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য নামাজের পূর্বে খোতবা প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।

৩. আরেক দল বলেন, ঈদের নামাজের সময় জুমার নামাজের সময়ের চাইতে ব্যাপকতর, আর এ কারণেই ঈদের খোতবা পরে এবং জুমার খোতবা পূর্বে প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪. আবার কেউ কেউ বলেন, জুমার খোতবা প্রদান করা ফরজ এবং তা শ্রবণ করাও অপরিহার্য, কিন্তু যদি জুমার খোতবা নামাজের পরে দেওয়া হয়, তা হলে অনেক মানুষ চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে তারা গুনাহগার হবে, এ জন্যই জুমার খোতবা পূর্বে প্রদান করা হয়ে থাকে।

وَعَنْ ١٣٤٥ وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) اَشَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَ قَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلَا اِقَامَةً ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَ

১৩৪৫. অনুবাদ : একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোনো ঈদের নামাজে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ [উপস্থিত ছিলাম]। রাসূলুল্লাহ ﷺ [ঈদগাহের উদ্দেশ্যে] ঘর হতে বের হলেন এবং নামাজ পড়ালেন, তারপর খোতবা দান করলেন। [পরবর্তী রাবী বলেন,] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আযান ও একামতের কথা উল্লেখ করেননি। অতঃপর রাসূল ﷺ মহিলাদের দিকে আসলেন এবং তাদের প্রতি উপদেশ দান

ذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَاَيْتُهُنَّ يُهْوِيْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلَالٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَ بِلَالٌ اِلٰى بَيْتِهٖ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

করলেন, নসিহত করলেন এবং সদ্কা-খয়রাত করার জন্য আদেশ করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, [রাসূলের উপদেশ শোনার পরে] মহিলাগণ নিজেদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতে লাগলো এবং অলঙ্কারাদি খুলে হযরত বেলাল (রা.)-এর হাতে দিতে লাগল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বেলালসহ তাঁর গৃহের দিকে উঠে চলে গেলেন।-[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٤٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন দু' রাকাত ঈদের নামাজ পড়লেন। কিন্তু এ দু' রাকাতের পূর্বে বা পরে অন্য কোনো নামাজ পড়েননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে নামাজ পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের মতে ঈদের নামাজের পূর্বে বা পরে কোনো নফল নামাজ পড়া জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল হলো—

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

(٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيْدٍ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ـ

ইমাম আবূ হানীফা, সুফইয়ান ছাওরী, আলকামা, মালেক প্রমুখ ইমামের মতে ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো নফল নামাজ পড়া যাবে না, কিন্তু পরে পড়া জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হলো, উল্লিখিত দু'টি হাদীসের প্রথমাংশ ঈদের নামাজের পূর্বে যে নফল পড়া জায়েজ নেই তার দলিল। এ ছাড়া নিম্নের হাদীস দু'টিও দলিল স্বরূপ পেশ করা হয়েছে :

(١) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) اَنَّهُ خَرَجَ اِلٰى صَلٰوةِ الْعِيْدِ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّوْنَ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْعِيْدِ صَلٰوةٌ ـ اَلْحَدِيْثُ

(٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) وَحُذَيْفَةَ (رضـ) اَنَّهُمَا كَانَا يُنْهِيَانِ عَنِ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْعِيْدِ ـ

ঈদের নামাজের পরে পড়ার দলিল :

(١) عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فَاِذَا يَرْجِعُ اِلٰى مَنْزِلِهٖ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ـ (اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَاَحْمَدُ بِمَعْنَاهُ وَاَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ فِى الْفَتْحِ)

(٢) عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْعِيْدِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِكُلِّ نَبْتٍ نَبَتَ وَبِكُلِّ وَرَقَةٍ حَسَنَةً ـ

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : যে সব হাদীসে ঈদের নামাজের পূর্বে নফল জায়েজ নয় বলা হয়েছে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এরও দলিল। আর যে সব হাদীসে ঈদের নামাজের পরে নফল জায়েয নয় বলা হয়েছে তার জবাব হলো, এ সব হাদীস দ্বারা ঈদের মাঠে নফল পড়া জায়েজ নয়, যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) মাকরূহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

وَعَنْ ١٣٤٧ أُمِّ عَطِيَّةَ (رض) قَالَتْ أُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ دَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ اِمْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰنَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৭. অনুবাদ : হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল, আমরা যেন ঋতুবতী মহিলাগণ ও পর্দানশীল মহিলাগণকে দুই ঈদের দিনেই ঈদগাহে বের করি, যাতে তাঁরা মুসলমানদের জামাতে হাজির হতে পারে এবং দোয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। আর যেন ঋতুবতীগণ মহিলাদের নামাজের স্থান হতে এক পাশে সরে বসে। তখন একজন মহিলা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো কারো কাছে বড় চাদর নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তার সহচরী নিজের চাদর [ধার হিসাবে] তাকে পরাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদগাহে রমণীদের গমন সম্পর্কে মতানৈক্য : ঈদের ময়দানে, জুমার জামাতে প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিত হওয়া বৈধ কি না–বর্তমান নৈতিক চরম অবক্ষয়ের যুগে এ প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীত ও বর্তমান সময়ের সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিম্নে এর একটি বিশ্লেষণ প্রদান করা হলো–

ফতহুল মুলহিম এবং আইনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.), আলী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রমুখ বলেন, ঈদের মাঠে মহিলাদের গমন করা শুধু বৈধই নয়; বরং কর্তব্যও। তাঁরা আলোচ্য উম্মে আতিয়্যা (রা.) বর্ণিত أُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ ـ (اَلْحَدِيْثُ) এ হাদীস উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মহিলাদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে এ ধরনের একটি অভিমত মুতাবিক এবং ইমাম মালেক, আবূ ইউসুফ, সুফইয়ান সাওরী, উরওয়া, কাসেম, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদিল আনসারী (র.) প্রমুখের মতে, মহিলারা যেন ঈদগাহে এবং অন্যান্য স্থানে না যায়। তাঁরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন।

قَالَتْ عَائِشَةُ (رض) لَوْ رَأَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ ـ

হযরত আয়েশা (রা.)-এর এ উক্তি ছিল রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের কয়েকদিন পরের। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.) যদি এ উক্তি করে থাকেন, তবে বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদ, ধর্ষণ-হাইজ্যাকের যুগে মহিলাদের ঈদগাহে ও জুমআর জামাআতে না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে।

বাদায়ে প্রণেতা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারীদের অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ঈদের ময়দানে, জুমার জামাআতে, এমনকি অন্য কোনো নামজে যুবতী মহিলাদের উপস্থিতিকে সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ। তাঁদের দলিল নিম্নোক্ত আয়াতটি– قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ـ (الاحزاب : ٣٣)

অর্থাৎ (নবী পত্নীদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন,) এবং তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান কর এবং পূর্বের অজ্ঞযুগের প্রথানুযায়ী চলাফেরা করো না। [আহযাব ঃ ৩৩]

তবে তাঁরা বৃদ্ধা রমণীদেরকে ঈদের ময়দানে গমনের অনুমতি দিয়েছেন; ইবনুল হুমামও এই অভিমত পোষণ করেছেন। মোল্লা আলী কারী (র.) একে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আদ-দুররুল মুখ্তার গ্রন্থে এসেছে যে, বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে যুবতী-বৃদ্ধা সব ধরনের মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য যে, তাদের জন্য ঈদের ময়দানে, জুমার জামাতে কিংবা কোনো ওয়াজ মাহফিলে গমন করা উচিত নয়, যদিও তাদের এই গমন রাতের আঁধারে হোক না কেন। আল্লামা ইবনু আবেদীন বলেন, ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন এর উপরই ফতোয়া প্রদান করেছেন।

বিরোধীদের উত্তর : মহিলাদের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার সপক্ষে যে হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এর উত্তরে বলা যায় যে,

১. আল্লামা ত্বাহাবী (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে অমুসলিমদের সম্মুখে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি করে দেখানোর উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে ঈদের ময়দানসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বর্তমানে এর আর প্রয়োজন নেই।

২. ফতহুল মুলহিম গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, তদানীন্তন সময় ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে মুক্ত ছিল, কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকায় তাদেরকে ঈদগাহে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ ١٣٤٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِيْ أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَفِيْ رِوَايَةٍ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৪৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মিনায় অবস্থানের দিনে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর নিকট হাজির হলেন। তখন তাঁর [আয়েশার] নিকট [আনসারীদের] দু'টি বালিকা বসে দফ বাজিয়ে গান গাইতেছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, বালিকাদ্বয় সেই গান গাইতেছিল, যে গান আনসারগণ বুআস যুদ্ধে [প্রেরণা ও যুদ্ধ উন্মাদনার জন্য] গেয়েছিল। তখন নবী করীম ﷺ নিজ কাপড়ে আবৃত হয়ে শুয়েছিলেন। এটা দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) বালিকাদ্বয়কে ধমক দিলেন। তখন নবী করীম ﷺ নিজ পবিত্র মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরালেন এবং বললেন, হে আবূ বকর! এদেরকে [তাদের কাজের উপর] ছেড়ে দাও। কারণ এটা ঈদের দিন। অপর এক বর্ণনায় এ কথা রয়েছে– হে আবূ বকর! প্রত্যেক জাতির জন্য আনন্দ উৎসব রয়েছে, এটা আমাদের আনন্দ উৎসবের দিন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حُكْمُ الْغِنَاءِ فِى الْاِسْلَامِ **ইসলামে গানের হুকুম :** আলোচ্য হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, গান গাওয়া এবং দফ্ বাজানো জায়েজ আছে। সুতরাং আসহাবে জাওয়াহের ও কোনো কোনো ইমাম একে মুবাহ্ মনে করেন, আবার কারো মতে এটা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ সম্পর্কে হাদীসের বাণী, সল্‌ফে সালেহীন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের মতামত পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ঈদ, বিবাহোৎসব, খৎনা ও অলিমার সময়ে লোকদের মাঝে জানাজানি ও প্রচারের নিয়তে 'দফ্' বাজানো মুবাহ। আর গান যদি হাম্‌দ-না'ত জাতীয় হয়, দীনের প্রশংসা, জিহাদী প্রেরণামূলক হয়, এক কথায় ইসলামি সঙ্গীত হয় তবে এমন গান গাওয়াও জায়েজ আছে। কিন্তু ঢালাওভাবে যে কোনো গান গাওয়া জায়েজ নেই। শুধুমাত্র হাসি-তামাশা ও চিত্তবিনোদনের নামে বর্তমান যুগে যে সব গান গাওয়া হচ্ছে এর অধিকাংশই অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী গান। সুতরাং এগুলো গাওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

উল্লিখিত হাদীসে যে গানের উল্লেখ রয়েছে তাতে অশ্লীলতার কিছুই ছিল না, একদিকে গায়িকাদ্বয় ছিল নাবালেগ-অল্পবয়স্কা মেয়ে, অপরদিকে তাদের গানের বিষয়বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যুদ্ধে তাদের সৈনিকদের বীরত্ব পূর্ণ কীর্তিগাঁথা শ্লোক। সুতরাং একে সরাসরি গানও বলা যায় না। এ জন্য মহানবী ﷺ এতে বাধা প্রদান করেননি। মোটকথা, যে গানের গায়ক বা গায়িকা অল্প বয়সের তথা নাবালেগ কচি ছেলে-মেয়ে হয় এবং তাতে ইসলামি ও জিহাদী প্রেরণা যোগায় সেই গান জায়েয হওয়ার মধ্যে কারো মতভেদ নেই।

أَقْوَالُ الْأَئِمَّةِ فِي الْغِنَاءِ وَالطَّبْلِ গান-বাদ্য সম্পর্কে ইমামদের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা ও ইরাকের ফিকহবিদ আলিমগণ বলেন, গান-বাদ্য হারাম। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, মাকরূহে তাহরীমী। হানাফীগণ বলেন, যে সমস্ত হাদীসে গান- বাদ্য মুবাহ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আল্লাহর কালাম وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ দ্বারা মনসুখ হয়ে গেছে। কেননা সমস্ত মুফাস্‌সিরীন বলেন, لَهْوَ الْحَدِيْثِ দ্বারা গান-বাদ্যকেই বুঝানো হয়েছে।

فَتْوٰى عَلَى الْغِنَاءِ وَالطَّبْلِ গান-বাদ্য সম্পর্কে ফকীহদের ফতোয়া : কাযী খান তার ফতওয়ার কিতাবে বলেছেন যে, গানের স্বর শোনা হারাম। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন اِسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ حَرَامٌ وَجُلُوْسُهُ فِسْقٌ وَاسْتِلْذَاذُهُ كُفْرٌ অর্থাৎ গান শোনা হারাম, সেই আড্ডা আসরে বসা ফাসেকী এবং তা হতে স্বাদ গ্রহণ করা বা বাহ বাহ দিয়ে উৎসাহিত করা কুফরি। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, যখন মহানবী ﷺ গানের স্বর-শব্দ শুনতেন তখন তিনি অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণদ্বয় বন্ধ করতেন। এরই প্রেক্ষিতে হিদায়ায় বর্ণিত আছে, এটাই গান হারাম হওয়ার দলিল। তাফসীরে আহমদীতে আছে, গান গাওয়া ও শোনা হারাম এবং তাতে স্বাদ গ্রহণ করা কুফরি। দুররে মুখতার, গায়াতুল আওতার ও মেয়াতে মাসায়েল ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, গান-বাদ্য মানুষের মনে 'নেফাকের' জন্ম দেয়, যেমন– পানি ঘাস-ফসলকে জন্ম দেয়। এরূপভাবে তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খাযেন, মাদারেক ইত্যাদি কিতাবে গান-বাদ্য হারাম হওয়ার পক্ষে অনেক দলিল এবং বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে আমাদের কথা হলো, আলোচ্য হাদীসটিকে কেন্দ্র করে অনেকে গান-বাদ্য জায়েজ হওয়ার দলিল করেন বিধায় এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উল্লেখ্য যে, হযরত আবূ বকর (রা.) এ জন্যেই বালিকাদের গান গাইতে বাধা দিয়েছিলেন যে, তিনি জানতেন, রাসূল ﷺ গান-বাদ্য পছন্দ করেন না। আর এখন তিনি ঘুমাচ্ছেন বিধায় বাধা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু হুজুর ﷺ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈদের দিন আর অন্য কোনো দিন সমান নয়। ঈদের দিন এরূপ লোকের পক্ষে এরূপ নির্দোষ গান এবং এরূপ সাদামাঠা বাজনা দূষণীয় নয়। হযরত আয়েশা (রা.) এ পার্থক্য জানতেন বলে বাধা দেন নি। মোটকথা, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, গান-বাদ্যে অভ্যস্ত নয় এরূপ বালক-বালিকা যদি ঈদ-উৎসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের আনন্দে কোনো নির্দোষ গান করে আর অন্যেরা তা উপভোগ করে তা দূষণীয় নয়। তবে গানবাদ্যকে ব্যবসায় পরিণত করা বা জাতিকে তাতে অভ্যস্ত করে তোলার অনুমতি এ হাদীস থেকে কখনো পাওয়া যায় না। বুখারীর অপর রেওয়ায়াতে এ হাদীসেরই শেষের দিকে আছে, وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ আর তারা গায়িকা ছিল না– অর্থাৎ, গানের সুর স্তর সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল না। বালিকাসুলভ মনের আনন্দে তারা যা তা করে একটি গান গাইতে ছিল।

بُعَاثُ-এর পরিচিতি : বু'আস মদীনা হতে আনুমানিক দুই মাইল দূরে একটি স্থানের নাম। কারো মতে এটা 'আওস' সম্প্রদায়ের একটি কিল্লা বা দুর্গের নাম। আবার কারো মতে এটা বনী জুরাইযার একটি বিশেষ জায়গার নাম, যেখানে তাদের অনেক মাল-সম্পদ ছিল। ইসলামের পূর্বে মদীনার বিশেষ শক্তিশালী 'আওস ও খায্‌রাজ' এই দুই গোত্রের মধ্যে সেখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ফলে তাদের উভয় গোত্রের মধ্যে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ১২০ [একশতবিশ] বছর পর্যন্ত শত্রুতা ও যুদ্ধ চলতে থাকে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও সেই পুরাতন শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এরই প্রেক্ষিতে কুরআনে নাজিল হয়, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ (الاية) এতে তারা পরস্পর যুদ্ধে নিজ দলের সৈন্যদের মধ্যে উদ্দীপনা ও বীরত্বসঞ্চার মূলক উত্তেজনা সৃষ্টি এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা ও দুর্নাম ছড়ানো কবিতা আবৃত করেছিল। অবশেষে সেই কবিতাগুলো তাদের প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। উক্ত ঈদের দিন বালিকাদ্বয় সেই দিনের আবৃত কবিতাগুলো আবৃত করার সময় হযরত আবূ বকর তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

وَعَنْ ١٣٤٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৪৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না; যতক্ষণ না তিনি কয়েকটি খেজুর খেতেন। তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন [অর্থাৎ তিনটি, পাঁচটি, সাতটি কিংবা নয়টি]। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে নিতেন। আর তা বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন এটা ঈদুল ফিতরের সুন্নত।

وَعَنْ ١٣٥٠ جَابِرٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৫০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حِكْمَةُ تَبْدِيْلِ الطَّرِيْقِ **রাস্তা পরিবর্তনের হেকমত :** রাসূল ﷺ ঈদগাহে যে রাস্তায় গমন করতেন সে রাস্তায় প্রত্যাবর্তন না করে অপর রাস্তায় আসতেন এরূপ করার পিছনে নিম্নলিখিত হেকমতসমূহ রয়েছে—

১. যাতে উভয় রাস্তা বা উভয় রাস্তার মাটি সাক্ষ্য দেয়।

২. অথবা, উভয় রাস্তার বাসিন্দাগণ জিন হোক বা মানুষ হোক তার সাক্ষী থাকে।

৩. রাসূল ﷺ-এর চলার কারণে রাস্তাটি যে মর্যাদা লাভ করল, এতে উভয় রাস্তাই মর্যাদার দিক থেকে সমান হলো।

৪. রাসূল ﷺ-এর ঈদগাহ তাঁর বাড়ি হতে ডান দিকে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমত নিজের চলার অভ্যাস মতো ডান দিকের রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন, নামাজ শেষ করে তিনি আবার ডান দিকের রাস্তায় ফিরে আসতেন। ফলে পূর্ববর্তী রাস্তা অর্থাৎ যে রাস্তায় এসেছেন তা তাঁর বাম দিকে থাকত।

৫. অথবা এক রাস্তায় গমন করে এবং অপর রাস্তায় এসে উভয় রাস্তায় মুসলমানদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন।

৬. অথবা জীবিত আত্মীয়-স্বজন, যারা উভয় রাস্তায় বসবাস করছেন, তাদের ঈদ উপলক্ষে সাক্ষাৎ দান করতেন এবং যারা মৃত কবরে শায়িত আছেন তাদের কবর জেয়ারত করতেন।

وَعَنْ ١٣٥١ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৫১. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক কুরবানির ঈদের দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিলেন এবং বললেন, আমরা আমাদের এই পবিত্র দিনে প্রথমে যা করব তা হলো আমাদের নামাজ। প্রথমে আমরা নামাজ পড়ব অতঃপর বাড়িতে ফিরে এসে কুরবানি করব। যে ব্যক্তি এরূপ করল সে আমার সুন্নত অবলম্বন করল। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামাজের পূর্বে পশু জবাই করল, নিশ্চয়ই তা গোশত খাওয়ার বকরি হবে, যা সে তার পরিবারের খাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি আগেভাগে জবাই করল। ফলে কুরবানির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٥٢ - جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৫২. **অনুবাদ :** হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে পশু জবাই করল, সে যেন [নামাজের পরে] এর স্থলে আর একটি পশু জবাই করে [কারণ তার প্রথম জবাই কুরবানি হয়নি]। আর যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়া পর্যন্ত জবাই করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে জবাই করে [কারণ তার এটা কুরবানি বলে গ্রাহ্য হবে]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কুরবানি করার নিয়ম হলো ঈদের নামাজের পরে, এর পূর্বে কুরবানি করা জায়েজ নয়।

وَعَنْ ١٣٥٣ - الْبَرَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهٗ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৫৩. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে জবাই করলে সে নিশ্চয়ই নিজের [খাওয়ার] জন্যই জবাই করল এবং যে নামাজের পরে জবাই করে তার কুরবানি সম্পন্ন হবে এবং সে মুসলমানদের নীতি পালন করল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির সময় নিয়ে ইমামদের মতভেদ : এই মতের উপর সকল ইমাম একমত যে, 'ইয়াওমুন নাহর' অর্থাৎ দশ তারিখের সুবহে সাদেকের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করা জায়েয নয়। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সূর্য যখন এক তীর পরিমাণ উপরে উঠে তখন কুরবানির ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু' রাকাত নামাজ ও সংক্ষিপ্ত দু'টি খোতবা দান করা পরিমাণ সময় অতিক্রম হয়ে গেলে কুরবানি করতে পারে, চাই এ সময়ের মধ্যে ইমাম নামাজ আদায় করুন বা না করুন। এ পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি জবাই করে তবে কুরবানি হবে না। চাই সে শহরবাসী হোক কিংবা মফঃস্বলের অধিবাসী হোক। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, কুরবানি সহীহ হওয়ার জন্য ইমামের নামাজ পড়া ও খোতবা প্রদান সমাপ্ত করা শর্ত। এর পূর্বে জবাই করলে কুরবানি আদায় হবে না। কেননা, হাদীসের মধ্যে مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এ হাদীস ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে প্রমাণিত হয়।

وَعَنْ ١٣٥٤ - ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৫৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে জবাই করতেন এবং নহর করতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** কণ্ঠ ও শ্বাস নালীর মধ্যস্থলে কাটাকে 'জবাই বলে। এটা গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিতে করতে হয়। দুই হাতের মধ্যস্থলে সিনায় ছুরি মারাকে 'নহর' বলে। উটকে নহর করতে হয়। অবশ্য উটকে জবাই করাও জায়েজ আছে। মদীনার ঈদগাহ হুজুর ﷺ-এর হুজরা শরীফের অতি নিকটে ছিল বিধায় তিনি সেখানে কুরবানি করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٥٥ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَبْدَلَكُمُ اللّٰهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

১৩৫৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মদীনায় আগমন করলেন, তখন তাদের অর্থাৎ মদীনাবাসীদের এমন দু'টি দিন নির্ধারিত ছিল, যে দিনগুলোতে তারা খেলাধুলা ও রং-তামাশা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কিরূপ? সাহাবীগণ আরজ করলেন, আমরা ইসলাম পূর্ব জাহেলিয়াত যুগে এ দুই দিনে খেলাধুলা ও রং-তামাশা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঐ দিনদ্বয়ের পরিবর্তে এর চাইতে ভাল দু'টি দিন দান করেছেন- ঈদুল আজহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। সুতরাং তোমরা জাহেলিয়াত যুগের সে দুই দিনকে ত্যাগ করে এ দুই দিনকে পালন কর। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** এতে বুঝা গেল যে, জাহিলিয়াত যুগের কোনো জাহেলী নিদর্শনকে রক্ষা করা এবং কাফির-মুশরিকদের উৎসবে-পার্বনে যোগদান করা মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। আর মুসলমানদের কোনো উৎসবই আল্লাহর সম্বরণ ছাড়া হওয়া উচিত নয়। তাই মুসলমানদের ঈদের দিন ইবাদতের দিনও বটে।

١٣٥٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْاَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৩৫৬. অনুবাদ : হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন নামাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি কিছু খেতেন। আর ঈদুল আযহার দিন কিছুই খেতেন না যে পর্যন্ত ঈদের নামাজ আদায় করতেন। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির ঈদে সকাল বেলায় কিছু না খেয়ে থাকা এবং নামাজের পর সকাল সকাল কুরবানি করে আল্লাহর যেয়াফত অর্থাৎ কুরবানির গোশত দ্বারা খাদ্য গ্রহণ করা ঈদুল আযহার সুন্নত এবং আল্লাহর তাযীমের নিদর্শন।

١٣٥٧ - وَعَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْاٰخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৩৫৭. অনুবাদ : হযরত কাসীর ইবনে আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ হতে, তিনি তাঁর পিতামহ [আমর ইবনে আওফ মুযানী] হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ উভয় ঈদের নামাজেই প্রথম রাকাতে কেরাত পাঠের পূর্বে সাতবার তাকবীর বলেছেন এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী রাকাতে কেরাত পাঠের পূর্বে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন। -[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদের নামাজের তাকবীর সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ঈদের নামাজে মোট কয় তাকবীর বলতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে, তা নিম্নরূপ–

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَاِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, ইসহাক, মদীনার সাত ফকীহ, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, যুহরী, হযরত আয়েশা (রা.), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), আবূ আইয়্যূব (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ওমর (রা.) প্রমুখের মতে ঈদের দু' রাকাতের প্রথম রাকাতে কেরাতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতে হবে। তাঁরা আলোচ্য হাদীসটিসহ নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ দলিল হিসেবে পেশ করেন।

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

(٢) عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اٰبَائِهِمْ عَنْ اَجْدَادِهِمْ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبَّرَ فِى الْاُوْلٰى سَبْعًا وَفِى الثَّانِىْ خَمْسًا .

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.), সুফইয়ান সওরী (র.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) আবূ মূসা আশআরী (রা.) প্রমুখের মতে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর কেরাত পাঠের পূর্বে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে কেরাতের পরে তিন তাকবীর অর্থাৎ দুই রাকাতে ছয় তাকবীর বলতে হবে। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ–

(١) حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَاَلَ اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . اَلْحَدِيْثَ . (اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ)

(٢) اَخْرَجَ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِسَنَدِهٖ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ شَهِدَ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ اَنَّهُ اَرْسَلَ اِلٰى اَرْبَعَةِ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَسَاَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدِ فَقَالُوْا ثَمَانِ تَكْبِيْرَاتٍ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِابْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ صَدَقَ اَلْحَدِيْثَ .

(٣) عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقَالَ لَا تَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهٖ وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ . (رَوَاهُ الطَّحَاوِىُّ)

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসদ্বয় ضعيف যা দলিল যোগ্য নয়, অথবা পরবর্তী হাদীস দ্বারা সেগুলো মনসূখ হয়ে গেছে।

١٣٥٨ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَبَّرُوْا فِى الْعِيْدَيْنِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَجَهَرُوْا بِالْقِرَاءَةِ . (رَوَاهُ الشَّافِعِىُّ)

১৩৫৮. অনুবাদ : হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক ইবনে মুহাম্মদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম করে বলেন যে, নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.) দুই ঈদের নামাজে এবং ইস্তিস্কার নামাজে সাতবার ও পাঁচবার তাক্বীর বলেছেন, খোতবার পূর্বে নামাজ পড়েছেন এবং কেরাত সশব্দে পাঠ করেছেন। –[শাফেয়ী]

وَعَنْ ١٣٥٩ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مُوْسَى وَحُذَيْفَةَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

১৩৫৯. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল আস্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আজহায় ও ঈদুল ফিতরে কিভাবে [কতবার] তাকবীর বলতেন? তখন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বললেন, তিনি চারবার তাকবীর বলতেন, যেরূপ তিনি জানাযার তাকবীর বলতেন। এটা শুনে হযরত হুযাইফা (রা.) এর সমর্থন করে বললেন যে, তিনি সত্য কথা বলেছেন। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** 'চার তাকবীরের' মধ্যে প্রথম রাকাতের তাকবীরে তাহরীমা এবং দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরে রুকুও শামিল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতি রাকাতে তিনটি করে অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হবে। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক গ্রন্থে সহীহ সনদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী ﷺ দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত পাঠের পরই তাকবীর বলেছেন। মোট কথা, হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ বিভিন্ন সময় ঈদের নামাজে বিভিন্ন সংখ্যায় তাকবীর বলেছেন। এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র.) চার তাকবীর বিশিষ্ট হাদীস এবং অপর তিন ইমাম সাত ও পাঁচ তাকবীর বিশিষ্ট হাদীসকে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকে নিজেদের অভিমতের সপক্ষে দলিলও পেশ করেছেন।

وَعَنْ ١٣٦٠ الْبَرَاءِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

১৩৬০. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে ঈদের দিনে একটি ধনুক প্রদান করা হলো রাসূল এর উপর ভর দিয়ে খোতবা দান করলেন। −[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ١٣٦١ عَطَاءٍ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلٰى عَنَزَتِهٖ اِعْتِمَادًا . (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

১৩৬১. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আতা (র.) মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু ﷺ যখন খোতবা দান করতেন, তখন নিজের নেযা বা বল্লমতুল্য লাঠির উপর ভর দিতেন। −[ইমাম শাফেয়ী]

وَعَنْ ١٣٦٢ جَابِرٍ (رض) قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَامَ

১৩৬২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন নবী করীম ﷺ-এর সাথে নামাজে হাজির ছিলাম। দেখলাম তিনি আযান ও একামত ছাড়া খোতবা প্রদানের আগে প্রথমে নামাজ পড়লেন এবং যখন নামাজ সমাপ্ত করলেন, তিনি হযরত বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর লোকদেরকে উপদেশ

مُتَّكِئًا عَلٰى بِلَالٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَ وَعَظَ النَّاسَ وَ ذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلٰى طَاعَتِهٖ وَمَضٰى اِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهٗ بِلَالٌ فَاَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَ وَعَظَهُنَّ وَ ذَكَّرَهُنَّ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

দিলেন, [পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের কথা] স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগত থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দান করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে গেলেন তখন রাসূল ﷺ -এর সাথে ছিলেন হযরত বেলাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ও তা'আলাকে ভয় করতে আদেশ [পরামর্শ] দিলেন, কিছু উপদেশ দিলেন এবং [পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের কথা] স্মরণ করিয়ে দিলেন। -[নাসায়ী]

وَعَنْ ١٣٦٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ رَجَعَ فِىْ غَيْرِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

১৩৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন ঈদের দিন এক রাস্তায় [ঈদগাহের দিকে] বের হতেন তখন অপর রাস্তায় প্রত্যাবর্তন করতেন। -[তিরমিযী ও দারেমী]

وَعَنْهُ ١٣٦٤ اَنَّهٗ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৬৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ঈদের দিন তাদেরকে বৃষ্টিতে পেল। তখন নবী করীম ﷺ তাদেরকে মসজিদের মধ্যে ঈদের নামাজ পড়ালেন।-[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঈদের নামাজ মসজিদে পড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম শাফেয়ী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ সহ কতিপয় ইমামগণ বলেন, সর্বাবস্থায় ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা উত্তম। যেমন- অন্যান্য নামাজ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহে নামাজ মসজিদে পড়াকে উত্তম বলা হয়েছে। কাজেই ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা উত্তম হবে না কেন?

কিন্তু হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব اَلدُّرُّ الْمُخْتَارُ -এ উল্লেখ রয়েছে যে, ঈদের নামাজ খোলা মাঠে-ময়দানে আদায় করা রাসূল ﷺ -এর সুন্নত।

এরূপভাবে ইমাম মালেক (র.), রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আওলাদগণ এবং মদীনাবাসীরা ঈদের নামাজ ময়দানে পড়াকে উত্তম মনে করেন। কারণ মহানবী ﷺ কোনো ওজর ব্যতীত ঈদের নামাজ ময়দান ছাড়া আদায় করতেন না। হাদীসে এরই প্রমাণ পওয়া যায়। ইবনে মালেক হতে বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ ঈদের নামাজ মুক্ত ময়দানে আদায় করতেন তবে যদি বৃষ্টি আসত তখন মসজিদে আদায় করতেন। তাই হানাফীগণ বলেন, প্রত্যেক শহরে নগরে বা উপকণ্ঠে সর্বত্র ঈদের নামাজ ময়দানে পড়াই সুন্নত। বিনা ওজরে ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা মাকরূহ। আল্লামা শাওকানী (র.) বলেন, বিভিন্ন হাদীস হতে বুঝা যায় বৃষ্টি-বাদলের সময় ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা মাকরূহ নয়।

তবে মক্কাতে ঈদের নামাজ মাসজিদুল হারামে পড়া হতো। মহানবী ﷺ একে পরিবর্তন করেননি। এমনকি সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের যুগেও সম্মানিত ব্যক্তিরা এর বরখেলাফ করেননি। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী ঈদের নামাজকে অন্যান্য নামাজের সাথে তুলনা করে মসজিদে আদায় করার যে ধারণা বা কিয়াস করেছেন তা স্পষ্ট হাদীসের খেলাফ হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْ ١٣٦٥ أَبِى الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ إِلٰى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ عَجِّلِ الْأَضْحٰى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَ ذَكِّرِ النَّاسَ ـ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

১৩৬৫. অনুবাদ : হযরত আবুল হুয়াইরিছ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবনে হাযম (রা.)-এর নিকট লেখলেন যে, তখন তিনি নজরানের কর্মকর্তা ছিলেন, ঈদুল আজহার নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ো এবং ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরি করে পড়ো আর লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করো। -[শাফেয়ী]

وَعَنْ ١٣٦٦ أَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَكْبًا جَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوْا وَإِذَا أَصْبَحُوْا أَنْ يَغْدُوْا إِلٰى مُصَلَّاهُمْ ـ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৩৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমাইর ইবনে আনাস তাঁর এক চাচা হতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, একবার একদল আরোহী নবী করীম ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং এ বলে সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁরা গতকাল [শাওয়ালের] নতুন চাঁদ দেখেছেন। তখন নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে আদেশ করলেন যেন তাঁরা রোজা ভেঙ্গে ফেলে এবং আগামী দিন সকালে তাঁরা ঈদগাহের দিকে [ঈদের নামাজের জন্য] আসে। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٦٧ ابْنِ جُرَيْجٍ (رحـ) قَالَ أَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحٰى ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِىْ عَطَاءَ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذٰلِكَ فَأَخْبَرَنِىْ قَالَ أَخْبَرَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلٰوةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ لَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৬৭. অনুবাদ : [তাবে তাবেয়ী] হযরত ইবনে জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [তাবেয়ী] হযরত আতা (র.) আমার কাছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় আযান দেওয়া হতো না। ইবনে জুরাইজ (র.) বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে [অর্থাৎ আতাকে] এ বিষয়ে কিছুদিন পরে আবার জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন যে, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) আমাকে বলেছেন যে, ঈদুল ফিতরের জন্য আযান, একামত বা ডাকাডাকি বা অন্য কিছু নেই, যখন ইমাম নামাজের জন্য বের হয়, এমনকি নামাজের পরে খোতবার জন্য বের হয়। মোটকথা সে দিন এলান ও একামত কিছুই নেই। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٦٨ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلٰوةِ فَإِذَا صَلّٰى صَلٰوتَهٗ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِىْ مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهٗ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهٗ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذٰلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا وَكَانَ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا تَصَدَّقُوْا وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ كَذٰلِكَ حَتّٰى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتّٰى أَتَيْنَا الْمُصَلّٰى فَإِذَا كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنٰى مِنْبَرًا مِنْ طِيْنٍ وَلَبِنٍ فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِىْ يَدَهٗ كَأَنَّهٗ يَجُرُّنِىْ نَحْوَ الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهٗ نَحْوَ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الْاِبْتِدَاءُ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلَّا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَأْتُوْنَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلٰثَ مِرَارٍ ثُمَّ انْصَرَفَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আজহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন [ঈদগাহের দিকে] বের হতেন, প্রথমে নামাজ পড়তেন। যখন নামাজ সম্পন্ন করে উঠে দাঁড়াতেন এবং জনতার দিকে [খোতবার উদ্দেশ্যে] ফিরতেন আর জনতা নিজ নিজ নামাজের স্থানে বসা থাকত। যদি তাঁর কোনো স্থানে সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন থাকত, লোকদেরকে তা বলতেন, অথবা এটা ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে তাও আদেশ করতেন। খোতবাতে তিনি এটাও বলতেন যে, সদকা করো! খয়রাত করো!! দান করো!!! আর দানকারীদের অধিকাংশই হতো মহিলা, অতঃপর তিনি [নিজ বাড়িতে] প্রত্যাবর্তন করতেন।

নিয়ম-পদ্ধতি এভাবেই চলে আসছিল যাবৎ না [খলিফা হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে] মারওয়ান ইবনে হাকাম [মদীনার] প্রশাসক হন। এক ঈদে আমি ও মারওয়ান হাত ধরাধরি করে [ঈদগাহের দিকে] বের হলাম। আমরা যখন ঈদগাহে পৌঁছলাম, দেখলাম কাছীর ইবনে সাল্‌ত কাদামাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা একটি মিম্বার তৈরি করে রেখেছেন। অতঃপর এমন সময় মারওয়ান আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল যেন সে আমাকে মিম্বারের দিকে টানছে [খোতবা দানের জন্য] আমি তাকে টানছিলাম নামাজের জন্য। আমি যখন তার এই অবস্থা দেখলাম [অর্থাৎ সে নামাজের পূর্বে খোতবা পাঠ করতে চাচ্ছে] আমি বললাম, ঈদের নামাজ প্রথমে পড়ার কথা কোথায় গেল? তখন সে বলল, হে আবূ সাঈদ! আপনি যা জানেন তা এখন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। আমি বললাম, কখনও না! সেই আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি যা জানি তা হতে উত্তম কিছু তোমরা কখনও করতে পারবে না। [পরবর্তী রাবী বলেন] হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) এরূপ তিনবার বললেন এবং [ঈদগাহ হতে] চলে আসলেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সর্বপ্রথম কে নামাজের পূর্বে খোতবা শুরু করে : এ কথা স্বীকৃত যে, উমাইয়্যা শাসকদের যুগে সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবনে হাকামই ঈদের নামাজের খোতবা নামাজের শুরুতে প্রদান করেছেন, সম্ভবত নামাজের পর জনগণ তা শুনতে আগ্রহী হতো না। এ জন্যই সে এরূপ করতো, যা সুন্নতের খেলাফ হওয়ার কারণে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) এর প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি তিনি রাজ শক্তির পরোয়াও করেননি।

بَابٌ فِى الْأُضْحِيَةِ

পরিচ্ছেদ : কুরবানি

أُضْحِيَةٌ-এর সংজ্ঞা : উল্লেখ্য যে. أُضْحِيَةٌ শব্দটি চারভাবে পড়া যায়, এর প্রথম অক্ষর পেশ অথবা যের যোগে। যেমন- أُضْحِيَةٌ ও إِضْحِيَةٌ-এর বহুবচন হলো أَضَاحِيْ তৃতীয়ত ضَحِيَةٌ তখন এর বহুবচন হবে ضَحَايَا যেমন عَطِيَةٌ-এর বহুবচন عَطَايَا আর চতুর্থত أَضْحَاةٌ-এর বহুবচন أَضْحٰى যেমন- أَرْطَاةٌ-এর বহুবচন أَرْطٰى

এর শাব্দিক অর্থ হলো- পশু কুরবানি করা। কেননা ضُحٰى দুপুর-পূর্বকালীন সময় এ কুরবানি করা হয়। আর শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রাণী, নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জবাই করাকে أُضْحِيَةٌ বলা হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٦٩ - عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ ضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهٖ وَسَمّٰى وَكَبَّرَ قَالَ رَأَيْتُهٗ وَاضِعًا قَدَمَهٗ عَلٰى صِفَاحِهِمَا وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৬৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানির ঈদে ধূসর বর্ণের শিংবিশিষ্ট দু'টি দুম্বা নিজ হাতে কুরবানি করলেন। [জবাই করার সময়] বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বললেন। রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তিনি তাঁর পা [জবাই করার সময়] দুম্বাদ্বয়ের পাঁজরের উপর রেখেছেন এবং "বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" বলছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীস হতে চারটি বিষয় জানা যায়-

১. পশু নিজের হাতে কুরবানি করাই উত্তম।

২. কোনো লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে জবাই করলে নিজের পা দ্বারা চেপে ধরা জায়েজ।

৩. কুরবানির পশুকে জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' মুখে বলা সুন্নত। যদিও তা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কুরবানি করা হয়।

৪. দুম্বা ভেড়া কুরবানি বা 'দম' ইত্যাদির ক্ষেত্রে বকরির সমতুল্য। বকরি দ্বারা যা আদায় করা যায় দুম্বা ও ভেড়া দ্বারাও তা আদায় হয়।

وَعَنْ ١٣٧٠ عَائِشَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِىْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِىْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ قَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيْهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৭০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি দুম্বা আনতে আদেশ করলেন যার শিং আছে, যা কালোতে হাঁটে অর্থাৎ যার পা কালো, কালোতে বসে অর্থাৎ যার পেট ও পাঁজর কালো, কালোতে দেখে অর্থাৎ যার চোখ কালো। সুতরাং কুরবানির জন্য এরূপ একটি দুম্বা আনা হলো। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! ছুরিটা দাও। তারপর বললেন, পাথরের উপরে একে ধারাল কর। তখন আমি তাই করলাম। অতঃপর তিনি তা নিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরলেন এবং কাত করে শোয়ালেন। অতঃপর একে জবাই করলেন, তারপর বললেন- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি এটা মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পরিবার-পরিজন ও মুহাম্মদের উম্মতের পক্ষ হতে গ্রহণ কর। অতঃপর তা দ্বারা তিনি সকলকে খানা খাওয়ালেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٧١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوْا اِلَّا مُسِنَّةً اِلَّا اَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৩৭১. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা 'মুসিন্না' ব্যতীত জবাই করো না। কিন্তু যদি মুসিন্না যোগাড় করতে অসুবিধা হয়, তবে মেষের মধ্যে 'জাযআ' গুলো জবাই করবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُسِنَّةُ-এর পরিচয় : اَلْمُسِنَّةُ বলতে সে সব জন্তুকে বুঝায়, যেগুলো সানা বয়সে পৌছেছে। এরূপ জন্তুর দ্বারা কুরবানি জায়েজ, তবে এর প্রত্যেক জাতের মুসিন্নার বয়স ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- গরুর মুসিন্না হলো দু' বছর পূর্ণ হয়ে তিন বৎসরে পড়েছে আর বকরি এবং মেষের মুসিন্না হলো যেগুলো এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়েছে, আর উটের মুসিন্না হলো পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বছরে পড়েছে।

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ تَعْرِيْفِ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّانِ মেষের جَذَعَة সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : শরহে সুন্নায় আছে যে, উট, গরু বা ছাগলের মধ্যে সুসিন্না হয়নি এরূপ প্রাণী দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কুরবানি জায়েজ নয়; কিন্তু মেষের জাযআর ব্যাপারে মতভেদ এই যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও যুহরী বলেছেন, 'জাযআ' বয়সের মেষ ব্যতীত যদি অন্য কোনো জন্তু পাওয়া যায়, তবে মেষের জাযআ দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই। তাঁরা উক্ত হাদীস অর্থাৎ হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস অনুসারেই মত প্রকাশ করেন। কারণ হাদীসে মুসিন্না না পাওয়া গেলেই মাত্র মেষের জাযআ দ্বারা কুরবানি করার হুকুম দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ইমাম নব্বী (র.) বলেন যে, সকল ইমামের মাযহাব এই যে, মেষের জাযআ সব সময়ের জন্যই যথেষ্ট- অন্য জন্তু পাওয়া যাক বা না যাক। কেননা হযরত মুজাশে' ইবনে সুলাইম (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম ﷺ বলতেন- 'জায'আ' দ্বারা সেই কাজই সম্পন্ন হয়, যা মুসিন্না দ্বারা সম্পন্ন হয় -[আবূ দাউদ]। আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মেষের জায'আ সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয়েছে, এতে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসের

জবাবে বলা হয়েছে যে, এ হাদীসে মোস্তাহাব বা উত্তমতার জন্য মুসিন্নার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য এটাই উত্তম যে, তোমরা মুসিন্না জবাই করবে। তবে হ্যাঁ, যদি মুসিন্না না পাও তবে মেষের জাযআই যথেষ্ট। এতে মেষের কথা প্রকাশ্যে নিষেধ করা হয়নি। যাতে মুসিন্না পাওয়া গেলেই মেষের জাযআ দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে না। কিন্তু কেউ কেউ এই শর্তারোপ করেছেন যে, ছয় মাস বয়সের হলেও মেষটি এতটুকু বলিষ্ঠ হতে হবে যে, দেখতে একে এক বছরের মতোই দেখায়।

وَعَنْ ١٣٧٢ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهٖ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهٗ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهٖ اَنْتَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَنِيْ جَذَعٌ قَالَ ضَحِّ بِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৭২. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানির পশু হিসাবে বণ্টনের জন্য তাকে [উকবা-কে] কতকগুলো ছাগল-ভেড়া দিলেন। অতঃপর [বণ্টন শেষে] একটি এক বৎসরের বাচ্চা বাকি থাকল। তখন তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানি কর। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, [উকবাহ বলেন,] আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাগে তো মাত্র একটি 'জায্‌আ' অর্থাৎ ছয় মাসের বাচ্চা পড়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এটা দ্বারাই কুরবানি করো। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْعَتُوْدِ -এর **পরিচয়** : اَلْعَتُوْدُ 'আল-আতুদ' অর্থ- বকরির এক বছর বয়সের বাচ্চা। আবার কারো মতে বছরের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও একে 'আতুদ' বলা হয়, যদিও পূর্ণ এক বৎসর বয়স নাও হয়। আমাদের নিকট সাধারণত এমন বকরি দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয়। তবে এখানে যে, বছরের অধিকাংশ সময় অতিক্রম না হওয়ার পরও উতবাকে কুরবানি করার অনুমতি প্রদান করেছেন, এটা তার জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্বরূপ ছিল। যেমন এক হাদীসে আবূ বুরদাকে অনুমতি দিয়েছেন। فِىْ جَذَعِ الْمَعْزِ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزَاُ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ

وَعَنْ ١٣٧٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৩৭৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ ঈদগাহেই জবাই ও নহর উভয়টি করতেন।

وَعَنْ ١٣٧٤ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْدَاوٗدَ وَاللَّفْظُ لَهٗ)

১৩৭৪. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন- গরু বা গাভী সাত জনের পক্ষ হতে এবং উট সাত জনের পক্ষ হতে কুরবানির জন্য যথেষ্ট। -[মুসলিম ও আবূ দাউদ। তবে হাদীসটির উল্লিখিত পাঠ আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।]

وَعَنْ ١٣٧٥ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَ اَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهٖ وَ بَشَرِهٖ شَيْئًا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَا

১৩৭৫. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ তারিখ শুরু হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা করে, সে যেন নিজের চুল বা শরীরের কোনো অংশ স্পর্শ না করে। অপর

يَـأْخُذَنَّ شَعْـرًا وَلَا يُـقْلِمَنَّ ظُفْـرًا وَفِـىْ رِوَايَـةٍ مَنْ رَأى هِلَالَ ذِى الْحِـجَّةِ وَأَرَادَ اَنْ يُّضَحِّىَ فَـلَا يَـأْخُذْ مِـنْ شَعْـرِهٖ وَلَا مِـنْ اَظْفَـارِهٖ - (رَوَاهُ مُسْـلِمٌ)

এক বর্ণনায় আছে যে, সে যেন চুল না কাটে এবং নখ না কাটে। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি যিলহজের নতুন চাঁদ দেখে এবং কুরবানি করার ইচ্ছা করে, সে যেন নিজের চুল না ছাঁটায় এবং নখসমূহ না কাটে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِى الْاُضْحِيَّةِ **কুরবানির ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ** : প্রকাশ্য হাদীসের শব্দ وَاَرَادَ بَعْضُكُمْ اَنْ يُّضَحِّىَ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরবানি করা বা না করার ব্যাপার ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, শরিয়তের পক্ষ হতে কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। এতদসত্ত্বেও ইমাম মালেক, আহমদ, শাফেয়ী ও হানাফীদের মধ্য হতে সাহেবাইন বলেন, কুরবানি সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সামর্থ্যবান মুকিম নেসাবের মালিকের উপর কুরবানি করা ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার দলিল নিম্নরূপ। যেমন–

১. এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না ঘেঁষে'। কোনো সুন্নত তরকজনিত কাজের জন্য এত কঠোর নির্দেশ হতে পারে না।

২. সালাতুল ঈদাইনের অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করে তাকে পুনরায় কুরবানি করতে বলা হয়েছে'। যদি কুরবানি বাধ্যতামূলক না হতো তবে এ ধরনের নির্দেশ বাণী থাকত না।

৩. এ ছাড়া কুরবানির আদেশ করে মহান আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানি ওয়াজিব।

৪. মহানবী ﷺ মদীনায় অবস্থানকালীন দশ বছর সময়ের মধ্যে প্রতি বছরই কুরবানি করেছেন, কখনও তরক করেননি। মোটকথা, কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে হাদীস ছাড়া কুরআন ও ইজমা ইত্যাদিতে অনেক প্রমাণই বিদ্যমান রয়েছে। আর যারা اَرَادَ بَعْضُكُمْ দ্বারা ওয়াজিব নয়; বরং ইচ্ছাধীন ব্যাপার বলে ধারণা করেছেন, এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে اِرَادَةٌ ইরাদা দ্বারা স্বাধীন এখতিয়ার নয়, বরং অভিপ্রায় ও চেষ্টা বুঝানো হয়েছে। কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানি ওয়াজিব।

وَعَنْ ١٣٧٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْـهِـنَّ اَحَبُّ اِلَـى اللّٰـهِ مِـنْ هٰـذِهِ الْاَيَّامِ الْـعَشْرِ قَالُـوْا يَا رَسُـوْلَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِـىْ سَبِيْـلِ الـلّٰـهِ قَالَ وَلَا الْـجِـهَـادُ فِـىْ سَبِيْـلِ اللّٰـهِ اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَـفْسِهٖ وَمَالِهٖ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَـىْءٍ - (رَوَاهُ الْـبُخَارِىُّ)

১৩৭৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই যাতে কোনো উত্তম কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দশদিন অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয় কি? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে [আল্লাহর পথে জিহাদে] বের হয়েছে। আর এর কিছু নিয়ে ফিরেনি [অর্থাৎ নিজে শহীদ হয়েছে এবং মাল কুরবানি করেছে তার কথা ভিন্ন। তার আমল এ দশ দিনের আমলের চেয়ে উত্তম বটে।]। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ الْعَشْرِ -এর ব্যাখ্যা : এর দ্বারা কোন্ মাসের কোন দশ দিন বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা জুলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো মতে এর দ্বারা রমজানের শেষ দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে। আবার এর উত্তমতার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন, জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিন উত্তম। কেননা এর মধ্যে আরাফার দিন রয়েছে। কারো মতে রমজানের শেষ দশ রাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর মাঝেই রয়েছে লাইলাতুল কদরের মতো মহামহিমান্বিত রাত। এর সমাধানে বলা যায় যে, দিবসের উত্তমতার প্রেক্ষিতে বৎসরের মধ্যে আরাফার দিন উত্তম এবং রাতের উত্তমতার দিক দিয়ে কদরের রাত উত্তম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٧٧ - عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْئَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

১৩৭৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক কুরবানির দিনে দু'টি শিং বিশিষ্ট ধূসর রংয়ের খাসী দুম্বা জবাই করলেন। যখন তিনি দুম্বাদ্বয়কে কেবলামুখী করলেন, তখন তিনি বললেন, اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ .... অর্থাৎ "আমি আমার মুখমণ্ডলকে সেই সত্তার দিকে ফিরালাম যিনি আকাশসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন সকল দিক হতে বিমুখ হয়ে ও নিজেকে হযরত ইবরাহীম দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই। উপরন্তু আমার নামাজ, আমার কুরবানি আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে; যিনি দু' জাহানের প্রতিপালক। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি এরই জন্য আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। হে আল্লাহ! এটা তোমারই নিকট হতে প্রাপ্ত, তোমারই জন্য উৎসর্গীকৃত, [এটা গ্রহণ কর] মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মতগণের পক্ষ হতে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার'। অতঃপর তিনি এটা জবাই করলেন। −[আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَحْمَدَ وَاَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ ذَبَحَ بِيَدِهٖ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَا يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِيْ .

আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ নিজের হাতে জবাই করলেন এবং বললেন, অর্থাৎ বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতগণের মধ্যে যারা কুরবানি করতে পারেনি, তাদের পক্ষ হতে গ্রহণ কর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَيُّ شَرِيْعَةٍ اِتَّبَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ নবুয়তের পূর্বে নবী করীম ﷺ কোন ধর্মের উপর ছিলেন : আমাদের মহানবী ﷺ নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে কোন ধর্মে থেকে ইবাদত করেছেন? এ ব্যপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর শরিয়তের উপর ছিলেন। কারো মতে হযরত মূসার দীনে, আবার কেউ বলেন, হযরত ঈসার দীনের উপর ছিলেন। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, হুজুর ﷺ সাবেক কোনো দীন-শরিয়তের অনুগত ছিলেন না; বরং সরাসরি একত্ববাদ ও আল্লাহর উপরে ঈমান রেখেছেন। জীবনে কোনোদিন মূর্তিপূজা করেননি। আর তিনি কী ধরনের ইবাদত করতেন তা কোনো মানুষের অবগতির বহির্ভূত। ইবনে বোরহান বলেছেন, হুজুর ﷺ-এর ঈমান ও ইবাদত প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যান্য মু'জিযার ন্যায় একে গোপন রেখেছেন। সুতরাং নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি ছিলেন ওলী, চল্লিশ বছর পর হয়েছেন নবী। সূরায়ে মুদ্দাসসির নাজেল হওয়ার পর হয়েছেন 'রাসূল'। শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এজাজ আলী (র.) বলেছেন, তিনি দীনে ফিতরাতের উপর থেকে দীনে ইবরাহীমের অনুসারী ছিলেন। আর সে দীন মনসুখ বা রহিতও হয়নি। কেননা হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী। ইবরাহীমের পুত্র তথা ইসমাঈলের দীনের বা শরিয়তের নবী ছিলেন না। কাজেই বনী ইসরাইলের নবীদের দীন রহিত হয়ে গেলেও ইসমাঈলের বা ইবরাহীমের দীন রহিত বা মনসুখ হয়নি। সুতরাং মহানবী ﷺ মিল্লাতে ইবরাহীমের উপর থেকে চল্লিশ বছর ইবাদত করলে কোনো মনসুখ দীনের উপর আমল করার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

١٣٧٨ - وَعَنْ حَنَشٍ (رحـ) قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هٰذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيَ عَنْهُ فَاَنَا اُضَحِّيْ عَنْهُ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

১৩৭৮. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত হানাশ (র.) বলেন, একবার আমি হযরত আলী (রা.)-কে দু'টি দুম্বা কুরবানি করতে দেখলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? [অর্থাৎ দু'টি কেন?] আপনার জন্য তো একটিই যথেষ্ট? তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তাঁর পক্ষ হতে কুরবানি করি। সুতরাং আমি তাঁর পক্ষ হতে [একটি] কুরবানি করছি। –[আবূ দাউদ। আর তিরমিযীও এরূপ বর্ণনা করেছেন।]

١٣٧٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ وَاَنْ لَا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ اِلٰى قَوْلِهٖ وَالْاُذُنَ)

১৩৭৯. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন আমরা [কুরবানির পশুর] চোখ ও কান ভালোভাবে দেখে নিই [যেন তাতে কোনো ত্রুটি না থাকে]। আমরা যেন জবাই না করি এমন পশু যার কানের অগ্রভাগ কাটা, অথবা পিছন দিক হতে কাটা এবং এমন পশুও না, যার কান দৈর্ঘ্যে চিরে গেছে অথবা গোলাকার ছিদ্র হয়ে গেছে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্] কিন্তু ইবনে মাজাহ্ তাঁর বর্ণনা ওয়াল উযন অর্থাৎ "কান দেখে নিই" পর্যন্ত শেষ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُقَابَلَةٌ مُدَابَرَةٌ شَرْقَاءُ، وَخَرْقَاءُ -এর অর্থ :

مُقَابَلَةٌ : এটা ঐ পশুকে বলা হয় যার কানের অগ্রভাগের কিছু অংশ কাটা গেছে এবং অবশিষ্টাংশ ঝুলে রয়েছে।

مُدَابَرَةٌ : যে জন্তুর কানের পশ্চাৎভাগ কিছুটা কাটা গেছে আর অবশিষ্টাংশ লটকে রয়েছে।

شَرْقَاءُ : এটি شَرْقٌ হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ দ্বিখণ্ডিত আর যে জন্তুর কান দৈর্ঘ্যে কেটে গেছে তাকে বলে।

خَرْقَاءُ : যে জন্তুর কান আড়াআড়িভাবে কাটা গেছে অথবা বৃত্তাকারে ছিদ্র হয়েছে তাকে বলে।

কান কাটার পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : কি পরিমাণ কান কাটা গেলে তার দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয় এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এমন ধরনের বকরি দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই, যার কানের কিছু অংশ কাটা গেছে। এমনকি সামান্য কাটাও জায়েজ হবে না। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়েছে, মহানবী ﷺ এমন বকরি বা জন্তু দ্বারা কুরবানি করতে নিষেধ করছেন। যার কানের অগ্রভাগ কিংবা পশ্চাৎভাগ কর্তিত। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কানের সামান্য কিছু কাটা হলেও কুরবানি জায়েজ হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদি কানের অর্ধেক হতে কম কাটা হয় তবে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে। তিনি হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আমি হযরত ইবনে কুলাইবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ 'শিং ও কান-আয্বা' জন্তু দ্বারা কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কানের 'আযবা' কি? তিনি জবাবে বলেছেন, যদি কানের অর্ধেক বা এর বেশি কাটা থাকে তবে তাকে 'আযবা' বলে। এ হাদীস হতে বুঝা যায় যে, যে জানোয়ারের কানের অর্ধেক বা এর বেশি কাটা থাকে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, কানের অর্ধেকের কম কাটা হলে এর দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে। এটাই হানাফীদের মাযহাব।

ইমাম শাফেয়ী তথা হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের জবাবে হানাফীদের পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে, হাদীসের শব্দ 'মোকাবালা ও মোদাবারা' দ্বারা অর্ধেকের বেশি কাটা গেছে বুঝতে হবে। তা হলে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়ে যাবে। আর যদি কিছু অংশ কর্তিত ধরে নেওয়া হয় তখন তা মাকরূহে তানযীহীর জন্য বুঝতে হবে।

وَعَنْهُ ١٣٨٠ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُضَحِّىَ بِاَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْاُذُنِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

১৩৮০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা জন্তু দ্বারা কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنِ ١٣٨١ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقٰى مِنَ الضَّحَايَا فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَقَالَ اَرْبَعًا اَلْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَ الْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ. (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِىُّ)

১৩৮১. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কুরবানির ব্যাপারে কোন্ ধরনের জন্তু হতে বেঁচে থাকতে হবে? রাসূল ﷺ হাতের দ্বারা [অর্থাৎ চার আঙ্গুল দেখিয়ে] বললেন, চার রকমের পশু হতে- (১) খোঁড়া- যার খোঁড়ামি স্পষ্ট, (২) কানা- যার কানামি স্পষ্ট, (৩) রোগা- যার রোগ স্পষ্ট এবং (৪) দুর্বল- যার হাড়ে মজ্জা নেই। -[মালেক, আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হানাফী ফকীহগণ বলেন যে, যেহেতু কান ও লেজ খাদ্য বস্তু, সুতরাং এর বেশির ভাগ কাটা গেলে অর্থাৎ না থাকলে কুরবানি হবে না। শিং খাদ্য বস্তু নয়, সুতরাং শিং ভেঙ্গে গেলেও এর দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে। রাসূল ﷺ-এর এ ক্ষেত্রে নিষেধ অনুত্তমতার জন্য। দুর্বল ও খোঁড়া বলতে এরূপ দুর্বল বা খোঁড়া যা কুরবানির স্থান পর্যন্ত যেতে অক্ষম। কানা বলতে যে জন্তুর চক্ষুর জ্যোতি সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে গেছে।

وَعَنْ ١٣٨٢ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُضَحِّىْ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ فَحِيْلٍ يَنْظُرُ فِىْ سَوَادٍ وَيَاْكُلُ فِىْ سَوَادٍ وَيَمْشِىْ فِىْ سَوَادٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিং বিশিষ্ট খুব তাজা দুম্বা দ্বারা কুরবানি করতেন, যা কালো দ্বারা দেখতো, কালোতে খেতো এবং কালোতে হাঁটতো [অর্থাৎ এর চোখ, মুখ ও পা কালো ছিল]। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ١٣٨٣ مُجَاشِعٍ (رض) مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّىْ مِمَّا يُوَفِّىْ مِنْهُ الثَّنِىُّ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৮৩. অনুবাদ : বনী সুলাইম গোত্রের সাহাবী হযরত মুজাশে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, জায্‌আ [অর্থাৎ, ছয় মাস বয়সের মোটাতাজা ভেড়া] দ্বারা সেই কাজ সাধিত হবে, যা মুসিন্না [পূর্ণ এক বছরের বকরি] দ্বারা সাধিত হয়। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** ছয়মাস বয়সের ভেড়াকে جَذَعٌ বলা হয়, এ রকম ভেড়াকে যদি দেখতে এক বছরের ভেড়ার মতো মোটাতাজা দেখা যায় তবে তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ কিন্তু ছয়মাসের ছাগল মোটাতাজা দেখা গেলেও তার দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই।

وَعَنْ ١٣٨٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نِعْمَتِ الْاُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّاْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

১৩৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– ভেড়ার ছয় মাস পূর্ণ বয়সের বাচ্চা কতই না উত্তম কুরবানি? [অর্থাৎ, এরূপ জন্তু দ্বারা কুরবানি জায়েজ]–[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٣٨٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الْاَضْحٰى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَ النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৩৮৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম, তখন কুরবানির সময় উপস্থিত হলো। আমরা একটা গাভীতে সাতজন এবং একটি উটে দশজন করে অংশগ্রহণ করলাম। –[তিরিমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ] তবে তিরমিযী বলেন এ হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ফিকহবিদগণ বলেন, উল্লিখিত হাদীসটি মনসুখ হয়ে গেছে। কেননা উটের মধ্যে ১০ জন শরিক হওয়া জায়েজ নেই।

وَعَنْ ١٣٨٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا عَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلَافِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৮৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আদম সন্তান [মানুষ] কুরবানির দিন রক্ত প্রবাহিত করা [অর্থাৎ কুরবানি করা] অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় কাজ করে না। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন কুরবানির পশু [কুরবানি দাতার পাল্লায়] তাদের শিং, পশম, ও খুরসহ এসে হাজির হবে এবং কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা প্রফুল্লচিত্তে কুরবানি কর। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]

وَعَنْ ١٣٨٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ)

১৩৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দিনসমূহের মধ্যে এমন কোনো দিন নেই, যাতে আল্লাহর ইবাদত করা জুলহজ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা তাঁর নিকট প্রিয়তর হতে পারে। [অর্থাৎ ঐ দিনগুলোর মধ্যে ইবাদত করাই অধিক উত্তম।] কেননা, এর প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমান এবং এর প্রত্যেক রাতের নামাজ কদরের রাতের নামাজের সমান। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। তবে তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটির সনদ যয়ীফ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসটি যয়ীফ হলেও অন্যান্য হাদীস অনুসারে ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, জুলহজ মাসের প্রথম দশদিন রমজান মাসের শেষ দশদিন অপেক্ষা উত্তম। কেননা, এ দশ দিনের মধ্যেই হজের দিন রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٣٨٨ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ شَهِدْتُ الْاَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَعْدُ اَنْ صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ

১৩৮৮. অনুবাদ : হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার কুরবানির দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হাজির ছিলাম। তিনি এর বেশি কিছু করলেন না– তিনি [শুধু] নামাজ পড়লেন এবং নামাজ হতে সালাম ফিরিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন।

صَلٰوتِهٖ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَرٰى لَحْمَ اَضَاحِىَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ اَوْ نُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ اُخْرٰى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখনই তিনি কিছু কুরবানির গোশত দেখতে পেলেন, যা রাসূলের নামাজ হতে অবসর গ্রহণের পূর্বেই জবাই করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে পশু কুরবানি করেছে অথবা রাবীর [সন্দেহ] আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে পশু কুরবানি করেছে, সে যেন এর পরিবর্তে আর একটি জবাই করে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত জুনদুব (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ কুরবানির দিন প্রথমে নামাজ পড়লেন, অতঃপর খোতবা দান করলেন তারপর [পশু] জবাই করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার পূর্বে জবাই করেছে অথবা তিনি বলেছেন, আমাদের নামাজ পড়ার পূর্বে কুরবানির পশু জবাই করেছে সে যেন এর স্থলে আর একটি পশু জবাই করে। আর যে ব্যক্তি জবাই করেনি, সে যেন আল্লাহর নামে জবাই করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ١٣٨٩ نَافِعٍ (رحـ) اَنَّ ابْنَ عُمَرَ (رضـ) قَالَ الْاَضْحٰى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى (رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَالَ بَلَغَنِىْ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ مِثْلُهٗ)

১৩৮৯. অনুবাদ : হযরত নাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, কুরবানি ঈদুল আযহার দিনের পরও দু' দিন। [অর্থাৎ ১১তম ও ১২তম জিলহজ।]–মালেক।

আর তিনি বলেছেন যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা.) হতেও আমার নিকট এরূপ হাদীস পৌঁছেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুরবানির দিন নির্ধারণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, আহমদ, সুফিয়ান ছাওরী ও সাহেবাঈনদের মতে ঈদের দিন ও এর পরে আরও দুই দিন হলো ঈদুল আজহা তথা কুরবানির দিন। অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত কুরবানি করা জায়েজ আছে। তারা ওপরে বর্ণিত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে দলিল গ্রহণ করেন, যেখানে ঈদের দিন ছাড়াও পরের দুই দিন অর্থাৎ ১১ ও ১২ই জিলহজ তারিখও ঈদুল আজহা হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া ইমাম কারখীর মুখতাসার গ্রন্থে হযরত আলী (রা.) -এর বর্ণিত হাদীস, যথা– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, اَيَّامُ الْاَضْحٰى ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ اَوَّلُهُنَّ اَفْضَلُهُنَّ কুরবানির দিন তিন দিন, তন্মধ্যে প্রথম দিনই সবচেয়ে উত্তম। এছাড়াও হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী, আওযায়ী, হাসান বসরী, আতা এবং আবূ সাওরের মতে চার দিন পর্যন্ত কুরবানি করা জায়েজ আছে। (অর্থাৎ কুরবানীর দিনসহ এর পরে তিন দিন ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ পর্যন্ত।) এটাই হযরত আলী এবং ইবনে আব্বাসের উক্তি ছিল। তাঁরা হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.)-এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। তাতে কুরবানির দিনের সাথে আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিনেরও উল্লেখ রয়েছে। হাদীসটি এই–

(١) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ كُلُّ فِجَاجٍ اَىْ طَرِيْقٍ مِنًى مَنْحَرٌ وَفِىْ كُلِّ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ - (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِىْ صَحِيْحِهٖ)

এ ছাড়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আইয়্যামে তাশরীকের সব কয়টি দিনই জবাইর দিন।

(٢) عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ (اَخْرَجَهُ ابْنُ عُدَى فِى الْكَامِلِ)

ইবনে সীরীন (র.), হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ও ইবনে আবূ সুলাইমান প্রমুখের মতে কুরবানির দিন শুধুমাত্র এক দিন, অর্থাৎ ১০ তারিখের ঈদের দিন। তাঁরা হযরত আবূ বাকরা (রা.) -এর হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন। উক্ত হাদীসে আছে, হুজুর ﷺ বিদায় হজের ভাষণে কুরবানির জন্য শুধু 'ইয়াওমুন নহর' উল্লেখ করেছেন।

তাঁদের দলিলের জবাব : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে ইবনে সীরীন প্রমুখের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের হাদীস اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ বাক্যে তাঁরা -اَلْ-কে جِنْس এর জন্য মনে করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে ال পরিপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হলে বুঝা যাবে যে, ঈদুল আজহার দিন হলো পরিপূর্ণ কুরবানির দিন। কুরতুবী (র.) বলেন, কুরআন মাজীদেও আইয়্যামে মা'লূমা বহুবচন দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সুতরাং একদিন হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাবে বলা হয়েছে যে, তিনি যে হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িমের হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন বায্যার (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি মুনকাতে'। হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান ইবনে হুসাইনের সাথে যুবাইরের সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দ্বিতীয় দলিলে উল্লিখিত হাদীসকেও নাসায়ী, ইবনে মাদীনী, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন দুর্বল বলেছেন।

١٣٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّىْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৩৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে দশ বছর অবস্থান করেছেন এবং প্রতি বছরই কুরবানি করেছেন।

١٣٩١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىْ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৩৯১. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানি কি? রাসূল ﷺ জবাবে বললেন, এটা তোমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত [রীতিনীতি]। তাঁকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে আমাদের কি [পূণ্য রয়েছে]? রাসূল ﷺ বললেন, [কুরবানির জন্তুর] প্রতিটি লোমের পরিবর্তে নেকী রয়েছে। তাঁরা আবারও বললেন, পশম বিশিষ্ট পশুর বেলায় কি হবে? [এদের তো পশম অনেক বেশি।] রাসূল ﷺ বলেছেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তেও একটি নেকী রয়েছে। -[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** একবার সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىْ এই কুরবানি কি? এটা কি আমাদের শরিয়তের বিধান নাকি অতীত কোনো শরিয়তের বিধান? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন যে, سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ.)-এর সুন্নত। তাঁরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল যে, এতে কি কোনো ছওয়াব রয়েছে? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন যে, এর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে ছওয়াব রয়েছে, কাজেই প্রত্যেক সামর্থ্যবানের উচিত কুরবানি করে ছওয়াব অর্জন করা।

بَابُ الْعَتِيْرَةِ
পরিচ্ছেদ : রজব মাসের কুরবানি

জাহিলিয়া যুগে আরবগণ রজব, জিলকাদ, জিলহজ ও মুহাররম এ চার মাসকে বিশেষভাবে মর্যাদা প্রদান করত, এই চার মাসের প্রথম রজব মাসের সম্মানার্থে তারা একটি জবাই করত, আর একেই عَتِيْرَةٌ বলা হতো। ইমাম খাত্তাবী এ মতই ব্যক্ত করেছেন।

অপর একদলের মতে اَلْعَتِيْرَةُ সেই জবাইকৃত পশুকে বলা হয়, যা প্রাক ইসলামী যুগে আরব তাদের বিভিন্ন দেব- দেবীর নামে উৎসর্গ করত এবং তার রক্ত সেই সব দেব-দেবীর মাথায় ঢেলে দিত।

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ রজব মাসে আল্লাহর নামে ছাগল ভেড়া কুরবানি করতো, আর একে রজবিয়্যাও বলা হতো, কিন্তু পরবর্তীতে এটা মনসুখ বা রহিত হয়ে যায়। এ অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٩٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ قَالَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِىْ رَجَبَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, এখন আর ফারাও নেই এবং 'আতীরাও নেই। বর্ণনাকারী বলেন, 'ফারা' হলো গবাদি পশু তথা ছাগল, ভেড়া ও উটের প্রথম বাচ্চা, যা তারা তাদের তাগুতের [অর্থাৎ ঠাকুর-দেবতার] নামে উসর্গ করত। আর 'আতীরা' হলো যা তারা রজব মাসে উৎসর্গ করত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফারা ও আতীরা -এর অর্থ : উল্লেখ্য যে, اَلْفَرَعُ-এর অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ফারা জন্তু-জানোয়ারের সেই প্রথম বাচ্চাকে বলা হয়, যা এই নিয়তে জবাই করা হয় যেন এর মা'র মধ্যে বরকত হয় এবং অধিক বাচ্চা-প্রসব হয়। অধিকাংশ ভাষাবিদ এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীরা এ মতই ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে اَلْفَرَعُ উটের প্রথম বাচ্চাকে বলা হয়। বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদে এ ধরনের ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আবূ দাউদে আরো একটু দীর্ঘ করে বলা হয়েছে যে, اَلْفَرَعُ হলো উটের সেই প্রথম বাচ্চা যা দেবদেবীর নামে জবাই করে এর গোশত ভক্ষণ করে এবং তার চামড়া গাছের উপর রেখে দেওয়া হয়। আবার কেউ বলেন, উট একশত বাচ্চা দেওয়ার পর যে বাচ্চাটি প্রসব করত জাহিলিয়া যুগের লোকেরা সেই বাচ্চাটিকে জবাই করত, একে তারা فَرَعٌ হিসাবে আখ্যায়িত করত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٣٩٣ - عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ (رض) قَالَ كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ هِىَ الَّتِىْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ .

১৩৯৩. অনুবাদ : হযরত মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান করছিলাম। তাঁকে বলতে শুনলাম-হে লোক সকল! প্রত্যেক গৃহবাসীর উপর প্রত্যেক বছর এক কুরবানি ও এক আতীরা ওয়াজিব। তোমরা জান আতীরা কি? এটা সেই জিনিসই যাকে তোমরা রজবিয়া বলে

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ضَعِيْفُ الْاِسْنَادِ وَقَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَالْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةٌ)

নামকরণ করেছ। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ তিরিমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাসূত্র দুর্বল। আবূ দাউদ বলেছেন, আতীরা রহিত হয়ে গেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আতীরা এবং ফাবা-এর হুকুম সম্পর্কে মতানৈক্য : আতীরা ও ফারা' সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত থাকার কারণে এর হুকুম সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম বায়হাকীর মতে এটা মোস্তাহাব। অবশ্য আলোচ্য মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। আবার কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা শুধুমাত্র এর অনুমতি পাওয়া যায়। যেমন আবূ রাযীনের হাদীস– عَنْ اَبِىْ رَزِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ الْجَاهِلِيَّةِ فَنَاْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَابَاْسَ بِهٖ ـ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ)

অপর এক হাদীসে এসেছে যে, عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِيِّ (رض) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتَرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعْ ـ

কোনো কোনো বর্ণনায় একে নাজায়েজ বলা হয়েছে। যেমন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অধিকাংশ আলিমের মতে আতীরা এবং ফারা-এর হুকুম মনসুখ হয়ে গেছে। আল্লামা কাজী ইয়ায একে যথার্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَعَنْ ١٣٩٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّيْ بِهَا قَالَ لَا وَلٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

১৩৯৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কুরবানির দিনকে ঈদের দিন হিসাব পালন করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা এ দিনটিকে এ উম্মতের জন্য ঈদের দিন ধার্য করেছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি মাদী 'মানীহা' ব্যতীত অন্য কোনো পশু না পাই, তবে কি তা দ্বারা কুরবানি করব? উত্তরে হুজুর ﷺ বললেন, না। বরং তুমি কুরবানির দিনে তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ খাটো করবে এবং নাভীর নিচের কেশ মুণ্ডন করবে। এটাই আল্লাহ তাআ'লার নিকট তোমার পূর্ণ কুরবানি। –[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** মানীহা বলা হয় দুধযুক্ত গাভী ছাগল বা ভেড়া যা কাউকে এ শর্তে দান করা হয় যে একটি নির্ধারিত বা প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত দুধ পান করে তা মালিককে ফেরত দেবে। এরূপ পশু অন্যের বিধায় তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ নয়।

بَابُ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ

পরিচ্ছেদ : সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ

এই মহাবিশ্বের বিশাল রহস্যরাজির মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র মহাকুদরতের দু'টি নিদর্শন, এদের গ্রহণও এক রহস্যময় ব্যাপার, প্রত্যেকটি গ্রহ ও উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে অবিরতভাবে পরিভ্রমণ করে, এই ক্রমাবর্তনকালে সূর্য চন্দ্র ও পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে একই সরল রেখায় যখন মিলিত হয় এবং চন্দ্র উভয়ের মধ্যখানে থাকে তখন সূর্যগ্রহণ হয়; আর যখন পৃথিবী মধ্যখানে থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়; আর এই দুই সময়ে যে নামাজ পড়া হয় তাকে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নামাজ বলে। আরবিতে একে বলা হয়, صَلٰوةُ الْخُسُوْفِ وَالْكُسُوْفِ তবে খুসূফ ও কুসূফ কোনটি দ্বারা কোন নামাজ বুঝানো হয়, এ ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। ফকীহদের মতে كُسُوْف সূর্যের সাথে এবং خُسُوْف চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত।

আর কারো মতে كُسُوْف ও خُسُوْف শব্দ দু'টি চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আরেক দল বলেন, كُسُوْف দ্বারা চন্দ্র গ্রহণ আর خُسُوْف দ্বারা সূর্যগ্রহণকে বুঝায়। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٣٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةً فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوْعًا قَطُّ وَلَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلُ مِنْهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন মহানবী ﷺ একজন ঘোষক [আহবানকারী] পাঠালেন। সে লোকদেরকে ডেকে বলল, اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةً নামাজের জামাত প্রস্তুত। লোকজন সমবেত হলো। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং চার রুকু ও চার সেজদাতে দু' রাকাত নামাজ পড়ালেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি কখনও এমন রুকু সেজদা করিনি, যা এই নামাজের রুকু ও সেজদা হতে দীর্ঘতর ছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কুসূফের নামাজের পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ : হযরত কাতাদা, আতা, ইবনে আবী রাবাহ, ইসহাক ও ইবনুল মুনযিরের মতে কুসূফের নামাজ দু' রাকাত। প্রত্যেক রাকাতে তিন তিনটি রুকুসহ মোট ছয় রুকুতে তা সমাপন করতে হয়। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীস–

(١) عَنْ جَابِرٍ (رضـ) .... فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢) عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

আল্লামা তাউস, হাবীব ইবনে আবী সাবেত, আব্দুল মালেক ইবনে জুরাইজ প্রমুখের মতে কুসূফের নামাজ প্রত্যেক রাকাতে চারটি করে মোট আট রুকুর মাধ্যমে সমাপন করতে হয়। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীস–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِىْ رَكَاتٍ اَىْ رُكُوْعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবূ ছাওর ও লাইস ইবনে সা'দ (র.)-এর মতে কুসূফের নামাজের প্রত্যেক রাকাতে দু'টি রুকু করে মোট চারটি রুকুর মাধ্যমে দু' রাকাত নামাজ সমাপ্ত করতে হবে। তাঁদের দলিল হলো নিম্নের হাদীস–

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (اَىْ رُكُوْعَاتٍ) فِىْ رَكْعَتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ইমাম আবূ হানীফা, সুফইয়ান সওরী, সাহেবাইন, ইব্রাহীম নাখয়ী (র.) প্রমুখের মতে কুসূফের অর্থাৎ, সূর্যগ্রহণের নামাজও স্বাভাবিক নামাজের ন্যায়। অর্থাৎ দু' রাকাত দু' রুকুতে সমাপন করতে হবে। তাঁদের দলিলসমূহ হলো–

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ . (اَخْرَجَهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ بَيْنَا اَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِىْ غَرْضَيْنِ لَنَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فِىْ عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْاُفُقِ .... فَاِذَا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَارِزٌ فَصَلّٰى فَقَامَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ ثُمَّ سَجَدَ بِنَا - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

(٣) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ اَىِ الْخُسُوْفَ فَصَلُّوْا كَاَحدث صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

মোটকথা, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও তাঁর মতের অনুসারী অন্যান্যদের মতে কুসূফের নামাজ অন্যান্য নামাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর ব্যতিক্রমের জন্য সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ প্রমাণ আবশ্যক। অথচ ব্যতিক্রমের হাদীসসমূহ নিঃসন্দেহ নয়। একাধিক রুকুর হাদীসগুলো মুযতারিব। কোনোটিতে দুই, কোনোটিতে তিন, কোনোটিতে চার, আবার কোনোটিতে পাঁচ রুকুর কথা রয়েছে। অথচ ঘটনা বিভিন্ন ছিল বলেও কোনো প্রমাণ নেই। ইমাম নববী (র.) এ দাবি করলেও মোল্লা আলী কারী দশ বছরে পাঁচ-ছয়বার সূর্য গ্রহণের দাবিকে অস্বীকার করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাসূল ﷺ রুকু আসলে একটাই করেছিলেন। কিন্তু বিশাল সমাবেশে অস্বাভাবিক দীর্ঘ রুকু হওয়ায় পেছনের মুসল্লীদের বিভ্রান্তি হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বালক হওয়ার কারণে এবং হযরত আয়েশা (রা.) নারী হওয়ায় সারির পেছনে ছিলেন।

١٣٩٦ - وَعَنْهَا قَالَتْ جَهَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সূর্যগ্রহণকালীন নামাজে কেরাত সশব্দে পাঠ করেছিলেন।–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِلَافُ الْاَئِمَّةِ فِىْ جَهْرِ الْقِرَاءَةِ وَاِخْفَائِهَا فِىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ **কুসূফ ও খুসূফের নামাজে কেরাত সশব্দে না নীরবে এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ :** ইমাম আহমদ, ইসহাক, সাহেবাইন, ইবনে খুযাইমা প্রমুখের মতে সূর্য গ্রহণের নামাজে কেরাত সশব্দে পড়তে হয়। তাঁদের দলিল হলো–

(١) عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَهَرَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) وَفِى الطَّحَاوِىْ اَنَّ عَلِيًّا (رض) جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ .

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ ফকীহদের মতে সূর্যগ্রহণের নামাজের কেরাত নীরবে পড়তে হবে। তাঁদের দলিল হলো– -

(١) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلٰوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ . اَلْمُرَادُ هُوَ الْاِسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ -

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

١٣٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهٗ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَ

১৩৯৭. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় সূর্যগ্রহণ হলো। তখন হুজুর ﷺ খুসূফের নামাজ পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে নামাজ পড়ল। তখন হুজুর ﷺ সূরা বাকারা পাঠ সমতুল্য সময় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর দীর্ঘ সময় রুকু করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং দাঁড়ালেন আর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন। তবে এই কেয়াম প্রথম কেয়ামের তুলনায় কিছু কম ছিল। অতঃপর পুনরায় দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে এটা প্রথম রুকু হতে দীর্ঘতায় কিছু কম ছিল। তারপর মাথা উঠালেন এবং সিজদা করলেন। তারপর আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন তবে তা দীর্ঘতায় প্রথম রাকাতের কেয়াম অপেক্ষা কম ছিল। অতঃপর দীর্ঘ রুকু করলেন। তবে এটা প্রথম রাকাতের রুকু হতে দীর্ঘতায় কম ছিল। তারপর মাথা তুললেন এবং দীর্ঘ কেয়াম করলেন। তবে তা প্রথম কেয়ামের তুলনায় কম ছিল। তারপর পুনরায় দীর্ঘক্ষণ রুকু করলেন। তবে তা দীর্ঘতায় প্রথম রুকু হতে কম ছিল। অতঃপর মাথা তুললেন এবং সিজদা করলেন। তারপর যথারীতি নামাজ সম্পন্ন করে নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলেন। ততক্ষণে সূর্য দীপ্তিমান হয়ে উঠল। তখন হুজুর ﷺ বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এটা কারো মৃত্যুর কারণে কিংবা জন্মের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা এটা [সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ] দেখবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে দেখলাম, যেন আপনি আপনার এই স্থানে দাঁড়িয়ে কিছু ধরতে ছিলেন। অতঃপর আপনাকে দেখলাম [ভয় পেয়ে] পিছু হঠে গেলেন। উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, আমি জান্নাত দেখেছিলাম, আর জান্নাতের গাছ হতে একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে ইচ্ছা করেছিলাম যদি আমি তা নিতাম তা হলে দুনিয়া বাকি থাকা পর্যন্ত তোমরা তা খেতে পারতে। আর আমি জাহান্নামও দেখেছিলাম, যার ন্যায় বিভৎস দৃশ্য আর কখনও দেখিনি।

رَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدٰهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আর এর অধিকাংশ অধিবাসীকেই দেখলাম নারী। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কি? হুজুর ﷺ বললেন, তাদের কুফরির কারণে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো তারা কি আল্লাহর কুফরি করে? তিনি বললেন, তারা তাদের স্বামীদের কুফরি করে থাকে এবং তাদের স্বামীদের অনুগ্রহের অস্বীকার করে থাকে। কোনো এক মহিলাকে যদি তুমি এক দীর্ঘ সময় [একযুগ বা এক শতাব্দী অথবা আজীবন] এহসান বা অনুগ্রহ করে থাক; অতঃপর সে যদি তোমার নিকট হতে সামান্য একটু ত্রুটি দেখতে পায় তখন সে নিঃসঙ্কোচে বলে উঠে, আমি তোমার কাছ হতে কখনও কোনো ভাল কিছু পেলাম না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজে প্রতি রাকাতে দুই রুকু করেছেন। অথচ অন্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাজের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ীএক রুকু সহকারে রাসূল ﷺ নামাজ পড়েছেন। মূলত এটা তাঁদের ধারণা মাত্র। অন্যথা নামাজ সাধারণ নিয়মে প্রতি রাকাতে এক এক রুকু দ্বারাই পড়া হয়েছে, যা হানাফীগণ বলেন। তবে সে দিনকার ঘটনা হলো এই যে, নামাজ ছিল অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘতম, যে পরিমাণ কেয়াম ছিল দীর্ঘক্ষণ, তদ্রূপভাবে রুকুও ছিল খুব লম্বা। পিছন হতে কোনো কোনো নামাজি মাথা তুলে চাইতেন, ইমাম এখন কি অবস্থায় আছেন। যখন দেখতেন যে, ইমাম এখন রুকুতে আছেন তখন তিনি পুনরায় রুকুতে চলে যেতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বালক হওয়ার দরুন এবং হযরত আয়েশা (রা.) নারী হওয়ার দরুন সমস্ত সারির পিছনেই ছিলেন। তাঁরাও এরূপভাবে বারবার রুকু হতে মাথা তুলে ধারণা করে নিয়েছেন যে, এবার আর একটি রুকু হলো। এভাবে হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা.) দুই দুই বার করে চার বার, মাথা তুলে দেখেছিলেন এবং প্রত্যেক বার সম্মুখের সারির কোনো না কোনো লোককে পুনঃ পুনঃ রুকু করতে দেখে তাকে বারবার রুকু করা হয়েছে বলে প্রকাশ করেছেন।

সঠিক উত্তর এই যে, সালাতুল কুসূফের রুকূর সংখ্যা বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর فِعْلِيْ হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী। কেননা, ঐ সকল রেওয়ায়েত প্রতি রাকাতে এক থেকে পাঁচ রুকূ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রুকূর সংখ্যা নির্ণয়ে এ হাদীসগুলো থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। কাজেই এক্ষেত্রে কাওলী হাদীসগুলোকে গ্রহণ করা উচিত। কেননা, সেগুলো এরূপ পরস্পর বিরোধী বর্ণনা নেই। এ ছাড়া কাওলী হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কাওলী হাদীস প্রধান্য পায়। সুতরা কাওলী রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে প্রতি রাকাতে এক রুকু প্রমাণিত হবে, যা পূর্বে বর্ণনা হয়েছে।

لَا يَنْخَسِفُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ -এর ব্যাখ্যা : জাহেলিয়া যুগে আরবদের এই ধারণা বদ্ধমূলভাবে চলে আসছিল যে, কোনো মহাপুরুষের মৃত্যুর কারণে মানুষ যেমন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, চন্দ্র-সূর্যও তদ্রূপভাবে শোকাতুর হয়ে পড়ে এবং তা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের আকারে প্রকাশ পায়। ঘটনাচক্রে দশম হিজরিতে জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু দিবসে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। ফলে হুজুর ﷺ -এর কতিপয় সাহাবীও তাদের পূর্বেকার ধারণা অনুযায়ী এমন কিছু ভাবতে লাগলেন যে, আল্লাহর নবীর পুত্রের মৃত্যুর কারণে এই মহাঘটনা ঘটছে। তখন আল্লাহর নবী তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করে বললেন, 'গ্রহণ' কারও মৃত্যুর বা জন্মের কারণে হয় না বরং এটা নভোমণ্ডলীয় কারণে হয়ে থাকে, আল্লাহর বিশেষ কুদরতে এটা ঘটে।

চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জামাত সম্পর্কে মতানৈক্য : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবূ সাওরের মতে সূর্যগ্রহণের ন্যায় চন্দ্রগ্রহণের নামাজও জামাতে পড়তে হয়। তাঁদের দলিল হলো–

(১) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (رحـ) قَالَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا فَرَغَ خَطَبَنَا . (اَلْحَدِيْثُ)

(২) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى كُسُوْفَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ . (اَلْحَدِيْث)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মালেক (র.) বলেন, চন্দ্রগ্রহণের নামাজের জন্য জামাতের প্রয়োজন নেই। তাঁদের দলিল হলো–

(১) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَفْضَلُ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهٖ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

(২) قَالَ مَالِكٌ لَمْ يَبْلُغْنَا وَلَا اَهْلَ بَلَدِنَا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمَعَ لِكُسُوْفِ الْقَمَرِ وَمَا نُقِلَ عَنْ اَحَدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ بَعْدَهُ

এ ছাড়াও তাঁরা বলেন, চন্দ্রগ্রহণ রাতে হয়ে থাকে। অতএব রাতে মানুষের একসাথ হয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পরে। এ জন্য এর জামাতের প্রয়োজন নেই।

١٣٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَتْ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِىَ عَبْدُهٗ اَوْ تَزْنِىَ اَمَتُهٗ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, অতঃপর হুজুর ﷺ সিজদা করলেন এবং সিজদাকে দীর্ঘায়িত করলেন, তারপর নামাজ হতে অবসর গ্রহণ করলেন। ততক্ষণে সূর্য দ্বীপ্তিমান হয়ে গেছে। তারপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দান করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে বা কারো হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না। সুতরাং তোমরা যখন এটা [সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ] দেখ তখন আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা কর এবং আল্লাহু আকবার বল, নামাজ পড় এবং দান-সদকা কর। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদের উম্মতগণ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ অপেক্ষা ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তিনি ঘৃণা করেন যে, তাঁর কোনো বান্দা যেনা করবে অথবা তাঁর কোনো বাঁদী যেনা করবে। যে জেনা করে। হে মুহাম্মদের উম্মতগণ, আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে তোমরা নির্ঘাত কম হাসতে এবং নির্ঘাত বেশি বেশি কাঁদতে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْغَيْرَةُ-এর অর্থ : 'গায়রত' অর্থ– সক্রোধ ঘৃণা। এ শব্দটি সাধারণত মানুষের পারিবারিক মানসম্ভ্রমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাপারে বিশেষভাবে মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করা হলে যে ঘৃণা ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় একে আরবি পরিভাষায় 'গায়রত' বলা হয়। এরূপ বিশেষ অর্থে গায়রত শব্দটি ব্যবহার হয়ে থাকে। সামাজিকভাবে এর উদাহরণ হলো, যেমন নিজের স্ত্রীর সাথে অবাঞ্ছিত কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পেলে তখন নিজের মনে যে ঘৃণা ও ক্রোধ জন্মে একে 'গায়রত' বলা যায়। কোনো বান্দা বা বান্দী জেনায় লিপ্ত হলে আল্লাহও এরূপ ঘৃণা ও রাগের সাথে তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

কুসূফের নামাজে খোতবা প্রদান সম্পর্কে মতানৈক্য : ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাক (র.) প্রমুখের মতে কুসূফের নামাজে খোতবা প্রদান করা মোস্তাহাব। উপরে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর এই হাদীসটিই তাঁদের দলিল।

ইমাম আবূ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে, এতে খোতবা প্রদান করতে হয় না। তাঁদের দলিল হলো সূর্যগ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়তে, তাকবীর বলতে এবং সদকা প্রদান করতে বলেছেন ; কিন্তু তিনি খোতবা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেননি। খোতবা প্রদান করা যদি সুন্নত হতো তবে অবশ্যই তিনি এর নির্দেশ দিয়ে যেতেন। এটা ছাড়াও তারা বলেন, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামাজ স্বীয় গৃহে একাকী পড়া বৈধ। যার প্রেক্ষাপটে এর জন্য খোতবার প্রয়োজন নেই।

جَوَابًا لَهٗ হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত হাদীসে যদিও কুসূফের নামাজের পরে খোতবা প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে, এটা মূলত খোতবার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়নি; বরং اِنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ এ অভিব্যক্তি রহিত করার জন্য প্রদান করা হয়েছিল।

আল্লামা বাজী (র.) বলেন, এর দ্বারা মিম্বারে উঠে যে খোতবা প্রদান করা হয় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর গুণ-প্রশংসা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। কেননা, সালাতুল কুসূফ হলো নফল নামাজ। সুতরাং অন্যান্য নফল নামাজে যেমন খোতবা পাঠ সুন্নত নয়, তেমনি কুসূফের নামাজেও খোতবা পাঠ সুন্নত নয়।

١٣٩٩ - **وَعَنْ** اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَّرُكُوْعٍ وَّسُجُوْدٍ مَا رَاَيْتُهٗ قَطُّ يَفْعَلُهٗ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ لَا تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهٖ وَلٰكِنْ يُّخَوِّفُ اللّٰهُ بِهَا عِبَادَهٗ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهٖ وَدُعَائِهٖ وَاسْتِغْفَارِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৩৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো তখন নবী করীম ﷺ কিয়ামত হয়ে যায় নাকি, এ ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মসজিদে আসলেন। তখন দীর্ঘ কেয়াম, রুকু ও সিজ্‌দা সহকারে নামাজ পড়লেন। আমি তাঁকে এরূপ করতে কখনও দেখিনি। অতঃপর বললেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন, যা তিনি দেখিয়ে থাকেন। এটা কারো মৃত্যুর কারণে বা হায়াতের কারণে হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এর কিছু [চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ] দেখ, তখন আল্লাহর স্মরণ, দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনার প্রতি শশব্যস্ত হয়ে ধাবিত হয়ো। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا الخ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে প্রশ্ন হয় যে, মহানবী ﷺ খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় কেয়ামত সংঘটিত হবে না। তথাপি কেয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্বে যে সমস্ত লক্ষণ ও নিদর্শন তিনি বর্ণনা করেছেন এর কোনোটিই তখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন- পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া, খারেজীদের বিদ্রোহ, বিচরণকারী জন্তুর আবির্ভাব, ধোঁয়া প্রকাশ হওয়া এবং বিভিন্ন শহর নগর মুসলমানদের হস্তগত হওয়া ইত্যাদি। তবু কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন— (১) সম্ভবত ঐ সমস্ত আলামত ও নিদর্শন সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বেই তিনি কেয়ামতের আশঙ্কা করেছিলেন এবং তিনি প্রতি মুহূর্তেই কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ধারণা করতেন। (২) অথবা বর্ণনাকারীর এটা ধারণামাত্র, হুজুরের বাহ্যিক ব্যস্ততা দেখেই তাঁর এই

ধারণা জন্মেছিল যে, বোধহয় হুজুর ﷺ কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কায় এভাবে করছেন। সুতরাং একজন প্রত্যক্ষকারীর ধারণার দরুন এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় না যে, মহানবী ﷺ প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের আশঙ্কায় এরূপ করেছিলেন। (৩) অথবা যা ভবিষ্যতে নির্ঘাত সংঘটিত হবে তা তখনই সংঘটিত হচ্ছে বুঝানোর জন্য এভাব প্রকাশ করেছেন। যেন লোকেরা এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণকে সাধারণ বিষয় বলে ধারণা না করে। কেননা, চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতি বিলুপ্ত হওয়াই কেয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। (৪) অথবা এ সময় যে নামাজ, দোয়া ও ইস্তিগফার করতে হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল হতে হয় এ কথা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এই ব্যস্ততা প্রকাশ করেছিলেন।

١٤٠٠ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِاَرْبَعِ سَجْدَاتٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪০০. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জমানায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইব্‌রাহীম মারা যাওয়ার দিন সূর্যগ্রহণ হলো। তখন হুজুর ﷺ লোকজনসহ [দু' রাকাত] নামাজ পড়লেন ছয় রুকু ও চার সিজদা সহকারে। [অর্থাৎ প্রতি রাকাতে তিন তিনবার রুকু করলেন।] -[মুসলিম]

١٤٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجْدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪০১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূর্যগ্রহণ হলো তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [দু' রাকাত] নামাজ আদায় করলেন যাতে আট রুকু ও চার সিজদা ছিল। হযরত আলী (রা.) হতেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। -[মুসলিম]

١٤٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنْتُ اَرْتَمِىْ بِاَسْهُمٍ لِىْ بِالْمَدِيْنَةِ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى مَا حَدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ قَالَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنْهَا فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَاَ سُوْرَتَيْنِ وَصَلّٰى

১৪০২. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় একদিন মদীনাতে আমি আমার তীরসমূহ নিক্ষেপ করছিলাম। এমন সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। তখন আমি আমার তীরসমূহ ছুড়ে ফেললাম এবং মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই দেখব যে, সূর্যগ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কি অবস্থা হয় [অর্থাৎ তিনি এ সময় কি করেন]? রাবী [আবদুর রহমান] বলেন, তখন আমি তাঁর নিকট আসলাম, রাসূল ﷺ নামাজে রত ছিলেন, নিজের দুই হাত উঠালেন এবং তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও হামদ করতে লাগলেন [অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করলেন] এবং দোয়া করতে থাকলেন, যতক্ষণ না সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল। যখন সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল তখন রাসূল ﷺ দু'টি সূরা পাঠ করলেন এবং দু'

رَكْعَتَيْنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَفِيْ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ) .

রাকাত নামাজ পড়লেন [অর্থাৎ দু'টি সূরা দ্বারা দু' রাকাত নামাজ পড়লেন]। মুসলিম তাঁর সহীহে আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। শরহে সুন্নাহ্তেও তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মাসাবীহ গ্রন্থে হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় দোয়া-দরুদ পড়তেন এবং সূর্যগ্রহণ শেষ হলে দু' রাকাত নামাজ পড়তেন। অথচ ইতঃপূর্বের সকল বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি সূর্যগ্রহণের সময়ই নামাজ পড়তেন।

এর সমাধানে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ সূর্যগ্রহণের নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাসবীহ-তাহলীল এতই দীর্ঘ করতেন যে, তা পাঠ করতে করতেই সূর্যগ্রহণের সমাপ্তি ঘটত। রাসূল ﷺ যখন নামাজ শেষ করতেন তখন আর তা অবশিষ্ট থাকত না। রাবী একেই এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সূর্যগ্রহণের অবসানের পর রাসূল ﷺ দু' রাকাত নামাজ আদায় করতেন। মূলত এ জাতীয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

١٤٠٣ - وَعَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ (رض) قَالَتْ لَقَدْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪০৩. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে সূর্য গ্রহণকালে দাস মুক্ত করতে আদেশ করেছেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকালীন সময়টা মানুষের জন্য একটা চরম বিপর্যয় ও মহাবিপদ, আর দান-সদকা দ্বারা এ সব মসিবত তিরোহিত হয়ে যায়; এ জন্য রাসূল ﷺ এ সময়ে দাস মুক্ত করতে আদেশ করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٠٤ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كُسُوْفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৪০৪. অনুবাদ : হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন, অথচ আমরা তাঁর কেরাত পাঠের শব্দ শুনলাম না। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

١٤٠٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيْلَ لَهُ تَسْجُدُ فِيْ

১৪০৫. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ইক্‌রিমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলা হলো যে, নবী করীম ﷺ-এর বিবিদের মধ্যে অমুক [অর্থাৎ হযরত সুফিয়া (রা.)] ইন্তেকাল করেছেন। [সংবাদ শুনে] তিনি সিজদায় লুটিয়ে

هٰذِهِ السَّاعَةِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوْا وَأَيُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

পড়লেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি এ সময় সিজ্‌দা করছেন? [অর্থাৎ অকারণে কেন সিজ্‌দা করছেন?] জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− যখন তোমরা [আল্লাহ তা'আলার] কোনো নিদর্শন দেখতে পাও তখন সিজদায় অবনত হয়। আর নবী করীম ﷺ-এর কোনো বিবির ইন্তেকাল অপেক্ষা বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে? −[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসে বর্ণিত فُلَانَة দ্বারা হয়তো হযরত সুফিয়া (রা.)-কে অথবা হযরত হাফসা (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলের কোনো এক বিবির ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে একে মহাবিপর্যয় মনে করে সিজদায় অবনত হয়ে গেলেন। এটা দেখে কেউ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা কোনো নিদর্শন দেখতে পাও তখন সেজদায় অবনত হও। মূলত রাসূল ﷺ-এর বিবিদের তিরোধান সত্যিই এক বিপর্যয়ের কারণ। কেননা, তাঁরা হলেন রাসূল ﷺ-এর বাণীর বার্তাবাহক। তাঁদের অনুপস্থিতিতে দীনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুদঘাটিতও থেকে যেতে পারে। আলোচ্য হাদীসের আলোকে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হতে পারে যে, آيَةً বা নিদর্শন দ্বারা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কথা বুঝানো হয়েছে। অথচ এটা দ্বারা এখানে রাসূল ﷺ-এর বিবিদের ইন্তেকালের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, آية শব্দটি ব্যাপ্তার্থবোধক। তবে সাধারণত চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের অর্থ নেওয়া হয়ে থাকে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٠٦ - عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُوْرَةٍ مِنَ الطُّوَلِ ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ حَتّٰى انْجَلٰى كُسُوْفُهَا . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

১৪০৬. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তখন হুজুর ﷺ তাদেরকে [সাহাবীদেরকে] নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাজে তিনি সাতটি দীর্ঘ সূরাসমূহ হতে একটি সূরা পাঠ করলেন এবং [প্রথম রাকাতে] পাঁচটি রুকু ও দু'টি সেজদা করলেন অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ সূরা সপ্তক সূরা হতে একটি পাঠ করলেন। অতঃপর পাঁচটি রুকু ও দু'টি সিজ্‌দা করলেন। তারপর নামাজ শেষে কেবলার দিকে মুখ করে বসে থাকলেন, আর যতক্ষণ না সূর্য গ্রহণ ছেড়ে আলোকিত হলো ততক্ষণ দোয়া করতে থাকলেন। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসে "সাতটি দীর্ঘ সূরা" অথবা "দীর্ঘ সূরাসপ্তক" বলে পবিত্র কুরআনের শুরুতে অবস্থিত সাতটি দীর্ঘ সূরা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো اَلسَّبْعُ الطِّوَالُ বলা হয়। এ হাদীসে কুসূফের নামাজের এক রাকাতে পাঁচটি করে রুকূ করার কথা বলা হয়েছে যার উত্তর ও ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ١٤٠٧ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْاَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتِ الشَّمْسُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةِ النَّسَائِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَلَهٗ فِىْ اُخْرٰى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا اِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى حَتّٰى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ اِلَّا لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ اَهْلِ الْاَرْضِ وَاِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهٖ وَلٰكِنَّهُمَا خَلِيْقَتَانِ مِنْ خَلْقِهٖ يُحْدِثُ اللّٰهُ فِىْ خَلْقِهٖ مَا شَاءَ فَاَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوْا حَتّٰى يَنْجَلِىَ اَوْ يُحْدِثَ اللّٰهُ اَمْرًا. (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

১৪০৭. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন রাসূল ﷺ দু' রাকাত করে নামাজ পড়তে থাকলেন এবং [নামাজের স্থানে থেকে] সূর্য গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, যতক্ষণ না সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। –[আবূ দাউদ]

নাসায়ীর এক বর্ণনায় আছে যে, যখন সূর্যগ্রহণ হলো তখন নবী করীম ﷺ আমাদের নামাজের মতো [স্বাভাবিক] নামাজ পড়লেন। নাসায়ীর অপর এক বর্ণনায় এ কথাগুলো রয়েছে [নো'মান ইবনে বশীর বলেন,] নবী করীম ﷺ একদিন তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে বের হলেন, তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। রাসূল ﷺ নামাজ পড়তে থাকলেন যতক্ষণ না সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, জাহেলিয়া যুগের লোকেরা বলত, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র দুনিয়ার মহান ব্যক্তিদের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতীত গ্রহণগ্রস্ত হয় না। অথচ সূর্য ও চন্দ্র কোনো [মহান] ব্যক্তির মৃত্যুর বা হায়াতের কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না; বরং এ দু'টি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি জগতের দু'টি সৃষ্টি। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতে যা ইচ্ছা পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। সুতরাং এদের মধ্যে যেটিই গ্রহণগ্রস্ত হয়, তোমরা নামাজ পড়তে থাকবে; যতক্ষণ না তা আলোকোজ্জ্বল হয় কিংবা আল্লাহ তা'আলা অন্য কোনো ঘটনার সৃষ্টি করেন। –[নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الْكُسُوْفِ وَالْخُسُوْفِ কুসূফ ও খুসূফের অর্থ : উক্ত হাদীসে 'কুসূফ' ও 'খুসূফ' উভয় শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফিকহ্‌বিদগণ বলেন, 'কুসূফ' শব্দটির ব্যবহার সূর্যগ্রহণের সাথে এবং 'খুসূফ' শব্দটির ব্যবহার চন্দ্রগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত। আবার কেউ কেউ বলেন যে, উভয় শব্দ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের সাথে ব্যবহৃত হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, উভয়ের যে কোনো একটি 'গ্রহণগ্রস্ত' হতে আরম্ভ করলে সেই প্রাথমিক অবস্থাকে 'কুসূফ' এবং তা ছেড়ে আলোকিত হতে আরম্ভ করলে সেই অবস্থাকে 'খুসূফ' বলে। হযরত লাইস ইবনে সা'দ বলেন, পূর্ণগ্রহণ হলে 'খুসূফ' এবং আংশিক গ্রহণগ্রস্ত হলে 'কুসূফ' বলা হয়।

بَابٌ فِىْ سُجُوْدِ الشُّكْرِ
পরিচ্ছেদ : কৃতজ্ঞতার সিজদা

আল্লাহ তা'আলার কোনো অনুগ্রহ লাভ করা বা কোনো বিপদ-আপদ কিংবা মসিবত হতে নাজাত পেলে যে সিজদা করা হয় তাকে সিজদায়ে শোকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদা বলা হয়।
উল্লেখ্য যে, নামাজের বাইরে চার প্রকারের সিজদা হতে পারে। যথা– (১) সিজদায়ে সাহু, (২) সিজদায়ে তেলাওয়াত, (৩) নামাজের শেষে সিজদায়ে মুনাজাত এবং (৪) সিজদায়ে শোকর বা কৃতজ্ঞতার সিজদা। আলোচ্য অধ্যায়ে এই চতুর্থ প্রকারের সিজদা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ
এ অধ্যায়ে প্রথম ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٠٨ - عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَهُ اَمْرٌ سُرُوْرًا اَوْ يُسَرُّ بِهٖ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

১৪০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ বাক্রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ বা এমন কিছু পৌঁছত যার দ্বারা তিনি খুশি হতেন, তখনই তিনি আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতায় সিজ্দায় লুটিয়ে পড়তেন। –[আবূ দাঊদ, তিরমিযী। তবে ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।]

١٤٠٩ - وَعَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأٰى رَجُلًا مِنَ النُّغَاشِيِّيْنَ فَخَرَّ سَاجِدًا . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ مُرْسَلًا وفى شرح السنة لفظ المصابيح)

১৪০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ জা'ফর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী ﷺ এক বামন [বেঁটে] ব্যক্তিকে দেখলেন এবং তৎক্ষণাৎ সিজ্দায় লুটিয়ে পড়লেন। এ হাদীসটি দারাকুতনী মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন আর শরহে সুন্নাহর মাসাবীহে বর্ণিত ভাষা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে।

١٤١٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ (رضـ) قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ غَزْوَزَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ

১৪১০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা হতে মদীনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা যখন গাযওয়াযা নামক স্থানের নিকটবর্তী হলাম, রাসূল ﷺ উষ্ট্রীর পিঠ হতে অবতরণ করলেন, অতঃপর নিজের দু' হাত উত্তোলন করে কিছু সময় ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন, অতঃপর সিজ্দায় লুটিয়ে পড়লেন, আর দীর্ঘ সময় সিজ্দায় থাকলেন। অতঃপর আবার উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দু' হাত কিছু সময় উত্তোলন করে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, তারপর পুনরায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন এবং সিজদায় দীর্ঘ সময় থাকলেন, অতঃপর পুনরায় উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের দু' হাত কিছু সময় ধরে উত্তোলন করে রাখলেন, তারপর [আবারও] সিজ্দায় লুটিয়ে পড়লেন। [সিজদা শেষে]

إِنِّىْ سَأَلْتُ رَبِّىْ وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ أُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَأَلْتُ رَبِّىْ لِأُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ أُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَأَلْتُ رَبِّىْ لِأُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ الثُّلُثَ الْاٰخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوُدَ)

বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করলাম। তিনি আমার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন [অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের গুনাহ মার্জনা করলেন]। তাই আমি আমার প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। তারপর মাথা উঠালাম এবং আমার উম্মতের জন্য [আবারও] আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে আমার উম্মতের [আরও] এক-তৃতীয়াংশ দান করলেন, তখন আমি আমার প্রভুর শোকরিয়ার উদ্দেশ্যে আবারও সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। অতঃপর [তৃতীয়বার] মাথা উঠালাম এবং আমার প্রতিপালকের নিকট আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশও দান করলেন। তখন আমি আমার প্রতিপালকের দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আবারও সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। –[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কৃতজ্ঞতার সিজদা সম্পর্কে মতানৈক্য : সিজদায়ে শোকর সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ (رح) وَاَحْمَدَ : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে সিজদায়ে শোকর সুন্নত, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতও এরূপই। তাদের দলিল নিম্নরূপ :

(১) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) كَانَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَاءَهُ اَمْرُ سُرُوْرٍ اَوْ يُسَرُّبِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلّٰهِ تَعَالٰى (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

(২) وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا اُتِىَ بِرَأْسِ اَبِىْ جَهْلٍ خَرَّ سَاجِدًا وَهٰكَذَا سَجَدَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) بِقَتْلِ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ وَسَجَدَ عَلِىٌّ (رض) بِقَتْلِ ذِى الثُّدَيَّةِ الخارجى وسجد كعب بن مالك ببشارة قبول توبته -

তবে রুগ্ন বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তাকে না জানিয়ে শোকরিয়া আদায় করতে হবে। রুগ্ন বা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানলে তার মনঃকষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে।

مَذْهَبُ الْإِمَامِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَمَالِكٍ (رح) : ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে সিজদায়ে শোকর করা মাকরূহ। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত অগণিত ও অসংখ্য। যদি সুন্নত বা মোস্তাহাব হিসাবে প্রতিটি নিয়ামতের জন্য সিজদা করা হয় তবে জীবনভর প্রতিটি মুহূর্ত সিজদা করতে থাকলেও সকল নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করা সম্ভব হবে না। অথচ এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

قَالَ الْإِمَامُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ (رح) لَوْ اَلْزَمَ الْعَبْدُ السُّجُوْدَ عِنْدَ كُلِّ نِعْمَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ لَكَانَ عَلَيْهِ اَنْ لَا يَغْفُلَ عَنِ السُّجُوْدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ لِاَنَّهُ لَا يَخْلُوْ عَنْهَا اَدْنٰى سَاعَةٍ فَاِنَّ مِنْ اَعْظَمِ نِعَمِ اللّٰهِ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالٰى نِعْمَةُ الْحَيَاةِ وَذٰلِكَ يَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ بِتَجَدُّدِ الْاَنْفَاسِ - وَهٰذَا الْقَوْلُ نَسَبَهُ الْحَمُوْنِىُّ فِىْ حَاشِيَةِ الْاَشْبَاهِ اِلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِىِّ (رح)-

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : যে সব হাদীসে সিজদার কথা উল্লিখিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাতে অংশ বিশেষকে উল্লেখ করে গোটা বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে সিজদা শব্দ দ্বারা পুরো নামাজকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। কাজেই এখানেও সিজদা দ্বারা নফল নামাজ উদ্দেশ্য। কিছু সংখ্যকের মতে সিজদায়ে শোকরের হাদীস মনসুখ হয়ে গেছে।

شَفَعْتُ لِأُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ أُمَّتِىْ-এর ব্যাখ্যা : এ হাদীসাংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, গুনাহের কারণে কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো উম্মতীর পাকড়াও হবে না। অথবা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও বহু হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কবীরা গুনাহে লিপ্তদের পাকড়াও হবে। এর জবাবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াবী শাস্তি যেমন ভূমিধ্বস ও চেহারার আকৃতি বিকৃতি করণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করা। সুতরাং তা গৃহীত হয়েছে। অথবা তূরেপেশতী বলেন, পূর্বেকার উম্মতের গুনাহের শাস্তি ছিল চিরস্থায়ী জাহান্নাম এবং শাফায়াত থেকে বঞ্চিত ও অভিশপ্ত হওয়া। রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল এ উম্মতকে এ থেকে রক্ষা করা।

بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

পরিচ্ছেদ : বৃষ্টি প্রার্থনা করা

اَلْاِسْتِسْقَاءُ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– বৃষ্টি প্রার্থনা করা বা পানি অন্বেষণ করা। আর পরিভাষায় দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির ফলে মানুষের চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃষ্টি বা পানির জন্য যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয় তাকে اِسْتِسْقَاءُ বলে।

ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, ইস্তিস্কা নামাজের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে যথা–

১. একাকী অথবা সমষ্টিগতভাবে শুধু দোয়া করা।

২. ইস্তিস্কার নামাজ আদায় করে দোয়া করা।

৩. নামাজ আদায় করে খোতবা প্রদান করা এবং দোয়া করা। এটা হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤١١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪১১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে লোকজন নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের সহ দু' রাকত নামাজ আদায় করলেন। এ দু' রাকাতে কেরাত সশব্দে পাঠ করলেন। এই সময় তিনি কেবলামুখী হয়ে দোয়া করলেন এবং হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন। কেবলামুখী হওয়ার সময় তিনি নিজের চাদরকে ঘুরিয়ে দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاِخْتِلَافُ فِىْ سُنَّةِ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ ইস্তিস্কার নামাজ সুন্নত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য : সাহেবাইন, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে ঈদের দু' রাকআত নামাজের ন্যায় ইস্তিস্কার নামাজ পড়তে হয়– এটা সুন্নত। তাঁদের দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস–

(١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِالنَّاسِ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَنَحْنُ خَلْفَهٗ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ - (رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ)

مَذْهَبُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ : হেদায়া প্রণেতা ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর অভিমত উল্লেখ করে বলেন, তাঁর মতে ইস্তিস্কার নামাজ জামাতে পড়া সুন্নত নয়। হ্যাঁ, যদি কেউ একাকী উক্ত নামাজ আদায় করে, তবে তা বৈধ হবে। এর কারণ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইস্তিস্কার অর্থই হলো দোয়া করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইবরাহীম নাখয়ী এই একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতেও এ ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। ইস্তিস্কার নামাজ যে জামাত পড়া সুন্নত নয়, তার দলিল নিম্নরূপ– (١) قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا -

আলোচ্য আয়াতে বৃষ্টি বর্ষণকে শুধুমাত্র ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, নামাজের সাথে নয়।

(٢) عَنْ أَنَسٍ (رض) يَذْكُرُ اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمًا يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يُغِيْثَنَا فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا ثَلَاثًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

(٣) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَسْقِ اللّٰهَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ اَسْقِنَا غَيْثًا مُرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ . (اَلْحَدِيْثُ)

(٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَرَادٍ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا تُوَسِّعُ بِهِ لِعِبَادِكَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) .

(٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِذَا اسْتَسْقٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ . وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

جَوَابًا لَهُمْ : ইস্তিস্কার নামাজ সুন্নতের পক্ষে যে সব দলিল আনয়ন করা হয়েছে তার উত্তর হলো উক্ত হাদীস দ্বারা সুন্নত সাব্যস্ত হয় না। কেননা রাসূল ﷺ কখনও ইস্তিস্কার জন্য নামাজ পড়েছেন আবার কখনও পড়েননি শুধু দোয়া করেছেন। আল্লামা ইবনুল আবেদীন বলেন, রাসূল ﷺ সর্বদা যেই আমল করেছেন কেবলমাত্র তা দ্বারাই সুন্নত সাব্যস্ত হয়। আর যে আমল মাঝে মাঝে করেছেন আবার মাঝে মাঝে পরিত্যাগও করেছেন তা দ্বারা মোস্তাহাব সাব্যস্ত হয়।

চাদর ঘুরানোর ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : চাদর ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য আছে। জমহুর ইমামগণ বলেন যে, চাদর ঘুরিয়ে দেওয়া সুন্নত। তারা উক্ত হাদীসকে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। এছাড়া হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসকেও দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন। কারণ আবূ দাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে :

পক্ষান্তরে ইমাম আযম, কতিপয় মালেকী মতাবলম্বী আলেম ও প্রাচীন আলেম ইবনে সালাম (রা.)-এর মতে চাদর ঘুরানো সুন্নত নয়। কেননা সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে শুধু দোয়া ও ইস্তিগফারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, চাদর ঘুরিয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি, এরূপ হাদীসও রয়েছে। এমনিভাবে ইমাম বুখারী (র.)-ও চাদর ঘুরানোকে জায়েজ বলেছেন, সুন্নত বলেননি।

١٤١٢ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ اِلَّا فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ يَرْفَعُ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪১২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইস্তিস্কা ব্যতীত তার কোনো দোয়াতেই দু' হাত উঠাতেন না। এতে তিনি এতটুকু হাত উঠাতেন যে, যাতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত। –[বুখারী ও মুসলিম]

١٤١٣ - وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَسْقٰى فَاَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪১৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মহানবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে পানি চাইলেন এবং উভয় হাতের পিঠ আকাশের দিকে রাখলেন –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : হাতের পিঠ উপরের দিকে রাখার তাৎপর্য হলো, যখন হাত উপুড় করা হয় তখন হাতের যাবতীয় বস্তু নিচের দিকে পড়ে যায় তেমনি মেঘমালার বৃষ্টিও যেন নিচের দিকে পড়ে যায় এটা বুঝানোই উদ্দেশ্য।

ইমাম আহমদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ যখন কোনো বালা-মসিবত হতে মুক্তি চাইতেন তখন হাত উপুড় করে দোয়া করতেন, আর যখন কোনো কিছু প্রার্থনা করতেন তখন হাতের তালু আকাশের দিকে করে দোয়া করতেন।

وَعَنْ ١٤١٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪১৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন, অর্থাৎ যে আল্লাহ! মুষল ধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষাও।-[বুখারী]

وَعَنْ ١٤١٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ اَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَهٗ حَتّٰى اَصَابَهٗ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنَّهٗ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهٖ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের গায়ের কাপড় খুলে ফেললেন। ফলে বৃষ্টির পানিতে তার পবিত্র দেহ ভিজে গেল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই কাজ করলেন কেন? রাসূল ﷺ বললেন, বৃষ্টির পানি এখনই নিজ প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। [অর্থাৎ, এ পানি এখনি আল্লাহ তা'আলার আদেশে দুনিয়াতে আসল। এখনও এ পানি দূষিত হয়নি। -[মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤١٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَاءَهٗ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللّٰهَ - (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১৪১৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদাগাহের দিকে বের হলেন এবং পানি প্রার্থনা [করার উদ্দেশ্যে নামাজ আদায়] করলেন। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হলেন এবং নিজের চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। অর্থাৎ চাদরের ডান প্রান্তকে তার বাম কাঁধের উপরে বাম প্রান্তকে তাঁর ডান কাঁধের উপরে রাখলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করলেন। -[আবূ দাঊদ]

وَعَنْهُ ١٤١٧ اَنَّهٗ قَالَ اِسْتَسْقٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهٗ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ اَنْ يَّاْخُذَ اَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهٗ اَعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَّبَهَا عَلٰى عَاتِقَيْهِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

১৪১৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির প্রার্থনা করলেন। তখন তাঁর গায়ে চতুষ্কোণবিশিষ্ট কালো চাদর ছিল। রাসূল ﷺ ইচ্ছা করলেন যে, চাদরের নিচের প্রান্ত উঠিয়ে উপরে করে দেবেন, যখন তা ভারি বোধ তখন তিনি একে শুধু নিজ কাঁধের উপর ঘুরিয়ে দিলেন। -[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** চাদরের ভিতরের দিক বাইরে উপরের দিকের নিচে ডানের দিক বামে এবং বামের দিক ডানে পিঠের পিছন হতে ঘুরাতে ইচ্ছা করলেন। জমহুর ইমামদের মতে পানি প্রার্থনার সময় এরূপ করা সুন্নত।

وَعَنْ ١٤١٨ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَبِى اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) .

১৪১৮. অনুবাদ : হযরত আবুল লাহামের মুক্ত করা গোলাম হযরত উমাইর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা যাওরা নামক স্থানের কাছাকাছি আহজারুয-যায় নামক স্থানে নবী করীম ﷺ-কে [আল্লাহ তা'আলার নিকট] পানি প্রার্থনা করতে দেখলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আপন দু' হাত মুখমণ্ডলের নিকট উঠিয়ে পানি প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর পবিত্র শির অতিক্রম করেনি। -[আবূ দাউদ। এ ছাড়া তিরমিযী এবং নাসায়ীও এরূপ বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ١٤١٩ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْنِى فِى الْاِسْتِسْقَاءِ مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَاشِعًا مُتَضَرِّعًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

১৪১৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বের হলেন সাধারণ পোশাকে, বিনয় সহকারে ভয়-বিহবল অবস্থায়, কাতরভাবে ফরিয়াদ করতে করতে।-[তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মেলা-মজলিসে যাওয়ার মত উত্তম লেবাস পোশাক ত্যাগ করে নিত্যব্যবহার্য কাপড় পরে ইস্তিস্কায় বের হওয়া উচিত।

وَعَنْ ١٤٢٠ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَبُوْدَاوُدَ)

১৪২০. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রা.) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতামহ বলেছেন- নবী করীম ﷺ যখন বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন তখন বলতেন, অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকেও, তোমার পশুদেরকে পানি পান করাও, তোমার অনুগ্রহ ছড়িয়ে দাও এবং তোমার মৃত জনপদকে প্রাণবন্ত কর। -[মালেক ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ **এই সনদের ব্যাখ্যা :** এই সনদের বিবরণ দু' প্রকারের হতে পারে। কিন্তু উভয় অবস্থাতে হাদীসটি 'মুরসাল' হয়। এ কারণে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহে عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ -এর হাদীস বর্ণনা করেননি। পূর্ণ সনদ হলো- عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ অর্থাৎ আমর ইবনে শোয়াইব বর্ণনা করেন তাঁর পিতা শোয়াইব হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে।

(ক) যদি 'তাঁর দাদা' দ্বারা আমরের দাদা নেওয়া হয় তখন হবেন 'মুহাম্মদ'। অর্থাৎ আমর বর্ণনা করেন পিতা শোয়াইব হতে এবং শোয়াইব বর্ণনা করেন 'আমরের দাদা' অর্থ 'মুহাম্মদ' হতে এবং মুহাম্মদ বর্ণনা করেন মহানবী ﷺ হতে। এ পর্যায়ে হাদীসটি এ কারণে মুরসাল যে, মুহাম্মদ-এর সাক্ষাৎ মহানবী ﷺ -এর সাথে হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

(খ) আর যদি 'তাঁর দাদা' দ্বারা শোয়াইবের দাদা 'আব্দুল্লাহকে' বুঝানো হয়, আর আব্দুল্লাহ মহানবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, এ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ রাসূলের সাহাবী, এর মধ্যে সন্দেহ নেই। কিন্তু শোয়াইবের সাথে তাঁর দাদা আবদুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। এ পর্যায়ে হাদীসটি 'মুনকাতি' বা মুরসাল হয়ে পড়ে। ফলে উভয় পদ্ধতিতে উক্ত সনদটি 'মুত্তাসিল' নয়।

وَعَنْ ١٤٢١ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوَاكِئُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ قَالَ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

১৪২১ অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিস্কায় হস্তদ্বয় উত্তোলন করে এই দোয়া পাঠ করতে দেখেছি। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করো, যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, উপকারী, ক্ষতিকর নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়। তিনি [রাবী হযরত জাবের] বলেন, এটা বলার সাথে সাথেই তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিতে লাগল। -[আবূ দাউদ]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤٢٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ شَكَى النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهٗ فِى الْمُصَلّٰى وَ وَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اَبَانِ زَمَانِهٖ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَدْعُوْهُ وَ وَعَدَكُمْ اَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَتْرُكِ الرَّفْعَ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ

১৪২২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে মানুষ অনাবৃষ্টির ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন রাসূল ﷺ একটি মিম্বার নির্মাণ করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাঁর জন্য ঈদগাহে মিম্বার রাখা হলো আর রাসূল ﷺ লোকদের নিকট হতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তারা একদিন ঈদগাহের দিকে সকলে বের হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সূর্যের কিনারা উদয় হতেই [ঈদগাহের দিকে] বের হলেন এবং মিম্বারের উপরে বসলেন, তারপর আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা [আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট] তোমাদের শহরে অনাবৃষ্টি ও বৃষ্টির মৌসুম অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বৃষ্টি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করেছ। আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন, যেন তোমরা আল্লাহকে ডাক, আর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন, অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি দু' জাহানের প্রতিপালক, দয়াময়-দয়ালু, বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তুমি অমুখাপেক্ষী ; আর আমরা তোমার মুখাপেক্ষী ফকির। আমাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আর যা বর্ষণ করবে তা আমাদের জন্য শক্তি ও কল্যাণের কারণ বানাও, যাতে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এর দ্বারা উপকৃত হই। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজের হস্তদ্বয়

إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

উত্তোলন করলেন, এতটা উত্তোলন করলেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তারপর জনতার দিকে পিঠ ঘুরালেন এবং নিচের চাদর উল্টিয়ে দিলেন, তখনও তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলিত ছিল। তারপর জনতার দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বার হতে নামলেন, অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়লেন। তখন আল্লাহ তা'আলা একখণ্ড মেঘ সৃষ্টি করলেন, মেঘ গর্জন করল, বিদ্যুত চমকাল, অতঃপর আল্লাহর আদেশে বৃষ্টি হলো। রাসূল ﷺ তাঁর মসজিদে আসতে না আসতেই বৃষ্টির পানির ঢল নামল। যখন রাসূল ﷺ লোকদেরকে নিজেদের আশ্রয়ের দিকে তাড়াহুড়া করে দৌড়াতে দেখলেন, হেসে উঠলেন, এমনকি সম্মুখের দাঁতসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। – [আবূ দাউদ]

١٤٢٣ - وَعَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) كَانَ إِذَا قُحِطُوْا اِسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْنَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪২৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। লোকেরা যখন অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হতো তখন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের অসিলায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন। তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আমাদের প্রিয় নবীর অসিলায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতাম। তখন তুমি বৃষ্টি বর্ষণ করতে। আর এখন আমরা তোমার কাছে আমাদের নবীর চাচা [হযরত আব্বাস (রা.)]-এর অসিলায় বৃষ্টির প্রার্থনা করছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। রাবী বলেন, এই দোয়ার ফলে তাদেরকে বৃষ্টি দান করা হতো। –[বুখারী]

١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خَرَجَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ ارْجِعُوْا فَقَدِ اسْتُجِيْبَ لَكُمْ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ النَّمْلَةِ . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)

১৪২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– নবীদের মধ্যে কোনো এক নবী জনতাকে সাথে নিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনায় বের হলেন, হঠাৎ দেখলেন, একটি পিঁপড়া নিজের সম্মুখের পা দু'টি [বৃষ্টির জন্য] আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে তখন এ দেখে মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা বাড়িতে ফিরে চল। তোমাদের প্রার্থনা এই পিঁপড়াটির কারণে মঞ্জুর করা হয়েছে।– [দারাকুতনী]

بَابُ فِى الرِّيَاحِ

পরিচ্ছেদ : ঝড় তুফানে করণীয়

মানুষের জীবন বাঁচানোর সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো বাতাস, এটা ব্যতীত কোনো প্রাণীই সামন্যতম সময়ও বেঁচে থাকতে পারে না, তবে এটা যখন অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে তখন মানুষের জান-মাল প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়, মুহূর্তের মধ্যে শহর-বন্দর-নগর মিসমার হয়ে যায়। বাতাস যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করত তখন রাসূল ﷺ-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে যেত। ফলে তিনি এর সমূহ ক্ষতি হতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ আনয়ন করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

١٤٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি পূবালী হাওয়া দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, আর আদ জাতি পশ্চিমা হাওয়া দ্বারা ধ্বংস হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلصَّبَا এবং اَلدَّبُوْرُ-এর ব্যাখ্যা : اَلصَّبَا 'সাবা' ও اَلدَّبُوْرُ 'আদ দাবূর' এ শব্দ দ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ— (১) জাওহারী বলেন, 'সাবা' হলো রাতের শেষ দিকের প্রথম ভাগের শীতল বাতাস। আর দাবূর হলো দিনের শেষে বিকালের বাতাস। এটা সাবা'র বিপরীত। (২) অথবা সাবা ঐ বাতাস, যা কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে পিছনের দিক হতে গায়ে স্পর্শ করে। পক্ষান্তরে দাবূর যে বাতাস সম্মুখ দিক হতে মুখমণ্ডল স্পর্শ করে। (৩) অথবা সাবা পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বাতাস, আর দাবূর পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত বাতাস। (৪) অথবা সাবা শীতকালীন বাতাস এবং দাবূর গ্রীষ্মকালীন বাতাস। (৫) অথবা সাবা উপকারী বাতাস, আর দাবূর বালা-মসিবতপূর্ণ বাতাস ইত্যাদি।

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, হাদীসের বাক্য نُصِرْتُ بِالصَّبَا দ্বারা কুরআনের সেই আয়াতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা খন্দকের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নাজিল করেছেন। আল্লাহর বাণী- فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থ- 'তখন আমি তাদের উপরে তুফান ও ফৌজ পাঠালাম যা তোমাদের চোখে অদৃশ্য ছিল।' উক্ত আয়াত ও বর্ণিত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, বাতাসের দ্বারা মহানবী ﷺ তথা মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হয়েছিল। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধে প্রায় মাসাধিক কাল যাবৎ মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য মিত্র গোত্রের দশ হাজার সৈন্যদল মদীনা শহর অবরোধ করে রেখেছিল। অবরুদ্ধ মুসলমানগণ পানি ও খাদ্য সংকট ও ভয় ভীতিতে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিল। শীতের প্রকোপও ছিল প্রচণ্ড। মক্কার মুশরিক বাহিনী পরিখার বাইরে অবস্থান করছিল। হঠাৎ একরাতে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে তাদের মালপত্র, তাঁবু-শিবির ইত্যাদি লণ্ড-ভণ্ড ও তছনছ হয়ে গেল। সাথে সাথে তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। এতে শত্রুগণ মনোবল হারিয়ে পলায়ন করতে শুরু করল। এছাড়া তুফানের তুমুল গর্জনের মধ্যে অজ্ঞাত সহস্র কণ্ঠের তাক্‌বীর ধ্বনি মুসলমান কাফের নির্বিশেষে সকলেই শুনতে পেল। ফলে এই তাক্‌বীর ধ্বনিতে ভীত হয়ে কাফের বাহিনী দ্রুত পলায়ন করতে লাগল। এটাই ছিল আল্লাহর ফৌজ ফেরেশতাদের ধ্বনি। এ ভাবে আল্লাহর নবী ও মুসলমানগণ পূবালী বাতাস দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হলেন।

وَعَنْ ١٤٢٦ - عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهٖ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ فَكَانَ اِذَا رَاٰى غَيْمًا اَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِىْ وَجْهِهٖ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কখনো এরূপ হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আল-জিভ দেখতে পাই। বরং তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ বা প্রবল বাতাস বইতে দেখতেন তখন চিন্তার ছাপ তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠত। [অর্থাৎ তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত] -[বুখারী, মুসলিম]

وَعَنْهَا ١٤٢٧ - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهٗ وَخَرَجَ وَ دَخَلَ وَاَقْبَلَ وَ اَدْبَرَ فَاِذَا مَطَرَتْ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ (رض) فَسَاَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهٗ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيَقُوْلُ اِذَا رَاَى الْمَطَرَ رَحْمَةً - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৪২৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন প্রবল ঝড়ো, হাওয়া বইত [তখন] নবী করীম ﷺ বলতেন, অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর ভাল দিকটি, এতে যে কল্যাণ রয়েছে তা এবং একে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তার ভাল দিকটি প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট মন্দ দিকটি হতে, এতে যে অকল্যাণ রয়েছে, তা হতে এবং এটা যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তার মন্দ দিক হতে পানাহ চাচ্ছি"। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,] যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হত তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত। [ভয়-বিহ্বল চিত্তে] তিনি একবার ঘর হতে বের হতেন, আবার ঘরে প্রবেশ করতেন, একবার সামনে অগ্রসর হতেন, আবার পিছনে সরে আসতেন। আর যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি হতো [তাঁর ভয়-বিহ্বলতা দূর হয়ে যেত] তাঁর চেহারা খুশিতে ভরে উঠত। রাবী বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর এই পরিবর্তন উপলব্ধি করতে পারলেন এবং তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, হে আয়েশা! এই মেঘ এমনও তো হতে পারে, যে মেঘ দেখে আদ সম্প্রদায় বলেছে- আল্লাহ কুরআনে বলেন, "যখন তারা একে তাদের নালা-প্রান্তরসমূহের দিকে আসতে দেখল, বলল, এটা তো মেঘ, এটা আমাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করবে।" অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল যখন স্বাভাবিক বৃষ্টি দেখতেন তখন বলতেন- এটা [আল্লাহর] রহমত। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে উল্লিখিত আয়াতটির বাকী অংশ এই : بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ. فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ [আল্লাহ বলেন, না, না] বরং এটা তাই. যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাইছিলে। এতে [তোমাদের জন্য] কঠিন. শাস্তি রয়েছে। [সূরা আহকাফ, আয়াত : ২৪]

وَعَنْ ١٤٢٨ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ (اَلْاٰيَةَ) ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

১৪২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গায়েবের চাবি পাঁচটি। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ ... (الاية) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলারই নিকট কিয়ামতের ইলম, আর তিনিই নাজিল করেন মেঘ-বৃষ্টি। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** مَفَاتِيْحُ শব্দ مِفْتَحٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো مَخْزَنٌ বা ভাণ্ডারসমূহ। আর مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ অর্থ- অদৃশ্যের ভাণ্ডারসমূহ, আর যদি مِفْتَاحٌ-এর বহুবচন হয় তবে এর অর্থ হবে عِلْمٌ বা জ্ঞান। এর জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই; নবী রাসূলদের যা অবহিত করেছেন তার অতিরিক্ত তারা জানতেন না। সর্বমোট عِلْمُ الْغَيْبِ হলো পাঁচটি। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ـ অর্থাৎ মহান আল্লাহর নিকট রয়েছে (১) কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান (২) বৃষ্টি বর্ষণ (৩) গর্ভে কি রয়েছে? (৪) মানুষ ভবিষ্যতে কি অর্জন করবে (৫) কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে, এগুলোর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। অন্য কেউ অবহিত হতে পারে না।

وَعَنْ ١٤٢٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَتِ السَّنَةُ بِاَنْ لَاتُمْطَرُوْا وَلٰكِنِ السَّنَةُ اَنْ تُمْطَرُوْا وَلَا تُنْبِتُ الْاَرْضُ شَيْئًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

১৪২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই নয় যে, তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হবে না; বরং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই যে, তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষিত হবে প্রচুর পরিমাণে। বৃষ্টি বর্ষিত হবে অথচ জমি কোনো কিছু ফলন দিবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা :** হাদীসটির উদ্দেশ্য এই যে, অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ নয়; বরং বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও জমিতে ফসল উৎপাদিত না হতে পারে এবং সে কারণে ও দুর্ভিক্ষ হতে পারে। বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিও হয়ে থাকে। এজন্য রাসূল ﷺ বৃষ্টির ভাল দিক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ١٤٣٠ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَاْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ فَلَا تَسُبُّوْهَا وَسَلُوا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوْذُوْا بِهٖ مِنْ شَرِّهَا ـ (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ)

১৪৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেন, "বাতাস আল্লাহর তরফ হতে আসে। তা কল্যাণ নিয়েও আসে, তা শাস্তি নিয়েও আসে"। সুতরাং তোমরা বাতাসকে গালমন্দ করো না; বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট এর কল্যাণ দিকটির প্রার্থনা করো এবং এর অকল্যাণ দিকটি হতে পানাহ প্রার্থনা করো। -[শাফেয়ী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী দাওয়াতুল কবীর গ্রন্থে]

وَعَنْ ١٤٣١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَلْعَنُوا الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর সম্মুখে বাতাসকে লানত করল। তখন মহানবী ﷺ বললেন, তোমরা বাতাসকে অভিসম্পাত করো না। কেননা, এটা আদেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি এমন কোনো কিছুকে অভিসম্পাত করে যা অভিশাপের যোগ্য নয়, সে অভিশাপ তার নিজের দিকেই ফিরে আসে। -[তিরমিযী। তবে তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

وَعَنْ ١٤٣٢ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ تَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

১৪৩২. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। আর যদি তোমরা একে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেখতে পাও, তবে বলবে, "হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই বাতাসের ভাল দিক, এতে যে কল্যাণ রয়েছে তা এবং যে উদ্দেশ্যে তা নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে তার উত্তম দিকটি প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট এর খারাপ দিক হতে, এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে এবং এটা যে উদ্দেশ্যে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে তার মন্দ দিক হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ١٤٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَاهَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا وَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ -(رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ)

১৪৩৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো ঝড়ো-বাতাস বইতে শুরু করলে নবী করীম ﷺ নিজের দু' হাঁটু পেতে বসে যেতেন এবং বলতেন, অর্থাৎ "হে আল্লাহ! একে করুণাস্বরূপ কর, শাস্তিস্বরূপ করো না। হে আল্লাহ! একে [মৃদু] বাতাসে পরিণত কর, ঝড়-তুফানে পরিণত করো না"। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে আছে যে, "আমি তাদের প্রতি [শাস্তিরূপে] প্রবল বাতাসকে পাঠালাম, আমি তাদের প্রতি [শাস্তিস্বরূপ] বন্ধ্যা বাতাস পাঠালাম, আমির তাদের প্রতি [অনুগ্রহস্বরূপ] গর্ভিনী বা ফলদায়িনী বাতাস পাঠালাম এবং তিনি [আল্লাহ] সুসংবাদ বহনকারী বাতাস পাঠালেন।" -[শাফেয়ী ও বায়হাকী দাওয়াতুল কাবীর গ্রন্থে]।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **হাদীসের ব্যাখ্যা** : বাতাসের মূল আরবি শব্দ رِيْحٌ এবং এর বহুবচন رِيَاحٌ কিন্তু আরবরা সাধারণত একবচন رِيْحٌ কে ক্ষতির ঝড়ের জন্য এবং বহুবচন رِيَاحٌ-কে মুখকর বাতাসের জন্য ব্যবহার করে থাকে। হাদীসের শেষাংশে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কুরআনের চারটি উদ্ধৃতি দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন।

وَعَنْ ١٤٣٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اَبْصَرَ نَاشِئًا مِنَ السَّمَاءِ تَعْنِي السَّحَابَ تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِيْهِ فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ)

১৪৩৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন নিজের কাজকর্ম ছেড়ে দিতেন এবং এর দিকেই নিবিষ্ট হয়ে যেতেন এবং বলতেন, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এতে যা কিছু অকল্যাণ রয়েছে আমি তা হতে তোমার কাছে পানাহ চাই। আর যদি আল্লাহ তা'আলা মেঘ পরিষ্কার করে দিতেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন, আর যদি বৃষ্টি হতো তিনি বলতেন, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান কর। -[আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ ও শাফেয়ী। তবে হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা শাফেয়ী (র.) কর্তৃক বর্ণিত।]

وَعَنْ ١٤٣٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

১৪৩৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনতে পেতেন তখন বলতেন, অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার রোষের দ্বারা হত্যা করো না; তোমার শাস্তির দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না; বরং এর পূর্বেই আমাদেরকে প্রশান্তি দান করো। -[আহমদ, তিরিমযী। তবে তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلرَّعْدُ وَالصَّوَاعِقُ-**এর ব্যাখ্যা** : اَلرَّعْدُ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- গর্জন। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে যে, أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ তবে এই اَلرَّعْدُ-এর মর্মার্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ- (১) ইবনুল মালিক বলেন رعد হলো সেই ফেরেশতার নাম, যিনি মেঘমালা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। (২) ইমাম শাফেয়ী (র.) নির্ভরযোগ্য একসূত্রে মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেন যে, রাদ হলো একজন ফেরেশতা, আর বারক হলো সেই ফেরেশতার পাখা, যার দ্বারা সে মেঘমালা পরিচালনা করেন। (৩) ইমাম বাগাবী (র.) অধিকাংশ তাফসীরকারক হতে বর্ণনা করেন যে, الرعد হলো মেঘমালা পরিচালমাকারী ফেরেশতা, আর যে শব্দ শোনা যায় তা হলো তার তাসবীহ। পবিত্র কুরআনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ الخ (৪) এক হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম ﷺ

বলেন, اَلرَّعْدُ হলো মেঘমালার বাক্য, আর اَلْبَرْقُ হলো তার হাসি। (৬) দার্শনিকদের মতে اَلرَّعْدُ হলো মেঘমালার সংঘর্ষের শব্দ। আর اَلْبَرْقُ হলো সেই সংঘর্ষের আলো।

اَلصَّوَاعِقُ-এর পরিচিতি : اَلصَّوَاعِقُ শব্দটি صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ হলো– বজ্রধ্বনি। এর ব্যাখ্যা নিয়েও কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যেমন– (১) কিছু সংখ্যকের মতে মেঘমালার ঘর্ষণের ফলে যে আগুনের সৃষ্টি হয় এবং নিচের দিকে চলে আসে তাকে صَاعِقَةٌ বলে। (২) আল্লামা তীবী (র.) বলেন صَاعِقَةٌ ঐ বিদ্যুতের গর্জনকে বলে, যার সাথে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। (৩) অপর এক দলের মতে শাস্তির আওয়াজকে صَاعِقَةٌ বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٤٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رض) اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

১৪৩৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন কথাবার্তা ছেড়ে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করতেন, যার অর্থ– আমি সেই সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসার সাথে। আর ফেরেশ্তাকুল পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ভয়ে। –[মালেক]

قَدْتَمَّ كِتَابُ الصَّلٰوةِ بِتَوْفِيْقِ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ الْعَلَّامِ وَعَوْنِهٖ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكْرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

(اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِكَاتِبِهٖ وَلِنَاشِرِهٖ وَلِمَنْ سَعٰى فِيْهِ)

—ঃ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ঃ—